গ্রন্থাবলী সিরিজ

যোগেন্দ্র-গ্রন্থাবলী

(দ্বিতীয় ভাগ)

পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত
বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

গ্রন্থাবলী সিরিজ

যোগেন্দ্র গ্রন্থাবলী

(দ্বিতীয় ভাগ)

পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

[দ্বিতীয় সংস্করণ]

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী-বৈদ্যুতিক-রোটারী-মেসিনে"

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত

[মূল্য ১৷৷০ টাকা।

কীর্ত্তি-মন্দির

বা

রাজপুত-বীর-কীর্ত্তি

(মহাত্মা টডের রাজস্থান অবলম্বন করিয়া)

যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ এম, এ
কর্ত্তৃক রচিত

মুখবন্ধ

বীরপ্রসবিনী রাজপুতানার বীরত্বকাহিনী কখন পুরাতন হয় না। রামায়ণ ও মহাভারতের ন্যায় রাজপুতানার ইতিহাস যতবার পাঠ করা যায়, ততবারই মন অমৃতরসে আপ্লুত হয়। আত্মবিসর্জ্জনের অনন্ত-জ্বলন্ত দৃষ্টান্তে অতি কাপুরুষেরও মনে স্বদেশের ও স্বজাতির জন্য প্রাণোৎসর্গ করিতে অভিরুচি হয়। স্পার্টান-রমণী প্রাণপুত্তলীকে রণস্থলে পাঠাইবার সময় তাহার হস্তে ঢাল দিয়া বলিতেন যে, বৎসে! রণে জয়ী হইয়া এই ঢাল লইয়া বিজয়োৎসাহে আমার নিকট ফিরিয়া আসিও, অথবা রণে হত হইয়া এই ঢালশয্যায় শায়িত হইয়া বরং জননীর নিকট আনীত হইও; কিন্তু কিছুতেই যেন রণে পরাজিত বা বিমুখ হইয়া আমার নিকট আসিও না।" বীরা তেজস্বিনী স্পার্টান-রমণীর এই বাক্যে তাঁহারা আজও জগতে পূজিতা হইয়া আছেন। কিন্তু রাজপুতনারী পুত্রকে বা স্বামীকে রণস্থলে পাঠইয়া নিজে বিলাসভবনে অবস্থিতি করিতেন না; স্বয়ং সমর-সাজে সাজিয়া অসি-হস্তে রণাঙ্গণে স্বামী বা পুত্রের পার্শ্বে দণ্ডায়মানা হইয়া স্বদেশ ও স্বজাতির জন্য যুদ্ধ করিতে করিতে স্বদেশ-রক্ষাযজ্ঞে প্রাণাহুতি দিতেন, আর যখন স্বদেশরক্ষা অসম্ভব মনে করিতেন, তখন সেই বিদ্যুল্লতিকাসকল সতীত্ব-রক্ষার জন্য পরস্পর শৃঙ্খলিত-করে দলে দলে অকাতরে জহরানলে প্রাণবিসর্জ্জন করিতেন। সুতরাং ইহারা স্পার্টান্‌রমণীগণ অপেক্ষাও শতগুণে অধিক পূজ্যা।

রাজপুতরমণীগণের ন্যায় রাজপুতবীরগণও বীরত্বে ও আত্মোৎসর্গে জগতে অতুলনীয়। এক লিয়োনিডাসের বীরত্বকাহিনীতে গ্রীস প্রতিধ্বনিত! কিন্তু রাজপুতানায় কত শত লিয়োনিডাস্ অতিমানুষ বীরত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক স্বদেশরক্ষা-ব্রতে জীবন আহুতি দিয়াছেন! মহাত্মা টড্ সত্যই বলিয়াছেন যে, রাজপুতানার প্রতি গিরিসঙ্কটই লিওনিডাদের বীরত্ব বিলসনভূমি থার্ম্মোপিলিসদৃশ। প্রত্যুত এত অদ্ভুত বীরত্বের কার্য্য আর কোন দেশেই এরূপ ধারাবাহিকরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল কি না, এবং এত বীরনারী কোন দেশেই এক সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন কি না সন্দেহ।

বাপ্পারাউল হইতে অমরসিংহ পর্য্যন্ত মিবারের স্বাধীন রাণাগণের জীবনী মাত্র এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই সময়ের অপূর্ব্ব কীর্ত্তিকলাপ বর্ণনা করা যদিও মাদৃশ মূঢ় জনের পক্ষে অসম্ভব, তথাপি সেই রাণাগণের ও তাঁহাদের অধীন সামন্তবর্গের গুণরাশি আমার কর্ণে নিরন্তর প্রতিধ্বনিত হওয়ায়, আমি এই চপলতায় প্রবৃত্ত হইয়াছি।* অথবা যেমন বজ্রসমুৎকীর্ণ মণির অভ্যন্তরে অতি কোমল সূত্রেরও গতি সহজসাধ্য,† সেইরূপ মহাত্মা টড্ কর্ত্তৃক প্রণীত সুবিখ্যাত রাজস্থানের ইতিহাস-নামক অমূল্য গ্রন্থের সাহায্যে মাদৃশ ক্ষুদ্র জনেরও এরূপ মহিমান্বিত রাজবংশের অতুল কীর্ত্তিকলাপের যৎকিঞ্চিৎ বর্ণনা করা সম্ভবপর হইতে পারে। সে মহিমা তাঁহার—আমার নহে।

টডের গ্রন্থকে অবলম্বন করিয়া এই ইতিহাস-গ্রন্থ লিখিয়াছি বটে, কিন্তু অনুবাদকের ন্যায় তাঁহার নিরন্তর অনুবর্ত্তন করি নাই। প্রকৃত ঘটনা অবিকল রাখিয়া আমি নানাস্থানে ইচ্ছামত উচ্ছ্বাসরাজ্যে বিচরণ করিয়াছি। ঘটনাপুঞ্জের ঘাতপ্রতিঘাতে আমার প্রাণে যে ভাব-তরঙ্গ উত্থিত হইয়াছে, তাহার যথাযথ বর্ণনা করিতে ত্রুটি করি নাই। রাজপুতানা

---

* 'তদ্‌গুণৈঃ কর্ণমাগত্য চাপলায় প্রণোদিতঃ॥' রঘুবংশম্।

† 'মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ॥' রঘুবংশম্।

অনন্ত কীর্ত্তিময়ী! ইহার সেই অনন্ত কীর্ত্তির অধিকাংশই আবার রঙ্গভূমি মিবারেই অনুষ্ঠিত হয়। মিবারের সেই আবর্ত্তময়ী ঘটনা রাশির আলোচনায় যাহার হৃদয়ে উদ্বেল তরঙ্গমালা উত্থিত না হয়, সে জন পাষাণ - নর নামের অযোগ্য।

এক রাণা প্রতাপের জীবনী পাঠ করিলেই জীবন সার্থক বলিয়া বোধ হইত। সে জীবনের মহিমা বর্ণন করা সামান্য লেখকের কার্য্য নহে। কিন্তু এরূপ ঘটনাপুর্ণ জীবনী—এরূপ ঘাতপ্রতিঘাতের অপূর্ব্ব কাহিনী—সামান্য লেখকের হস্তেও নিজ মাহাত্ম্যে অদ্ভুত আভিনয়িক ফল উৎপাদন করিয়া থাকে। সে গৌরব সে চরিত্রের, লেখকের নহে।

বাপ্পারাউল হইতে রাণা অমরসিংহ পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যবর্ত্তী মিবার ইতিহাস হিন্দুযবন-সংঘর্ষে পরিপূরিত। এই কালের মধ্যে যবনেরা অবিরাম ভারত আক্রমণ করিয়া পদে পদে প্রতিহত হইয়া অবশেষে ভারতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হন। যে যে হিন্দুজাতি সেই অজস্র বাহিনী যবন-স্রোতস্বিনীর গতি-রোধ ব্রতে জীবন আহুতি দিয়াছিলেন, তাঁহাদিগেব মধ্যে মিবারের রাজপুতগণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। প্রায় সহস্র বৎসর ধরিয়া মিবারের রাণাগণ অধীন সামন্তবর্গসহ এই প্রবল স্রোতস্বিনীর গতি-রোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের অতিমানুষ বীরত্বে ও অদ্ভুত রণ কৌশলে বহুদিন ধরিয়া তাঁহারা এই স্রোতস্বিনীর গতি মিবারের বহির্ভাগে রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কাপুরুষ রাণা উদয়সিংহ চিতোরের সিংহাসনে অধিরূঢ় না থাকিলে বোধ হয়, চিতোর রাজপুত কীর্ত্তিস্থলী রাজরাজেশ্বরী চিতোর নগরী কখনই যবনহস্তে পতিতা হইত না। বীর সন্ন্যাসী প্রতাপ পিতৃ-কলঙ্ক-ক্ষালনের জন্য বিবিধ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু মহাপ্রতাপান্বিত ও রণচতুর আক্বরের বুদ্ধি-কৌশলে ও বাহুবলে তাঁহার সমস্ত চেষ্টাই বিফল হইয়াছিল। বীরবর প্রতাপতনয় অমরসিংহও হ্যানিবলের ন্যায় পিতা কর্ত্তৃক এই ব্রতে দীক্ষিত হইয়া মিবারের লুপ্তগৌরব উদ্ধার করিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনিও চিতোরের পুনরুদ্ধারে সমর্থ হন নাই। অমরসিংহের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে মিবারের স্বাধীনতাসূর্য্যও অস্তমিত হইল! সেই স্বাধীনতাসূর্য্য ভারতগগনে আর কখন উদিত হইবে কি না—ভারতের অনন্ততিমিরময়ী নিশার কখন অবসান হইবে কি না—এ গভীর প্রশ্নের উত্তর ভগবান্ ভিন্ন আর কেহ দিতে পারেন না।

সেই স্বাধীনতা সমরে—সেই ভীষণ হিন্দু-যবন-সংঘর্ষে—যে কত হিন্দু বীর বলি পড়িয়াছিলেন ও কত হিন্দুদেবমন্দির ভূমিসাৎ হইয়াছিল, তাহার গণনা করে, কাহার সাধ্য? আর কত আর্য্যললনা প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর সতীত্বরত্নের রক্ষার জন্য যে অহবানলে বা অসিহস্তে সমরাঙ্গনে প্রাণবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা নির্ণয় করিতে গেলে কাহার না হৃদয় বিদীর্ণ হয়?

তাই রাজপুতানার ইতিহাস লিখিতে গেলে স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তির প্রাণে বড় ব্যথা লাগে। হিন্দু-যবনের বহুদিন একত্রে অবস্থিতি নিবন্ধন হিন্দুগাত্রের যে সকল ক্ষত শুষ্কপ্রায় হইয়া আসিয়াছিল, রাজপুতানার ইতিহাস পাঠ করিতে বা লিখিতে গেলে, সেই সকল ক্ষত আবার নবীভূত হইতে থাকে। যবনগণের অতীত অত্যাচার-কাহিনী পাঠ করিলে ক্রোধে ও ক্ষোভে সর্ব্বশরীর অগ্নিময় হইয়া উঠে। কিন্তু ভারতের ভবিষ্য মঙ্গলের জন্য এ প্রজ্বলিত অনল আবার তখনই নির্ব্বাপিত কবিতে হয়। যেহেতু, এ অনল আবার জ্বলিলে ভারত পুনরায় ভস্মস্তূপে পরিণত হইবে। এই জন্য রাজপুতানার ইতিহাস লিখিতে বা পড়িতে যমযন্ত্রণা উপস্থিত হয়। এই জন্যই আমি এতদিন বৈদেশিক মহাত্মাগণের জীবনী ও বৈদেশিক বীরত্ব-কাহিনী বর্ণনা করিয়াই প্রাণের আকাঙ্ক্ষা কথঞ্চিৎ মিটাইতাম!

কিন্তু স্বদেশের বীরত্ব-কাহিনী ও স্বদেশের ইতিহাস বর্ণনা না করিলেও জীবন সার্থক বলিয়া মনে হয় না। যেন গুরুতর কর্ত্তব্যের ক্রটি হইল বলিয়া মনে হয়। প্রাণের পিপাসা কেবল পরের কথায় মিটে না। তাই আমি আজ অক্ষয়কীর্ত্তি রাজপুতগণের বীরত্ব-কাহিনী বর্ণনা করিতে বসিয়াছি। হৃদয়ের চিরলালিত ভাবতরঙ্গের সহিত সমঞ্জসীভূত হওয়ায়, এই বিষয়টি আমার নিকট অতি মধুর লাগিয়াছে। এক্ষণে বিষয়ের মাহাত্ম্যে যদি আমার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি সহৃদয় পাঠকবর্গের নিকট মধুর লাগে, তাহা হইলেই জীবন সার্থক মনে করিব।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে—যদি ভাবোচ্ছ্বাসের বেগে অতীত যবনগণের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমি কোন রূঢ় বচন বলিয়া থাকি, আশা করি, বর্ত্তমান

উদারমতি যবনভ্রাতৃগণ ঐতিহাসিকের সে অধিকার ক্ষমাযোগ্য বলিয়া মনে করিবেন। কারণ যদিও তাঁহাদিগের সহিত আমাদের এক্ষণে পূর্ণ ভ্রাতৃভাব, তথাপি সত্যের অনুরোধে ঐতিহাসিককে বলিতে হইবে যে, আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ কর্ত্তৃক সবিশেষ নির্য্যাতিত হইয়াছিলেন। সে পুরাতন কাহিনী তুলিয়া বর্ত্তমান যবন-ভ্রাতৃগণকে তিরস্কার করা আমাদের অভিপ্রেত নহে। কেবল বর্ত্তমান সময়ে অতীত কালের ঘটনাবলী হইতে উপদেশ গ্রহণ করাই আমাদিগের একমাত্র লক্ষ্য। হিন্দু-যবন-বিদ্বেষে ভারতের কি দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, এবং ইহা চিরস্থায়ী হইলে এই দুর্দ্দশা অনন্তকালস্থায়ী হইবে, ইহা প্রতিপন্ন করাই—এ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য। যদি কখন এ বিদ্বেষ অপনীত হইয়া ভারতে হিন্দু-যবন-সমন্বয় হয়, তাহা হইলেই ভারতের সৌভাগ্য-সূর্য্য ভারতগগনে পুনরুদিত হইবে—নতুবা নহে। তাহা হইবে কি না, ভবিষ্য ইতিহাস ইহার উত্তর দিবে।

যবন-রাহু-গ্রস্ত, শ্রীভ্রষ্ট পতিত মিবারের কাহিনী লিখিতে লেখনী সরিল না বলিয়া অগত্যা আমাকে এবারকার মত অমরসিংহের জীবনী পর্য্যন্ত লিখিয়াই গ্রন্থ সমাপ্ত করিতে হইল। অলমতিবিস্তরেণ।

শকাব্দা ১৮১১।
তারিখ ১৮ই আশ্বিন।

গ্রন্থকারস্য।

কীর্ত্তি-মন্দির

বাপ্পারাউল্‌ ও তদ্বংশ

৭৮৭ সংবতে বা ৭২৮ খৃষ্টাব্দে পঞ্চদশবর্ষ বয়ঃক্রম-কালে এই মহাপুরুষ চিতোরের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ইহার পূর্ব্বে মোরিবংশীয় রাজগণ চিতোরের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়া আসিতেছিলেন। বাপ্পারাউল শেষ মোরিবংশীয় রাজার ভাগিনেয়। মোরিবংশীয় রাজা সামন্তবর্গের জায়গীর কাড়িয়া লওয়ায় তাঁহারা সমবেত হইয়া মোরিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া সেই শূন্য সিংহাসনে বাপ্পারাউলকে সমাবেশিত করেন। ইনিই মিবারের শিশোদীয়াবংশীয় রাজবৃন্দের আদিপুরুষ। বাপ্পারাউল ঘেলোটবংশীয়। আমরা এই স্থলে সংক্ষেপে এই বংশের কাহিনী বর্ণন করিব। এই বংশ সূর্য্যবংশ হইতে উৎপন্ন। রামপুত্র লব হইতে এই বংশের আবির্ভাব। লব লবকোট বা লাহোর নগরী প্রতিষ্ঠাপিত করেন। তদীয় বংশধরগণ বহুদিন ধরিয়া তথায় রাজত্ব করেন। লববংশের যে শাখা হইতে মিবারের রাণা সমুৎপন্ন হইয়াছেন, সেই শাখার অন্যতম রাজা কনকসেন তথা হইতে আসিয়া দ্বারকায় রাজ্য স্থাপন করেন। তৎকালে এই বংশ সেন-বংশ নামে কথিত হয়। তাহার পর স্থান-পরিবর্ত্তনে বা অন্যান্য কারণে এই বংশ আদিত্য-বংশ আখ্যা ধারণ করে। তাহার পর ইহা ঘেলোট্‌-বংশ নামে আখ্যাত হইতে আরম্ভ হয়। ঘেলোট-বংশ প্রথমে অহর্য্যবংশ এবং পরে শিশোদীয়া-বংশ আখ্যা ধারণ করে। বাপ্পারাউল হইতে আরম্ভ করিয়া মিবারের রাণাগণ শিশোদীয়া-বংশ হইতে সমুৎপন্ন।

কনকসেন লবকোট বা লাহোর হইতে সৌরাষ্ট্র প্রদেশে আসিয়া তথায় ১৪৪ খৃষ্ট শকে বীরনগর নামে একটি নগরী সংস্থাপন করেন। তিনি প্রমরা-বংশীয় রাজাকে পরাজিত করিয়া তদীয় রাজ্য সৌরাষ্ট্র প্রদেশ নিজ করায়ত্ত করেন। চারি-পুরুষ গত হইলে তদীয় বংশে বিজয় সেন বা নশীর্ব্বাণ নামে এক প্রবলপরাক্রান্ত নরপতি আবির্ভূত হন। ইনি বিজয়পুর, বিদর্ভ ও বল্লভীপুর নামে তিনটি নগরী সংস্থাপিত করিয়া তন্মধ্যে বল্লভীপুরকেই নিজ রাজধানীতে পরিণত করেন। বল্লভীপুর বর্ত্তমান ভাওনগর বা ভগবান্‌গরের দশ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। ইহা এখনও অতি দুরবস্থা-তেও প্রাচীন মাহাত্ম্যের কোন কোন চিহ্ন ধারণ করিতেছে। লোকে ইহাকে এখন শুদ্ধ বল্লভী বলিয়া জানে। 'শক্রঞ্জয়-মাহাত্ম্য' নামক একখানি জৈনগ্রন্থে এই নগরীর সমৃদ্ধি সবিশেষ কীর্ত্তিত আছে। বল্লভীর প্রাচীর-মালার ভগ্নাবশেষ এখনও ইহার অতীত মাহাত্ম্যের পরিচয় দিতেছে। অন্যান্য জৈনগ্রন্থেও 'রাণা রাজসিংহের রাজত্ববর্ণন' নামক ইতিহাসে বল্লভীপুরের উল্লেখ আছে। জৈন-গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে, ২০৫ বিক্রম শকে বা ৫২৪ খৃষ্ট শকে এই মহানগরী অসভ্যগণ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ ও গৃহীত হয়। সেই সময় ইহার অধিবাসি-বৃন্দের অনেকে নিহত হন এবং হতাবশিষ্ট অধিবাসিগণ তথা হইতে পলাইয়া মরুদেশে গিয়া বল্লী, সন্দেরী, ও নাদোল—এই তিনটি নগরী সংস্থাপন করিয়া তথায় বাস করেন। পুরাতত্বে প্রথিত আছে, ঐ সকল আক্রমণকারিগণ সিথিক বংশ হইতে সমুৎপন্ন এবং পার্থিয়া রাজ্য হইতে সমাগত। ইহারা খৃষ্টীয়

দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রথমে সিন্ধুপ্রদেশে আসে। যদুবংশীয় রাজগণ হইতে বলে শমীনগর অধিকার করে, এবং ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইতে আসিয়া বল্লভীপুর অবরুদ্ধ ও অধিকৃত করে। ঐ পথ দিয়া আসিয়ার উদীচ্য পার্ব্বত্যপ্রদেশ হইতে অসংখ্য আর্য্য ও অনার্য্য জাতি আসিয়া ক্রমশঃ ভারত উপদ্বীপকে অধিবাসিত করে। খৃষ্টীয় প্রথম হইতে ষষ্ঠ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই মানবস্রোতস্বিনী উত্তর হইতে প্রথমে দক্ষিণাভিমুখিনী ও পরে পূর্ব্বাভিমুখিনী হইয়া পঞ্চনদ, সৈন্ধব ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশকে ক্রমশঃ প্লাবিত করে। ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ ভারতীয় ও পাশ্চাত্য পুরাবৃত্তে বিদ্যমান আছে। এই সকল জাতির মধ্যে জিৎ বা জেতী, শূন, কমরী, কট্টী, মক্কহন, বল্ল ও অশ্বরী প্রধান। কাহারও কাহারও মতে বল্লভী নগরীর আক্রমণকারিগণ সিথিক-বংশোদ্ভব নহেন, শূন-বংশোদ্ভব। তাঁহারা বলেন যে, নামকারণ্যে বল্লভীপুর সম্ভবতঃ বল্লজাতীয় রাজগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠাপিত। বল্লজাতি সিথিক-বংশের একটি শাখা। সুতরাং সিথিক্‌জাতীয় আক্রমণকারী স্বজাতি-প্রতিষ্ঠাপিত নগরীর অধিবাসিবৃন্দের হননকার্য্য দ্বারা আপনাদিগকে কখনই কলঙ্কিত করিতেন না।

সিথিক-বংশোদ্ভবগণ সূর্য্য ও অগ্নির উপাসক ছিলেন, এবং বল্লভীপুরের রাজবৃন্দও সূর্য্য ও অগ্নির উপাসক ছিলেন। ইহা হইতেও পুরাতত্ত্ববিদগণ অনুমান করেন, বল্লভীপুরের রাজবৃন্দও সিথিক-বংশীয় বল্লজাতি হইতে সমুৎপন্ন। বল্লভীপুর এক সময়ে ভারবর্ষের রাজধানী ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কারণ, যদিও বল্লভীপুর সৌরাষ্ট্রপ্রদেশের রাজধানী ছিল, তথাপি ষ্ট্রাবো প্রভৃতি প্রতীচ্য পুরাতত্ত্ববিদগণ যখন ভারতকে সৌর বা সূর্য্যের উপাসকগণের দেশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তখন সমস্ত ভারতবর্ষে বল্লভীপুরের রাজবৃন্দের আধিপত্য থাকা সম্ভব। শিলাদিত্যের যেরূপ প্রতাপ বর্ণিত আছে, তাহাতে এ অনুমান অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

আদিত্য-বংশের প্রসিদ্ধ রাজা শিলাদিত্য। প্রবাদ আছে যে—তদীয় রাজধানী বল্লভীপুরনাম্নী নগরীতে সূর্য্যকুণ্ড নামে একটি প্রস্রবণ ছিল। শিলাদিত্যের আদেশে সেই সূর্য্যকুণ্ড হইতে একখানি সপ্তাশ্বরথ সমুদিত হইত। হিন্দুশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, সূর্য্যদেব সপ্তহয়বাহিত রথে আরোহণ করিয়া ধরামণ্ডল প্রদক্ষিণ করিয়া থাকেন। সুতরাং লোকে তাঁহাকে সূর্য্যের অবতার বা তদ্‌বংশসম্ভূত বলিয়া মনে করিত। প্রবাদ আছে যে—এই সপ্তাশ্বরথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধস্থলে অবতীর্ণ হইলে তাঁহাকে কেহ পরাজয় করিতে পারিত না। কিন্তু ভারত চিরদিনই বিশ্বাসঘতকতা দ্বারা বিক্রীত হইয়া আসিতেছে। শিলাদিত্যের মন্ত্রী—শত্রুর নিকট সূর্য্যকুণ্ড কলুষিত করিবার উপায় প্রকাশ করিয়া দিলেন। তদনুসারে শত্রুগণ গোরক্তে সেই পবিত্র প্রস্রবণকে দূষিত করিল। আর শিলাদিত্যের আদেশে সে কুণ্ড হইতে সপ্তাশ্ব রথ সমুদিত হইল না। শিলাদিত্য বার বার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সে প্রার্থনা আর গ্রাহ্য হইল না। কোন্ জাতি এ গোহত্যা-পাতকে লিপ্ত হইল, তাহার নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা অসম্ভব। সে যে জাতি হউক্ না কেন—ইহা স্থির হইল যে—সেই জাতি দ্বারাই বল্লভবীপুর বিধ্বস্ত হইল।

এই যুদ্ধে শিলাদিত্য নিহত হইলে তদীয় পত্নীগণ তাঁহার সহিত সহমৃতা হইলেন। কেবল রাজমহিষী পুষ্পবতী গর্ভবতী ছিলেন বলিয়া চিতারোহণ করিতে পারিলেন না। বিশেষতঃ বল্লভপুরের পতনের সময় তিনি পিতৃ-গৃহে ছিলেন। তিনি প্রমর-বংশীয় চন্দ্রাবতীশ্বরের দুহিতা। চন্দ্রাবতী নগরে অম্বভবানী নামে এক জাগ্রত দেবতা ছিলেন। নিজ গর্ভে যাহাতে রাজা জন্মগ্রহণ করেন, এই উদ্দেশ্যে অম্বভবানীর মন্দিরে ধন্না দিবার জন্য তিনি তথায় গমন করেন। কিন্তু বল্লভীপুরের অবরোধবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তিনি দ্রুতপদে স্বামিসকাশে গমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে স্বামীর মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া তিনি বজ্রাহতার ন্যায় পতিতা ও মূর্চ্ছিতা হইলেন। অম্বভবানী—তাঁহার গর্ভজাত কুমার রাজা হইবে বলিয়া তাঁহকে যে বর দিয়াছিলেন—এবং সেই বর পাইয়া তিনি মনে যেন আশালতা পোষিত করিতেছিলেন—সে আশালতা এত দিনে সমূলে উৎপাটিত হইল। শোকে অভিভূতা হইয়া রাজমহিষী মল্লিয়া-গিরিগুহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। তথায় তিনি এক পুত্র-সন্তান প্রসব করিলেন। পাছে শত্রুগণ সন্ধান পাইয়া তদীয় পুত্রের প্রাণ সংহার

করে, এই ভয়ে মহিষী পুষ্পবতী বীরনগরের কমলাবতী নাম্নী কোন ব্রাহ্মণপত্নীর হস্তে ইহার লালনপালন ও শিক্ষার ভার দিয়া পতির উদ্দেশে অনলে আত্ম-আহুতি প্রদান করিলেন। ধন্যা পুষ্পবতী! ধন্য তোমার স্বামি-ভক্তি! তুমি নবপ্রসূতা কুমারের স্নেহ ভুলিয়াও অপার্থিব সুখের আশায় পার্থিব সুখে জলাঞ্জলি দিলে! পুত্র-স্নেহ পতিভক্তির নিকট পরাজিত হইল! পুষ্পবতি! তোমার ন্যায় সতী যে দেশে জন্মগ্রহণ করেন, সে দেশ পূত হইয়া যায়।

কমলাবতী বীরনগরীর কোন দেবালয়ের সেবিকা ছিলেন, এবং স্বয়ং পুত্রবতী ছিলেন। তথাপি তিনি এই রাজকুমারকে পুত্র-নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। "গুহজাত" বলিয়া তিনি রাজকুমারের নাম "গোহা" রাখিলেন। শিশু গোহা পালয়িত্রী ও তদ্বন্ধুবর্গের অনন্ত চিন্তা ও অসুখের উৎস-স্বরূপ হইয়া উঠিলেন। তিনি রাজপুত-পুত্রগণের সহিত পাখী মারিয়া ও বন্য জন্তু সকল শীকার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। যখন ইহাঁর বয়স একাদশ বৎসর মাত্র, তখনই গোহা সম্পূর্ণরূপে শাসনাতীত হইয়া উঠিলেন। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ কয়দিন ভস্মাচ্ছাদিত থাকে? সূর্য্য-রশ্মিকে কেহ কখন কি বালুপুঞ্জে আবৃত করিতে পারে?

এই সময়ে ঈদর-নগরে মাণ্ডলিক নামে এক ভীল-জাতীয় রাজা রাজত্ব করিতেছিলেন। বালক গোহা ভীল-বালকগণের সমভিব্যাহারে সেই অরণ্য-প্রদেশে মধ্যে মধ্যে গমন করিতেন। শান্তিময় ব্রাহ্মণ-কুমারগণ অপেক্ষা নির্ভীক ও অদীনসাহস ভীলপুত্রগণের সহিত তাঁহার অধিকতর প্রাকৃতিক সামঞ্জস্য ছিল। এই জন্য তাঁহাদিগের মধ্যে ঘনীভূত সখ্যভাব সংস্থাপিত হইল। তিনি সেই আরণ্য-বালকগণের ক্রমে অতি আদরের সামগ্রী হইয়া উঠিলেন! তাহারা তাঁহাকে সেই আরণ্য-প্রদেশের রাজ-স্বরূপ করিয়া ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিল। এক দিন সেই আরণ্য বালকগণ তাঁহার অভিষেক-চ্ছলে নিজের অঙ্গুলি কাটিয়া সেই রক্তে তাঁহার ললাটে রাজটীকা পরাইয়া দিল। এই সংবাদ বৃদ্ধ ভীলরাজের কর্ণগোচর হইল। তিনি ইহাতে বিরক্ত না হইয়া বরং মহাসন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে মহাসমারোহে ঈদরের সিংহাসনে আরোহিত করিলেন। কোন অজ্ঞাত কারণে গোহা এই উপকর্ত্তার প্রাণবধ করিয়া নিজ নাম কলঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, এই গোহাই গোহাবংশের প্রতিষ্ঠাতা। এই গোহাবংশই ক্রমে শাব্দিক বিবর্ত্তনে প্রথমে গেহিলোট্, পরে গোহিলোট্, এবং শেষে গেহ্লোট নাম ধারণ করিয়াছিল।

গোহা হইতে ক্রমে অষ্টজন গেহ্লোট্-বংশীয় নরপতি নির্ব্বিবাদে ঈদরের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিলেন। কিন্তু ক্রমেই ভীলেরা বৈদেশিক শাসনে বীতশ্রদ্ধ ও স্খলিত-ধৈর্য্য হইয়া উঠিল। অবশেষে অষ্টম গেহ্লোট নরপতি নাগাদিত্য বা নাগাদিৎ তাহাদিগের এই বৈদেশিক-শাসন-বিদ্বেষের নিকট বলি পড়িলেন। একদিন তিনি মৃগয়া-উপলক্ষে একাকী অরণ্য-মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এমন সময়ে কোন নিষ্ঠুর ভীল তাঁহার প্রাণবধ করিল। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ঈদরে গেহ্লোট্-রাজবংশের রাজত্বকালের অবসান হইল।

বীরনগরের ব্রাহ্মণী কমলাবতীর বংশধরগণই ঈদরস্থ গেহ্লোট্-বংশীয় রাজগণের পৌরোহিত্য করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহারা গোহার প্রাণরক্ষা করিয়া যেমন গেহ্লোট্-বংশের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সেইরূপ এই সঙ্কটকালে নাগাদিৎতনয়, তিন বৎসরের শিশু বাপ্পারাওর জীবন রক্ষা করিয়া এই গেহ্লোট্-বংশ অক্ষত রাখিলেন। তাঁহারা শিশু বাপ্পারাওকে লইয়া বর্ত্তমান জারোলের পোনের মাইল দূরে অবস্থিত ভান্দীয়ার নামক দুর্গে পলায়ন করিলেন। তথায় একজন যদুবংশীয় বীর তাঁহাকে শত্রুদিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করেন। কিন্তু তথায় তাঁহার জীবনের আশঙ্কা আছে মনে করিয়া অবশেষে তাঁহাকে পরাশরারণ্যে লইয়া যাওয়া হয়। সেই নিবিড় অরণ্যের মধ্যভাগস্থ ত্রিকূট-পর্ব্বতের পাদদেশে তৎকালে নগেন্দ্র নামে এক নগরী ছিল। সেই নগরীর অধিষ্ঠাতৃদেব নগেন্দ্রের নামে নগরীর নামকরণ হইয়াছিল। এই নগরী কেবল ব্রাহ্মণগণ দ্বারা অধ্যুষিত ছিল। ব্রাহ্মণেরা নাগীন্দ্র দেবের পূজা করিয়া সেই নগরীর উপস্বত্ব ভোগ করিতেন। গিরিগুহা-পরিবেষ্টিত এই পার্ব্বত্যপ্রদেশস্থ বলদেবকুঞ্জে বা দেব-মন্দিরে বাপ্পারাওর শৈশবকাল অতিবাহিত হয়।

এখনও এই গৈরিক-প্রদেশে অতি প্রাচীন দেবমন্দির সকল দৃষ্টিগোচর হয়। তুমি অতি গভীর তমসাচ্ছন্ন গুহামধ্যে প্রবেশ কর বা অতি বন্ধুর গিরি-শিখরে আরোহণ কর, অথবা অতি নিবিড় অরণ্যের নিবিড়তম প্রদেশে অবগাহন কর, সর্ব্বত্র লতামণ্ডপাবৃত নিভৃত নিকুঞ্জপ্রদেশ, সৌন্দর্য্যের আবাস-ভূমি দেবালয়, এবং অত্যুদাত্ত প্রাসাদাবলী—আজও তোমার নয়ন ও মনোহরণ করিবে; এবং ভক্তি ও বিস্ময়ে তোমার চিত্তকে অভিভূত করিবে। এই সকল প্রদেশের অধিবাসিগণ অতি পুরাকাল হইতেই দেবাদিদেব মহাদেবের উপাসক।

ফণিফণাভূষিতকণ্ঠ ধবলবৃষভসমাসীন হরমূর্ত্তি এই গৈরিক-প্রদেশের প্রায় সর্ব্বত্র অদ্যাপি দৃষ্টি-গোচর হয়। গেহ্লোট-বংশীয় রাজগণ অদ্যাপি এই একলিঙ্গের উপাসক। বাপ্পারাও হইতে মিবারের বর্ত্তমান রাণা পর্য্যন্ত সকলেই শৈব। অদ্যাপি মিবারের রাজধানী উদয়পুরে বৎসরে নয় দিন করিয়া একলিঙ্গের পূজা ও তদুপলক্ষে মহোৎসব হইয়া থাকে। এই উৎসবে জৈন ও বৈষ্ণবেরাও শৈবগণের সহিত মহানন্দে যোগ দিয়া থাকেন। রাণাগণ এক-লিঙ্গকে তাঁহাদিগের অধিষ্ঠাতা দেব ও আপনাদিগকে তাঁহার দাওয়ান বা প্রতিনিধি বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। যে সকল গিরিপথ বহিয়া উদয়পুরে প্রবেশ করিতে হয়, তাহার একটিতে এক-লিঙ্গের মন্দির প্রতিষ্ঠাপিত। এরূপ প্রকাণ্ড মন্দির প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। ইহার সমস্তই শ্বেতপ্রস্তরে নির্ম্মিত। সেই সকল শ্বেত প্রস্তরের গাত্রে বিবিধ চিত্র ও অলঙ্কার খোদিত রহিয়াছে। এই গিরিপথ দিয়া ধর্ম্মদ্বেষী যবনেরা অনেকবার আক্রমণ করায়, সেই প্রকাণ্ড মন্দিরের অনেক শোভা বিনষ্ট হইয়াছে। শিববাহক বৃষভের জন্য একটি স্বতন্ত্র মন্দির নির্দ্দিষ্ট আছে। ঐ মন্দিরে পিত্তলময় বৃষভ অদ্যাপি দর্শকগণের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। ইহা অতি সুন্দর, সুগঠিত ও অতি-মার্জ্জিত। যে যে স্থানে যবনেরা কুঠারাঘাত করিয়াছিল, সেই সেই স্থান ব্যতীত ইহার গাত্রে একটি দাগও পরিদৃষ্ট হয় না। ইহার উদরাভ্যন্তরে গুপ্ত ধন নিহিত আছে মনে করিয়া, যবনেরা বৃষভের শূন্যগর্ভ উদর ফুটাইয়া দেখিয়াছিল। মিবারের অন্যান্য স্থানেও এক-লিঙ্গের মন্দিরের পার্শ্বেই তদীয় বাহন বৃষভের মন্দির প্রতিষ্ঠাপিত আছে। যাত্রিগণ এক-লিঙ্গের ন্যায় সেই বৃষভ-গণেরও পূজা করিয়া থাকে।

যাহারা কোন বংশের প্রতিষ্ঠাতা, তাঁহাদিগের বাল্য-জীবনের অলৌকিক কার্য্যকলাপের কাহিনী অতি যত্নে পরিরক্ষিত হইয়া থাকে। বাপ্পারাও শিশোদীয়বংশের প্রতিষ্ঠাতা; সুতরাং মিবারের রাজগণ অতি যত্নে তাঁহার বাল্যজীবনের ক্রিয়া-কলাপের কাহিনী পরিরক্ষিত করিয়াছেন। বাপ্পা-রাও শৈশবে ও বাল্যে গোচারণ করিতেন। এক দিন তিনি মাঠে গরু ছাড়িয়া দিয়া এক নিকুঞ্জমধ্যে বসিয়া আছেন, এমন সময় সোলাঙ্কি-বংশীয় নাগদা-রাজ্যের অধীশ্বরের দুহিতা গ্রামবাসিনী সঙ্গিনীগণ সমভিব্যাহারে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আজ ঝুল্-ঝুলনী উৎসবের দিন। প্রচলিত পদ্ধতিমতে এই দিনে স্ত্রীপুরুষ একত্র ঝুলনে ঝুলিতে হয়। তাঁহারা ঝুলনোপযোগী রশ্মি লইয়া যাইতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহারা বাপ্পারাওকে তাঁহাদিগের জন্য রশ্মি আনিতে অনুরোধ করি-লেন। তিনি তাঁহাদিগের অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু অগ্রে তাঁহার একটি অনুরোধ রক্ষা করিতে বলিলেন। তিনি প্রথমে একটি বিবাহ-ক্রীড়া করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। রাজ-নন্দিনী ও তাঁহার সঙ্গিনীগণ ইহাতে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সম্মত হইলেন। এই বৈবাহিক অভিনয়ে বাপ্পারাও নায়ক ও সোলাঙ্কি-রাজনন্দিনী নায়িকা এবং তাঁহার সঙ্গিনীগণ সখী সাজিলেন। সখীগণ নায়িকার অঞ্চলের সহিত নায়কের উত্তরীয়াগ্রে গ্রন্থি বদ্ধ করিয়া দিলেন এবং উভয়কে করে করে মিলিত করিয়া এক প্রবীণ বৃক্ষমূলে দাঁড় করা-ইলেন। তৎপরে সকলে মিলিয়া সপ্তবার সেই তরু-বরকে প্রদক্ষিণ করিলেন। এইরূপে এক প্রকার শাস্ত্রমতেই ইহাঁদিগের পরিণয়-কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। সখীগণ সপ্তপদীগমন পূর্ব্বক নায়ককে বরণ করায় তাঁহারাও বাপ্পারাওর এক প্রকার ভার্য্যা হইলেন।

এই ক্রীড়া-পরিণয়ের জন্য তাঁহাকে নাগদা পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে হইল। এই পলায়নই তাঁহার কীর্ত্তিমান্ হইবার পক্ষে প্রধান কারণ হইল। তিনি পলায়ন করিলেন

বটে, কিন্তু হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে রাজনন্দিনীর সহিত সেই অসংখ্য গ্রাম্যবালিকাগণের পতিত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিলেন না। এ পরিণয়ের সংবাদ অপ্রচারিত রহিল না, ইহার অনতি-কাল পরেই কোন যোগ্য স্থান হইতে রাজনন্দিনীর সহিত বিবাহের প্রস্তাব আসিল। এই উপলক্ষে কুল-পুরোহিত সোলাঙ্কিনীর করতল পরীক্ষা করিতে বসিলেন। রেখাপর্য্যবেক্ষণ দ্বারা পুরোহিত বলিলেন যে, রাজনন্দিনী পূর্ব্বেই বিবাহিতা হইয়াছেন। পুরোহিতের এই বাক্যে সকলে প্রথমে স্তব্ধ ও বিস্মিত হইলেন। সমস্ত রাজ-পরিবারের ভিতর ইহা লইয়া ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইল। বাপ্পা যদিও গুপ্ত বিষয় অপ্রকাশ রাখিবার জন্য সবিশেষ দক্ষ ছিলেন, তথাপি যে ব্যাপারে ছয় শত গ্রাম্য বালিকা ও রাজকুমারী সংশ্লিষ্ট ছিলেন, সে ব্যাপার অধিক দিন গোপন থাকা অসম্ভব।

বাপ্পা তাঁহার সম্মুখে একটি গর্ত্ত খনন করিয়া একখানি উপলখণ্ড হস্তে করিয়া সহচরবৃন্দকে বলিতেন—"শপথ গ্রহণ কর যে, কি ভাল, কি মন্দ—সকল অবস্থাতেই তোমরা আমার বশীভূত থাকিবে ও আমার গুপ্তকথা অপ্রকাশ রাখিবে। যদি তদন্যথা হয়, তোমাদের পিতৃপুরুষগণের পুণ্যপুঞ্জ এই উপলখণ্ডের ন্যায় এই ধোপার গর্ত্তে পতিত হইল।" এই বলিয়া তিনি সেই উপলখণ্ড সেই গর্ত্তে প্রক্ষিপ্ত করিতেন। তাঁহার সহচরবৃন্দ তাঁহার নিকট এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইত বলিয়া তাহারা কখন তাঁহার অবাধ্যতা করিত না, বা কখন তাঁহার গুপ্তকথা ব্যক্ত করিত না। এতদূর সতর্কতা সত্ত্বেও এ গুপ্ত বিষয় অপ্রকাশিত রহিল না। সোলাঙ্কিরাজ তাঁহাকে অপরাধী জানিয়া তাঁহার অপরাধের সমুচিত শাস্তি-বিধানে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। বাপ্পার গুপ্তচরগণ তাঁহাকে এই সংবাদ দেওয়ায় তিনি তথা হইতে পলায়ন করিলেন। তিনি দুই জন বিশ্বস্ত ভীল সহচর সমভিব্যাহারে সেই পার্ব্বত্য প্রদেশের এক অতি নিভৃত স্থানে গিয়া অতি কষ্টে আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। যে দুইজন সহচর তাঁহাকে এই আসন্নবিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের এক জনের নাম বালেয়ো। ইনি ঔন্দ্রী গিরিগুহাবাসী। অন্যের নাম দেবা। ইনি সোলাঙ্কিবংশীয় এবং ওগুণাপানোরা রাজ্যের অধিবাসী। মোরিবংশীয় রাজার নিকট হইতে রাজত্ব কাড়িয়া লইয়া তৎসিংহাসনাধিরোহণকালে এই বালেয়োই নিজের অঙ্গুলি চিরিয়া তাহার রক্ত দিয়া বাপ্পার ললাটের রাজ-টীকা পরাইয়া দিয়াছিলেন। এই জন্য তদীয় বংশধরগণ আজও অভিষেককালে রাজ-ললাটে রাজটীকা পরাইবার অধিকার ভোগ করিতেছেন। আজও বাপ্পার নামের সহিত তদীয় প্রাণরক্ষক সহচরদ্বয়ের নাম পুরুষপরম্পরাক্রমে একত্র গীত হইয়া আসিতেছে।

ওগুণাপানোরা ভারতবর্ষের সুইজর্লণ্ড। এই ক্ষুদ্র রাজ্য চিরদিন প্রাকৃতিক স্বাধীনতা ভোগ করিয়া আসিতেছে। বহিশ্চর রাজ্যসমূহের সহিত সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকায় ইহা কখন কোন রাজ্যের অধীন হয় নাই। এই আরণ্য রাজ্য সহস্রসংখ্যক গ্রাম ও নগরে গঠিত। এই সহস্র গ্রাম ও নগর হইতে প্রয়োজন হইলে পঞ্চ সহস্র ধনুর্দ্ধর যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারে। ওগুণাপানোরার অধিপতিগণ সোলাঙ্কিরাজপুতবংশ হইতে সমুদ্ভূত। দেবার সময় হইতে ইঁহারা সকলেই মিবারের রাণাগণের সামন্তত্ব স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা সকল বিষয়েই স্বাধীন! কেবল অভিষেকসময়ে তাঁহাদিগকে আসিয়া উক্ত সামন্তকে অঙ্গুলি চিরিয়া রক্ত বাহির করিয়া সেই রক্তে রাণার ললাটে রাজটীকা পরাইয়া দিতে হয় এবং রাণার ললাটে রাজটীকা দিয়া তাঁহাকে হাত ধরিয়া লইয়া গিয়া রাজসিংহাসনে বসাইতে হয়। অপর দিকে ঔন্দ্রী ভীল সামন্তকে অভিষেকপাত্র ধরিয়া থাকিতে হয়। এই প্রথা বাপ্পারাওর সময় হইতে অদ্যাপি অক্ষুণ্ণভাবে চলিয়া আসিতেছে।

মিবারের অভিষেককার্য্য ক্রমে এত ব্যয়সাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল যে, পরবর্ত্তী রাণাগণ অসাধ্য মনে করিয়া এই অভিষেকের অনেকগুলি অঙ্গ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। জগৎসিংহই শেষ রাণা—যাঁহার অভিষেককার্য্য প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। প্রথিত আছে যে, এই অভিষেককার্য্যে কোটি বা তদধিকসংখ্যক রজত-মুদ্রা ব্যয়িত হয়। ইহা মিবারের এক বৎসরের রাজস্ব।

আমরা এক্ষণে প্রকৃতের অনুসরণ করিব। বাপ্পার সেই পার্ব্বত্যপ্রদেশের অতি নিভৃত স্থানে

গোপনে অবস্থিতিকালীন একটি অলৌকিক ঘটনায় তাঁহার ভবিষ্যসম্পদ্ সূচিত হয়। বাপ্পা গোচারণ করিয়া প্রতিদিন প্রভুগৃহে প্রত্যাগত হইতেন। গৃহ-স্বামীর একটি সুন্দরী দুগ্ধবতী গাভী প্রতি সায়ং-কালে শূন্যগর্ভ আপীন লইয়া গুহাপ্রদেশ হইতে গৃহে প্রত্যাগত হইত। গৃহস্বামী মনে করিলেন যে, বাপ্পাই প্রতিদিন উহার দুগ্ধ দোহন করিয়া পান করিয়া থাকেন।

এই সন্দেহ তিনি বাপ্পাকে জানাইলেন। বাপ্পা প্রথমে অকারণ দোষারোপে ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া তিনি জানিতে পারিলেন যে, এ সন্দেহ অমূলক নহে। কারণ, তিনি দেখিলেন, সত্য সত্যই ঐ দুগ্ধবতী গাভী প্রতিদিন শূন্য-পালানে গৃহে প্রত্যাগত হয়। সকলের চক্ষু অতঃপর সেই গাভীর উপর রহিল। তিনি প্রতি-দিন অনন্যমনে তাহার গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। এক দিন দেখিলেন, ঐ অলৌকিক ধেনু গুহামধ্যে প্রবেশ করিয়া বেত্রকুঞ্জোপরি স্বতঃ আপীন নিঝারণ করিতেছে। বাপ্পা দেখিলেন, সেই বেত্রকুঞ্জভিতরে এক জন মহাপুরুষ ধ্যানস্থ রহিয়াছেন। দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। বাপ্পা চীৎকার করিয়া সেই মহাপুরুষের ধ্যানভঙ্গ করিলেন এবং স্তুতি-মিনতি করিয়া জানিতে পারিলেন যে, তিনি প্রজাপতি হারীত। এত দিন তিনি তথায় ধ্যানমগ্ন ছিলেন অথচ কেহ তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই।

বাপ্পা তাঁহার নিকট যতদূর জানিতেন, আত্ম-পরিচয় দিলেন। তিনি প্রজাপতির চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন এবং তাঁহার আশীর্ব্বচন শিরো-ধার্য্য করিয়া প্রস্থান করিলেন। এইরূপে তিনি প্রতিদিন সেই প্রজাপতির নিকট গমন করিতেন। গিরি-নির্ঝরিণীর পবিত্র উদকে তাঁহার চরণ ধৌত করিয়া তাহাতে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেন, এবং তাঁহার সেবার জন্য পর্য্যাপ্ত দুগ্ধ দোহন করিয়া দিতেন। প্রজাপতিও তাঁহার পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ধর্ম্মতত্ত্ব ও নীতিতত্ত্বের উপদেশ দিতেন এবং অবশেষে স্বয়ং তাঁহার ললাটে ত্রিপুণ্ডকটীকা প্রদান করিয়া তাঁহাকে শৈব-ধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্বে দীক্ষিত করিলেন। অধিক কি, তিনি তাঁহাকে ভগবান্ এক-লিঙ্গের প্রতিনিধি বা দাওয়ানপদে অভিষিক্ত করি-লেন। ইঁহার বংশধর বলিয়া মিবারের রাণাগণ একে একে সকলেই এই উপাধি ধারণ করিয়া আসিতে-ছেন। একলিঙ্গের পূজায় ও প্রজাপতির সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া সিংহবাহিনী ভবানী স্বয়ং তাঁহাকে দর্শন দেন। দেবী স্বহস্তে তাঁহাকে বিশ্বকর্ম্মার হস্তবিনির্ম্মিত এক অপূর্ব্ব কঞ্চুক উপহার প্রদান করেন। এই কঞ্চুক অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। ইঁহার অনুরূপ কঞ্চুক আজিও পৃথিবীর আর কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় নাই। ভবানী স্বহস্তে তদীয় দেহ এই স্বর্গীয় বর্ম্মে আবৃত করিয়া তাঁহাকে অস্ত্রশস্ত্রে বিভূষিত করিয়া দিলেন। দেবীদত্ত বর্শা, ধনু, তূণাধার ও তূণাবলীতে এবং ঢাল ও তরবারিতে তাঁহার বীরদেহ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। ভবানী এই স্বর্গীয় অভিষেকের বিনিময়ে ভক্তের নিকট হইতে বিশ্বাস ও ভক্তির প্রতিশ্রুতিরূপ উপঢৌকন লইয়া কৈলাসাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এ দিকে প্রজাপতি হারীতও শিষ্যকে নিজ অদৃষ্টের অনুসরণ করিতে উপদেশ দিয়া স্বয়ংও হরগৌরী-শিখরে গমনে কৃতসংকল্প হইলেন। যাইবার সময় নির্দ্দেশ করিয়া তিনি বাপ্পাকে পরদিন প্রত্যূষে তদীয় বেতসকুঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হইতে বলিলেন। কিন্তু বাপ্পা নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়া যথাসময়ে তথায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। কিঞ্চিৎ বিলম্বে আসিয়া দেখেন যে, অপ্সরো-বাহিত স্বর্গীয় রথে চড়িয়া হারীত শূন্যমার্গে উঠিয়া-ছেন। তিনি গুরুদেবের সহিত সাক্ষাৎ হইল না ভাবিয়া দুঃখভরে প্রপীড়িত হইয়া ঊর্দ্ধমুখে চীৎকার করিতে লাগিলেন। বাপ্পার কণ্ঠরব শুনিতে পাইয়া হারীত রথের গতি মন্দা করিতে আদেশ দিলেন এবং স্বয়ং অবতরণ না করিয়া শিষ্যের দেহ বিশ হাত দীর্ঘ করিয়া দিলেন। তথাপিও বাপ্পা গুরু-দেবের সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারিলেন না। তখন তিনি শিষ্যকে মুখব্যাদান করিতে বলিলেন। শিষ্য মুখব্যাদান করিলে তিনি তাহাতে থুৎকার প্রক্ষেপ করিলেন। বাপ্পা ঘৃণায় মুখ পশ্চাদ্দিকে অবহেলিত করায়, ঐ থুৎকারবিন্দু তাঁহার মুখের ভিতর না পড়িয়া পদের উপর পড়িল। প্রজাপতি বলিলেন, শিষ্যবর! থুৎকার তোমার উদরস্থ হইলে তুমি অমরত্ব লাভ করিতে পারিতে। কিন্তু যখন তোমার চরণের উপর পড়িয়াছে, তখন তুমি অস্ত্র দ্বারা অবধ্য হইলে।' এই বলিয়াই তিনি রথের গতি ঊর্দ্ধ-মুখিনী করিতে আদেশ দিলেন। দেখিতে দেখিতে

সেই স্বর্গীয় রথ প্রজাপতিকে লইয়া লোকলোচনের বহির্ভূত হইয়া পড়িল।

এইরূপে দৈববলে বলীয়ান্ হইয়া এবং তিনি যে চিতোরের মোরিবংশীয় রাজার ভাগিনেয়, জননীর মুখে এই সংবাদ শুনিয়া বাপ্পা গোচারকের আলস্যময় জীবন পরিহার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি কতিপয় বিশ্বস্ত সহচর সমভিব্যাহারে সেই আরণ্য প্রদেশের গুপ্ত স্থান হইতে বিনির্গত হইয়া জীবনের সর্ব্বপ্রথমে সমতলক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। আরণ্য প্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া যাইবার অনতিপূর্ব্বে ত্রিগড়পাহাড়ে মহর্ষি * গোরক্ষনাথের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার ভক্তিতে প্রীত হইয়া মহর্ষি গোরক্ষনাথ তাঁহাকে একখানি দ্বি-ফলক খড়্গ উপহার প্রদান করেন। যে মন্ত্রে এই খড়্গ মন্ত্রপূত করিয়া প্রহার করিলে গিরি বিদারণ করা যায়, গোরক্ষনাথ তাঁহাকে সেই মন্ত্রে দীক্ষা প্রদান করিলেন। ভবানী ও গোরক্ষনাথের অস্ত্রে ও প্রজাপতি হারীতের বরে বলীয়ান্ হইয়া বাপ্পা সহচরবৃন্দ সমভিব্যাহারে চিতোরে নিজ কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রোথিত করিবার জন্য সেই নগরাভিমুখে ধাবিত হইলেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই চিতোর নগরীতে তৎকালে প্রমর-বংশীয় মালওয়াধিপতির সগোত্রীয় মোরি-রাজ রাজত্ব করিতেছিলেন। চিতোর তৎকালে সমস্ত ভারতের রাজধানী ছিল কি না, তাহার স্থিরতা নাই। তবে ইহার তৎকালীন সুন্দর প্রাসাদাবলী, রমণীয় জলাধার-সকল এবং সুদৃঢ় ও সুগঠিত দুর্গসকল সাক্ষ্য দিতেছে যে, ইহা সেই পুরাকালেও অতি সমৃদ্ধিশালিনী নগরী ছিল।

মোরিরাজের ভাগিনেয় বলিয়া বাপ্পা চিতোর নগরীতে সাদরে গৃহীত হইলেন। তাঁহাকে রাজ্যের সামন্তশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেওয়া হইল এবং তাঁহার ব্যয়নির্ব্বাহার্থ তদুপযুক্ত একটি জমীদারী তাঁহাকে প্রদান করা হইল। মিবারে তৎকালে সামন্ত-তন্ত্র রাজ্য-প্রণালী প্রচলিত ছিল। মোরিরাজ অসংখ্য সামন্তবর্গে পরিবেষ্টিত ছিলেন। তাঁহাদিগের প্রত্যেকেই যুদ্ধের সময় রাজাকে সৈন্য-সাহায্য প্রদান করার নিয়মে এক একটি জমীদারী বা জায়গীর ভোগ করিতেন। বাপ্পারাউলের প্রতি মোরিরাজের সবিশেষ অনুগ্রহ দেখিয়া ইহাঁরা সকলেই তাঁহার উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িলেন। এমন সময় এক বৈদেশিক শত্রু আসিয়া রাজ্য আক্রমণ করিল। মোরিরাজ তদীয় সামন্তবর্গকে যুদ্ধার্থ সৈন্য প্রদান করিতে আদেশ করিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার সে আদেশ পালন করিলেন না, বরং তৎপ্রদত্ত জায়গীর সকলেই তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিলেন। সকলেই একবাক্যে তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, নবাগত সামন্ত-যুবকের উপর তাঁহার যখন এতাদৃশ অনুগ্রহ, তখন তাঁহাকেই যুদ্ধে প্রেরণ করুন।

সামন্তবর্গের এই বিদ্রূপোক্তিতে বিরক্ত হইয়া মোরিরাজ তাঁহাদিগকে স্ব স্ব জায়গীর হইতে বঞ্চিত করিলেন এবং বাপ্পাকে সেনাপতিপদে বরণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করিলেন। তখন সামন্তবর্গ লজ্জায় অধোবদন হইয়া বাপ্পার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিলেন। বাপ্পা শত্রুগণকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া মিবার রাজ্য হইতে দূরীকৃত করিয়া দিলেন।

কিন্তু বাপ্পা শত্রুদমন করিয়াও চিতোরে প্রত্যাগমন করিলেন না। তিনি সেই বিজয়োৎসাহিত সৈন্য লইয়া নিজ পিতৃপুরুষগণের রাজধানী গজনী নগরে গমন করিলেন। তথায় তৎকালে সেলিম নামে একজন যবন বাস করিতেছিলেন। তিনি তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া সেই শূন্য সিংহাসনে চাবুরা-জতীয় এক ক্ষত্রিয়কে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন। কিংবদন্তী আছে যে, বাপ্পা এই সময়ে উক্ত সিংহাসনচ্যুত যবনরাজের দুহিতার পাণিগ্রহণ করেন। যাহা হউক, বাপ্পা পিতৃরাজ্যে একজন ক্ষত্রিয়কে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া সেই অসন্তুষ্ট সামন্তবর্গ-সমভিব্যাহারে চিতোরে প্রত্যাগত হইলেন। সামন্তবর্গ রাজার নিকট সম্মান না পাইয়া ক্রোধে চিতোর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। রাজগুরু

* গুরু গোরক্ষনাথের নামে এবং সেই মহাদেব একলিঙ্গের নামে এবং সর্পরাজ তক্ষকের নামে, এবং মহাদেবী ভবানীর "নামে কাট" আজও মিবারের লোকে ভক্তিভাবে বৎসরে একদিন ঐ খড়্গ পূজা করিয়া থাকে, এবং প্রতিদিন উক্ত মন্ত্র জপ করিয়া থাকে।

ও রাজার ধাত্রীপুত্র তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য দূতস্বরূপ প্রেরিত হইলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহারা ফিরিলেন না। বরং তাঁহাদিগের দ্বারা সামন্তবর্গ রাজাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহারা রাজার লবণ খাইয়াছিলেন বলিয়া প্রতিশোধ লইবার জন্য এক বৎসরকাল প্রতীক্ষা করিবেন। সামন্তবর্গ বাপ্পার উদারচরিত্রে ও সদ্ব্যবহারে তাঁহার প্রতি নিতান্ত শ্রদ্ধাবান্ হইয়া উঠিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহারা বাপ্পাকে চিতোরের সিংহাসনে বসাইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া তাঁহার নিকট গুপ্তচর পাঠাইলেন। রাজ্যলাভে বাপ্পা গেহ্লোট-বংশসুলভ কৃতজ্ঞতাধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিলেন। বাপ্পা সামন্তবর্গের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তখন সামন্তবর্গ সসৈন্য আনিয়া চিতোর আক্রমণ করিলেন। এ দিকে বাপ্পারাউল্ সেনাপতি ছিলেন বলিয়া, চিতোরের সৈন্যগণও সামন্তবর্গের সহিত যোগ দিল। সুতরাং সহজেই চিতোরের সিংহাসন বাপ্পারাউলের হস্তগত হইল। চিতোরের প্রজাবর্গ একবাক্যে বাপ্পার সিংহাসনাধিরোহণে অনুমোদন করিল। বাপ্পার হৃদয়মাহাত্ম্যে ও রাজোচিত গুণে সকলেই এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিল যে, কেহই মোরিরাজের সিংহাসনচ্যুতিতে দুঃখ প্রকাশ করিল না। রাজ্যের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই একবাক্যে তাঁহাকে হিন্দুসূর্য্য (হিন্দুকা সুরজ), রাজ-গুরু এবং রাজ-চক্রবর্ত্তী—এই উপাধিত্রিতয়ে বিভূষিত করিল। বাপ্পারাউলকে প্রজারা সাক্ষাৎ যমের ন্যায় ভয় করিত, পিতার ন্যায় ভক্তি করিত এবং দেবতার ন্যায় পূজা করিত। তাঁহাকে প্রজাবর্গ আজও দেবতা-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। মিবারের "চিরঞ্জীব" বলিলে বাপ্পা ভিন্ন আর কাহাকেও বুঝায় না।

বাপ্পা শিশোদীয়া-বংশের প্রতিষ্ঠাতা এবং শত রাজার আদিপুরুষ। এরূপ সৌভাগ্য পৃথিবীর আর কোন রাজার ভাগ্যে আর কখনও ঘটে নাই।

বাপ্পার অসংখ্য পুত্র-সন্তান জন্মিয়াছিলেন এবং তাঁহারা নানাস্থানে পরিক্ষিপ্ত হইয়া পড়েন।

তাঁহাদিগের অধিকাংশই সৌরাষ্ট্র-প্রদেশের প্রথম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। আইন-আক্‌বরীতে লিখিত আছে যে, আক্‌বরের সময় সৌরাষ্ট্রপ্রদেশে পঞ্চাশৎ সহস্র গেহ্লোটবংশীয় ক্ষত্রিয় বাস করিতেছিলেন। ইহাঁরা সকলেই বাপ্পার পুত্র-পৌত্রাদি হইতে সমুৎপন্ন।

"শতং বৈ জীবেৎ" শাস্ত্রে লিখিত আছে, মনুষ্য শত বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিবে। বাপ্পা এই শাস্ত্রবাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিলেন। জীবনের শেষকালে তিনি বিজয়িনী সেনা লইয়া প্রতীচ্যদেশ অধিকার করিতে গিয়াছিলেন। সেকন্দর সাহা যেরূপ স্বরাজ্যে প্রতিনিধি রাখিয়া প্রাচ্য-রাজা সকলের জয়োদ্দেশে বিনির্গত হইয়া পারস্যে আসিয়া পারস্যরাজ দারাউসকে পরাজিত করিয়া তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, এইরূপ প্রবাদ আছে যে, বাপ্পারাউল সেই প্রাচীন বয়সে প্রতীচ্য-দেশ সকল জয় করিতে করিতে খোরাসানেরও পশ্চিমে গিয়া পড়িয়াছিলেন, এবং রাজ্যচ্যুত যবন-রাজগণের কন্যাগণকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই সকল যবন-কন্যাগণের গর্ভে ও বাপ্পার ঔরসে অসংখ্য সন্ততি জন্মিয়াছিল। বাপ্পা এই দিগ্বিজয় হইতে আর চিতোরে প্রত্যাগত হন নাই। এরূপ জনশ্রুতি আছে যে, তিনি তুরক্ষ (তুরস্ক) প্রদেশ জয় করিয়া তথায় মানবলীলা সংবরণ করেন।

মিবারে একখানি প্রাচীন ইতিহাসে লিখিত আছে যে, বাপ্পা ইস্পাহান, গান্ধার, কাশ্মীর, ইরাক্, ইরাণ, তুরাণ এবং কাফেরিস্থান প্রভৃতি প্রতীচ্য রাজ্য সকল অধিকৃত করিয়া সেই সেই রাজ্যের যবন-রাজগণের কন্যাগণকে বিবাহ করেন। সেই সকল স্ত্রীর গর্ভে তাঁহার সর্ব্বশুদ্ধ এক শত ত্রিশটি পুত্র-সন্তান জন্মে। ইহাঁরা "নশেরা পাঠান" নামে প্রথিত হন। তাঁহাদিগের প্রত্যেকেই নিজ নিজ জননীর নামে এক এক জাতি প্রতিষ্ঠাপিত করেন। অন্যদিকে বাপ্পার হিন্দু-স্ত্রীগণের গর্ভে সর্ব্বশুদ্ধ দ্বূন-শত সন্তান জন্মে। তাঁহারা অগ্নি-উপাসক সূর্য্যবংশ বলিয়া আখ্যাত হন। বাপ্পা ক্ষত্রিয়ের ন্যায় যতিধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া মেরু পর্ব্বতের পাদ-মূলে সমাধিমগ্ন হন। সেই অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার মৃতদেহ লইয়া প্রজাবর্গের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হয়। হিন্দু প্রজাগণ তদীয় দেহকে চিতানলে ভস্মীভূত করিতে অভিলাষী হন। এ দিকে যবনপ্রজাবৃন্দ ইহাকে

সমাধি-নিহিত করিতে ইচ্ছা করে। যখন এই বিষয় লইয়া বাপ্পার প্রজাবৃন্দমধ্যে ঘোরতর আন্দোলন চলিতেছিল, সেই সময় একজন সহসা সেই দেহের বস্ত্র উদ্‌ঘাটন করিল। সকলে দেখিয়া বিস্মিত হইল যে, সে মৃত-দেহ আর তথায় নাই, কেবল পদ্মফুল তথায় পড়িয়া রহিয়াছে। তখন সকলের বিবাদ মিটিয়া গেল। সেই সকল পদ্মের বীজ লইয়া তখন সকলে অদূরবর্ত্তী হ্রদে গিয়া নিক্ষিপ্ত করিল, এবং সেই সকল বীজ হইতে অসংখ্য পদ্মফুলের গাছ উৎপন্ন হইল। পারস্যরাজ নসীর্ব্বান সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ উপাখ্যান বর্ণিত আছে। বাপ্পারাউল ৭৬৯ সংবতে বা ৭১৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, এবং ৭৮৪ সংবতে বা ৭২৮ খৃষ্টাব্দে পঞ্চবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে চিতোরের সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। তিনি ৮২০ সংবতে বা ৭৬৪ খৃষ্টাব্দে দিগ্বিজয় উপলক্ষে চিতোর হইতে বিনির্গত হন। তাঁহার রাজত্বকালের মধ্যে বোগদাদে ওয়ালিদ, দ্বিতীয় ওমার, হুসাম, এবং আলমানসুর এই চারিজন কালিফ রাজত্ব করেন।

৭৮৪ সংবতে বা ৭২৮ খৃষ্টাব্দে বাপ্পার চিতোরাধিকারের পঞ্চদশবর্ষ পূর্ব্বে কালিফ ওয়ালিদের সেনাপতি কাসিম ভারত আক্রমণ করেন। তাঁহার বিজয়িনী সেনা অনুগাঙ্গ প্রদেশ হইতে সিন্ধু পর্য্যন্ত বিজিত করেন। এ বিজয়ের ফল চিরস্থায়ী হয় নাই। কালিফ দ্বিতীয় ওমারের সেনাপতি কাসিমপুত্র মহম্মদ ৭১৮ হইতে ৭২১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে চিতোরাধিপতি মোরিরাজকে আক্রমণ করেন। অবশেষে ৭৫৪ হইতে ৭৭৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কালিফ আলমানসুরের রাজত্বকালে সিন্ধুদেশ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়। ৭৬৪ খৃষ্টাব্দে বাপ্পারাও চিতোর পরিত্যাগ করিয়া ইরাণাভিমুখে বিজয়োদ্দেশে বিনির্গত হন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যখন যবন-সেনাপতিগণ ভারত-বিজয়ের জন্য উন্মত্ত হন, সেই সময়েই বাপ্পার অন্তরে প্রতীচ্যদেশ সকল জয় করিবার ইচ্ছা বলবতী হয় এবং সেই বলবতী ইচ্ছার বশীভূত হইয়া তিনি দিগ্বিজয়ে বিনির্গত হন। তখন কালিফের সেনাপতি সিন্ধুদেশের চরম পরাজয়ে লিপ্ত থাকেন, সেই সময়েই সমস্ত পাশ্চাত্য যবনরাজ্য সকল বাপ্পার নিকট অধীনতা স্বীকার করে।

যেমন সেকেন্দার সাহ প্রাচ্য যবন-রাজ্য সকল জয় করিয়া যবন-রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, বাপ্পাও সেইরূপ প্রতীচ্য রাজ্য সকল জয় করিয়া পরাজিত যবন-রাজগণের কন্যাগণকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সেকেন্দার সাহ যেমন প্রজাবৃন্দকে জাতিনির্ব্বিশেষে স্নেহভাবে দেখিতেন, বাপ্পাও সেইরূপ হিন্দু ও যবন প্রজাবৃন্দকে সমভাবে দেখিতেন। সেই জন্যই হিন্দু যবন উভয়বিধ প্রজা তাঁহার মৃতদেহের জাতীয় প্রথা অনুসারে সম্মাননা করিতে এত ব্যাকুল হইয়াছিলেন। সেকেন্দার সাহ যেমন দিগ্বিজয়ে বিনির্গত হইয়া আর দেশে ফিরিয়া যাইতে পারেন নাই, বাপ্পাও সেইরূপ দিগ্বিজয়ে নির্গত হইয়া আর চিতোরে ফিরিয়া আসিতে পারেন নাই।

তাঁহার মৃত্যুর পর হইতে ক্রমাগত একাদশ শতাব্দী ধরিয়া তাঁহার সিংহাসন তদীয় বংশধরগণ অবিচ্ছিন্নভাবে অলঙ্কৃত করিয়া আসিতেছিলেন। কোন রাজবংশের ভাগ্যে কোনও দেশেও কোনও কালে এত দীর্ঘকাল এত গৌরবের সহিত রাজত্ব করা ঘটিয়া উঠে নাই। ধন্য বাপ্পা! ধন্য তোমার বংশ! তোমার মত বীর, তোমার মত মহাপ্রাণ ও মহদাশয় রাজা তোমার পর আর ভারতে জন্মেন নাই। তুমিই সেই স্বাধীন হিন্দুরাজচক্রবর্ত্তী, যাঁহার বিজয়কীর্ত্তি-স্তম্ভ ককেসস্ পর্ব্বতের পাদমূলে প্রোথিত হইয়াছিল।

ধর্ম্ম বিষয়ক ঔদার্য্যে তুমি মহামতি আকবরেরও শ্রেষ্ঠ। আকবর রাজপুতকন্যা বিবাহ করিয়াও তদ্‌গর্ভজাত পুত্রকে দিল্লীর সাম্রাজ্য দিতে পারেন নাই! কিন্তু তুমি সেলিমাদি যবন-রাজগণের কন্যাগণকে বিবাহ করিয়া তাঁহাদিগের গর্ভজাত পুত্রগণকে ভারতের বহিশ্চর রাজ্য সকল প্রদান করিয়া গিয়াছিলে! ধন্য তোমার মহাপ্রাণতা! ধন্য তোমার সমদর্শন!

অপরাজিত এবং অশীল

চতুর্ব্বিংশতি গেহ্লোট-জাতির মধ্যে অনেকগুলিই বাপ্পা হইতে সমুৎপন্ন। বাপ্পা চিতোরাধিকার করিয়াই সৌরাষ্ট্র-প্রদেশের বিজয়ে বিনির্গত

হন। তথায় বন্দর দ্বীপের * অধিপতি ঈশুপগোল নামক নরপতির কন্যাকে বিবাহ করেন; এবং এই নবোঢ়া রাজনন্দিনীর সহিত সেই দ্বীপের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—ব্যান্ মাতাকেও চিতোরে লইয়া যান। সেই অবধি ব্যান্ একলিঙ্গের সহিত চিতোরে সমপুজিত হইয়া আসিতেছেন। যে প্রকাণ্ড মন্দিরে বাপ্পা তাঁহাকে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন, সেই গগন-স্পর্শী মন্দির আজও চিতোর-গিরির শিখরদেশ অলঙ্কৃত করিয়া বাপ্পা-প্রতিষ্ঠাপিত অন্যান্য মন্দিরের সহিত তদীয় দিগন্ত-ব্যাপিনী কীর্ত্তির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই নন্দিনীর গর্ভে অপরাজিত নামে বাপ্পার এক পুত্র-সন্তান জন্মে। এই পুত্র চিতোরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া বাপ্পা তাঁহাকে নিজের উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া দিগ্বিজয়ে বিনির্গত হন। প্রমর-বংশীয় রাজকুমারীর গর্ভে তাঁহার অশীল নামে পুত্র পূর্ব্বেই জন্মিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠাধিকারে বঞ্চিত হওয়ায় পাছে তিনি ক্ষুণ্ণ হন বলিয়া বাপ্পা তাঁহাকে সৌরাষ্ট্র-প্রদেশের অধিপতি করিয়া যান। ইহা হইতেই অশীল গেহ্লোট-বংশ উৎপন্ন হইয়াছে। এই বংশ ক্রমে এত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল যে, আকবরের সময় এই এক বংশ হইতেই রণস্থলে পঞ্চাশৎ সহস্র সৈন্য উপস্থিত হইতে পারিত।

অপরাজিতের রাজত্বকালে বিশেষ কোন ঘটনা ঘটে নাই। তাঁহার কালভুজ বা কর্ণ এবং নন্দকুমার নামে দুইটি পুত্র জন্মে। কালভুজ তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় সিংহাসনে আরোহণ করেন। নন্দকুমার ভীমসেন দোদাকে বধ করিয়া দাক্ষিণাত্যের দেবগড় অধিকার করেন।

কালভুজ

কালভুজের সামরিক গুণাবলী নাগদা গিরিগুহার জয়স্তম্ভ সকলে সাবশেষ বর্ণিত আছে। তিনি যে শুদ্ধ বীর ছিলেন, এরূপ নহে। রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলাস্থাপনেও তাঁহার সবিশেষ দক্ষতা ছিল। বিশেষতঃ শিল্প ও স্থপতিবিদ্যা তাঁহা দ্বারা সবিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। যে স্থানে বসিয়া প্রজাপতি হারীত তপস্যা করিতেন, যেখানে বসিয়া পিতামহ বাপ্পারাউল হারীতের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতেন, সেই পবিত্র তীর্থস্থলের উপরে কালভুজ এক প্রকাণ্ড মন্দির নির্ম্মিত করিয়া তাহাতে দেবাদিদেব একলিঙ্গের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাপিত করেন। অদ্যাপি সেই মন্দির পূর্ব্ব-গরিমায় অবস্থিত থাকিয়া কালভুজের কীর্ত্তির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। যে পুরোহিত-বংশকে কালভুজ ভগবান্ একলিঙ্গের পূজায় নিয়োজিত করিয়াছিলেন, আজও সেই পুরোহিত-বংশ সেই মন্দিরের সেবায় নিযুক্ত রহিয়াছে। সেই আদি পুরোহিত হইতে প্রায় একসপ্ততিপুরুষ চলিয়া আসিয়াছে। এতদ্ভিন্ন তিনি আরও অনেক কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। সে সকলের মধ্যে বেরৈল হ্রদ সর্ব্বপ্রধান। কালভুজ হারুণ অল রসিদের সমকালীন। উক্ত কালিফ ৭৮৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ৮০৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চিতোরের সিংহাসন অলঙ্কৃত করেন। কালভুজের মৃত্যুর পর তদীয় বিখ্যাত-নামা পুত্র খোমান্ চিতোরের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

খোমান্

খোমান্ পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হন। তিনি ৮১২ খৃষ্টাব্দে রাজত্বভার গ্রহণ করেন। আল্‌মামুন্-পিতা হারুণ অল রসিদের রাজত্ব-কালেই তাঁহার নিকট হইতে জাবুলিস্থান, কাবুলিস্থান, সিন্ধুদেশ ও ভারতবর্ষের শাসনভার প্রাপ্ত হন। তিনি ৮১৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পিতার অধীনে শাসন-কর্ত্তৃরূপে উক্ত দেশগুলি শাসন করিয়া আসিতেছিলেন। অবশেষে ৮১৩ খৃষ্টাব্দে তিনি পিতার মৃত্যুর পর স্বয়ং কালিফপদে বৃত হইয়াই চিতোর আক্রমণের জন্য জাবুলিস্থান হইতে এক মহতী সেনা লইয়া তদভিমুখে ধাবিত হন। চিতোরই তৎকালে হিন্দুধর্ম্মের কেন্দ্রস্বরূপ ছিল এবং ইহার রাজগণই ভারতের রাজচক্রবর্ত্তী বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। সেই মহতী যবন-সেনার অধিনায়ক হইয়া মামুন্ স্বয়ং আগমন করেন। এই সঙ্কট-কালে খোমান্ ভারতের সমস্ত রাজবৃন্দ ও সামন্তবর্গকে তাঁহার সাহায্যার্থ আহ্বান করেন, এবং অসংখ্য আর্য্য ও অনার্য্য হিন্দুরাজা

* বর্ত্তমান দেও। আলবুকার্কের সময় হইতে ইহা পর্টুগীজদিগের অধিকারে আছে।

ও সামন্ত তদীয় আহ্বানে আহূত হইয়া চিতোরে আগমন করেন। এই সমবেত হিন্দু-সেনা লইয়া খোমান্ সেই মহতী যবন-সেনাকে চিতোরের অবরোধ হইতে বিদূরিত করেন এবং সেই পলায়মান সৈন্যের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া সেনাপতি মামুনকে ধৃত করিয়া লইয়া আসেন। মামুন কিছুদিন চিতোরের কারাগারে বন্দীভূত হইয়া থাকেন। তখন মামুন কালিফ হইয়াছিলেন কি না, জানিবার কোন উপায় নাই। তিনি চিতোরের ইতিহাসে কখন বা "খোরাসানের অধিপতি" কখন বা "খোরাসানসুত" নামে আখ্যাত হইয়াছেন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, কালিফ হারুণ অল রসিদ্ আপন পুত্রগণকে স্বরাজ্য ভাগ করিয়া দেওয়ায়, দ্বিতীয় পুত্র আলমামুনকেই জাবুলিস্থান, কাবুলিস্থান, সিন্ধুদেশ ও হিন্দুস্থান এই চারিটি রাজ্যের শাসন-কর্ত্তা নিযুক্ত করেন। আল্‌মামুন পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া হিজিরা ১৯৮ বা ৮১৩ খৃষ্টাব্দে কালিফ-পদে অভিষিক্ত হন। তিনি ৮৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। সুতরাং তাঁহার রাজত্বকাল খোমানের রাজত্বকালের অন্তর্নিবিষ্ট। এই জন্য অসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণীকৃত হইতেছে যে, উক্ত "খোরাসানসুত মামুদ" আল্‌মামুন ব্যতীত আর কেহ নাহেন। লিপিকর-প্রমাদ-বশতঃ বোধ হয় "মামুন" "মামুদে" পরিবর্ত্তিত হইয়াছেন।

এই পরাজয়ে ভীত হইয়া যবনেরা ইহার পর বিংশ বৎসর আর ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন নাই। এই সময়ে তাঁহাদিগের দৃষ্টি সিন্ধুদেশের উপরেই সবিশেষ পতিত হয়।

খোমান-রস নামে একখানি কবিতা গ্রন্থে এই চিতোর-রক্ষা অতি সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। যে সকল রাজা ও সামন্ত হিন্দু-ধর্ম্মের রক্ষার জন্য খোমানের সহিত আসিয়া মিলিত হইয়াছিলেন, এই গ্রন্থে তাঁহাদিগের তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। এই তালিকা দেখিলে স্পষ্ট প্রতীতি জন্মিবে যে, এক সময়ে হিন্দুসমাজে এক অঙ্গে আঘাত লাগিলে, অন্যান্য অঙ্গে সমবেদনা অনুভূত হইত। হায়! সে দিন কি আর আসিবে? কে বলিতে পারে, আর আসিবে না?

খোমান্ যবনগণের সহিত চতুর্ব্বিংশতি মহাসমরে জয়লাভ করেন। এই জন্য সীজারের ন্যায় খোমানের নাম একটি পারিবারিক গৌরব-সূচক উপাধিতে পরিণত হইয়াছে। সর্ব্বপ্রকার শুভ-কার্য্যে খোমানের নাম আজও উল্লিখিত হইয়া থাকে। উদয়পুরে তুমি যদি হাঁচ বা যদি তোমার পদস্খলন হয়, অমনি পার্শ্ববর্ত্তী লোক বলিয়া উঠিবে, "খোমান তোমায় রক্ষা করুন।" যেন খোমানের আত্মা আজও মিবারবাসিগণের রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। ইহা অপেক্ষা অধিকতর গৌরবের বিষয় আর কি হইতে পারে? ব্রাহ্মণগণের পরামর্শে খোমান্ রাজসিংহাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই শূন্য সিংহাসনে কনীয়ান্ পুত্র যোগরাজকে অভিষিক্ত করেন। কিন্তু অনতিপরেই নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া পুত্রের নিকট হইতে সিংহাসন পুনর্ব্বার গ্রহণ এবং যে সকল ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে সিংহাসন পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে বধ করেন। অতঃপর তিনি ব্রাহ্মণগণের এইরূপ নির্য্যাতন আরম্ভ করিলেন যে অচিরকালমধ্যেই মিবার প্রায় নির্ব্রাহ্মণ হইয়া উঠিল। কিন্তু খোমান্‌কে অনেকদিন নিজ চিত্তকে এই গর্হিত ব্রাহ্মণ-হত্যার দ্বারা কলঙ্কিত করিতে হয় নাই। তাঁহার অন্যতম পুত্র মঙ্গল পিতৃহত্যা দ্বারা তাঁহাকে এই নৃশংস পাপাচরণ হইতে মুক্তি প্রদান করেন। কিন্তু মঙ্গলও নিজ পিতৃহত্যা-পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ সামন্তগণ কর্তৃক নিজরাজ্য হইতে বহিষ্কৃত হন। তিনি মিবার হইতে বহিষ্কৃত হইয়া উদিচ্য মরুভূমিস্থিত গোদূর্ব্বানগর অধিকার করিয়া তথায় মঙ্গলিয়া গেহ্লোট্ বংশ প্রতিষ্ঠাপিত করেন।

ভর্ত্তৃভূত

খোমান্ হত ও মঙ্গল নিষ্কাশিত হইলে ভর্ত্তৃভূত বা ভট্টো তদীয় সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ইঁহার ও তদীয় উত্তরাধিকারীর রাজত্বকালে চিতোর-রাজ্য অত্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ভর্ত্তৃভূত মাহীনদীর তীর হইতে আবু-পর্ব্বতের পাদদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশ অধিকৃত ও মিবার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। এই নবাধিকৃত প্রদেশে তিনি অসংখ্য দুর্গ নির্ম্মিত করেন এবং তাহার মধ্যে ধোরনগড় ও উজরগড় অদ্যাপি অক্ষুণ্ণভাবে বিদ্যমান

থাকিয়া তাঁহার কীর্ত্তিঘোষণা করিতেছে। তিনি কুলানগর, চম্পানর, চোর্ত্তা, ভোজপুর, লুনাড়া, নিম্বখোড়, সোদারু, বোধগড়, সান্দপুর, আইৎপুর এবং গঙ্গাদেবপুর প্রভৃতি মালব ও গুর্জ্জর প্রদেশে ত্রয়োদশটি রাজ্যে তদীয় ত্রয়োদশ পুত্রকে প্রতিষ্ঠাপিত করেন। ইহাঁরা ও ইহাঁদের উত্তরাধিকারিগণ—ভাটি-ওরা-গেহ্লোট নামে ইতিহাসে বিদিত আছেন।

ভর্ত্তৃভূত বা ভট্টের রাজত্বের পর পঞ্চদশ-পুরুষ-পরম্পরা ধরিয়া মিবারের ইতিহাসে কোন বিশেষ ঘটনা উল্লিখিত নাই।

ভর্ত্তৃভূতের পরবর্ত্তী রাজগণ

অতি পুরাকাল হইতেই আজমীরের চোহান্-বংশীয় নরপতিগণের সহিত চিতোরের গেহ্লোট-বংশীয় রাজবৃন্দের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়া আসিতেছে। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্বেও মধ্যে মধ্যে তাঁহাদিগের মধ্যে মিত্রতাও সংঘটিত হইত। মিবারাধিপতি বর্ষীরাউল্ কোয়ারিওর মহাসমরে বিখ্যাতনামা আজমীরাধিপতি দুর্ল্লভ চোহান্‌কে নিহত করেন। যখন বহিঃশত্রু না থাকিত, তখন ইহাঁরা এইরূপে সমরাঙ্গনে পরস্পরের সহিত বল-পরীক্ষা করিতেন। আবার যখন বহিঃশত্রু যবনাদি আসিয়া তাঁহাদিগের রাজ্যের শান্তিভঙ্গ করিত—হিন্দুধর্ম্মের বক্ষে পদাঘাত করিত—তখন উভয় রাজ্য মিলিত হইয়া সেই সাধারণ অরির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইত। কারণ, দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইহার পর-পুরুষের দুর্ল্লভ-পুত্র প্রথিতনামা বিশুলদেব চিতোরাধিপতি রাউল্ তেজশ্রীর সহিত মিলিত হইয়া মহতী সেনা লইয়া আক্রমণকারিণী যবন-সেনার গতিরোধ করিবার জন্য গতিপথে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। এই সকল বৃত্তান্ত ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে এবং কীর্ত্তিস্তম্ভ সকলও খোদিত রহিয়াছে।

খোমান্ হইতে সমরসিংহের কাল পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে পঞ্চদশ নরপতি চিতোরের সিংহাসন অলঙ্কৃত করেন। ইহাঁদিগের মধ্যে শক্তিকুমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ভর্ত্তৃভূত বা ভর্ত্তৃভাটের পর সিংহজী, সিংহজীর পর উল্লুত, উল্লুতের পর নরবাহন, নরবাহনের পর শালবাহন, শালবাহনের পর শক্তিকুমার—মিবারের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ইনি ১০২৪ সংবৎ বা ৯৬৮ খৃষ্টাব্দে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। গজনীপতি আলেপতেগিন্ ৯৫৭ খৃষ্টাব্দে গজনীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। সুতরাং শক্তিকুমার ও আলেপতেগিন্ উভয়ে সমকালীন; আলেপ্‌-তেগিনের সেনাপতি সুবেক্তগিন শক্তিকুমারের রাজত্বকালে ভারত আক্রমণ করেন। তদীয় রাজধানী আইৎপুর বা আদিত্যপুরের একখানি প্রস্তর-ফলকে এইরূপ লিখিত দৃষ্ট হয়। শক্তিকুমারের পর অম্বপোষ্য চিতোরের সিংহাসন অলঙ্কৃত করেন, এবং তাঁহার পর নবধর্ম্ম ও তাঁহার পর যশোধর্ম্ম—সেই সিংহাসনে আরোহণ করেন।

সুবেক্তেগিন ৯৭৭ খৃষ্টাব্দে গজনীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। গজনীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তিনি আবার ভারত আক্রমণ করেন। ভারত আক্রমণ, সুতরাং নবধর্ম্মের সময় ঘটিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার পুত্র মামুদই প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতের সর্ব্বনাশ করেন। ইনি যশোধর্ম্মের সমকালীন। ইনি খৃষ্টীয় শকের ৯৯৭ হইতে ১০২৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গজনীর সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন।

হিন্দু-যবন-সংঘর্ষ

(সংবৎ ৭৮৪) ৭২৮ খৃষ্টাব্দে বাপ্পার সিংহাসনারোহণ হইতে (সংবৎ ৮২০) ১১৯৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সময় ভারত-ইতিহাসে বিশেষ স্মরণ-যোগ্য। এই সময়ের মধ্যে যবনেরা হিন্দু-রাজবৃন্দের হস্ত হইতে ভারত-সিংহাসন কাড়িয়া লইবার জন্য অবিরাম চেষ্টা করিয়াছেন। কুক্ষণে মহম্মদ বেন্‌কাশিম ৭৭৭ সংবৎ বা ৭১৮ খৃষ্টাব্দে সিন্ধুপতি ডিডাহির-দেশ-পতিকে বধ করিয়াছিলেন। সেই দিন হইতে হিন্দু-সৌভাগ্য-সূর্য্য অল্পে অল্পে যবন-রাহুগ্রস্ত হইতে আরম্ভ হয় এবং সমরসিংহের সময়ে দৃশদ্বতী নদীতীরে সেই হিন্দু-সৌভাগ্য-সূর্য্য যবন-রাহু-কবলে পূর্ণগ্রস্ত হয়। এই সময়ের মধ্যে অষ্টাদশ নরপতি চিতোরের রাজ-সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। এই চতুঃশতাব্দীকাল তাঁহারা ক্রমাগত যবনদলনে নিরত ছিলেন। কিন্তু বিধাতার নির্ব্বন্ধে তাঁহাদের সমস্ত চেষ্টা বিফল হইল। ভারতের রাজমুকুট হিন্দুর মস্তক হইতে

স্খলিত হইয়া যবনের মস্তক সুশোভিত করিল। হায় রে! সে দিনের স্মৃতি হিন্দুর বক্ষে আজও শেলাঘাত করিতেছে।

৭৬৪ খৃষ্টাব্দে বাপ্পারাউল ইরাণ-বিজয়ে বিনির্গত হন। এই সময়ে ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে সমরশ্রীর রাজ্যারোহণকাল পর্য্যন্ত সময়ের ন্যায় ঘটনা-পূর্ণ সময় হিন্দু-ইতিহাসে আর নাই। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, এই মহাযুগের সবিস্তার ইতিহাস পাওয়া দুর্ঘট। একখানি জৈন-হস্ত-লিখিত পুস্তকে পাওয়া গিয়াছে যে, উল্লত ৯২২ সংবৎ বা ৮৬৫ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। আইৎপুর বা আদিত্যপুরের প্রস্তরফলকে শক্তিকুমারের কাল নির্ণীত আছে। সুবেক্তেগিন ও মামুদের আক্রমণকাল দ্বারা নব-বর্ম্মের ও যশোবর্ম্মের কাল নির্ণীত হইয়াছে।

যশোবর্ম্মের রাজত্ব-কালেই মামুদ দ্বাদশবার ভারত আক্রমণ করেন। তিনি ভারতের রত্নরাজি সমস্তই লুঠিয়া লইয়া যান ও ভারতের দেবমন্দির সকলকে ভূমিসাৎ করেন। প্রবাদ আছে যে, তিনি ভারতের পরাজিত রাজপত্নীগণের সতীত্বরত্ন পর্য্যন্ত হরণ করিয়া চলিয়া যান। চিতোর ও গির্ণারের অপূর্ব্ব দেব-মন্দির সকল ও সোমনাথের অতুল মন্দির তাঁহার ভীষণ হস্তে শ্রীভ্রষ্ট ও রত্নরাজি অপহৃত হয়। সুবেকতেগিন আদিত্যপুরের ধ্বংসবিধান করেন মাত্র, কিন্তু তাঁহার পুত্র ভারতের যাহা কিছু অমূল্য ছিল, সমস্তই নষ্ট করিয়া যান। তিনি ও অনেক পরে নাদের সাহ ভারতের যেরূপ দুর্দ্দশা করিয়াছিলেন, এরূপ আর কেহ কখনও করে নাই, করিতে পারিবে কি না, জানি না।

যশোবর্ম্মের পর সমরসিংহ পর্য্যন্ত কালের মধ্যে পঞ্চজন রাজা চিতোরের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে বর্ষা রাউল ও তেজশ্রী রাউল ভিন্ন আর কাহারও নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য নাই বলিয়া এখানে পরিত্যক্ত হইল। আমরা এক্ষণে যোগীন্দ্র রাজ-শ্রেষ্ঠ সমরসিংহের রাজত্বকালের বর্ণনায় অবতীর্ণ হইব।

রাজপুতকীর্ত্তি সমরসিংহ

দিল্লীর পতন।

বিলম্বিত জটাজুটে যাঁহার মস্তকে যেন বিজলী খেলিতেছে, রুদ্রাক্ষমালায় যাঁহার করকমল অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে ও পদ্মবীজমালা যাঁহার কণ্ঠদেশকে আলিঙ্গন করিয়া আছে, ঐ মহাপুরুষ কে? যাঁহার এক নয়ন হইতে ব্রহ্মতেজ ও অপর নয়ন হইতে ক্ষত্র-তেজ উদ্গীরিত হইতেছে, ঐ রাজর্ষি কে? রুদ্র ও শান্তভাবের যাঁহাতে অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ হইয়াছে, ঐ মানবরূপী দেবতা কে? গভীর চিন্তায় যাঁহার উজ্জল মুখচন্দ্র রাহুগ্রস্তের ন্যায় হইয়াছে, ঐ নরোত্তম কে? যিনি রাজসিংহাসনে আসীন হইয়াও সেই দেবাদিদেব মহাদেবের ন্যায় বেশ ধারণ করিয়া আছেন, ঐ মহাযোগী কে? মিবারের সিংহাসনে সহসা ত্রিশূলীর আবির্ভাব কেন? আবার কি সেই মহাযোগী মহাদেব দানব-দলন-মানসে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন? না পাঠক! উনি দেবাদিদেব মহাদেব নহেন, কিন্তু সেই মহাযোগীর উপাসক যোগীন্দ্র রাণা সমরসিংহ। সেই মহাযোগীর ন্যায় ইঁহাতেও শান্ত ও ধীর ভাবের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ হইয়াছে। মরি মরি, অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! ইঁহার আবির্ভাবে মিবাররাজ্য পূত ও বলিষ্ঠ হইয়াছে! আজ এ গভীর চিন্তা কেন? আজ দিল্লীর মহারণে যাইতে হইবে বলিয়া কি যোগীন্দ্র ভারতের ভবিষ্যৎ-ভাবনায় নিমগ্ন আছেন?

সমরসিংহ ১২০৬ শকে জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং ত্রয়োদশ খৃষ্টাব্দেই তাঁহার আবির্ভাবকাল বলিতে হইবে। ইনি দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজের ভগিনী বিখ্যাত-নাম্নী পৃথা দেবীকে বিবাহ করিয়া দিল্লীরাজ্যের সহিত ঘনিষ্ঠ সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন। বীলনদেব ইন্দ্রপ্রস্থের এক জন সমৃদ্ধিশালী ঠাকুর ছিলেন। এই সময়ের চারিশত বৎসর পূর্ব্বে তিনি রাজ-উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক ইন্দ্রপ্রস্থে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। উত্তরাধিকারক্রমে উনবিংশতি জন রাজা তদীয় সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তদীয় বংশের মহিমা বিস্তার করেন। তিনি অনঙ্গপাল নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার বংশধরগণ সকলেই এই পারিবারিক নামে অভিহিত হইতেন। এই বংশের শেষ রাজা বিখ্যাতনামা অনঙ্গপাল

সমস্ত ভারতবর্ষের একচ্ছত্রী রাজা হইয়াছিলেন। সমস্ত হিন্দু-নরপতিগণ তাঁহার আদেশের বশবর্ত্তী ছিলেন। *

"পত্তনের, চালুক-বংশোদ্ভব লৌহকায় ভোলা-ভীম; আবুপর্ব্বতের সমরে ধ্রুব তারাসম, অচল-জাতবংশোদ্ভব প্রেম রায়; মিবারের প্রবল হইতে করগ্রাহি, দিল্লীর প্রধান সহায় সমরসিংহ; মণ্ডোর, নাগোর, সিন্ধু, জলবাত, পেশাবর, কঙ্কগ্র, কাশী, প্রয়াগ, দেওগির, সীমর, জশলমীর প্রভৃতি রাজ্যের রাজগণ অনঙ্গপালের আদেশ বহন করিয়া থাকেন।" আজমীরের চোহান বংশের নরপতিগণও শেষে অনঙ্গপালের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। এই বংশের চতুর্থ নরপতি সমরেশ্বর ও কান্যকুব্জাধিরাজ বিজয়পাল এই দুই জনে অনঙ্গপালের দুই কন্যাকে বিবাহ করেন। প্রথম দম্পতীর পুত্র খ্যাতনামা পৃথ্বীরাজ এবং দ্বিতীয় দম্পতীর পুত্র জয়চন্দ্র। বিজয়পাল শ্বশুরের আধিপত্যের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইয়াছিলেন বলিয়া অনঙ্গপাল আজমীরাধিপতি সমরেশ্বরের সাহায্যে তাঁহাকে দমিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং সেই সাহায্যের পুরস্কারস্বরূপ সমরেশ্বরকে কনিষ্ঠা কন্যা সম্প্রদান করেন। অনঙ্গপাল অপুত্রক অবস্থায় পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তিনি অষ্টমবর্ষীয় দৌহিত্র পৃথ্বীরাজকে নিজ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করিয়া যান। এইরূপে চোহান বংশে ও রাঠোর-বংশে ঘোরতর শত্রুতা বাধিয়া উঠিল। যখন পৃথ্বীরাজ দিল্লীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন, তখন জয়চন্দ্র তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতে অস্বীকার করিলেন, এবং অনঙ্গপালের জ্যেষ্ঠা কন্যার পুত্র বলিয়া দিল্লীর সিংহাসনে তাঁহার অধিকতর অধিকার প্রতিপন্ন করিতে সচেষ্ট হইলেন। এই চেষ্টায় তিনি চোহান-বংশের চিরশত্রু পত্তনরাজ অহলবর ও মুণ্ডোরাধিপতি পুরীহরের বিশেষ সহায়তা প্রাপ্ত হইলেন।

এক ঘটনায় উভয় পক্ষের অভ্যন্তরস্থ ধূমায়মান বহ্নি অচিরাৎ প্রজ্বলিত হুতাশনে পরিণত হইল এবং সেই প্রজ্বলিত হুতাশনে উভয় পক্ষই পুড়িয়া ভস্মসাৎ হইলেন আর সেই ভস্মস্তূপে ভারতের স্বাধীনতা-রত্ন বহুকালের জন্য সমাধি-নিহিত হইল।

পৃথ্বীরাজ মুণ্ডোরাধিপতির দুহিতার পাণি-গ্রহণার্থী হইলেন। মুণ্ডোরাধিপতি ইহাতে অস্বীকৃত হইলেন; সুতরাং দিল্লীশ্বরের সহিত তাঁহার সমর বাধিয়া উঠিল। কান্যকুব্জাধিপতি ও পত্তনেশ্বর উভয়েই মুণ্ডোরাধিপতির সাহায্যার্থে অগ্রসর হইলেন। ইহাঁরা আপনাদের দলের দুর্ব্বলতা বুঝিতে পারিয়া তাতার-বংশোদ্ভব গজনীর অধিপতি সাহাবুদ্দীনের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। সাহাবুদ্দীন এ সুবিধা ছাড়িবার লোক ছিলেন না। তিনি তাঁহাদিগের সাহায্যার্থে একদল পাঠানসেনা প্রেরণ করিলেন। দিল্লীশ্বর সমরসিংহকে তাঁহার সাহায্যার্থ আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। এ দিকে সাহাবুদ্দীনও সমরসিংহকে হস্তগত করিবার জন্য লাহোরের সামন্ত চাঁদপুণ্ডীরকে তাঁহার নিকট দূতস্বরূপ প্রেরণ করিলেন। সমরসিংহ তাঁহাকে মহাসমাদরে গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু তিনি যে কার্য্যের জন্য আসিয়াছিলেন, তাহার কোন সুবিধা হইল না। সমরসিংহ নিজের দেশ ও স্বজাতিকে প্রাণাপেক্ষা অধিকতর ভালবাসিতেন। যে দেহ ও প্রাণ তিনি দেশের জন্য উৎসর্গ করিবেন বলিয়া সযত্নে রক্ষা করিতেছিলেন, কোন্ প্রাণে তিনি সেই দেহ ও প্রাণ বৈদেশিকের কার্য্যে ব্যয়িত করিবেন? কোন্ প্রাণে নিজ হস্ত স্বদেশীয়ের রুধিরে কলঙ্কিত করিবেন? না—মহাপুরুষের জন্ম স্বদেশের মঙ্গল-সাধনের জন্য—স্বদেশের অধঃপাতসাধনের জন্য নহে। তাই আজ সমরসিংহ সাহাবুদ্দীনের প্রস্তাব ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিলেন। তাঁহার স্বদেশানুরাগে দূতবর চাঁদপুণ্ডীর মুগ্ধ হইলেন। এখন হইতে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি স্বদেশের কার্য্যে আত্মোৎসর্গ করিলেন। সেই রাভীতীরে, যেখানে ভারতের স্বাধীনতা-সূর্য্য অনন্তকালের জন্য রাহুগ্রস্ত করিবার জন্য যবন-রাহু সাহাবুদ্দীন প্রথমে আবির্ভূত হন—সেই রাভীতীরে চাঁদপুণ্ডীর সেই যবন-রাহুর প্রতিরোধ করিতে গিয়া এই মরণশীল দেহের বিনিময়ে অমরত্ব লাভ করেন। অহো! মহাপুরুষের উদার দৃষ্টান্তের কি অপূর্ব্ব মহিমা! বৈদেশিকের দৌত্য-কার্য্যে আসিয়া সমরসিংহের চরিত্রের

---

* চাঁদ কবি-লিখিত এই সময়ের ইতিহাস দেখ।

মোহিনীশক্তি-বলে চাঁদপুণ্ডীর আজ জননী জন্মভূমির চরণে আত্মপ্রাণ অঞ্জলি প্রদান করিলেন। ধন্য গুরু! ধন্য শিষ্য! এই জন্য স্বদেশানুরাগবশতঃ সমরসিংহ স্বজাতীয়ের বিরুদ্ধে অসিধারণ না করিয়া পাঠান-সৈন্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে স্বীকৃত হইলেন। পৃথ্বীরাজ যৎকালে হিন্দুরাজগণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত ছিলেন, সেই সময় সমরেশ্বর পাঠান-সৈন্যগণের সম্মুখীন হইয়া তাহাদিগের গতিরোধ করিয়া রহিলেন। এই সময়ে পাঠানদিগের সহিত তাঁহার অনেকগুলি যুদ্ধ হয়। জয়-পরাজয় কোন পক্ষেই নিশ্চিত হয় নাই। ইত্যবসরে পৃথ্বীরাজ গুজরাটের যুদ্ধ অবসান করিয়া তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। মিলিত আর্য্যসেনা ভীষণ রণোন্মাদের সহিত যবন-সেনাকে আক্রমণ করিল। আক্রমণকারিণী যবনসেনা সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইল ও যবন-সেনাপতি বন্দীকৃত হইলেন। পৃথ্বীরাজ যুদ্ধে জয়ী হইলেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেই নগরে সাত লক্ষ সুবর্ণ মুদ্রা প্রাপ্ত হইলেন। পৃথ্বীরাজ ভগিনীপতি সমরসিংহকে ইহার অংশ দিতে চাহিলেন। কিন্তু যোগীন্দ্র সমরসিংহ সামান্য পার্থিব ধনের আকাঙ্ক্ষী ছিলেন না। তিনি আবিষ্কৃত ধনের অংশ-গ্রহণে অস্বীকৃত হইলেন।

কিন্তু তিনি নিজ সামন্তবর্গকে সম্রাট-প্রদত্ত উপঢৌকন গ্রহণ করিতে অনুমতি করিলেন। পৃথ্বীরাজকে স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া সমরসিংহ নিজ রাজধানী চিতোর নগরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এ দিকে পৃথ্বীরাজ রাজচক্রবর্ত্তিরূপে ভারত শাসন করিতে লাগিলেন। উপর্য্যুপরি বিজয়ে তিনি এতদূর দৃপ্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, যবনদিগের অবশ্যম্ভাবী ভবিষ্য আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক মনে করেন নাই। বহু বৎসর গত হইল, তথাপি যবনেরা আর আক্রমণ করিল না দেখিয়া পৃথ্বীরাজ একেবারে নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন। কিন্তু গজনীরাজ নিদ্রিত ছিলেন না। তিনি কৃত অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য কেবল অবসর প্রতীক্ষা করিতেছিলেন মাত্র। তিনি পৃথ্বীরাজকে প্রমত্ত ও অনবহিত দেখিয়া এই সুযোগে মহতী সেনা লইয়া স্বয়ং দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পৃথ্বীরাজ ইহার জন্য বিন্দুমাত্রও প্রস্তুত ছিলেন না। সুতরাং তিনি ত্রস্ত ব্যস্ত হইয়া সমরসিংহের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন ও তাঁহাকে অবিলম্বে সসৈন্যে দিল্লীরক্ষার্থ আগমন করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। এ দিকে ঈর্ষা ও প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হইয়া পত্তন, কান্যকুব্জ ও ধাবানগরীর অধিপতিত্রয় অন্তর্নিগূহিত হর্ষের সহিত উদাসীনভাবে এই জাতীয় সমরের পরিণাম দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু হায়! তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন না যে, এই মহারণে পৃথ্বীরাজের সহিত তাঁহাদিগের—অধিক কি, সমস্ত ভারতবাসীর অদৃষ্ট পরীক্ষিত হইবে।

শেষে জানিলেন, এই জাতীয় কার্য্যে অবহেলারূপ পাপের প্রায়শ্চিত্ত তাঁহাদিগকেও অচিরাৎ করিতে হইবে। যে পাপিষ্ঠ সহর্ষে আশ্রয়-তরুর মূলোচ্ছেদ অবলোকন করে, বিধাতার অলৌকিক কৌশলে ছিন্নতরুর স্কন্ধ তাহার মস্তকে অব্যর্থরূপে পতিত হয়! এই পাপেই ভারতের মানচিত্র হইতে এ তিন রাজ্যের চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে! ধন্য বিধাতঃ! ধন্য তোমার কৌশল!

সমরসিহ এবার যেন বুঝিতে পারিলেন যে, আর তাহাকে চিতোরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে না। বুঝিয়াই যেন তিনি প্রিয়তম কনিষ্ঠ কুমার কর্ণ-হস্তে রাজধানী-রক্ষার ভার অর্পণ করিয়া দিল্লীর রক্ষার্থ গমন করিলেন। জ্যেষ্ঠাধিকার লঙ্ঘন করায় জ্যেষ্ঠ-পুত্র বিরক্ত হইয়া বিদর্ভাধিপতি মুরসী পাসার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন ও তৎকর্ত্তৃক তথায় মহাসমাদরে গৃহীত হইলেন। অন্যতর পুত্র নেপালে পলায়ন করিয়া তথায় ঘেলোট-বংশ প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন।

এ দিকে সমরসিংহের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সমস্ত দিল্লীবাসী আনন্দে উৎফুল্ল হইল। আবালবৃদ্ধ-বনিতা আনন্দ-গীত গাইতে লাগিল ও আনন্দোৎসবে প্রমত্ত হইল। সকলেই যেন তাঁহাকে ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া মনে করিতে লাগিল। দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ ও তদীয় সভাসদ্‌গণ তাঁহার অভ্যর্থনার্থ সাত মাইল অগ্রবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। সমর-মহিষী পৃথ্বীরাজ-ভগিনী পৃথার সহিত পৃথ্বীরাজের উদ্দীপনাপূর্ণ স্নেহালাপ হইল, এবং উভয় পক্ষের সামন্তবর্গের মধ্যে পরিচিতে পরিচিতে পরস্পর গাঢ়তর আত্মীয়তার বিনিময় হইল। সমরসিংহ

পৃথ্বীরাজকে এরূপ নিশ্চেষ্ট থাকার জন্য সবিশেষ তিরস্কার করিলেন। পৃথ্বীরাজ অবনত-মস্তকে হিতাকাঙ্ক্ষী ভগিনীপতির সেই তিরস্কার বহন করিলেন।

কি প্রণালীতে উপস্থিত সমর চালাইতে হইবে এবং দৃশদ্বতী নদীতীরে কিরূপে শত্রুর সম্মুখীন হইতে হইবে, এ সকল বিষয়ে পৃথ্বীরাজ সমরসিংহের মত গ্রহণ করিলেন এবং তদনুসারে কার্য্যও করিতে লাগিলেন। ট্রয়-অভিযান-কালে গ্রীক্-সৈন্যগণ ইউলিসিসকে যে ভাবে দেখিতেন, আজ এই মিলিত সেনা সমরসিংহকে সেই ভাবে দেখিতে লাগিলেন। সমরসিংহ যুদ্ধে সৎসাহসী, ধীর, অবিচলিত ও সুদক্ষ, মন্ত্র ভবনে সদ্বিবেচক, বিজ্ঞ, বহুদর্শী, সদ্বক্তা এবং সর্ব্বসময়ে ধর্ম্মপরায়ণ, ভগবদ্ভক্ত, বিনীত ও সংযত-বাক্ বলিয়া উভয় পক্ষের সামন্ত ও অধীন ভূম্যধিকারিগণের সবিশেষ ভক্তি-ভাজন ছিলেন। তিনি যাহারই সহিত সংস্রবে আসিতেন, নিজ চরিত্র-গৌরবে তাহাকে মুগ্ধ করিতেন। তিনি সর্ব্বগুণের আধার ও সর্ব্বকর্ম্ম ও জ্ঞানের আকর ছিলেন।

অভিযান-কালে শাকুনিক লক্ষণ দ্বারা ভবিষ্যৎ বলিয়া দিতে তাঁহার মত কোন শাকুনিক-শাস্ত্র-বিশারদ পারিতেন না। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকদিগকে অস্ত্রে-শস্ত্রে সাজাইয়া দিতে তাঁহার মত কেহ পারিতেন না। রণস্থলে অস্ত্রচালন বা প্রচালনা-বিষয়ে তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারেন, ভারতে এরূপ বীর তৎকালে কেহ ছিলেন না। কি যুদ্ধক্ষেত্রে, কি অভিযান-কালে, অথবা যুদ্ধের আয়োজনসময়ে সামরিক নেতৃবৃন্দ সকলেই যেন এক নয়নে উপদেশ-প্রতীক্ষায় তাঁহার দিকে তাকাইয়া থাকিতেন। তাঁহারা তাঁহার বাগ্মিতায় প্রীত ও তদীয় জ্ঞানগর্ভ উপদেশে উপকৃত হইতেন। কি ধর্ম্মনীতি, কি রাজনীতি, কি সমাজ-নীতি, সকল শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। কি কি লক্ষণ দ্বারা দূত নির্ব্বাচন করিতে হইবে, কিরূপ গুণাক্রান্ত লোককে মন্ত্রি-পদে অভিষিক্ত করিতে হইবে এবং রাজা ও প্রজা পরস্পর পরস্পরের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিবেন—এ সমস্ত উপদেশ লইতে হইলে সকলে তাঁহারই নিকটে উপস্থিত হইতেন।

কিন্তু এই মহাপুরুষের জীবিত-কাল অন্ত্য-সীমায় উপনীত হইয়াছে। তিনদিন ঘোরতর রণের পর এই মহাপুরুষ দৃশদ্বতী-নদীতীরে প্রিয় পুত্র-কন্যাগণের সহিত রণক্ষেত্রে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। হায়! ভারতের চন্দ্র আজ অস্তমিত হইলেন। সেই দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত ভারত-গগনে অনন্ত অমাবস্যা বিরাজ করিতেছে। হিন্দুগণ! একবার নয়ন ভরিয়া দেখ, তোমাদের গগন-শশী ভূতল-শায়ী হইয়াছেন! আর ঐ দেখ, তোমাদের শেষ সম্রাট পৃথ্বীরাজ যবন-রাহু-কবলে পতিত হইয়াছেন! হিন্দুগণ! একবার ক্রন্দন-রোলে ও বক্ষতাড়নে গগন বিদারিয়া এই যবন-রাহু-কবলিত রবির ও এই গগনচ্যুত শশীর জন্য কাঁদ! আর এই দিনে প্রতি বৎসর একদিন করিয়া কাঁদিতে থাক! হায় রে! সে দিন কবে আসিবে—যে দিনে ঐ রবিশশী আবার ভারত-গগনে উদিত হইবে?

দিল্লী-অধিকার

হিন্দুর দুর্দ্দশা।

এই মহারণে শুদ্ধ যে সমরসিংহ ও তদীয় পুত্র নিহত এবং পৃথ্বীরাজ শত্রু-হস্তে নিহত হইলেন, এরূপ নহে, দিল্লী ও মিবারের সামন্তবর্গের ও সৈন্যগণের প্রধান প্রধান প্রায় সকলেই সমরশায়ী হইলেন। বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয় যে, এই নরমেধ-যজ্ঞে শুদ্ধ মিবারেরই সৈন্য ও সামন্তে ত্রয়োদশ সহস্র ক্ষত্রবীর বলি পড়িলেন। ঐ দেখ, ক্ষত্র-শোণিতে দৃশদ্বতী নদী স্ফীতাবয়বা হইয়া দ্রুততর বেগে প্রবাহিত হইতেছে। ঐ দেখ, শকুনি-গৃধিনীতে রণস্থল যেন মেঘাবৃত হইয়া আছে। কি ভীষণ দৃশ্য! ভারত-বাসীর হৃদয়ের প্রিয়তম বস্তু—ভারতের বীরমণ্ডলী আজ ভূমিতলে গড়াগড়ি যাইতেছেন! তাঁহাদের এই পবিত্র দেহের সৎকার করে, এমন লোক কেহই নাই! আজ অগণ্য হিন্দুসন্তানের মধ্যে সাহসে হৃদয় বান্ধিয়া যবন-রাহু-কবল হইতে এই পবিত্র শব-গুলি উদ্ধার করে, এমন কেহ নাই! হায় রে, আমরা কেন বাঁচিয়াছি? আর ঐ দৃপ্ত যবনেরা আজ বিজয়-উল্লাসে মত্ত হইয়া হিন্দুর শেষ দাঁড়াইবার স্থল হস্তিনাপুরের অভিমুখে ধাবিত হইতেছে। আজ সমরসিংহ হত ও পৃথ্বীরাজ বন্দীকৃত—কে তবে এ বিপদে হিন্দুদিগকে রক্ষা করিবে? আজ

ভারতের বীরমণ্ডলী জননীক্রোড়ে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত, আজ কে তবে জননীর গৌরবরক্ষা করিবে? হায় হায়, সব গেল! ঐ দেখ, যবনেরা বিশ্বাসঘাতকতার সাহায্যে দিল্লী অধিকার করিল। ঐ শুন, আবালবৃদ্ধ-বনিতার ক্রন্দন-রোলে আজ দিল্লী ফাটিয়া যাইতেছে! যবনের "আল্লা আল্লা" রবে আজ কর্ণ বধির হইতেছে! ঐ দেখ, সমর-প্রিয়া পৃথাদেবী প্রিয়তম পতির ও প্রাণাধিক পুত্রের মৃত্যু ও ভ্রাতার বন্দীভূত হওয়ার সংবাদ শ্রবণে শোকে অধীর হইয়া পাগলিনীর ন্যায় ছুটিতেছেন। ঐ দেখ, পাগলিনীবেশে চিতোর-রাজমহিষী পতির মৃতদেহের পার্শ্বে শয়ন করিয়া ও পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া অনলে আত্ম-আহুতি দিতেছেন! হায়, কি হইল? ভারত-শশীসহ ভারত-রোহিণী দেখিতে দেখিতে পঞ্চভূতে মিশাইয়া গেলেন!

দিল্লীর ধ্বংস

আর পাঠক! ঐ হিন্দু-কীর্ত্তি-স্তম্ভ হস্তিনা-পুরের দিকে একবার তাকাইয়া দেখ! অহো! কি লোমহর্ষণ দৃশ্য! ঐ দেখ, বিজয়োন্মত্ত যবনেরা সতীর সতীত্ব নাশ করিতেছে! যাহাকে সম্মুখে পাইতেছে, প্রচণ্ড খড়্গাঘাতে তাহাকে শমন-সদনে প্রেরিত করিতেছে! আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কেহই ইহাদের করাল অসির গ্রাস হইতে রক্ষা পাইতেছে না! ধ্বংস, লুণ্ঠন ও হত্যা ভিন্ন আর কিছুই নয়নগোচর হইতেছে না। অপূর্ব্ব ধর্ম্ম-মন্দির—বিচিত্র সৌধরাজী,—ধর্ম্মের চক্ষে যাহা অতি পবিত্র, শিল্পবিজ্ঞানে যাহা অতুলনীয়—সমস্তই এই নির্দ্দয় ও অসভ্য তাতারগণ কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইল! ঐ দেখ, হিন্দুর হৃদয়ের প্রিয়-বস্তু হস্তিনাপুর নিমেষমধ্যে শ্মশান-ভূমিতে পরিণত হইল! এই পূত রাজধানীর প্রতি-বিন্দু হিন্দুর পবিত্র রুধিরে কলঙ্কিত হইল! প্রত্যেক গমনপথ হিন্দুর মৃতদেহে সমাচ্ছন্ন হইল! হিন্দুর আনন্দপুরী আজ যমপুরীতে পরিণত হইল! হায়, কি হইল? কোন্ পাপে হিন্দুর আজ এই দুর্দ্দশা ঘটিল?

সমরসিংহ ও তদীয় উত্তরাধিকারিগণ

রাণা ভীমসিংহ ও তদীয় পত্নী পদ্মিনী।

(সম্রাট্ আলাউদ্দীন কর্ত্তৃক চিতোর আক্রমণ)

মহামতি সমরসিংহ দৃশদ্বতী নদীতীরে স্বদেশের স্বাধীনতা-রক্ষার জন্য প্রাণোৎসর্গ করিলে, তদীয় পুত্র কর্ণ পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিলেন। কিন্তু তিনি তৎকালে অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন বলিয়া তদীয় জননী পত্তন-রাজ-তনয়া বিখ্যাতনাম্নী কর্ম্মদেবী তাঁহার অভি-ভাবিকা-স্বরূপ রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগি-লেন। ১২৪৯ শকে বা ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে কর্ণ পিতৃসিং-হাসনে আরোহণ করেন। ইহার অব্যবহিত পরেই কুতবুদ্দীন রাজপুতানা আক্রমণ করেন। কর্ম্মদেবী রাজপুত সৈন্য লইয়া এই আক্রমণকারিণী যবন সেনার গতিরোধ করেন। তিনি অম্বর নগরে আসিয়া ইহাদিগকে যুদ্ধ দেন। এই যুদ্ধে কুতবু-দ্দীন পরাজিত ও আহত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করেন।

এই যুদ্ধে নয় জন রাজা ও একাদশ জন সামন্ত কর্ম্মদেবীর অনুবর্ত্তন করেন। সমরসিংহ ও সুরয-মল দুই সহোদর ছিলেন, সুরযমলের পুত্র ভারত। ভারতের পুত্র রাহুপ। কর্ণের মৃত্যুর পর রাহুপই (১২৫৭ শকে—১২০১ খৃষ্টাব্দে) চিতোরের রাজ-সিংহাসন অধিকার করেন। রাহুপের সময়েই মিবার রাজবংশ শিশোদীয়া-বংশ নামে আখ্যাত হয় ও রাজা রাণা উপাধি ধারণ করেন। এখন হইতে আমরা মিবারাধিপতিগণকে রাণা উপা-ধিতে ভূষিত করিব। কর্ণের মাহুপ নামে এক পুত্র ছিল, কিন্তু তাঁহার অযোগ্যতা নিবন্ধন, কর্ণ ভারতকেই উত্তররাধিকারী মনোনীত করেন। কিন্তু ভারত তাঁহার অগ্রেই পরলোকগত হন বলিয়া তদীয় রাহুপই কর্ণ পরিত্যক্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাণা রাহুপ ও রাণা লক্ষ্মীব রাজত্ব-কালের ব্যবধান অর্দ্ধশতাব্দী মাত্র। এই অল্পসময়ের মধ্যে নয়জন রাণা মিবারের রাজসিংহাসন অলঙ্কৃত করেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের রাজত্বকালের ব্যবধান প্রায়ই সমান। এই নয় জন রাণার প্রত্যেকেই পবিত্র গয়া-নগরীকে যবনাক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে গিয়া রণক্ষেত্রে যবনহস্তে প্রাণ হারান। এই রাজ-শ্রেণীর শেষ রাজা রাণা পৃথ্বীমল। উপর্য্যুপরি

নরজন রাজা এই পবিত্র তীর্থস্থানের পবিত্রতা-রক্ষার জন্য আত্মোৎসর্গ করায় যবনরাজ ভীত ও বিস্মিত হইয়া কিছুকাল এই নগরী আক্রমণ হইতে বিরত থাকেন। ধর্ম্মান্ধ আলাউদ্দীনের সময়েই এই আক্রমণ পুনর্বারব্ধ হয়।

রাণা লক্ষ্মী ১৩৩১ শকে (১২৭৫ খৃষ্টাব্দে) পিতৃ-পরিত্যক্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন। যে চিতোর নগরী—ভারতের যাহা কিছু বহুমূল্য বা অমূল্য মণিমুক্তা-হীরক-প্রবাল-প্রস্তরাদি—তদ্দ্বারা খচিত ও নির্ম্মিত যে কিছু মনোমোহন কারুকর্ম্মাদি, তদ্দ্বারা সুশোভিত; যে চিতোরনগরী অপবিত্র করস্পর্শে আজও দূষিত হয় নাই, সেই অপূর্ব্ব রাজধানী চিতোর-নগরী এই রাণার সময়েই পাঠান সম্রাট আলাউদ্দীন কর্তৃক উপর্য্যুপরি দুইবার আক্রান্ত, অবরুদ্ধ ও অবশেষে ভগ্নাবশেষে পরিণত হয়। প্রথমাক্রমণ চিতোরের বীরবৃন্দের রুধিরে প্রতিহত হয়। দ্বিতীয় আক্রমণে চিতোর শ্মশানে পরিণত হয়।

রাণা লক্ষ্মীর খুল্লতাত রাণা ভীমসিংহ তাঁহার অপ্রাপ্ত-বয়স্ক অবস্থায় তদীয় অভিভাবকস্বরূপ নিযুক্ত ছিলেন। তিনি সিংহলরাজ চোহানবংশীয় হামিরশঙ্কের কন্যা বিখ্যাতনাম্নী পদ্মিনীকে বিবাহ করেন। এই পদ্মিনীই শিশোদীয়া বংশের অগণ্য ও অসীম দুঃখের মূল হইলেন। পদ্মিনী সৌন্দর্য্যে ও গুণে অতুলনীয়া ছিলেন। বংশ-মর্য্যাদায়, চরিত্র-গৌরবে ও সৌন্দর্য্যে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিনী হইতে পারে তৎকালে জগতে এরূপ ললনা শ্রুতিগোচর হয় নাই।

—

চিতোর আক্রমণ

কিন্তু পদ্মিনীর এই অলৌকিক সৌন্দর্য্যই চিতোরের ধ্বংসের কারণ হইল। কামাতুর যবন-রাজ আলাউদ্দীন পদ্মিনীর রূপ-লাবণ্যবার্ত্তা শ্রবণে উন্মত্ত হইয়া পদ্মিনীলাভার্থ চিতোর আক্রমণ করিলেন। রাজপুতগণের অসাধারণ বীরত্বে তাঁহার প্রথম আক্রমণ প্রতিহত হইল। কিন্তু বিক্রমকেশরী আলাউদ্দীন কিছুতেই নিবৃত্ত হইবার নহেন। তিনি মহতী সেনা লইয়া দ্বিতীয়বার চিতোর আক্রমণ করিলেন। তিনি বলে নগর অধিকার করিতে অক্ষম হইয়া দীর্ঘকাল নগর অবরোধ করিয়া রহিলেন। কিন্তু চিতোর কিছুতেই অবনমিত হইল না। তখন তিনি যবন-সুলভ চাতুরী অবলম্বন করিলেন। তিনি প্রথমে বলিয়া পাঠাইলেন যে, পদ্মিনীকে পাইলেই তিনি নগরের অবরোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিজ রাজধানীতে চলিয়া যাইবেন। কিন্তু রাজপুতেরা প্রাণ দিতে প্রস্তুত, তথাপি কুলকামিনীকে শত্রুহস্তে অর্পণ করিতে প্রস্তুত নহেন। সুতরাং আলাউদ্দীনের মনস্কামনা পূর্ণ হইল না। তিনি পদ্মিনীকে একবারমাত্র দেখিতে চাহিলেন; কিন্তু রাজপুতেরা তাহাতেও অস্বীকৃত হইলেন। অবশেষে উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত হইল যে, আলাউদ্দীন দর্পণে পদ্মিনীর প্রতিবিম্বমাত্র দেখিয়া যাইবেন। রাজপুতগণের বিশ্বস্ততার উপর নির্ভর করিয়া আলাউদ্দীন অল্পসংখ্যক দেহরক্ষক সঙ্গে লইয়া পদ্মিনীমহলে গমন করিলেন। তথায় দর্পণে সেই জগল্ললামভূতা রমণীরত্নের প্রতিবিম্ব দেখিয়া হৃদয়ের পিপাসা কথঞ্চিৎ নিবৃত্ত করিয়া আলাউদ্দীন নিজ শিবিরে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। বিশ্বাসবিষয়ে যবনের নিকট পরাস্ত হইতে ইচ্ছুক না হইয়া ভীমসিংহ নির্ভীক-চিত্তে সম্রাট সঙ্গে দুর্গপাদমূল পর্য্যন্ত গমন করিলেন। আলাউদ্দীন জানিতেন, পবিত্র-চরিত আতিথ্যজীবন হিন্দুরা কখনই বিশ্বাসভঙ্গ করিবেন না। তিনি আরও জানিতেন যে, তিনি যখন নির্ভয়ে ভীমসিংহের আলয়ে গমন করিলেন, তখন ভীমসিংহও অন্ততঃ দুর্গদ্বার পর্য্যন্ত তাঁহাকে রাখিয়া যাইবেন। হিন্দুর চরিত্র-মহিমার উপর নির্ভর করিয়া কপটী যবন-সম্রাট ভীমসিংহকে ধরিবার জন্য দুর্গ-দ্বারের নিকট লুকায়িত ভাবে অনেকগুলি সৈন্য রাখিয়াছিলেন। তিনি বিদায় গ্রহণ-কালে চিতোরের উপর অত্যাচার করার জন্য ভীমসিংহের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন, এমন সময় সেই গুপ্তস্থান হইতে যবন-সৈন্য বহির্গত হইয়া ভীমসিংহকে বন্দী করিয়া যবন-শিবিরে লইয়া গেল। আলাউদ্দীন পদ্মিনীর নিষ্ক্রয়স্বরূপ ভীমসিংহকে বন্দী করিয়া রাখিলেন।

এই সংবাদ চিতোরে আসিবামাত্র চিতোরবাসী বীরগণের হৃদয় গভীর শোকে আচ্ছন্ন হইল। চিতোরের রক্ষক ও অভিভাবক রাণা ভীমসিংহ যবন-শিবিরে

বন্দীভূত! এখন চিতোর রক্ষা করে কে? এই ভাবনায় সকলেই নিরতিশয় কাতর হইয়া উঠিলেন, তাঁহার নিষ্ক্রয়স্বরূপ পদ্মিনীকে পাঠান হইবে কি না, এই বিষয় লইয়া ঘোরতর আন্দোলন হইতে লাগিল। এই সংবাদ পদ্মিনী সতীর কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। তিনি স্বামীর উদ্ধারের জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইলেন। তিনি স্বামীকে উদ্ধার করিয়া আত্মধ্বংস করিবেন সঙ্কল্প করিয়া পরিচ্ছদ মধ্যে অস্ত্র লুক্কায়িত করিলেন, করিয়া নিজ খুল্লতাত গোরা ও তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র বীরবর বাদলকে নিজ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু তাঁহারা ভীমসিংহের উদ্ধার ও পদ্মিনীর সম্মান-রক্ষা উভয় দিক করিবার জন্য এক অপূর্ব্ব কৌশল অবলম্বন করিলেন। "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ" 'শঠের সহিত শঠতা করিতে হইবে', চাণক্যের এই নীতি অবলম্বন করিয়া আলাউদ্দীনকে বলিয়া পাঠাইলেন যে—যে দিন তিনি চিতোরের অবরোধ উত্তোলন করিবেন, সেই দিনই তাঁহারা পদ্মিনীকে তাঁহার শিবিরে প্রেরণ করিবেন। কিন্তু রাজনন্দিনী ও রাজমহিষীর অবস্থানুরূপ লোকজনসহ তাঁহাকে পাঠান হইবে। যে সকল ধাত্রী ও সহচরীগণ তাঁহার সহিত দিল্লী গমন করিবেন, শুদ্ধ যে কেবল তাঁহারাই সম্রাটের শিবিরে যাইবে, এরূপ নহে, কিন্তু যে সকল রাজপুত রমণী তাঁহার সহিত শেষ দেখা করিতে যাইবেন, তাঁহাদিগকেও যাইতে দিতে হইবে, আর কঠিন আদেশ প্রচার করিতে হইবে যে,কেহ যেন কৌতূহলোদ্দীপ্ত হইয়া সেই কুলকামিনীগণের শিবিকার বস্ত্র উত্তোলন করিয়া কুলকামিনীর লজ্জাশীলতার ব্যাঘাত সম্পাদন না করে। কামোন্মত্ত আলাউদ্দীন এই বাগুরায় পতিত হইলেন। তিনি রাজপুতগণের সমস্ত প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। দেখিতে দেখিতে সপ্ত শত শিবিকা সম্রাটের শিবিরাভিমুখে প্রবাহিত হইল। প্রত্যেক শিবিকায় মিবারের এক একটি বীররত্ন শায়িত হইলেন। প্রত্যেক শিবিকায় ছয় জন করিয়া গুপ্তাস্ত্র বীরপুরুষ কর্ত্তৃক প্রবাহিত হইল। শিবিকারোহী বীরবৃন্দ অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত রহিলেন। এইরূপ অবস্থায় সেই শিবিকামালা যবন সম্রাটের শিবিরে আসিয়া উপস্থিত হইল। অমনি রাজশিবির কানাত বা শ্বেতবস্ত্র-নির্ম্মিত প্রাচীরে পরিবেষ্টিত হইল। বাহকেরা শিবিকা রাখিয়া স্ব স্ব স্থানে দণ্ডায়মান হইল। রাণা ভীমসিংহকে পদ্মিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অর্দ্ধ ঘণ্টা-কাল মাত্র সময় প্রদত্ত হইল। ভীমসিংহ শিবিকা আরোহণে সেই কানাত -পরিবেষ্টিত শিবিকা-ভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। পরস্পর কথোপ-কথনে রাণার অল্প বিলম্ব হওয়ায় আলাউদ্দীন ঈর্ষানলে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। অবশেষে ভীম-সিংহ শিবির হইতে বিনির্গত হইয়া চিতোরাভিমুখে ধাবিত হইলেন। অদূরে বেগগামী অশ্ববর প্রস্তুত ছিল, রাণা তৎপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক চিতোরাভিমুখে পলায়ন করিলেন। রাণার শিবির হইতে নিষ্ক্রমণের পরই অস্ত্রধারী বীরপুরুষগণ নিজমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। নিমেষমধ্যে প্রত্যেক শিবিকারোহী ও প্রত্যেক শিবিকা-বাহী যেন এক এক যমদূতের মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হই-লেন। আলাউদ্দীন পূর্ব্ব হইতেং সতর্ক না হইলে, বোধ হয় আজ সসৈন্যে নির্ম্মূল হইতেন। তিনি এরূপ ঘটনা সম্ভবপর মনে করিয়া সৈন্যগণকে রণ-সজ্জায় সজ্জিত রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে সঙ্কেত পাইবা-মাত্র সমস্ত যবন সৈন্য সেই সেই ছদ্মবেশী বীরবৃন্দকে আক্রমণ করিল। সেই অনন্ত যবনসৈন্য-সাগরে ক্ষত্র-বীরবৃন্দ একে একে বিলীন হইয়া গেলেন। কিন্তু তাঁহাদের সংকল্প সিদ্ধ হইল, ভীমসিংহ পরিত্রাণ পাইলেন এবং পদ্মিনী সতীর সতীত্ব-রক্ষা হইল। রাজার জীবন ও রাজপুত-রমণীর সতীত্ব-রক্ষার জন্যই যেন রাজপুত বীরবৃন্দের জন্মপরিগ্রহ। এরূপ রাজভক্তি ও এরূপ রমণী-সম্মানরক্ষা আর কোন দেশে আছে কি না, হইতে পারে কি না, ইতিহাসে আজও তাহা লিখে নাই। স্ত্রী-জাতির সম্মান-রক্ষা যদি সভ্যতার নিকর্ষস্থল হয়, তাহা হইলে মুক্ত-কণ্ঠে বলিতে হইবে যে, রাজপুত-জাতির ন্যায় সভ্য জাতি জগতে আর জন্মে নাই। এরূপ আত্মোৎ-সর্গ ও এরূপ স্বজাতিপ্রেমও আর কুত্রাপি পরি-দৃষ্ট হয় নাই। ধন্য বীরবৃন্দ! ধন্য তোমাদের জীবন!

ভীমসিংহ সেই বেগগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া দ্রুতবেগে চিতোর দুর্গোপরি আরোহণ করিলেন। তিনি দুর্গমধ্যে প্রবিষ্ট হইবামাত্র দুর্গ-দ্বার রুদ্ধ হইল। চিতোরের বীরচূড়ামণিগণ দুর্গদ্বারের বাহিরে গিয়া অনুসরণকারিণী যবন-সেনার গতিরোধ করিলেন। বীরবর গোরা ও তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র বীরচূড়ামণি বাদল এই ক্ষত্রবীরবৃন্দের

অধিনেতা হইয়া অদ্ভুত রণনৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। আজ রাণা ভীমসিংহের উদ্ধার ও রাজ্ঞী পদ্মিনীর সম্মানরক্ষা—তাঁহাদের হৃদয়ের প্রিয়তম সঙ্কল্পদ্বয় সাধিত হইয়াছে। এখন আর জীবনে তাঁহাদের মমতা নাই। যাঁহার জীবনে মমতা নাই, যাঁহার প্রাণ স্বজাতির ও স্বদেশের গৌরবরক্ষার জন্য উৎসর্গীকৃত হইয়াছে, তাঁহার গতিরোধ করে কাহার সাধ্য? আজ এই উৎসর্গীকৃতপ্রাণ বীরবৃন্দের করাল অসিমুখে অসংখ্য যবনসৈন্য নিহত হইতে লগিল। কিন্তু দুর্দ্দান্ত রণোন্মত্ত যবনসৈন্য কিছুতেই নিরস্ত হইবার নহে। এক দল নিহত হইল, অমনি আর এক দল যবনসৈন্য আসিয়া তাহাদের স্থল অধিকার করিল। এইরূপ নিরন্তর আক্রমণে রাজপুত সৈন্য ক্রমেই ক্ষীণবল হইতে লাগিল। রাজপুত সৈন্য ক্রমেই ক্ষীণবল হইতে লাগিল বটে, কিন্তু রাজপুততেজ কিছুতে নির্ব্বাপিত হইবার নহে। এক প্রবয়াঃ গোরা ও এক দ্বাদশবর্ষীয় বালক বাদলের অদ্ভুত বীরত্ব দেখিয়া আলাউদ্দিন চমকিত হইলেন। তিনি বুঝিলেন, একটি রাজপুত জীবিত থাকিতে তাঁহাকে সহজে দুর্গ দখল দিবে না। সুতরং আর স্ববল ক্ষয় করা উচিত নয় মনে করিয়া তিনি প্রত্যভিযানের অনুমতি প্রদান করিলেন। আজ গোরা ও বাদল এবং তাঁহাদের অনুগামী রাজপুতগণের অতিমানুষ আত্মোৎসর্গে রাণার উদ্ধার ও রাণী পদ্মিনীর সতীত্বরক্ষা হইল। আজ মিবারের বীরচূড়ামণিকুলের অর্দ্ধেকের রুধিরে চিতোরের স্বাধীনতা ক্রীত হইল। আজ রাজপুত বীর্য্যে আর্য্য গৌরব-রবি যবন-রাহুর গ্রাস হইতে রক্ষা পাইল।

দ্বাদশবর্ষীয় বালক বাদল রণজয়ী হইয়া হতদেহে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু তদীয় খুল্লতাত গোরা, নিজের জীবনের বিনিময়ে ভ্রাতুষ্পুত্রীর সম্মান রক্ষা ও ভ্রাতৃজামাতার উদ্ধারসাধন করিয়া রণস্থলে শায়িত রহিলেন। বালক গৃহে একাকী ফিরিয়া আসিলে তদীয় খুল্লতাত-পত্নী উন্মত্তার ন্যায় হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রাণাধিক বাদল বল বল, তোমার খুল্লতাত কেমন যুদ্ধ করিলেন?" রাজপুত-রমণী স্বামীর জীবন অপেক্ষা তাঁহার গৌরবকে অধিকতর আদর করিতেন, তাই আজ গোরা-পত্নী স্বামীর মৃত্যু-শোকে অধীরা না হইয়া রণস্থলে তিনি বীরোচিত আচরণ করিয়াছিলেন কি না, কেবল তাহাই জানিতে চাহিলেন। বীর বালক বাদলও তাঁহার আশানুরূপ উত্তর প্রদান করিলেন—বলিলেন, "মাতঃ! এ যুদ্ধক্ষেত্রের শত্রুরাজির তিনিই প্রধান কর্ত্তনকারী। তদীয় করাল অসি যাহা কাটিতে লাগিল, আমি কেবল তদনুগামী হইয়া কেবল কুড়াইতে কুড়াইতে চলিলাম। সেই রুধিরময় গৌরব-শয্যার উপর তিনি শত্রুদেহরূপ বিচিত্র আস্তরণ বিস্তারিত করিলেন। এক যবনরাজকে সেই শয্যার উপাধান করিবার জন্য তিনি নিজে তাঁহাকে ভূপাতিত করিলেন এবং শত্রু-মণ্ডলী পরিবেষ্টিত হইয়া সেই গৌরব-শয্যায় শয়ন করিয়া অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।" গোরাপত্নী ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন. "বল বাদল! আমার প্রাণপ্রিয় রণস্থলে আর কি কি করিলেন?" বাদল আবার উত্তর করিলেন, "জননি গো! তাঁহার বীরত্বের আর অধিক কি পরিচয় দিব? তিনি যুদ্ধস্থলে তাঁহার এমন এক জন শত্রু রাখিয়া যান নাই যে, সে তাঁহার ভয়ে ভীত হইবে, বা তাঁহার বীরত্বের প্রসংসা করিবে।" রাজপুতসতী তখন তৃপ্ত হইলেন এবং ঈষৎ হাসিয়া বাদলের নিকট বিদায় লইয়া বলিলেন—"বাদল! আমি চলিলাম, আর বিলম্ব করিলে আমার প্রভু আমায় তিরস্কার করিবেন।" এই বলিয়া বাদলের নিকট বিদায় লইয়া সেই স্বর্ণ-প্রতিমা রণস্থলে গিয়া স্বামীর মৃতদেহ ক্রোড়ে লইয়া জলন্ত চিতায় আরোহণ করিলেন। সেই অনলে পুড়িয়া সতী পতিসহ বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন। আর সেই পবিত্র চিতাভস্মে ভারতবক্ষ পূত হইল! কি অদ্ভুত সতীত্ব ও অলৌকিক আত্মোৎসর্গ!

পুনর্ব্বার চিতোর আক্রমণ

নরাধম আলাউদ্দীনের পদ্মিনী-পিপাসা নিবৃত্ত হইবার নহে। যবন-সম্রাট উপচিত-বল হইয়া আবার (১৩৪৬ শকে—১২৯০ খৃষ্টাব্দে) চিতোর আক্রমণ করিলেন। মিবারবাসিগণ এখনও পূর্ব্বের

ধাক্কা সামলাইয়া উঠিতে পারেন নাই। মিবারের বীরবৃন্দের অর্দ্ধেক পূর্ব্ব-সমরে নিহত হইয়াছিলেন। এখনও মিবার সেই শোকাভিভূতি হইতে সম্যক্ উঠিতে পারে নাই। সুতরাং আলাউদ্দীনের পুনরাগমনে রাজপুতগণ ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া প'ড়লেন। বিষাদমেঘে মিবারগগন সহসা সমাচ্ছন্ন হইল। এই স্তম্ভিত অবস্থায় অল্প বাধায় আলাউদ্দীন চিতোরগিরির দক্ষিণকেন্দ্র দখল করিয়া ফেলিলেন ও পরিখাখনন দ্বারা আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

সমস্ত দিবস সংগ্রামের পর ক্লান্ত হইয়া রাণা লক্ষ্মী পর্য্যঙ্কে শয়ন করিবেন। গভীর চিন্তায় নিদ্রা পরিহৃত হইল। তিনি এই আসন্ন বিপদে তদীয় দ্বাদশ পুত্রের মধ্যে অন্ততঃ এক জনকে কিরূপে রক্ষা করিবেন, ইহাই ভাবিতে লাগিলেন—এমন সময় "মীন্ ভুখা হো !" (আমি ক্ষুধাতুরা হইয়াছি) এই শব্দ সহসা তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল। দীপশিখা মিটি-মিটি জ্বলিতেছিল,—তিনি সেই ক্ষীণ দীপালোকে দেখিতে পাইলেন যে, চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীমূর্ত্তি স্তম্ভদ্বয়ের মধ্য দিয়া তদীয় পর্য্যঙ্কাভিমুখে আসিতেছেন। রাণা ভীত না হইয়া উত্তর করিলেন, "মা! আমার আত্মীয়-কুটুম্বের মধ্যে প্রায় অষ্ট সহস্র জন গত সমরে আপনার নিকট বলি পড়িয়াছে, তথাপিও কি আপনার রুধির-পিপাসা মিটে নাই ?" দেবী উত্তর করিলেন—"আমি রাজবলির প্রার্থিনী, যদি দ্বাদশ জন মুকুটধারী রাজা চিতোর-রক্ষার জন্য বলি না পড়েন, তাহা হইলে মিবার-রাজ্য অন্য অন্য রাজবংশে গত হইবে।" দেবীমূর্ত্তি এই কথা বলিয়াই অন্তর্হিতা হইলেন।

চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা

প্রত্যূষে রাণা লক্ষ্মী উঠিয়াই সামন্তসভা আহ্বান করিলেন এবং সামন্তবর্গকে গত রাত্রির দেবী আবির্ভাব-বৃত্তান্ত জানাইলেন। সামন্তবর্গ বলিলেন যে, "ইহা চিন্তাকুলিত ব্যক্তির বিপর্য্যস্ত কল্পনায় স্বপ্নদর্শন মাত্র।" কিন্তু রাণা এই কথায় পরিতৃপ্ত হইলেন না। তিনি সামন্তবর্গকে রজনীতে তদীয় শয়নাগারে উপস্থিত হইতে বলিলেন। তাঁহারা যথাসময়ে তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং দেবীমূর্ত্তিও নির্দ্দিষ্ট সময়ে আবার আবির্ভূতা হইলেন। আবার তিনি পূর্ব্বরাত্রির সমস্ত কথা পুনরুক্ত করিলেন, বলিলেন, তাঁহার আদেশ প্রতিপালিত না হইলে, তিনি কখনই তাঁহাদিগের মধ্যে থাকিবেন না। আরও বলিলেন—"যদিও সহস্র সহস্র যবনদেহে পৃথিবী আচ্ছন্ন হয়, তাহাতে আমার কি ? আমি ক্ষত্রিয়-রাজার রক্তপান করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। অতএব প্রতিদিন এক এক জন রাজকুমারকে রাজসিংহাসনে আসীন কর। সুবর্ণ-সূর্য্য-মণ্ডল-পরিশোভিত ছত্রে তাঁহার মস্তক সুশোভিত হউক; চামর দ্বারা তদীয় অঙ্গের ব্যজন-কার্য্য সম্পন্ন হউক; রাজদণ্ড তাঁহার শোভাবর্দ্ধন করুক এবং তিন দিন তাঁহার আদেশ দুর্লঙ্ঘ্য হউক। চতুর্থ দিবসে তাঁহাকে শত্রুসঙ্গে রণে অবতীর্ণ হইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণবিসর্জ্জন করিতে হইবে। তাহা হইলেই কেবল আমি চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইয়া থাকিতে পারি।"

সকলে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া দেবীর এই কঠোর আদেশ শুনিলেন। এতক্ষণে সকলের সন্দেহভঞ্জন হইল। সামন্তবর্গ—সকলেই রাজকুমারগণের সহিত আত্মোৎসর্গ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সকলেই একবাক্যে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, দেহে প্রাণ থাকিতে তাঁহারা রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া আসিবেন না।

আত্মোৎসর্গের প্রতিদ্বন্দ্বিতা

এ দিকে রাজকুমারগণের মধ্যে কে অগ্রে যাইবেন বলিয়া মহা আন্দোলন হইতে লাগিল। উর্শী জ্যেষ্ঠাধিকারক্রমে সর্ব্বাগ্রে আত্ম-বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার দাবী ন্যায়সঙ্গত বলিয়া সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকেই রাজা করা হইল। তিনি তিন দিবস কাল রাজসিংহাসন অলঙ্কৃত করিলেন। সুবর্ণ-সূর্য্য তিন দিন সুবর্ণময় কিরণমালায় তাঁহার অঙ্গ ভূষিত করিল, তিন দিন রাজদণ্ড তাঁহার দক্ষিণকরকে ভূষিত করিল। তিন দিন সকলেই অবনতমস্তকে তদীয় আদেশ পালন করিল। চতুর্থ দিবসে তিনি সদলে সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়া

রাজ-সম্মানের সহিত জীবনবিসর্জন করিলেন। দ্বিতীয় রাজকুমার অজেয়শ্রী জ্যেষ্ঠের অনুগামী হইবার অধিকার চাহিলেন। কিন্তু তিনি পিতার সবিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন বলিয়া পিতা তাঁহাকে নিষেধ করিলেন। সুতরাং তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণকে অনুগামী হইতে অনুমতি দিলেন। এইরূপে একে একে একাদশ রাজকুমার দেবীর প্রীতিবিধানমানসে তিন দিন রাজত্ব করিয়া চতুর্থ দিবসে রণস্থলে আত্মবিসর্জন করিলেন। দ্বাদশ সংখ্যা পূরণ-করণ-মানসে রাণা লক্ষ্মী চিতোররক্ষার্থ আপনাকে বলি দিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি সামন্তবর্গকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগের সম্মুখে আত্মমনোরথ ব্যক্ত করিলেন। কিন্তু রাজার প্রাণোৎসর্গ করিবার পূর্ব্বে সেই ভীষণ জহর-প্রথার অনুষ্ঠান চাই। চিতোরের মহিলাকুল জীবিত থাকিতে রাজার আত্ম-আহুতি দিবার অধিকার নাই। অগ্রে চিতোরের সম্ভ্রান্ত ললনাগণ অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া আত্ম-সম্মান রক্ষা করিবেন, তাহার পর রাজা সামন্তবর্গসহ আত্মআহুতি দিতে পাইবেন।

পদ্মিনী সহ চিতোরের মহিলাগণের অগ্নি প্রবেশ

ঐ দেখ, ভূমধ্যস্থ অসূর্য্যম্পশ্য গৃহে এক প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত হইয়াছে। ঐ দেখ, একে একে চিতোরের সমস্ত সম্ভ্রান্ত মহিলা তদভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। ঐ যে মুকুট-শোভিত-শির সোনার প্রতিমাখানি আগে আগে চলিতেছেন, উনিই চিতোরের রাজমহিষী রাণা লক্ষ্মীর সহধর্ম্মিণী। আর ঐ যে রূপে জগৎ আলোকিত করিয়া সঞ্চারিণী সৌদামিনীর ন্যায় রমণীরত্ন সর্ব্বপশ্চাতে যাইতেছেন, উনিই সেই পদ্মিনী সতী, যাহার রূপে পাগল হইয়া সম্রাট্ আলাউদ্দীন আজ চিতোরের পূর্ণধ্বংস করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। জগতে যাহা কিছু বরণীয়, যাহা কিছু কমনীয়, যাহা কিছু অতুলনীয়, যাহা কিছু মাধুর্য্যময়, সেই সমস্তের আধার এই চিতোর-সুন্দরীগণ সেই ভূগর্ভস্থ গৃহে উপস্থিত হইবামাত্র সেই বিশাল অগ্নিকুণ্ডের উপরিতন আচ্ছাদন উদ্ঘাটিত হইল। অমনি সেই সতী-কুল সেই উদ্ঘাটিত অগ্নিকুণ্ডে ঝম্প প্রদান করিলেন। সেই উদ্ঘাটিত ঢাকন নিমেষমধ্যে তাঁহাদিগের উপর পতিত হইল। তাঁহারা সর্ব্বসংহারী বিশ্বাবসুর ক্রোড়ে গিয়া যবনের অত্যাচার হইতে আত্ম-সম্মান রক্ষা করিলেন। ঐ দেখ, সেই ভূগর্ভস্থ গৃহ হইতে ভস্মরাশি ও ধূমপুঞ্জ উদ্গীরিত হইয়া জগতের অসারতা জানাইতেছে। আলাউদ্দীন! তুমি যাঁহার সৌন্দর্য্যে অন্ধ হইয়া আজ স্বর্ণপুরী চিতোরনগরীকে ভস্মস্তূপে পরিণত করিলে, ঐ দেখ, সেই সৌন্দর্য্যময়ী তোমায় ফাঁকি দিয়া আজ বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন। ঐ দেখ, দীনবন্ধু হরি স্বয়ং সারথি হইয়া অগ্নিময় রথে তুলিয়া চিতোর-সুন্দরীকে সঙ্গিনীগণসহ বৈজয়ন্ত-ধামে লইয়া গেলেন। ঐ শুন, তাঁহাদের সম্মানার্থ তথায় দুন্দুভিধ্বনি হইতেছে।

অজেয়শ্রীর প্রস্থান ও রাণার আত্মবিসর্জ্জন

এক্ষণে একমাত্র জীবিত পুত্র অজেয়শ্রীর সহিত পিতার আত্ম-বিসর্জ্জন লইয়া বিবাদ আরম্ভ হইল। শেষে পুত্রকে পিতার আগ্রহাতিশয়ের নিকট মস্তক অবনত করিতে হইল। অজেয়শ্রী পিতার আদেশানুসারে বীরবৃন্দসহ যবনব্যূহ ভেদ করিয়া অক্ষতশরীরে কৈলবারা নগরে নিরাপদে গিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। বংশরক্ষা হইল দেখিয়া রাণা এক্ষণে নিশ্চিন্তমনে আত্ম-বলি দিতে প্রস্তুত হইলেন। পত্নী, ভগিনী ও কন্যাগণের মৃত্যুতে তদীয় সামন্তবর্গ জীবনে মমতাশূন্য হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহারাও রাণার সহিত প্রাণোৎসর্গ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। উৎসর্গীকৃতপ্রাণ সেই বীরদল দুর্গদ্বার উদ্ঘাটন করিয়া সমতল ক্ষেত্রে আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহাদিগের করাল অসির সম্মুখে যে আসিতে লাগিল, সেই শমন-সদনে প্রেরিত হইতে লাগিল। যেমন মত্ত মাতঙ্গকুল বনস্পতিগণকে বিদলিত, উৎপাটিত ও উন্মূলিত করে, সেইরূপ সেই রণোন্মত্ত বীরবৃন্দ যবনকুল উন্মূলিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই অকূল সেনাসাগরকে বিশোষিত করা এই নগণ্য বীরদলের পক্ষে অসম্ভব। এই ক্ষীণা ক্ষত্র-স্রোতস্বিনী সেই যবন-সেনাসাগরকে তরঙ্গতাড়িত করিতে করিতে ক্রমে তাহাতে বিলীন হইয়া গেল।

ক্ষত্রবহ্নি যবনসাগরের জলে নির্ব্বাপিত হইল। এত দিনে চিতোর নিষ্প্রদীপ হইল! চিতোর নগরীতে একটি বাতী জালিবার জন্যও একটি লোক রহিল না। যবন-সম্রাট অচেতনপুরী দখল করিলেন! যে সৌন্দর্য্যের মোহে তিনি এই লোমহর্ষণ ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিলেন, সেই সৌন্দর্য্যময়ীর চিতা-ভস্ম হইতে এখনও ধূম্রপুঞ্জ উদ্গারিত হইতেছে! তাঁহার কামনার বিষয় এখন ভস্মরাশিতে পরিণত হইয়াছে।

আলাউদ্দীন কর্ত্তৃক চিতোর গ্রহণ

সে ভীষণ স্থানে এখন যায়, কাহার সাধ্য? মানবচক্ষু আজও পর্য্যন্ত সে গহ্বরে প্রবেশ করে নাই। এক প্রকাণ্ড অজাগর সেই স্থানে প্রহরী হইয়া আজও দর্শকগণের গতিরোধ করিয়া আছে। যদি কোন নির্ভীক ভ্রমণকারী আলোক লইয়া সেই প্রগাঢ় তমসাচ্ছন্ন সতীকুণ্ড গমন করিতে উদ্যত হন, অমনি সেই অজাগর ফুৎকার দ্বারা সেই আলোক নির্ব্বাপিত করিয়া দেয়। সুতরাং সেই অবধি এই সতীকুণ্ড মানব-পদ দ্বারা কলঙ্কিত হয় নাই।

১৩০৩ খৃষ্টাব্দে এই বিখ্যাত নগরী আলাউদ্দীনের করতলস্থ হয়। যবনরাজ চিতোরের প্রতি বিন্দুতে রাজপুতের মৃতদেহ বিদলিত করিয়া পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অভীপ্সিত বিষয়ে বিফল মনোরথ হইয়া তিনি আরও উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। প্রাণিজগৎ কুক্ষিগত করিয়া তাহার পিপাসা মিটে নাই। তিনি এক্ষণে জড়জগতের উপর তাঁহার প্রতাপ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। চিতোরের অপূর্ব্ব মন্দির ও শিল্পকীর্ত্তিস্তম্ভ সকল তাঁহার আদেশে উন্মূলিত হইতে লাগিল। জড়-জগতে ও শিল্পরাজ্যে যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু মনোহর, সে সমস্তই তাহার আদেশে বিনষ্ট হইল। কেবল রাণা ভীম ও তদীয় পত্নী পদ্মিনী সতীর প্রাসাদ অক্ষুণ্ণ রহিল। সে পাষাণে এ কোমল ভাবের আবির্ভাব কেমন করিয়া হইল, জানি না। অবশেষে তিনি সেই ভগ্নপুরী যালোরপতি মল্লদেবের হস্তে সমর্পণ করিয়া সসৈন্যে নিজ রাজধানীতে চলিয়া আসিলেন। আজ অমরপুরী শ্মশানপুরীতে পরিণত হইল!

রাণা অজেয়শ্রী ও রাণা হামির

চিতোরের পুনরুদ্ধার।

রাণা অজেয়শ্রী কৈলবারা নগরে গিয়া পৌছিলেন। এই পার্ব্বত্য নগর আরাবলী গিরিমালার মধ্যভাগে অবস্থিত। আরাবলী গিরিমালা মিবারের পশ্চিম সীমা।—এই গিরিমালার সাহায্যেই মিবারের রাণাগণ দ্বাদশ শতাব্দী ধরিয়া আপনার স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। চতুর্দ্দিকে গিরিমালা-পরিবেষ্টিত, মধ্যে গিরিনির্ঝরিণীবৃন্দ-বিধৌত, ফলপুষ্প পরিশোভিত, শস্যশ্যামল ও শাদ্বল—এই অধিত্যকাপ্রদেশ যেন ইন্দ্রের নন্দন-কানন বলিয়া ভ্রমোৎপাদন করে। কাশ্মীরের নিম্নে ভারতের আর কোন স্থান এরূপ রমণীয় নহে। অজেয়শ্রী এই রম্য গুহাপ্রদেশে অনুগত সামন্তবর্গসহ ভবিষ্যৎ সুদিনের আশায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে রাজ্যাধিকারী করিয়া পিতা তাঁহাকে এই অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, তিনি শতবর্ষকাল রাজ্যভোগ করিয়া মৃত্যুকালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্রকে যেন রাজসিংহাসন দিয়া যান। অজেয়শ্রীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উর্শীর পুত্রের নাম হামির। অজেয়শ্রীর নিজ পুত্রগণ নিতান্ত অযোগ্য ছিলেন। এদিকে হামির বীর্য্যে ও মহাপ্রাণতায় অতিশয় খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। এই সকল কারণে অজেয়শ্রী তাঁহাকেই উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়াছিলেন। এই হামিরই চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করিবার জন্যই যেন জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহা দ্বারাই পিতৃপৈতামহিক রাজধানী চিতোর নগরী ও তদীয় বংশের লুপ্তগৌরব পুনরুদ্ধৃত হইবে। ইঁহার জন্ম ও আদি-জীবন বিচিত্র ঘটনাজালে পরিপূর্ণ। পাঠক! তোমার কৌতূহল নিবারিত করিবার জন্য আমরা সংক্ষেপে তাহা বর্ণনা করিতেছি। হামিরের পিতা উর্শী একদা কতিপয় যুবা সামন্ত-তনয় সমভিব্যাহারে ওন্দবা অরণ্যে মৃগয়ায় বিনির্গত হইয়াছিলেন। তাঁহারা একটি বন্য বরাহের অনুসরণ করিতে করিতে এক শস্যক্ষেত্রে আসিয়া পড়িলেন। তাঁহারা বরাহকে কিছুতেই ধরিতে পারিতেছেন না দেখিয়া এক বীরা রমণী তাঁহাদিগের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন। তিনি উক্ত শস্যের একটি ডাঁটা কাটিয়া তাহার অগ্রভাগ

দ্বারা শস্যক্ষেত্রমধ্যে বরাহের গতি নির্দ্দেশ করিতে লাগিলেন। এই শস্য প্রায় আট নয় হাত উচ্চ হইয়া থাকে। সুতরাং তিনি শস্য-রক্ষণ-মঞ্চের * উপর দণ্ডায়মান হইয়া বরাহের আবর্ত্তন স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তথাপি সম্ভ্রান্ত শীকারিগণ বরাহ বিদ্ধ করিতে পারিলেন না দেখিয়া তিনি স্বয়ং উহাকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগের সম্মুখে ঠেলিয়া লইয়া গেলেন, এবং বিদ্ধ বরাহকে রাজকুমারের সম্মুখে রাখিয়াই সহসা অন্তর্হিতা হইলেন। যেন বিদ্যুল্লতা সহসা নয়ন ঝলসিয়া গগনে বিলীন হইয়া গেল। যদিও রাজপুতগণ আপনাদের রমণীগণের এরূপ বীরত্ব সর্ব্বদা দেখিয়া থাকেন, তথাপি রাজকুমার ও তৎসহচরবৃন্দ সেই রমণীর এই অদীন পরাক্রমে বিস্মিত হইলেন। রমণীর শৌর্য্য, বীর্য্য ও রূপলাবণ্যে উর্শীর চিত্ত সবিশেষ আকৃষ্ট হইল। তিনি মনে মনে তাঁহাকে পত্নীত্বে বরণ করিলেন। আপাততঃ তাঁহার কোন উদ্দেশ না পাওয়ায় তাঁহারা সেই বন্য বরাহমাংস সমীপবর্ত্তিনী নির্ঝরিণীর তীরে লইয়া গিয়া পাক করিলেন, এবং পাক সমাপনান্তে সেই পূতমাংস ভক্ষণ করিলেন। আহারান্তে তাঁহারা সেই বীরা রমণীর শৌর্য্য-বীর্য্যের প্রশংসা করিতেছেন, এমন সময় সহসা ধনুঃপ্রক্ষিপ্ত একটি মৃন্ময় গুলী আসিয়া যুবরাজের অশ্বের একখানি পা ভগ্ন করিয়া ফেলিল। সকলে বিস্মিত ও চকিত হইয়া প্রথমে ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পরে যে দিক্ হইতে গুলী আসিল, সেই দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন, সেই বীরা রমণীই সেই ক্ষেত্র-রক্ষণ মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া ধনুকে গুলী যোজনা করিয়া বিহঙ্গমকুলের অত্যাচার হইতে সেই শস্যক্ষেত্রকে রক্ষা করিতেছেন। রমণী সেই সম্ভ্রান্ত যুবকগণের মুখভঙ্গীতে বুঝিতে পারিলেন যে, তাহাদিগের কোন অনিষ্ট হইয়াছে। তখন তিনি সেই উচ্চস্থান হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহাদিগের নিকট ক্ষতিকরণ জন্য ক্ষমা চাহিলেন। ক্ষমা চাহিয়াই রমণী দ্রুতপদে আবার সেই উচ্চস্থানে উঠিয়া নিজ কার্য্যে রত হইলেন। সম্ভ্রান্ত যুবকবৃন্দও আবার মৃগয়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। সমস্ত দিবস মৃগয়া করিয়া তাঁহারা যখন গৃহাভিমুখে গমন করিতেছেন, তখন আবার সেই রমণী তাঁহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু এবার অন্য মূর্ত্তিতে। তাঁহার মস্তকে দুগ্ধপূর্ণ ভাণ্ড ও দুই হস্তে দুই মহিষ-তাড়নদণ্ড এবং সেই তাড়ন-যষ্টিদ্বয়ের সম্মুখে দুই নবীন নধর মহিষ গম্যমান। যুবকবৃন্দের মনে সহসা একটি কৌতুক করিবার ইচ্ছা উদিত হইল। ইচ্ছা হইল যে, তাঁহারা দুগ্ধভাণ্ডটি ফেলিয়া দেন। এই অভিপ্রায়ে সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাঁহাদিগের একজন বেগে অশ্ব চালিত করিয়া রমণীর গাত্রে গিয়া ধাক্কা দিলেন। দুগ্ধভাণ্ড বিচলিত হওয়ায় কিঞ্চিৎ দুগ্ধ পড়িয়া গেল; কিন্তু রমণী কোন প্রকার বিরক্তি বা রাগ প্রকাশ না করিয়া একটি মহিষকে সঙ্কেত করিলেন। সুশিক্ষিত মহিষ সঙ্কেতমাত্রে শৃঙ্গে অশ্বের পা বাধাইয়া আরোহীকে ভূপাতিত করিল। রমণীর নির্ভীকতা, অবিচলিততা, শিক্ষাকৌশল ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখিয়া যুবকদল বিস্মিত হইলেন। যুবরাজ অনুসন্ধান দ্বারা জানিতে পারিলেন যে, রমণী চন্দনবংশীয় কোন দরিদ্র রাজপুতের কন্যা। চন্দনবংশ চোহানবংশের একটি শাখা। সুতরাং যুবরাজ বুঝিলেন, উক্ত কন্যা তাঁহার বিবাহযোগ্যা। এই পর্য্যন্ত জানিয়াই যুবরাজ সে দিন রাজধানী চলিয়া গেলেন।

পরদিন তিনি মৃগয়া-ব্যপদেশে আবার সেই প্রদেশে আগমন করিলেন, এবং আসিয়া উক্ত রমণীর পিতাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ক্ষত্রবর আসিয়া নির্ভীকচিত্তে ও স্বাধীনভাবে যুবরাজের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। যুবরাজের সহচরবৃন্দ ইহা দেখিয়া সবিশেষ কৌতুক করিতে লাগিলেন। যুবরাজ এই সুযোগে রমণীর পিতার নিকট তদীয় কন্যার পাণিগ্রহণের অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। তখন প্রবয়াঃ রাজপুত উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও তাঁহার প্রস্তাবে অস্বীকৃত হইয়া চলিয়া গেলেন। ইহাতে সকলে আরও বিস্মিত হইলেন। আজ মিবারের যুবরাজ একজন দরিদ্র রাজপুতের কন্যার পাণিগ্রহণাভিলাষী হইয়া প্রত্যাখ্যাত হইলেন। ইহা অপেক্ষা অধিকতর বিস্ময়ের বিষয় আর কি হইতে পারে?

* ক্ষেত্রের মধ্যভাগে চারিটি খোঁটা পুঁতিয়া তাহার উপর একটি মাচা বাঁধা হয়। এই মাচার উপর দাঁড়াইয়া ক্ষেত্রস্বামী বা তৎপুত্র বা তৎকন্যা বা তদীয় ভৃত্য ধনুর্হস্তে খেচর ও ভূচর জীবজন্তু হইতে ক্ষেত্র রক্ষা করিয়া থাকেন।

সকলেই এ রহস্যের মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু কেহই কিছু স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। এমন সময় সেই বৃদ্ধ রাজপুত আবার ফিরিয়া আসিলেন। তিনি বাটীতে গিয়া গৃহিণীকে সবিশেষ জ্ঞাত করায় তাঁহার নিকট অত্যন্ত তিরস্কৃত হইয়াছিলেন। "কত শত রাজ-কুমারী যাহার পাণিগ্রহণাভিলাষিণী হইয়াও ব্যর্থ-মনোরথ হইয়াছেন, আজ সেই মিবারের যুবরাজ স্বয়ং দরিদ্র রাজপুতের কন্যার পাণিগ্রহণাভিলাষী হইয়া দণ্ডায়মান, ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? তুমি এখনই গিয়া যুবরাজের সহিত কন্যার সম্বন্ধ স্থির কর। আমি তাঁহাকে কন্যা-সম্প্রদান করিব"—বুদ্ধিমতী পত্নীর এই তিরস্কারবাক্যে রাজপুতের চৈতন্য হইল। তিনি ফিরিয়া আসিয়া যুবরাজকে কন্যা সম্প্রদান করিতে স্বীকৃত হইলেন। উভয় পক্ষের সম্মতির পর যুবক যুবতী সেইখানেই পরিণীত হইলেন। নব-দম্পতী কিছুকাল তথায় অবস্থিতি করিয়া পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইলেন। পিতার বিনা অনুমতিতে বিবাহ করায় যুবরাজ নবপরিণীতা ভার্য্যাকে পিতৃসদনে লইয়া যাইতে সাহস করিলেন না। তিনি তাঁহাকে তদীয় পিত্রালয়ে রাখিয়া আসিলেন।

উভয়ের এই প্রেম-মিলনের ফল হামির জননী-সহ মাতামহালয়েই লালিত-পালিত হইতে লাগিলেন। রাণা লক্ষ্মী ঈষৎ বিরক্ত হইয়া হামির ও তদীয় জননীকে একেবারেই চিতোরে আনিলেন না। সুতরাং হামির বীরা জননীর আদেশেই গঠিত হইতে লাগিলেন। পিতা-মাতা যাঁহার বীরত্বের আদর্শ, তিনি যে বীর হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? যৎকালে চিতোর আলাউদ্দীন কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হয়, তখন হামিরের বয়স দ্বাদশ বৎসর মাত্র।

রাণা হামির

মুঞ্জামুণ্ডরক্তে তদীয় রাজটীকা।

চিতোরের পতনের পর মিবারের সমস্ত দুর্গগুলি ক্রমে ক্রমে দিল্লী-সম্রাটের সৈন্যে পরিপূরিত হইল। অজেয়শ্রী সুতরাং সেই গুহাপ্রদেশেই অবরুদ্ধ হইয়া রহিলেন। এদিকে সেই পার্ব্বত্যপ্রদেশের সামন্তগণের সহিতও তাঁহার বিবাদ বাধিয়া উঠিল। এই পার্ব্বত্য শত্রুগণের মধ্যে মুঞ্জাবলৈচা স্বয়ং সসৈন্যে সেই গুহাপ্রদেশে গিয়া রাণা অজেয়শ্রীর সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করেন, এই যুদ্ধে সেই অসুরবরের বর্শাঘাতে রাণার মস্তক ক্ষত-বিক্ষত হয়। রাণার দুই পুত্র—সুজনশ্রী ও অজিনশ্রী যদিও ক্রমান্বয়ে চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তথাপি এই সঙ্কটকালে ক্ষত্রিয়োচিত বলবীর্য্য দেখাইতে সমর্থ হন নাই। সুতরাং বিপৎকালে রাণা অজেয়শ্রী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার জ্যেষ্ঠ পুত্র বীরবর হামিরকে মাতামহালয় হইতে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। দ্বাদশবর্ষীয় ক্ষত্রিয় বালক আসিয়া খুল্লতাতের চরণ বন্দন করিলেন, এবং তাঁহার শত্রুর দর্প চূর্ণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। খুল্লতাতের নিকট বৈরনির্য্যাতনে প্রতিশ্রুত হইয়া বীরবর হামির শত্রু-রাজধানীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন, এবং অল্পদিনের মধ্যেই অশ্বপার্শ্বে মুঞ্জার মস্তক ঝুলাইতে ঝুলাইতে রাণার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাণার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক সেই মুঞ্জামুণ্ড রাণার চরণে অঞ্জলি প্রদান করিলেন এবং বলিলেন, "পিতঃ! এই আপনার শত্রু-মস্তক কি না, চিনিয়া লউন।" রাণা অজেয়শ্রী আনন্দোচ্ছ্বাসে অভিভূত হইয়া নীরবে ভ্রাতুষ্পুত্রের মুখচুম্বন করিলেন, এবং বুঝিলেন, বিধাতা তাঁহাকেই তদীয় উত্তরাধিকারী এবং মিবারের উদ্ধার-কর্ত্তা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। ইহা বুঝিয়া তিনি সেই রুধিরাক্ত শত্রু মুণ্ড হইতে রক্ত লইয়া হামিরের ললাটে অঙ্গুলি দ্বারা রাজচিহ্নস্বরূপ টীকা অঙ্কিত করিয়া দিলেন। এই কার্য্য দ্বারাই তিনি হামিরকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। এই ঘটনায় অজিনশ্রী ভগ্নহৃদয় হইয়া কৈলবারা নগরেই প্রাণত্যাগ করিলেন। পাছে জ্যেষ্ঠপুত্র সুজনশ্রী কোন এক অন্তর্ব্বিপ্লব উত্থাপিত করেন, এই ভয়ে রাণা অজেয়শ্রী তাঁহাকে দাক্ষিণাপথে প্রেরণ করিলেন *

---

* এই সুজনশ্রীই খ্যাতনামা সেতার রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা শিবজীর আদিপুরুষ।

অজেয়শ্রী ১। পুত্র ২। সুজনশ্রী। ৩। দিলীপজী। ৪। শিবজী। ৫। ভোরাজী। ৬। দেবরাজ। ৭। উগ্রসেন। ৮। মাহলজী ৯। খৈলুজী। ১০। জুঙ্কোজী। ১১। সত্যজী। ১২। শাম্ভজী। ১৩। শিবজী মহারাষ্ট্রীয় রাজ্যের স্থাপন-কর্ত্তা। ১৪। শাম্ভজী। ১৫। রামরাজা। ইহার পর এই রাজ্য পেশওয়াবংশে সংক্রামিত হয়।

রাণা হাম্মিরের অলৌকিক বীরত্ব

১৩৫৭ শকে বা ১৩০১ খৃষ্টাব্দে হাম্মির মিবারের রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। ভগবানের কৃপায় তিনি চতুঃষষ্টি বৎসর এই সিংহাসন অলঙ্কৃত করেন। তাঁহার এই সুবিস্তৃত রাজত্বকাল নিরন্তর শত্রু-বিমর্দ্দে অতিবাহিত হয়। তাঁহার অবিরাম যত্নে তদীয় দেশ অতীত শতাব্দীর ধ্বংস হইতে পূর্ণ উদ্ধৃত হইল। যে চিতোরনগরী হইতে তাঁহার খুল্লতাত তাড়িত হইয়া গিরিগুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, যে চিতোরনগরীতে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ নরমেধযজ্ঞে বলি পড়িয়াছিলেন, সেই চিতোরনগরীতে তদীয় পতাকা আবার সগর্ব্বে উড্ডীয়মান হইয়াছিল। যে মিবার রাজ্যের সমস্ত দুর্গ শত্রুহস্তগত হইয়াছিল, একে একে মিবারের সেই সমস্ত দুর্গ তাঁহার করতলস্থ হইয়াছিল। তাঁহার আহার ছিল না, নিদ্রা ছিল না, বিরাম ছিল না—এক স্বদেশের উদ্ধার-চিন্তায় তাঁহার দিন-যামিনী অতিবাহিত হইত। প্রবল যবনশক্তির সম্মুখে এই মহাপুরুষ কিরূপে অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলিলেন, তাহার সবিস্তর নিম্নে বর্ণিত হইতেছে।

মিবারের রাজপুতজাতির মধ্যে টীকা যৌতুক নামে একটি প্রথা বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে। এই প্রথা অনুসারে রাজটীকা পরার দিন নব রাণাকে টীকা-ধারণের পর কোন শত্রুরাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কোন অসাধারণ বীরত্বের কার্য্য করিতে হয়। যদি সীমান্তপ্রদেশে কোন শত্রু না থাকে, তাহা হইলে কোন উদাসীন রাজার সঙ্গে বিবাদ বাধাইয়াও কোন শৌর্য্য-বীর্য্যের কার্য্য অনুষ্ঠিত করিতে হয়। এই প্রথার বশবর্ত্তী হইয়া মিবারের রাণারা রাজ্যাভিষেকদিবসে সীমান্তপ্রদেশের রাজ্যে প্রবেশ করিয়া শত্রুদুর্গ অধিকার বা শত্রুনগর লুণ্ঠন করিয়া বিজয়লব্ধ দ্রব্যাদি সমভিব্যাহারে নিজ রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়া থাকেন। আজ নব রাণা হাম্মিরও এই প্রথানুসারে রাজচিহ্নস্বরূপ টীকাধারণের পর আনুযাত্রিক সহ বালেচ নামক অত্যাচারী রাজার রাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অতি অল্পসময়ের মধ্যে তাঁহার পসালিয়ো নামক গৈরিক দুর্গ অধিকার করিয়া নিজ ভবিষ্য-জীবনের নমুনা দেখাইলেন। সেই বালকের এই বীরত্ব দেখিয়া শত্রুমণ্ডলীর হৃদয় ভয়ে অভিভূত ও বন্ধুবর্গের মন আনন্দে উৎফুল্ল হইল। শত্রু-মিত্র সকলের নয়ন সেই নবোদিত সূর্য্যের দিকে যুগপৎ নিপতিত হইল।

হাম্মিরের গেরিলা যুদ্ধ-প্রণালী

অজয়সিংহের স্বর্গারোহণের পর হইতেই বীরবর হাম্মিরকে যে অসি নিষ্কোষিত করিতে হইয়াছিল, তাঁহার জীবিতকালে সে অসি আর স্বকোষে প্রবিষ্ট হয় নাই। মালদেব এই সময় চিতোরের দুর্গেই অবস্থিত আছেন; এবং মিবারের অন্যান্য দুর্গে যবন-সৈন্য অবস্থিতি করিতেছে। হাম্মির দেখিলেন, পিতৃপৈতামহিক রাজ্যের ভিতরে পদার্পণ করা দুঃসাধ্য। কিন্তু স্বদেশের উদ্ধারব্রতে উৎসর্গীকৃত প্রাণ বীরের হৃদয়ে কখন ভয়ের সঞ্চার হয় না। তিনি এই আপাত-দর্শনে অসম্ভব কার্য্যে নির্ভীকচিত্তে প্রবৃত্ত হইলেন। সম্মুখ সংগ্রামে যবন-সেনার সম্মুখীন হইবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই দেখিয়া, তিনি গেরিলা বা অনিয়মিত যুদ্ধপ্রণালী অবলম্বন করিলেন। তাঁহারই আদর্শে ভবিষ্যতে প্রতাপও এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তিনি অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া মিবারের সমতল ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া সমস্ত ছারখার করিয়া দিয়া ঝটিতি অন্তর্হিত হইতে লাগিলেন। যবনসৈন্য সাজিয়া গুজিয়া রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তিনি তাহাদের গ্রাস হইতে পলায়ন করিতে লাগিলেন। তিনি মিবারের প্রজা-বৃন্দকে সমতল ক্ষেত্রে পরিত্যাগ করিয়া গৈরিক প্রদেশে গিয়া বসতি করিতে আদেশ দিলেন। যাহারা তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিতে অসম্মত হইতে লাগিল, তাহাদিগকে শত্রুসঙ্গে ধ্বংসপুরীতে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। তদীয় সৈন্যগণ অসংখ্য ক্ষুদ্রদলে বিভক্ত হইয়া গুপ্ত স্থান হইতে সহসা বিনির্গত হইয়া সম্মুখে যাহা পাইতে লাগিল, তাহাই লুঠপাট করিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। এইরূপে মিবারের পথ, ঘাট, মাঠ পথিকগণের অগম্য হইয়া উঠিল। উক্ত সৈন্যদলগুলি আরাবলী গিরিমালার নিভৃত গুহাপ্রদেশ হইতে বহির্গত হইয়া মিবারের সমতল ক্ষেত্রে ধ্বংস-বিস্তার করিয়া তীরবেগে আবার সেই সূর্য্যেরও অগম্য স্থানে আসিয়া লুক্কায়িত হইয়া

থাকিত। যবন-সেনা এইরূপ অতর্কিত আক্রমণে নিরন্তর অনুসরণে ক্রমে ক্লান্ত ও হতাশ হইয়া পড়িল। ক্রমে তাহারা অনুসরণ হইতে নিবৃত্ত হইতে লাগিল এবং অবশেষে হঠাৎ আক্রমণকারীদিগের ভয়ে তাহারা দুর্গের বাহিরে যাওয়া বন্ধ করিল। প্রজাবৃন্দ অবশেষে নিরুপায় হইয়া গৃহ ও ক্ষেত্রের মমতায় জলাঞ্জলি দিয়া সপরিবারে সেই আরাবলীর গুহাপ্রদেশে গিয়া আশ্রয় লইতে লাগিল। কৈলবারা নগরী ক্রমে ইন্দ্রের অমরাবতীতে পরিণত হইল। এ দিকে স্বর্ণ-রাজ্য মিবার ক্রমে মরুভূমিতে পরিণত হইল। আজ হামির নিজ রাজ্যকে বিধ্বস্ত করিয়া প্রজাবৃন্দ-সহ যেমন দুর্গম গিরিগুহায় আশ্রয় লইলেন এবং তথা হইতে সুবিধামত সমতলক্ষেত্রে নামিয়া যেমন শত্রুগণকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিতে লাগিলেন, এইরূপ গেরিলা-যুদ্ধ-প্রণালী দশম শতাব্দীতে গজনীপতি মামুদের ভারত-আক্রমণ হইতে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে শেষ দিল্লীর সম্রাট্ মহম্মদ পর্য্যন্ত —সমস্ত যাবনিক কালে হিন্দুরাজগণকর্ত্তৃক অবলম্বিত হইয়া আসিতেছিল। যাহারা যবনের অধীনতা স্বীকার করিয়া স্বাধীনতা মহারত্নে বঞ্চিত হইলেন, তাঁহারা একপ্রকার আপাত সুখে কাল কাটাইতে লাগিলেন, কিন্তু যাহারা স্বাধীনতা-ধনকে প্রাণাপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান্ বোধ করিলেন, তাঁহাদিগের জীবন এইরূপে নিরন্তর শত্রু-সংঘর্ষে অতিবাহিত হইতে লাগিল। স্বাধীনতার কণ্টকবিকীর্ণ পথ তাঁহাদিগের নিকটে পুষ্প-বিকীরিত বলিয়া বোধ হইল। নিরন্তর সমর তাঁহাদিগের নিকট প্রমোদ নৃত্য বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিল।

—

ভারতের মহাশক্তিচতুষ্টয়

এই নিরন্তর শবসাধনার ফলে ভারত ক্রমে ক্রমে চারিটি মহাশক্তি প্রাদুর্ভূত হয়। প্রথম রাজপুতানায় আর্য্যশক্তি, দ্বিতীয় আর্য্য ও অনার্য্য শক্তিদ্বিতয়সমবেত মহারাষ্ট্রে মহাশক্তি, তৃতীয় আর্য্য, অনার্য্য ও যবনশক্তি ত্রিতয়সমুদ্ভূত পঞ্চনদে মহামহিম শিখ-শক্তি, এবং চতুর্থ পূর্ব্বতন শক্তিত্রিতয়-সমবেত মহামহিমান্বিত সিপাহীশক্তি। রাজপুতানায় যে শক্তি যবনশক্তিকে দমিত করে, তাহা অবিমিশ্রিত আর্য্যশক্তি। কিন্তু মহারাষ্ট্রে ক্ষত্রিয়প্রবর মহাত্মা শিবজী যে শক্তি লইয়া যবন-শক্তির বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হন, তাহা আর্য্য ও অনার্য্য উভয় শক্তির সমবায়ে গঠিত এক মহাশক্তি। কারণ, শিবজী স্বয়ং মিবারের রাজবংশসমুদ্ভূত ছিলেন বটে এবং তদীয় বংশের চিরন্তন মন্ত্রিগণ প্রখ্যাতনামা পেশোয়াগণ ব্রাহ্মণ ছিলেন বটে, কিন্তু তদীয় ও তদ্বংশের বিখ্যাত সেনাপতিগণ অনেকেই অনার্য্যবংশসম্ভূত বা আর্য্য ও অনার্য্য উভয়বংশসম্ভূত ছিলেন। তৃতীয় মহাশক্তির স্রষ্টা গুরুগোবিন্দ সিংহ। তিনি স্বয়ং ক্ষত্রিয়বংশসম্ভূত ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি যে প্রলয়ঙ্করী মহাশক্তি প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন, তাহা আর্য্য, অনার্য্য ও যবনশক্তির সংমিশ্রণে গঠিত এক বিরাট্ শক্তি। এই মহাশক্তি একদিন যবন-শক্তিকে কুক্ষিগত করিয়া বিরাট মুখব্যাদান পূর্ব্বক ব্রিটন্ শক্তিকেও গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছিল। যে বিশ্বাসঘাতকতার কুহকজালে পড়িয়া আর্য্য-শক্তিমান একদিন যবনজালুকের হস্তগত হইয়াছিল, সেই বিশ্বাসঘাতকতার জালে বদ্ধ হইয়া শিখমহাশক্তিমীনও আজ ভারতের ভাগ্যদোষে শ্বেতজালুকের করতলস্থ হইয়াছে। আবার আর্য্য, অনার্য্য ও যবন-শক্তি সমবেত হইয়া যে সিপাহীরূপ মহাশক্তি উদ্ভূত হইল, বিধির নির্ব্বন্ধে সে শক্তিও ব্রিটন-শক্তির কুক্ষিগত হইল। সেই শক্তির অভাবে ভারত এখন প্রাণহারা হইয়া পড়িয়া আছে। ইন্দ্রপুরী যেন শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। বিদ্যুদ্ও যেন বেগশূন্য হইয়া ধরাতলে পতিত রহিয়াছে। সেই বিশ্বনিয়ন্তা ভগবানই জানেন, কবে তিনি এই অচেতনে চেতনা সঞ্চারিত করিবেন কবে তিনি এই নির্জ্জীব ভারতের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবেন ?

— —

মিবারের দুরবস্থা

এক্ষণে প্রকৃতের অনুসরণ করা যাউক। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হামির কৈলবারা নগরীতেই নিজ রাজধানী স্থাপন করেন। ক্রমে মিবারের সমতল ভূভাগ হইতে প্রজাবৃন্দ উঠিয়া আসিয়া এই রাজধানীতে বসতি করিতে লাগিল। কৈলবারার অবস্থান সর্ব্বাংশেই অতি সুন্দর। চতুর্দ্দিকে আরাবলী গিরিমালা ইহাকে যেন প্রাকারবেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছে। যে গুহাপথ দিয়া ইহাতে প্রবেশ

করিতে হয়, তাহা এত সংকীর্ণ যে, শত্রুসৈন্য তাহার ভিতর প্রবেশ করিতে সাহস করে না। কারণ, সেখানে সৈন্যের সংখ্যা-বাহুল্যে কোন ফলোদয় হইবে না। কৈলবারা উক্ত গিরিমালার পাদদেশে অবস্থিত। পাদদেশ ধরিয়া আর একটি অতি দুর্গম মহাপ্রদেশে প্রবেশ করা যায়। এই দুর্গমতর গুহা-প্রদেশে কমলমীর নগর অবস্থিত। এই দুই গুহা-প্রদেশের মধ্য দিয়া নির্ম্মলসলিলা নির্ঝরিণী সকল প্রবাহিত হইতেছে। ফলভরে অবনত বনস্পতিগণ ইহাদের সুষমা বর্দ্ধিত করিতেছে। সুন্দর শাদ্বল ক্ষেত্র সকলে গোমেষাদি চতুষ্পদগণ তৃণ ভক্ষণ করিতেছে। আরণ্য মহীরুহ সকল গৃহস্থগণকে ইন্ধন সংযোজিত করিতেছে। উর্ব্বর ও হলকৃষ্ট ক্ষেত্র সকল শস্য ও মূলে অধিবাসিবৃন্দের আহার যোজনা করিতেছে। গুহাপ্রদেশের বিস্তার পঞ্চাশ মাইলের অধিক। ইহা মিবারের সমতল ক্ষেত্র হইতে দুই শত পাদ এবং সাগরবক্ষ হইতে ত্রিসহস্র পাদ উচ্চে অবস্থিত। ইহাতে কর্ষণোপযোগী ভূমি যথেষ্ট আছে, তাহা হইতে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়। তদ্ভিন্ন মিবারের সমতল ক্ষেত্র, গুজরাটদেশ ও ভীলদিগের রাজ্য হইতে শস্যাদি আমদানী করিবার সুগম পথ আছে। সুতরাং অধিবাসিবৃন্দের কোন প্রকারই কষ্ট ছিল না। এ দিকে অনুকূল বন্ধু ভীলগণ হামিরকে যুদ্ধের সময় পঞ্চ সহস্র ধনুর্দ্ধর ও অপর্য্যাপ্ত খাদ্যসামগ্রী সংযোজন করিত এবং তাঁহারা যখন যুদ্ধার্থ সসৈন্যে সমতল ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন, তখন তাহারা তাঁহাদিগের পরিবারবর্গের রক্ষক হইয়া থাকিত। এদিকে প্রাচ্য অরণ্যানীমধ্যেও অনেক নিভৃত স্থান আছে, যথায় তাঁহারা বিপৎকালে আশ্রয় লইতে পারেন। কিন্তু আলাউদ্দীনের অনুসরণের বিরাম নাই। তিনি প্রতিনিয়তই হামিরের অনুসরণে ফিরিতেন। প্রত্যেক গিরিগুহা ও প্রত্যেক গিরিশৃঙ্গ এবং প্রত্যেক অরণ্যানী তিনি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁহার গুপ্তিস্থান আবিষ্কার করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

মল্লদেব কর্তৃক বিধবা কন্যা সম্প্রদান

এ দিকে মিবারের সমস্ত সমতল-ক্ষেত্র কর্ষণাভাবে নিবিড় জঙ্গলে পরিণত হইল। সমস্ত গৃহ অধিবাসি-বিরহে হিংস্র জন্তুগণের আবাসভূমি হইয়া উঠিল। হামিরের সৈন্যগণের লুণ্ঠন ভয়ে শিল্পবাণিজ্য পরিত্যক্ত হইল। মিবারের এই ঘোর দুর্দ্দশার সময় চিতোরের শাসনকর্ত্তা মল্লদেবের কন্যার সহিত হামিরের বিবাহের প্রস্তাব আসিল। হামিরের অমাত্য ও সামন্তবর্গ এই প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। তাঁহারা বুঝিলেন, হামিরকে কোন বিপজ্জালে জড়িত করিবার অভিপ্রায়ে, অথবা তাঁহাকে চিতোরে লইয়া গিয়া কোনপ্রকারে অপমানিত করিবার উদ্দেশে এই ষড়যন্ত্র হইয়াছে। ইহা বুঝিয়া তাঁহারা রাণাকে এই প্রস্তাবে সম্মত হইতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু বীরের হৃদয় ভীতির অগম্য। চিতোরের নামে হামিরের মন নৃত্য করিত। তিনি এই উপলক্ষে সেই পিতৃপৈতামহিক রাজধানীতে একবার পদার্পণ করিয়া জীবনের সাধ মিটাইবেন এবং যদি সুবিধা করিতে পারেন, ইহা পুনরধিকৃত করিতে চেষ্টা করিবেন, এই আশায় সমস্ত বিপদ তুচ্ছ জ্ঞান করিলেন। বিবাহের প্রস্তাব করিয়া সম্বন্ধের যৌতুকস্বরূপ যে নারিকেল প্রেরিত হইয়াছিল, তিনি তাহা রাখিতে আদেশ দিলেন। দূতেরা প্রস্তাব গৃহীত হইল জানিয়া চলিয়া গেল।

তাহার পর হামির অমাত্য ও সামন্তবর্গকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে—"চিতোরে যে প্রস্তরময় সোপানাবলী আমার পূর্ব্বপুরুষগণের চরণরেণুতে পূত হইয়াছিল, আমি জীবনের মধ্যে একবার অন্ততঃ সেই সোপানাবলীতে পদার্পণ করিব। রাজপুতমাত্রেরই বিপদের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকা আবশ্যক। একদিন বা তাঁহাকে ক্ষত-বিক্ষত শরীরে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে; আবার আর একদিন হয় ত তাঁহাকে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া পুনরায় রাজসিংহাসনে বসিয়া মস্তকে রাজমুকুট ধারণ করিতে হইবে।" অমাত্য ও সামন্তবর্গ হামিরের এই সার-গর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া নীরব হইলেন, এবং প্রস্তাবিত বিবাহে আর বাধা দিলেন না।

মল্লদেব প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, পঞ্চশত অশ্বারোহী-সহ রাণাকে চিতোরে প্রবেশ করিতে হইবে। সেই প্রস্তাব অনুসারে হামির পঞ্চশতমাত্র অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া চিতোরযাত্রা করিলেন। তিনি চিতোর-দুর্গের দ্বারে উপস্থিত হইলে মল্লদেবের পঞ্চপুত্র তাঁহার সম্মানার্থ অগ্রবর্ত্তী হইয়া

তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু হামির দুর্গদ্বারের সম্মুখে বিবাহচিহ্নস্বরূপ কোন তোরণদ্বার নির্ম্মিত হয় নাই দেখিয়া বিস্মিত হইলেন ও মল্লদেবের পুত্রগণকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা যে উত্তর প্রদান করিলেন, তাহাতে হামিরের তৃপ্তিকর প্রতীতি জন্মিল না। ইহার অভ্যন্তরে কোন প্রকার বিশ্বাসঘাতকতা বিদ্যমান আছে, অনুমান করিয়াও হামির পশ্চাৎপদ হইলেন না। তিনি জীবনের মধ্যে এই প্রথম চিতোরদুর্গের ভিতর প্রবেশ করিলেন। কত কত ভাবতরঙ্গের ঘাতপ্রতিঘাতে আজ তাঁহার চিত্ত আকুল হইয়া উঠিল। যে বহুমর দালানে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ রাজদরবার করিতেন, সেই বিচিত্র ও প্রকাণ্ড দালানে আজ রাও মল্লদেব, তদীয় পুত্র বনবীর, ও অন্যান্য সন্তানগণ তাঁহাকে মহাসমাদরে গ্রহণ করিলেন। একে একে সকলেই তাঁহাকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করিলেন। পরস্পর অভিবাদনের পর পাত্র বিবাহ-সভায় আনীত হইলেন। কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক মন্ত্রপাঠ বা কোন প্রকার বৈবাহিক আচার অনুষ্ঠিত হইল না। কেবল মল্লদেব বরকন্যার গ্রন্থিবন্ধন ও পাণিসংযোজন * করিয়া পরিণয়কার্য্য সম্পাদন করিলেন। কুলপুরোহিত উভয়কে ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিলেন। নবদম্পতী বিবাহের পর এক নিভৃত ও নির্দ্দিষ্ট মন্দিরে গমন করিলেন। বিবাহসভাও ভঙ্গ হইল। হামির সেই নিভৃত মন্দিরে প্রবেশ করিয়া নবপরিণীতা ভার্য্যার নিকট অবগত হইলেন যে, তিনি মল্লদেবের বিধবা কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন। হামির এই সংবাদে ক্রোধে ও অপমানে অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু পত্নীর কাতর বচনে ও আশ্বাসে কথঞ্চিৎ ধৈর্য্য অবলম্বন করিলেন। এই পতিপ্রাণা রমণী অতি শৈশবে ভট্টিজাতীয় এক সামন্তের সহিত পরিণীতা হইয়াছিলেন; কিন্তু বিবাহের অব্যবহিত পরে তাঁহার স্বামী যুদ্ধে গিয়া প্রাণ হারান, সুতরাং সেই পূর্ব্বস্বামীর স্মৃতি পর্য্যন্তও তাঁহার অন্তর হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। আজ তিনি প্রাণ মন ও জীবন সমস্তই হামিরের চরণে উৎসর্গ করিলেন। আজ তিনি পতির জন্য পিতৃকুল বিসর্জ্জন দিলেন।

* গ্রন্থিবন্ধন অর্থাৎ গাঁইটছড়া বাঁধা এবং বরকন্যার পাণিমিলিত করার নাম পাণিসংযোজন।

এই পরিণয়ের ফল

পিতা তাঁহার পতির সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন বলিয়া তিনি পতির নিকট লজ্জিতা হইলেন ও তাহার জন্য ক্ষমা চাহিলেন। তিনি কিরূপে এই বিশ্বাসঘাতকতার পরিশোধ লইতে হইবে, স্বামীকে তাহার উপদেশ দিয়া স্বামীর অন্তর হইতে সমস্ত দুঃখ দূর করিলেন। তিনি বলিলেন, এই বিবাহ হইতেই তিনি ভবিষ্যতে চিতোর ও মিবার-রাজ্য লাভ করিতে পারিবেন। পত্নীর এই সান্ত্বনাবাক্যে হামির পরম পরিতোষলাভ করিলেন। পরিণয়ের যৌতুকস্বরূপ কোন বিশেষ অনুগ্রহ প্রার্থনা করার অধিকার আছে। আজ পত্নীর উপদেশমত হামির শ্বশুরের নিকট এই প্রার্থনা করিলেন যে, মেহতাবংশীয় জল নামক কর্ম্মচারীকে তাঁহাদের সহিত পাঠাইতে হইবে। শ্বশুর তাঁহার এই প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। নবদম্পতী এই বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ও সৈন্যগণসহ কৈলবারা দুর্গে গমন করিলেন। এক বৎসর পরে দম্পতীর সম্মিলনের ফলস্বরূপ কাবস্থ নামে এক পুত্র সন্তান জন্মিল। মালদেব এই শুভ ঘটনায় প্রীত হইয়া [illegible] প্রদেশ হামিরকে প্রত্যর্পণ করিলেন। পুত্র এক বৎসরবয়স্ক হইলে রাজমহিষী পিতা-মাতার নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি [illegible] জন্য চিতোরে গিয়া পুত্রকে দেব-মন্দিরে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন। পিতা মাতার অনুমতিক্রমে রাজমহিষী সেই শিশু-সন্তানকে ক্রোড়ে লইয়া পিতামাতা-কর্তৃক প্রেরিত আনুযাত্রিকসহ চিতোর-যাত্রা করিলেন। এই সময় মালদেব সসৈন্য মদিরা প্রদেশের অধিপতির বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। যে সকল লোকের উপর নগররক্ষার ভার ন্যস্ত ছিল, চিতোর প্রবেশ করিয়াই রাজনন্দিনী পূর্ব্বোক্ত মেহতা কর্ম্মচারীর সাহায্যে তাহাদিগকে হস্তগত করিলেন। এদিকে হামিরও সসৈন্য বাগোর নগরে সময় প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। সমস্ত প্রস্তুত হইয়াছে—পত্নীর নিকট হইতে এই সংবাদ আসিবামাত্র তিনি সসৈন্যে চিতোরাভিমুখে ধাবিত হইলেন। কিন্তু তিনি চিতোরে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই ষড়যন্ত্র প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং চিতোরদুর্গদ্বারে তাঁহার

গতি প্রতিহত হইল। কিন্তু সাগরাভিমুখিনী স্রোতস্বিনীর গতিরোধ করে, কাহার সাধ্য? হামির-বাহিত সেই ক্ষুদ্র সেনা প্রচণ্ডবেগে চিতোর-দুর্গমধ্যে লব্ধ-প্রবেশ হইল। বহুদিন পরে আবার সেই স্বর্ণ-সূর্য্য মণ্ডলা-পরিশোভিনী মিবারের রক্তধ্বজা চিতোরের দুর্গ-চূড়া হইতে উড়িতে লাগিল। সমস্ত বাধা সমস্ত বিপত্তি যেন কোথায় উড়িয়া গেল! আজ সমস্ত মিবারবাসী আনন্দে মত্ত হইয়া উঠিল। ক্রমে ক্রমে সামন্তগণ সকলেই আসিয়া রাণার নিকটে বশ্যতাসূচক শপথ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। হামিরের অনুগত প্রজাবৃন্দ এই শুভ সংবাদ শ্রবণমাত্র সেই গৈরিক আবাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপন আপন পরিত্যক্ত ভূমিতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। কমলমীর ও কৈলবারা নগরদ্বয় এবং আরাবলী গিরিমালার অধিত্যকা-প্রদেশ হইতে জনস্রোত অবিরাম প্রবাহিত হইতে লাগিল দেখিতে দেখিতে মিবারের পরিত্যক্ত সমতলভূমি পুনঃ জনপূর্ণ নগরমালা ধারণ করিল। মরুভূমি যেন স্বর্ণপুরীতে পরিণত হইল। যে সকল পথ-ঘাট এতদিন লুণ্ঠন-কারী সৈন্যগণের উপদ্রবে দিবসে পথিকগণের অগম্য ছিল, এখন সে সকল পথঘাট রজনীতেও লোকজনের গম্য হইয়া উঠিল। যে সকল পল্লী [illegible] হওয়াতে এতদিন হিংস্রজন্তুদিগের আবাস-স্থল হইয়াছিল, আবার সেই সকল স্থান জনতায় পরিপূর্ণ হইল। প্রত্যেক হিন্দুর হৃদয় যবনের দাসত্ব হইতে উন্মুক্ত হওয়ায় এই সুযোগে আনন্দ-নৃত্য করিতে লাগিল। এই ভাব সমস্ত মিবারবাসীর অন্তরে যেন তাড়িতবেগে সংক্রামিত হইল। প্রজাবৃন্দ হামিরের প্রতি এতদূর অনুরক্ত হইয়া উঠিলেন যে, মল্লদেব প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আর স্বনগরমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। তিনি নগরদ্বারে উপস্থিত হইবামাত্র প্রজাবৃন্দ গগন বিদারিয়া হামিরের জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। তখন মল্লদেব গত্যন্তর না দেখিয়া দিল্লীশ্বরের নিকট এই বার্ত্তার বাহক হইয়া চলিলেন। আলাউদ্দীন ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন এবং এক্ষণে মামুদ তদীয় সিংহাসন অধিকার করিয়াছেন। মামুদ পূর্ব্বেই সংবাদ পাইয়াছিলেন যে, হামির চিতোর দখল করিয়াও তৃপ্ত হয় নাই। ক্রমে ক্রমে মিবারের সমস্ত দুর্গগুলিও তাঁহার হস্তগত হইতেছে। এই সংবাদে তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া হামিরের বিরুদ্ধে রণসজ্জা করিতেছিলেন। এক্ষণে মল্লদেবের মুখে এই সংবাদ পাইয়া ইহার সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইলেন এবং ত্বরিতগতিতে মিবারাভিমুখে ধাবিত হইলেন। দিল্লীশ্বর অজ্ঞতাবশতঃ মিবারের পূর্ব্বসীমা ধরিয়া মিবাররাজ্যে প্রবেশ করিলেন। পূর্ব্বদিক দিয়া প্রবেশ করিতে হইলে সঙ্কীর্ণ গিরিপথ দিয়া গমন করিতে হয়। তথায় সৈন্যের সংখ্যাবাহুল্যে কোন ফলোদয় হয় না। এই সঙ্কীর্ণ গিরিপথ দিয়া দিল্লীশ্বর সিঙ্গোলী নামক স্থানে গিয়া সৈন্যাবাস সংস্থাপিত করিলেন। হামির এই সংবাদ পাইবামাত্র সসৈন্যে তথায় গিয়া উত্তীর্ণ হইয়া মামুদকে হঠাৎ আক্রমণ করিলেন। মামুদ এই আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, সুতরাং তিনি পরাজিত ও বন্দীভূত হইলেন। এই যুদ্ধে হামির বনবীরের ভ্রাতা হরিসিংহকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে হত করেন। হামির মামুদকে বন্দী করিয়া চিতোরে আনয়ন করিলেন। সমস্ত মিবারবাসী আজ মহানন্দে বিজয়োৎসব করিতে লাগিল। সকলেই সমস্বরে হামিরের যশোগান করিতে লাগিল। আজ যবনরাজ চিতোরে বন্দী! আজ সমস্ত মিবার যবনের দাসত্ব-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত! ইহা অপেক্ষা হিন্দুর অধিকতর আনন্দের বিষয় কি হইতে পারে?

মামুদ তিনমাসকাল চিতোরের দুর্গে কারাযন্ত্রণা ভোগ করিলেন। তিনি আত্মনিষ্ক্রয়স্বরূপ হামিরকে আজমীর, রিনথম্বোর, নাগোর ও সুশোপুর ছাড়িয়া দিলেন এবং যুদ্ধের ক্ষতিপূরণস্বরূপ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ও একশত হস্তী প্রদান করিলেন। মামুদ ভবিষ্যতে আর যাহাতে চিতোর আক্রমণ না করেন, তদ্বিষয়ে হামির কোন প্রতিশ্রুতি লইলেন না। বরং গর্ব্ব করিয়া বলিলেন যে, তাহা ঘটিলে তিনি চিতোর রক্ষা করিতে পারিবেন এবং এবার চিতোর-দুর্গের বাহিরে উভয়সৈন্যে যুদ্ধ ঘটিবে।

হামির ভারতের একমাত্র রাজচক্রবর্ত্তী

মল্লদেবের পুত্র বনবীর সিংহ হামিরের অধীনতা স্বীকার করিয়া তাঁহার সামন্তশ্রেণীভুক্ত হইলেন। তাঁহার ও রাজমহিষীর পিতৃকুলের অন্যান্য সম্পর্কীয়

আসিল। অধিক কি, ইহা দিল্লীর প্রাচীর পর্য্যন্ত গিয়া দিল্লীশ্বরকেও রণে পরাজিত করিল।

শিল্প ও স্থপতিবিদ্যার উন্নতি

মিবার যে দীর্ঘকাল সমৃদ্ধি ও শান্তি ভোগ করিয়াছিল—তাহার নিদর্শন ইহার সৌন্দর্য্যময়ী ও মহতী প্রাসাদাবলী ও অতুলনীয় দেবমন্দির-নিচয় ও কীর্ত্তিস্তম্ভমালা। এক একটি কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিতে এ রাজ্যের এক বৎসরের সমস্ত আয় ব্যয়িত হইয়া গিয়াছে। মিবারের বর্ত্তমান অবস্থায় রাজকোষ ভূমির দশ বৎসরের আয়েও এরূপ একটি কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মিত হইতে পারে না। চিতোরের ধ্বংসের পূর্ব্বের একটিমাত্র প্রাসাদ—ভীমসিংহ ও পদ্মিনীর বিলাস-গৃহ কেবল আলাউদ্দীন নষ্ট করেন নাই। উহা অদ্যাপি বিদ্যমান আছে ও লোক-সাধারণ চাঁদা করিয়া ইহার জীর্ণ-সংস্কার আদি করিয়া থাকেন।

মিবারের রাণাগণ শিল্প ও স্থপতিবিদ্যার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। কিরূপে তাঁহারা শুদ্ধ জমীর উপস্বত্বে এরূপ বহু-ব্যয়সাধ্য শিল্প ও স্থপতি-বিদ্যার কীর্ত্তিস্তম্ভ সকল বিনির্ম্মিত করিয়াও মহতী সেনা সকলের ব্যয়ভার বহন করিতেন, ইহা ভাবিলে বিস্ময়-রসে অভিভূত হইতে হয়। দীর্ঘকাল-ব্যাপিনী শান্তি ও সমৃদ্ধি এবং কমনীয় প্রজা-বৎসলতা গুণ ব্যতীত কে কখন এরূপ অসাধ্যসাধন করিয়া উঠিতে পারিতেন না। প্রজারা রাণাগণকে পিতৃ-সম মনে করিত বলিয়াই সামান্যমাত্র পারিশ্রমিক লইয়া ঐ অতুলনীয় কীর্ত্তিমালা বিনির্ম্মিত করিয়া দেওয়া গিয়াছিল। এই সকল সুরম্য হর্ম্ম্য, সুন্দর দেবালয় ও অতুলনীয় বিজয়-স্তম্ভ সকল মিবারের সর্ব্বত্র অদ্যাপি বিদ্যমান থাকিয়া রাজভক্ত প্রজা ও প্রজাবৎসল রাজা উভয়েরই মহিমা ঘোষণা করি-তেছে। পাঁচ-সহস্রগ্রাম-ক্রীত মহামতি মহাবীর হাম্বির পরিণত বয়সে সকলের পূজ্য হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। ১২৯১ শকে বা ১৩৬৫ খৃষ্টাব্দে এই দুর্ঘটনা ঘটে। সমস্ত মিবারবাসী আজ শোকে অভিভূত হইলেন। হিন্দুজগৎ আজ শোকতিমিরে নিমগ্ন হইল। সর্ব্বত্র হাহাকারধ্বনি উত্থিত। বিশ্ব-ব্যাপী আর্ত্তনাদে ভারত-গগন বিদীর্ণ হইল।

স্বদেশ-হিতৈষণা ও স্বজাতিপ্রেমে হাম্বিরের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারেন, প্রতাপ ব্যতীত রাজস্থানে এমন রাজা আর জন্মে নাই। বীরত্বে ও বিচক্ষণতায় বোধ হয়, প্রতাপও ইঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইবার যোগ্য নহেন। আজও মিবারবাসিগণ ইঁহাকেই মিবারের রাণা-গণের মধ্যে বীরত্বে ও বিজ্ঞতায় অদ্বিতীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। হাম্বির পুত্রপ্রবর কায়স্থীর হস্তে অতি বিশাল, সমৃদ্ধিশালী ও সুগঠিত রাজ্য অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্তমনে বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন।

কায়স্থীর সিংহাসনাধিরোহণ

১৪২১ শকে (১৩৬৫ খৃষ্টাব্দে) কায়স্থী পিতৃ-সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তিনি পিতার ন্যায় প্রভুশক্তিসম্পন্ন ও অত্যুদারচরিত ছিলেন। উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র পিতৃসিংহাসন অধিকার করায় প্রজাবৃন্দের অনুশোচনার আর কোন কারণ রহিল না। কায়স্থী সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াই অভিযানে বহির্গত হইলেন। বীর কখন শান্তিপ্রয়াসী নহেন। অভিযানে বহির্গত হইয়াই তিনি আজমীর ও জেহাজপুর লালাপাঠানের হস্ত হইতে কাড়িয়া লই-লেন; এবং মণ্ডলগড়, হুসোবা ও সমস্ত চপ্পন-প্রদেশ মিবারের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলেন। তিনি পিতার সুশিক্ষিত সেনা লইয়া বাকরোলে দিল্লীশ্বর হুমায়ুনের গতিরোধ করিলেন, এবং তাঁহাকে রণে পরাজিত করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিলেন। কিন্তু বিধাতা এই বীরকুলচূড়ামণিকে অধিক দিন মিবারসিংহাসন অলঙ্কৃত করিতে দিলেন না। ওদার অধীন সমস্ত বুনাওদা প্রদেশের অধিপতি হরসিংহের কন্যার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ স্থির হয়। সম্বন্ধ স্থির হওয়ার পর কোন অনির্দ্দিষ্ট কারণে তাঁহার সহিত বায়স্থীর মতান্তর উপস্থিত হয়। বিশ্বাসঘাতক হরসিংহ গুপ্তহত্যার দ্বারা ভাবী জামাতার প্রাণ সংহার করে। এইরূপে অল্পদিনের মধ্যে মিবার শোকা-নলে দগ্ধ হইল। কায়স্থীর শোচনীয় মৃত্যুতে মিবার বাসিগণ নিরতিশয় ব্যথিতহৃদয় হইলেন।

লক্ষ-রাণা

কাযস্থী গুপ্তহত্যায় হত হইলে লক্ষ রাণা ১৩৩১ শকে (১৩৮৩ খৃষ্টাব্দে) মিবারের রাজ-সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। লক্ষ রাণাও মিবার-সিংহাসনে আরোহণ করিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত পাত্র। তাহা না হইলে এ কীর্ত্তিমন্দিরে তিনি স্থান পাইতেন না। তিনি সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াই সর্ব্বপ্রথমেই মাড়ওয়ারা পার্ব্বত্যপ্রদেশকে মিবার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন; এবং ইহার সর্ব্বপ্রধান দুর্গ বিরাট্‌গড়কে সমভূমি করিয়া তদুপরি বেডনৌরনগর প্রতিষ্ঠাপিত করেন। কিন্তু রাজ্যের সীমা বৃদ্ধি ভিন্নও আর একটি ঘটনায় তাঁহার নাম মিবারে চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। কাযস্থী চম্পনের ভীলগণের নিকট হইতে যে প্রদেশ কাড়িয়া লইয়া নিজরাজ্যভুক্ত করেন, তথায় জাবুরা নামক একটি স্থান আছে। লক্ষ রাণার সূক্ষ্মদৃষ্টি তথায় সপ্তধাতুস্থ একটি খনি আবিষ্কৃত করিল। এই খনিতে সুবর্ণ, রজত, পারদ, তাম, সুরমা, সীসা ও টিন, এই সপ্ত ধাতু পাওয়া গেল। রাণা এই খনি খোদিত করার সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন। এই খনি হইতে যে ধাতু উঠিতে লাগিল, তাহাতে মিবারের সমৃদ্ধি অত্যন্ত বাড়িতে লাগিল। যদিও এখন ইহাতে সকল ধাতু পাওয়া যায় না, তথাপি এখনও পর্য্যন্ত এই খনি বিদ্যমান রহিয়াছে।

লক্ষ রাণা বীরত্বেও হামির ও তৎপুত্রের উত্তরাধিকারী হইবার যোগ্য ছিলেন। তিনি অম্বরের যুদ্ধে নাগরচলের * রাজপুতদিগকে পরাজিত করিলেন। তিনি দিল্লীর সম্রাট্ লোদীকেও আক্রমণ করিতে ভীত হন নাই। তিনি সেই বিজয়িনী সেনা লইয়া গয়া পর্য্যন্ত গমন করিলেন, এবং সেই পবিত্র তীর্থকে যবনশূন্য করিয়া সেই মহাতীর্থে ও মহাব্রতে আত্মবলি প্রদান করিলেন। রাণা এই পবিত্র যুদ্ধে হত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অপূর্ব্ব কীর্ত্তি অনন্ত কালের জন্য রহিয়া গেল।

তিনি শিল্প ও স্থপতিবিদ্যায় বিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন। স্বদেশের উপকারসাধন তাঁহার জীবনের মহাব্রত ছিল। অনেক বৃহৎ জলাধার ও হ্রদ তাঁহার আদেশে খনন করা হইয়াছিল। যে সকল পর্ব্বতসম মৃত্তিকাস্তূপে তিনি তাহাদের তীর বাঁধাইয়া দিয়াছিলেন, সে সকল অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। অনেক নব নব দুর্গ তাঁহার সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। জাবুরা খনির সমস্ত উপস্বত্ব তিনি আলাউদ্দীন-বিধ্বস্ত চিতোর-নগরীর সৌধমালার পুনঃনির্ম্মাণে ব্যয়িত করিয়াছিলেন। তদীয় প্রাসাদের কিয়দংশ অদ্যাপি দর্শকগণের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। এই প্রাসাদ, প্রাচীন জৈন-রত্নমন্দির ও পদ্মিনীমহলের আদর্শে গঠিত। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মের নামে একটি মন্দির তুলিয়াছিলেন। এরূপ সুবিশাল ও বহুব্যয়সাধ্য মন্দির জগতে অতি বিরল। ইহা অদ্যাপি বিদ্যমান থাকিয়া তাঁহার অক্ষয়কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে।

রাণা লক্ষের পুত্রগণ

রাণা লক্ষের অনেকগুলি পুত্রসন্তান জন্মিয়াছিল। তন্মধ্যে চন্দ, রঘুদেব, লুন ও দুল, এবং মুকুলজী প্রধান। চন্দ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। চন্দ হইতে চন্দাবত, লুন হইতে লুনাবত, এবং দুল হইতে দুলাবত—এই তিনটি রাজপুতবংশ উৎপন্ন হইয়াছে। একটি অদ্ভুত ঘটনায় চন্দ নিজের জ্যেষ্ঠাধিকার হইতে স্বেচ্ছা-বঞ্চিত হন। হৃদয়ের মাহাত্ম্যে চন্দ ভীষ্মদেব ও রামচন্দ্রের শ্রেণীভুক্ত হইবার যোগ্য ছিলেন। যে ঘটনায় তিনি আপন ইচ্ছায় চিতোরের রাজসিংহাসনের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া পিতৃভক্তি ও আত্মোৎসর্গের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা নিম্নে বিবৃত হইল। স্ত্রীজাতির সম্মানরক্ষা যদি সভ্যতার প্রধান অঙ্গ হয়, তাহা হইলে এ বিষয়ে রাজপুতগণ সভ্যতামঞ্চের সর্ব্বোচ্চ সোপান অধিকার করিবার যোগ্য। স্ত্রীলোকের যাহাতে লজ্জাশীলতার ব্যাঘাত হয়, স্ত্রীলোকের যাহাতে মানহানি হয়, রাজপুত কখন এমন কার্য্য করিবেন না; এবং কেহ করিলে রাজপুতের নিকট তাহা মার্জ্জনীয় নহে। অধিক কি, কোন রাজপুত-রমণীকে লক্ষ্য করিয়া যদি কেহ সামান্য পরিহাস-বিদ্রূপ করেন, তাহাও রাজপুতের অসহনীয়। এই রমণী-সম্মান অক্ষত রাখিতে গিয়া রাজপুতবংশ সকল পরস্পর সংঘর্ষে আত্মঘাতী

---

* ঝুন্ ঝুনু, সিংঘানা, ও নর্ব্বান—এই তিনটি স্থান লইয়া নাগরচল রাজ্য সংগঠিত ছিল।

হইয়াই মোগল বা মহারাষ্ট্রীয়গণের রাজপুতানা আক্রমণের পথ পরিষ্কৃত করিয়া দেয়।

যুবরাজ চন্দ

রাণা লক্ষ বয়োবৃদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহার পুত্র-পৌত্রগণ স্ব স্ব রাজ্যে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছেন, এমন সময়ে একদিন মারওয়ারাধিপতি বিনমূলের কন্যার সহিত যুবরাজ চন্দের বিবাহের সম্বন্ধসূচক নারিকেল লইয়া এক দূত উপস্থিত হইলেন। রাণা লক্ষ পাত্রমিত্র-পরিবেষ্টিত হইয়া রাজসিংহাসনে বসিয়াছিলেন, এমন সময়ে দূতবরের আগমন-বার্ত্তা রাজ-সকাশে বিজ্ঞাপিত হইল। রাজাদেশে দূত রাজসমীপে নীত হইলে রাজা তাঁহাকে মহাসমাদরে গ্রহণ করিলেন। যুবরাজ চন্দ তৎকালে স্থানান্তরে গিয়াছিলেন; সুতরাং রাণা বলিলেন, "দূতবর! যুবরাজ এখনই প্রত্যাবৃত্ত হইয়া মারওয়ারাধিপতি প্রেরিত নারিকেল গ্রহণ করিবেন।" রাণা অঙ্গুলিনিচয় শ্মশ্রুরাজিমধ্যে পরিবেশিত করিয়া আরও বলিলেন, "দূতবর! বোধ হয় তোমার রাজা আমার মত ধবলশ্মশ্রু প্রবয়াঃ নরপতির জন্য এরূপ ক্রীড়নক প্রেরণ করেন নাই।" রাজার এই পরিহাসোক্তিতে পারিষদ ও দূত সকলেই হাসিয়া উঠিলেন, এবং সকলেই ইহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু যুবরাজ চন্দ প্রত্যাবৃত্ত হইয়া যখন এরূপ পরিহাসোক্তি শুনিলেন, তখন পিতার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং যে বিবাহ-যৌতুকের জন্য পরিহাসচ্ছলেও পিতা লালসা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। এ বিবাহ যৌতুক ফিরাইয়া দিলে মারোয়ারাধিপতি বিনমল অতিশয় অপমানিত হইবেন এবং তাঁহার সহিত সমর অনিবার্য্য হইবে, এই বলিয়া বৃদ্ধ রাণা যুবরাজকে সেই বিবাহ-যৌতুক গ্রহণ করিবার জন্য সবিশেষ অনুরোধ করিলেন, কিন্তু চন্দ কিছুতেই সে অনুরোধ রক্ষা করিলেন না। তখন বৃদ্ধ রাণা ক্রোধে ও অপমানে আত্মহারা হইয়া সেই বিবাহ-যৌতুক স্বয়ং গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু তাহা স্বীকার করিবার পূর্ব্বে তিনি যুবরাজ চন্দের নিকট এই প্রতিশ্রুতি চাহিলেন যে, এ বিবাহে যদি পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সেই পুত্রের অনুকূলে যুবরাজকে জ্যেষ্ঠাধিকার পরিত্যাগ করিতে হইবে। মহামতি চন্দ পিতার এই প্রার্থনায় তৎক্ষণাৎ 'তথাস্তু' বলিলেন। রাণা আরও অনুরোধ করিলেন যে, তাঁহাকে কনিষ্ঠের সর্ব্বপ্রধান প্রজা হইয়া থাকিতে হইবে। প্রাতঃস্মরণীয়চরিত চন্দ পিতার এ প্রার্থনাও পূরণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তিনি ভগবান্ একলিঙ্গের নামে শপথ গ্রহণ করিলেন যে, তিনি পিতার এই উভয় মনোরথই পূর্ণ করিবেন। দশরথ রামচন্দ্রকে যে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাহা অধিকতর কঠোর নহে। ধন্য যুবরাজ চন্দ! ধন্য তোমার আত্মোৎসর্গ! তুমি পিতৃতৃপ্তির জন্য আপনি পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে মিবারের রাজসিংহাসন হইতে স্বেচ্ছা-বঞ্চিত হইলে! তোমার দৃষ্টান্তে তোমার বংশধরগণ আত্মোৎসর্গে মিবারের সামন্ত-মণ্ডলীর মধ্যে আজও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়া রহিয়াছেন।

পিতা যাঁহাকে তাঁহার পরিণয়যোগ্য বলিয়া একবার মনে করিয়াছেন, তিনি মাতৃসমা, সুতরাং তাঁহার বিবাহের অযোগ্যা এ সূক্ষ্ম নৈতিক ভাব যাহার হৃদয়কে আলোড়িত করিতে পারে, তাঁহার নৈতিক উৎকর্ষ আধুনিক সভ্যজগতের বিস্ময়ের কারণ। চন্দ যে সৌন্দর্য্যময়ী পত্নীলাভে শুদ্ধ বঞ্চিত হইলেন, এরূপ নহে, রাজ্যশাসনোপযোগী সমস্ত গুণের আধার হইয়াও আজ তিনি পুত্রপরম্পরায় রাজ্যভোগে বঞ্চিত হইলেন।

মুকুলজী ও যুবরাজ চন্দের অলৌকিক আত্মত্যাগ

চন্দের নিকট প্রতিশ্রুতি লইয়া রাণা লক্ষ মাড়ওয়ার-রাজকুমারীকে বিবাহ করিলেন। প্রবয়াঃ রাণার ঔরসে ও নবরাণী মাড়ওয়ার রাজকুমারীর গর্ভে মুকুলজী নামক পুত্র জন্মিল। নবজাত কুমার পিতা-মাতার নয়নানন্দবর্দ্ধন করিতে করিতে জীবনের পঞ্চম সোপানে আরোহণ করিলেন। এই সময় রাণা গয়ার পবিত্র ক্ষেত্র হইতে যবনদিগকে বিদূরিত করিবার উদ্দেশে তাহাদিগের বিরুদ্ধে ধর্ম্ম-রণ বিঘোষিত করিলেন। 'বনং পঞ্চাশতো ব্রজেৎ' শাস্ত্রের এই অনুশাসন অনুসারে ক্ষত্রিয় নরপতিগণ পঞ্চাশৎ বর্ষের পর উপযুক্ত পুত্রের উপর রাজ্যভার

অর্পণ করিয়া নিঃসঙ্গ যোগতাপস হইয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল ভগবানের চিন্তায় অতিবাহিত করিয়া থাকেন। আজ প্রবয়াঃ রাণা লক্ষ সেই ধর্ম্মানুশাসন স্মরণ করিয়া পুত্রের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া পবিত্র হিন্দুধর্ম্মের মর্য্যাদা-রক্ষার জন্য ধর্ম্মযুদ্ধে আত্মোৎসর্গ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। আত্মবলি দিবার এরূপ সুযোগ জুটে না বলিয়া রাণা আর কালাবলম্ব করিতে ইচ্ছা করিলেন না। কিন্তু যাহার জন্য মিবারের রাজ-সিংহাসন পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—সেই রাজকুমার মুকুলজী এক্ষণে নিতান্ত শিশু। সুতরাং রাজ্যরক্ষণে সম্পূর্ণ অক্ষম। বিশেষতঃ প্রকৃত সিংহাসনাধিকারী মহামতি চন্দ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়াইলে, শিশু রাজকুমার তাঁহার সহিত সংগ্রামে অপারগ হইবেন এবং রাজ্যও অন্তর্বিদ্রোহে ছারখার হইয়া যাইবে। রাণা এই সকল ভাবিয়া চন্দের মন পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে ডাকাইলেন। যুবরাজ সম্মুখে উপস্থিত হইলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! মুকুলজীকে কোন্ কোন্ প্রদেশ দিবে?" চন্দ না ভাবিয়া চিন্তিয়া তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন—"কেন, সে ত স্থির হইয়াই আছে—মুকুলজী মিবারের সিংহাসনে অধিরোহণ করিবে।" রাণা পুত্রের আত্মত্যাগ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। চন্দ পিতার মন হইতে সর্ব্বপ্রকার সন্দেহ ও আশঙ্কা বিদূরিত করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন যে, তাঁহার গয়াযাত্রার পূর্ব্বেই অভিষেককার্য্য সমাপন করিতে হইবে। চন্দের আগ্রহাতিশয়ে অভিষেককার্য্য অবিলম্বেই সমাপিত হইল। চন্দই সর্ব্বাগ্রে শিশু রাজার নিকট মস্তক অবনত করিয়া শপথ গ্রহণ করিলেন। তিনি আত্মোৎসর্গের বিনিময়ে মন্ত্রসভায় প্রধান আসন চাহিলেন, এবং দ্বিতীয় অনুরোধ এই করিলেন যে, যাবতীয় রাজকীয় দানপত্রে তদীয় বর্শালাঞ্ছন রাজকীয় নাম মুদ্রার পূর্ব্বে অঙ্কিত করিতে হইবে। তাঁহার এই সামান্য প্রার্থনাদ্বয় গ্রাহ্য হইল। সেলুম্বা নগর তাঁহার বসতির জন্য তাঁহাকে অর্পণ করা হইল। অদ্যাপি তদীয় বংশধরগণ ঐ নগরে আধিপত্য করিতেছেন। চন্দের অলৌকিক আত্মত্যাগ ঘোষণা করিবার জন্যই যেন তদীয় বর্শালাঞ্ছন অদ্যাপি মিবারের রাজনাম মুদ্রার পূর্ব্বে অঙ্কিত হইয়া থাকে।

চন্দের অধ্যক্ষতা ত্যাগ

পিতার অনুরোধে পিতার গয়াযাত্রার পর হইতে চন্দ সমস্ত রাজকার্য্য শিশুরাজার নামে ও তদুপকারার্থ নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। বীরোচিত সাহসিকতায়, তাপসোচিত সরলতায় ও রাজোচিত প্রজাপালনক্ষমতায় তৎকালে মিবারে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী কেহই ছিল না। সুতরাং আপামর-সাধারণ সকলেই তাঁহার অধ্যক্ষতায় সন্তুষ্ট হইল। প্রজাবৃন্দ বৃদ্ধ রাজার অভাব একদিনও অনুভব করিল না। কিন্তু বিমাতার চক্ষে অমৃতও গরল বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল। যে সকল গুণে আবালবৃদ্ধবনিতা চন্দের নামে মুগ্ধ ছিলেন, সেই সকল গুণেই চন্দ রাজমাতার চক্ষে বিষতুল্য হইলেন। তিনি চন্দের সমস্ত কার্য্য ঈর্ষানয়নে দেখিতে লাগিলেন এবং স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিলেন যে, চন্দ রাজকার্য্য-নির্ব্বাহকরণ ব্যপদেশে মিবারের প্রকৃত রাজত্বই ক্রমে হস্তগত করিয়া লইতেছেন যে, চন্দের ঔদার্য্যেই তিনি রাজমাতা হইতে পারিয়াছেন, আজ তিনি সেই নিষ্কাম যোগীর অভিপ্রায়ের বিমলতায় মলিনতার ছবি প্রতিবিম্বিত করিতে চেষ্টা করিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন যে, যদিও চন্দ রাণা উপাধিধারণ করিলেন না বটে, কিন্তু তিনি প্রকৃত রাণাকে নামমাত্রে পরিণত করিয়াছেন। কিন্তু অটলের ন্যায় চন্দ বিমাতার এই সকল বাক্যবাণ সহিতে লাগিলেন। তিনি নিজের অভিপ্রায়ের বিমলতা জানিতেন বলিয়া এই সকল কথায় বিচলিত হইলেন না। বরং বিমাতার এই স্বাভাবিক ব্যাকুলতা সঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন। তথাপি তিনি বিমাতার সন্দেহ-নিবারণের জন্য রাজকার্য্যের ভার বিমাতার হস্তে দিয়া নিজে মণ্ডুর-অধিপতির নিকট গমন করিলেন। যাইবার সময় বিমাতাকে কেবল এই বলিয়া গেলেন যে, "অকারণে আপনি প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষীর অভিপ্রায়ে ও কার্য্যে সন্দেহ করিয়াছেন, যাহা হউক, এক্ষণে দেখিবেন, যেন শিশোদীয়াবংশের গৌরব ও স্বত্ব সকল নষ্ট না হয়।" মণ্ডুর রাজ্যেশ্বর মহা সমাদরে রাণা লক্ষের জ্যেষ্ঠকুমারকে গ্রহণ করিলেন। চন্দের গুণগরিমা সর্ব্বত্র প্রচারিত হওয়ায় মণ্ডুরেশ্বর তাঁহাকে রাজ্যের সর্ব্বোচ্চ সম্মান প্রদান করিলেন, এবং তাঁহার মর্য্যাদারক্ষাজন্য হল্লর নামক জেলা তাঁহাকে প্রদান করিলেন।

নিষ্কাম যোগীর ন্যায় চন্দ প্রজাবর্গের মঙ্গলবিধান করিবার জন্যই এই জায়গীর গ্রহণ করিলেন।

রাণা মুকুলজী

রাণা মুকুলজী ১৩২৪ শকে বা ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। যতদিন তিনি জ্যেষ্ঠের অভিভাবকতায় রাজ্য করিতেছেন,ততদিন তাঁহার কোন প্রকার অনিষ্টের আশঙ্কা ছিল না। কিন্তু জ্যেষ্ঠের রাজ্য পরিত্যাগ করার পর তদীয় মাতৃবংশ আসিয়া মিবারে অযথা কর্তৃত্ব আরম্ভ করিলেন। তদীয় মাতামহ মাড়ওয়ারাধিপতি বৃদ্ধ রাও বিনমুল কখন বা শিশু দৌহিত্রকে ক্রোড়ে করিয়া কখন বা একাকী মিবার সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে সমস্ত রাজশক্তি তিনি নিজ করতলস্থ করিয়া লইলেন। যে বাপ্পারাওয়ের সিংহাসনে এতদিন শিশোদীয়া-বংশীয় ব্যতীত আর কেহ বসিতে সাহস করেন নাই, আজ সেই সিংহাসনে অন্যদেশীয় লোক আসীন। প্রজাবর্গের অন্তরে ইহা শেলসম বিদ্ধ হইতে লাগিল; অথচ রাজমাতার ভয়ে কেহ এ বিষয়ে উচ্চবাচ্য করিল না। রাণীমাতার ভ্রাতা যোধসিংহ পূর্ব্বেই আসিয়া কর্তৃত্ব আরম্ভ করিয়াছেন। এক্ষণে পিতা দলবলে আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় তাঁহার প্রভুত্ব শতগুণ বাড়িয়া উঠিল।

রাজমাতা ও রাজমাতামহ

একদিন বিনমুলকে সিংহাসনাধিরূঢ় দেখিয়া মুকুলজীর ধাত্রী ক্রোধে আরক্ত-নয়না হইয়া রাণীমাতাকে স্পষ্টাক্ষরে বলিল যে, বৃদ্ধ রাওয়ের অভিপ্রায় সম্বন্ধে তাহার সন্দেহ হইতেছে। হইতেছে। তাহার বোধ হইতেছে যে, বৃদ্ধ রাও দৌহিত্রকে বঞ্চিত করিয়া নিজে মিবারের সিংহাসন অধিকার করিবার চেষ্টায় আছেন। রাণীমাতার অন্তরে পূর্ব্বে এ সন্দেহ অঙ্কুরিত হইয়াছিল, এক্ষণে ধাত্রীর বাক্যে সে সন্দেহ তরুশাখাপল্লবে বিভূষিত হইল। তিনি জানিতেন, রাজপুতজাতি রাজ্যলোলুপ। রাজ্যলোভের জন্য তাঁহারা ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান ততদূর করেন না। এই ভাবিয়া তিনি অন্তরের সন্দেহ মুখে ব্যক্ত করিলেন। রাণীমাতা এতদিনে মুখ ফুটিয়া পিতাকে তাঁহার বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তিরস্কার করিলেন। বিনমুল এতদিনে মুক্তাবরণ হইলেন। তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন, মিবার-সিংহাসন তিনিই অধিকার করিয়াছেন এবং তিনিই আজীবন ভোগ করিবেন। আর বলিলেন যে, রাণীমাতা যদি তাঁহার সঙ্কল্পসিদ্ধির অন্তরায় হয়েন, তাহা হইলে পুত্রের জীবন সংশয়াপন্ন হইবে।

রঘুদেব বা পিতৃদেব হত

পিতার এই নিষ্ঠুর বাক্যে দুহিতার ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। কিন্তু তিনি চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখিলেন। বুঝিলেন যে, পিতা কর্ম্মচারী ও সৈন্যগণকে নিশ্চয় হস্তগত করিয়াছেন। নতুবা এরূপ বাক্য বলিতে কখন সাহস করিতেন না। তাঁহার সন্দেহ শীঘ্র দৃঢ়ীভূত হইল। চন্দের মধ্যম ভ্রাতা দেব-প্রকৃতি রঘুদেবকে কৈলবারা ও কোয়ারিয়া নগর জায়গীর দেওয়া হইয়াছিল। তিনি তথায় নিষ্কাম যোগীর ন্যায় প্রজাপালনের ও ভগবানের আরাধনায় নিযুক্ত ছিলেন। বিশ্বাসঘাতক বিনমুল তাঁহার নিকট সম্মানসূচক এক পরিচ্ছদ প্রেরণ করিলেন। প্রচলিত প্রথা অনুসারে প্রাপ্তিমাত্র তিনি ঐ পরিচ্ছদ পরিধান করিতেছিলেন, এমন সময় গুপ্ত হত্যাকারীর অস্ত্রে তাঁহার প্রাণবধ হইল। ধার্ম্মিকতা, সাহসিকতা, এবং বীরোচিত অঙ্গসৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য্যে রঘুদেব মিবারে অদ্বিতীয় ছিলেন। সুতরাং তাঁহার এরূপ শোচনীয় মৃত্যুতে মিবারের আবালবৃদ্ধবনিতা শোকে অভিভূত হইয়া পড়িল। তাঁহার হত্যা সৎকার্য্যে আত্মবলিরূপে পরিগণিত হইল। ইহাতে তিনি দেবোচিত গৌরব লাভ করিলেন। তিনি আজ হইতে মিবারের পিতৃদেবগণের সহিত একাসনে বসিয়া জাতীয় পূজোপহার পাইতে লাগিলেন। আজ হইতে প্রত্যেক গৃহস্থের পূজা-গৃহে তদীয় মূর্ত্তি পিতৃদেবগণের সহিত পূজিত হইতে লাগিল। বৎসরে অন্ততঃ দুইবার করিয়া—আশ্বিন ও চৈত্রমাসে—

রাণা হইতে সামান্য দাস পর্য্যন্ত সকলকেই তদীয় মন্দিরে আসিয়া তদীয় প্রতিমা পূজা করিতে হয়। মিবার আত্মোৎসর্গের পূজা করিতে জানিত বলিয়া মিবারে এই সময় তত মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

রাজমাতা ও চন্দের ষড়যন্ত্র

রাণীমাতার এতদিনে সন্দেহ দৃঢ়ীভূত হইল। তিনি এই অকূল সাগরে পড়িয়া একমাত্র চন্দকে কাণ্ডারী বলিয়া স্থির করিলেন। তিনি চন্দকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি না আসিলে শিশোদীয়া-বংশের আধিপত্য লোপ হইবে। তাঁহার পিতৃবংশ আসিয়া রাজ্যের সমস্ত উচ্চপদ অধিকার করিয়াছেন। অধিক কি, মিবারের সর্ব্বোচ্চপদে এক জন ভট্টিবংশোদ্ভব জসলমীরীয় রাজপুত অধিরূঢ় রহিয়াছেন। চন্দ বিমাতার পত্র পাইয়াই দুই শত বিশ্বস্ত শীকারি সঙ্গে লইয়া চিতোরাভিমুখে ধাবিত হইলেন। এই শীকারিগণ স্ব স্ব পরিবার চিতোরে রাখিয়া চন্দের সমভিব্যাহারে গমন করিয়াছিল। ইহারা আপন আপন পরিবারের সহিত সাক্ষাৎ করিবার ছলে চিতোর দুর্গাভ্যন্তরে বিনা সন্দেহে লব্ধপ্রবেশ হইল। চন্দ তাহাদিগকে দুর্গের দ্বাররক্ষকগণের অধীনে কর্ম্ম স্বীকার করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। তদনুসারে তাহারা সকলেই দুর্গদ্বারপালগণের অধীনে চাকরী গ্রহণ করিল॥ তাহারা পরিবার ফেলিয়া আর চন্দের নিকট যাইতে চাহে না বলায় তাহারা মহাসমাদরে গৃহীত হইল। এদিকে চন্দ রাজমাতাকে পুত্রসহ প্রতিদিন নানাব্যপদেশে দুর্গের বাহিরে আসিতে উপদেশ দিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তদনুসারে তিনি প্রতিদিন ধাত্রী, পুরোহিত ও অন্যান্য বিশ্বস্ত ভৃত্যবর্গকে সঙ্গে লইয়া পুত্রসহ দুর্গের বহিঃস্থ গ্রামাদি প্রদর্শন ও তথায় দীন-দুঃখী প্রজাবর্গের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ ও দারিদ্র্য বিদূরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। চন্দের উপদেশানুসারে তাঁহারা পরিভ্রমণের দূরত্ব ক্রমেই বাড়াইতে লাগিলেন। দেওয়ালীর দীপোৎসব-রজনীতে চিতোর হইতে সাত মাইল দূরে অবস্থিত গোসুণ্ডা নগরে উভয় পক্ষে সাক্ষাৎ হইবার প্রস্তাব রহিল।

চন্দের চিতোরাধিকার

রাজমাতা চন্দের সমস্ত উপদেশ অনুষ্ঠিত করিলেন। দেখিতে দেখিতে সেই দীপোৎসবরজনী আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজমাতা পূর্ব্ববৎ সকলকে সঙ্গে লইয়া গোকুণ্ডা নগরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে তাঁহারা মহোৎসবে রজনীযাপন করিতে লাগিলেন। নিশা প্রায় অবসান হইয়া আসিল—তথাপি চন্দের দেখা নাই। রাজমাতা, পুরোহিত ও ধাত্রী ক্রমে হতাশ হইয়া পড়িলেন। এমন সময় সহসা চল্লিশজন অশ্বারোহী বীরপুরুষ তাঁহাদের সম্মুখ দিয়া নক্ষত্র বেগে চিতোরের পথে ছুটিয়া গেলেন। চন্দ এই বীরবৃন্দের নেতা ছিলেন। তিনি যাইবার সময় সঙ্কেতে চিতোরাধিপতি শিশু-ভ্রাতাকে রাজপদোচিত অভিবাদন করিয়া গেলেন। সে সঙ্কেত যাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, তাঁহারাই চন্দকে চিনিতে পারিলেন। তাঁহাকে চিনিবার অন্য উপায় ছিল না, কারণ, তিনি ছদ্মবেশে গমন করিতেছিলেন।

নিমেষ-মধ্যে সেই বীরদল রামপুল বা রামসেতু অতিক্রম করিলেন। ইহাই চিতোরদুর্গে প্রবেশের প্রথমদ্বার। ঐ বহির্দ্বারে কেহই তাঁহাদের গতিরোধ করিল না। শান্ত্রিগণ কেবল 'কোন্ হায়?' এই প্রশ্ন মাত্র করিয়াছিল। কিন্তু যখন শুনিল, তাঁহারা গোকুণ্ডা হইতে রাজার অগ্রগামী সৈন্যস্বরূপ আসিতেছেন, তখন আর দ্বিরুক্তি করিল না। কারণ, এ কথায় অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ ছিল না। কিন্তু যখন অবশিষ্ট সৈন্যগণ রাজাকে লইয়া নগরমধ্যে প্রবেশ করিল, তখন ষড়যন্ত্র আর গুপ্ত রহিল না। তখন সেই দুই শত বিশ্বস্ত তীরন্দাজ নিজমূর্ত্তি ধারণ করিল। চন্দের চিরপরিচিতস্বরে তাহারা কর্ত্তব্য বুঝিয়া লইল। এদিকে চন্দ অসি নিষ্কোশিত করিয়া সর্ব্বাগ্রে সেই ভট্টিসামন্তের দিকে অগ্রসর হইলেন। তিনি এ ষড়যন্ত্রের কোন সংবাদ পান নাই। সুতরাং সহসা উত্তোলিত-অসি চন্দকে সম্মুখে দেখিয়া ভয়বিহ্বল ও ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া নিজ ছোরা চন্দের অভিমুখে সবেগে প্রক্ষেপ করিলেন, চন্দ ক্ষত হইয়াও নিমেষমধ্যে খড়্গাঘাতে ভট্টিপতির দেহ বিখণ্ডিত করিলেন। দ্বারপালগণ খণ্ড খণ্ড হইয়া চতুর্দ্দিকে

বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, রাঠোরবংশোদ্ভবগণকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাহির করিয়া নিদ্দয়রূপে হত্যা করা হইল।

হত্যাকাণ্ড ও যোধসিংহের পলায়ন

রাও রিনমুলের হত্যাকাণ্ড শোচনীয় অপেক্ষা অধিকতর হাস্যজনক হইয়াছিল। উক্ত প্রবয়াঃ মাড়ওয়ারাধিপতি রাজমাতার কোন সহচরীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া তাহার সতীত্বরত্ন অপহরণ করেন। যখন চন্দ তদীয় প্রাসাদ অবরোধ করেন, তখন তিনি মদ্য, অহিফেন ও প্রেমে বিহ্বল হইয়া সেই রমণীকে নিজ বাহুযুগলের নিগড়ে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। যুবতীর অন্তরে যে প্রতিহিংসানল ধূমায়মান ছিল, তাহা এই সুযোগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। রমণী তাঁহার শিথিলিত বাহুযুগলের বন্ধন হইতে আপনাকে কথঞ্চিৎ মুক্ত করিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া তদীয় মাড়ওয়ারী পাকড়ী দ্বারা তাঁহাকে খড়াপাদে বাঁধিল। অহিফেনের শক্তিতে তদীয় নয়নদ্বয় নিমীলিত ছিল। এ দিকে মদ্য তাঁহার চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল, এই অবস্থায় রমণী গৃহের দ্বার খুলিয়া দিল; এই অবসরে অস্ত্রধারী পুরুষগণ তদীয় গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। অস্ত্রের ঝনঝনাশব্দে ও অস্ত্রধারী পুরুষগণের পাদশব্দে বৃদ্ধ রাওর চৈতন্য হইল। তখন আসন্ন-মৃত্যু দেখিয়া তিনি সিংহবিক্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু সে প্রেমাগারে বীরবাহু অস্ত্র কোথায় পাইবেন? বৃদ্ধ তথাপি নিরস্ত্র হইবার নহেন। ক্ষত্রিয় নিশ্চিত মৃত্যু জানিয়াও কখন প্রাণভিক্ষা করেন না। আজ সেই ক্ষত্রধর্মের বশীভূত হইয়া প্রবয়াঃ মাড়ওয়ারাধিপতি সম্মুখে তৈজসপত্র যাহা পাইলেন, তদ্দ্বারা অসংখ্য লোককে শমনসদনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু শীঘ্র একটি বন্দুকের গুলী আসিয়া তাঁহাকে তদীয় প্রাসাদের শানের উপর পাতিত করিল। এইরূপে তিনি তাঁহার বিশ্বাসঘাতকতাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। কেহ তাঁহার মৃতদেহের সমুচিত সৎকার করিল না। তাঁহার ও তদীয় অনুচরবর্গের শবগুলি চিতোরের শ্মশান-ভূমিতে শকুনি গৃধিনীর মুখে প্রক্ষিপ্ত হইল। যেমন পাপ, তদনুরূপ প্রায়শ্চিত্ত হইল!

তদীয় পুত্র যোধসিংহ তৎকালে চিতোরদুর্গের পাদদেশে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি এই সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র ক্ষিপ্রগামী অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক চিতোর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। তিনি প্রথমে মণ্ডোর নগরে গমন করেন, কিন্তু চন্দ সেই নগরাভিমুখে তদনুসরণে আসিতেছেন শুনিয়া সেই নগর পরিত্যাগ করিয়া বীরবর অতিথিবৎসল হর্ব্বশঙ্কলের আশ্রয় গ্রহণ করেন; চন্দ নিজ পুত্রদ্বয়ের উপর মণ্ডোর নগর রক্ষার ভার দিয়া স্বয়ং চিতোরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। এই সুযোগ পাইয়া যোধসিংহ হর্ব্বশঙ্কলের সাহায্যে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া উক্ত নগর আক্রমণ করেন। চন্দের জ্যায়ান্ পুত্র উপেক্ষা করিয়া অল্পমাত্র সৈন্য লইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করেন, কিন্তু যোধসিংহ কর্ত্তৃক রণে পরাজিত ও হত হয়েন। কনীয়ান্ পুত্র এই সংবাদ পাইয়া বেগগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া পলায়ন করিতেছিলেন, কিন্তু গোধওয়ার প্রদেশে ধৃত ও নিহত হইলেন। বৃদ্ধ রাঠোরের মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্য দুই জন চিতোর-রাজকুমারকে বলি দেওয়া হইল। যোধসিংহ বুঝিলেন যে, এই অনল বিনা প্রায়শ্চিত্তে নির্ব্বাপিত হইবার নহে। এই জন্য তিনি চন্দের নিকট আত্ম-সমর্পণ করিলেন, এবং তদীয় কুমারদ্বয়ের হত্যার জন্য যে ব্যবস্থা হয়, তাহাই তিনি মস্তক পাতিয়া লইতে স্বীকৃত হইলেন। অবশেষে স্থিরীকৃত হইল যে, তাঁহাকে গোধওয়ার ছাড়িয়া দিতে হইবে। তিনি তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন। এইরূপে অনেক দিনের পর গোধওয়ার রাজ্য আবার মিবার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল।

রাণা মুকুল ও তাঁহার গুণাবলী

রাণা মুকুল বীরত্বে ও মহাপ্রাণতায় তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের অযোগ্য উত্তরাধিকারী ছিলেন না। তাঁহার রাজত্বকালের সমকালীন প্রসিদ্ধ ঘটনা—তাইমুর কর্ত্তৃক ভারত আক্রমণ। সম্রাট ফেরোজ সাহার একটি অজ্ঞাতশ্মশ্রু প্রপৌত্র তৎকালে দিল্লীর সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। তিনি তাইমুরের আগমনে দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া গুজরাটাভিমুখে পলায়ন করিতেছিলেন। তিনি মিবার-রাজ্যের মধ্য দিয়া সেই দিকে ধাবিত হইবার উপক্রম করিয়াছিলেন। রাণা মুকুল এই

সংবাদ পাইয়া সসৈন্যে তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। যেন সহসা একটি গিরিশৃঙ্গ পতিত হইয়া গিরিনির্ঝরিণীর গতিরোধ করিল। রাণা মুকুল আরাবলী গিরি-সঙ্কট অতিক্রম করিয়া বাইপুর রণক্ষেত্রে সৈন্যাবাস স্থাপন করিয়া যবনসম্রাটের আক্রমণ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তদীয় দুর্ভেদ্য ব্যূহ ভেদ করিতে অসমর্থ হইয়া যবনসৈন্য প্রত্যাবৃত্ত হইল। এই বিজয়ে প্রোৎসাহিত হইয়া রাণা মুকুল সেই বিজয়িনী সেনা লইয়া সম্বরপ্রদেশ ও সম্বর হ্রদ অধিকার করিলেন। রাণা মুকুল আরও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সীমান্তপ্রদেশ জয় করিয়া রাজ্যের সীমাবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলাস্থাপনেও তিনি অল্প বিচক্ষণতা প্রকাশ করেন নাই। পিতার ন্যায় তিনিও স্থপতিবিদ্যার এক জন প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন। যে প্রকাণ্ড প্রাসাদ রাণা লক্ষ আরম্ভ করিয়া গিয়াছিলেন, রাণা মুকুল তাহা পরিসমাপ্ত করিলেন। এই প্রকাণ্ড প্রাসাদ এখন প্রকাণ্ড ভগ্ন-স্তূপে পরিণত হইয়াছে। তিনি চিতোরগিরির প্রতীচ্যপ্রদেশে একটি প্রকাণ্ড মন্দির নির্ম্মাপিত করিয়া তাহাতে চতুর্ভুজের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন।

রাণা মুকুলের শোচনীয় হত্যা

রাণা মুকুলের লালবাই নাম্নী এক পরমা সুন্দরী কন্যা জন্মিয়াছিল। তিনি কীচী প্রদেশের অধিপতির সহিত তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন। উক্ত কীচীরাজ বিবাহের যৌতুক না লইয়া রাণার নিকট বিপদের সময় সৈন্য-সাহায্যের প্রতিশ্রুতি লইয়াছিলেন। মালওয়াধিপতি হোসঙ তাঁহাদিগের নগর আক্রমণ করিলে, তিনি পুত্র ধীরাজকে রাণার নিকট সাহায্যভিক্ষার জন্য পাঠাইলেন। রাণা তৎকালে সসৈন্যে মাদারীয়া নগরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ধীরাজ আসিয়া সৈন্য চাহিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার সে প্রার্থনা পূরণ করিলেন। ধীরাজ সৈন্য লইয়া যাওয়ার পর একটা সামান্য ঘটনায় মুকুলের খুল্লতাতদ্বয় —চাচ ও মররা—তৎপ্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রাণবিনাশ করিলেন।

কাম্বয়ী পরমরূপলাবণ্যবতী কোন সূত্রধর-বংশোদ্ভবা রমণীকে গোপনে বিবাহ করেন। এই বিবাহ তাঁহাদিগের কৌলিক প্রথার বিরুদ্ধে হইয়াছিল বলিয়া ও উক্ত কামিনী নীচবংশোদ্ভবা ছিলেন বলিয়া লোকে ইহার সিদ্ধতা স্বীকার করিত না। এই কামিনীর গর্ভে ও কাম্বয়ীর ঔরসে ঐ দুই পুত্র জন্মে। এই জন্য লোকে তাঁহাদিগের দুই জনের জন্মবৃত্তান্ত লইয়া কানাকানি করিত। মিবারে এই অসিদ্ধ বিবাহের পুত্রগণ পঞ্চম শ্রেণীর পুত্র বলিয়া অভিহিত হইতেন। ইঁহারা মন্ত্রভবনে ও অন্তঃপুরে প্রবেশাধিকার পাইতেন ও বিশেষ যত্নের সহিত প্রতিপালিত হইতেন বটে, কিন্তু রাজ্যে বা রাজ্যের সর্ব্বোচ্চপদে তাঁহাদিগের অধিকার থাকিত না। রাণা মুকুলের সেনামধ্যে ইঁহারা প্রত্যেকে সপ্ত শত অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়কপদে অভিষিক্ত ছিলেন। কোন সামন্ত ইহাতে ঈর্ষান্বিত হইয়া রাজ-সকাশে যে কোন প্রকারে তাঁহাদিগকে অপদস্থ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। একদিন সে সুযোগও উপস্থিত হইল। একদিন রাণা সামন্তগণ পরিবেষ্টিত হইয়া নিকুঞ্জমধ্যে আসনে সমাসীন হইয়া অদূরবর্ত্তী কোন বৃক্ষের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। চোহান-সামন্ত নিজের অনভিজ্ঞতার ভান করিয়া রাণাকে কানে কানে তদীয় খুল্লতাতদ্বয়ের এক জনকে উক্ত বৃক্ষের নাম জিজ্ঞাসা করিতে বলিলেন। সরলহৃদয় রাণা ইহার প্রকৃত মর্ম্মের উদ্ভেদ করিতে না পারিয়া সরলভাবে তাঁহাদিগের অন্যতরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"খুল্লতাত! এ বৃক্ষটি কি বৃক্ষ?" উভয় ভ্রাতাই এ প্রশ্নে ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা মনে করিলেন যে তাঁহারা সূত্রধরকন্যার গর্ভজাত বলিয়া বিদ্রূপ করিয়া তাঁহাদিগকেই বৃক্ষের নাম জিজ্ঞাসা করা হইতেছে। তাঁহারা সেই দিনই ইহার প্রতিশোধ লইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। রাণা মুকুল ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। তিনি একাগ্রমনে মালা জপিতেছিলেন, এমন সময় ভ্রাতৃদ্বয় যমদূতের ন্যায় সহসা তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। এক জনের অসি তদীয় মস্তককে দেহবিচ্ছিন্ন করিল, অন্যতরের অসি তাঁহার দেহকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ভূপাতিত করিল। ভ্রাতৃদ্বয় এই লোমহর্ষণ ব্যাপার অনুষ্ঠিত করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া চিতোরাভিমুখে ধাবিত হইলেন। তাঁহাদের সঙ্কল্প ছিল যে চিতোরের শূন্য-সিংহাসন গিয়া অধিকার করেন। কিন্তু চিতোরবাসীরা এই দুর্ঘটনার সংবাদ পূর্ব্বেই পাইয়া তাঁহাদের বিরুদ্ধে দুর্গদ্বার অর্গলবদ্ধ করিল।

রাণা কুম্ভ এবং রাজহন্তৃদ্বয়

রাণা মুকুল নিহত হইলে তদীয় পুত্র কুম্ভ মিবারের শূন্য সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। কিন্তু হত্যাকারিদ্বয় তাঁহাকে অধিকারচ্যুত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে ক্রটি করেন নাই। তাঁহারা চিতোরে প্রত্যাখ্যাত হইয়া মাদারীয়ার সমীপবর্ত্তী দুর্গাভিমুখে ধাবিত হইলেন। এই সঙ্কটসময়ে কুম্ভ পিতৃমাতুল যোধসিংহের শরণাপন্ন হইলেন। যোধসিংহ এই বিপৎকালে ইচ্ছা করিলে মিবারের সিংহাসন অধিকার করিতে পারিতেন; কিন্তু ক্ষত্রিয় কখন শরণাগতের সর্ব্বস্বাপহারী হন না। তিনি ক্ষত্রোচিত হৃদয়-মাহাত্ম্যের বশীভূত হইয়া নিজপুত্রকে সৈন্য-সামন্ত দিয়া মাদারীয়া দুর্গাভিমুখে প্রেরণ করিলেন। তাহাদের আগমনসংবাদেই সে দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা রাতাকোট গিরিদুর্গে গিয়া আশ্রয় লইলেন। এই দুর্গ উক্ত গিরির অত্যুচ্চ শৃঙ্গোপরি বিনির্ম্মিত, সুতরাং অতি দুরধিগম্য। রাজহন্তৃদ্বয় চোহানবংশীয় সামন্ত সুজার এক কুমারী কন্যাকে লইয়া তথায় পলায়ন করেন; এই জন্য সুজা প্রতিহিংসাপরতন্ত্র হইয়া অনেক কষ্টে তাঁহাদিগকে ধরাইয়া দেন। যোধসিংহ তনয় ও কুম্ভ উক্ত সামন্তের সাহায্যে রজনী-তিমিরে অবগুণ্ঠিত হইয়া গিরিশৃঙ্গের গাত্র বাহিয়া দুর্গোপরি আরোহণ করিলেন। চাচ্ছ ও ময়রা সহসা কুমারদ্বয়কে সম্মুখে দেখিয়া ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। এই অবসরে পথি-প্রদর্শক চন্দনা চাচকে ও রাঠোররাজতনয় ময়রাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ভূপাতিত করিলেন। অবশেষে আক্রমণকারীরা দুর্গের লুণ্ঠিত দ্রব্য ভাগ করিয়া লইয়া প্রস্থান করিলেন।

রাণা কুম্ভ

রাণা কুম্ভ ১৪৭৫ শকে বা ১৪১৯ খৃষ্টাব্দে পিতৃসিংহাসন অধিকার করেন। তদীয় বিস্তৃত রাজত্বকালের মধ্যে কোন প্রকার প্রজাবিদ্রোহের লক্ষণ উপলক্ষিত হয় নাই। কিন্তু তাঁহাকে নিয়ত বহিশ্চর শত্রুর সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। অথচ তাঁহার রাজত্বের সময় মিবার অতিশয় সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল।

কোন দেশের ইতিহাসে উপর্য্যুপরি কয়েক শতাব্দী ধরিয়া প্রতিভাশালী মহাপ্রাণ শাসনদক্ষ রাজবৃন্দকে রাজত্ব করিতে দেখা যায় নাই। বাপ্পার সময় হইতে গণনা আরম্ভ করিলে বলিতে হইবে যে, কুম্ভের রাজত্বকাল মিবারের সৌভাগ্য-সূর্য্যের মধ্যাহ্নকাল। মিবারের গৌরবগিরিপাদমূলে প্রতিহত হইয়া একে একে সমস্ত যবন-শক্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে;—যেমন মহেন্দ্র পর্ব্বতের পাদমূলে সাগরতরঙ্গ প্রতিহত হইয়া জলকণিকা-পুঞ্জরূপে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতেছে। নিষ্ঠুর ধর্ম্মান্ধ আলাউদ্দীন যে দিন আসিয়া চিতোরে শিল্প ও স্থপতিবিদ্যার কীর্ত্তিস্তম্ভ সকল চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিল, সেই দুর্দ্দিন হইতে আজ এক শতাব্দী কাল অতীত হইয়াছে, সে দুর্দ্দিনের আঘাত হইতে চিতোর এখন একরূপ সামলাইয়াছে। চিতোররক্ষার জন্য যে সকল বীর আত্মবলি দিয়াছিলেন, তাঁহাদের স্থানে আবার নব নব বীর আবির্ভূত হইয়া স্বদেশের রক্ষার্থ প্রাণোৎসর্গ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছেন। ককেসস্ পর্ব্বতের শিখরদেশে ও ককসসের উপকূলে যে মহতী যবনশক্তি ভারত আক্রমণের জন্য ক্রমে উপচিত বল হইতেছিল, এবং যে মহাশক্তি তদীয় পৌত্র রাণা সঙ্গের রাজত্বকালে উত্তাল সাগরতরঙ্গের ন্যায় মিবারকে কুক্ষিগত করিবার জন্যই যেন প্রচণ্ডবেগে তদভিমুখে ধাবিত হইয়াছিল, সেই মহতী যবনশক্তির সম্মুখীন হইবার যোগ্য উপাদান-সামগ্রী রাণা কুম্ভের রাজত্বকালে সবিশেষরূপে সংগৃহীত হইতে আরম্ভ হয়। হামিরের বীরত্ব ও কার্য্যকরী শক্তি, রাণা লক্ষের শিল্পবিষয়িণী স্বাদগ্রাহিতা, এবং বাপ্পারাউলের সর্ব্ববিষয়িণী প্রতিভা এক রাণা কুম্ভে বিদ্যমান ছিল। রাণা কুম্ভ এই সকল অসামান্য মৌলিক শক্তিবলে যখন যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহাতেই কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি এই দ্বিতীয়বার মিবারের লোহিতধ্বজা দৃশদ্বতী নদীতীরে প্রোথিত করিলেন! যে দৃশদ্বতী নদীতীরে তদীয় পিতৃপুরুষ সমরসিংহ যবনহস্তে রণে পরাজিত ও হত হন, সেই দৃশদ্বতী নদীতীরে তাঁহার বিজয়িনী সেনা যবন-শক্তিকে পরাজিত করিয়া মিবার-রাজ্যের পরিসর দৃশদ্বতীনদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিল।

দিল্লী ও মিবারের রাজবংশ

কি কারণে এত শীঘ্র যবন-শক্তির হ্রাস হইত, এবং কি কারণেই বা হিন্দু শক্তি এত শীঘ্র পুষ্টাবয়ব হইত, ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায়, আত্মসংযমের অভাবেই যবনগণের পতনের কারণ, এবং তাহার ভাবই হিন্দুগণের দ্রুত উন্নতির নিদান। ভারত-রাহু সাহাবুদ্দীনের ও তাঁহার সমসাময়িক সমরসিংহের সময় হইতে দিল্লীর সিংহাসনে দুইটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দুই রাজবংশে সর্ব্বশুদ্ধ চতুর্ব্বিংশতি সম্রাট ও এক সাম্রাজ্ঞী আবির্ভূত হন।

গুপ্ত-হত্যা, রাজ্যবিপ্লব বা সিংহাসনচ্যুতিনিবন্ধন তাঁহারা অতি অল্পব্যবধানেই রঙ্গভূমি হইতে অন্তর্হিত হন। গড়ে তাঁহারা প্রত্যেকে নয় বৎসরের অধিক রাজত্ব করিতে পারেন নাই। এরূপ ঘন ঘন রাজ্য-বিবর্ত্তনের মূলে আত্মসংযমের অভাব নিহিত রহিয়াছে; যিনি সম্রাট বা সম্রাজ্ঞী হইলেন, তিনি আত্মসুখে বিভোর হইয়া পড়িলেন। আত্মীয়গণ ও প্রজাবর্গ তাঁহার বিদ্বেষী হইয়া পড়িলেন। সুতরাং তাঁহাদের ষড়যন্ত্রে সম্রাট হত ও তাঁহার উত্তরাধিকারী সিংহাসনে প্রতিষ্ঠাপিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু মিবারে সেরূপ ঘটনা অল্পই ঘটিয়াছে। মিবারের রাজগণ এরূপ প্রজাবৎসল ও কুটুম্বপরিপোষক ছিলেন যে, তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হইয়াছিল বলিয়া ইতিহাসে লিখিত নাই। তাঁহাদিগের রাজ্যে সকলেই সুখী ছিল, তাঁহাদের আত্মোৎসর্গে সকলেই প্রীত ছিল বলিয়া কোন প্রকার অন্তর্ব্বিপ্লব বা গৃহবিচ্ছেদ ঘটিতে শুনা যায় নাই। যে সময়ে দিল্লীর সিংহাসনে চতুর্ব্বিংশতি সম্রাট অধিরূঢ় হইয়াছিলেন, সেই সময়ের মধ্যে মিবারের সিংহাসনে একাদশ জনমাত্র রাজা অধিরূঢ় হন।

ভারতের তদানীন্তন অবস্থা

খিলজী রাজবংশের রাজত্বকালের শেষে দিল্লীর সাম্রাজ্যের অন্তর্দ্দৌর্ব্বল্য-নিবন্ধন তদধীন ভারতীয় রাজ্য সকল স্বাধীনতা-ধ্বজা উড্ডীন করিল। দাক্ষিণাত্যে বিজয়পুর ও গোলকুণ্ডা; এবং আর্য্যাবর্ত্তে মালব, গুর্জ্জর ও জৈনপুর, অধিক কি, কাল্পীও আপন আপন স্বাধীনতা স্থাপন করিল। যে সময়ে কুম্ভ সিংহাসনাধিরোহণ করেন, সে সময় মালব ও গুজরাট অতিশয় ক্ষমতাশালী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কুম্ভের গৌরব-সূর্য্যের মধ্যাহ্নের সময় এই দুই রাজ্যের রাজদ্বয় তাঁহার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইবার জন্য পরস্পর সন্ধিবদ্ধ হন।

অবশেষে ১৪৯৬ সংবৎ বা ১৪৪০ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা দুই মহতী সেনা লইয়া মিবার আক্রমণ করেন। কুম্ভ এক লক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য ও চতুর্দ্দশ সহস্র হস্তী লইয়া মালব-ক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া এই মিলিত সেনাকে যুদ্ধ প্রদান করেন। এই মহারণে সেই মিলিত সৈন্য কুম্ভের হস্তে পরাজিত হয় এবং খিলজী বংশীয় মালবাধিপতি মামুদ রণে বন্দীভূত হইয়া চিতোরে আনীত হন।

কুম্ভের চরিত্র মাহাত্ম্য

কুম্ভের হৃদয়-মাহাত্ম্য এই বিজয়ের পর অধিকতর বিকসিত হয়। হিন্দুধর্ম্মে পরাজিত ও রণে বন্দীভূত শত্রুর প্রতি নৃশংসাচার নিষিদ্ধ। কুম্ভ পরাজিত, বন্দীভূত মামুদকে শুদ্ধ মুক্তি দিয়াই যে শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন, এরূপ নহে, পদানত শত্রুর প্রতি সে ঔদার্য্য ত হিন্দুবীরমাত্রই প্রদর্শন করিতে বাধ্য। কিন্তু তিনি মামুদকে মুক্তি দিবার সময় বহুমূল্য রত্নরাজি উপহার দিয়া নিজের হৃদয়ের অতিমানুষিক বিশালতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত যুদ্ধস্থলে তিনি শত্রুগণের যে সমস্ত বসন ভূষণ কাড়িয়া লইয়াছিলেন, সে সমস্তই তাঁহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিলেন; কেবল বিজয়চিহ্নস্বরূপ মালবাধিপের রাজমুকুটখানি রাখিয়া দিলেন। এই ঘটনার একাদশ বর্ষ পরে কুম্ভ এই বিজয় চিরস্মরণীয় করিবার জন্য চিতোর-গিরির বক্ষে এক গগনস্পর্শী বিজয়স্তম্ভ নিখাত করেন। ইহা সমাপ্ত করিতে তাঁহার দশ বৎসরকাল লাগিয়াছিল। এই বিজয়স্তম্ভ এত উচ্চ যে, উচ্চতায় মেরু-পর্ব্বতকেও পরিহাস করিতেছে। ইহা অদ্যাপি অক্ষুণ্ণভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। অনন্তকালের জন্য ইহা এইরূপ অক্ষুণ্ণভাবে থাকিয়া রাণা কুম্ভের কীর্ত্তি ঘোষণা করুক, ইহা আমার ঐকান্তিক কামনা। এই কীর্ত্তিস্তম্ভের

পাদমূলে এই যুদ্ধের সংক্ষেপ বিবরণ লিখিত আছে। এই মর্ম্মে সেই বিবরণের প্রারম্ভ হইয়াছে—"যখন গুর্জ্জরখন্দ ও মালবের অধিপতিদ্বয় সাগরোপম বাহিনীদ্বয় লইয়া মেদিনী বিকম্পিত করিয়া মিবারাভিমুখে আগমন করেন ইত্যাদি।"

——

কুম্ভের অনন্ত কীৰ্ত্তি

হৃদয়-মাহাত্ম্যের নিকট পরাজিত না হয়, এমন লোক জগতে অতি বিরল। যে মালবাধিপতি মামুদকে কুম্ভ রণে পরাজিত করিয়া ছয়মাসকাল চিতোরের কারাগারে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহার মহাপ্রাণতায় সেই মামুদ তাঁহার নিকট চিরদিন আত্ম-বিক্রীত হইয়াছিলেন, তাঁহার কারামুক্তির পর যখন ঝুন্‌ঝুন্ রণক্ষেত্রে কুম্ভের সহিত যবন-সম্রাটের সৈন্যের ঘোরতর সংগ্রাম হয়, তখন মামুদ সসৈন্যে কুম্ভের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া স্বজাতীয় সেনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই মিলিত সৈন্যের সাহায্যে কুম্ভ সহজেই সেই মহতী সম্রাট-সেনার উপর জয়লাভ করিয়াছিলেন। এই উপকার-প্রত্যুপকারে উভয়েরই চরিত্র ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে।

——

রাণা কুম্ভের কীর্ত্তি-কলাপ

মিবারের রক্ষার জন্য যে চতুরশীতি দুর্গ প্রতিষ্ঠাপিত হয়, তাহার মধ্যে দ্বাত্রিংশৎসংখ্যক দুর্গ কুম্ভ কর্ত্তৃক নির্ম্মাপিত। মিবারের যে প্রকাণ্ড দুর্গ কেবল চিতোরের দুর্গের নিকট অবনতমস্তক, সেই উত্তুঙ্গ ও বিশাল দুর্গ তাঁহারই নামে কুম্ভমীর নামে আখ্যাত হয়। এক্ষণে ইহা সাধারণতঃ কমলমীর নামে বিদিত আছে। চিতোর-দুর্গ যেমন চিতোর-গিরির উপর প্রতিষ্ঠাপিত, ইহাও সেইরূপ কুম্ভমীর। গিরির উপর প্রতিষ্ঠাপিত, ইহার প্রাকৃতিক অবস্থান ও উত্তুঙ্গ প্রাকারে বেষ্টন হেতু ইহা অনন্তকালের জন্য শত্রুদিগের দুষ্প্রবেশ্য হইয়া রহিয়াছে। যে স্থানে কুম্ভ এই দুর্গ প্রতিষ্ঠাপিত করেন, সেই স্থানে পুরাকাল হইতে একটি প্রাচীন দুর্গ প্রতিষ্ঠাপিত ছিল; এরূপ কিংবদন্তী আছে যে, চন্দ্রগুপ্তের বংশোদ্ভব জৈনধর্ম্মাবলম্বী সম্প্রীত নামক এক রাজা খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে ঐ দুর্গ নির্ম্মাপিত করেন। দুর্গাভ্যন্তরে যে সকল জৈনমন্দির আছে, তাহা দ্বারা এই কিংবদন্তীর সত্যতা প্রমাণীকৃত হয়। সেই প্রাচীন অট্টালিকা সকল এরূপ সুদৃঢ় ও সুগঠিত ছিল যে, কুম্ভ সেগুলি ভাঙ্গিয়া না ফেলিয়া তাহার সঙ্গে নূতন সৌধরাজি সংযোজিত করিয়া ইহাকে একটি অপূর্ব্ব দুর্গে পরিণত করিয়াছিলেন। কুম্ভ নাগোর নগর বলে অধিকার করিয়া তাহার অপূর্ব্ব তোরণ সকল আনিয়া কুম্ভমীর দুর্গে বসাইয়া দেন। এই সকল তোরণের উপর ভক্তবীর হনুমানের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাপিত আছে। তিনি যেন সেই দুর্গের রক্ষাকার্য্যে ব্রতী হইয়া রহিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তিনি আবু-পর্ব্বতের শিখরদেশে একটি অপূর্ব্ব দুর্গ নির্ম্মাপিত করেন। এই দুর্গটি প্রমরবংশীয় নরপতিগণের অতি বিশাল দুর্গের অভ্যন্তরে অবস্থিত। এই দুর্গে তিনি অনেক সময় বাস করিতেন। ইহার বারুদখানা ও ভীতি-সৌধ * অদ্যাপি কুম্ভের নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। এই দুর্গের একটি মন্দিরে কুম্ভ ও তদীয় পিতার পিত্তলের মূর্ত্তি অদ্যাপি পূজিত হইয়া থাকে। কত শতাব্দী অতীত হইয়াছে, সেখান হইতে মিবারের আধিপত্য চলিয়া গিয়াছে, তথাপি তথাকার লোকে আজও কুম্ভ ও তদীয় পিতাকে দেবতার ন্যায় পূজা করিয়া থাকে। ইহাকেই বলে প্রকৃত রাজভক্তি। কুম্ভ প্রতীচ্য সীমা ও আবুপর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী গুহাপ্রদেশে অনেকগুলি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সিরোহীর নিকট বাসন্তী নামক দুর্গ এবং সেরনালা ও দেবগড় রক্ষার জন্য সেরনালা গিরিসঙ্কটমুখে অবস্থিত প্রাচীন দুর্গ অদ্যাপি তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে। এতদ্ভিন্ন তিনি জারোল ও পানোরা ভূমিয়া (ভূম্যধিকারী) ভীলদিগকে প্রদর্শন করিবার জন্য আহোর প্রভৃতি কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্গ প্রস্তুত করান। তদ্ভিন্ন তিনিই সর্ব্বপ্রথমে নিঃসন্দিগ্ধরূপে মাড়ওয়ার ও মিবার-রাজ্যের সীমা নির্দ্দেশ করেন।

তাঁহার সমর-বিষয়িণী প্রতিভার জলন্ত সাক্ষিস্বরূপ এই সকল সামরিক দুর্গ ভিন্নও ধর্ম্মবিষয়ক কীর্ত্তিরাজিও তাঁহার নাম মিবারে চিরস্মরণীয় করিয়া

* যে উত্তুঙ্গ টাওয়ারে বসিয়া শত্রুর আগমন ঘোষণা করা হয়।

রাখিয়াছে। তিনি আবু পর্ব্বতের শিখরদেশে "কুন্দস্তাম" নামে এক অপূর্ব্ব মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই মন্দির অদ্যাপি দর্শকগণের মনে বিস্ময়রসের অবতারণা করিয়া থাকে। এই মন্দির অন্য দেশে প্রতিষ্ঠাপিত হইলে বোধ হয়, এত দিন এই মন্দিরের নাম জগদ্বাসী সকলেই জানিতে পারিত। কিন্তু কুম্ভের অন্যান্য কীর্ত্তিকলাপের সহিত তুলনায় ইহা যেন রাহুগ্রস্ত হইয়া রহিয়াছে। কুম্ভের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি "ঋষভ দেবের মন্দির।" এই মন্দির সদ্রিগিরি-সঙ্কটে অবস্থিত। এই গিরিপথ দিয়া মিবারের প্রতীচ্য অধিত্যকাপ্রদেশ হইতে অবতরণ করিয়া মিবারের সমতলক্ষেত্রে আসিতে হয়। রাণার জৈনধর্ম্মাবলম্বী মন্ত্রিপ্রবর ১৪৩৮ খৃষ্টাব্দে এই মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন করেন। এই মন্দির নির্ম্মাণ করিতে এক কোটি বিশ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়। কুম্ভ নিজ কোষ হইতে ইহার দ্বাদশ ভাগমাত্র প্রদান করেন। অবশিষ্ট সমস্ত টাকা চাঁদা দ্বারা সংগৃহীত হয়। এরূপ উচ্চ ও বিশাল মন্দির পৃথিবীতে আর আছে কি না সন্দেহ। ইহা ত্রিতল, প্রত্যেক তল অসংখ্য প্রস্তরময় স্তম্ভে সংরক্ষিত। এক একটি স্তম্ভ উচ্চে চত্বারিংশৎ পাদ পরিমিত। স্তম্ভগুলির অঙ্গ-গাত্র বহুমূল্য হীরকরত্নাদিখচিত, এবং খোদিতাক্ষর ও খোদিতছবি। ইহার নিম্নস্থল ভূগর্ভস্থ। সেই নিম্ন-তলের প্রত্যেক গোলার্দ্ধের * নিম্নে এক এক জন জৈন ঋষির মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাপিত আছে। ইহার নিভৃত অবস্থান হেতু ইহা ধর্ম্মান্ধ যবনগণের কুঠারাঘাত বক্ষে ধারণ করে নাই। এক্ষণে এই নির্জ্জন মন্দির কেবল ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তুর আবাসভূমি হইয়া রহিয়াছে।

রাণা কুম্ভের পারিবারিক জীবন

কুম্ভ রাঠোরবংশীয় মৈর্ত্তানগরের অধিপতির কন্যাকে বিবাহ করেন। এই বংশ মাড়ওয়ারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়বংশ। রাণা স্বয়ং যেমন সুকবি ছিলেন, তাঁহার মহিষী মীরাবাইও সেইরূপ সুকবি বলিয়া প্রথিত ছিলেন। কুম্ভ যে শুদ্ধ কবিতা লিখিতে পারিতেন, এরূপ নহে, তিনি কবিত্বের প্রকৃত মর্ম্মোদ্ভেদে সমর্থ ছিলেন। জয়দেবের অপূর্ব্ব প্রেম-গীতি, গীতগোবিন্দের অতি সুললিত ও সুন্দর টীকা লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ভার্য্যাও সম্পূর্ণরূপে তাঁহার যোগ্যা ছিলেন। তিনি কৃষ্ণভক্তি বিষয়ে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুন্দর গীতিকাব্য লিখিয়া গিয়াছেন। মীরাবাইয়ের রূপলাবণ্য ও ধর্ম্মানুষ্ঠান—দুইই লোকের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল। তাঁহার অনেকগুলি সুললিত গীতি-কাব্য কালের করাল গ্রাস হইতে পরিরক্ষিত হইয়াছে।

তাঁহার জীবন উপন্যাসের নায়িকার ন্যায় অপূর্ব্ব ও ঘটনাপূর্ণ। তিনি যমুনা-পুলিন হইতে দ্বারকা পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানে যতগুলি কৃষ্ণের মন্দির ছিল, সমস্ত প্রদর্শন করিয়া আসেন। এই তীর্থ-পর্য্যটন কালে তাঁহার জীবনে অনেকগুলি ঔপন্যাসিক ঘটনা সংঘটিত হয়। সে সকল ঐতিহাসিকের বর্ণনীয় নহে বলিয়া এখানে উল্লিখিত হইল না। যাহা হউক, মীরাবাই যে সৌন্দর্য্যে ও ধর্ম্মপরায়ণতায় তৎকালে আদর্শ-রমণী বলিয়া গণ্যা হইয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

কুম্ভের জীবন-নাটকের শেষাঙ্ক

কুম্ভ যে শুদ্ধ বীর ছিলেন, এরূপ নহে। তিনি একজন বিখ্যাত প্রেমিক ছিলেন। বীরপুরুষ-মাত্রেই প্রায় প্রেমিক হইয়া থাকেন। তাঁহারা প্রায়ই রমণীর উপাসক। বাপ্পারাউল, আলেক্জাণ্ডার, নেপোলিয়ন, গ্যারিবল্ডী প্রভৃতি জগতের প্রখ্যাতনামা বীরবৃন্দ সকলেই রমণীকুলের উপাসক ছিলেন। কুম্ভের প্রেম-পিপাসা শুদ্ধ মীরাবাইয়ে নিরস্ত হয় নাই। তিনি ঝালাবর সামন্তের দুহিতার রূপলাবণ্যের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়া রাক্ষসবিবাহ করেন। মণ্ডোর-রাজকুমারের সহিত এই রমণীর বিবাহ সম্বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং এই ঘটনায় মিবারের সহিত মণ্ডোরের পূর্ব্ব-শত্রুতা বলবতী হইয়া উঠিল। মণ্ডোর-রাজকুমার নিজ ভবিষ্য ভার্য্যার উদ্ধারের বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারিলেন না। মণ্ডোর-রাজকুমারের জীবন অতঃপর বিড়ম্বনাময় হইয়া উঠিল। শরতের বিমল রজনীতে মণ্ডোরের দুর্গ

* Vaults.

হইতে কুম্ভমীর দুর্গের ভীতি-সৌধ স্পষ্ট দেখা যাইত, মণ্ডোর-রাজকুমার সেই নিভৃত কক্ষে বসিয়া এক-দৃষ্টিতে সেই ভীতিসৌধের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন। কারণ, তাঁহার প্রাণেশ্বরী সেই সৌধে বাস করিতেন। জ্যোৎস্না-রাত্রিতে সৌধের ধবলতা-মাত্র উপলব্ধি হইত। কিন্তু অন্ধকার রজনীতে সেই সৌধের দীপালোক হইতে কিরণ আসিয়া তাঁহার তমসাচ্ছন্ন হৃদয়কে আলোকিত করিত। যুবরাজ আর বিচ্ছেদ-যাতনা সহিতে অক্ষম হইয়া এক রজনীতে সেই কুম্ভমীর দুর্গে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি মই লাগাইয়া সেই ভীতি-সৌধে উঠিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময় প্রহরীরা জানিতে পারিল। তিনি একলম্ফে নামিয়া বনজঙ্গল ভাঙ্গিয়া পলায়ন করিলেন। এই জন্য একটি প্রবাদ হইয়া আছে যে, তিনি ঝাল (জঙ্গল) ভেদ করিয়া গিয়াও ঝালানীকে (ঝালাবর-রাজনন্দিনী) পাইলেন না।

কুম্ভের রাজত্বকাল অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ণ হইল। এই পঞ্চাশৎ বৎসরে তিনি রাজ্যের সমস্ত শত্রুকে পরাজিত ও সুদৃঢ় দুর্গাবলী দ্বারা ইহাকে সুসংরক্ষিত এবং অপূর্ব্ব মন্দিরমালা দ্বারা ইহাকে পরিশোভিত করিয়া মিবারের নাম জগদ্ব্যাপী করিয়া তুলেন। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নাম মিবারবক্ষে অনন্তকালের জন্য অমর-বর্ণে অঙ্কিত করেন। তদীয় রাজ্যের যে পঞ্চাশত্তম বৎসরে তাঁহার সামন্তবর্গ ও প্রজাগণ একতানে ও একপ্রাণে তাঁহার প্রতি অবিচলিত ভক্তি-প্রদর্শনার্থ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পঞ্চাশৎ বৎসরের রাজত্ব-উৎসব বা জুবিলি করিবার জন্য আয়োজন করিতেছিলেন, সেই শুভ বৎসরেই (সংবৎ ১৫২৫, খৃষ্টাব্দ ১৪৬৯) এক লোমহর্ষণ ব্যাপার দ্বারা তাঁহার সামন্ত ও প্রজাবর্গের সেই উৎসব বিষাদে পরিণত করে। এক গুপ্ত-হত্যাকারীর অতর্কিত ও অদৃষ্ট অস্ত্রে এই মহাপ্রাণ, মহাবীর ও মহাপ্রবীণ এবং প্রজাবৎসল ও প্রজাপ্রাণভূত নরপতির জীবনাভিনয়ের পরিসমাপ্ত হয়। এ গুপ্ত-হত্যাকারী আবার যে কেহ নহে, তদীয় পুত্র উডাই এই জঘন্য কার্য্য দ্বারা আপনাকে সেই পবিত্র পিতৃবংশকে ও পবিত্র হিন্দুনামকে চিরকলঙ্কিত করিয়া গিয়াছে। এই পিতৃহত্যা উজ্জ্বল হিন্দু ইতিহাসে অতি গভীর কালিমারেখা অর্পণ করিয়াছে। এরূপ রাজার এরূপ শোচনীয় মৃত্যুতে সমস্ত মিবারবাসী শোকে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। প্রতিগৃহে ক্রন্দনের রোল উঠিল। প্রতিগৃহস্থ শোক-চিহ্ন ধারণ করিল। এরূপ বিশ্বব্যাপিনী শোকাভিভূতি ভারতে আর একবারমাত্র অনুভূত হইয়াছিল। যে দিনে রাণা-বংশের আদিপুরুষ রামচন্দ্রের অভিষেক বননির্ব্বাসনে পরিণত হয়, সেই দিন কেবল প্রজাগণ বালবৃদ্ধনির্ব্বিশেষে এইরূপ কাঁদিয়াছিলেন! কুম্ভ! তুমি মরিলে বটে, কিন্তু তোমার স্মৃতি তোমার প্রজামণ্ডলীর হৃদয়-ক্ষেত্রে অনন্তকালের জন্য জীবিত রহিল! এরূপ মৃত্যু শোচ্য নহে।

রাণা উডা হাতিয়ারো বা পিতৃ-হন্তা

রাণা উডা অস্বাভাবিক দুরাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া পিতার দীর্ঘজীবন সহিতে না পারিয়া তাঁহার প্রাণবধ করিয়া তদীয় সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। দুর্দ্দমনীয় রাজ্য-পিপাসায় উপহত-বিবেক হইয়া সিংহাসনপ্রাপ্তির আশায় মিবার-কহিনুর ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত তাঁহাকে হাতে হাতে করিতে হইল। মিবারবাসিগণ আবালবৃদ্ধবনিতা তাঁহাকে অতঃপর হাতিয়ারো বা পিতৃহন্তা বলিয়া ডাকিতে লাগিল। কেহ তাঁহার নিকটে যাইত না—কেহ তাঁহার নামও মুখে উচ্চারণ করিত না! আত্মীয় স্বজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া তিনি অন্তশ্চর সামন্তবর্গ ও বহিশ্চর রাজন্যবর্গের শরণাপন্ন হইলেন। যে মিবারের মহিমা তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের সময়ে দিগন্তব্যাপী হইয়াছিল, সে মহিমা যেন সহসা রাহুগ্রস্ত হইল। তিনি দেওরা সামন্তকে আবুপ্রদেশে স্বাধীন করিয়া দিলেন এবং মিত্রতার মূল্যস্বরূপ যোধপুরাধিপতি * যোধাকে সম্বর, আজমীর এবং নিকটবর্ত্তী জেলা সকল প্রদান করিলেন। কিন্তু তাঁহার হৃদয় অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিল।

---

* যোধা উডার সিংহাসনাধিরোহণের দশ বৎসর পূর্ব্বে (১৫১৫ সংবৎ) তদীয় রাজধানী যোধপুরে স্থাপনা করেন।

পিতৃহন্তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত

তিনি বুঝিলেন যে, তিনি কাহারও নিকট শ্রদ্ধা, ভক্তি বা সম্মানের আশা করিতে পারেন না। তিনি বুঝিলেন যে, যে সকল রাজন্য ও সামন্ত তাঁহার সাহায্য করিতেছেন, সে কেবল রাজ্যলোভে। যত দিন তিনি নিজ রাজ্যের অংশ দিয়া তাঁহাদিগের রাজ্য-পিপাসা শান্তি করিতে পারিবেন, তত দিনই কেবল তাঁহাদের নিকট সাহায্য পাইতে পারিবেন। সুতরাং তিনি রাজ্যের অংশ দিয়া সাহায্য ক্রয় করা অপেক্ষা, দিল্লীর সম্রাটকে কন্যাদান করিয়া তাঁহার নিকট নিজ অবৈধ উপায়ে রাজ্যপ্রাপ্তির অনুমোদন ভিক্ষা অধিকতর সম্মানের বিষয় মনে করিলেন। কিন্তু বিধাতা এ ঘোর অপমান ও কলঙ্ক হইতে বাপ্পারাউলের বংশকে রক্ষা করিবার জন্য নিজের বজ্র-অস্ত্র গ্রহণ করিলেন। পিতৃহন্তা দিল্লীশ্বরের সহিত নিজ কন্যার বিবাহের প্রস্তাব করিয়া দেওয়ানখানা হইতে যেমন বাহির হইয়াছেন, অমনি দুর্গ হইতে বিদ্যুদ্দণ্ড তদীয় মস্তকে পতিত হইয়া তাঁহাকে ভূপাতিত করিল। এইরূপে শিশোদীয়া-বংশের কুলাঙ্গার উডা পঞ্চ বৎসরের অবৈধ ঘৃণিত রাজত্বের পর অকালে কাল-কবলে পতিত হইলেন। তদীয় মৃত্যুতে এক বিন্দু শোকাশ্রু পতিত হইয়া পবিত্র মিবারক্ষেত্রকে দূষিত করিল না।

রায়মল্ল

রায়মল্ল রাণা কুম্ভের জ্যেষ্ঠপুত্র। সুতরাং তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে কুম্ভের সিংহাসনাধিকারী, ঝুনঝুনুর যুদ্ধে জয়লাভের পর অবধি কুম্ভ সিংহাসনে বসিবার পূর্ব্বেই নিজ তরবারিকে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক তিনবার চক্রাকারে ঘুরাইতেন। এই গূঢ় সমস্যার উদ্ভাবন করিতে অত্যন্ত কৌতূহলী হওয়ায় কুম্ভ তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করেন। তাহাতেই কুম্ভের সিংহাসনে কনীয়ান্ পুত্র উডার অধিকার জন্মে এবং সেই লোভেই তিনি চ্যুতধৈর্য্য হইয়া পিতৃহত্যা-পাপে লিপ্ত হন। পিতৃহত্যার সংবাদ পাইয়া রায়মল্ল মিবারে আগমন করেন এবং অবিরাম সংঘর্ষের পর উডাকে রণে পরাজিত করেন। সেই পরাজয়ের পরই উডা দিল্লীতে পলায়ন করেন, এবং নিজ কন্যা দিয়া দিল্লীশ্বরের সাহায্য-ভিখারী হন।

রাণা রায়মল্ল ১৫৩০ সংবৎ বা ১৪৭৪ খৃষ্টাব্দে স্ববিক্রমে কুম্ভের সিংহাসনে আরোহণ করেন। আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, রায়মল্ল কর্ত্তৃক পরাজিত পিতৃহন্তা দিল্লীর সম্রাটের শরণাপন্ন হন ও তাঁহার সাহায্যের নিষ্ক্রয়স্বরূপ তাঁহাকে নিজ দুহিতা সম্প্রদান করিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু বজ্রাঘাতে তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় বাপ্পারাউলের পবিত্র বংশ এই ঘোর কলঙ্ক হইতে রক্ষা পায়। অপঘাতে তাঁহার মৃত্যুতে দিল্লীশ্বরের হৃদয় ব্যথিত হয়। দিল্লীশ্বর শরণাগত-বাৎসল্য-পরতন্ত্র হইয়া পিতৃহন্তার দুই পুত্র সেহেশমল্ল ও সুরজমল্লকে লইয়া মিবার আক্রমণ করেন। যবন-সম্রাট সিঘাড়া নগরে (বর্ত্তমান নাথদ্বার) গিয়া সৈন্যাবাস স্থাপন করেন। মিবারের সামন্তবর্গ সিংহাসনের বৈধ অধিকারী রায়মল্লের প্রতি অবিচলিতভক্তি ছিলেন। সুতরাং রায়মল্ল তাঁহাদিগের এবং আবু ও গীর্ণারের মিত্ররাজদ্বয়ের সাহায্যে অবিলম্বে অষ্টপঞ্চাশৎ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য এবং একাদশ সহস্র পদাতিক সৈন্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইলেন। এই সমবেত সেনা লইয়া তিনি ঘাসা সমরক্ষেত্রে যবন-সম্রাট ও ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয়ের সম্মুখীন হইলেন। উভয় পক্ষে তুমুল রণ হইল। সমীপবর্ত্তিনী নদী সকল অবিরাম শোণিত বহন করিতে লাগিল। পিতৃহন্তার পুত্রদ্বয় বিক্রমে কেশরী ছিলেন। সুতরাং রায়মল্লের সেনা তাঁহাদের বীরত্বে স্খলিতপদ হইবার উপক্রম হইল। কিন্তু যে পক্ষে ধর্ম্ম, বিজয়লক্ষ্মী অবশেষে সেই পক্ষই অবলম্বন করিলেন। রায়মল্ল সেই মহতী যবন-সেনাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন। যবন-সম্রাট রায়মল্লের পরাক্রমে এতদূর ভীত হইয়াছিলেন যে, সেই যুদ্ধের পর আর মিবারে প্রবেশ করেন নাই।

জয়মল্লের বীরত্ব ও মহাপ্রাণতা

এই সাহায্যের পুরস্কারস্বরূপ রায়মল্ল এক কন্যা গীর্ণারাধিপতি যদুবংশীয় শূরজীকে ও অন্য কন্যা দেওরা-বংশীয় সিরোহী নগরাধিপতি জয়মল্লকে সম্প্রদান করিলেন এবং দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহ-যৌতুকস্বরূপ আবু-প্রদেশ চিরস্থায়ী জায়গীরস্বরূপ জয়মল্লকে প্রদান

করিলেন। জয়মল্ল ঘাসা যুদ্ধক্ষেত্রে ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয়ের অসাধারণ বীরত্ব দেখিয়া তাঁহাদিগের উপর এতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহাদিগের সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিলেন এবং তাঁহাদিগকে সৈন্য-বিভাগে অতি উচ্চ পদ প্রদান করিলেন। তিনি বীরত্বে বাপ্পা-রাউল, হামির ও রাণা কুম্ভ প্রভৃতি পিতৃপুরুষগণের ন্যূন ছিলেন না। তিনি সিংহাসনারোহণের পর অবধি নিরন্তর সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ ছিলেন। প্রত্যেক সমরেই তিনি বিজয়লাভ করিয়া শত্রুগণের ভীতিস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি মালবাধিপতি ঘিয়াসউদ্দীনকে অনেকগুলি নিয়মিত রণে পরাস্ত করেন। এই সকল যুদ্ধে তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয়ের বীরত্বে সবিশেষ উপকৃত হন। অবশেষে তিনি তাঁহার সমস্ত দাবী পরিত্যাগ করিয়া রায়মল্লের নিকট শান্তি ক্রয় করেন। এই সময়ের পর লোদীবংশীয় সম্রাটগণ দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। ইহাদিগের সহিত মিবারের উত্তর-সীমা লইয়া রাণার কিছুকাল সংঘর্ষ চলে।

রায়মল্লের তিনটি পুত্র-সন্তান জন্মে,—সঙ্গ, পৃথ্বীরাজ ও জয়মল্ল। তিন জনই রাজপুত ইতিহাসে সবিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। সঙ্গ দিল্লীশ্বর বাবরের প্রতিদ্বন্দ্বী, এবং পৃথ্বীরাজ বীরত্বে ভীমোপম। ইঁহারা দুইজনে ঝালী-রাণীর গর্ভজাত। জয়মল্ল অন্য রাণীর গর্ভে উৎপন্ন, সুতরাং সঙ্গ ও পৃথ্বীরাজের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। সঙ্গ রণে অজেয় ছিলেন বলিয়া "সংগ্রাম সিংহ" নামেও অভিহিত হইতেন। রায়মল্লের দুর্ভাগ্যতা নিবন্ধন তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে মধুময় ভ্রাতৃপ্রেমের পরিবর্ত্তে বিষময় বিদ্বেষভাব বদ্ধমূল হয়। এই ভ্রাতৃবিদ্বেষ মিবার ও মিবারাধিপতির নিরন্তর অশান্তির কারণ হইয়া উঠে। ভ্রাতৃত্রয়ের পরস্পরবিদ্বেষ যে শুদ্ধ তাঁহাদিগের হৃদয়কে কলুষিত করিয়া নিরস্ত হয়, এরূপ নহে; ইহার বাহ্যবিস্ফুরণে মিবাররাজ্য ও রাজ-পরিবার নিরন্তর দগ্ধ হইয়াছিল। এই সংঘর্ষ উপস্থিত না হইলে বোধ হয়, রায়মল্লের রাজত্বকাল তদীয় যে কোন পূর্ব্বপুরুষের রাজত্বকালের সমতুল হইতে পারিত। কিন্তু যেরূপ ঘটিয়াছিল, তাহাতে ইহা নিরন্তর অন্তর্ব্বিপ্লবে সম্পূর্ণ বিপরীত আকার ধারণ করিয়াছিল। সঙ্গ আত্মজীবন-রক্ষার জন্য অগ্রেই মিবার হইতে স্বেচ্ছানির্ব্বাসিত হন। দ্বিতীয় পুত্র পৃথ্বীরাজের দুর্দমনীয়তা নিবন্ধন রায়মল্ল তাঁহাকে রাজ্য হইতে নিষ্কাশিত করিতে বাধ্য হন। তৃতীয় পুত্র জয়মল্ল পতঙ্গবৎ নিজ কামানলে পতিত হইয়া ভস্মীভূত হন। দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে গিয়া তিনি গুপ্তহত্যাকারীর অস্ত্রে প্রাণত্যাগ করেন।

——

রায়মল্লের পুত্রগণের সংঘর্ষ

পৃথ্বীরাজ আপনাকে সার্থকনামা করিবার জন্য সর্ব্বদা রণে অবতীর্ণ হইতেন। যখন রাজ্যে প্রগাঢ় শান্তি বিরাজ করিতেছিল, তখনও তিনি সামান্য সামান্য ঘটনা উপলক্ষ করিয়া নিজের অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করিতেন। তাঁহার শৌর্য্য-বীর্য্য আজও মিবারবাসিগণের বিস্ময়ের বিষয় হইয়া রহিয়াছে। আজও বীরের নামোল্লেখকালে তাঁহারই নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লিখিত হইয়া থাকে। পৃথ্বীরাজ বীরত্বে অদ্বিতীয় ছিলেন বটে, কিন্তু ভীমের ন্যায় তাঁহারও আত্মসংযমশক্তি ছিল না। সামান্য বিষয়ে তিনি উত্তেজিত হইয়া নিজের বীরত্ব প্রদর্শন করিতে যাইতেন। ইহাতে রাষ্ট্রবিপ্লব হইবার সম্ভাবনা মনে করিয়া রায়মল্ল তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করেন। সঙ্গ ইহার ঠিক বিপরীত-প্রকৃতির লোক ছিলেন। যদিও তাঁহার সাহসিকতা পৃথ্বীরাজের সাহসিকতার ন্যূন ছিল না, তথাপি তিনি এরূপ সংযমী ও চিন্তাশীল ছিলেন যে,—তিনি সহসা কোন বিষয়ে উত্তেজিত হইতেন না, বিশেষ কারণ উপস্থিত না হইলে তিনি কখনই নিজ শৌর্য্য-বীর্য্য প্রদর্শন করিতেন না। অর্জ্জুনে ও ভীমে যে প্রভেদ ছিল, সঙ্গে ও পৃথ্বীরাজেও সেই ভেদ উপলব্ধি হইত। কিন্তু সঙ্গ পৃথ্বীরাজের জ্যেষ্ঠ, এইমাত্র বিপর্য্যয়। সঙ্গ পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করিবেন—এ চিন্তাও পৃথ্বীরাজের অসহনীয় হইত। এই জন্য তিনি প্রজাবর্গের চিত্তাকর্ষণ করিবার জন্য স্থানে অস্থানে, কালে অকালে নিজ শৌর্য্য-বীর্য্য প্রদর্শন করিতেন এবং সর্ব্বদা বলিতেন যে, "বিধাতা নিশ্চয়ই আমায় মিবারশাসন করিবার জন্য পাঠাইয়াছেন। এক দিন তিনি পাতায় বসিয়া খুল্লতাত সুরজমল্লের সহিত সকল বিষয়ে কথোপকথন করিতেছিলেন, এমন সময় সঙ্গ বলিয়া উঠিলেন যে, "যদিও তিনি মিবারের

দশ সহস্র নগরের ভাবী উত্তরাধিকারী, তথাপি তিনি তাঁহার স্বত্বাধিকার পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছেন, যদি নাড়ামুগরো পর্ব্বতোপরি * স্থাপিতা চারণী দেবীর পুরোহিতার সঙ্কেতচিহ্ন তাঁহার প্রতিকূল হয়।" এই প্রস্তাবের পর তাঁহারা সকলে সেই স্থানে গমন করেন। পৃথ্বীরাজ ও জয়মল্ল সর্ব্বাগ্রে তথায় গিয়া উত্তীর্ণ হইয়া এক আস্তীর্ণ শয্যার উপর আসিয়া বসিলেন। সঙ্গ পরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং পুরোহিতার ব্যাঘ্রচর্ম্ম বিস্তার রহিয়াছে দেখিয়া তদুপরি উপবেশন করিলেন। সূর্য্যমল্ল সর্ব্বপশ্চাতে আসিয়া দেখিলেন যে, বসিবার আসন নাই, তখন তিনি একটি জানু সঙ্গাধিকৃত সেই ব্যাঘ্রচর্ম্মাসনের উপর রাখিয়া অপর জানু উত্তোলিত করিয়া বসিলেন। সকলে সমাসীন হইলে পৃথ্বীরাজ আপনাদিগের আগমনের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। পুরোহিতা সেই ব্যাঘ্রচর্ম্মের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন যে, "যিনি ঐ সিংহাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন, উনিই রাজচক্রবর্ত্তী হইবেন ; এবং যিনি এক জানু উক্ত সিংহাসনে রাখিয়া অপর জানু উচ্চ করিয়াছেন, তিনি রাজ্যের একটি ক্ষুদ্র অংশমাত্র প্রাপ্ত হইবেন।" রোমিউলস্ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রীমস্‌কে যেরূপে শমনসদনে প্রেরণ করিয়াছিলেন, আজ পৃথ্বীরাজ পুরোহিতার লাক্ষণিক ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া ঠিক সেইভাবে অসি নিষ্কোষিত করিয়া জ্যেষ্ঠের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। সুরজমল্ল মধ্যে আসিয়া বাধা না দিলে সেই উদ্যত অসি নিশ্চয়ই সঙ্গের দেহকে দ্বিধা বিচ্ছিন্ন করিত ও পুরোহিতার ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হইত। কিন্তু সুরজমল্ল তাহা হইতে দিলেন না। তিনি নিজের ক্ষত-বিক্ষত-দেহ লইয়া মিবারের মুকুটমণি সঙ্গের জীবনরক্ষা করিলেন। সঙ্গ প্রাণভয়ে পলায়ন করিলেন বটে, কিন্তু অক্ষতশরীরে যাইতে পারিলেন না। পৃথ্বীরাজের খড়্গ তাঁহার শরীরে পঞ্চ ক্ষতচিহ্ন অঙ্কিত করিল এবং তদীয় তীর জন্মের মত সঙ্গের একটি চক্ষু অন্ধ করিয়া দিল। জয়মল্ল পলায়মান সঙ্গের অনুসরণ করিলেন।

* এই পর্ব্বত উদয়পুরের পঞ্চক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে ব্যাঘ্রের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব বলিয়া পর্ব্বতকে লোকে "ব্যাঘ্র পর্ব্বত" বলিয়া থাকে।

*. সিংহ বা ব্যাঘ্রচর্ম্মের আসন।

এ দিকে সুরজমল্ল ও পৃথ্বীরাজে ঘোরতর দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলিতে লাগিল। উভয়ে উভয়ে খড়্গাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত শরীর হইলেন। বীরত্বে উভয়েই জগতে অতুলনীয়—সুতরাং কেহ কাহার নিকট পরাজিত হইবার নহেন। অবশেষে নিরন্তর রক্তমোক্ষণে উভয় শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল। তখন পার্শ্বচরেরা উভয়েরই যুদ্ধস্থল হইতে লইয়া চলিয়া গেল।

এ দিকে সঙ্গ চতুর্ভুজের মন্দিরাভিমুখে পলায়ন করিলেন ; তিনি বেগগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া সাবন্তী প্রদেশ দিয়া গমন করিতেছিলেন। তথায় তিনি এক দেবমন্দিরের সম্মুখে বিশ্রামার্থ অশ্ব থামাইলেন। মন্দিরাধ্যক্ষ বীডা তাঁহাকে অতি কষ্টে অশ্ব হইতে অবতারিত করিয়া যেমন মন্দির-মধ্যে প্রবেশিত করিয়াছেন, সেই সময়ই অনুসরণকারী জয়মল্ল তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আশ্রয়দাতা অতিথিকে মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিতে বলিলেন, এবং স্বয়ং সেই আততায়ী রাজকুমারের সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে অতিথির প্রাণরক্ষার জন্য নিজের প্রাণোৎসর্গ করিলেন। ইত্যবসরে সঙ্গ মন্দিরের পশ্চাদ্দ্বার দিয়া মন্দির হইতে বহির্গত হইয়া পলায়ন করিয়া নিজ প্রাণরক্ষা করিলেন।

সঙ্গের দৈবাভিষেক ও পরিণয়

এ দিকে পৃথ্বীরাজ ক্রমে ক্রমে ব্রণক্ষত হইতে আরোগ্য লাভ করিলেন। সঙ্গও ভ্রাতার অক্ষালনীয় শত্রুতা হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য আত্মগুপ্তির বিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। যিনি ভবিষ্যতে একদিন তাইমুর বংশোদ্ভব দিল্লীর সম্রাট বাবরের বিরুদ্ধে রণস্থলে শতসহস্রসংখ্যক সৈন্য অবতারিত করিতে পারিয়াছিলেন, আজ সেই সঙ্গ গোপালনেও অসমর্থ বলিয়া যাহারা কৃষক-গৃহ হইতে নিষ্কাশিত হইয়াছিল, এবম্ভূত মেষপালকগণের সহিত মৈত্রবন্ধনে আবদ্ধ হইতে বাধ্য হইলেন। আল্‌ফ্রেড্ দি গ্রেটের ন্যায় সঙ্গও রুটী প্রস্তুত করিতে গিয়া রুটী পুড়াইয়া ফেলায়, কার্য্যে "যোগ্যতাশূন্য আহারপটু" বলিয়া তিরস্কৃত হইয়াছিলেন। মহাপুরুষগণের জীবনী

এইরূপ বিপরীত ঘটনাবলীর সমাবেশেই গঠিত হইয়া থাকে। কতিপয় বিশ্বস্ত রাজপুত তাঁহাকে এইরূপ দুরবস্থায় পতিত দেখিয়া তাঁহাকে একটি দ্রুতগামী অশ্ব ও প্রয়োজনীয় অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা সংযোজিত করিলেন এবং তাঁহাদিগের অধিনায়ক করিয়া শ্রীনগরাধিপতি * রাও করিমচাঁদ প্রমরের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। করিমচাঁদ তাঁহাদিগকে নিজ সৈন্যতালিকাভুক্ত করিয়া লইলেন এবং তাঁহাদিগকে লইয়া সীমান্তবর্ত্তী রাজ্য আক্রমণ করিলেন। একদিন এইরূপ আক্রমণ-ব্যাপারে ক্লান্ত হইয়া সঙ্গ অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক এক বটতলে শয়ন করিলেন। তাঁহার ছোবার উপর মস্তক রাখিয়া তিনি নিদ্রা যাইতেছিলেন, এবং জয়সিংহ বলেয়ো ও রৈমুসিদ্দিল্ নামক দুইজন রাজপুত সহচর তাঁহার রন্ধনকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। এ দিকে তাঁহাদিগের অশ্ব সকল পার্শ্ববর্ত্তী শাদ্বল ক্ষেত্রে তৃণ ভক্ষণ করিতেছিল। এরূপ সময়ে সূর্য্যকিরণ পত্র ভেদ করিয়া সঙ্গের মস্তকোপরি আসিয়া পতিত হইল। একটি বিষধর রৌদ্র পোহাইবার মানসে সঙ্গের মস্তকোপরি আরোহণ করিল, এবং কুণ্ডলিতদেহ হইয়া ফণা তুলিয়া তথায় বসিয়া রহিল। একটি দেবী পক্ষী এই সময় সেই বিষধরের ফণার উপর আসিয়া বসিল ও মনের উল্লাসে কত কি বুলী বলিতে লাগিল। মারু নামক একজন মেষপালক সেই সময় সেই পথ দিয়া যাইতেছিল। সে সেই পক্ষিকূজিতের অর্থ বুঝিত। সে বৃক্ষতলে উপস্থিত হইলেই সঙ্গের নিদ্রাভঙ্গ হইল। মেষপালক নিদ্রোত্থিত সঙ্গকে জানাইলেন যে, তিনি রাজচক্রবর্ত্তী হইবেন। সঙ্গ তাহার কথা বিশ্বাস করিলেন না। কিন্তু সে গিয়া রাজাকে জানাইল যে, তিনি একজন রাজচক্রবর্ত্তী দ্বারা অনুসেবিত হইতেছেন। প্রমররাজ এ রহস্যের উদ্ভেদ করিলেন না এবং সঙ্গের ভবিষ্যৎ সৌভাগ্যের প্রত্যয়ে তাঁহাকে এক কন্যা সম্প্রদান করিলেন। বিবাহের পর তিনি জামাতাকে সর্ব্বপ্রকার বিপদ হইতে রক্ষা করিতে লাগিলেন। অবশেষে ভ্রাতার শোচনীয় মৃত্যুর পর সঙ্গ পিতৃ-সিংহাসন অলঙ্কৃত করিবার জন্য চিতোরে আহূত হইলেন।

---

* এই শ্রীনগর আজমীরের অদূরে অবস্থিত।

পৃথ্বীরাজের নির্ব্বাসন ও মিবারের অন্তর্দ্দৌর্ব্বল্য

যখন পৃথ্বীরাজের ভ্রাতৃহননোদ্যমের সংবাদ রায়মল্লের কর্ণগোচর হইল, তখন তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইয়া পৃথ্বীরাজকে নিজরাজ্য হইতে নিষ্কাশিত করিলেন এবং নিষ্কাশন সময়ে বলিলেন যে, তিনি আপন বীরত্ব ও দ্বন্দ্বপ্রিয়তা-বৃত্তির চালনা দ্বারা যথা ইচ্ছা তথা যাইয়া আত্মজীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন। পৃথ্বীরাজ পঞ্চজন অশ্বারোহী সৈন্যমাত্র লইয়া পিতৃগৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গোদ্‌ওয়ারপ্রদেশস্থ বলেহ নগরাভিমুখে ধাবিত হইলেন। অতীত রাজত্বের শোচনীয় পরিণামের পর এই সকল অন্তর্ব্বিচ্ছেদ সংঘটিত হওয়ায় মিবার-রাজ্য অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। এই অন্তর্দ্দৌর্ব্বল্য নিবন্ধন আরাবলী পর্ব্বতের অধিবাসিগণ এতদূর নির্ভয় হইয়া উঠিল যে, যাহারা গোদ্‌ওয়ারের রাজধানী নাডোলদুর্গে অবস্থিত রাজপুত সেনাকে তুচ্ছ করিয়া সদলে মিবারের সমতলক্ষেত্রে পড়িয়া লুণ্ঠন আরম্ভ করিল। পৃথ্বীরাজ নাডোলে আসিয়া এই সংবাদ পাইয়া তথায় অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া এক মণিকারের বিপণিতে নিজের বহুমূল্য অঙ্গুরীয়ক বিক্রয় করিয়াছিলেন, সুতরাং সে রাজকুমারকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার কার্য্যে আত্মসমর্পণ করিতে স্বীকৃত হইল। পৃথ্বীরাজ মণিকারের সাহায্যে নিজের আবশ্যকীয় সমস্ত দ্রব্যাদি ক্রয় করিলেন। এক্ষণে তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, গোদ্‌ওয়ার প্রদেশ পুনরধিকার করিয়া পিতাকে দেখাইবেন যে, পৃথ্বীরাজ পিতৃ-অনুগ্রহ বিনাও জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন।

তৎকালে মীনবংশীয় ভূস্বামিগণ এই গোদ্‌ওয়ার-প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন। রাজপুতেরা এই প্রদেশ জয় করিয়া কিছুদিন অধিকার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু রায়মল্লের রাজত্বের অন্তর্দ্দৌর্ব্বল্যের সুবিধা পাইয়া মীনবংশীয় একজন রাউত স্বাধীনতা-ধ্বজা উড্ডীন করিলেন এবং সমতলক্ষেত্রস্থিত নাডোলেরী নগরে নিজ রাজধানী প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন। মীনরাজ এরূপ প্রতাপশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, অনেক রাজপুত তদীয় সেনার মধ্যে প্রবেশ করিতে লজ্জাবোধ করেন

নাই। পূর্ব্বোক্ত বণিক ওজার পরামর্শানুসারে পৃথ্বীরাজ ও তদীয় সহচরবর্গও মীনরাজের অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। এই প্রদেশে বৎসরে বৎসরে আভেরীয়া বা মৃগয়োৎসব নামে একটি উৎসব হইয়া থাকে। এই উৎসব উপলক্ষে সকল কর্ম্মচারী আপন আপন পরিবারবর্গের সহিত মিলিত হইয়া উৎসব করিতে পাইতেন।

পৃথ্বীরাজের বিজয়

প্রথমতঃ বোধ হয়, এই প্রথা মৃগয়াশীল ব্যক্তিগণে আবদ্ধ ছিল, কিন্তু ক্রমে ইহা সার্ব্বজনিক উৎসব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। পৃথ্বীরাজও এই উৎসব-উপলক্ষে গৃহে গমন করিতে অনুমতি পাইলেন। তিনি গৃহ-গমন-ব্যপদেশে নগর হইতে বহির্গত হইয়া রাজপথের পার্শ্ববর্ত্তী কোন ঝোপের মধ্যে লুক্কায়িত হইয়া নিজ ষড়যন্ত্রের পরিণাম প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি নগর হইতে বহির্গত হইবার পূর্ব্বে তাঁহার সহচরবর্গকে অসহায় মীনরাজকে বধ করিবার জন্য নগরমধ্যেই রাখিয়া আসিয়াছিলেন। সমস্ত সৈনিক কর্ম্মচারীই তৎকালে উৎসবোপলক্ষে স্ব স্ব আলয়ে গমন করিয়াছিলেন। সুতরাং নগর প্রায় অরক্ষিত অবস্থায় ছিল। এই সুযোগে পৃথ্বীরাজের অনুচরবর্গ মীনরাজকে আক্রমণ করে। মীনরাজ বেগগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করেন। পৃথ্বীরাজও তাহাই অনুমান করিয়া অগ্র হইতে তাঁহার পলায়নপথের পার্শ্বে এক জঙ্গলমধ্যে লুক্কায়িত হইয়াছিলেন। যেমন মীনরাজ সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন, অমনি পৃথ্বীরাজ তদভিমুখে অশ্ব চালিত করিলেন, এবং নিমেষমধ্যে তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইলেন। মীনরাজ আত্মরক্ষার জন্য একটি কেশূলবৃক্ষে পৃষ্ঠ দিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তত হইলেন। কিন্তু পৃথ্বীরাজের সুতীক্ষ্ণ বর্শা তাঁহাকে সেই কেশূলবৃক্ষের সঙ্গে গাঁথিয়া তাঁহার ঐহিক লীলা সমাপ্ত করিল। এইরূপে মীনরাজের প্রাণবধ করিয়া পৃথ্বীরাজ অবিলম্বে তদীয় রাজধানীতে অগ্নি প্রদান করিলেন। মীনীয়গণ অগ্নিদাহ হইতে পলায়ন করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু বিশ্বাবসু সর্ব্বদিক্ হইতে সহসা ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করায় তাহাদিগের সে উদ্যম বিফল হইল। এইরূপে একে একে পৃথ্বীরাজ গোদ্বারপ্রদেশের সমস্ত নগরে অগ্নি প্রদান করিয়া মীনীয় বংশের পূর্ণ ধ্বংস বিধান করিলেন। দৈশূরী ও সোদ্গড় দুর্গ ব্যতীত সমস্ত গোদ্বারপ্রদেশ অচিরকালমধ্যে পৃথ্বীরাজের হস্তগত হইল। দৈশূরী দুর্গ তৎকালে মত্রেচ-বংশীয় সন্দ নামক ক্ষত্রিয়ের অধিকারে ছিল। আর সোলাঙ্কিবংশীয় সর্দ্দ নামক একজন ক্ষত্রিয় সোদ্গড়দুর্গ অধিকার করিতেছিলেন। সঙ্গের পুত্র মত্রেচের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এক্ষণে পৃথ্বীরাজ দৈশূরী দুর্গ সঙ্গকে অর্পণ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া তাঁহার অধীনতা ক্রয় করিলেন এবং তাঁহার সাহায্যে দৈশূরী দুর্গ অধিকার করিয়া তাঁহাকেই সেই দুর্গ অর্পণ করিলেন। এইরূপে অল্প সময়ের মধ্যেই সমস্ত গোদ্বারপ্রদেশে পৃথ্বীরাজের অপ্রতিদ্বন্দ্বিনী প্রভুতা প্রতিষ্ঠাপিত হইল। যে ষড়যন্ত্রে দৈশূরী দুর্গ হস্তগত হইল, তাহা পরিশিষ্টে পরিব্যক্ত হইবে।

পৃথ্বীরাজের স্বদেশে গমন

পৃথ্বীরাজের বিজয়বার্ত্তা রায়মল্লের কর্ণগোচর হইলে তিনি পুত্রকে সাদরে রাজধানীতে আহ্বান করিলেন। বিশেষতঃ কনিষ্ঠ পুত্র জয়মল্লের শোচনীয় মৃত্যু ও পূর্ব্বেই জ্যেষ্ঠপুত্র সঙ্গের নিরুদ্দেশ নিবন্ধন রায়মল্লের হৃদয় শোকে অভিভূত হইয়াছিল। পৃথ্বীরাজ ভিন্ন মিবারের সিংহাসন অধিকার করিবার আর কেহ নাই দেখিয়া রায়মল্ল তাঁহাকে আনিবার জন্য দূত প্রেরণ করিলেন। পৃথ্বীরাজ বণিক ওজা ও সোলাঙ্কী সাম্বের উপর গোদ্বার রাজ্যের শাসনভার অর্পণ করিয়া পিতৃরাজধানী চিতোরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। রায়মল্ল পৃথ্বীরাজের সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া তাঁহাকে অতি সমাদরে ও গভীর স্নেহে গ্রহণ করিলেন।

জয়মল্লের শোচনীয় মৃত্যু ও রায়মল্লের মহাপ্রাণতা

আমরা জয়মল্লের শোচনীয় মৃত্যুর কথা উল্লেখ করিয়াছি, এক্ষণে সংক্ষেপে সেই মৃত্যুর বিবরণ প্রদান করিব। রায় শূরতম বা সুরতন্ নামে সোলাঙ্কীবংশীয় এক নরপতি টোডা নগরের অধিপতি ছিলেন। পাঠানেরা তদীয় নগর অধিকার করিয়া তাঁহাকে তথা হইতে নিষ্কাশিত করে। তিনি নিরুপায় হইয়া মিবাররাজ্যে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহার অশেষ গুণসম্পন্না অলৌকিক রূপলাবণ্যবতী তারাবাই নাম্নী এক কন্যা ছিল। তারাবাই তৎকালে যৌবন সীমায় পদার্পণ করিয়াছিলেন। যে বীর পাঠানদিগকে টোডা হইতে তাড়াইয়া তথায় সুরতনকে পুনঃ প্রতিষ্ঠাপিত করিতে পারিবেন, তাঁহাকেই তিনি কন্যা সম্প্রদান করিবেন বলিয়া সুরতন ঘোষণা করেন। এই কন্যাপণ সত্ত্বেও জয়মল্ল অবৈধরূপে রমণীর পার্শ্ববর্ত্তী হইতে চেষ্টা করেন। যদিও সঙ্গের অজ্ঞাতবাসে ও পৃথ্বীরাজের নির্ব্বাসনে জয়মল্লই মিবারে ভাবী রাণা বলিয়া বিদিত ছিলেন, তথাপি সুরতন্ কন্যাপণ ভঙ্গ করিয়া তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। ইহা জানিয়াও জয়মল্ল অবৈধ উপায়ে তদীয় কন্যার পাণিগ্রহণের চেষ্টা করায় তিনি অতিশয় অপমান বোধ করিলেন, এবং এই অপমান অসহনীয় হওয়ায় জয়মল্লের প্রাণসংহার করিলেন। সুরতন্ আজ মিবারের একজন সামান্য প্রজামধ্যে গণনীয় হইয়া মিবারের সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী জয়মল্লের প্রাণবধ করিলেন—ইহাতে সকলেই স্থির করিল যে, তাহার প্রতি প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রদত্ত হইবে। বোধ হয়, সুরতনও তাহাই ভাবিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য প্রস্তুতও হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ ইহাই সম্ভবপর ছিল। কিন্তু রায়মল্ল প্রকৃতিতে দেবোপম ছিলেন। হৃদয়মাহাত্ম্যে তিনি তদীয় পূর্ব্বপুরুষগণের কাহারও ন্যূন ছিলেন না। জয়মল্লের হত্যাকাণ্ডের সংবাদ রাজধানীতে পৌঁছিলে তদীয় সৈন্য-সামন্ত সকলেই ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন, এবং তাঁহাকে পুত্রহন্তার প্রতি প্রতিহিংসা লইবার জন্য উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু রায়মল্ল অটল অচলের ন্যায় অবিচলিতভাবে সেই মহাশোক সহ্য করিলেন এবং বলিলেন—"যে পিতা বিপদাপন্ন অবস্থায় আসিয়া আমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই পিতার কুলগৌরবের হন্তা হইতে গিয়া জয়মল্ল প্রাণদণ্ডার্হ হইয়াছিল, সুতরাং সেই পাপিষ্ঠ কুলাঙ্গার পুত্রের এই উপযুক্ত মৃত্যুতে রাজা হইয়া আমার শোক করা উচিত নহে; এবং সেই উপযুক্ত দণ্ডের বিধাতাকে দণ্ডিত না করিয়া বরং আমার পুরস্কৃত করাই উচিত।" রায়মল্ল যে শুদ্ধ মুখে এই কথা বলিয়া ক্ষান্ত হইলেন, এরূপ নহে—তিনি সোলাঙ্কীরাজ সুরতনকে বেদনোর রাজ্য প্রদান করিয়া নিজ বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করিলেন। তাঁহার অতিমানুষ সৎকার্য্যে হিন্দু-সমাজের মুখ উজ্জ্বল হইল; ক্ষত্রিয়কুলের গৌরব বৃদ্ধি পাইল; এবং অনন্তকালের জন্য তাঁহার নাম ভারতেতিহাসে জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিত হইল। ধন্য রায়মল্ল! ধন্য তোমার সমদর্শিতা! ধন্য তোমার ন্যায়পরতা! ধন্য তোমার গুণগ্রাহিতা! এবং ধন্যাদপি ধন্য তোমার মহাপ্রাণতা! ব্রিটনবাসি! রায়মল্লের ন্যায়পরতা ও মহাপ্রাণতার সহিত তোমাদের অনুদারনীতি ও প্রতিহিংসাবৃত্তির একবার তুলনা কর, দেখিবে, এতদুভয়ে স্বর্গ-নরক প্রভেদ! আজ রায়মল্ল! তুমি ক্ষত্রোচিত চরিত্র-মাহাত্ম্যে যুগপৎ জগৎপূজিত হইলে ও জগৎ বিজিত করিলে। প্রকৃত বীরের হৃদয় যে মহানুভাবে উদ্বোধিত, তাহা তুমি আজ জগৎসমক্ষে নিজ দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইলে।

—

পৃথ্বীরাজের সঙ্কল্প

জয়মল্লের শোচনীয় মৃত্যুই পৃথ্বীরাজের নির্ব্বাসনদণ্ড হইতে মুক্তির প্রধান কারণ। তিনি পিতা কর্ত্তৃক আহূত হইয়া বহুদিনের পর চিতোরে প্রত্যাগত হইলেন। চিতোরে আসিয়া তিনি জয়মল্লের সেই শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের সবিশেষ বিবরণ অবগত হইলেন। ভ্রাতা যে টোডা দুর্গ পুনরধিকার করিতে অক্ষম হইয়া অবৈধ উপায়ে সেই জগল্ললামভূতা বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি বীরা রমণী তারাবাইয়ের পাণি-গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়া প্রাণ হারাইয়াছিলেন, আজ বীরবর পৃথ্বীরাজ সেই টোডা দুর্গ অধিকার করিয়া বৈধ উপায়ে সেই রমণীরত্নের পাণিগ্রহণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। যে বীরা রমণী একদিন করধৃত ধনুর্ব্বাণ ও পৃষ্ঠে কৃততূণীর হইয়া

অশ্বপৃষ্ঠে রণস্থলে নিরন্তর পৃথ্বীরাজের পার্শ্ববর্ত্তিনী হইবেন, আজ পৃথ্বীরাজ কল্পনার তালিকায় সেই রমণীমূর্ত্তি হৃদয়ফলকে চিত্রিত করিলেন, এবং সেই রমণীরত্নকে পাইবার জন্য টৌডাধিপতি পাঠানরাজ লীল্লাকে পরাজিত করিয়া টোডা দুর্গ রাও সুরতনকে প্রদান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি বেদনৌরে আসিয়া রাও সুরতনের নিকট প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যদি তিনি এই দুর্গ অধিকার করিতে না পারেন, তাহা হইলে আপনাকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিবেন না।

পৃথ্বীরাজ ও তারাবাই

এ দিকে তারাবাইও পূর্ব্ব হইতেই পৃথ্বীরাজের রূপ, গুণ ও বীরত্বের পরিচয় পাইয়া মনে মনে তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই বীরত্বরত্নাকরস্বরূপ গুণাধার পৃথ্বীরাজকে স্বয়ং পিতৃসদনে উপস্থিত দেখিয়া তিনি তদীয় অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী হইতে কৃতসঙ্কল্পা হইলেন। উভয়েই উভয়ের হৃদয়-সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিলেন। পৃথ্বীরাজের প্রার্থনামতে অবিলম্বে যুদ্ধযাত্রার আয়োজন হইল। রণপ্রিয়া তারাবাই পিতৃ-অনুমতি লইয়া রণসজ্জায় সজ্জিতা হইলেন। আজ রণসঙ্গিনী রণসাজে সাজিয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অশ্বারোহী রণবীরের সঙ্গে সঙ্গে সমরাঙ্গনে অবতীর্ণা হইলেন।

টৌডাধিপতির মৃত্যু

আজ মহরমের দিন। টোডা নগরের সমস্ত মুসলমান আজ শোকোৎসবে মাতিয়া উঠিয়াছে। সকল মুসলমানই বক্ষঃস্তাড়ন দ্বারা ইমাম ও হোসেনের শোক নবীভূত করিতেছে। বীরপতি ও বীরা পত্নী পঞ্চশত অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া অশ্বপৃষ্ঠে টৌডা নগরের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দম্পতী আসিয়া দেখিলেন যে, মহরমের তাজিয়া বাহির হইয়াছে। তাঁহারা অশ্বারোহীদিগকে নগরের বাহিরে রাখিয়া অনুগত ও বিশ্বস্ত সেনগড়াধিপতিকে মাত্র সঙ্গে করিয়া সেই জনস্রোতের মধ্যে মিশিয়া গেলেন। ক্রমে সেই জনস্রোত টোডাপতির প্রাসাদের সমীপবর্ত্তী হইল। টৌডাধিপতি লীল্লা সেই উৎসবে যোগ দিবার জন্য তৎকালে সজ্জিত হইতেছিলেন। সেই জনস্রোতের মধ্যে তিনটি অপরিচিত লোক দেখিয়া তাঁহার চিত্ত আকুলিত হইল। তিনি সেই অপরিচিত ব্যক্তিত্রয়ের পরিচয় লইতেছিলেন, এমন সময় সহসা পৃথ্বীরাজ ও তারাবাইয়ের শর আসিয়া তাঁহার দেহ বিদ্ধ করিল। তিনি তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। বীরপুরুষ ও বীরা নারীর অব্যর্থ শর-সন্ধানে টৌডাপতির এরূপ হঠাৎ মৃত্যুতে সকলেই বিস্মিত হইল ও সমস্ত নগরীতে ঘোরতর আর্ত্তনাদ উপস্থিত হইল। এই আকস্মিক চমকের ও স্তব্ধভাবের সুবিধা লইয়া সেই অশ্বারোহীদ্বয় ও অশ্বারোহিণী তাড়িতবেগে নগরের তোরণদ্বারের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সহসা লীল্লার এক শিক্ষিত হস্তী আসিয়া তাঁহাদিগের বহির্গমনের পথ রোধ করিল। কিন্তু প্রত্যুৎপন্নমতি নির্ভীক বীরা রমণী এই সঙ্কটে ইতিকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইলেন না। বীর্য্যবতী তারাবাই নিমেষমধ্যে করধৃত অসির প্রহারে গজপতির শুণ্ডাদণ্ড তদীয় বিশাল দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। হস্তী ভয়চকিত ও যাতনায় অধীর হইয়া প্রচণ্ডবেগে পলায়ন করিল। বীরদ্বয় ও বীরা রমণী সেই পঞ্চশত-সংখ্যক রাজপুত-সৈন্যের সহিত মিলিত হইলেন।

টোডা গ্রহণ ও টৌডাদুর্গে হিন্দুপতাকা

ইত্যবসরে পাঠানেরাও ক্রোধোন্মত্ত হইয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিতে দেখিতে উভয় সৈন্যে তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া উঠিল। জয়লক্ষ্মী কিছুকাল সংশয়িতভাবে রহিলেন, কিন্তু পরিশেষে ক্ষত্রিয়-তেজ পাঠানগণের অসহ্য হইয়া উঠিল। তাহারা সেই অসহনীয় তেজ সহিতে না পারিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। এই যুদ্ধে তারাবাইই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শৌর্য্য প্রদর্শন করেন, এবং প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহারই অসমসাহস, বীরত্ব ও শৌর্য্যনিবন্ধন আজ রাজপুতগণ রণে অজেয় পাঠানগণের উপর জয়লাভ

করিলেন। আজ পৃথ্বীরাজকে পতিরূপে পাইবার জন্য—পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিবার জন্য—তারাবাই আত্মোৎসর্গের পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন। তিনি জীবনের মমতায় জলাঞ্জলি দিয়া সর্ব্বাগ্রে রণানলে ঝাঁপ দিয়াছিলেন, এবং ভগবতী মহাশক্তিরূপিণী হইয়া এই বিষম রণে জয় লাভ করিলেন। ধন্য তারাবাই! ধন্য তোমার বীরত্ব! ধন্য তোমার পতিভক্তি! ঐ দেখ, আজ তোমার সর্ব্বসংহারিণী শক্তির নিকট অসংখ্য পাঠান বলি পড়িয়া মৃতদেহে রণস্থল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে! ঐ দেখ, মৃতাবশিষ্টেরা ভয়ে রণস্থল হইতে উদ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতেছে! বীরা রাজপুতরমণী অসিহস্তে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তাহার প্রচণ্ড আঘাতে হস্তীর হস্ত ছেদন করিতেছেন—রণে দুর্দ্ধর্ষ যবনকুলকে নির্ম্মূল করিতেছেন—এ এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! ভারত-পুণ্য-ক্ষেত্রে আবার সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিবার জন্য মন বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। জানি না, আবার কবে ভগবতী মহাশক্তি ভারতের ললনাকুলকে অনুপ্রাণিত করিবেন! সেই মহাশক্তি একদিন গ্যারিবল্‌ডী-রমণী আনিটাতে আবির্ভূতা হইয়া ইতালীর উদ্ধারকর্ত্তা গ্যারিবল্‌ডীর প্রধান সহায় হইয়াছিলেন। সেই উদ্দীপনাবলেই গ্যারিবল্‌ডী অতিমানুষ কার্য্যকলাপ করিতে পারিয়াছিলেন। আজ পৃথ্বীরাজ প্রস্ফুরিত মহশক্তি তারাবাইয়ের সাহায্যে টোডাদুর্গ অধিকার করিয়া দুর্গোপরি আবার হিন্দুপতাকা উড্ডীন করিলেন।

তারাবাই পৃথ্বীরাজ পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ

টোডা অধিকার করিয়া পৃথ্বীরাজ রাও সুরতনকে তাহা প্রদান করিলেন। সুরতনও অঙ্গীকৃত পণ অনুসারে টোডাগৃহীতা পৃথ্বীরাজকে যথাবিধানে কন্যা সমর্পণ করিলেন। বীরনারী বীরভোগ্যা আর বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। সুতরাং বীরবর পৃথ্বীরাজ নিজ বীরত্বের পুরস্কারস্বরূপ তারাবাইকে পাইয়াও পরিতৃপ্ত হইলেন না। তিনি বসুন্ধরাকে তারার সপত্নী করিবার জন্য মহাব্যাকুল হইলেন। নবদম্পতী পরিণয়ের পর কমলমীর প্রাসাদে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পৃথ্বীরাজ ইহার পর অনেক যুদ্ধে অবতীর্ণ হন, এবং প্রত্যেক যুদ্ধেই তারাবাই স্বামিপার্শ্ববর্ত্তিনী থাকিয়া রমণীকুলের গৌরব বৃদ্ধি করেন। রাজপুতানা এই বীরদম্পতীর বিজয়-সৌভাগ্যে নিরন্তর গৌরবান্বিত হইতে লাগিল। এই বীরদম্পতী দীর্ঘজীবন লাভ করিলে, বোধ হয়, ভারত যবনশূন্য হইত। ভারত-ইতিহাস অন্যরূপ ধারণ করিত।

সুরজমল্ল ও পৃথ্বীরাজ

এ দিকে খুল্লতাত সুরজমল্লও নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তিনি সঙ্গ, পৃথ্বীরাজ ও জয়মল্লের মধ্যে পরস্পর বিবাদ বাধাইয়া দিয়া তাহার সুবিধা লইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্কল্প অনেক পরিমাণেই সিদ্ধ হইয়াছে। সঙ্গের নিরুদ্দেশ, পৃথ্বীরাজের নির্ব্বাসন ও জয়মল্লের মৃত্যু—এই সুযোগত্রিতয় যুগপৎ উপস্থিত হওয়ায় তিনি তাহার সুবিধা লইতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইলেন। আবার তিনি পিতৃহন্তা পিতার উত্তরাধিকারিত্বসূত্রে মিবারের সিংহাসন দাবী করিতে লাগিলেন। মিবারের অন্তর্দৌর্ব্বল্য নিবন্ধন তাঁহারও যথেষ্ট পক্ষবল যুটিল। দেবসেবয়িত্রীর ভবিষ্যদ্বাণী কখন ব্যর্থ হইতে পারে না বলিয়া তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস ছিল। সুতরাং তিনি লক্ষরাণার অন্যতর পুত্র সারঙ্গদেবের সহিত মিবারের সিংহাসনপ্রাপ্তির জন্য গভীর ষড়্‌যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন। পুরোহিতা তাঁহাকে রাজ্যের অংশভাক্ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে রাজ্যের অংশমাত্র তাঁহার অধিকার, এই জন্য "সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ" 'যখন সব যায় যায় হয়, তখন পণ্ডিত ব্যক্তি অর্দ্ধেক দিয়া অর্দ্ধেক রক্ষা করিতে চেষ্টা করেন'—এই নীতি অনুসারে তিনি মিবারের অপরার্দ্ধ সারঙ্গদেবকে দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া তাঁহার সহকারিতা ক্রয় করিলেন। পরে উভয়ে মালবের সুলতান মুজঃফরের নিকট গমন করিলেন। তাঁহার নিকট সৈন্য-সাহায্য লইয়া তাঁহারা মিবারের দক্ষিণ সীমা আক্রমণ করিলেন। অনতিকালমধ্যে সত্রি ও রাটরো দুর্গ—ও নাই হইতে নীমক পর্য্যন্ত সমস্ত ভূখণ্ড তাঁহাদিগের করতলস্থ হইল। তাঁহারা সেই বিজয়িনী সেনা লইয়া চিতোরাভিমুখে ধাবিত হইলেন।

সূরজমল্ল ও সারঙ্গদেব কর্ত্তৃক মিবার আক্রমণ

তখন রায়মল্ল উপস্থিতমত সৈন্য লইয়া চিতোর-গিরি হইতে অবতরণ করিলেন। গম্ভীরী নদীতীরে উভয় সৈন্য পরস্পরের সম্মুখীন হইল। রাণা সামান্য পদাতিক সৈন্যের ন্যায় পাদচারে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। উভয় সৈন্যে তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া উঠিল। রাণা তদীয় বীরদেহে দ্ব্যধিক-বিংশসংখ্যক ক্ষত ধারণ করিলেন। অপর্য্যাপ্ত রক্তমোক্ষণে তিনি ক্রমে অবশেন্দ্রিয় হইয়া পড়িলেন। এমন সময় পৃথ্বীরাজ এক সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া তাঁহার সাহায্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভগবান্ই যেন মরণোন্মুখ রাণাকে রক্ষা করিবার জন্য এই দৈবী সেনা প্রেরণ করিলেন। সেই নির্ব্বাণোন্মুখ রণ আবার নবীভূত হইয়া উঠিল। পৃথ্বীরাজ খুল্লতাত সূরজমল্লকে লক্ষ্য করিয়া অবিরাম অস্ত্র প্রক্ষেপ করিতে লাগিলেন। নিমেষমধ্যে সূরজমল্লের দেহ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া উঠিল। উভয় পক্ষেই অসংখ্য সৈন্য সমরশায়িত হইতে লাগিল। তথাপি যুদ্ধের বিরাম নাই। কোন পক্ষই যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে। অবশেষে উভয় পক্ষই একান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িল। তখন উভয় সেনাই যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অপসৃত হইয়া পরস্পরের দৃষ্টির সম্মুখে আপন আপন সৈন্যাবাসে গিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল।

পৃথ্বীরাজ ও সূরজমল্লে সাক্ষাৎ

পৃথ্বীরাজের সহিত রায়মল্লের এখনও সাক্ষাৎ হয় নাই। তিনি স্বদেশে আসিয়াই যুদ্ধবার্ত্তা শ্রবণ করিলেন এবং শ্রবণ করিয়াই সসৈন্যে পিতৃ-সাহায্যার্থ রণস্থলে উপস্থিত হন। এই বিশ্রামকালে সর্ব্বপ্রথমেই তিনি সূরজমল্লের শিবিরে গমন করেন। বীরের প্রতি বীরের আসক্তি স্বভাবসিদ্ধ। আজ পৃথ্বীরাজ সেই স্বাভাবিকী আসক্তির বশীভূত হইয়া খুল্লতাতের দর্শন-পিপাসায় তদীয় শিবিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। ক্ষত্রিয় রণস্থল ব্যতীত অন্যস্থলে শত্রুকে আঘাত করেন না। অভ্যাগত অতিথি পরম শত্রু হইলেও তাঁহাকে সমাদরে গ্রহণ করেন। পৃথ্বীরাজ এই ক্ষত্রধর্ম্মের উপর নির্ভর করিয়া একাকী নির্ভীকচিত্তে শত্রু-শিবিরে প্রবেশ করিলেন। পৃথ্বীরাজ শিবিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন—খুল্লতাত পর্য্যঙ্কোপরি অর্দ্ধ হেলিত অবস্থায় শয়ান রহিয়াছেন ও একজন অস্ত্রচিকিৎসক তাঁহার ক্ষতগুলি সেলাই করিয়া দিতেছেন। পৃথ্বীরাজকে সহসা সম্মুখে দেখিয়াই সূরজমল্ল শয্যা হইতে উঠিলেন—যেন কোন মনান্তর ঘটে নাই। এই ঝটিতি-উত্থানে তাঁহার ক্ষতগ্রন্থির অনেকগুলি ছিঁড়িয়া গেল এবং রুধিরস্রাবে তাঁহার দেহ ভাসিয়া গেল। এই বীরদ্বয়ের যে কথোপকথন হইল, তাহা শুনিলে শরীর ও মন বিস্ময়রসে অভিভূত হয়। পাঠক! একবার সেই বীরদ্বয়ের কথোপকথন শ্রবণ করুন।,

পৃথ্বীরাজ। ভাল, কাকা! তোমার ক্ষতগুলি কেমন আছে?

সূরজমল্ল। বৎস! তোমার দর্শনজনিত সুখে সেগুলি সম্পূর্ণরূপে সারিয়া গিয়াছে।

পৃথ্বীরাজ। কাকা! এখনও আমি দাওয়ানজীকে * দেখি নাই। আমি সর্ব্বপ্রথমেই আপনাকে দেখিতে আসিয়াছি। আমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি। কিছু কি খাবার আছে?

তৎক্ষণাৎ উভয়ের আহারের আয়োজন হইল। অবিলম্বে চর্ব্ব-চোষ্য-লেহ্য পেয়-পরিপূরিত ভোজনপাত্র উভয়েরই সম্মুখে আনীত হইল। সেই অসাধারণ বীরযুগল একপাত্রে ভোজন করিলেন। বিদায়কালে সূরজমল্ল পৃথ্বীরাজের হস্তে একটি পানের খিলি প্রদান করিলেন। পৃথ্বীরাজ নিঃশঙ্কচিত্তে তাহা চর্ব্বণ করিতে লাগিলেন।

পৃথ্বীরাজ। কাকা! তবে কল্য প্রত্যূষে আমরা আমাদের যুদ্ধের অবসান করিব।

সূরজমল্ল। বৎস! আচ্ছা, তাহাই হইবে। খুব প্রত্যূষে আসিও।

পৃথ্বীরাজ প্রস্থান করিলেন।

---

* মিবারের রাণাগণ ভগবান্ একলিঙ্গের দাওয়ানজী বলিয়া কথিত হইতেন।

গম্ভীরী নদীতীরে মহারণ

প্রত্যুষে পূর্ব্বকথিতমত পৃথ্বীরাজ ও সুরজমল্ল রণস্থলে পরস্পরের সম্মুখীন হইলেন। উভয় সৈন্যে ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। সারঙ্গদেব এই যুদ্ধে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বীরত্ব প্রদর্শন করিলেন। তাঁহার দেহ পঞ্চত্রিংশ ব্রণ-লাঞ্ছনে বিভূষিত হইল। চারি ঘণ্টাকাল উভয় পক্ষ রণোন্মত্ত হইয়া নিরন্তর পরস্পরের উপর তরবারি ও বর্শা প্রক্ষেপ করিলেন। উভয় পক্ষেই অসংখ্য রাজপুত সমরশায়ী হইলেন। কিন্তু অবশেষে বিজয়-লক্ষ্মী পৃথ্বীরাজেরই অঙ্কশায়িনী হইলেন। বিদ্রোহিগণ পরাজিত হইয়া সত্রি-অভিমুখে পলায়ন করিলেন। এদিকে পৃথ্বীরাজ বিজয়-ধ্বজা উড়াইতে উড়াইতে মহোল্লাসে চিতোরাভিমুখে ধাবিত হইলেন। কিন্তু তিনিও অক্ষত-শরীরে রণস্থল হইতে ফিরিতে পারেন নাই। সেই ভীষণ সময়ে সেই বীরবরের দেহ সপ্ত ব্রণ-লাঞ্ছনে লাঞ্ছিত হয়।

বিদ্রোহিগণ পলায়ন করিলেন বটে, কিন্তু লক্ষ্যচ্যুত হইলেন না। ইহার পরও পৃথ্বীরাজের সহিত সুরজমল্লের অসংখ্য দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইয়াছিল। ভ্রাতুষ্পুত্র খুল্লতাতকে বলিলেন যে, "তিনি তাঁহাকে সূচ্যগ্র-পরিমিত স্থানও প্রদান করিবেন না।" আবার খুল্লতাত ভ্রাতুষ্পুত্রকে উত্তর দিলেন যে, তাঁহার শয়ন করিতে যেটুকু স্থান প্রয়োজন, তাঁহাকে কেবল সেইটুকুমাত্র প্রদান করিবেন। কিন্তু পৃথ্বীরাজ তাঁহাকে ও তদীয় পক্ষভুক্তগণকে বিন্দুমাত্র বিশ্রাম দেন নাই। তিনি নিরন্তর অনুসরণ দ্বারা তাঁহাদিগকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন।

পৃথ্বীরাজ কর্ত্তৃক বিদ্রোহিগণের দারু-দুর্গ আক্রমণ

অদ্য এক স্থানে, কল্য অন্য স্থানে- পরশ্ব তদন্যত্র —এইরূপ করিয়া তাঁহাদিগকে অবিরাম আত্মরক্ষার্থ স্থানপরিবর্ত্তন করিতে হইত। অবশেষে তাঁহারা বাটোরা অরণ্যমধ্যে একটি দারুদুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তদভ্যন্তরে অবস্থিত করিতে লাগিলেন। এই দুর্গমধ্যে পদাতিক ও অশ্বারোহী উভয় সৈন্য একত্র অবস্থিতি করিতে লাগিল। রজনীতে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তৎপার্শ্বে উপবেশন করিয়া সুরজমল্ল ও সারঙ্গদেব আপনাদের দুরবস্থার বিষয় আলোচনা করিতেছিলেন, এমন সময় সহসা অশ্বের পদশব্দ ও হ্রেষারব তাঁহাদের শ্রুতি-গোচর হইল। উভয়েই ভয়চকিতভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সুরজমল্ল বলিয়া উঠিলেন—"এ নিশ্চয়ই আমার ভ্রাতুষ্পুত্র হইবে।" এই কথা তাঁহার মুখ হইতে নিঃসৃত হইতে না হইতেই পৃথ্বীরাজ অমনি অশ্বে প্রচণ্ডবেগে সেই দারুদুর্গ ভেদ করিয়া সসৈন্য একেবারে তাঁহাদিগের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ক্ষণকাল বোধ হইল, যেন মহাপ্রলয়কাল আসিয়া উপস্থিত হইল। কে কাহাকে মারে, তাহার কিছুই ঠিক নাই। খড়্গ, তরবারি, বর্শা ও বাণের যেন চতুর্দ্দিকে বৃষ্টি হইতে লাগিল। কিন্তু লক্ষ্য স্থির নাই—উদ্দেশ্য স্থির নাই! এই প্রলয়-মুহূর্ত্তের পর পৃথ্বীরাজ খুল্লতাতের অভিমুখে ধাবিত হইলেন, এবং তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া এক প্রচণ্ড অসিপ্রহার করিলেন। সারঙ্গদেব রক্ষা না করিলে এই অসিপ্রহারে সুরজমল্ল শমনসদনে প্রেরিত হইতেন। সারঙ্গদেব পৃথ্বীরাজকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন যে, তোমার খুল্লতাতের দেহে এক সামান্য আঘাত পূর্ব্ব বিংশ আঘাতের সমান অনুভূত হইবে। সুরজমল্ল সারঙ্গদেবের এই বাক্যের এই বলিয়া উপসংহার করিলেন যে, 'যদি এই আঘাত আমার ভ্রাতুষ্পুত্র-হস্ত দ্বারা প্রদত্ত হয়।' সুরজমল্ল ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত কথোপকথন করিবার জন্য সময় চাহিলেন। পৃথ্বীরাজ তাঁহাকে সেই সময় প্রদান করিয়া বীরধর্ম্ম রক্ষা করিলেন। সুরজের প্রার্থনা অনুসারে কিয়ৎকালের জন্য যুদ্ধ স্থগিত হইল।

ভ্রাতুষ্পুত্র ও খুল্লতাতের কথোপকথন

সুরজমল্ল ভ্রাতুষ্পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বৎস! যদি মরি, তাহাতে ক্ষতি নাই। কারণ, আমার পুত্রগণ রাজপুত—তাহারা সাহায্যের জন্য সমস্ত মিবাররাজ্য আলোড়িত করিয়া বেড়াইতে পারিবে। কিন্তু বৎস! তোমার জ্যেষ্ঠ নিরুদ্দেশ, এবং তোমার কনিষ্ঠ হত। এ অবস্থায় তুমি মরিলে চিতোরের দশা কি হইবে? তাহা হইলে আমারই মুখে যে কালী পড়িবে, এবং আমারই নাম যে অনন্তকালের জন্য ভর্ৎসিত হইবে।" এই বলিতে

বলিতে সুরজমল্লের নয়নযুগল হইতে দরবিগলিত ধারা বহিতে লাগিল।

উভয়ে তখন অসি কোষসাৎ করিয়া পরস্পরকে আলিঙ্গন করিলেন। পৃথ্বীরাজ ভক্তিভাবে খুল্লতাতকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তাত! আমি যখন উপস্থিত হইলাম—তখন আপনারা কি করিতেছিলেন?" তদুত্তরে সুরজমল্ল বলিলেন—"তখন আহারান্তে আমরা অসংবদ্ধ প্রলাপ করিতেছিলাম। পৃথ্বীরাজ বলিলেন—"তাত! যখন আমার মত শত্রু আপনার মাথার উপর রহিয়াছে, তখন আপনি কি বলিয়া এরূপ অনবহিত ছিলেন?" সুরজমল্ল উত্তর করিলেন—"বৎস! আমি কি আর করিতে পারিতাম? তুমি আমাকে সর্ব্বোপায়শূন্য করিয়াছ, আমার মস্তক রাখিবার ত একটা স্থান চাই!" এই কথোপকথনের পর বীরদ্বয় পরস্পর বিশ্রম্ভালাপ করিয়া সকলে মিলিয়া তথায় রজনীযাপন করিলেন।

—

পৃথ্বীরাজ কর্ত্তৃক সারঙ্গদেবের মুণ্ড কালীচরণে উপহার

প্রত্যূষে উঠিয়া পৃথ্বীরাজ খুল্লতাতকে বলিলেন—"তাত! চলুন, ঐ অদূরবর্ত্তী কালীমন্দিরে গিয়া বলি দিয়া আসি।" কিন্তু সুরজমল্ল পূর্ব্বদিনের আঘাতে অতিশয় কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন, এই জন্য যাইতে অক্ষম হইলেন। তথাপি তিনি সারঙ্গদেবকে প্রতিনিধিস্বরূপ পৃথ্বীরাজের সঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন। মহিষ বলি সমাপ্ত হইল এবং ছাগ বলি হইবে—এমন সময় পৃথ্বীরাজ উত্তোলিত খড়্গ লইয়া সারঙ্গদেবকে আক্রমণ করিলেন। সারঙ্গদেবও তদ্বিরুদ্ধে নিজ অসি উত্তোলিত করিলেন। উভয় বীরে তুমুল দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলিতে লাগিল—কিন্তু পরিশেষে বিজয়লক্ষ্মী পৃথ্বীরাজেরই করতলস্থ হইলেন। পৃথ্বীরাজ প্রচণ্ড খড়্গাঘাতে সারঙ্গদেবের মস্তক তদীয় দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিলেন। পৃথ্বীরাজ সারঙ্গদেবের মুণ্ড লইয়া নৃমুণ্ডমালিনীর চরণে উপহার প্রদান করিলেন। তৎপরে তিনি সদলে আসিয়া সেই দারুদুর্গ বা গুড়া লুণ্ঠন করিলেন, এবং বাটোরা নগর পুনরধিকৃত করিলেন। সুরজমল্ল পলাইয়া আবার সত্রিদুর্গে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার প্রতিজ্ঞা ছিল যে, যদি তিনি নিজের ভূমি-সম্পত্তি রক্ষা করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাহা রাজরাজেশ্বর অপেক্ষাও অধিকতর শক্তিশালী মিবারের ব্রাহ্মণ ও চারণগণকে দান করিয়া চলিয়া যাইবেন। তিনি আজ সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিলেন, তিনি নিজের সমস্ত ভূমি-সম্পত্তি আজ ব্রাহ্মণ ও চারণগণকে দান করিয়া মিবাররাজ্য পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন। *

—

প্রতাপগড় ও দেওরা দুর্গ সংস্থাপন

তিনি খানখুল্ অরণ্যের মধ্য দিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময় দেখিলেন, একটি ব্যাঘ্র, শাবককে মুখে করিয়া লইয়া যাইতে চেষ্টা করিতেছে—কিন্তু ব্যাঘ্রী প্রাণপণে সেই ব্যাঘ্রশাবকটিকে রক্ষা করায় লইয়া যাইতে পারিতেছে না। এই লক্ষণ দ্বারা সুরজমল্ল ঐ স্থানই নিজ বাসস্থানের উপযোগী বলিয়া স্থির করিলেন। পুরোহিতার ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হইতে পারে না ভাবিয়া তিনি তথায় বাসস্থান নির্ম্মাণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি তথাকার আদিম অধিবাসিগণকে পরাজিত করিয়া সেই স্থনেই একটি দুর্গ ও নগর নির্ম্মাণ করাইলেন। এই নগরের নাম প্রতাপগড় ও এই দুর্গের নাম দেওরা দুর্গ হইল। ক্রমে ক্রমে তিনি সহস্র গ্রামের অধিপতি হইয়া উঠিলেন। আজও তাহার বংশধরগণ এই ক্ষুদ্র রাজ্য ভোগ করিয়া আসিতেছেন। তদায় বর্ত্তমান বংশধর ইংরাজরাজের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া রাজ্য করিতেছেন।

—

পৃথ্বীরাজের শোচনীয় মৃত্যু

আজি পৃথ্বীরাজ মিবাররাজ্যকে শত্রুশূন্য করিয়া কমলমীর প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন। নব-দম্পতী কিছুদিন তথায় মনের সুখে কালযাপন করিলেন।

* এরূপ দানের প্রত্যাহরণকারীকে ষাইট হাজার বৎসর নরকে বাস করিতে হইবে। এই জন্য এই ব্রাহ্মণ ও চারণগণের উত্তরাধিকারিগণ আজও ইহা ভোগ করিতেছেন।

কিন্তু বিধাতা এ বীরদম্পতীকে এ পাপময় পৃথিবীতে আর রাখিতে চাহিলেন না। এ উজ্জ্বল রত্ন দুটিকে শীঘ্রই নিজ স্নেহময় ক্রোড়ে গ্রহণ করিলেন। সিরোহী-রাজ প্রভুরাও পৃথ্বীরাজের ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অসৎ ব্যবহার করিতেন। এই জন্য পৃথ্বীরাজ সিরোহীতে গিয়া তাঁহার সমুচিত শাসন করিলেন। সিরোহীপতির এ অপমান অসহ্য হইল। তিনি এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য পবিত্র আতিথ্যধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া কাপুরুষের ন্যায় তদ্বধের গুপ্ত উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি স্বয়ং মিষ্টান্ন বিষমিশ্রিত করিয়া বিদায়-কালে পৃথ্বীরাজকে ভোজন করিতে দিলেন। পৃথ্বীরাজ নিজ স্বাভাবিক ঔদার্য্যগুণে নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে তাহা গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তিনি তখন ভোজন না করিয়া পথিমধ্যে ভোজন করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

কমলমীর প্রাসাদের চূড়া দৃষ্টিগোচর হইলে পৃথ্বীরাজ প্রফুল্লচিত্তে ভগিনীপতি-দত্ত মিষ্টান্ন ভোজন করিতে বসিলেন। মিষ্টান্ন ভোজন করিয়া তিনি কমলমীর প্রাসাদাভিমুখে ধাবিত হইলেন। তথায় প্রিয়তমাকে একাকিনী রাখিয়া আসিয়াছেন বলিয়া তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছিল। কিন্তু যাহাকে দেখিবার জন্য পৃথ্বীরাজ আকুলিত-প্রাণে কমলমীর প্রাসাদাভিমুখে ছুটিতেছিলেন, সেই জগল্ললামভূতা রমণীর সহিত তাঁহার আর এই নশ্বর জগতে সাক্ষাৎ হইল না। পৃথ্বীরাজ কালকূটের প্রভাবে ক্রমে অবশেন্দ্রিয় হইয়া পড়িলেন। মামা দেবীর মন্দিরের সম্মুখে যখন উপস্থিত হইলেন, তখন আর অশ্বচালনে তাঁহার শক্তি রহিল না। অশ্বের বল্গা হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া পড়িল, শরীর অবসন্ন হইয়া অশ্বপৃষ্ঠে পতিত হইল। তখন সকলে ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে নামাইয়া মন্দিরাভ্যন্তরে লইয়া গেল। তারাবাইকে আনিবার জন্য তৎক্ষণাৎ একজন অশ্বারোহী প্রেরিত হইল। কিন্তু সেই প্রাণাধিকা আসিয়া উপস্থিত হইতে না হইতেই মামা দেবীর সম্মুখে সেই মহাপ্রাণ বীরেন্দ্র প্রাণত্যাগ করিয়া স্বর্গধামে চলিয়া গেলেন। আনুযাত্রিকবর্গের আর্ত্তনাদে সেই বিশাল মন্দির প্রতিধ্বনিত হইল !

তারাবাই পৃথ্বীরাজের সহমৃতা

অনতিবিলম্বেই বীরা রমণী তারাবাই প্রচণ্ড-বেগে অশ্বচালনা করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। কিন্তু আসিয়া দেখিলেন যে. তাঁহার প্রাণ-তারা ভারতগগন হইতে পূর্ব্বেই স্খলিত হইয়াছেন। তারাবাই আজ জগৎ অন্ধকার দেখিলেন। বুঝিলেন, তাঁহার জীবনের কার্য্য পর্য্যবসিত হইয়াছে। তিনি ঊর্দ্ধকর্ণে প্রাণনাথের আহ্বান শুনিতে লাগিলেন। সে আহ্বানে কর্ণপাত না করিয়া থাকে, কাহার সাধ্য ? সতী আজ সেই আহ্বানের অনুবর্ত্তিনী হইয়া প্রাণনাথের সহমৃতা হইতে কৃতসঙ্কল্পা হইলেন। শীঘ্রই চিতা সজ্জিত হইল। তারাবাই ভক্তিভাবে মামা দেবীকে প্রণাম করিয়া সেই জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করিলেন। সেই জীবন-সর্ব্বস্ব পৃথ্বীরাজকে পার্শ্বে করিয়া সেই আদর্শ-সতী বীরাঙ্গনা পবিত্র সতীত্বধর্ম্মে আত্মবিসর্জ্জন করিলেন। অলক্ষিত-ভাবে দেবসারথি সূক্ষ্মশরীরাবচ্ছিন্ন সেই বীর-দম্পতীকে পুষ্পকরথে করিয়া স্বর্গধামে লইয়া চলিল !

আজ তাঁহাদিগের অভাবে সমস্ত মিবার শোকে অভিভূত হইল। চিতোররাজপুরী আজ মহাশ্মশানের আকার ধারণ করিল। বৃদ্ধ রায়মল্লের পক্ষে এ শোক অসহনীয় হইল। অচিরকালমধ্যে সেই প্রবয়াঃ নরপতি পুত্রের অনুগমন করিলেন। রায়মল্ল যদিও বীরত্বে পূর্ব্বপুরুষগণের তুল্য ছিলেন না, তথাপি হৃদয়-মাহাত্ম্যে ও শাসনদক্ষতায় তিনি তাঁহাদিগের কাহারও ন্যূন ছিলেন না। প্রজাগণ তাঁহাকে পিতৃনির্ব্বিশেষে ভক্তি করিত। আজও তাঁহার নামোচ্চারণে মিবারবাসিগণ ভক্তি-গদগদ হইয়া উঠে। আজও তাহারা ভক্তিভাবে রায়মল্লের প্রাসাদের প্রাচীরাবলীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।

আজ পৃথ্বীরাজ ও রায়মল্লের মৃত্যুতে মিবার-সিংহাসন শূন্য পড়িয়া রহিল। এখন সেই সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী সংগ্রাম-সিংহ কোথায় ? সকলের নেত্র এক্ষণে যুগপৎ তাঁহারই দিকে প্রেরিত হইল। পাঠক ! চল, আমরা মিবারবাসিগণের সহিত অনুসন্ধান করিগে, সেই রাজরাজেশ্বর এখন কোথায় লুকাইয়া আছেন !

রাণা সংগ্রামসিংহ

মিবারের সিংহাসন শূন্য পড়িয়া আছে, এই সংবাদ সেই নির্জ্জনাবাসে সংগ্রামসিংহের কর্ণ-গোচর হইল। তিনি সেই শূন্য সিংহাসনে আরো-হণ করিবার জন্য দ্রুতগতিতে চিতোরাভিমুখে ধাবিত হইলেন। তথায় পৌছিয়া ১৫৬৫ সংবৎ বা ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে সংগ্রামসিংহ সেই শূন্য-সিংহাসন অধিকার করিলেন। মিবারে তিনি রাণা সঙ্গ নামে অধিকতর প্রসিদ্ধ। মোগল ঐতিহাসিকেরা তাঁহাকে রাণা সিঙ্ক নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই নরপতির রাজত্বকালেই মিবার সৌভাগ্য-গিরির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করে। ইহাই মিবারের গৌরব-রবির মধ্যাহ্নকাল। সংগ্রাম সিংহই মিবারের কীর্ত্তিমন্দিরের চূড়ারূপে বর্ণিত হইয়াছেন। তাঁহার পর হইতে মিবারের সৌভাগ্যচক্রনেমি অধোমুখিনী হইতে আরম্ভ হয়। যদিও সেই অধোগতির সময় মিবারের সৌভাগ্য-চক্রকেন্দ্র হইতে দুই চারিটি বৈদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ বিনির্গত হইয়া-ছিল, কিন্তু তাহাতে সেই অধোগতি বরং অধিকতর উজ্জ্বলভাবে লোক-নয়ন-সমক্ষে অবতারিত হইয়া-ছিল।

দিল্লী সাম্রাজ্যের তাৎকালিক অবস্থা

যে ইন্দ্রপ্রস্থে বহুদিন ধরিয়া পাণ্ডুপুত্র-পৌত্রাদিগণ রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং যে ইন্দ্র-প্রস্থ বা দিল্লীর সিংহাসনে চোহানবংশীয় সম্রাট্ পৃথ্বীরাজ আরোহণ করিয়াছিলেন, সেই দিল্লীর সিংহাসনে এতদিন গাজনী, ঘোরী, খিলিজী ও লোদীবংশীয় সম্রাট্গণ ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করিয়া আসিতেছিলেন। যখন সংগ্রামসিংহ মিবারের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন, সে সময় সেই বিশাল যবনসাম্রাজ্য শেষ দশায় উপস্থিত হই-য়াছে। সেই প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ-গুলি আপন আপন স্বাধীনতা উদ্‌ঘোষিত করিয়াছে, দিল্লী হইতে বারাণসী পর্য্যন্ত প্রদেশের মধ্যে তিনটি হিন্দু রাজা স্বাধীন হইয়া উঠেন। সেই তিন রাজ্যের নাম—বিনা, কাল্পী ও জৈনপুর। এইরূপ মালব, গুজরাট, মাড়ওয়ার, অম্বর প্রভৃতি রাজাও দিল্লীর অধীনতা পরিত্যাগ করিয়াছিল। মিবার কখন দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করে নাই; এখন ত ইহাকে তুচ্ছজ্ঞান করিতে লাগিল।

সংগ্রাম সিংহ এই অবস্থায় মিবারের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। আরোহণ করিয়াই তাঁহাকে সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইতে হইল। বিদ্রোহিদল মালব ও গুজরাটাধিপতির সাহায্যে আবার মিবার আক্রমণ করিল। রাণা সংগ্রাম অশীতি সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া শত্রুসেনার বিরুদ্ধে ধাবিত হইলেন। তদ্ভিন্ন সাত জন রাজা, নয় জন রাও, এবং রাউল্ বা রাউৎ উপাধিধারী একশত চারিজন সামন্ত স্ব স্ব সৈন্য ও পঞ্চশত হস্তীর সহিত তাঁহার সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে চলিলেন। মাড়ওয়াররাজ এবং অম্বর, গোয়ালিয়ার, আজমীর, সিক্‌রী, রাইসেন, কাল্পী, চন্দেরী, বুন্দী, গগরাউন, রামপুর এবং আবুর রাওগণ—সকলেই সংগ্রামের নিকট অধী-নতা স্বীকার করিয়া সদলে তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে চলিলেন। পৃথ্বীরাজের দ্বাদশ পুত্র তৎকালে অম্ব-রের অধিপতি ছিলেন। ইঁহারাই কচ্ছবহ (Cutchwaha) বংশের শাখা-প্রশাখার আদি-পুরুষ। হুমায়ুনের রাজত্বকালেই এই বংশের গৌরব অধিকতর বর্দ্ধিত হয়। যদিও পৃথ্বীরাজ জ্যেষ্ঠের পরম শত্রু ছিলেন, তথাপি মহামতি সংগ্রাম তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রগণকে কোন প্রকারে নির্য্যাতিত করেন নাই।

সংগ্রামের হৃদয়মাহাত্ম্যে সকলেই মুগ্ধ হইয়া-ছিল। যাঁহারা সেই অজ্ঞাতবাসের সময় তাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, তিনি এই সৌভাগ্যের দিনে তাঁহাদিগকে ভুলিলেন না। সকলকেই তিনি যথাযথরূপে ধন-মান-সম্পদাদি দ্বারা পূজিত করিলেন। শ্রীনগরের করমচাঁদ চন্দেরী দখল বিষয়ে তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি তাঁহাকে আজমীর রাজ্য জায়গীরস্বরূপ প্রদান করিলেন এবং তাঁহার পুত্র জগমল্লকে রাও উপাধি প্রদান করিলেন।

দিল্লীসম্রাট ও মালবরাজের সহিত নিরন্তর সমর ও সংগ্রামসিংহের উপর্য্যুপরি জয়লাভ

সংগ্রামসিংহ সেই মহতী বাহিনী লইয়া সংগ্রামস্থলে উপস্থিত হইলেন। অচিরকালমধ্যেই শত্রুসৈন্য পরাজিত হইল, মিবারে শান্তি প্রতিষ্ঠাপিত হইল। কিন্তু সংগ্রামসিংহ অধিক দিন শান্তিসুখভোগ করিতে পারিলেন না। মালবাধিপতি ও দিল্লীর সম্রাট নিরন্তর তাঁহাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতে লাগিলেন। ইহাদিগের বিরুদ্ধে তিনি সর্ব্বশুদ্ধ ষোলটি নিয়মিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হন, এবং প্রত্যেকটিতে জয়লাভ করেন। এই ষোলটি যুদ্ধের মধ্যে দুইটি যুদ্ধে—বাকরোল ও ঘাটোলী রণক্ষেত্রে দিল্লীর সম্রাট ইব্রাহিম্ লোদী স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। শেষের যুদ্ধটিতে যবনসেনা পরাজিত ও নির্ম্মূলপ্রায় হইয়া যায়, এবং একজন যবনরাজ বন্দীভূত হইয়া বিজয়-প্রতিষ্ঠানের শোভা সংবর্দ্ধন করে। এই কয়েকটি যুদ্ধে উপর্য্যুপরি জয়লাভ করায় মিবারের পরিসর বাড়িয়া যায়। এখন হইতে বিয়ানার অদূরবর্ত্তিনী পীত কৃত্রিম সরিৎ (পীলা খাল) মিবারের উত্তর সীমা, সিন্ধু নদী পূর্ব্ব-সীমা, মালব দক্ষিণ-সীমা, এবং দুর্ভেদ্য দুর্গাবলীর ন্যায় আরাবলী গিরিমালা ইহার প্রতীচ্য সীমাস্বরূপ হয়। এইরূপে প্রায় সমস্ত রাজপুতানার উপর অপ্রতিদ্বন্দ্বিনী প্রভুতা সংস্থাপন করিয়া এবং যে সকল গুণ ক্ষত্রিয়ের অতিভক্তি ও আদরের সামগ্রী, সেই সকল গুণের পূর্ণ আধার হইয়া সংগ্রামসিংহ নিজ সৌভাগ্য-গিরির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিলেন। যদি এই সময় অক্সস ও জাকজার্টেসের অনন্ত বীর-প্রসবী উপকূল বিভাগ হইতে উসবেক্স ও তাতারজাতীয় নব নব বীরদল আবার আসিয়া ভারতক্ষেত্রকে প্লাবিত না করিত, তাহা হইলে সংগ্রাম সিংহ অবিসম্বাদিতরূপে সমস্ত ভারতের রাজরাজ্যেশ্বর হইতে পারিতেন। আবার হিন্দুরাজ্যের মহিমা সমস্ত ভারতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িত। কেবল এইমাত্র পৃথক্ হইত যে, ভারতের রাজশক্তি ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে চিতোরগিরির উপর বিরাজমান হইত এবং ভারতের জয়পতাকা চিতোর গিরিদুর্গের উপর উড্ডীন হইত।

রাণা সংগ্রামের পূর্ণ অভ্যুদয়কালে বাবর কর্ত্তৃক ভারত আক্রমণ

কিন্তু কি ভাগ্যদোষে জানি না, বিধাতা তাহা হইতে দিলেন না। সে সময় সমরসিংহের সমরবিষয়িণী প্রতিভা যবনরাজশক্তিকে প্রায় গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিল, সেই সঙ্কটকালে বীরবর বাবর অবসন্নপ্রায় কোরাণশিষ্যগণের গতিহীন ধমনীতে তাড়িত বেগ সঞ্চারিত করিবার জন্য ভারতক্ষেত্রে আসিয়া আবির্ভূত হইলেন।

হিন্দু-সাম্রাজ্যের দুর্ব্বলতার কারণ

ভারতভূমি অতি পুরাকাল হইতেই এই ভোগ ভুগিয়া আসিতেছেন। ইহাঁর অনন্ত রত্ন-ভাণ্ডার লুঠিবার জন্য মধ্য-আসিয়া হইতে লুণ্ঠনকারী দস্যুর দলের পর দল আসিয়া সমস্ত লুঠিয়া লইয়া যাইতেছে। অনন্ত রত্ন-প্রসবিনী ভারতভূমি কামধেনুর ন্যায় তথাপি অবিরাম রত্ন প্রসব করিতেছেন। অনন্ত স্নেহময়ী জননী—যে আসিয়া মা বলিয়া ডাকিতেছে—তাহাকেই ক্রোড়ে স্থান দিতেছেন—স্নেহভরে লালিত করিতেছেন। বিরাম নাই! বিরাগ নাই! কিন্তু যে লুণ্ঠনকারী দস্যুরা তাঁহাকে মা বলিয়া বলে তাঁহার কণ্ঠাভরণ ছিঁড়িয়া লইয়া যাইতেছে, তাহাদিগকে বধ করিবার জন্য নিজ পুত্রগণকে উদ্দীপিত করিতেছেন। অনন্ত-বীর-প্রসবিনী মায়ের বীর-সন্তানের কখন অপ্রতুল ছিল না—এখনও নাই। কিন্তু চিরকালই তাঁহার সন্তানগণ পরস্পর বিচ্ছিন্ন—পরস্পর বিদ্বেষ-বিশিষ্ট, সুতরাং দূরবিপ্রকৃষ্ট। ঘনীভূত আকর্ষণে কখন তাঁহারা কেন্দ্রীভূত নহেন। সমস্ত হিন্দু-সাম্রাজ্যের মধ্যে তাঁহারা কেবল ছয় জন রাজচক্রবর্ত্তীর অধীনে কেন্দ্রীভূত ও ঘনীভূত হইয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন আর সকল সময়েই তাঁহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন দূরবিক্ষিপ্ত। ইহার কারণ কেন্দ্রীকরণ শাসনপ্রণালীর অভাব, এবং সামন্ততন্ত্র শাসনপ্রণালীর সদ্ভাব। বর্ত্তমানকালে রুসীয় কেন্দ্রীকরণ শাসনপ্রণালীর পূর্ণ আদর্শ। সমস্ত রুসীয় সাম্রাজ্য এক কেন্দ্রীভূত শাসনের অধীন। সেণ্টপিটার্স বর্গে রুসীয় সাম্রাজ্যের রাজশক্তি কেন্দ্রীভূত রহিয়াছে।

তথা হইতে যে সকল বিধি-ব্যবস্থা বিনির্গত হইতেছে, সমস্ত সাম্রাজ্যের লোকে তাহা মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিতেছে। ভারতে পূর্ব্বে এইরূপ কেন্দ্রীভূত সাম্রাজ্যশক্তি ছিল না। ইহা অসংখ্য ক্ষুদ্ররাজ্যে বিভক্ত ছিল। সকল রাজ্যই প্রায় সম্পূর্ণ স্বাধীন। তবে যখন কোন রাজচক্রবর্ত্তী সমস্ত ভারতের শাসনদণ্ড চালিত করিতেন, তখন সেই সকল ক্ষুদ্র রাজ্য সামন্তরাজ্যরূপে পরিণত হইত। অর্থাৎ সামন্তগণ যেমন যুদ্ধের সময় নিজ রাজাকে সৈন্য ও অর্থ সাহায্য দিয়াই অন্যান্য সকল বিষয়েই স্বাধীনতা ভোগ করিতেন, সেইরূপ এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজগণও যুদ্ধের সময়ে সম্রাটকে সৈন্য ও অর্থ-সাহায্য দিয়াই আর সকল বিষয়েই আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা ভোগ করিতেন। সুতরাং ইঁহাদিগের পরস্পর স্বার্থ সম্পূর্ণ পৃথক্ ছিল। এই জন্য কোন লুণ্ঠনকারী দস্যুর দল আসিয়া ভারত আক্রমণ করিলে আক্রান্ত নরপতি বা সম্রাট্ ভিন্ন তাহাতে আর কেহ বাধা অনুভব করিত না। সম্রাটের সাহায্যার্থ যে সকল সৈন্য প্রেরিত হইত, তাহারা কেন্দ্রীভূত রাজশক্তির সহিত সহানুভূতি-বিরহে বিশেষ উৎসাহের সহিত কার্য্য করিত না। পরস্পর বিদ্বেষ বশতঃ একের ধ্বংসে বরং অপরের উল্লাস হইত। যৎকালে সেকেন্দর সাহ ভারত আক্রমণ করেন, তখনও ভারতের রাজশক্তির এইরূপ বিচ্ছিন্ন দশা ছিল। এক পঞ্চনদ প্রদেশেই অনেকগুলি রাজা রাজত্ব করিতেন। তদ্ভিন্নও তথায় অনেক নাগরিক সমাজ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিল। এই সকল কারণে তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিয়া নিরন্তর ভারতবক্ষ বিতাড়িত করে।

ভারতে নিরন্তর বৈদেশিক আক্রমণস্রোত

সেকেন্দর সাহের পূর্ব্বে পারসীকেরা ভারত বিজয় করে। দ্বিতীয় নরপতি দারায়ুস ভারতকে আপনার সাম্রাজ্যের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধনশালী অঙ্গ বলিয়া গণ্য করিতেন। পারসীকদিগের পর গ্রীকেরা গ্রীকদিগের পর পার্থীয়ানগণ, পার্থীয়ানগণের পর গেটস্ বা যতিগণ ক্রমান্বয়ে ভারত আক্রমণ করেন। ইতিহাস ও বিবিধ মুদ্রা ইহার প্রমাণ। কিন্তু ইঁহারা কেহই ভারতে স্থায়ী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাপিত করিতে পারেন নাই। ঘোরীবংশীয় সাহাবুদ্দীনই ইন্দ্রপ্রস্থে সর্ব্বপ্রথমে স্থায়ী যবনসাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। তাঁহার সময় হইতে জেঙ্গীস খাঁর বংশসম্ভূত বাবরের সময় পর্য্যন্ত কিঞ্চিন্ন্যূন তিন শত শতাব্দীর মধ্যে পঞ্চবার ভারত আক্রান্ত ও অধিকৃত হয়। প্রত্যেকবারেই এক একটি নূতন যবনবংশ ইন্দ্রপ্রস্থে প্রাতষ্ঠাপিত হয়। সংগ্রামসিংহের প্রতিদ্বন্দ্বী বাবরই ভারতের শেষ আক্রমণকারী যবন। এই মোগলবংশেই ভারতের যবন রাজশক্তি পূর্ণ বিকসিত হইয়া ইহাতেই বিলীন হইয়া যায়। এই মোগল রাজশক্তিকে গ্রাস করিবার জন্য চারিটি রাজশক্তি ক্রমে অভ্যুদিত হয়। প্রথম মিবারে রাজপুত-শক্তি, দ্বিতীয় দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্রীয় শক্তি, তৃতীয় পঞ্চনদে শিখশক্তি এবং চতুর্থ আনুগাঙ্গ প্রদেশে ব্রিটনশক্তি। প্রথম তিনটি পর পর অভ্যুদিত হইয়া মোগল সাম্রাজ্য শক্তিকে পূর্ব্বে বিপর্য্যস্ত ও অন্তঃসারশূন্য করিয়া ফেলিয়াছিল। ব্রিটন রাজশক্তি শেষে আসিয়া এ সমস্ত শক্তিকেই কুক্ষিগত করিয়া ফেলিয়াছে। এই মহাশক্তির নিকট সেই শক্তিচতুষ্টয় পরাজিত হইয়া এক প্রকার ইহার কুক্ষিগত হইয়া গিয়াছে। কত ধর্ম্মবিপ্লব ও রাজ্যবিপ্লব এই সময়ের মধ্যে চলিয়া গিয়াছে—তথাপি মিবারের রাজপুতগণ আপনাদিগের ধর্ম্ম ও আপনাদিগের কর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হন নাই। সেই পুরাকালের আর্য্যসভ্যতা মিবারে আজও বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই সনাতন ধর্ম্ম-বিশ্বাস এখনও অটল রহিয়াছে।

রাজপুতানার স্থিতিশীলতা

রাজপুতানার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে বোধ হয়, যেন অন্যান্য দেশের সহিত ইহার কোন সংস্রব নাই এবং কোন কালেও ছিল না। ইহার নৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা সেকেন্দর সাহের আক্রমণকালেও যেরূপ ছিল, এখনও ঠিক সেইরূপ রহিয়াছে। ইহার ধর্ম্মসংস্কার সকল অবিচলিত ও অচলভাবে দণ্ডায়মান হইয়া ইহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব জগতে উদ্ঘোষিত করিতেছে। ইহা চিরকালই স্থিতিশীল। ইহা আপনার পরিবর্ত্তন যেমন চাহে না—পরের পরিবর্ত্তনও সেইরূপ সংঘটিত করিতে প্রস্তুত নহে। ইহা স্থিতিশীল বটে, তাই বলিয়া নিষ্ক্রিয় বা শক্তিহীন নহে। এই রাজপুত সমাজের

ভিতর একটি মহতী শক্তি নিহিত আছে। কর্ত্তব্য-প্রিয়তা রাজপুতজাতির একটি প্রধান ধর্ম্ম। যদি কোন কার্য্য কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়, তখন সেই কর্ত্তব্যসাধনে রাজপুতজাতি আবাল-বৃদ্ধ বনিতা অকাতরে প্রাণোৎসর্গ করিবে। কর্ত্তব্য-পালনে প্রাণবিসর্জ্জনের জন্যই রাজপুতের জন্ম, প্রত্যেক রাজপুতের অন্তরে এই ভাব চিরবদ্ধমূল হইয়া আছে। কোন্‌টি কর্ত্তব্য কর্ম্ম, এইটি বুঝাইতে পারিলেই হইল। রাজপুতজাতি সেই কর্ত্তব্যসাধনে জলন্ত অনলে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত হইবে। রাজপুতজাতির এই কর্ত্তব্য পালনে আত্মোৎসর্গ করার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইতেই ভারতের সৌভাগ্যসূর্য্য পুনরুদিত হইবে।

— —

বাবর ভারত-ক্ষেত্রে আবির্ভূত

পৌরাণিক ইতিহাসে কথিত আছে যে, তক্ষ ও যবন আসিয়া ভারত অধিকার করিবে। আজ এই পৌরাণিকী ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক করিবার জন্যই যেন তর্কস-জাতীয় ফার্ঘাণাধিপতি বাবর ভারত-ক্ষেত্রে আসিয়া আবির্ভূত হন। যখন বাবর বিজয়িনী সেনা লইয়া অনুগাঙ্গ প্রদেশে আসিয়া আবির্ভূত হন, তখন সংগ্রামসিংহের প্রতাপ দিগন্তপ্রসারী হইয়া পড়িয়াছে। বাবর শাকদ্বীপ বা প্রাচীন সকটাই * রাজ্যের একাংশের অধিপতি ছিলেন। তদীয় রাজ্য জাকৃসার্টেস্ নদীর উভয় তীরে বিস্তৃত ছিল। হিরোদোতস্ যে গেটিক্ রাণী তোমিরিস্‌কে চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন, তিনি পুরাকালে এই রাজ্যেরই অধীশ্বরী ছিলেন। গেটিজিত বা যুতি জাতি এই রাজ্য হইতেই বিনির্গত হইয়া খৃষ্ট শকাব্দীর দুইশত বৎসর পূর্ব্বে ব্যাকট্রিয়া রাজ্যের ধ্বংসবিধান করেন, এবং তাহার পঞ্চ শত বৎসর পরে উদীচ্য ভারতে আসিয়া ভারতে যবন-রাজ্যের সূত্রপাত করে। সেই প্রথম নির্গমনের দিন হইতে ধরিয়া এক সহস্র বৎসর অতীত হইলে সেই শাকদ্বীপ হইতেই বাবর দলবলসহ ভারতে অবতীর্ণ হইয়া তথায় স্থায়িরূপে যবনসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাপিত করেন। এই শাকদ্বীপের অধিবাসিগণ যে শুদ্ধ ভারতের ভাগ্যবিপর্য্যয় করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন, এরূপ নহে। আসি, জিৎ, যিউৎ প্রভৃতি জাতি—এই চিরস্মরণীয় রাজ্য হইতেই বিনির্গত হইয়া বলটিক্ সাগরের উপকূলভূমি অধিবাসিত করে এবং তথা হইতে ক্রমে সমস্ত ইউরোপখণ্ডে বিক্ষিপ্ত হইয়া ইহার ভাগ্যচক্রের নেমি আবর্ত্তিত করে, আঙ্গেল্ জাতি, ঐ সকল জাতির একটি শাখা মাত্র। সেই আঙ্গেল জাতি সাক্‌সেন্ জাতির সহিত মিশ্রিত হইয়া ইংরাজজাতিরূপে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু অধিবাসি সংখ্যার আধিক্য—তাইমুর ও জেঙ্গীস খাঁর উত্তরাধিকারিগণের জ্যাকৃজার্টিস পরিত্যাগ করিয়া অনুগাঙ্গ প্রদেশ আসিবার কারণ নহে। অচরিতার্থ রাজ্যপিপাসাই ইহার মূল কারণ। বাবর ত সমরকন্দ হইতে তাড়িত হইয়াই নিজ অদৃষ্ট-পরীক্ষার জন্য দুই সহস্র মাত্র সৈন্য সমভিব্যাহারে ভারতক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। সমরসিংহ ব্যতীত সে প্রচণ্ড বাহিনীর সম্মুখীন হইবার যোগ্য বীর ‥ কালে ভারতে আর ছিল না।

—

সমরসিংহ ও বাবর তুলিত

বাবর সমরসিংহের প্রতিদ্বন্দ্বী হইবার সম্পূর্ণ যোগ্য ছিলেন। উভয়েই আশৈশব বিপৎ ও দারিদ্র্যের ক্রোড়ে লালিত। সংযমিত বীরত্বে ও অসমসাহসিকতায় উভয়েই তৎকালে জগতে তুলনারহিত। উভয়েই স্থিরপ্রজ্ঞ ও পরিণামদর্শী। ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে বাবর একটি বিস্তৃত রাজ্যের অধীশ্বর হন। ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি অসংখ্য শত্রুসভব বিজিত করিয়া সমরকন্দ অধিকার করেন; এবং পরবর্ত্তী দুই বৎসর ইহা একবার হারাইয়া আবার অধিকার করেন। তাঁহার জীবন জয়-পরাজয়ের মালামাত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এক সময়ে তিনি অতিক্রান্ত অক্সস্ * রাজ্য সমূহের রাজচক্রবর্ত্তী সম্রাট; এবং পর মুহূর্ত্তেই প্রাণভয়ে পলায়মান, অসহায়, দীনহীন কাঙ্গালের মত সর্ব্বজন-অনুশোচ্য। এক

* Scythia.

* Transcaspian.

সময়ে বিপুল সেনার অধিনায়ক, আর এক সময়ে অনুসরণকারিণী শত্রুসেনার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ। তিনি একাকী দ্বন্দ্বযুদ্ধে অনেক বীরের সম্মুখীন হইতে পারিতেন। এক সময়ে অনেককে শমন-সদনে প্রেরণ করিয়াছেন।

ইব্রাহিম লোদী হত ও বাবর দিল্লীর সিংহাসনে অধিরূঢ়

অবশেষে তিনি ফার্গানা হইতে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত হইয়া নৈরাশ্যের তীব্র তাড়নে হিন্দুকুশ অতিক্রম করিয়া ১৫১৯ খৃষ্টাব্দে ভারতে অবতীর্ণ হন। কাবুল ও পঞ্চনদ প্রদেশের মধ্যবর্ত্তী স্থানে সাত বৎসরকাল অবস্থিতি করিয়া তিনি ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ অবস্থার গতি পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। অবশেষে সময় বুঝিয়া তিনি প্রচণ্ড বিদ্যুৎপাতের ন্যায় দিল্লীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভয়-চকিত দিল্লীর সম্রাট ইব্রাহিম লোদী সে প্রচণ্ড বেগ ধারণ করিতে অক্ষম হইলেন। এই রণে তিনি হত, তাঁহার সৈন্য তাড়িত ও সর্ব্বতোবিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। দিল্লী ও আগরা—সেই পলাতক ফার্গা-নাধিপতির বিজয়িনী সেনার অভ্যর্থনার্থ আপন আপন তোরণদ্বার উদ্ঘাটিত করিল। এইরূপে দিল্লীর সাম্রাজ্য-মুকুট লোদীবংশের মস্তক হইতে স্খলিত হইয়া মোগলবংশীয় সম্রাটের মস্তকে পতিত হইল। এই বংশের রাজত্বকালেই আবার সমস্ত ভারত এককেন্দ্রীভূত শাসনের অধীন হইয়াছিল। ইহারই গৌরবরবির মধ্যাহ্নকালে দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা এই জয়ধ্বনি সমস্ত ভারতে উদ্-ঘোষিত হইয়াছিল। বাবর অত্যন্ত ঈশ্বর-পরায়ণ ছিলেন। এই বিজয়ের পর তিনি বলিয়াছিলেন—'হে ঈশ্বর! এ বিজয় তোমারই প্রসাদে লাভ করি-য়াছি—সুতরাং এ বিজয়ফলে তোমারই অধিকার—আমার কোন অধিকার নাই।' বাবর এক বৎসর মাত্র দিল্লীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াই প্রবলতম শত্রু চিতোরাধিপতি রাণা সংগ্রামসিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে সাহসী হইলেন।

বাবর রাণা সংগ্রামের সম্মুখীন

বাবরের অসাধারণ বীরত্ব, এবং মেঘগিরি-* বাসী তদীয় অনুযাত্রিবর্গের সুদৃঢ়কায়তা ও কষ্ট-সহিষ্ণুতা সত্বেও কেহ ভাবে নাই যে, তিনি সমর সিংহের হস্তে পরিত্রাণ পাইবেন। সকলেই ভাবিয়া-ছিল যে, তাঁহাকে ও তদীয় ক্ষুদ্র সেনাকে বিয়ানার লোহিত স্রোতস্বিনীতে আত্মবলি দিতে হইবে। সে জলময়ী সমাধি হইতে তিনি ও তৎসহচরবৃন্দ উত্তীর্ণ হইবেন, ইহা কেহই ভাবে নাই। বাবর তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন যে—"আমরা কতিপয়মাত্র বীর জ্যাক্জার্টিস্ নদীর তীর হইতে সুদূর বিয়ানাক্ষেত্রে অসংখ্য রাজপুতবীরের সম্মুখে ব্যূহ রচনা করিয়া আত্মরক্ষা করিতেছি। যদিও আমা-দের অটল বিশ্বাস যে, এই ধর্ম্মযুদ্ধে মরিলে আমরা স্বর্গলাভ করিব, তথাপি আজ আমি কিছুতেই আমার অনুযাত্রিকবর্গের মন হইতে গভীর হতাশ-তার ভাব বিদূরিত করিতে পারিতেছি না। আজ যেন সকলেই মৃত্যু নিশ্চয় বুঝিয়া শোকে অভিভূত হইতেছে। একটি প্রাণীর ও মুখে বীরোচিত সাহস-বাক্য শুনিতেছি না। আজ বীরের উপযুক্ত মত প্রকাশ করিতে কাহাকেও দেখিতেছি না। আজ আমাদের ধর্ম্মোন্মাদ যেন বিসাদে পরিণত হইয়াছে।" সত্যই এ বিপদে রাজপুতগণের পরস্পর হিংসা ও স্বদেশানুরাগের অভাবই বাবরের কৃতকার্য্যতার একমাত্র নিদান হইয়াছিল। সমস্ত রাজপুত যদি এই ধর্ম্মসংগ্রামে সংগ্রামসিংহের পার্শ্ববর্ত্তী হইতেন, তাহা হইলে সেই নগণ্য যবনবীরদল সেই নরমেধ-যজ্ঞে নিশ্চয়ই বলি পড়িতেন। ভারতে হিন্দু-রাজত্ব অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইত এবং ভারত-ইতিহাস আজ অন্য আকার ধারণ করিত! কিন্তু কি পাপে জানি না—হিন্দুর গৌরব রক্ষা হইল না। হিন্দুর ব্যক্তিগত লালসার নিকট তাঁহার জাতীয় গৌরব বলি পড়িল। যে বিশ্বাসঘাতকতা মহম্মদ ঘোরীর নিকট দিল্লীর সিং-হাসন বিক্রীত করিয়াছিল, আজ সেই বিশ্বাসঘাতকতা বাবরের নিকট হিন্দুরাজশক্তিকে বলি দিল, ও বিষ-প্রয়োগে দ্বারা হিন্দু-গৌরব-সূর্য্য রাণা সংগ্রামসিংহের প্রাণাপহরণ করিল।

বাবরের অগ্রগামিনী সেনার ধ্বংস

বাবর আগ্রা ও সিক্রী হইতে রাণা সংগ্রামসিংহের আক্রমণার্থ অভিযান করিলেন। সংগ্রামসিংহ সমস্ত রাজপুত রাজন্যবর্গের নেতা হইয়া তদাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি ১৫৮৪ শকাব্দা ১৫২৮ খৃষ্টাব্দের ৫ই কার্ত্তিক বিয়ানা সৈন্যাবাস হইতে অগ্রসর হইয়া কানুয়ায় গিয়া বাবরের অগ্রগামিনী সেনার সম্মুখীন হইলেন। বাবর পঞ্চদশ শতমাত্র অশ্বারোহী সৈন্যকে শত্রুর অবস্থানাদি জানিবার জন্য অগ্রে পাঠাইয়াছিলেন। এই সৈন্য প্রায় নির্ম্মূল হইল। অতি অল্পসংখ্যক সৈন্যমাত্র ফিরিয়া গিয়া বাবরের নিকট অগ্রগামিনী সেনার পূর্ণ ধ্বংসের সংবাদ দিল। গভীর হতাশতা আসিয়া সমস্ত মোগল-সৈন্যকে আশ্রয় করিল। তাঁহারা আর অগ্রসর হইতে সাহস করিলেন না। সেই স্থানেই তাঁহারা ব্যূহ রচনা করিয়া রাজপুতগণের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। যে সকল সৈন্য বাবরের সাহায্যার্থ নানা স্থান হইতে আসিতেছিল—তাহারা ও অগ্রগামিনী সেনা রাজপুতগণ কর্ত্তৃক বিনষ্টপ্রায় হইতে লাগিল। উহার অল্প-সংখ্যকমাত্র মোগল-শিবিরে আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল।

মোগল-সৈন্য ব্যূহমধ্যে আবদ্ধ ও বাবরের সন্ন্যাস

কিন্তু বাবর এই উপর্য্যুপরি বিপদ্-পরম্পরায় অধীর হইলেন না। কারণ, তিনি শৈশব হইতেই বিপদে দীক্ষিত হইয়া আসিতেছেন। তিনি অচিরকালমধ্যেই সৈন্যগণের নির্ব্বাণোন্মুখ বীর্য্যবহ্নি উদ্দীপনা-বাক্যে সন্ধুক্ষিত করিলেন। তিনি চতুর্দ্দিকে মৃত্তিকাস্তূপ তুলিয়া তাহার উপর কামানরাজি সজ্জিত করিলেন, এবং কামানগুলিকে সুদৃঢ় লৌহশৃঙ্খল দ্বারা মধ্যভাগে পরস্পর সংযুক্ত করিলেন। কামানের অগ্রভাগ লেদার চর্ম্ম দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত হইল। এইরূপে সেই ব্যূহকে দুর্ভেদ্য করিয়া তাঁহারা রাজপুতগণের আক্রমণ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সকল দিকই হিন্দুদিগের অনুকূল বোধ হইতে লাগিল। রাজপুতরা বীরত্বে ও আত্মোৎসর্গে পৃথিবীতে অতুলনীয়। সেই বীরত্ব ও আত্মোৎসর্গের সহিত আবার সংখ্যার আধিক্য ঘটিয়াছে। সোনার সোহাগা মিশিয়াছে! এরূপ অজেয় সেনাকে জয় করিতে পারিব বলিয়া কাহারও মনে সাহস হইতেছে না। কিন্তু বাবরের মনে হতাশতার ভাব একবারও উদিত হইতেছে না। জ্যোতির্ব্বিদ গণনা করিয়া বলিয়াছেন যে সেনা প্রথম আক্রমণ করিবে—সেই সেনাই এই যুদ্ধে পরাজিত হইবে। এই কারণে মোগল-সেনা আজ একপক্ষকাল সেই ব্যূহমধ্যে অবরুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, ব্যূহ হইতে বিনির্গত হইয়া রাজপুতদিগকে আক্রমণ করিতে পারিতেছে না। এমন সময় বাবর অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া নিজ সৈন্যগণের সংস্থান পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে ভাবিলেন যে, দৈবসাহায্য ব্যতীত তাঁহার এ বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার আর উপায় নাই। এই জন্য তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, পূর্ব্বকৃত পাপের জন্য তিনি আজ হইতে অনুতাপ ও প্রায়শ্চিত্ত করিবেন। তিনি আজ হইতে মদ্য ও অন্যান্য বিলাসদ্রব্যে স্বেচ্ছাবঞ্চিত হইলেন। ব্যূহমধ্যে যত মদ্য ছিল, সমস্তই মৃত্তিকায় ঢালিয়া ফেলিতে আদেশ দিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, আর কখন মদ্য পান করিবেন না। শিবিরে যত কিছু সুবর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি ধাতুনির্ম্মিত তৈজসপত্র ছিল—সমস্ত ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া দীনদুঃখী ও দরবেশগণকে দান করিতে আদেশ দিলেন। আজ হইতে তিনি শ্মশ্রুধারণ করিলেন। তাঁহার আদেশে দিল্লী সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র এই ঘোষণা হইল যে, সেই দিন হইতে কোন মুসলমানের উপর আর টেমঘা বা ষ্ট্যাপ-কর ধার্য্য হইবে না। তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিলেন যে, যিনি আপনাকে রক্ষা করিতে চাহেন—তাঁহাকে আত্মবিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হইতে হইবে। সমস্ত মোগল শিবিরে এক অপূর্ব্ব ধর্ম্মের ভাব প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। এ ধর্ম্মযুদ্ধে সকলেই আত্মোৎসর্গ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। সর্ব্বপ্রথমে আসাস্ বাবরের মন্ত্র-শিষ্য হইলেন। একে একে সমস্ত পুরুষ প্রাণোৎসর্গ করিতে শপথ গ্রহণ করিলেন। সকলেই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, আজ হইতে তাঁহারা সর্ব্ববিলাসদ্রব্যের ব্যবহারে জলাঞ্জলি দিলেন। সকলেই শ্মশ্রুধারণ করিলেন। এইরূপ অল্প দিনের মধ্যেই বাবরের ক্ষুদ্র সেনাদল এক নবীন বীর সন্ন্যাসিদলে পরিণত হইল। বাবরের উজ্জ্বল আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্তে প্রধান সেনাপতি হইতে সামান্য সৈন্য পর্য্যন্ত সর্ব্ববিধ বিলাসে স্বেচ্ছাবঞ্চিত হইলেন।

বাবরের উদ্দীপনা-বাক্য

বাবর সমস্ত অধীনস্থ ব্যক্তিগণকে একত্র করিয়া এইরূপ উদ্দীপনাবাক্যে উদ্দীপিত করিলেন—সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ও সৈন্যগণ! যিনিই এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাকেই মৃত্যু-যাতনা ভোগ করিতে হইবে। মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার কাহারও আশা নাই। যখন আমরা সংসার-নাট্যশালা হইতে অন্তর্ধান করিব—তখন কেবল এক অপরিবর্ত্তনশীল ঈশ্বরই বর্ত্তমান থাকিবেন। যিনিই জন্ম-ভোজ থাইবেন, তাঁহাকেই সেই ভোজনাবসানে মৃত্যুরূপ পানীয় পান করিতে হইবে। যিনিই এই জীবনরূপ পান্থ-নিবাসে আসিয়া উপস্থিত হইবেন, তাঁহাকে সেই শোকনিবাস হইতে বিদায় লইতে হইবে। এ জগৎ ত শোক-দুঃখের নিলয়মাত্র। তবে কি লজ্জা ও অগৌরবের সহিত জীবন ধারণ করা অপেক্ষা সম্মান ও গৌরবের সহিত মৃত্যু সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ নহে? যদি কীর্ত্তি রাখিয়া মরিতে পারি, তাহা হইলে মরণেও সন্তোষ লাভ করিব। আমার সহিত আমার কীর্ত্তির সম্বন্ধ নিত্য,—কিন্তু আমার দেহের সহিত আমার সম্বন্ধ ক্ষণিক, কারণ, সে দেহে মৃত্যুরই অধিকার আছে। সেই মহামহিমান্বিত ঈশ্বর আমাদিগকে এখন এমন সঙ্কটে আনিয়াছেন যে, যদি আমরা যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করি, তাহা হইলে আমরা জগতে উৎসৃষ্টপ্রাণ ধর্ম্মবীর বলিয়া প্রখ্যাত হইব। আর যদি বাঁচি, তাহা হইলে বিজয়ী হইয়া এ বিপদ্ হইতে উঠিব। নিশ্চয়ই উঠিব—কারণ, পুত্তলী উপাসনা দ্বারা ঈশ্বরের নামে যাহারা কলঙ্ক আনয়ন করিতেছে, তাহাদিগকে দণ্ড দিবার জন্যই তিনি আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। অতএব এস ভ্রাতৃগণ! আজ আমরা একবাক্যে ঈশ্বরের পবিত্র বাক্য * স্পর্শ করিয়া শপথ করি যে, যতক্ষণ আমাদের অবিনশ্বর আত্মা এই বিনশ্বর দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন না হইবে, ততক্ষণ আমরা এ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অবসৃত হইব না এবং যে যুদ্ধ ও ঘাতন কার্য্য শীঘ্রই উপস্থিত হইবে, তাহা ফেলিয়া পলায়ন করিব না।"

বাবরের এই উদ্দীপনা-বাক্য মোগল-সৈন্যগণের রুদ্ধরক্তস্রোত ধমনীমণ্ডলে তাড়িতবেগ সঞ্চারিত করিল। যে শিবিরে এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে ভয় ও প্রাণের ব্যাকুলতা বিরাজিত ছিল, সেই শিবিরে এখন সেই ভয় ও ব্যাকুলতার স্থানে প্রচণ্ড ধর্ম্মোন্মাদ ও যুদ্ধ-পিপাসা দেদীপ্যমান হইল। ধর্ম্মের এমনই মোহিনী শক্তি যে, ইহার পবিত্র নামে অতি নরাধমও দেবতা হইয়া উঠে। আজ ধর্ম্মের নামের মোহিনী শক্তিতে শত্রু মিত্র সকলে একবাক্যে কোরাণ স্পর্শ করিয়া বাবরের প্রার্থনামত শপথ গ্রহণ করিলেন। আজ মোগল শিবির "আল্লা! আল্লা!" রবে প্রতিধ্বনিত হইল!

সন্ধির প্রস্তাব ও সংগ্রামের দীর্ঘসূত্রতা

এই বিশ্বজনীন ধর্ম্মোন্মাদের সুবিধা লইবার জন্য বাবর সেই সৈন্যাবাস ভগ্ন করিয়া যুদ্ধার্থ সৈন্যগণকে শ্রেণী-বদ্ধ করিয়া রাজপুত সেনার অভিমুখে ধাবিত হইলেন। তাঁহারা একমাস সেই ব্যূহমধ্যে অবরুদ্ধ থাকিয়া আজ যেন কারামুক্তির আনন্দ অনুভব করিলেন। আজ তাঁহারা যেন মেঘমুক্ত সূর্য্যের ন্যায় প্রখর দীপ্তিতে জগৎ বিভাসিত করিতে লাগিলেন। তাঁহারা এইরূপ শ্রেণী-বদ্ধভাবে দুই মাইল অগ্রসর হইয়া রাজপুতগণকে যুদ্ধ প্রদান করিলেন। অসমসাহসিক রাজপুতগণ মোগল-দিগের কামানের সম্মুখ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া তাঁহা-দিগের অবস্থান ও সৈন্যসংখ্যা দেখিয়া যাইতে লাগি-লেন। বাবর এরূপ অরক্ষিত অবস্থায় নিতান্ত অধীর হইয়া পড়িলেন। এই সময় রাণা সংগ্রামসিংহ ইচ্ছা করিলে মোগল-সেনাকে সমূলে নির্ম্মূল করিতে পারি-তেন। কারণ, তখনও তাঁহার সৈন্যগণমধ্যে দুর্দ্দমনীয় রণ-পিপাসা বিদ্যমান ছিল। কিন্তু কি কারণে জানা যায় না—তিনি এরূপ অমূল্য সুবিধা হারাইলেন। ভারতে যবন-প্রভুশক্তিকে ধ্বংস করিবার এরূপ সুবিধা আর কখন হইয়াছিল কি না সন্দেহ। কৌশলী বাবর এই অবস্থার সুবিধা লইতে ত্রুটি করিলেন না। তিনি সময় পাইবার জন্য রাইসীনাধিপতি তুয়ারবংশীয় সিলেদী দ্বারা সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। তিনি দিল্লী ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী অধীন রাজ্য সকলকে দিল্লীর সাম্রাজ্যের অধীন রাখিয়া আর সমস্ত সংগ্রামসিংহকে ছাড়িয়া

---

* কোরাণ। মহম্মদ এই গ্রন্থখানি ঈশ্বরের নিকট পাইয়াছেন বলিয়া জগতে উদ্‌ঘোষিত করিয়া-ছিলেন।

দিতে চাহিলেন। বিয়ানার নিম্নবর্তী পীলাখাল উভয় রাজ্যের মধ্যসীমা বলিয়া গণ্য করিতে স্বীকৃত হইলেন; অধিক কি, সংগ্রামসিংহকে বৎসরে বৎসরে রাজকর দিতেও প্রতিশ্রুত হইলেন।

কানুয়ায় মহাসমর

হিন্দুর হৃদয় ইহাতে গলিত হইল। শরণাগতবাৎসল্য হিন্দুর প্রধান ধর্ম্ম। সংগ্রামসিংহ সে ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। সুতরাং তিনি এরূপ অবস্থায় মোগল সৈন্য আক্রমণ করা বোধ হয় অধর্ম্ম বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। সন্ধির পরিণাম কি হয় দেখিয়া, বোধ হয়, কার্য্য করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। নতুবা এরূপ দীর্ঘসূত্রতার আর কোন কারণ স্থির করিয়া উঠা যায় না।

যে কারণেই হউক, সন্ধির প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইল। বাবর সন্ধির প্রস্তাব পরিত্যাগ করিয়া এখন বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় লইয়া হিন্দু-শিবিরে ভেদ উৎপাদন করিলেন। তখন সংগ্রামসিংহ বাবরের চাতুরী বুঝিতে পারিয়া ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন, এবং ১৬ই মার্চ্চ প্রত্যূষে মোগল-সৈন্যর মধ্য ও দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রমণ করিলেন। কয় ঘণ্টা ধরিয়া উভয় সৈন্যে ভীষণ সমর চলিতে লাগিল। রাজপুতগণ এই ভীষণ সমরে অতিমানুষ বীরত্ব প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাদিগের সে বীরত্ব ও আত্মোৎসর্গে কোন ফল দর্শিল না। বাবরের কামানবাজি অবিরাম অগ্নিময় গোলা বর্ষণ দ্বারা ক্ষত্রিয় বীরবৃন্দকে সমরশায়িত করিতে লাগিল। ক্ষত্রিয়গণ কিছুতেই সে কামানশ্রেণি-পরিরক্ষিত মোগলব্যূহ ভেদ করিয়া ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। সেই ব্যূহ মধ্যে মোগল পদাতিক সেনা চতুরস্র ক্ষেত্র করিয়া দণ্ডায়মান ছিল। যদিও ক্ষত্রিয় সেনা মোগলব্যূহ ভেদ করিতে পারিল না—তথাপি বিজয়লক্ষ্মী এখনও তাঁহাদিগের দিকেই রহিয়াছেন,—কারণ, মোগলেরা কেবল আক্রমণ নিবারণ করিতেছে মাত্র, ক্ষত্রিয় সেনাকে আক্রমণ করিতে সাহস করিতেছে না।

বাবর বিজয়ী

এই সঙ্কটসময়ে বিশ্বাসঘাতক ভুইয়ার শীলেদী সসৈন্য রাজপুতপক্ষ ছাড়িয়া মোগল শিবিরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন সংগ্রামসিংহ গত্যন্তর না দেখিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অপসৃত হইলেন। তিনি দেখিলেন যে, তিনি স্বয়ং ক্ষত, তাঁহার প্রধান প্রধান সামন্তগণ রণে নিহত, ও সৈন্যগণ উপর্য্যুপরি কয় ঘণ্টার নিরন্তর রণে ক্লান্তকলেবর, এ অবস্থায় আবার নূতন করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করা অসম্ভব। এই জন্য তিনি জয়-পরাজয় সন্দিগ্ধ থাকিতেই রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন। রণস্থলে দোঙ্গারপুরের রাউল উদয়সিংহ দুই শত নিজবংশীয় বীর সহ, মাড়ওয়ারাধিপতির পুত্র রাঠোরবংশীয় রায়মল্ল; মায়েটার অধিনায়কদ্বয় রায়সী ও রত্ন; সনিগুরাধিপতি রামদাস রাও, ঝালবংশীয় উজা; প্রমরবংশীয় গোকুলদাস; মিবারের চোহানবংশীয় প্রথম শ্রেণীস্থ সামন্তদ্বয় মাণিকচাঁদ ও চন্দ্রভানু প্রভৃতি ক্ষত্রিয়বৃন্দ সমাধিনিহিত রহিলেন। দিল্লীর সিংহাসনচ্যুত লোদী সম্রাটের পুত্র হোসেন খাও আসিয়া সদলে সংগ্রামসিংহের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। তিনিও সেই ক্ষত্রিয় বীরবৃন্দের পার্শ্বে সেই রণক্ষেত্রে সমাধি-নিহিত হইয়া রহিলেন। সেই পরিত্যক্ত শবাচ্ছাদিত রণক্ষেত্রে বাবরই বিজয়ী বলিয়া উদ্ঘোষিত হইলেন। তথায় সে উদ্ঘোষণার প্রতিবাদ করিবার জন্য আর কেহ ছিল না। আজ বিজয়ী বাবর "গাজী" (বিজয়ী) উপাধি গ্রহণ করিলেন। তাহার উত্তরাধিকারীগণ আবহমানকাল এই উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছিলেন। বাবর মৃত বীরবৃন্দের মস্তক পুঞ্জীকৃত করিয়া জয়চিহ্নস্বরূপ একটি নৃমুণ্ড-পীরামিড নির্ম্মাণ করাইলেন, আর সেই যুদ্ধক্ষেত্রের অদূরবর্ত্তী গিরিশৃঙ্গের উপরে নরকপাল দ্বারা একটি বিজয়মন্দির নির্ম্মাপিত হইল। এইরূপে সেই ভীষণ সমরের পর্য্যবসান হইল। আজ হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে হিন্দুর গৌরব-সূর্য্য চিরকালের জন্য রাহুগ্রস্ত হইল। হিন্দুর সৌভাগ্য-লক্ষ্মী যবনের অঙ্কশায়িনী হইল।

সংগ্রামসিংহের মৃত্যু

স্বদেশের স্বাধীনতা জন্য উৎসর্গীকৃত-প্রাণ সঙ্গের প্রাণে আজ নিদারুণ ব্যথা লাগিল। তিনি উৎসৃষ্ট-প্রাণ বীরবৃন্দের শোকে ও পরাজয়দুঃখে অভিভূত হইয়া মেওয়াট্ গিরির অভিমুখে ধাবিত হইলেন। তথায় গিয়া তিনি ঘোষণা করিলেন যে, যত দিন তিনি মোগল সেনার উপর বিজয় লাভ করিতে না পারেন, তত দিন চিতোরে পুনঃ প্রবেশ করিবেন না। যদি তিনি বাঁচিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে স্বদেশের লুপ্ত-গৌরব উদ্ধার করিয়া নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতেন। কিন্তু তাঁহার সাধ মিটিল না। যে বৎসর তিনি পরাজিত হইলেন, সেই বৎসর তাঁহার জীবনের শেষ বৎসর হইল। মেওয়াট গিরির সীমান্তপ্রদেশস্থ বুসওয়া নগরে এই মহাপ্রাণ মহাবীর স্বদেশ-বৎসল সংগ্রামসিংহ মানবলীলা সংবরণ করেন। বলিতে লজ্জা হয়—হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায় যে, তদীয় মন্ত্রী বাবরের সুবর্ণে ক্রীত হইয়া বিষপ্রয়োগ দ্বারা প্রভুর জীবন সংহার করিলেন। রাজহত্যার বিনিময়ে তাঁহারা অকীর্ত্তির শান্তি-সুখ ক্রয় করিয়া স্বদেশের মুখে কালী দিলেন। যে বাক্তি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, যত দিন না শত্রু বিজিত হয়, তত দিন তিনি গগনমণ্ডলকে নিজ চন্দ্রাতপে পরিণত করিবেন, আজ তদীয় মন্ত্রিবর্গ অনন্ত শান্তি-সুখের প্রয়াসী না হইয়া যদি তাঁহার সহিত বিপদ ও কষ্টের সাগরে ঝাঁপ দিতেন, তাহা হইলে আজ ভারতের ইতিহাস অন্য রূপ ধারণ করিত। হায় রে! কি পাপে তাহা ঘটিল না! কি পাপে বিশ্বাসঘাতকতা ভারতীয় জাতীয় দুর্গতির কারণ হইয়াছে? বল বিধি, কেন তুমি আমাদের প্রতি বাম?

বাবর রণে জয় করিয়াও সঙ্গ-ভীত হইতে মুক্ত হন নাই। তিনি সঙ্গের পরাক্রম স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন—এই জন্য তিনি সঙ্গকে ভয়ও করিতেন ও শ্রদ্ধাও করিতেন। তিনি এই জন্য আর তাঁহার সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে সাহস করেন নাই। তিনি তদীয় আত্মজীবনবৃত্তান্তে লিখিয়াছেন যে, "রাণা আপন বীরত্ব ও বাহু-বলেই উন্নতি-শৈলের এত উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছেন।"

সংগ্রামসিংহের আকৃতি-প্রকৃতি

রাণা সঙ্গ মধ্যমাকৃতি ছিলেন। তাঁহার শরীরে শারীরিক বলের পরাকাষ্ঠা ছিল। তিনি উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ছিলেন। তাঁহার নয়নদ্বয় অতি বিস্ফারিত ছিল। তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ সকলেই প্রায় তাঁহার বিস্তৃত নয়ন পাইয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি প্রকৃত বীরের দেহ ধারণ করিয়াছিলেন। ভ্রাতার সহিত সংঘর্ষে তিনি একটি চক্ষু হারাইয়াছিলেন। লোদীবংশ দিল্লীর সম্রাটের সহিত সমরে তাঁহার একখানি হাত ভাঙ্গিয়া যায়। একটি কামানের আঘাতে তাঁহার আর একটি অঙ্গ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় তিনি বিকলাঙ্গ হইয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার দেহ সর্ব্বশুদ্ধ অশীতিসংখ্যক অস্ত্র-ক্ষত-চিহ্ন ধারণ করিয়াছিল। কিন্তু কার্য্যোদ্যমের তীব্রতায় অতি প্রথিত ছিলেন। মালবাধিপতি মুজঃফরকে রণে পরাজিত বন্দীভূত করা—অভেদ্য দুর্গ রিন্থম্বোরের সহজে গ্রহণ প্রভৃতি কার্য্য তাঁহার বীরত্ব ও অদম্যসাহসিকতার পরিচয় দিতেছে। এই সকল বীরোচিত গুণের সহিত দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতা মিলিত হইয়া তাঁহাকে আদর্শ-নরপতি করিয়া তুলিয়াছিল। যদি তাঁহার পরবর্ত্তী রাণা তদীয় গুণাবলী অনুকরণ করিতেন—তাহা হইলে দিল্লীতে মোগলসাম্রাজ্য কখনই স্থির থাকিতে পারিত না। সঙ্গ কান্নুয়া সমরক্ষেত্রে একটি প্রাসাদ নির্ম্মাপিত করিয়া তাহাতেই নিবারের প্রান্তসীমারূপে নির্দ্দেশিত করিয়াছিলেন। বাবর এ প্রাসাদ অতিক্রম করিয়া দিল্লীর রাজসীমা বাড়াইতে সাহস করেন নাই।

কান্নুয়া সমরের দুই বৎসর পরে (সংবৎ ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দ ১৫৩০) রাজপুতকুলচূড়ামণি মানবলীলা সংবরণ করেন। বিশ্বাসঘাতক অমাত্যবর্গের ষড়যন্ত্র আহারের সঙ্গে হলাহল প্রযুক্ত হয়। তাহাতেই এই অপূর্ব্ব বীরদেহ নিমেষমধ্যে বিকলেন্দ্রিয় হইয়া যায়। ইঁহার চিতাভস্মের উপর একটি সমাধি-মন্দির বিনির্ম্মিত হয়। এই সমাধিমন্দির বহুকাল পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল।

সঙ্গের সর্ব্বশুদ্ধ সাতটি পুত্র সন্তান জন্মে। তাহার মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় অপ্রাপ্তবয়স্ক অবস্থাতেই প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার তৃতীয় পুত্ররত্ন মিবারের শূন্যসিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন।

রাণা রত্ন

রাণা রত্ন ১৫৮৬ সংবৎ বা ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি পিতা হইতে ক্ষত্রোচিত তেজ ও বীরোচিত গুণাবলী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনিও পিতার ন্যায় প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যত দিন শত্রু অবিজিত থাকিবে, তত দিন তিনি রণস্থলকে রাজধানীস্বরূপ করিবেন। তিনি চিতোরের দুর্গদ্বার বন্ধ করিতে নিষেধ করিলেন, এবং ঘোষণা করিলেন যে, দিল্লী ও মণ্ডুই অতঃপর তাঁহার তোরণ-দ্বার হইবে। যদি রত্ন যৌবনসুলভ প্রচণ্ডতা ও অবিমৃষ্যকারিতা সংযত করিয়া রাজ্য করিতে পারিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, তিনিও প্রতিজ্ঞা পালন করিতে পারিতেন। কিন্তু যৌবনের প্রথম সীমাতেই এই গুরুভার তাঁহার স্কন্ধে পতিত হওয়ায় আত্ম-সংযম শিক্ষা করার সময় তিনি পাইলেন না। সুতরাং তিনি সে গর্ব্বিত ঘোষণা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলেন না।

রত্নের গুপ্ত পরিণয়

দুর্দ্দমনীয় জিগীষাপরতন্ত্র হইয়া রত্ন বিবাদ অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বিবাদের কারণও শীঘ্রই উপস্থিত হইল। রত্নের জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম ভ্রাতার মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি অম্বরাধিপতি পৃথ্বারাজের দুহিতাকে অতি গোপনে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার দ্বিফলা তরবারি তাঁহার সেই বিবাহের সাক্ষিস্বরূপ ছিল। তিনি বিবাহের পর এই তরবারি পৃথ্বারাজ-তনয়ার নিকট রাখিয়া আসিয়াছিলেন — বলিয়া আসিয়াছিলেন যে, যথাসময়ে তিনি এই তরবারি উদ্ধার করিবেন, এবং সেই সময় বিবাহের কথা ঘোষণা করিয়া তাঁহাকে গৃহে লইয়া যাইবেন। কন্যা বীরের এই কথায় বিশ্বাস করিয়া নির্জ্জনে তাঁহাতে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু রত্ন চিতোরের সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া আর সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন না। এই অবস্থায় বুন্দীরাজ হরসিংহ সেই কন্যার পাণিগ্রহণাভিলাষী হইলেন। রত্নের সহিত যে তাঁহার পূর্ব্বেই বিবাহ হইয়া গিয়াছিল, এ কথা বরকন্যা ও কন্যাপক্ষীয় ব্যক্তিগণ ব্যতীত আর কেহই জানিতেন না। সুতরাং হরসিংহ সেই কন্যার পাণিগ্রহণের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়া কোন প্রকার সাধু-বিগর্হিত কার্য্য করেন নাই।

রত্ন দ্বন্দ্বযুদ্ধে হত

রত্ন ইহার পর হরসিংহের ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সুতরাং হরসিংহ রত্নের সহিত অম্বররাজতনয়ার বিবাহের কথা জানিতে পারিলে কখনই এরূপ প্রস্তাব করিয়া পাঠাইতেন না। বিশেষতঃ বুন্দীরাজবংশ—সমরসিংহের সহিত মিলিত হইয়া দৃশদ্বতীনদীতীরে সাহাবুদ্দীনের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সেই দিন হইতে এই দুই রাজপরিবারে একটি ধর্ম্ম-সম্বন্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। বুন্দীরাজবংশ সেই অবধিই মিবারের পক্ষতিতলে আশ্রয় লইয়া ধীরে ধীরে সমৃদ্ধিশালী ও কীর্ত্তিশালী হইয়া আসিতেছিল। আজ হরসিংহ অজ্ঞানতা বশতঃ সেই মৈত্রীসূত্র ছিন্ন করিলেন। অম্বররাজতনয়া রত্নের বিবাহ প্রকাশ না করায় হরসিংহের প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলেন। মহাসমারোহে হরসিংহ রত্নজায়াকে বিবাহ করিয়া মিবার-বংশে ও রত্নের হৃদয়ফলকে কলঙ্কারোপ করিলেন। এ অজ্ঞানকৃত অপরাধ রত্নের হৃদয়কে শেলবিদ্ধ করিল। তিনি এ অপরাধের প্রতিশোধ লইবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। এ সুবিধাও শীঘ্র উপস্থিত হইল। বসন্ত শীকারোৎসব * আসিয়া উপস্থিত হইল। উভয় বীরই সেই উৎসবস্থলে উপস্থিত হইলেন। রত্ন হরসিংহকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিলেন, এ আহ্বান অস্বীকার করা ক্ষত্র-ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ। সুতরাং হরসিংহ অগত্যা এ আহ্বানে যোগ দিলেন। দুই বীর প্রচণ্ড দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরস্পরের অস্ত্রে পরস্পর প্রাণ হারাইলেন। রত্নের মৃত্যুতে সমস্ত মিবার শোকে অভিভূত হইল। তিনি পাঁচ বৎসরমাত্র মিবারের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন, এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে তিনি তীব্রকান্ত গুণাবলী দ্বারা প্রজাবর্গের অনুরাগ-ভাজন হইয়া উঠিয়াছিলেন। সকলেই তাঁহা হইতে অনেক মহৎকার্য্যের আশা করিতেছিলেন। প্রত্যুত রত্ন দীর্ঘজীবন লাভ করিলে বোধ হয়, মোগল-সাম্রাজ্য দিল্লীর সিংহাসন-চ্যুত হইত। কিন্তু বিধির নির্ব্বন্ধে

* আহেরিয়া (Ahaeria)।

তাহা ঘটিল না। রত্ন কামদেবের মন্দিরে আত্মবলি দিয়া মিবারকে ঘোর বিপদে ফেলিয়া গেলেন। কিন্তু একটি সান্ত্বনা মৃত্যুকালে রত্নের মনে শান্তি প্রদান করিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে সঙ্গ-বিজয়ী বাবরের মৃত্যু হইয়াছিল—এবং সেই বিজয়ের পর মোগল-সম্রাট্ সূচ্যগ্র-পরিমিত ভূমিও মিবার-রাজ্য হইতে দিল্লীর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারেন নাই। এই সান্ত্বনা লইয়া রত্ন ইহালোক হইতে অন্তর্হিত হইলেন। তিনি অপুত্রক ছিলেন বলিয়া—তাঁহার ভ্রাতা বিক্রমজিৎ সেই শূন্য সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

রাণা বিক্রমজিৎ

১৫৯১ সংবতে (১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে) রাণা বিক্রমজিৎ মিবারের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। রত্নের ন্যায় ইহারও যৌবন-সুলভ মত্ততা ছিল। কিন্তু এই মত্ততা সত্ত্বেও যে সকল ভামকান্ত নৃপগুণে রত্ন মিবারের প্রজাবৃন্দের অনুরাগ-ভাজন হইয়াছিলেন, বিক্রমজিতের সে সকল গুণ বিদ্যমান ছিল না। তিনি অধিকন্তু দৃপ্ত, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র, প্রতিহিংসাশীল এবং আত্ম-সম্মানজ্ঞানবিরহিত ছিলেন। তিনি রাজপুতগণের নেতৃত্ব পরিত্যাগ করিয়া, নিরন্তর মল্লগণের ও পুরস্কার-লোভী ব্যবসায়ী যোদ্ধাবৃন্দের সহবাসে কালাতিপাত করিতেন। যে পুরস্কার বা রাজপ্রাসাদ এতদিন উচ্চবংশীয় রাজপুত অশ্বারোহী বীরবৃন্দই কেবল অধিকার করিয়া আসিতেছিলেন, বিক্রমজিৎ সেই রাজপ্রাসাদ এই সকল মল্ল ও ব্যবসায়ী যোদ্ধা এবং 'পাইক' বা পদাতিক সৈন্যের উপর অজস্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন। বোধ হয় বিক্রমজিৎ মোগলদিগের নিকট হইতে এই প্রথা শিক্ষা করিয়াছিলেন। কারণ কামানের যুদ্ধ ক্রমেই অধিকতর ব্যবহৃত হওয়ায়, মোগলেরা কামান রক্ষার ও পরিচালনের জন্য এই সময় হইতে পদাতিক সৈন্যের অধিকতর আদর আরম্ভ করেন। বিশেষতঃ অবরোধকালে দেখা গিয়াছে—অশ্বারোহী সৈন্য দ্বারা কোন কার্য্য হয় না। বাবরের সঙ্গে যুদ্ধে রাজপুত অশ্বারোহিগণ কিছু কাজে লাগে নাই। সে সময় তাহারা অশ্ব বাঁধিয়া অশ্বপৃষ্ঠ হইতে কার্পেট তুলিয়া তাহা পাতিয়া তাহাতে উপবেশন করিয়াছিলেন। পদাতিক সৈন্যই মোগল-ব্যূহ ভেদ করিতে অগ্রসর হইয়াছিল, বোধ হয়, বিক্রমজিৎ এই কারণেই, রাজপুত অশ্বারোহী অপেক্ষা পদাতিক সৈন্যের অধিক আদর করিতে লাগিলেন।

রাজপুতগণের স্থিতিশীলতার পরিণাম

রাজপুতেরা কিন্তু বিক্রমজিতের এই পরিবর্ত্তনে তাঁহার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। কামানের আবশ্যকতা ইহারা এখনও উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। তাঁহারা বর্শা বা তরবারিহস্তে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া কামানমুখে আত্ম-সমর্পণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন, তথাপি অশ্বপৃষ্ঠে হইতে অবতরণ করিয়া সামান্য পদাতিক সৈন্যের সহিত মিশিয়া যাইতে প্রস্তুত ছিলেন না। এরূপ স্থিরশীল জাতি পৃথিবীর আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না! যাহা পূর্ব্বপুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে, তাহার বিরুদ্ধাচরণ তাঁহারা কিছুতেই করিতে প্রস্তুত হন না। এই জন্যই এত বীরত্ব—এত আত্মোৎসর্গ সত্ত্বেও রাজপুতবীরগণ মোগলসেনার নিকট বার বার পরাজিত হইয়াছেন। একদিকে কামানরাজি অনবরত অগ্নি উদ্গারণ করিয়া বিশ্বজগৎ গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে, অন্য দিকে রাজপুত অশ্বারোহী সেনা বর্শা ও তরবারি হস্তে পতঙ্গ-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া সেই বহ্নিমুখে প্রবিষ্ট হইতেছেন! এ দৃশ্যে আমাদের হৃদয় নিদারুণ ব্যথিত হয়! আমাদের অদৃষ্টকে তিরস্কার না করিয়া থাকা যায় না! এত বীরত্ব—এত আত্মোৎসর্গ—একটু বুদ্ধির এটিতে ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল। রাজপুতগণের বাহুতে যে বল ছিল, হৃদয়ে যে মহত্ত্ব ছিল, তাহার সহিত যদি মস্তকে বুদ্ধি থাকিত—তাহা হইলে বোধ হয়, জগতের আধিপত্য তাঁহাদিগের করতলস্থ হইত! কিন্তু বিধাতা একধারে সকল গুণ দেন না! তাই আজ আমরা পথের কাঙ্গালী! জগতের কৃপার পাত্র! দাসের দাস!

গুজরাটাধিপতি বাহাদুরসাহেব চিতোরাক্রমণ

বিক্রমজিতের এই পরিবর্ত্তনে সকল রাজপুতই অন্তরে রাজবিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা প্রকাশ্যরূপে বিক্রমজিতের রাজত্বকে "পোপ্পাবাইকা রাজ" * বলিয়া পরিহাস করিতে লাগিলেন। সুদূর পার্ব্বত্যপ্রদেশের অধিবাসিবৃন্দ আসিয়া চিতোরের প্রাচীরের বাহির হইতেই গো-পাল ও মেষ-পাল চুরি করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। বিক্রমজিৎ যখন তাঁহার অশ্বারোহী সৈন্যবৃন্দকে তদনুসরণে ব্যস্ত হইতে আদেশ দিলেন, তখন তাঁহারা পরিহাস করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে, রাণা যেন তাঁহার পাইকগণকে এই কার্য্যে প্রেরণ করেন।

গুজরাটের সুলতান বাহাদুরসাহ এই অন্তর্বিচ্ছেদের সুবিধা লইবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। পূর্ব্বাপমানের প্রতিহিংসা লইবার এমন সুযোগ আর ঘটিবে না—তাহা তিনি বুঝিলেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ মুজঃফরের পরাজয় ও কারারোধ তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ়-প্রোথিত শল্যের ন্যায় বিদ্ধ ছিল। এক্ষণে তাহা উত্তোলিত করিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইলেন। তিনি মণ্ডুর অধিপতির নিকট সৈন্য-সাহায্য পাইয়া সেই মিলিত সৈন্য লইয়া রাণার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। যদিও বাহাদুরসাহের সৈন্য অগণ্য ছিল, তথাপি ক্ষত্রিয়োচিত সাহসের উপর নির্ভর করিয়া বিক্রমজিৎ তাঁহাকে যুদ্ধ প্রদান করিলেন। যুদ্ধস্থলে কেবল তাঁহার পাইক বা পদাতিক সৈন্যই উপস্থিত হইয়াছিল। রাজপুত অশ্বারোহী সৈন্যগণ কেবল যে তাঁহার সহিত যোগ না দিয়াও ক্ষান্ত রহিলেন, এরূপ নহে, তাঁহারা একবাক্যে সকলেই চিতোররক্ষার্থ ধাবিত হইলেন। সঙ্গের মৃত্যুর পর তাঁহার যে পুত্র জন্মে, তাঁহাকেই তাঁহারা ভাবী রাণা স্থির করিয়া তাঁহার তত্ত্বাবধান আরম্ভ করিলেন।

---

* পুরাকালে পোপ্পাবাই নামে একজন রাণী মিবারের সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। তাঁহার সময় অত্যন্ত অরাজকতা হইয়াছিল বলিয়া ইহা অরাজকতা বিষয়ের প্রসঙ্গস্বরূপ হইয়া আছে।

চিতোর ধ্বংসের সবিশেষ আয়োজন

প্রত্যেক রাজপুতের হৃদয় চিতোরের নামে নৃত্য করিতে থাকে। ইতালীয়গণ যেমন রোমনগরীর নামে উন্মত্ত, সমস্ত রাজপুতানার অধিবাসীও সেইরূপ চিতোরের নামে উন্মত্ত। সে নামে তাঁহাদিগের কর্ণে অমৃত বর্ষণ করে। চিতোর তাঁহাদিগের নিকট সমস্ত পবিত্রতার খনি। এই জন্যই সেই পুরাকাল হইতেই চিতোরের রক্ষার্থ সমস্ত রাজপুতানার অধিবাসিগণ বিদ্বেষ ভুলিয়া প্রাণোৎসর্গ করিতে প্রস্তুত। সেই পবিত্রভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া আজ রাজপুতানার সমস্ত সামন্ত ও রাজন্য চিতোরাভিমুখে ধাবিত হইলেন।

আজ দেওলাধিপতি সুরজমল্লের পুত্র পূর্ব্ববৈর বিস্মৃত হইয়া শরীরের রক্তবিন্দু দিয়া পিতৃপৈতামহিক রাজধানীর রক্ষার্থ ধাবিত হইলেন। বুন্দীরাজপুত্র পঞ্চশত হর বীর সমভিব্যাহারে দ্রুতপদে চিতোরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেইরূপ ঝালোর ও আবুর সোণিগুরা ও দেওরাবংশীয় রাওগণ সসৈন্যে চিতোরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই চন্দ্রাবৎবংশীয়গণ, রাঠোর বংশীয়গণ, রাওত্রা প্রভৃতি তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

চিতোর দুর্গাবরোধ

এ দিকে সুলতান বাহাদুরসাহও চিতোর-ধ্বংসের নিমিত্ত সবিশেষ আয়োজন করিলেন। তিনি চিতোর দুর্গের মূলোচ্ছেদ করিবার নিমিত্ত ইউরোপীয় আর্টিলারিষ্টস্ × বা কামানদারগণকে নিযুক্ত করেন। বাবর যে ইঞ্জিনিয়ারের কামানপ্রয়োগদ্বারা রাজস্থানের সমবেত

---

* চাঁদ কবির কাব্য-গ্রন্থে লিখিত আছে যে, দিল্লীসম্রাট পৃথ্বীরাজও কামান ও 'নল গোলা' ব্যবহার করিয়াছিলেন। তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, একবার নহে, বার বার বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই সকল যুদ্ধক্ষেত্রীয় আগ্নেয় গিরিমুখ হইতে অবিরাম অগ্নি উদ্গীরিত হইয়াছিল। ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি জন্মিতেছে যে, হিন্দুরা যুদ্ধস্থলে বড় বড় কামান ও গোলা ব্যবহার করিতেন। ইহার পর বিয়ানা-যুদ্ধে বাবর কামান ও গোলার অবতারণা করেন। সুলতান বাহাদুরসাহই সর্ব্বপ্রথমে দুর্গাবরোধকালে কামান ও গোলার ব্যবহারের সূত্রপাত করেন।

অশ্বারোহী সৈন্যকে পরাস্ত করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম করিম খাঁ। বাহাদুর খাঁ যে ইঞ্জিনিয়ারের সাহায্যে চিতোর জয় করেন, তাঁহার নাম কিবিমী লাবী খাঁ। তিনি 'বাঁকা পাহাড়ের' নিম্নে একটি সুড়ঙ্গ খনন করিয়া উক্ত সুড়ঙ্গ বারুদপূর্ণ করিয়া তাহাতে অগ্নি প্রদান করেন। ইহাতে চিতোর-দুর্গের বন পঞ্চচত্বারিংশৎ ফুট উড়িয়া যায়। দুর্গের ঐ স্থলেই বীর পঞ্চশত হর দণ্ডায়মান হইয়া উহার রক্ষাকার্য্যে ব্রতী ছিলেন। বুন্দীরাজকুমারসহ তদীয় পঞ্চশত হর বীর কোথায় উড়িয়া গেলেন! বুন্দাকবিগণ এই শোচনীয় ঘটনা উপলক্ষ করিয়া অতি তীব্র করুণরসের অবতারণা করিলেন। বাও দুর্গা এবং চন্দ্রাবত সামন্তদ্বয় সত্তো ও দুদু সদর্পে অতি বীরত্বের সহিত সুড়ঙ্গমুখ রক্ষা করিতে লাগিলেন। এ দিকে রাঠোরবংশীয় রাণীমাতা জেওয়াহীর বাই কঞ্চুকে অঙ্গ আবৃত করিয়া একদল সৈন্যের নেত্রী হইয়া অসিহস্তে দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া যবন-সেনাকে আক্রমণ করিলেন। বীরা রমণীর বীরত্ব ও স্বজাতিপ্রেম দেখিয়া আক্রমণকারী ও আক্রান্ত উভয় সৈন্যই মুগ্ধ হইল। রণরঙ্গিণী বামা অসিহস্তে সমর করিতে করিতে রণদেবীর মন্দিরে আত্মবলি প্রদান করিলেন। চিতোরে হাহাকার ধ্বনি উঠিল। আজ মিবারের প্রজামণ্ডলী যেন মাতৃহারা হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

এ দিকে যবনেরা ক্রমেই অগ্রসর হইতে লাগিল। তখন চিতোরে এক সামরিক সভার অধিবেশন হইল। কিরূপে তাঁহারা এই উপস্থিত বিপদে চিতোরের ভবিষ্যৎ আশাস্থল শিশুরাজার প্রাণ রক্ষা করিবেন, কেবল এই বিষয়ে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন।

বাঘজীর অভিষেক

কিন্তু রাজা না থাকিলে চিতোররক্ষা কে করে? রাজবলি ব্যতীত চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা প্রসন্না হন না। এই জন্য তাঁহারা একজন ব্যবহিত মুকুটধারী খাড়া করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। দেওলাধিপতি সুরজমল্লের পুত্র বাঘজী এই ব্যবহিত মুকুটধারী হইতে স্বীকৃত হইলেন। তিনি যথারীতি অভিষিক্ত হইয়া চিতোরের শূন্য সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। চিতোর-সিংহাসন বিক্রমজিতের নগর-পরিত্যাগের পর হইতেই শূন্য পড়িয়াছিল। আজ তাহার উপর সুরজমল্লের পুত্র মহোৎসবে ও ক্ষত্রবীরবৃন্দের জয়ধ্বনির মধ্য দিয়া আরোহণ করিলেন। চিতোরের সূর্য্যমণ্ডল-পরিশোভিত লোহিত-ধ্বজা তাঁহার মস্তকের উপর সদর্পে উড়িতে লাগিল। যখন প্রধান রাজচিহ্ন সুবর্ণ-সূর্য্য মধ্যে সুনীলবপু রাজছত্র নব রাজার মস্তকের উপর উত্তোলিত হইল, তখন চতুর্দ্দিকে "হর! হর!" ধ্বনিতে ও জয়শব্দে দিক্ বিদীর্ণ হইতে লাগিল। শিশু উদয়সিংহের রক্ষার ভার বুন্দীরাজ চুকাসেন ধুন্ধেরার হস্তে সমর্পিত হইল। দুর্গরক্ষক সৈন্যগণ সকলেই রক্তপরিচ্ছদে আবৃত হইলেন।

রাজপুতরমণীগণের অলৌকিক আত্মোৎসর্গ

এ দিকে রাজপুতসতীগণের সতীত্বরক্ষার জন্য জোহর বা আত্মবলির উপাদানসামগ্রীসকলের আয়োজন হইতে লাগিল। চিতানল সজ্জিত করিবার আর সময় ছিল না। শত্রুকৃত সুড়ঙ্গমুখ রক্ষা করিতে গিয়া অসংখ্য ক্ষত্রবীর আত্মাহুতি প্রদান করিয়াছেন। আর চিতোর-রক্ষা হয় না দেখিয়া বীরা রমণীগণ যবনের হস্ত হইতে অনন্য সতীত্বরত্ন রক্ষা করিবার জন্য আত্মাহুতি দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। চিতোরের গিরিবক্ষে বিশাল গর্ত্তসকল খনন করা হইল। সেই সকল গর্ত্ত বারুদে বা অন্যান্য দাহ্য পদার্থে পরিপূর্ণ করা হইল। নবাভিষিক্ত রাণা বাঘজীর জননী আদর্শ-সতী কর্ণাবতী ত্রয়োদশ সহস্র রাজপুতসতীর অগ্রগামিনী হইয়া সেই কৃত্রিম গিরিগহ্বরে গিয়া ঝাঁপ দিলেন। অমনি সেই সকল দাহ্য পদার্থে অগ্নি প্রদান করা হইল। নিমেষমধ্যে কর্ণাবতীসহ সেই ত্রয়োদশ সহস্র রাজপুত সুন্দরী এ পাপ পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গধামে চলিয়া গেলেন। তাঁহাদিগের সেই স্বর্গীয় দেহকান্তির আর চিহ্নমাত্র রহিল না। তখন চিতোরের তোরণ-দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। নব রাণা বাঘজী মৃতাবশিষ্ট বীরবৃন্দে অগ্রণী হইয়া প্রচণ্ডবেগে যবনসৈন্যের উপর আসিয়া পতিত হইলেন। কিন্তু সে ক্ষুদ্র তরঙ্গ যবনগিরির পাদদেশে বার বার আহত হইয়া ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। আবার চিতোর-সিংহাসন শূন্য পড়িয়া রহিল। চিতোর আজ এই দ্বিতীয়বার মহাশ্মশানে পরিণত হইল! হায়! আর এ দৃশ্য দেখা যায় না! হিন্দুর এ দুর্দ্দশা আর সহ্য হয় না।

ভগবতী বসুন্ধরে! দ্বিধা-বিভক্ত হও! তোমার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া প্রাণের এ দুর্ব্বিষহ জ্বালা জুড়াইগে! অথবা কাল স্মৃতি আমায় ছাড়িবে না। কোন স্থানে গিয়াও ইহার হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারিব না। পূর্ণ নির্ব্বাণ ব্যতীত এ জ্বালার হাত এড়াইবার আর উপায় দেখি না!

এই দুর্ঘটনা ১৫৮৯ সংবতের (১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে) ১২ই জ্যৈষ্ঠ ঘটিয়াছিল। এই দিনে ভারতবক্ষে এক প্রকাণ্ড শেল প্রোথিত হইল। সে শেল কবে উদ্ধৃত হইবে, বিধাতাই জানেন।

চিতোর মহাশ্মশানে পরিণত

বাহাদুরসাহ চিতোরে প্রবেশ করিয়া ইহার ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। দেখিলেন, অসংখ্য মৃতদেহ ভীষণ আকার ধারণ করিয়া পড়িয়া আছে—তাহা অপেক্ষাও ভীষণতর আর একটা দৃশ্য দেখিয়া বাহাদুরের হৃদয় গলিত হইল। তিনি দেখিলেন যে, চিতোর একেবারে রমণীশূন্য হইয়াছে। রাজপুত রমণীরা সতীত্বকে প্রাণাপেক্ষা অধিকতর ভালবাসেন। তাই সতীত্বনাশের আশঙ্কায় স্বহস্তে বক্ষস্থলে ছুরিকা প্রবেশিত করিয়া বা বিষপান করিয়া রাজপুত রমণীগণ আজ প্রশান্তভাবে মৃত্যু প্রতীক্ষা করিতেছেন। * কর্ণাবতীনীতা সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ পূর্ব্বেই বিশ্বাবসু-ক্রোড়ে গিয়া সতীত্বনাশ ও কারাবাসের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। ত্রিশ সহস্র রাজপুত-মহিলা পূর্ব্বেই অগ্নিমুখে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। আজ অবশিষ্ট রাজপুতরমণীগণ ছোরা-প্রহারে বা বিষপান দ্বারা যবনের হস্ত হইতে নিজ নিজ সতীত্ব ও সম্মান রক্ষা করিলেন। আজ চিতোরের শেষ দিন উপস্থিত। আজ প্রত্যেক রাজপুতবংশ নেতৃহীন ও প্রত্যেক নেতা সহায়হীন হইয়াছেন। অবরোধ ও আক্রমণে সর্ব্বশুদ্ধ দ্বাত্রিংশৎ সহস্র রাজপুত বীর এই ভীষণ সমরে নিহত হন। চিতোরের এই দ্বিতীয়শক বা অর্দ্ধ-ধ্বংস!

বাহাদুরসাহ দুই সপ্তাহ মাত্র চিতোরে অবস্থিতি করিতেছেন—এমন সময় সংবাদ আসিল যে, হুমায়ুন চিতোর-রক্ষার জন্য সসৈন্যে তদভিমুখে আসিতেছেন। রাণী কর্ণাবতীর আহ্বানে বীর বীর হুমায়ুন বঙ্গ-বিজয় পরিত্যাগ করিয়া আজ চিতোর-সতীকুলের উদ্ধারার্থ আগমন করিতেছেন। কিন্তু সে মৃদুগতি এরূপ বিপদের উদ্ধারের অনুকূল নহে। যাহাদের উদ্ধারের নিমিত্ত তিনি আসিতেছিলেন, সে রাজপুতসতীগণ আর যবনের বিভীষিকার অধীনা নহেন। হুমায়ুনের আগমনের পূর্ব্বে তাঁহারা এ পাপ পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া বিশ্বনাথের ক্রোড়ে স্থান লইয়াছেন। হুমায়ুন সে দুর্ঘটনার পরে গজপতি-গমনে চিতোর শ্মশানে আসিয়া উপস্থিত। তাঁহার আগমনের পূর্ব্বেই বাহাদুরসাহ চিতোর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন। হুমায়ুন যদি এত দূরে অবস্থিত না থাকিতেন, তাহা হইলে এরূপ দুর্ঘটনা কখনই ঘটিতে পারিত না, বাহাদুরসাহ তাহা হইলে কখনই এরূপ অসমসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন না। কারণ, বীরধর্ম্মানুসারে তিনি চিতোর-রক্ষার জন্য প্রাণোৎসর্গ করিতে বাধ্য ছিলেন। কারণ, রাণী কর্ণাবতী স্বয়ং তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় ভগিনী রাঠোর-রাজনন্দিনী উদয়সিংহ-জননী হুমায়ুনকে যে রাখী প্রেরণ করিয়াছিলেন, সে রাখীদ্বয় গ্রহণ করিয়া হুমায়ুন্ ঐ দুই সম্ভ্রান্ত মহিলাদ্বয়ের ধর্ম্ম-ভ্রাতৃত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। সুতরাং এ বিপদের সময় তিনি প্রাণোৎসর্গ না করিলে তিনি বীর-ধর্ম্মচ্যুত হইবেন। বীর প্রাণ দিতে পারেন, কিন্তু বীরধর্ম্ম ছাড়িতে পারেন না।

---

* বিজেতা নরপতি বিজিত নরপতির স্ত্রীগণকে কারারুদ্ধ করিয়া লইয়া গিয়া নিজ ভোগ সেবায় নিযুক্ত করিয়া থাকেন। এইরূপ অন্যান্য বিজেতা বিজিত বীরবৃন্দের পত্নীগণকে কারারুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে আপনাদিগের মধ্যে ভাগ করিয়া লইয়া থাকেন। এইরূপ বিবাহকে মনু রাক্ষস-বিবাহ বলিয়াছেন! এইরূপ বিবাহের প্রথা অন্যদেশেও প্রচলিত ছিল। ওল্ড টেষ্টামেণ্টের এক স্থানে সিসেরাজননী জিজ্ঞাসা করিতেছেন—তাঁহারা কি বিজিত রমণীগণকে প্রত্যেকে দুই একটি করিয়া ভাগ করিয়াছেন—Judges V 31.

হুমায়ুন রাজপুতমহিলার রাখীবন্ধ ভাই

রাজপুত মহিলারা রাখী উপহার দিয়া ধর্ম্মভ্রাতৃত্ব-সম্বন্ধ স্থাপন করিতেন। এই ধর্ম্মভ্রাতৃগণকে তাঁহারা রাখীবন্ধ ভাই * বলিয়া আদর করিতেন। এই রাখীর বিনিময়ে "রাখীবন্ধ ভাই" ধর্ম্ম-ভগিনীকে কাঁচুলী ও সুবর্ণ-মণিমুক্তাদির অলঙ্কার উপহার দিতেন। আজ এই উদয়জননী এই প্রথা অনুসারে রাখী প্রেরণ দ্বারা হুমায়ুনকে ভ্রাতৃসম্বন্ধে আবদ্ধ করিলেন। হুমায়ুন্ বিয়ানাযুদ্ধে পিতার সঙ্গে থাকিয়া রাণা সঙ্গের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে রাণা সঙ্গ ও তদীয় রাজপুতসৈন্যগণের বীরত্ব ও আত্মোৎসর্গ দেখিয়া তাঁহাদিগের প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধাবান্ হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ রাণা সঙ্গের মহাপ্রাণতার আরও অনেক পরিচয় পাইয়া হুমায়ুন তাঁহাতে মুগ্ধ ছিলেন। এই জন্য রাণা সঙ্গের পরিবারবর্গ ও সন্তান-সন্ততিগণের বিপদে তাঁহার স্বতঃই সহানুভূতি উদ্রিক্ত হইল। তাহার উপর এই ধর্ম্মসম্বন্ধে সেই সহানুভূতি গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়া উঠিল। আজ তিনি তাই সেই শ্রদ্ধা ও এই স্নেহের ঋণ পরিশোধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

রাণা বিক্রমজিৎ চিতোরে পুনঃ প্রতিষ্ঠাপিত

একে একে তিনি সমস্ত সঙ্কল্প সিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি বাহাদুরকে চিতোর হইতে তাড়াইয়া, মণ্ডুরাজ বাহাদুরকে সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া তদীয় রাজধানী মণ্ডুনগরী সবলে কাড়িয়া লইলেন; কাড়িয়া লইয়া সেই মণ্ডুরাজসিংহাসনে রাণা বিক্রমজিৎকে বসাইয়া মণ্ডুরাজ্য তাঁহাকেই অর্পণ করিলেন। তিনি অভিষেকের পূর্ব্বে স্বহস্তে রাণা বিক্রমজিতের কটিদেশে তরবারি বাঁধিয়া দিলেন। হুমায়ুনের ব্যবহারে সমস্ত রাজপুতানা মুগ্ধ হইল। রাজপুত রমণীগণের মন হইতে যবন-বিদ্বেষ অনেক পরিমাণে কমিল। কর্ণাবতী ও উদয়জননার দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তন করিয়া অনেক রাজপুতরাণী ও সম্ভ্রান্ত মহিলা তাঁহার সহিত রাখীবন্ধভাই সম্বন্ধ পাতাইলেন। *

রাণা বিক্রমজিৎ স্বরাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠাপিত হইলেন বটে, কিন্তু দারিদ্র্য ও বিপদে কিছুই শিক্ষালাভ করিতে পারেন নাই। তিনি পূর্ব্বের ন্যায় এখনও অতিদৃপ্ত ও মর্য্যাদালঙ্ঘনকারী রহিলেন। পিতার বৃদ্ধ মন্ত্রিবর্গের প্রতি যে কিরূপ সম্মান করা উচিত,তাহা তিনি জানিতেন না। প্রত্যুত তিনি পদে পদে তাহাদিগকে অপমান করিয়া বসিতেন। এক দিন তিনি প্রকাশ্য রাজসভায় তদীয় পিতার বিপদ-বন্ধু আজমীরাধিপ বৃদ্ধ সামন্ত কেরেমচাঁদকে অবমাননা করায় সমস্ত

---

* এই রাখীবন্ধ সম্বন্ধে অনেক ঐতিহাসিক কাহিনী লিখিত আছে। রাজপুতরমণীগণ প্রথমে বিপন্নাবস্থায় যবন-সম্রাট্‌গণের নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিয়া রাখীপ্রেরণ দ্বারা তাঁহাদিগের সহিত ভ্রাতৃত্ব-সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতেন। শেষে এই প্রথা অতি সাধারণ হইয়া পড়ে। যে সকল রাজপুতরাজবংশ যবন-সম্রাট্‌গণকর্ত্তৃক অপহৃতসর্ব্বস্ব ও হৃতরাজত্ব হইয়াছিল, এই রাখীবন্ধ দ্বারা সেই সকল রাজবংশ পূর্ব্ব পূর্ব্ব সমৃদ্ধির অবস্থায় প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল। যবনসম্রাট্‌গণ রাজপুতরাজগণের রাজ্য ফিরাইয়া দিয়া তাহার বিনিময়ে কেবল রাজপুতরাণীর হস্তলিখিত একখানি চিঠি ও তাঁহার নিকট হইতে ভগিনীর আদরের কামনা করিতেন। হুমায়ুনের মহত্ত্বে ও আশ্রিতবাৎসল্যে রাজপুতরমণীরা এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, উদয়পুর, বুন্দী ও কোটার রাণীগণ এবং চাঁদবাই ও রাণার কুমারী ভগিনী সকলেই রাখীবন্ধ দ্বারা তাঁহার সহিত ভ্রাতৃসম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন রাজপুতানার সম্ভ্রান্ত মহিলাগণও এইরূপে রাখীবন্ধ দ্বারা তাঁহার সহিত ধর্ম্মভ্রাতৃ-ভগিনীবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। হুমায়ুনের সহিত তাঁহাদিগের সকলেরই চিঠিপত্র লেখালিখি চলিত।

* হুমায়ুনের দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তন করিয়া তদীয় পুত্র আকবর, এবং পর পর সম্রাট্‌গণ—জাঁহাগীর, সাজাহান ও আওরঙ্গজেবও মহান্ আহ্লাদের সহিত রাজপুতরাণী ও মহিলাগণের 'রাখীবন্ধ ভাই' হইয়াছিলেন। উদয়পুরের রাণীমাতা স্বহস্তে আওরঙ্গজেবকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, আওরঙ্গজেব অতি ভক্তিভাবে সে সকল পত্র পরিলক্ষিত করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে "ধর্ম্মশীলা প্রিয় ভগিনী" বলিয়া পত্রে সম্বোধন করিতেন। এই গুণেই মোগল-সম্রাট্‌গণ রাজপুতানা অধিকার করিয়াছিলেন।

অমাত্য ও সামন্তবর্গ একবাক্যে রাজসভা হইতে উঠিয়া চলিলেন। যাইবার সময় চন্দ্রাবতবংশনেতা সামন্তপ্রধান কর্ণজী বলিয়া উঠিলেন, সামন্ত ভ্রাতৃগণ! এত দিন আমরা কেবল মুকুলের ঈষৎ গন্ধ পাইয়াছিলাম—এখন আমাদিগকে সেই প্রস্ফুটিত মুকুলের ফল খাইতে হইবে। এই কথায় প্রমরবংশীয় সামন্ত উত্তর করিলেন—"কাল আমরা সে ফলের গন্ধ আঘ্রাণ করিব।" এই কথার পর সকলে একবাক্যে এই রাজসভা হইতে প্রস্থান করিলেন।

প্রকৃত রাজা কে?

যদিও রাজপুতগণ রাজাকে দেবতাস্বরূপ মনে করেন, এবং রাজাদেশ পালন করিলে স্বর্গলাভ হইবে বলিয়া বিশ্বাস করেন, তথাপি রাজা যথেচ্ছাচারী ও লোক-মর্য্যাদা-লঙ্ঘনকারী হইলে, তাঁহাকে দণ্ড দিতে জানেন। লোকপালন ও লোকমর্য্যাদারক্ষার জন্যই রাজার প্রয়োজন যে রাজা দ্বারা তাহার বিপরীত ঘটিয়া থাকে, তিনি রাজনামের ও রাজাসংহাসনের অযোগ্য। 'রাজা প্রকৃতিরঞ্জনাৎ' —প্রজার মনোরঞ্জন যিনি করিতে পারিলেন, তিনিই প্রকৃত রাজা। কিন্তু যে রাজা যথেচ্ছাচারিতাদি দ্বারা প্রজাসাধারণের বিরাগভাজন হন, তিনি রাজপদের অযোগ্য। এই জন্যই এরূপ স্থলে রাজপুতগণ সেই সেই রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিলেন। রাজপুতনার স্বাধীনতার দিনে এরূপ ঘটনা অনেক ঘটিয়াছে। রাজশক্তির প্রকৃত পরিচালনের দণ্ড আপনাদের হস্তে ছিল বলিয়াই রাজপুতগণ পুত্রপৌত্রাদিক্রমে রাজবংশের বিরোধী ছিলেন না। পুরাতন রাজবংশে যদি যোগ্য রাজা পাওয়া যায়, তাহা হইলে নব রাজবংশ প্রতিষ্ঠাপিত করিতে কাহার সাধ্য হয়? যোগ্য রাজা না পাইলে তাঁহারা নূতন রাজবংশ প্রতিষ্ঠাপিত করিতে কিছুমাত্র ভীত বা বিচলিত হইতেন না। ইহাতে রাজা ও প্রজা—উভয়েরই শক্তি পরিচালিত হইত। রাজা প্রজাবর্গের অনুরাগভাজন—এই স্থানে উভয়ের মধ্যে একটি অচ্ছেদ্য প্রেম-বন্ধন স্থাপিত হইত। এই নির্ব্বাচনশক্তি প্রজার হস্ত হইতে চলিয়া গিয়াছে বলিয়াই আজ ব্রিটন-রাজশক্তি প্রজার এত বিরাগ-ভাজন হইয়া পড়িয়াছে; এবং এত অনিয়ন্ত্রিতভাবে যথেচ্ছাচারিণী হইয়া পড়িয়াছে।

বিক্রমজিৎ সিংহাসনচ্যুত ও তাঁহার মৃত্যু

কিন্তু রাজস্থানের এরূপ অবস্থা ছিল না বলিয়াই রাজা প্রজায় এত সদ্ভাব ছিল। রাজপুতেরা সেই জন্যই রাজাকে শাসনকর্ত্তা ও পিতা—এই দুই ভাবেই দেখিতেন; এবং রাজগণও প্রজাবর্গকে অনুশাস্য ও পুত্র—এই দুই ভাবেই দেখিতেন। ব্রিটনরাজশক্তি প্রজাবর্গকে কেবল অনুশাস্যভাবে দেখেন বলিয়াই প্রজারা তাঁহাকে শাসনকর্ত্রী মাত্র ভাবে দেখিয়া থাকে। এই জন্য উভয়ের মধ্যে প্রেমের বন্ধন নাই। কেবল শাসনের বন্ধন আছে। ইহা যেমন অপ্রীতিকর, তেমনই ক্ষণস্থায়ী।

আজ এই প্রেমের বন্ধনের অভাব হওয়ায় বিক্রমজিতে ও প্রজাবর্গে মানসিক অনৈক্য উপস্থিত হইল। এই মানসিক অনৈক্যের পরিণাম—রাষ্ট্রবিপ্লব। সামন্তবর্গ বিক্রমজিৎকে পরিত্যাগ করিয়া পৃথ্বীরাজের অনুলোমপরিণয়জ তনয় বীরবর বনবীরের নিকট গমন করিলেন। তাঁহারা অপ্রাপ্তবয়স্ক রাজাকে সিংহাসনে বসাইয়া রাজ্যের আর বিড়ম্বনা করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। বনবীর অতি সুবোধ ছিলেন—এই জন্য ইহাতে প্রথমে অস্বীকার করিলেন; এ বিপদ্‌সঙ্কুল গৌরবের পদ আরোহণ করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল না। কিন্তু সামন্তবর্গের আগ্রহাতিশয় তিনি উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। বিশেষতঃ তাঁহারা যখন দেখাইলেন, তিনি সিংহাসনে আরোহণ না করিলে রাজ্য নষ্ট হয়, তখন বনবীর অগত্যা ইহাতে স্বীকৃত হইলেন। বিক্রমজিৎ সিংহাসনচ্যুত হইলেন। লতাকে যেমন সবলে আশ্রয়তরু হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে তাহা আর বাঁচিতে পারে না, সেইরূপ রাজাকে অপমানের সহিত সিংহাসন হইতে নামাইলে, রাজার প্রাণও আর বাঁচে না। সিংহাসনচ্যুতিও হইল, বিক্রমজিতের প্রাণবায়ুও দেহ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল! একদিকে বিক্রমজিতের পরিবারমণ্ডলীর হাহাকার ধ্বনিতে গগন বিদীর্ণ হইতে লাগিল, অন্য দিকে বনবীরের মস্তকের উপর চাঙ্গী বা রাজছত্র উত্তোলনকালের জয়ধ্বনিতে সে আর্ত্তনাদের ধ্বনি অভিভূত হইয়া পড়িল! এ ধরাধামে শোক ও উল্লাস এইরূপেই পাশাপাশি হইয়া দেখা দিয়া থাকে। একদিকে পুত্রশোকাতুরা জননী—পতিশোকবিধুরা

নববিধবার আর্ত্তনাদ,—অন্যদিকে নব-কুমারের জন্মজনিত আনন্দোৎসব—এ অপূর্ব্ব বিষম দৃশ্য আমরা প্রতিনিয়ত সম্মুখে দেখিতেছি। জন্ম ও মৃত্যু, সুখ ও দুঃখ, হর্ষ ও বিষাদের এই বৈষম্যভাবাক্রান্ত চিত্র জগতে না থাকিলে জন্ম, সুখ, হর্ষাদির—মৃত্যু, দুঃখ ও বিষাদাদির সহিত তুলনা না করিতে পারিলে কে অন্তরে আনন্দ অনুভব করিত? জগদ্-বৈচিত্র্য একেবারে বিলুপ্ত হইত! অনন্তরূপীর খেলা বুঝা ভার! আজ বৃক্ষচ্যুতা বল্লরীর ন্যায় বিক্রমজিৎ পদদলিত হইলেন। আজ বনবীর বা তৎপক্ষীয়গণ কর্তৃক প্রেরিত ঘাতকের হস্তে রাণা সঙ্গের বংশধর হত হইলেন! আজ রাণা সঙ্গের অন্তঃপুরে গগনবিদারী শোকধ্বনি উত্থিত হইল। কিন্তু সে শোকের ক্রন্দন আজ কে শুনে? আজ যে মিবারবাসিগণ বনবীরের অভিষেকোৎসবে প্রমত্ত রহিয়াছেন, আজ তাঁহাদের ক্রন্দনে যোগ দিবার অবসর নাই! হায় রে! এ ধরাধামে স্বার্থেরই পূর্ণ রাজত্ব! এই স্বার্থে অন্ধ হইয়া মানুষ পিশাচ হইয়া যায়!

রাণা বনবীরসিংহ

বনবীরসিংহের মনে সিংহাসনাধিরোহণের পূর্ব্বে যে ধর্ম্মভাব ও সৌজন্য ছিল—সিংহাসনাধিরোহণের সঙ্গে সঙ্গে তাহার তিরোভাব হইল। এখন ঘোরতর রাজ্যলালসা ও দুর্দ্দমনীয় আত্মাভিমান আসিয়া তাঁহার আশ্রয় করিল। তিনি চিতোর-রাজসিংহাসনে আপনার ও আত্মবংশের স্থায়ী স্বত্ব প্রতিষ্ঠাপিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। যাঁহারা তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত লক্ষ্য করিয়া তাঁহার পূর্ণ রাজসম্মান দিতে ইতস্ততঃ করিতেন—বনবীর তাঁহাদিগেরও সমুচিত শাস্তিপ্রদান করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন।

যখন অমাত্য ও সামন্তবর্গ একবাক্যে বিক্রমজিৎকে রাজ্যচ্যুত করিয়া বনবীরকে সেই শূন্যসিংহাসনে বসাইলেন, তখন তাঁহাদিগের মনে মনে এই গূঢ় সঙ্কল্প ছিল যে, উদয়সিংহ প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে এই অধিকার প্রদান করিবেন। উদয়সিংহ তৎকালে ষড়বর্ষমাত্র বয়স্ক ছিলেন। সুতরাং তাঁহারা স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, বনবীরকে দশবৎসরমাত্র চিতোরের সিংহাসন অধিকার করিতে দিবেন। তাহার পরই তাঁহাকে নামাইয়া রাণা সঙ্গের সিংহাসনে তদীয় পুত্র উদয়সিংহকে বসাইবেন। তাঁহাদের মনের এ গূঢ়সঙ্কল্প তাঁহারা তৎকালে বনবীরকে জ্ঞাত করেন নাই। কিন্তু সুচতুর বনবীর তাহা তখনই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এই জন্য তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া নিজ সৌভাগ্যপথের প্রধান কণ্টক উৎপাটন করিতে স্থিরসঙ্কল্প হইলেন। তাই তিনি শিশু উদয়সিংহকে স্বহস্তে শমনসদনে প্রেরণ করিয়া আপনার অভ্যুদয়পথ পরিষ্কৃত রাখিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন।

ধাত্রী পান্নার অপূর্ব্ব প্রভুভক্তি

বনবীরের যে সঙ্কল্প—সেই কার্য্য। যে অভিষেক-রাত্রিতে কোন অজ্ঞাত ঘাতকের হস্তে বিক্রমজিতের গুপ্তহত্যা সাধিত হয়, সেই ভীষণ রাত্রিতেই বনবীর স্বহস্তে উদয়সিংহের প্রাণসংহার করিতে সঙ্কল্প করিলেন।

ধাত্রী পান্নার নাম চিরদিন জগতে ঘোষিত হইবে। আত্মোৎসর্গের জলন্ত দৃষ্টান্ত-স্বরূপিণী পান্না শিশু উদয়সিংহকে ও নিজ শিশুপুত্রকে লইয়া শয়নাগারে গিয়া শয়ন করিয়াছিলেন। উদয়সিংহ দুগ্ধান্ন ভোজন করিয়া গভীর নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন। ধাত্রীর শিশু-সন্তান এবং ধাত্রীও অকাতরে ঘুমাইতেছিলেন। এমন সময় অন্তঃপুরের আর্ত্তনাদে ধাত্রীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। এই সময় এক নাপিত ভৃত্য উদয়সিংহের উচ্ছিষ্টান্ন গ্রহণ করিতে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিল। ধাত্রী তাহাকে এই আর্ত্তনাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, কোন গুপ্ত হত্যাকারীর অস্ত্রে রাণা বিক্রমজিতের প্রাণনাশ হইয়াছে। ধাত্রী তখনই বুঝিলেন যে, এক হত্যার পর অপর হত্যার আর অধিক বিলম্ব নাই। যে হস্ত বিক্রমজিতের প্রাণসংহার করিয়াছে, সেই হস্তই শিশু উদয়সিংহের বিরুদ্ধে উত্তোলিত হইবে—ইহা যেন কে তাহার কানে কানে বলিয়া দিল। তখন প্রভুভক্তি জননী-স্নেহকে পরাজিত করিল। প্রত্যুৎপন্নমতি পান্না বুঝিলেন যে, নিজ শিশুপুত্রকে বলি না দিলে সঙ্গতনয় উদয়সিংহকে রক্ষা করিবার আর উপায় নাই। কারণ, তিনি বুঝিলেন, বনবীরের রক্তপিপাসা উক্ত রাজশিশুর হত্যা ব্যতীত নিবৃত্ত হইবার নহে। সুতরাং তিনি রাজশিশুর প্রাণরক্ষার জন্য আজ প্রাণপুত্তলী শিশুপুত্রকে বলি দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। প্রভু-

ভক্তিই পান্নার একমাত্র ধর্ম্ম, আর সে পবিত্র ধর্ম্মপালনের জন্য মানবরূপিণী দেবী পান্না উদয়-সিংহের শয্যায় নিজপুত্রকে শয়ান করিয়া, একটি ফলের চুবড়ীর ভিতরে উদয়সিংহকে পুরিয়া পত্রাদির দ্বারা তাঁহাকে ঢাকিয়া সেই বিশ্বস্ত নাপিত ভৃত্য দ্বারা নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

পান্না উদয়সিংহকে বাহির করিয়া দিয়া তাঁহার শৈশবদোলার উপর যেমন আপন পুত্রকে শয়ান করিয়াছেন, অমনি বনবীর তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভীষণমূর্ত্তি পুরুষ গৃহে প্রবেশ করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন—"উদয়সিংহ কোথায়?" ধাত্রীর মুখে আর কথা আসিল না—অধরোষ্ঠ উত্তর-দানে অস্বীকৃত হইল। তিনি কেবল সেই দোলার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন। অমনই বনবীরের শাণিত অস্ত্র সেই দোলা-স্থিত ধাত্রীপুত্রের হৃদয়ে নিহত হইল। আজ ধাত্রী স্বচক্ষে নিজ-পুত্রের মৃত্যু দেখিলেন। উদয়সিংহের প্রাণ বাঁচাইলেন—এই আনন্দে আজ ধাত্রীর পুত্রশোক বিলীন হইল! ধন্য পান্না! ধন্য তোমার ধর্ম্ম-জ্ঞান! ধন্য তোমার প্রভুভক্তি।

পাপিষ্ঠ বনবীর একবার তাকাইয়া দেখিতে সাহস করিলেন না যে, তিনি কাহাকে হত্যা করিলেন। পাপীর ন্যায় ভীরু ও অন্ধ জগতে কে আছে? তিনি ধাত্রীরঞ্জনকে হত্যা করিয়াই গৃহ হইতে চলিয়া গেলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল যে, বনবীর উদয়সিংহকে হত্যা করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। এই শোচনীয় সংবাদে অন্তঃপুরমধ্যে হাহাকার-ধ্বনি উঠিল। ক্রন্দন-রোলে গগন বিদীর্ণ হইতে লাগিল। ধাত্রী পান্না প্রকৃত বৃত্তান্ত অতি কষ্টে গোপন রাখিয়া সেই কান্নায় যোগ দিলেন। ধাত্রী পান্না ক্ষত্রকুলোদ্ভবা। আজ এই অদ্ভুত আত্মোৎসর্গ দ্বারা তিনি আজ আত্মবংশের পরিচয় দিলেন। পান্না অশ্রুজল দ্বারা পুত্রের চিতানল নির্ব্বাপিত করিয়া এবং অতি কষ্টে পুত্রশোক গোপন করিয়া অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলেন। যে উদয়-সিংহ হইতে রাজরাজেশ্বরী চিতোর যবনের ক্রীড়াভূমি হইয়াছিল, যে উদয়সিংহ কর্তৃক মিবাররাজ্য শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল, আজ সেই শিশু উদয়সিংহের রক্ষার্থ পান্না প্রাণপুত্তলীকে বলি দিয়া, নগরের বাহিরে যে স্থানে সেই বিশ্বস্ত নাপিত তাঁহাকে লইয়া অপেক্ষা করিতেছিল, পাগলিনীর ন্যায় তথায় ছুটিলেন।

বিশ্বস্ত নাপিত সেই রাজশিশুকে লইয়া বেরিস্ নদীর পুলিনদেশে অতি আগ্রহের সহিত পান্নার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। এই নদী চিতোর নগর হইতে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত। সৌভাগ্যক্রমে সেই রাজশিশু নগর হইতে অবতরণ করার পূর্ব্বে নিদ্রোত্থিত হয় নাই। তাঁহারা তাঁহাকে লইয়া দেবলাভিমুখে ধাবিত হইলেন, এবং ইহার অধিপতি সিংহ রাওএর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। যে বীরবর বাঘজীরাও চিতোরের রক্ষানলে প্রাণাহুতি দিয়াছিলেন, সিংহরাও তাঁহারই উত্তরাধিকারী। কিন্তু তিনি ধরা পড়ার ভয়ে এই গুরুতর দায়িত্ব গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। সুতরাং তাঁহারা ডোঙ্গারপুর নগরাভিমুখে ধাবিত হইলেন। রাউল্ আইস্করণ তৎকালে এই রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। দেবল রাজবংশের ন্যায় এই রাজবংশও চিতোর-রাজবংশের প্রবীণতর শাখা। তিনি রাণা সঙ্গের পুত্রের প্রাণরক্ষা করিতে নিতান্ত সমুৎসুক হইয়াও নিজের ও রাজশিশুর প্রাণনাশের আশঙ্কায় তাঁহাদিগকে নিজ ক্ষীণ মন্দিরে আশ্রয় দিতে সাহস করিলেন না। সুতরাং তাঁহারা ঈদর ও আরাবলী পর্ব্বতের জটিল গুহার মধ্য দিয়া, ইহার আরণ্য ভীল অধিবাসিগণের রক্ষণে ও সাহায্যে কমলমীর নগরে গিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া ধাত্রী পান্না দেপ্রাজাতীয় জৈনধর্ম্মাবলম্বী আশাস-নামক তথাকার শাসনকর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিলেন। সাক্ষাৎকার হইলে তিনি রাজ-কুমারকে তাঁহার ক্রোড়ে অর্পণ করিয়া তাঁহার ভবিষ্য রাজার প্রাণরক্ষা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তিনি প্রথমে ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় ও ভয়চকিত হইয়াছিলেন। তাহার জননী তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি পুত্রের ভীরুতা দেখিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন—"প্রভুপরায়ণতা কখন বিপদ বা কষ্টের দিকে তাকায় না। এই রাজকুমার রাণা সঙ্গের পুত্র; সুতরাং তোমার প্রভু। ইহার প্রাণরক্ষা করিলে ঈশ্বর-কৃপায় তাহার ফল গৌরব-প্রসূ হইবে।"

সাহজী জননীর আদেশ লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না। অতঃপর সঙ্গতনয় সাহজীর গৃহে তদীয় ভাগি-নেয়রূপে পরিচিত হইলেন। পাছে সাহজীর গৃহে রাজপুতরমণীর অবস্থানে লোকের মনে কোন সন্দেহ উদ্রিক্ত হয়, এই জন্য প্রভুপরায়ণা পান্না রাজকুমারকে সাহজীর গৃহে রাখিয়া তথা হইতে অন্তর্হিতা হইলেন।

সর্ব্বদাই লোকে সাহজীর ভাগিনেয়-সম্বন্ধে নানাবিধ সন্দেহ করিত ; অথচ মুখ ফুটিয়া কেহ কিছু বলিতে সাহস করিত না। কিন্তু একদিন এই রাজশিশুর সাহস দেখিয়া সকলের মনে সন্দেহ আরও বদ্ধমূল হইল। একদা সাহজীর পিতার সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হন। রাজপুতগণ এক পংক্তিতে বসিয়াছেন, এবং সাহজীর স্বজাতীয় ধনবান্ বণিকেরা অপর পংক্তিতে বসিয়াছেন। একজন দধি পরিবেশন করিতেছিলেন, এমন সময় রাজকুমার তাঁহার হস্ত হইতে দধিপাত্র কাড়িয়া লইলেন। সকলে কত নিষেধ করিল, এবং কত ভয়প্রদর্শন করিল, কিন্তু তিনি বিদ্রূপ করিয়া সে সকল উড়াইয়া দিলেন। সাত বৎসর পরে উদয়সিংহের তেজস্বিতা ও স্বাধীনতা-প্রকৃতি হইতে এই গুপ্ত কথা আপনিই প্রচারিত হইয়া পড়িল। এক সময়ে সোনিগুরা-অধিনায়ক, সাহজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করেন। সাহজী তাঁহার অভ্যর্থনার্থ উদয়সিংহকে প্রেরণ করেন। উদয়সিংহ এরূপ মর্য্যাদার সহিত সেই কর্ত্তব্যপালন করিলেন যে, উক্ত সামন্তের মনে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিল যে "এই বালক কখনই সাহজীর ভাগিনেয় নহে।" এই সংবাদ জনশ্রুতি দ্বারা সর্ব্বতঃ প্রসৃত হওয়ায় মিবারের সম্ভ্রান্ত পুরুষগণ এবং কমলমীর নগরের অদূরবর্ত্তী সামন্তগণ রাণা সঙ্গের পুত্রকে অভিবাদন করিবার জন্য তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সালুম্বার সোহিদা-সামন্তগণ, চন্দ্রবংশের প্রতিনিধি, চন্দ্রাবতবংশের সামন্তগণ, বাগোরের সঙ্গ, কোটারিও এবং বৈদলার চোহানগণ, সোনিগুরার সামন্তপ্রবর প্রমর সাঙ্কোরের সামন্ত পৃথ্বীরাজ, এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান সামন্তগণ এই বিষয়ের সত্য-মিথ্যা-নির্ণয়ার্থ কমলমীর নগরে গমন করিলেন। প্রভুপরায়ণা ধাত্রী পান্না ও সেই বিশ্বস্ত ক্ষৌরকারের সাক্ষ্যে তাঁহাদিগের মনের সমস্ত সন্দেহ বিদূরিত হইল।

একটি মন্ত্রিসভা গঠিত হইল, এবং সাহজী সেই সভার অধিনায়ক মিবারের সম্ভ্রান্ততম সামন্ত কোটারিয়ো চোহানের ক্রোড়ে চিতোরের রাজকুমারকে অর্পণ করিয়া নিজের গুরুতর দায়িত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। এই সামন্তপ্রবর প্রথম হইতেই এই ষড়্‌যন্ত্রের বিষয় অবগত ছিলেন, সুতরাং তিনি এই রাজকুমার রক্ষার সম্বন্ধে লোকের মনে যে শেষ সন্দেহ ছিল, তাহার অপনোদন-মানসে রাজকুমারের সহিত বসিয়া একপাত্রে ভোজন করিলেন। এ দিকে সোনিগুরা সামন্ত প্রমর তাঁহার কন্যার সহিত রাজকুমারের বিবাহ দিতে স্বীকার করিলেন। যদিও হামিরের সহিত বিধবা কন্যার বিবাহ দেওয়ায় তিনি সোনিগুরা-বংশের সহিত বিবাহ রাজাদেশ দ্বারা নিষিদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন, তথাপি মন্ত্রিসভা প্রমরের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। মন্ত্রিসভা উদ্যোগে কুম্ভনগরের দুর্গে উদয়সিংহের টীকাভিষেক সম্পন্ন হইল। তথায় মিবারের প্রায় সমস্ত সামন্ত তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিলেন।

এই সংবাদ অবিলম্বে বনবীরের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। বনবীর রাজ্যে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতে নিজ দুর্ব্বিনীত ব্যবহারে সকলকেই বিরক্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি প্রকৃত উত্তরাধিকারীর সমস্ত মর্য্যাদা ও আচার-ব্যবহার ধারণ করিয়াছিলেন। অধিক কি, যে সকল সম্ভ্রান্ত সামন্ত তিনি নীচ-জন্মা বলিয়া তাঁহার হস্তে দুনা আহার গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইতেন, তিনি তাঁহাদিগকে দণ্ডিত করিতেও ভীত হইতেন না। পংক্তিভোজনের সময় রাজা ভোজ্যবস্তু হইতে অগ্রভাগ তুলিয়া সহস্তে যাহাকে পরিবেশন করিতেন, তিনি আপনাকে গৌরবান্বিত বলিয়া মনে করিতেন। কোন নিমন্ত্রণের সময় মিবারের সামন্তগণ রাজার সহিত একত্র বসিয়া ভোজন করিবার অধিকার পাইতেন। সেই পংক্তিভোজনে সামন্তগণ আপন আপন পদমর্য্যাদা-অনুসারে পর পর বসিতেন। রাণা যাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্মান করিবেন মনে করিতেন, তাঁহাকেই ঐ দুনা প্রদান করিতেন। এই সহভোজনের সময় সামন্তগণ রাজার সহিত স্বাধীনভাবে কথোপকথন করিতে পাইতেন। তথাপি তাঁহারা আপনার পিতার ন্যায় রাজার প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করা উচিত, তাহার ত্রুটি করিতেন না। এই প্রকার সামাজিক মিশ্রনে রাজা ও সামন্তবর্গের মধ্যে একটি সখ্যভাব সংস্থাপিত হইল। রাজা যাঁহাকে দুনা প্রদান করিতেন, তাঁহার তাহা গ্রহণ করিতেই হইত। নিজ পাচক দ্বারা রাজভোগের কিয়দংশ রাজা যাঁহাকে পাঠাইতেন, তাঁহাকেও

লোকে ধন্য বলিয়া মনে করিত। ইহার দ্বারা এই সঙ্কেত করা হইত যে, তিনি রাজসমীপে আসিয়া কথোপকথন করিতে পারেন।

বিক্রমজিতের রাজত্বকালে কোন নিমন্ত্রণে বিক্রমজিৎ কিসেনগড়ের রাঠোরবংশীয় সামন্তকে এই দূনা অর্পণ করিলে বিজলীসামন্ত তথা হইতে চলিয়া গেলেন। কারণ, বিজলীসামন্ত মিবারের ষোলজন উচ্চশ্রেণীর সামন্তের অন্যতম। তিনি ইহাতে বিশেষ অপমান বোধ করিলেন। সুতরাং তিনি এই অপমান সহিতে না পারিয়া রাজার সম্মুখ হইতে সরিয়া গেলেন। যাইবার সময় তিনি রাজাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া গেলেন—"মহারাজ! আমি এখানে থাকিতে কচ্ছবহ বা রাঠোর সামন্তেরও এ সম্মান পাইবার অধিকার নাই। কিসেনগড়ের ঠাকুর ত আমার অনেক নিম্নে। সুতরাং আমার এই অবমাননা আমি এখানে বসিয়া দেখিতে পারিব না। সুতরাং আমি এখান হইতে চলিলাম।"

যে দূনা পাইবার জন্য সামন্তগণের সকলেই লালায়িত, আজ দাসী শীতলসেনীর পুত্র বলিয়া বনবীরপ্রদত্ত দূনা সামন্তগণ ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিলেন। এক নিমন্ত্রণে রাণা বনবীর চন্দাবত সামন্তকে দূনা অর্পণ করেন। তিনি তাহা ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়া সগর্ব্বে বলিয়া উঠেন—"যে দূনা বাপ্পাবাউলের সন্ততির হস্তে অতি পবিত্র ও সম্মানের বিষয়, তাহা দাসী শীতলসেনীর পুত্রের হস্ত দ্বারা প্রদত্ত হইলে অপমানের সামগ্রী হইয়া উঠে।" এই বলিয়া তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। ক্রমে সামন্তগণ সকলেই চন্দাবত সামন্তের অনুবর্ত্তন করিলেন। অতঃপর সকলে একবাক্য হইয়া কমলমীরে মিবারের প্রকৃত রাজা রাজকুমার উদয়সিংহের নিকট গমন করিলেন।

সেই গুহাপথের মধ্য দিয়া পঞ্চশত অশ্ব ও দশ সহস্র বৃষের পৃষ্ঠে করিয়া কচ্ছদেশ হইতে বনবীরের কন্যার যৌতুকের জন্য বিবিধ পণ্যদ্রব্য লইয়া এক সহস্র গাড়ওয়াল রাজপুত গমন করিতেছিল। সামন্তগণ তাহাদিগের নিকট হইতে সেই সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী কাড়িয়া লইলেন। বনবীরের আভ্যন্তরীণ দৌর্ব্বল্যের ইহা অপেক্ষা প্রমাণ আর কি হইতে পারে? রাণা উদয়সিংহের অনতিকালমধ্যেই ঝালোরের রাওএর কন্যার সহিত শুভ পরিণয়ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। এই সকল লুণ্ঠিত দ্রব্যসামগ্রী সেই রাজকীয় পরিণয় কার্য্যে ব্যয়িত হইল

উক্ত বিবাহক্রিয়া ঝালোর-রাজ্যের অভ্যন্তরস্থ বাহ্লীনগরে মহাসমারোহে নির্ব্বাহিত হইল। রাজস্থানের প্রায় সমস্ত রাজন্যবর্গ এই উপলক্ষে উদয়সিংহকে উপঢৌকন প্রদান করিলেন বা পাঠাইয়া দিলেন। সামন্তগণের মধ্যে কেবল মাহোলীর সোলাঙ্কীবংশীয় সামন্ত ও টানার মালোজী এই উৎসবে যোগ দিলেন না। সুতরাং সমবেত সামন্তবর্গ তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। সেই যুদ্ধে মালজী হত হওয়ায়, সোলাঙ্কী আত্মসমর্পণ করিলেন। সুতরাং সর্ব্ব-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া বনবীর কেবল রাজধানীতে আবদ্ধ রহিলেন। তাঁহার মন্ত্রিগণ তাঁহার সাহায্যে সৈন্য আনয়ন করার ব্যপদেশে নগরীমধ্যে উদয়সিংহের প্রতি উৎসর্গীকৃত প্রাণ এক সহস্র সুদৃঢ় সৈন্য প্রবেশিত করাইলেন। তাহারা নগরীমধ্যে প্রবেশ করিয়াই নগরীর দ্বাররক্ষকগণকে হঠধৃত ও নিহত করিল। অমনি 'রাণা উদয়সিংহের জয়!' ধ্বনিতে নব রাজত্ব উদ্‌ঘোষিত হইল। বনবীরকে ধনসম্পত্তি ও পরিবারবর্গ লইয়া মিবার রাজ্য হইতে প্রস্থান করিবার সুবিধা হইল। বনবীর মিবার হইতে পলাইয়া দাক্ষিণাত্যে গিয়া আশ্রয় লইলেন। এরূপ প্রবাদ আছে যে, নাগপুর-রাজ্যের ভোনসলাগণ এই বনবীরের বংশ হইতে সমুৎপন্ন।

ইরূপে সর্ব্বসম্মতিক্রমে ১৫৯৭ শকে (১৫৪১-২ খৃষ্টাব্দে) রাণা উদয়সিংহ মিবারের রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। উদয়সিংহের রাজ্যাভিষেকে মিবারের সমস্ত প্রজা আনন্দে উৎফুল্ল হইল। এই সময় যে আনন্দগীতি প্রস্তুত হইয়া একতানে সর্ব্বত্র অভিগীত হইয়াছিল, উদয়পুরে আজও ঈশানী দেবীর মন্দিরে উৎসবকালে কুলবধূগণ একতানে গাইয়া থাকে। কিন্তু রাণা সঙ্গের মৃত্যুর পর হইতে মিবারের যে দুর্দ্দিন আরম্ভ হইয়াছে, উদয়সিংহের রাজসিংহাসনে আরোহণে তাহার পর্য্যবসান হইল না। রত্নের হঠকারিতা, বিক্রমজিতের উচ্ছৃঙ্খলা, বনবীরের নিষ্ঠুরতা ও রাণা উদয়সিংহের দুর্ব্বলতা—এই সমস্তই মিবারের সর্ব্বনাশের কারণ হইয়া উঠিল। অধিক কি, রাণা রত্ন ও বিক্রমজিতের পাপসকল রাণা উদয়সিংহের দুর্ব্বলতা ও কাপুরুষতার সহিত তুলনায় পুণ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। এই দুর্ব্বলতা ও কাপুরুষতা মিবারের পূর্ণধ্বংসের মূল কারণ হইয়া উঠিল। মিবারের ক্ষত্রিয়গণের মনে এতদিন যে জাতীয়তা ও অজেয়তার ভাব দৃঢ় অঙ্কিত ছিল, এতদিনে তাহা স্খলিত হইতে লাগিল।

নাবালক বা স্ত্রীলোক যে রাজ্যের শাসনদণ্ড পরিচালন করেন, সে রাজ্যের আর দুর্গতির সীমা থাকে না। কিন্তু যে রাজ্যে নাবালক ও স্ত্রীলোক—এক সময়ে রাজত্ব করেন, সে রাজ্যের দুরবস্থা বর্ণনাতীত। এই সময়ে মিবারের অদৃষ্টে তাহাই ঘটিয়াছিল। মিবারের দুঃখের ভরা তাই পূর্ণ হইয়াছিল। উদয়সিংহের রাজোচিত কোন গুণই ছিল না। বিশেষতঃ যে বীরত্ব ও অদম্য সাহস ক্ষত্রিয়জাতির অমূল্য ও অদ্বিতীয় পিতৃপৈতামহিক সম্পত্তি—রাণা উদয়সিংহ তাহাতে একেবারে বঞ্চিত ছিলেন। তথাপি তিনি হুমায়ুনের রাজত্বকালে বা পাঠান সংঘর্ষ সময়ে অনায়াসে সুখে ও স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাইতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার ও রাজস্থানের এবং হিন্দুজাতির দুরদৃষ্ট বশতঃ সেই সময় ভারতে এক নব যবনশক্তি আবির্ভূত হয়।

যে বৎসরে কমলমীরের মেঘমণ্ডিত প্রাসাদে রাণা উদয়সিংহের উদ্ধারবিষয়িণী গীতিমালা অভিগীত হইয়াছিল, সেই বৎসরই আকবরের জন্মের সংবাদ অমরকোটের প্রাচীর ভেদ করিয়া মরুভূমির বায়ুমুখে সমস্ত ভারতে প্রচারিত হয়। হুমায়ুন পলাইয়া—অনন্ত মরুভূমি পার হইয়া—পূর্ণগর্ভা মহিষীকে লইয়া এই নগরে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। তথায় তদীয় মহিষী এই পুত্ররত্ন প্রসব করেন। এই পুত্রই কালে ভারতের রাজচক্রবর্ত্তিগণের অগ্রণী হন। অমরকোট নগর ভারতীয় মরুভূমির অন্যতম ওয়েসিস বা মরুদ্বীপ। প্রমরবংশের একটি শাখা সোকৃদীবংশ। সেকন্দর সাহের দিগ্‌বিজয়কাল হইতে বা তাহার পূর্ব্ব হইতে এই বংশ এই প্রদেশে রাজত্ব করিয়া আসিতেছেন। সেই সোকৃদীবংশীয় ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে আকবর সর্ব্বপ্রথমে আলোকের মুখ অবলোকন করিলেন। তদীয় পিতা তথায় পলাতকভাবে অবস্থিত, তাঁহার মস্তক হইতে রাজমুকুট স্খলিত এবং বাবর কর্ত্তৃক সে মুকুটলাভ অপেক্ষা তাহার পুনঃপ্রাপ্তি অভাবনীয়।

যে দশ বৎসর হুমায়ুন দিল্লীর রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন, তাঁহাদিগের ভ্রাতৃগণের নিরন্তর ষড়যন্ত্রে ও তাঁহাদিগের সহিত অবিরাম সংঘর্ষে এতদিন শান্তিসুখ ভোগ করিতে পারেন নাই। এই অন্তর্দৌর্ব্বল্যের অবস্থায় সেরসাহ তাঁহাকে পরাজিত ও সিংহাসনচ্যুত করিয়া দিল্লীতে মোগল-রাজ্যের ধ্বংস ও পাঠানরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিলেন।

কান্যকুব্জ রণক্ষেত্রে মোগল ও পাঠানের অদৃষ্ট পরীক্ষা হয়। এই যুদ্ধে জয়লক্ষ্মী পাঠানদিগেরই অঙ্কশায়িনী হন। বিজয়ী সেরসাহ পরাজিত হুমায়ুনকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে তাড়াইয়া প্রথমে আগ্রায় ও তৎপর লাহোরে লইয়া যান। তথা হইতে তাড়িত হইয়া হুমায়ুন নিজ পরিবার ও অল্পসংখ্যক অনুযাত্রিকবর্গ লইয়া সিন্ধুদেশে গমন করেন। পথিমধ্যে তিনি কখন বা কোন হিন্দু নরপতির আশ্রয় প্রাপ্ত হন, এবং কখন বা অন্য কোন হিন্দু নরপতি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। সিন্ধুনদীর উভয় তীরের প্রতি দুর্গই তিনি বলে গ্রহণ করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু প্রতিপদেই তিনি অকৃতকার্য্য হন। এই সময়ে তাঁহার অর্থাভাবজনিত কষ্টের ইয়ত্তা ছিল না। তাঁহার অনুযাত্রিবর্গ অন্নাভাবে ও পথের কষ্টে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। সুতরাং তিনি তাহাদিগকে বিদায় দিয়া স্বজাতিদ্রোহী হিন্দুদিগের দয়ার উপরই নির্ভর করিলেন। কিন্তু কোথায়ও তাঁহার প্রার্থনা শ্রুত হইল না। তিনি জশলমীর ও যোধপুরের রাজার নিকট সাহায্য চাহিলেন, কিন্তু তথায় সাহায্য পাইলেন না। ভট্টী ও রাঠোরেও এইরূপে প্রত্যাখ্যাত হইলেন। অধিক কি, মল্লদেব তাঁহাকে ধৃত করিতেও চেষ্টা করিয়াছিলেন। হিন্দুরাজদিগের এই অনাতিথেয় ব্যবহারে হুমায়ুন মর্ম্মাহত হইয়া পলাইয়া মরুভূমির আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তথায় অনেক দুঃখ কষ্ট সহিয়া অমরকোটের আতিথেয় সোডাবংশীয় নরপতির আশ্রয় প্রাপ্ত হন।

হুমায়ুনের পলায়ন

এই পলায়মান যবন-নরপতির সৎসাহস ও দয়াদাক্ষিণ্যাদি রাজোচিতগুণে সকলেই মুগ্ধ হইত! এই জন্যই তাঁহার কষ্ট-যন্ত্রণা বিশ্বজনীন সহানুভূতি উদ্দীপিত করিয়াছিল। হুমায়ুন নিজে জ্যোতিঃশাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তথাপি তিনি নিজের অদৃষ্ট গণনা করিয়া দেখিতে বিস্মৃত হইলেন। তিনি যদি গণনা দ্বারা জানিতে পারিতেন যে, তাঁহার এই উপস্থিত বিপদ ভবিষ্য-গৌরবের সূচনা মাত্র, তাহা হইলে তিনি কখনই অমরকোটের আশ্রয়দায়িনী সৈকত-গিরিমালা পরিত্যাগ করিয়া সপরিবারে পারস্য দেশে পলায়ন করিতেন না।

দিল্লীর সিংহাসনে পুনরধিরোহণ

হুমায়ুন যেমন নিজে পিতার অধীনে শৈশব ও বাল্যে বিপদ্বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, পুত্র শিশু আকবরকেও সেইরূপ বিপদ-বিদ্যালয়ে অধ্যাপিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার পৈতৃক রাজ্য অক্‌সিয়ানা, কান্দাহার ও কাশ্মীর এবং পারস্যরাজ্যের মধ্যে তাঁহার অতি সুদীর্ঘ দ্বাদশবৎসর অদৃষ্টের বিবিধ বিবর্ত্তে অতিবাহিত হইল। এই কালের মধ্যে দিল্লীর সিংহাসনে সেরসাহ হইতে সেকেন্দরসাহ পর্য্যন্ত ছয় জন নরপতি অধিষ্ঠিত হন। শেষ পাঠান-সম্রাট্‌ সেকেন্দরসাহ হুমায়ুনের ন্যায় ভ্রাতৃগণের সহিত অন্তর্বিচ্ছেদে জড়িত হইলেন। হুমায়ুন তৎকালে কাশ্মীরের অদূরে অবস্থিত ছিলেন। তিনি এই আভ্যন্তরীণ বিবাদের সংবাদ পাইয়া মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া নির্ব্বাচিত সৈন্য লইয়া সিন্ধুনদ উত্তরণপূর্ব্বক সাহিন্দনগরের উপর আসিয়া পড়িলেন। সেকেন্দরসাহ এই সংবাদ পাইবামাত্র মহতী সেনা লইয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অজাতশ্মশ্রু যুবরাজ আকবরের দুর্দ্দমনীয়তা নিবন্ধন উভয় সৈন্যে অচিরাৎ ঘোরতর সংঘর্ষ বাধিয়া উঠিল। এত অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া বিশাল পাঠান-সেনার সহিত সম্মুখ-সমরে অবতীর্ণ হওয়া হুমায়ুনের ন্যায় রণপণ্ডিত প্রবীণ সেনাপতিগণের মতে উন্মত্ততামাত্র। কিন্তু হুমায়ুন তাহা মনে করিলেন না। তিনি নিজ যুবা বীরপুত্রকে অকুতোভয়ে সৈন্যাপত্যে বরণ করিলেন। আকবরের অসাধারণ বীরত্বে তদীয় সেনা এরূপ উদ্দীপিত হইল যে, তাহারা পাঠান-সেনার সংখ্যাধিক্য তুচ্ছ করিয়া, প্রচণ্ডবেগে আক্রমণ করিল। বিজয়লক্ষ্মী বীরেরই অঙ্কশায়িনী হইয়া থাকেন। এই যুদ্ধে তিনি আকবরের অতিমানুষ বীরত্বে প্রীত হইয়া তাঁহাকেই বরমাল্য প্রদান করিলেন। পিতামহ বাবর যে দ্বাদশ বৎসরে ফার্গাণার সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন, সেই দ্বাদশবৎসর বয়সেই আকবর পিতার লুপ্ত-সিংহাসন পুনরুদ্ধার করিলেন। এই বিজয়ই আকবরের ধবল যশের পূর্ব্বসূচনা। যোগ্য পিতার যোগ্য পুত্র এবং যোগ্য পুত্রের যোগ্য পিতা—হুমায়ুন্‌ সেই বিজয়িনী সেনা লইয়া মহোল্লাসে ও মহোৎসবে দিল্লীতে পুনঃপ্রবেশ করিলেন।

হুমায়ুনের মৃত্যু

কিন্তু বিধাতা তাঁহাকে অধিক দিন এ সৌভাগ্যভোগ করিতে দেন নাই। তাঁহার জ্ঞান পিপাসা অতি প্রবল ছিল। তাঁহার বংশের অন্যান্য নরপতির ন্যায় তাঁহারও জ্ঞানপিপাসা অতি প্রবল ছিল। রাজকার্য্য সমাপন করিয়া তিনি যে অবসর পাইতেন, তাহা তিনি পাঠনায় অতিবাহিত করিতেন। একদিন তিনি নিজ পুস্তকালয়ে বসিয়া পাঠনায় নিমগ্ন ছিলেন, হঠাৎ কোন কারণে খোলা ছাদের উপর ধাবিত হওয়ায় তাঁহার পদস্খলন হইল। অমনি তিনি ভূপতিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

আকবরের দিল্লীর সিংহাসনাধিরোহণ

আকবরের পিতৃসিংহাসনে অধিরূঢ় হওয়ার অব্যবহিত পরেই দিল্লী ও আগ্রা তাঁহার হস্ত হইতে স্খলিত হয়। শেষে পঞ্জাবের এক কোণমাত্র তাঁহার রাজ্যে পর্য্যবসিত হয়। ঐতিহাসিকেরা আকবরকে ফরাসীরাজ চতুর্থ হেন্‌রীর এবং তদীয় মন্ত্রী বাইরাম খাঁকে উক্ত ফরাসীরাজের মন্ত্রী সলীর সহিত তুলিত করিয়াছেন। ইহারা সমসাময়িক। বাইরাম খাঁর দুর্নিবার বীরত্বে আকবরের লুপ্ত রাজ্য অচিরাৎ পুনরুদ্ধৃত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। কাল্পী, চান্দেড়ী, কলিঞ্জার সমস্ত বুন্দেলখণ্ড ও মালব অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত হইল। আকবর অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে সাম্রাজ্যের সমস্ত ভার নিজহস্তে গ্রহণ করিলেন।

রাজপুতগণের বিরুদ্ধে প্রথম অভিযান

স্বরাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াই তিনি রাজপুতদিগের বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন; মল্লদেব তাঁহার প্রতি অনাতিথেয় ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়া, তিনি সর্ব্বপ্রথমে তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য রাঠোরবংশীয়গণের বিরুদ্ধে ধাবিত হইলেন; এবং মাড়ওয়ারের দ্বিতীয় নগরী—মায়ের্ত্তা সবলে গ্রহণ করিলেন। অম্বররাজ বরমল্ল (Bharmul) দিল্লীশ্বরের অভিযানবার্ত্তা পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছিলেন, এই জন্য তাঁহার অভ্যর্থনার্থ প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

তিনি স্বয়ং ও তদীয় পুত্র ভগবান্‌দাস আকবরের অধীনতা স্বীকার করিয়া তাঁহার সামন্তশ্রেণীভুক্ত হইলেন। অম্বরেশ যবনসম্রাটের সহিত তাঁহার এক কন্যার বিবাহ দিয়া স্বরাজ্যকে তদীয় সাম্রাজ্যের অধীন রাজ্য করিয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন। আক্‌বর উস্‌বেক সামন্তগণের বিদ্রোহ ও অন্যান্য আভ্যন্তরীণ গোলযোগ নিবারণ-মানসে এ যাত্রা ইহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া দিল্লী প্রত্যাগত হইলেন। কিন্তু আভ্যন্তরীণ বিবাদ মিটাইয়া ও অন্তর্ব্বিদ্রোহ নিবারিত করিয়া অল্প দিনের মধ্যেই চিতোরাভিমুখে ধাবিত হইলেন।

চিতোরে রাণা উদয়সিংহ

যে দেশে আইনের রাজত্ব বিদ্যমান ও যে দেশে রাজাই একমাত্র শাসনকর্ত্তা, সেই দেশই ধন্য। সে দেশের সৌভাগ্যলক্ষ্মী ঘটিকাযন্ত্রের পেনড্যুলমের ন্যায় রাজার ব্যক্তিগত ইচ্ছা দ্বারা সর্ব্বদা দোলায়মান নহে। এক নরপতির মহতী গুণপরম্পরা তাঁহাকে সৌভাগ্য-শিখরে তুলিয়া, আবার তাঁহার উত্তরাধিকারীর পাপে তাঁহাকে দুরবস্থাগহ্বরে প্রক্ষিপ্ত করিতে পারে না। আক্‌বর ও উদয়সিংহ এই স্বতঃসিদ্ধ সত্যের প্রতি-পোষকতা করিতেছেন।

দারিদ্র্যে কি ফললাভ করা যাইতে পারে, রাণা উদয়সিংহের তাহা বুঝিবার উপযুক্ত বয়স হইয়াছিল। আর যদিও চিতোরের বীরচূড়ামণিগণ পূর্ব্বেই চিতোর-রক্ষানলে আত্মাহুতি দিয়াছিলেন, তথাপি উদয়সিংহকে এই বিষম সঙ্কটে—সদুপদেশ দিতে ও সৎপথে চালিত করিতে সমর্থ—মিবারে এরূপ লোকের অসদ্ভাব ছিল না, কিন্তু দুর্ব্বল-মতি উদয়সিংহ কুসংসর্গে পড়িয়া সেই মহান্‌ ব্যক্তিগণের উপদেশ গ্রহণ করিলেন না। মিবারে দুর্ভাগ্যবশতঃ উদয়সিংহ কোন দুঃসাহসিনী কৌশলময়ী রমণীর হস্তে ক্রীড়নক-স্বরূপ হইয়া উঠিলেন। এই রমণীই অতঃপর উদয়সিংহের ও মিবারের নেত্রী হইয়া দাঁড়াইলেন।

উদয়সিংহ ও আক্‌বর তুলিত

যে বয়সে উদয়সিংহ মিবারের সিংহাসনে অধি-রোহণ করিয়াছিলেন, তাহার অধিক বয়সেও আক্‌বর দিল্লীর সিংহাসনে আরূঢ় হন নাই। আক্‌বরের আশাতারাও উজ্জ্বলতর ছিল না। কিন্তু যে সুনক্ষত্রে তিনি সৈন্ধব মরুভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই সুনক্ষত্রই আজ এই মহাপ্রাণ বাইরাম খাঁকে ও ধার্ম্মিকপ্রবর আবুল ফজলকে তাঁহার মন্ত্রিরূপে প্রেরণ করিয়াছিল। উদয়সিংহ ও আক্‌বর—দুই-জনের সিংহাসনাধিরোহণের কালের সাম্য ব্যতীত—তাঁহাদের মধ্যে আর কোনও সাম্য ছিল না। ভাগ্যলক্ষ্মীর পরিবর্ত্তন-শীলতার বহুদর্শননিমিত্ত আকবরের মনে মানব-প্রকৃতির সূক্ষ্মতত্ত্ব চির-অঙ্কিত হইয়াছিল। এ দিকে উদয়সিংহের জন্মবৃত্তান্ত গুপ্ত থাকায় এবং তাঁহার শৈশবকাল কমলমীরের গুহাপ্রদেশে পরগৃহে অতিবাহিত হওয়ায় তাঁহার শিক্ষা অতি সঙ্কীর্ণ হইয়াছিল এবং তাঁহার ভাগ্যে মানবচরিত্রপর্য্যবেক্ষণের সুবিধাও অল্প ঘটিয়াছিল।

আক্‌বরই মোগলসাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা এবং রাজপুতস্বাধীনতার কৃতকার্য্যসংহর্ত্তা। মানব-চরিত্র-নির্ব্বাচনে বিচক্ষণতা ও অসাধারণ কার্য্যতৎ-পরতা নিবন্ধন, তিনি সহজেই অদম্য রাজপুতগণের পদে সুবর্ণশৃঙ্খল পরাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কুহকী আক্‌বর ক্রমে ক্রমে তাঁহাদিগকে এই শৃঙ্খলের ভার-বহনে সমর্থ ও সহিষ্ণু করিলেন; প্রত্যেক জাতির জাতীয় ভাব রক্ষা করিয়া এবং তাহাদিগের জঘন্য ভোগ-লালসা পরিতৃপ্তিকরণের সাধনীভূত হইয়া প্রত্যেক জাতিকেই নিজের বশে আনিতে লাগি-লেন। আর যাঁহারা কিছুতেই বশ্যতা স্বীকার করিলেন না, তাহার শাণিত করবাল সেই বীর-দলকে ক্রমে নির্ম্মূল করিতে লাগিল।

আক্‌বরের অমিতপরাক্রমে ক্রমে ক্ষত্রিয়বীর্য্য-বহ্নি নির্ব্বাপিত হইল। ক্ষত্রিয়তেজ নির্ব্বাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের স্বাধীনতাসূর্য্য অস্তমিত হইল। সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে আক্‌বরের অপ্রতিদ্বন্দ্বিনী প্রভুভক্তি প্রতিষ্ঠাপিত হইলে, তিনি প্রচণ্ড রুদ্রমূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় কমনীয় মূর্ত্তি অব-লম্বন করিলেন। রাজোচিতগুণে তিনি ভারতীয় ভূত ও ভবিষ্যৎ কোন নরপতিরই ন্যূন ছিলেন

না। যদিও তিনি দুর্দ্দমনীয় রাজ্য-পিপাসায় উন্মত্ত হইয়া সাহাবুদ্দীন, আলাউদ্দীন প্রভৃতি ভারতের ধ্বংসকারী বিজেতৃগণের ন্যায় একলিঙ্গের মন্দির ভাঙ্গিয়া সেই স্থানে ও সেই উপাদানে কোরাণপ্রচারবেদী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, তথাপি বিজয় সমাপ্ত হইলে তিনি বিশ্বজনীন সদ্ব্যবহার ও অবিচলিত অপক্ষপাতিতায় হিন্দু-দিগের হৃদয়ক্ষত আরোগ্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কোটি কোটি ভারতবাসী হিন্দু তাঁহাকে একবাক্যে "জগদ্‌গুরু" এই মহা গৌরবের উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। অধিক কি, তাঁহারা—"দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা"—এই বাক্যে তাঁহাকে ঈশ্বরের সঙ্গে তুলিত করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। অদ্যাবধি কোন যবন নরপতিই হিন্দুগণ কর্তৃক এরূপ ঐকতানিক যশোগীতি দ্বারা অভিগীত হন নাই।

এ দিকে মিবাররাজ রাণা উদয়সিংহে রাজোচিত গুণের পূর্ণ অসদ্ভাব মিবারের দুঃখভরা পূর্ণ করিল। শিশোদীয়বংশের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা মাতা ভবানী প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, যতদিন বাপ্পারা-উলের কোন বংশধর তাঁহায় সেবায় রত থাকিবেন, ততদিন তিনি চিতোরের মহাগৌরবের অধিষ্ঠাত্রী-প্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া কখনই যাইবেন না। আল্লা কর্তৃক চিতোরের প্রথম আক্রমণকালে দ্বাদশজন মুকুটী মিবারের লোহিত পতাকা করে লইয়া চিতোর-রক্ষার্থ যুদ্ধ করিতে করিতে সমরশায়িত হন। দ্বিতীয়বার যখন মালবাধিপতি বাহাদুরবাহাদুর চিতোর আক্রমণ করেন, তখনও মিবার রাজবংশের শাখাসম্ভূত দেবলসামন্ত চিতোররক্ষানলে আত্মাহুতি দিয়া স্বদেশের জন্য উৎসৃষ্টপ্রাণ এই গৌরবের উপাধিপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছেন।

চিতোরের অধিষ্ঠাত্রীদেবীর অন্তর্ধান

কিন্তু এই তৃতীয় ও বিশালতম সংঘর্ষের সময় কোন মুকুটধারী চিতোর-দেবীর চরণে বলি পড়িয়া তাঁহাকে প্রসন্না করিতে সমুদ্যত হইলেন না। যে দেবী ভবানীর কটাক্ষপাতে শত্রুসেনা চিতোরের প্রাকারমালার পাদদেশ আসিয়াই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইত, আজ সেই দেবী রজনী-তিমিরাবগুণ্ঠিতা হইয়া চিতোরনগরী হইতে সহসা অন্তর্হিতা হইলেন। যাঁহার অধিষ্ঠানে এতদিন চিতোরবাসিগণ আপনাদিগকে অজেয় বলিয়া মনে করিতেন, আজ সেই মোহিনীশক্তি অন্তর্হিতা হইলেন। যে দেবীমূর্ত্তি সেই গভীরা রজনীতে সমরশ্রীর শয়ন-মন্দিরে আবির্ভূতা হইয়া বলিয়াছিলেন, "তোমার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু গৌরব-রবি অস্তমিত হইবে," সেই দেবী আজ নিজবাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করিবার মানসেই যেন কাপুরুষ উদয়সিংহকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। চিতোরের যে প্রাকারমালা এতদিন গৌরবমণ্ডলের ন্যায় ইহাকে প্রদক্ষিণ করিয়াছিল এবং যে প্রাকারাবলী এতদিনকাল স্ফীতবক্ষে রাজপুতগণের স্বাধীনতা ও ধর্ম্মকে শত্রুর করাল গ্রাস হইতে রক্ষা করিয়া আসিতেছিল, আজ দেবীর তিরোধানে তাহা যেন অরক্ষিতা ও চ্যুতগৌরবা হইয়া পড়িল।

দেবীর অন্তর্ধানে চিতোরের অরক্ষণীয় অবস্থা

জাতীয় বিশ্বাস যে, জাতীয় মহতী অবদানপরম্পরার মূল, অতীতসাক্ষী ইতিহাস তাহা সপ্রমাণ করিতেছে। বিশেষতঃ ইহা যে মিবারের জাতীয় গৌরব ও জাতীয় স্বাধীনতার প্রধান উদ্দীপক, ইতিহাস মুক্তকণ্ঠে তাহা ঘোষণা করিতেছে। এই বিশ্বাস—যথেচ্ছাচারিণী পশুশক্তির প্রধান প্রতি-রোধক বলিয়া দার্শনিক ও মানবপ্রেমিকগণ ইহার সবিশেষ সমর্থন করিয়া থাকেন। এই অন্ধবিশ্বাস জাতীয় গাথার আচ্ছাদনে আবৃত থাকিয়া জাতীয় কার্য্যের উদ্দীপনা করিয়া থাকে। এই জাতীয় বিশ্বাসের উপলময়ী প্রাচীরাবলী চূর্ণীকৃত কর, দেখিবে যে, জাতীয় জীবনও তাহার সহিত চূর্ণীকৃত হইবে। এই বিশ্বাসের বলে এতদিন চিতোরবাসি-গণ চিতোরনগরীকে অজেয় বলিয়া মনে করিতেন, দেবীর অন্তর্ধানের সহিত সে বিশ্বাসও আজ অপনীত হইল। আজ তাহারা সেই চিতোরনগরীকে অরক্ষণীয়া বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন। যে চিতোরনগরী সহস্র বৎসর ধরিয়া বিখ্যাতনামা নৃপতিবৃন্দের বীরত্ববিলসনভূমি ছিল এবং যে নগরী সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া ভারতীয় নগরীমালার শীর্ষস্থানীয় ছিল, আজ কি না সেই চিতোরনগরী আরণ্য জন্তুগণের আবাসভূমি হইয়া উঠিল! ইহার

যে দেবমন্দির সকলে ভগবান একলিঙ্গের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল, আজ তথায় সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুকাদি হিংস্র জন্তুগণ আশ্রয় পাইল! যে চিতোর এক দিন সর্ব্বসৌভাগ্যের আধারভূমি ছিল, আজ তাহা অলক্ষ্মীর আলয় বলিয়া বিবেচিত হইল! অধিক কি, বিজয়ের পর যে চিতোর-প্রবেশকালে এক দিন মিবারের রাণাগণ আনন্দে ও উৎসবে মাতিয়া উঠিতেন, আজ তাহাতে তাঁহাদের প্রবেশ একেবারে নিষিদ্ধ হইয়া উঠিল! এ বিবর্ত্তনশীল জগতেও এরূপ পরিবর্ত্তন অতি বিরল ও অতি শোচনীয়।

আক্‌বর কর্ত্তৃক চিতোর আক্রমণ

যবন ঐতিহাসিক ফেরিস্তা আকবর কর্ত্তৃক চিতোরের একবারমাত্র আক্রমণের বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু রাজস্থানের ঐতিহাসিকেরা তৎকর্ত্তৃক চিতোরের দুইবার আক্রমণের কথা লিখিয়া গিয়াছেন। রাণার অপ্রশস্ত পরিণীতা রাণীর অতিমানুস বীরত্বেই চিতোর প্রথমবার আকবরের করাল আক্রমণ হইতে রক্ষা পায়। উক্ত রাণী এক দল আক্রমণকারী সৈন্যের শীর্ষস্থানীয়া হইয়া নগর হইতে বহির্গত হইয়া আক্‌বরের শিবির পর্য্যন্ত আক্রমণ করেন। আক্‌বর প্রতিহত হইয়া দিল্লীতে প্রত্যাগত হন। দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ রাণা ঘোষণা করেন যে, তাঁহার রাণীর বীরত্বেই এ যাত্রা চিতোর শত্রু-হস্ত হইতে রক্ষা পাইল। এই ঘোষণায় মিবারের সামন্তবর্গ আপনাদিগকে নিতান্ত অবমানিত মনে করিলেন এবং এই অবমাননার মূলীভূত কারণ উন্মূলিত করিবার মানসে সকলে ষড়্‌যন্ত্র করিয়া সেই বীরা রাণীর প্রাণবধ করিলেন। এই ঘটনায় তাঁহাদিগের সহিত রাণার ঘোরতর মনোবাদ বাধিয়া উঠিল। সুচতুর আক্‌বর এই অন্তর্বিচ্ছেদের সংবাদ পাইয়া দ্বিতীয়বার চিতোর আক্রমণ ও অবরোধ করিলেন। আক্‌বর জীবনের পঞ্চবিংশ সোপানে পদার্পণ করিয়াই 'চিতোর-বিজয়ী'—এই গৌরবের উপাধিলাভের দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষায় প্রণোদিত হইয়া দ্বিতীয়বার চিতোরের তোরণদ্বারের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত! লোকে আজও তাঁহার শিবিরসন্নিবেশের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। তাঁহার সৈন্যাবাসপাণ্ডলী গ্রাম হইতে আরম্ভ করিয়া বুসী পর্য্যন্ত দশ মাইল ব্যাপিয়া অবস্থিত ছিল। যে স্থানে আক্‌বরের নিজের শিবির সন্নিবেশিত হইয়াছিল, সে স্থানে এখনও একটি মার্ব্বেল-প্রস্তরের কীর্ত্তিস্তম্ভ নিখাত আছে। ইহাকে লোকে আজও আক্‌বরকা দেওয়া বা আক্‌বরের দ্বীপ বলিয়া থাকে।

উদয়সিংহের চিতোর পরিত্যাগ

আক্‌বর চিতোরের তোরণদ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র কাপুরুষ রাণা উদয়সিংহ চিতোর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। সামন্তগণের সঙ্গে বিবাদ হওয়ার পর হইতেই তিনি চিতোর পরিত্যাগ করিবেন বলিয়া মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। আজ আক্‌বরের আগমন তাই তিনি অনুকূল গলহস্ত বলিয়া মনে করিলেন। আজ আবশ্যকতা তাঁহার ইচ্ছার সহিত মিলিত হওয়ায় তিনি পিতৃপৈতামহিক রাজধানী মহাগৌরবান্বিতা চিতোরনগরীকে শত্রুকবলে নিক্ষেপ করিয়া অনায়াসে চলিয়া গেলেন। ধিক উদয়সিংহ! শত ধিক্ তোমার জীবনে! রে ক্ষত্রিয়াপসদ! তোর পাপেই আজ সোনার ভারতভূমি শত্রু পদদলিতা!

সামন্তগণ কর্ত্তৃক চিতোর রক্ষা

কাপুরুষ ক্ষত্রকুলকলঙ্ক উদয়সিংহ চিতোর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলে, চিতোরের বীরবৃন্দও চিতোররক্ষার্থ সুসজ্জিত হইলেন। বীরচূড়ামণি সাহিদাস চন্দবংশীয় বীরদল লইয়া সূর্য্যতোরণমুখে দণ্ডায়মান হইলেন। থার্ম্মোপিলি গিরিগুহামুখে বীরবর লিওনিডাস্ ও তদীয় উৎসর্গীকৃত-প্রাণ তিনশত স্পার্টানবীরের ন্যায় সেই তোরণমুখে সহিদাস ও তদীয় বীরদল প্রচণ্ড শত্রু-সেনাতরঙ্গিণীর গতিরোধ করিতে গিয়া সমরশায়িত হইলেন! তাঁহাদিগের রুধির-বিধৌত শিলাপটে সহিদাসের সমাধিমন্দির আজিও দণ্ডায়মান থাকিয়া তাঁহাদিগের অনন্ত কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। এ দিকে মাদারিয়াধিপতি রাউৎ দুদা সঙ্গ-বংশীয় বীরদল লইয়া রণে অগ্রসর হইলেন। আর দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজের বংশে উৎপন্ন বৈদল ও কোটারীয় সামন্তদ্বয়, বিজোলী সামন্ত

প্রমর ও সত্রী সামন্ত ঝাল প্রভৃতি মিবারের সামন্তগণ নিজ নিজ বীরত্বে স্ব স্ব সৈন্যগণকে অনুপ্রাণিত করিলেন। এতদ্ভিন্ন দেবলের অন্যতম পুত্র সোনিগুরাবংশোদ্ভব ঝালোরাধিপতি রাও, রাঠোরাধিপতি ঈশ্বরী দাস, কচ্ছবাহ সামন্ত করমচাঁদ, সেকাবত সামন্ত দুদাসদনী, এবং গোয়ালায়ারাধিপতি—বহিশ্চর এই কয়জন বীর আসিয়া তাঁহাদিগের বলবৃদ্ধি করিলেন।

কিন্তু এই শত শত বীরতারা মিবারগগনের যে অন্ধকার বিদূরিত করিতে পারিলেন না, বেদ্‌নোরের জয়মল্ল ও কৈলবের পুত্ত—মিবারের রবিচন্দ্র—যুগপৎ উদিত হইয়া সে অন্ধকার বিদূরিত করিলেন। ইঁহারা মিবারের ষোলজন প্রথম শ্রেণীর সামন্তের মধ্যবর্ত্তী। মিবারের ইতিহাসে এই দুই বীরচূড়ামণির অতিমানুষ-বীরত্বের অপূর্ব্ব কাহিনী জ্বলদক্ষরে লিখিত আছে। অধিক কি, চিতোর-বিজয়ী আকবর স্বলেখনী দ্বারা ইঁহাদিগের যশোগান করিয়া ইঁহাদিগকে অমর করিয়া গিয়াছেন। জয়মল্ল মৈত্রিয়ার রাঠোরবংশ হইতে সমুৎপন্ন—এবং মিবারের সামন্তগণের মধ্যে সাহসিকতম। পুত্ত চন্দবংশের প্রধান শাখা যুগাবৎবংশের শীর্ষস্থানীয়। 'জয়মল্ল ও পুত্ত' -এই দুই নাম আজও মিবারের প্রতিগৃহে প্রাতঃস্মরণীয়। যতদিন রাজপুতগণের স্মৃতিপটে অতীত গৌরবের রেখামাত্রও অঙ্কিত থাকিবে, ততদিন তাঁহারা কখনই এই দুই পবিত্র নাম বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। যদি চিতোরাধিরাজ উদয়সিংহ আজ রণস্থলে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাদিগকে বীরত্বের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত করিতেন, তাহা হইলে মিবারের ইতিহাস ও ভারতের অদৃষ্ট যে কিরূপ উজ্জ্বল রূপ ধারণ করিত, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু তাঁহারা এই উদ্দীপনা প্রাপ্ত না হইয়াও এই রণস্থলে যেরূপ অমানুষ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহার তুলনা ইতিহাসে অতি বিরল। অধিক কি, ইঁহাদিগের বীরত্বে অনুপ্রাণিত হইয়া চিতোরের নারীগণ সমরসাজে সজ্জিত হইয়া অসিহস্তে প্রচণ্ডবেগে সমরপ্রাঙ্গণে আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন।

বীরবর পুত্ত সৈন্যাপত্যে বৃত এবং মাতা ও পত্নীসহ রণে হত

সালুম্ব্রাধিপতি সূর্য্য-তোরণ-মূলে পতিত হইলে পর কৈলব-সামন্ত পুত্তের উপর মিবারের সৈন্যাপত্য অর্পিত হইল। পুত্ত তখন ষোড়শবর্ষীয় যুবকমাত্র। তাঁহার পিতা পূর্ব্ব-আক্রমণের সময় সমরশায়িত হন। তদবধি তদীয় জননী তাঁহার লালন-পালন করিয়া আসিতেছিলেন। একমাত্র বংশধর হইলেও স্পার্টান রমণীর ন্যায় পুত্তজননী কর্ম্মদেবী প্রাণপুত্তলীকে স্বহস্তে সমরসাজে সাজাইয়া চিতোরের জন্য প্রাণোৎসর্গ করিবার জন্য সমরপ্রাঙ্গণে পাঠাইয়াছিলেন এবং স্বয়ং সমরসাজে সাজিয়া তাঁহার অনুবর্ত্ত করিয়া চরিত্র-মাহাত্ম্যে স্পার্টান-রমণীকেও অতিক্রম করিলেন। পাছে তাঁহাদের শোকে পুত্রবধূ অধীরা হইয়া পড়েন, এই জন্য তিনি সেই জগল্ললামভূতা বালার হস্তে শাণিতফলক বর্শা দিয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া চিতোরশিখর হইতে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইলেন। বীরা সতী অতিমানুষ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া পতির ও শ্বশ্রূমাতার পার্শ্বেই সমরশায়িতা হইলেন। কর্ম্মদেবীও পুত্র ও পুত্রবধূর ন্যায় বীরত্ব প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করিলেন না। রাজপুত বীরবৃন্দ রাজপুতবীরনারীগণের তাদৃশ বীরত্ব দেখিয়া রণোন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। মাতাপুত্র প্রচণ্ড অসিপ্রহারে অগণ্য যবন সংহার করিয়া চিতোর-রক্ষানলে আত্মাহুতি প্রদান করিলেন। ধন্যা কর্ম্মদেবী! ধন্যা পুত্তবধূ! ধন্য বীরচূড়ামণি পুত্ত!

জয়মল্ল সৈন্যাপত্যে বৃত ও রণে নিহত

পুত্তের পতনে জয়মল্লের উপর সৈন্যাপত্য প্রদত্ত হইল। এতদিন তাঁহারা প্রাণপণে চিতোরের রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণের চিন্তাও তাঁহাদের মনে উদিত হয় নাই। এমন সময় হঠাৎ একটি জলন্ত গোলা আসিয়া জয়মল্লকে আহত করিল। গোলার আঘাত সাংঘাতিক মনে করিয়া আর চিতোর-রক্ষার কোনও আশা নাই দেখিয়া তিনি বীরের ন্যায় মরিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তদাদেশে অষ্ট সহস্র রাজপুতবীর সমরাঙ্গনে প্রাণবিসর্জ্জন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহারা শেষে সংভোজনে তাম্বুল ভক্ষণ করিয়া লোহিত-পরিচ্ছদে আবৃত হইয়া মিবারের তোরণদ্বার উদ্ঘাটিত করিলেন। তাঁহাদিগের প্রচণ্ড অসিপ্রহারে যবনকুল নির্ম্মূল হইতে লাগিল। কিন্তু অবিরাম যুদ্ধে অবশেষে তাঁহারা ক্লান্ত হইয়া পড়িলে অগণ্য

যবন পড়িয়া সেই বীরদলকে সমূলে নিহত করিল। সেই পীতাম্বরা চির-রাজ-রাজেশ্বরী মিবার নগরীকে শত্রুহস্তে অর্পণ করিবার কলঙ্কভোগ করিবার জন্য সেই বীরবৃন্দের কেহই জীবিত রহিলেন না। মানব-জাতির 'অভিভাবক' এই গৌরবান্বিত উপাধিধারী আকবর সেই পবিত্র নগরীতে প্রবেশ করিয়া ত্রিশ সহস্র নিরীহ অধিবাসীকে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। তাঁহার দুর্দমনীয় রাজ্যপিপাসা অগণ্য মানবরুধিরে অতঃপর নিবারিত হইল।

চিতোরের ধ্বংস

এই বিষম সময়ে বড় বড় গৃহের অধিনায়কগণ ও মিবার রাজবংশের শাখাপ্রশাখা সম্ভূত সপ্তদশ শত সন্তান নিহত হন। এতদ্ভিন্ন নয়জন রাণী, পাঁচ জন রাজকন্যা, দুইটি রাজশিশু এবং প্রধান প্রধান সামন্তগণের পরিবারবর্গ সমরাঙ্গনে বা জোহরানলে আত্মাহুতি প্রদান করেন। কেবল তুয়ারবংশীয় গোয়ালিয়রাধিপতি এ যাত্রা রক্ষা পাইলেন। আজ আদিত্যের দিনে মিবারের স্বাধীনতা-সূর্য্য চিতোর-শিখরে শেষ কিরণ বিকিরণ করিয়া অস্তমিত হইলেন। হায়! আর সে সূর্য্যের উদয় হইল না। শত শত মুকুটীর বলভিত্তি চিতোরনগরী আজ ভূমি-সাৎ হইল। ইহার অগণ্য দেবমন্দির ও প্রাসাদাবলী ভগ্নস্তূপে পরিণত হইল। অধিক কি, ইহার অবনতি ও নিজ বিজয় পূর্ণ করিবার মানসে আকবর ইহার রাজচিহ্ন সকল হরণ করিয়া লইলেন। যে নাগরা চিতোরের রাণাগণের নগরপ্রবেশ ও নগরী-বহির্গমনের কালে প্রতিহত হইয়া এই বার্ত্তা কত মাইল দূর ব্যাপিয়া উদ্ঘোষিত করিত, সে নাগরাবাদ্য চিতোরে আজ হইতে রহিত হইল। আজ পর্য্যন্তও তাহা বাজিল না, আর বাজিবে কি না, কে বলিতে পারে? যে মাতা ভবানী তাঁহার করাল অসি বাপ্পারাউলের কটিদেশে বিলম্বিত করিয়া দিয়াছিলেন এবং যে অসি লইয়া বাপ্পরাউল চিতোর অধিকার করিয়াছিলেন, আজ আকবর সেই দেবীর মন্দিরকে ইহার বহুমূল্য ঝাড় লণ্ঠন হইতে বিচ্যুত করিলেন। আর ইহার দুঃখের ভরা পূর্ণ করিবার জন্যই যেন আকবর ইহার তোরণদ্বারগুলি লইয়া স্বপ্রতিষ্ঠাপিত নগরী আকবরাবাদের শোভা সংবর্দ্ধন করিলেন। চ্যুতাভরণা, মলিনবসনা, আলুলায়িতকেশা, স্খলিতনয়না, ধরণীপ্রোথিতনয়না, নবীনা নব বিধাতাকে দেখিলে পাষাণও যখন গলিত হয়, আজ চ্যুতগৌরব, হৃতসর্ব্বস্বা, চূর্ণীকৃতভবনা রাজরাজেশ্বরী চিতোরনগরীকে দেখিয়া ভাবুকের হৃদয় যে গলিত হইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি?

আকবর স্বহস্তে বীরবর জয়মল্লকে বধ করার গৌরব দাবী করিলেন। যবন ঐতিহাসিক আবুল্ ফজল্ ঘটনার সত্যতা নিজ ইতিহাস-গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আর যে বন্দুক লইয়া আকবর জয়মল্লের প্রাণ বধ করিয়াছিলেন, আকবর জয়মল্ল সিংগ্রামের নামে যে তাহার নাম সিংগ্রাম রাখিয়াছিলেন,—জাহাঙ্গীরনামাতেও তাহার উল্লেখ আছে। কিন্তু আকবর যে চিতোরবিজয়ী হইয়া কেবল নিজের গৌরব ঘোষণা করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন, এরূপ নহে। তিনি দিল্লীতে নিজ তোরণ-দ্বারের সম্মুখে জয়মল্ল ও পুত্তের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া নিজগুণগ্রাহিতা ও মহাপ্রাণতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

যখন কার্থেজনীয় সেনাপতি বীরবর হ্যানিব্যাল্ সুপ্রসিদ্ধ কান্নী-সমরে জয়লাভ করিয়াছিলেন, তখন সেই মহারণে নিহত রোমীয় সৈনিকগণের অঙ্গুলি হইতে সংগৃহীত অঙ্গুরীয়কের পরিমাণ অনুসারে আপনার বিজয়ের পরিমাপ করিয়াছিলেন। আজ আকবর সেইরূপ এই মহাসংঘর্ষে হত রাজপুতবীর-বৃন্দের কণ্ঠদেশ হইতে উন্মোচিত হারের হীরক পান্না প্রভৃতির গুরুত্ব অনুসারে আপনার বিজয়ের গুরুত্ব নির্ণীত করিয়াছিলেন। এই মূল্যবান্ হীরা জহরাদির ওজন ৭৪৷৷০ মণ হইয়াছিল। অতঃপর রাজস্থানের বণিকেরা পত্রাদির খামের উপর এই ৭৪৷৷০ সংখ্যা লিখিতে আরম্ভ করিলেন। এই সঙ্কেতের অর্থ এই যে, যিনি তৎসংখ্যাঙ্কিত পত্র খুলিবেন, চিতোরধ্বংসের পাপ তাঁহাকে অর্শিবে।

রাণা উদয়সিংহ উদয়পুরে

পাঠক ! এস, আমরা প্রকৃতের অনুসরণ করি। দেখি, এস, সেই কাপুরুষ রাণা উদয়সিংহ এখন কোথায় ? ঐ দেখ, তিনি চিতোর হইতে পলাইয়া রাজপিপ্পীর অরণ্যে গোহিলগণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তথা হইতে তিনি আরাবলীর গিরি-গুহা বহিয়া, চিতোর বিজয়ের পূর্ব্বে বাপ্পারাউল যে গুহাস্থান আশ্রয় করিয়াছিলেন, সেই স্থানে আসিয়া অধিকার করিলেন। এই দুর্ঘটনার কিছুকাল পূর্ব্বে এই গিরিগুহার মুখে রাণা 'উদয়সাগর' নামে এক প্রকাণ্ড হ্রদ খনন করাইয়াছিলেন। এই হ্রদ অদ্যাপি উদয়সাগর নামে অংখ্যাত হইয়া থাকে। সেই হ্রদের অদূরে চতুর্দ্দিকে গিরিবেষ্টিত স্থানে উদয়সিংহ 'নচৌকি' নামে নিজ প্রাসাদ নির্ম্মাপিত করিলেন। অচিরকালমধ্যে ইহার চতুর্দ্দিকে অসংখ্য অসংখ্য অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়া গেল। তখন রাণা উদয়সিংহ এই নব-নির্ম্মিত নগরী নিজ নামে নামকরণ করিলেন। এই উদয়পুর অতঃপর মিবারের রাজধানী হইল। চারিবৎসরমাত্র উদয়সিংহ চিতোরচ্যুতি-জনিত শোক ভোগ করিয়াছেন। অবশেষে তিনি বিয়াল্লিশ বৎসর বয়সে গোগুণ্ডা-নগরে মানব-লীলা সংবরণ করিলেন। এই বয়সেই তিনি ইচ্ছা করিলে দেশের অনেক মঙ্গলসাধন ও গৌরববর্দ্ধন করিয়া যাইতে পারিতেন।

রাণা উদয়সিংহ পঞ্চবিংশ ঔরসপুত্র রাখিয়া যান। ইহাদিগের অধিকাংশই শিশু ছিলেন বলিয়া তাঁহা-দিগকে 'বাবা' বলিয়া ডাকিত। তাঁহাদিগের বংশ-পরম্পরাক্রমে 'বাবা' নামে আখ্যাত হইল। এই 'বাবা' বংশ তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া ক্রমে রাণাবৎ, পুরাবৎ ও রণাবৎ—এই তিন নাম ধারণ করিল।

উদয়সিংহ জ্যেষ্ঠপুত্র প্রতাপ জীবিত থাকিতেই প্রিয়তম ও অন্যতম পুত্র যুগমল্লকে আপনার অধি-কারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া যান। ফাল্গুনের পূর্ণিমা তিথির রজনীতে যখন প্রতাপসিংহ ও মিবা-রের সামন্তবর্গ উদয়সিংহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সময়ে যুগমল্ল মহোৎসবে উদয়সিংহের রাজপ্রাসাদে তদীয় সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। যখন রাজপ্রাসাদ আনন্দবাদ্যধ্বনিতে ও 'মহারাজ দীর্ঘজীবী হউন' এই জয়ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, সেই সময়েই—উদয়সিংহের চিতার পার্শ্বে প্রতাপকে রাজ্য অভিষিক্ত করিবার জন্য সামন্তগণের ষড়্‌যন্ত্র চলিতে লাগিল। উদয়সিংহ সোনিগুরা-রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই পরিণয়ের ফল রাণা প্রতাপ। তাই ঝালোর-রাও ভাগিনেয়ের জ্যেষ্ঠাধিকার সমর্থন করিবার জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইলেন। তিনি চন্দাবতবংশের অধি-নায়ক সামন্তপ্রবর কৃষ্ণকে বলিলেন—'আপনারা এরূপ অবিচারের সমর্থন করিলেন কিরূপে ?' তদুত্তরে তিনি বলিলেন, 'যদি কোন রুগ্ন প্রাচীন ব্যক্তি মৃত্যুশয্যায় দুগ্ধ পান করিতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহার অনুরোধ কি কখন লঙ্ঘন করা যায় ? যাহা হউক, প্রতাপই আমার মনোনীত রাণা এবং তাঁহার পক্ষসমর্থন করিতে আমি বিন্দুমাত্রও ক্রটি করিব না।' এই বলিয়া তাঁহারা রাজপ্রাসাদাভি-মুখে ধাবিত হইলেন।

প্রতাপের অভিষেক

তাঁহারা তথায় পৌছিয়া দেখিলেন যে, প্রতাপ নগর হইতে যাইবার জন্য দ্রব্যসামগ্রী গুছাইতেছেন, আর যুগমল্ল রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছেন। রাউৎ কৃষ্ণ গোয়ালিয়রাধিপতি ও প্রতাপকে সঙ্গে লইয়া রাজদরবারে গমন করিলেন। কৃষ্ণ ও গোয়া-লিয়রাধিপতি দুই জনে অভ্যর্থনাচ্ছলে যুগমল্লের দুই হাত ধরিয়া তাঁহাকে সিংহাসন হইতে নামাইয়া সম্মুখের আসনে বসাইলেন এবং বলিলেন, 'মহারাজ ! জ্যেষ্ঠ উপস্থিত থাকিতে রাজসিংহাসনে বসা আপনার সঙ্গত নয়। ঐ স্থানে বসিবার আপনার জ্যেষ্ঠেরই অধি-কার।' এই বলিয়া সকলে প্রতাপকে রাজসিংহাসনে বসাইলেন, এবং তাঁহাকে সকলেই একবাক্যে মিবা-রের রাণা বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

চতুর্দ্দিক মাঙ্গল্যবাদ্যের নির্ঘোষে ও জয়ধ্বনিতে উদ্‌ঘোষিত হইল। আজ প্রতাপ নির্ব্বাসিত না হইয়া রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন ! আজ যোগ্যে যোগ্যস্থান পাইল বলিয়া মিবারবাসিগণের আনন্দের আর সীমা রহিল না।

প্রতাপের অভিষেকের পর সামন্তবর্গ তাঁহাকে লইয়া সেই দিনই মৃগয়ায় বহির্গত হইলেন। সেই

মৃগয়া-উপলক্ষে প্রতাপ যে কৃত্রিম রণ-কৌশল ও বীরত্ব দেখাইলেন, তাহাতে তাঁহার ভবিষ্য কার্য্যক্ষেত্র সংসূচিত হইল।

—

রাণা প্রতাপসিংহ

ঐ যে সম্মুখে করতলে কপোলবিন্যাস করিয়া কুশাসনে বসিয়া দেবমূর্ত্তি যোগীর ন্যায় ধ্যানমগ্ন রহিয়াছেন, উনি কে? উনি কি যোগী—তাই আধ্যাত্মিক ধ্যানে নিমগ্ন আছেন? না, তাহা হইতে পারে না। কারণ, উহাঁর মুখমণ্ডলে বিষাদ-রেখাবলী অঙ্কিত রহিয়াছে! কোন অতীত দুর্ঘটনার বিষাদময়ী ছবি যেন উহাঁর আনন্দদর্পণে প্রতিবিম্বিত রহিয়াছে। উহাঁর সর্ব্বশরীরে যেন স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতিপ্রেমের ভাব মাখান রহিয়াছে। অতীত জাতীয় মাহাত্ম্যের স্মৃতির সহিত বর্ত্তমান জাতীয় অধঃপতনের জ্ঞান উহাঁর বদনমণ্ডলে যেন বিসদৃশভাবে মিশ্রিত রহিয়াছে। উহার অন্তরে এই দুই ভাবের সামঞ্জস্য হইতেছে না বলিয়াই যেন তথায় বিজাতীয় যাতনার তরঙ্গ উঠিয়াছে। সেই তরঙ্গতাড়নে তিনি যেন অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন। ও চিন্তা নয়—বিভিন্ন অসামঞ্জসীভূত ভাবদ্বয়ের ঘাতপ্রতিঘাত-জনিত অভিভূতি! আহা! তুমি কে? যেন শূন্য হইতে কে বলিয়া উঠিল—'উনি রাজর্ষি ক্ষত্রিয়কুলতিলক রাণা প্রতাপ।'

প্রতাপ মিবারের রাজসিংহাসনে নবাধিরূঢ় হইয়াছেন। মিবারের সেই অপূর্ব্ব রাজধানী চিতোরনগরী মোগলগণ কর্ত্তৃক ভগ্নাবশেষে পরিণত হইয়াছে। মিবারের ধনাগার শূন্য। রাজপুতগণ কুটুম্ব ও সামন্ত সকলেই পুনঃ পুনঃ পরাজয়ে ভগ্নাংশ—এবং অধিকাংশ সেই কুহকী যবন-সম্রাট আকবরের নিকট আত্মবিক্রীত। কিন্তু কোন বাধা বিপত্তিতেও প্রতাপের মন বিচলিত হইবার নহে। পিতা রাণা উদয়সিংহের পরাজয়ের প্রতিশোধ-গ্রহণ ও চিতোরের উদ্ধার-সাধন—এই দুই ব্রত-পালনে প্রতাপ জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। কিরূপে সেই ব্রত পালন করিবেন—তাহারই জন্য তিনি ভগবতী মহাশক্তির মানসপূজা করিতেছেন।

ঐ দেখ, প্রতাপ ভগবতী মহাশক্তি কর্ত্তৃক অনুপ্রাণিত ও অভীষ্টসাধনের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়া প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধে সমরসজ্জা করিতেছেন। দৈববলে বলীয়ান্ হইয়া প্রতাপ মোগলের অনন্ত শক্তিকে উপহাস করিতেছেন। পূর্ব্বপুরুষগণের অতিমানুষ বীরত্বের অগণ্য কাহিনী তাঁহাকে এই কার্য্যে উদ্দীপিত করিতেছে। চিতোর একাধিকবার শত্রুগণের কারাগারে পরিণত হইয়াছিল। আবার সেই কারাগারে যে পরিণত হইবে না, কে বলিল? প্রতাপের বিশ্বাস যে, অবশ্যই হইবে। প্রতাপ জানিতেন, ভাগ্যলক্ষ্মী চঞ্চলা—চিরদিন যে তিনি দিল্লীর সিংহাসনের প্রতি প্রসন্না থাকিবেন, এরূপ হইতে পারে না। তাঁহার বিশ্বাস যে, ভাগ্যবিবর্ত্তন যদি তদীয় চেষ্টার সহায়তা করে; তাহা হইলে তিনি অচিরাৎ দিল্লীর অস্থির সিংহাসনকে অপার জলধিজলে নিমগ্ন করিতে পারিবেন। প্রতাপের অন্তরে এই বিশ্বাস এতদূর বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, তিনি মন্ত্রগুপ্তিরূপ রাজধর্ম্ম ভুলিয়া মুক্তকণ্ঠে সকলের নিকট নিজের লক্ষ্য ও সাধন ব্যক্ত করিতে লাগিলেন।

ধূর্ত্ত যবনসম্রাটের কর্ণে এ সমস্ত সংবাদ প্রবেশ করিল। তিনি কৌশলে সমস্ত রাজপুতগণকে নিজ অধীনতায় আনিতে লাগিলেন। মাড়ওয়ার, অম্বর, বিকানীয়ার, অধিক কি, চিরবন্ধু বুন্দীর অধিপতি পর্য্যন্ত একে একে সকলেই আকবরের সহিত যোগ দিতে লাগিলেন। বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়—প্রতাপের নিজ সহোদর সাগরজী পর্য্যন্ত আকবরের পতাকামূলে গিয়া স্বজাতিবিদ্রোহিতার ধ্বজা উত্তোলন করিলেন, এবং সেই জাতীয় বিশ্বাসহননের পুরস্কার-স্বরূপ চিতোরনগরী ও তৎসংলগ্ন রাজোপাধি ও রাজ্যসম্পত্তি প্রাপ্ত হইলেন।

কিন্তু প্রতাপের হৃদয় কিছুতেই টলিবার নহে। বিপদের আধিক্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রতাপের হৃদয়ের দৃঢ়তা ও অবিচলিততা বাড়িতে লাগিল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যত দিন দেহে প্রাণ থাকিবে—তত দিন মিবারের লুপ্তগৌরব উদ্ধার করিতে তিনি চেষ্টার ত্রুটি করিবেন না। 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীরপতন'—তাঁহার সঙ্কল্প হইয়া উঠিল। প্রতাপ তাঁহার প্রতিজ্ঞা পালনও করিয়াছিলেন। তিনি একাকী শতাব্দী-চতুর্থাংশকাল সমবেত মোগলসেনাসাগরের গতিরোধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। কখন তিনি সমরক্ষেত্রে পড়িয়া শত্রুসেনার করালগ্রাস হইতে

রক্ষা করিবার জন্য রাজ্যের যাবতীয় অস্থাবর সম্পত্তি ভগবান্ বিশ্বাবসুর উদরসাৎ করিতেছেন—কখন বা গিরিশৃঙ্গ হইতে গিরিশৃঙ্গান্তরে ও গুহা হইতে গুহান্তরে পলায়ন করিয়া শত্রুগণের তীব্র অনুসরণ হইতে আপনাকে ও পরিজনবর্গকে রক্ষা করিতেছেন। সেই ভীষণ সময়ে তিনি মিবারের ভবিষ্য গৌরবরবি যুবরাজ শিশু অমরসিংহকে এবং সুকুমারবপু রাজমহিষী ও রাজনন্দন ও রাজনন্দিনীগণকে বন্য ফলমূল খাওয়াইয়া বনের পশুগণের এবং তদপেক্ষা দুর্দ্দান্ততর পার্ব্বতীয় জাতিগণের মধ্যে লালন-পালন করিতে লাগিলেন। বাপ্পারাওএর বংশধরগণ—কোন মানুষের নিকট মস্তক অবনত করিবে,—এ চিন্তা তাঁহার অসহনীয়। এই জন্য তিনি অগণ্য নরপতি-কিরীট-ভূষিত-চরণ দিল্লীশ্বর আকবরের আহ্বান বার বার প্রত্যাখ্যান করিতে লাগিলেন। আকবর তাঁহার সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইবার জন্য অনেক অনুনয় করিয়া কতবার দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রতাপ প্রতিবারই ঘৃণার সহিত সে অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন।

এই পঞ্চবিংশতি বৎসর ধরিয়া প্রতাপ যে সকল অদ্ভুত কীর্ত্তিকলাপ—যে সকল অতিমানুষ অবদানপরম্পরার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, মিবারের প্রত্যেক গুহা তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। আত্মোৎসর্গের এরূপ জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ইতিহাসে অতি বিরল। প্রতাপের দেবোচিত আত্মোৎসর্গের ও অলৌকিক শৌর্য্যবীর্য্যের কাহিনী স্বজাতি-প্রেমিক রাজপুতমাত্রেরই হৃদয়ে রুধিরাক্ষরে লিখিত আছে। বিজেতা যবনজাতির ইতিহাসও প্রতাপের সেই সকল গৌরবকাহিনীতে সুশোভিত রহিয়াছে। এই সময়ে প্রতাপ যে সকল কষ্ট যন্ত্রণা পাইয়াছিলেন—যেরূপ বীরত্ব ও আত্মত্যাগের দৃষ্টান্তে মিবারভূমি উজ্জ্বলিত করিয়াছিলেন—তাহা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলে—তাঁহাকে উপন্যাসের নায়ক বলিয়া প্রতীতি জন্মে। আজও মিবারের প্রত্যেক গৃহে প্রতাপের যশোগান গীত হইয়া থাকে। আজও প্রতাপের বংশধরগণ প্রতিদিন প্রতাপের নামকীর্ত্তন করিয়া গলদশ্রু হইয়া থাকেন।

যদিও রাজপুতানার অন্যান্য রাজ্যের অধিপতিগণের ও সামন্তবর্গের অনেকেই ধন-সম্পত্তির ও পদমর্য্যাদার আকর্ষণ পরিহার করিতে সমর্থ হন নাই, তথাপি মিবারের সামন্তবর্গ প্রতাপের আত্মোৎসর্গের মোহিনীশক্তিবলে পার্থিব সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া প্রতাপের সঙ্গে স্বদেশের জন্য ও স্বজাতির জন্য আত্মবলি দিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। জয়মল্লের পুত্রগণ, পুত্তের বংশধরগণ এবং সালুম্বা ও চন্দার অধিপতিগণের নাম ইতিহাসে প্রতাপের নামের পার্শ্বে অনন্তকালের জন্য সুবর্ণ অক্ষরে লিখিত থাকিবে। তাঁহারা স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ও রাজভক্তির অপূর্ব্ব দৃষ্টান্তে মিবারভূমি উদ্দীপিত করিবার জন্য—একে একে আত্মরুধিরে জননী ভারতভূমির বক্ষোদেশ অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন। আত্মত্যাগের এমনই শক্তি যে, কয়েকজন সামন্ত প্রতাপের দুরবস্থা দেখিয়া গলিতহৃদয় হইয়া তাঁহার জন্য যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণবিসর্জ্জন করিবার জন্যই তাঁহার পতাকামূলে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাদের মধ্যে দালওয়ারার সামন্তই প্রধান। অবিচলিত রাজভক্তি নিবন্ধন তিনি প্রতাপের দক্ষিণবাহুস্বরূপ হইলেন।

বস্ত্রালঙ্কারবিবর্জ্জিতা বিধবা রমণীর ন্যায় সর্ব্ব-সৌন্দর্য্য বিচ্যুতা যবনদলিতা চিতোরনগরীর দৃশ্য প্রতাপের নিকট অসহনীয় হইয়া উঠিল। পিতৃ-রাজধানী অমরাবতীসদৃশী সেই চিতোরনগরীকে যত দিন তিনি পূর্ব্বাবস্থায় না আনিতে পারিবেন, তত দিন প্রতাপ আপনাকে ও আপনার বংশধরগণকে সর্ব্বসুখে স্বেচ্ছাবঞ্চিত করিলেন। যত দিন না সেই চিতোরনগরীকে পূর্ব্বগৌরবে প্রতিষ্ঠাপিত করিতে পারিতেছেন, তত দিন তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার বিলাস-দ্রব্যের ব্যবহার পরিহার করিলেন। সৌবর্ণ ও রৌপ্য থাল, বাটী এবং গেলাসের পরিবর্তে বৃক্ষপত্র ও পর্ণপুট ব্যবহৃত হইতে লাগিল। কুশাসন ও কুশশয্যা স্বর্ণাসন ও দুগ্ধফেননিভ শয্যার স্থান অধিকার করিল। কেশশ্মশ্রু ও নখাদিতে তাঁহাদের দেহের জ্যোতিঃ অধিকতর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আর আদেশ হইল যে, যত দিন চিতোরের লুপ্ত গৌরবের উদ্ধার না হইবে, তত দিন অভিযান সময়ে মিবারের রণবাদ্য (নাগরা) আর পূর্ব্বের মত সম্মুখে অভিবাদিত হইবে না। এই সকল আদেশ আজও প্রতিপালিত হইয়া থাকে। অভিযানসময়ে মিবারের নাগরা আজও সৈন্যগণের পশ্চাতে বাজিয়া থাকে। আজও প্রতাপের বংশধরগণ মিবারের অবনতিদ্যোতক

কেশশ্মশ্রুনখাদি ধারণ করিয়া থাকেন। যদিও তাঁহারা আহার ও শয়ন বিষয়ে সে কঠোরতা রক্ষা করিতে পারেন নাই, তথাপি তাঁহারা সৌবর্ণ ও রৌপ্যপাত্রের সহিত বৃক্ষপত্র মিশাইয়া ভক্ষণ করিয়া এবং দুগ্ধফেননিভ শয্যার নিম্ন কুশাবলী সংন্যস্ত করিয়া প্রতাপের গৌরব ও মিবারের অধঃপতনের স্মৃতি সঞ্জীবিত রাখিয়াছেন।

প্রতাপ খেদ করিয়া সর্ব্বদা বলিতেন, 'যদি মহাপ্রতাপ রাণা সঙ্গ ও প্রতাপের অভ্যন্তরে উদয়সিংহ আবির্ভূত না হইতেন, তাহা হইলে আজ তুর্কেরা রাজস্থানের বিধিনিয়ন্তা হইত না।' বস্তুতঃ হিন্দু-সমাজ পূর্ব্বশতাব্দীর মধ্যে এত পুষ্টাবয়ব হইয়া পড়িয়াছিল, যমুনা হইতে গঙ্গা পর্য্যন্ত প্রদেশ সকল ধীরে ধীরে এরূপ উন্নত ও উপচিতবল হইয়াছিল এবং অম্বর ও মেওয়ার এরূপ শক্তিশালী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল যে, উপযুক্ত নেতৃপরিচালিত হইলে এই সমবেত হিন্দু-শক্তির নিকট যাবনী শক্তি কয়দিন টিকিতে পারিত? একাকী মেওয়ারই সম্রাট্ সেরশাহের গতি-রোধ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এ দিকে চম্বল নদীর উভয়তীরবর্ত্তী সামন্তবর্গও ক্রমে প্রবল-প্রতাপ হইয়া উঠিলেন। এই সময় মহম্মদায়গণের হস্ত হইতে ভারতের শাসনদণ্ড কাড়িয়া লইবার জন্য কেবল একজন অসাধারণ প্রতিভা-শালী রাজার প্রয়োজন হইয়াছিল। রাণা সঙ্গে সে অভাবও দূরীকৃত হইয়াছিল। স্বতঃপ্রণোদিত অধীনতা আকর্ষণ করিবার শক্তি তাঁহাতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ছিল। হিমালয় হইতে রামেশ্বর পর্য্যন্ত হিন্দু-রাজ্য বংশমর্য্যাদায় ও চরিত্র-গৌরবে তাঁহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিত, সুতরাং সকলেই একবাক্যে তাঁহার অধীনতাস্বীকারে প্রস্তুত। এই সকল রাজ্যের অধি-কাংশই প্রায় যবন-পদদলিত হইয়াছিল। সুতরাং সেই সকল রাজ্যের উদ্ধারের জন্য তদধিপতিগণের রাণা সঙ্গের পাতকামূলে আসিয়া দণ্ডায়মান হওয়ার গুরুতর প্রণোদক কারণ ছিল। এই সমবেত মহতী হিন্দুশক্তি লইয়া রাণা সঙ্গ যবনতেজকে কিছুকালের জন্য নিষ্প্রভ করিয়া রাখিয়াছিলেন। যদি প্রতাপ রাণা সঙ্গের পরই মিবারের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইতে পারিতেন, তাহা হইলে আর চিতোরের ধ্বংস দেখিতে হইত না; আকবর কর্ত্তৃক রাজপুতানার স্বাধীনতা অপহৃত হইত না! তাহা হইলে হয় ত ভারতের ইতিহাস আজ অন্য আকার ধারণ করিত। কিন্তু নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডন করিতে পারে? বিলাসজীবন ক্ষত্রিয়াপসদ উদয়-সিংহ রাণা সঙ্গের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া মিবারের গৌরবরবি চিতোরকে যবনরাহুগ্রাসে পাতিত করিলেন, এবং ঐশ্বর্য্য সম্পদ সমস্তই হারাইলেন। আর আর্য্য-স্বাধীনতার স্তম্ভীভূত রাজপুতবীরমণ্ডলী ও বীরনারীগণ সেই নরমেধযজ্ঞে বলি পড়িলেন। হায়! কি কুক্ষণেই রাণা উদয়সিংহ মিবারের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন! কি কুক্ষণেই আকবরের ন্যায় অসা-ধারণ প্রতিভাশালী নরপতি দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন।

প্রতাপ কতিপয় বিচক্ষণ ও বহুদর্শী সামন্ত লইয়া মিবারের শাসনপ্রণালীকে নূতন আকার প্রদান করিলেন। ইহাকে সর্ব্বতোভাবে সেই সঙ্কটকালের নিজ স্বল্পীভূত আয়ের উপযোগী করি-লেন। নূতন নূতন সামন্তকে নূতন নূতন জায়গীর প্রদত্ত হইল, এবং তদ্বিনিময়ে যে যে রাজকার্য্য করিতে হইবে—তাহা বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট হইল। গিরিদুর্গসকল দৃঢ়ীকৃত ও সুসংরক্ষিত হইল। প্রতাপ দেখিলেন যে, সমতলক্ষেত্রে তিনি যবনসেনার সহিত সম্মুখসংগ্রামে পরাস্ত হইবেন। এই জন্য তিনি পার্ব্বত্যপ্রদেশে রণস্রোত লইয়া যাইতে কৃতসঙ্কল্প হই-লেন। পাছে যবনসেনা আসিয়া সমতলবাসী অরক্ষিত প্রজাবৃন্দের উপর উৎপীড়ন করে, এই জন্য তিনি সমস্ত প্রজাকে অধিত্যকাপ্রদেশে গিয়া বসতি করিতে আদেশ করিলেন। পাছে তাঁহার আদেশ সম্পূর্ণ-রূপে প্রতিপালিত না হয়, এই জন্য তিনি আদেশ-লঙ্ঘনের জন্য প্রাণদণ্ড ব্যবস্থা করিলেন। এই কঠিন দণ্ডের ভয়ে সকলেই পার্ব্বত্যপ্রদেশে গিয়া বসতি করিতে আরম্ভ করিল। এই সুদীর্ঘ সংঘর্ষকালে বুনাস্ ও বেরিস্ প্রবাহিত মিবারের সমস্ত উর্ব্বর ও সমতল ক্ষেত্র একেবারে নিষ্প্রদীপ হইয়া পড়িয়াছিল। আর পশ্চিমে আরাবলী গিরিমালা ও পূর্ব্বে উপত্যকাপ্রদেশ—ইহার মধ্যবর্ত্তী স্থলে একটি বাতী জ্বালিতে দেখা যায় নাই।

প্রতাপ অতি কঠোর শাসন দ্বারা প্রজাবৃন্দকে তাঁহার এই কঠোর রাজনীতির অধীনতায় আনিয়া-ছিলেন। তিনি কতিপয়মাত্র অশ্বারোহি-সৈন্য-পরি-বেষ্টিত হইয়া অশ্বারোহণে স্বয়ং সেই সকল প্রদেশ আলোড়ন করিয়া বেড়াইতেন। যদি কেহ তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিতে সাহসী হইত, তিনি স্বহস্তে

তৎক্ষণাৎ তাহার সমুচিত শাস্তিবিধান করিতেন। তাঁহার সেই কঠোর শাসনে শস্যশালিনী ও ধনজনপূর্ণা মিবারভূমিতে সতত মরুভূমির নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। তরঙ্গায়িত শ্যামল শস্যরাজির পরিবর্ত্তে তথায় তৃণরাজি বিরাজিত হইল। সুদীর্ঘ ও সুপ্রশস্ত রাজপথ সকল কণ্টকাকীর্ণ হইয়া পড়িল। যেখানে প্রজাবৃন্দের আবাস ছিল, সেখানে হিংস্র জন্তু সকল আসিয়া বসতি করিতে লাগিল। এই অনন্ত ধ্বংসের মধ্য বুনাস নদীর তীরে আনুতলার মাঠে এক দিন এক সাহসী মেষপাল মেষদল চরাইতেছিল। দৈবগত্যা অশ্বারূঢ় ও অশ্বারূঢ় প্রতাপ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দুই একটি প্রশ্ন করিয়া সদুত্তর না পাইয়া প্রতাপ তৎক্ষণাৎ স্বহস্তে তাহার শিরশ্ছেদ করিলেন এবং ভয় প্রদর্শনার্থ সেই মৃতদেহ তথায় টাঙ্গাইয়া রাখিলেন। প্রতাপের এই স্বদেশ-হিতৈষণা-প্রণোদিত কঠোরতায় রাজস্থানের উদ্যানভূত মিবারের সমতলভূমি ভীষণ মরুভূমিতে পরিণত হইল। সুতরাং সেই অপূর্ব্ব রাজ্য-বিজেতা যবনজাতির কোন কাজেই আসিল না। বরং মিবারের মধ্য দিয়া সুরাট বন্দর হইতে দিল্লীতে এবং দিল্লী হইতে সুরাট বন্দরে যে সকল পণ্যদ্রব্যের আমদানী ও রপ্তানী চলিতেছিল, তাহা বন্ধ হইয়া গেল। কারণ, প্রতাপের লোকেরা সেই সকল দ্রব্য লুঠ করিয়া পথে কাড়িয়া লইতে লাগিল। এইরূপে ইউরোপের সহিত বহির্ব্বাণিজ্য বন্ধ হওয়ায় দিল্লীশ্বরের সমূহ ক্ষতি হইতে লাগিল।

সুতরাং আকবর স্বয়ং প্রতাপের উচ্ছেদসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া আজমীরে আসিয়া সৈন্যাবাস সন্নিবেশিত করিলেন। এই নগরের বিখ্যাত দুর্গে অল্পদিন পূর্ব্বে যবনসেনা লব্ধপ্রবেশ হইয়াছে। যে নগর এক দিন আকবরের দ্বাবিংশ সুবার অন্যতম হইবে, যে নগরে এক দিন সম্রাটের প্রতিনিধির প্রাসাদ বিরাজিত হইবে, সে নগরে এখনও মাড়ওয়ারাধিপতি মল্লদেবের রাজধানী রহিয়াছে। যে মহাবল মল্লদেব এক দিন সেরশাহের বলদর্প খর্ব্ব করিয়াছিলেন, আজ সেই মহাপ্রাণ মল্লদেব ক্ষত্রিয়াধম অম্বরাধিপতি ভগবান্‌দাসের দৃষ্টান্তানুবর্ত্তন করিয়া আকবরের পাদমূলে দণ্ডায়মান। সে অধিক দিন নয়—প্রতাপের সিংহাসনাধিরোহণের দুই বৎসর পরে মাত্র—মল্লদেব মায়ের্ত্তা ও যোধপুরের যুদ্ধক্ষেত্রে যবনসেনার বিরুদ্ধে ঘোরতর রণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিজয়লক্ষ্মী যবনাঙ্কশায়িনী হওয়ায়, নিজ রাজ্যরক্ষার জন্য নিজ পুত্র উদয়সিংহকে সম্রাটের নিকট অধীনতা স্বীকার করিবার জন্য পাঠাইয়া দেন। আকবর যখন আজমীরাভিমুখে যাত্রা করেন, সেই সময় অভিযান-পথের নাগোর নগরে তাঁহাকে গ্রহণ করেন। সে উপলক্ষে মন্দোরের রায়বংশ রাজোপাধিতে ভূষিত হয় ও যুবরাজ উদয়সিংহ 'মুতা রাজা' এই উপাধি প্রাপ্ত হন।

এই উদয়সিংহই সর্ব্বপ্রথমে তুর্ককে কন্যাদান করিয়া মাড়ওয়ার রাজবংশে কলঙ্ককালিমা অর্পণ করেন। অসামান্যরূপলাবণ্যবতী উদয়সিংহনন্দিনী যোধবাই-এর* বিনিময়ে পিতা বিশ লক্ষ টাকা বাৎসরিক আয়ের ভূমি-সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। গোদগড়, উজ্জয়িনী, দেবলপুর ও বুধনাগড়—এই চারিটি রাজ্য এই বিবাহ দ্বারা মাড়ওয়ার-রাজ্যের সহিত সংলগ্ন হইল। এইরূপে মাড়ওয়ারের আয় দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল। অম্বর ও মাড়ওয়ারের প্রবলতর দৃষ্টান্তে ক্রমে ক্রমে রাজস্থানের অংশ সামন্তবর্গ আকবরের অধীনতা স্বীকার করিল। এই রাজপুত সামন্তবর্গ এখন হইতে মোগল সাম্রাজ্যের স্তম্ভীভূত হইয়া দাঁড়াইল।

এই সমবেত শক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া প্রতাপের পক্ষে নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। বিশেষতঃ তদ্বিরুদ্ধ পক্ষীয় ক্ষত্রিয়গণ আত্মাবনতিজ্ঞানে ও প্রতাপের প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণার ভাবে এরূপ উত্তেজিত হইয়াছিল যে, প্রতাপের উচ্ছেদসাধনে তাহারা প্রাণপণ করিয়াছিল। প্রতাপের মহাপ্রাণতা - প্রতাপের স্বদেশানুরাগ ও প্রতাপের আত্মোৎসর্গের অনুকরণে অসমর্থ হইয়া—সেই ক্ষত্রিয়াপসদেরা স্বজাতির কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ—জাতীয় স্বাধীনতার একমাত্র অবলম্বনাভূত এই মহাপুরুষের ধ্বংস বিধানে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ হইল! হায়! ভারতের ভাগ্যদোষে জয়চন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া সংখ্যাতীত জাতীয় বিশ্বাসহন্তৃগণ কর্ত্তৃক ভারতের স্বাধীনতারত্ন বিজেতৃ হস্তে সমর্পিত হইতেছে। কে জানে, কোন্ পাপে আমরা বিদেশীয় চরণে

---

* জাহাঙ্গীরের জননী যোধবাইয়ের প্রকাণ্ড ও রমণীয় সমাধি-মন্দির আগ্রার নিকটবর্ত্তী সেকন্দ্রাতে আকবরের সমাধির পার্শ্বে আজও বিদ্যমান আছে।

আত্মবিক্রীত হইয়া থাকি! ভারতের সমবেত শক্তির নিকট দণ্ডায়মান হইতে পারে, পৃথিবীতে আজও এমন শক্তি আবির্ভূত হয় নাই! তথাপি কেন আমরা আজ পথের ভিখারী? কোন্ পাপে আমরা আজ বিজেতৃ চরণ-দলিত সর্ব্বমান-বিবর্জ্জিত দাসাধিদাস ঘৃণিত জাতি? এ প্রশ্নের একই মীমাংসা। আমরা কর্ম্মফলে কুক্কুরজাতির ন্যায় স্বজাতিদ্রোহী হইয়া পড়িয়াছি। এত যে অবমানিত হইতেছি, এত যে পাদুকাঘাত সহ্য করিতেছি, তথাপি আজও পরস্পরকে ভালবাসিতে শিখিলাম না—আজও প্রেমভরে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতে পারিলাম না! হা বিধি! জানি না, অদৃষ্টে আর কি লিখিয়াছ?

এরূপ মহতী বিসংবাদিনী শক্তির সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াও প্রতাপ দলিত ফণীর ন্যায় তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ভয় কাহাকে বলে, প্রতাপ তাহা জানিতেন না। বুন্দীর অধিপতি ভিন্ন রাজস্থানের আর সমস্ত ক্ষত্রিয়ই যবন-সংসৃষ্ট হইয়া পড়ায় তিনি তাঁহাদিগের সহিত সামাজিক সংস্রব পরিত্যাগ করিলেন। দিল্লী, পত্তন, মাড়ওয়ার ও ধারের—এই কয়েকটি দুঃস্থ প্রাচীনবংশকে তিনি নিজ রাজ্যের প্রথম শ্রেণীর অধিবাসীর তালিকাভুক্ত করিয়া লইলেন এবং তাঁহাদিগের সহিতই আদান-প্রদান আরম্ভ করিলেন। প্রতাপ ও তদীয় বংশধরগণের পক্ষে ইহা অক্ষয় কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে যে, তাঁহারা মোগলসাম্রাজ্যের ধ্বংস পর্য্যন্ত ও শুদ্ধ তাঁহাদিগের সঙ্গে কেন, তৎসংসৃষ্ট মাড়ওয়ার ও অম্বর রাজবংশের সহিত কোন প্রকারে বৈবাহিক বা সামাজিক সংস্রবে সংশ্লিষ্ট হন নাই। উক্ত বংশদ্বয়ের তিলক-স্বরূপ বকেটসিংহ ও জয়সিংহের স্বহস্ত-লিখিত পত্র দ্বারাই ধর্ম্ম ও আত্মত্যাগের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইতেছে। যখন তাঁহারা রাজসম্মানে ও ধনসম্পত্তিতে সমৃদ্ধশালী হইয়া মোগল সাম্রাজ্যের প্রাণভূত হইয়াছিলেন, সেই ঐশ্বর্য্য ও পদমর্য্যাদার সময়েও তাঁহাদিগকে সমাজে উঠিবার জন্য মিবাররাজবংশের নিকট দীনভাবে গললগ্নীকৃতবাসে দণ্ডায়মান হইতে হইয়াছিল। তাঁহারা প্রায়শ্চিত্ত করিয়া বিগতকল্মষ হইয়া সেই পবিত্র মিবারবংশের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে সংবদ্ধ হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। যবন-সম্রাটগণকে কন্যাপ্রদানে যে প্রথা তাঁহাদিগের মধ্যে একশতাব্দী ধরিয়া প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, সেই প্রথা একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইল; প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইল এবং মিবাররাজনন্দিনীর গর্ভজাত কুমার থাকিতে আর কাহারও রাজসিংহাসনে অধিকার থাকিবে না, এই নিয়মে আবদ্ধ হইতে হইল। তবে তাঁহারা মিবারের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে সংবদ্ধ হইবার অধিকার পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। মোগলসাম্রাজ্য তৎকালে পতনোন্মুখ হইয়াছিল, সুতরাং উক্ত রাজন্যবর্গকে এ সকল নিয়ম আর ভঙ্গ করিতে হয় নাই। সুতরাং এতদিনে দারিদ্র্যধর্ম্ম বা আত্মত্যাগ পার্থিব বিষয়লোভের উপর জয়লাভ করিল।

যাবনিক সংস্রবের উপর প্রতাপের বদ্ধমূল বিদ্বেষের একটি দৃষ্টান্ত প্রদান করিতে বাধ্য লইলাম। কারণ, এই ঘটনাই প্রতাপের যাবতীয় কষ্টের মূল বলিতে হইবে। যবনগণের সহিত ব্যবহিত বা অব্যবহিত সম্বন্ধে মিবাররাজকুল যাহাতে দূষিত না হয়, তজ্জন্য প্রতাপ যবন-সংস্রব-দুষ্ট মাড়ওয়ার প্রভৃতি রাজবংশের সহিত সর্ব্ববিধ সংস্রব পরিত্যাগ করিলেন। অম্বরের রাজসিংহাসনে যত রাজা অধিরূঢ় হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে রাজা মানসিংহ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাহা হইতেই অম্বর-রাজ্যের অভ্যুদয় আরম্ভ হয়। বাবর রাজপুতবংশের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া নিজের সিংহাসন সুদৃঢ় করার যে উদার রাজনীতি অবতারিত করেন, অম্বরবংশই তাহাকে সর্ব্ব-প্রথমে কার্য্যে পরিণত হইতে দেন। কারণ, অম্বর-রাজ ভগবান্দাসই রাজপুতদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে যবনকে কন্যাদান করেন। মোগলসম্রাট বাবরনন্দন হুমায়ুন তাঁহার জামাতা এবং মোগল-কুল-গৌরব আক্বর তাঁহার দৌহিত্র। সুতরাং রাজা মানসিংহ সম্বন্ধে আক্বরের অতি ঘনিষ্ঠ। এই জন্যই তাঁহাদের মধ্যে সহজেই অতি প্রগাঢ় সখ্যভাব সংস্থাপিত হইল। মানসিংহের লোকাতীত সাহস ও অসাধারণ রণবিষয়িণী প্রতিভা এই প্রাকৃতিক সম্বন্ধের সহিত মিলিত হইয়া যেন সোনায় সোহাগাস্বরূপ হইয়াছিল। আক্বরের সেনাপতিগণের মধ্যে মানসিংহই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। এই এক মানসিংহের নিকটই আক্বর তদীয় বিশাল সাম্রাজ্যের অর্দ্ধেকের জন্য

ঋণী। চিরহিমানীসমাচ্ছাদিত ককেশস্ হইতে সুবর্ণমণ্ডিত খার্সোনীজ্ পর্য্যন্ত এবং এক দিকে কাবুল ও আলেকজাণ্ডারের প্যারোপামিসান্ এবং অন্যদিকে ভারত-মহাসাগরের উপকূলবর্ত্তী আরাকান্ এই সমস্ত রাজ্যই একাকী মানসিংহ মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন।* আকবর মানব-হৃদয় এরূপ বুঝিতেন যে, অদ্ভুত কৌশলে তিনি বংশমর্য্যাদাভিমানী বীরদর্পী রাজপুতজাতিকে আপনার ক্রীড়নকস্বরূপ করিয়া তুলিলেন। যে বার রাজপুতজাতিকে পাশব বলে আজও কেহ আয়ত্ত করিতে পারে নাই, আকবরের মোহমন্ত্রবলে সেই রাজপুতজাতি এখন তাঁহার পদানত দাসস্বরূপ হইয়া পড়িল। বিধির কি বিড়ম্বনা! কুহকীর মন্ত্রের কি অপূর্ব্ব শক্তি!

রাজা মানসিংহ দিল্লীর সম্রাটের নিকট যতই আদরণীয় হউন্ না কেন, স্বজাতি-প্রেমিক ও স্বদেশানুরাগী প্রতাপের চক্ষে তিনি স্খলিত-ধর্ম্ম যবন-সংস্রব-দুষ্ট দাস বৈ আর কিছুই নহেন। প্রতাপ তাঁহার নিকট দেবতা; কিন্তু তিনি প্রতাপের নিকট দানব। উভয়ের মনের ভাব ব্যক্ত হইতেও অধিক বিলম্ব হইল না। রাজা মানসিংহ সোনাপুর জয় করিয়া আর্য্যাবর্ত্তে ফিরিয়া আসিবার কালে প্রতাপের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে কমলমীরা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। প্রতাপ উদয় সাগর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। সেই হ্রদের তীরে মৃত্তিকা-স্তূপের উপর অম্বরাধিপতির জন্য আহার-সামগ্রী সকল বিস্তারিত হইল। সমস্ত আয়োজন হইলে অম্বররাজ প্রতাপকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। প্রতাপ কুমার অমরসিংহকে অতিথি-সৎকারের জন্য তৎসমীপে পাঠাইয়া দিলেন। অমরসিংহ আসিয়া বলিলেন, "মহারাজ! পিতৃদেবের শিরঃপীড়া উপস্থিত হইয়াছে, সুতরাং তিনি আসিতে পারিবেন না, এই জন্য আমায় প্রতিনিধি-স্বরূপ পাঠাইয়াছেন, আর তাঁহার জন্য প্রতীক্ষা করিবেন না, আহার আরম্ভ করুন্। রাজা মানসিংহ সসম্মান অথচ গভীরভাবে উত্তর করিলেন, 'যুবরাজ, আমি বাণার শিরঃপীড়ার কারণ বুঝিতে পারিতেছি। কিন্তু তিনি যদি আমার পার্শ্বে বসিয়া আহার করিতে স্বীকৃত না হন, তবে আর কে হইবে?' তখন প্রতাপ দেখিলেন, আর হৃদয়-ভাব গোপন করা অসম্ভব ও অনাবশ্যক। তিনি তখন অনুরোধ রক্ষা করিতে অসমর্থ হওয়ার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে—'যে রাজপুত যবনকে ভগিনী সম্প্রদান করিয়াছেন ও সম্ভবতঃ তাহার সহিত একত্র আহার করিয়াছেন, তাঁহার সহিত তিনি একত্র আহার করিতে পারেন না। রাজা মানসিংহের তখন চৈতন্য হইল। তিনি নির্ব্বুদ্ধিতা বশতঃ অকারণে এই অপমান আহ্বান করিলেন। যদি প্রতাপ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া এরূপ অপমান করিতেন, তাহা হইলে আমরা প্রতাপকে দোষী করিতাম। কিন্তু তিনি স্বয়মাগত হইয়া প্রতাপকে আপনার সহিত আহার করিতে অনুরোধ করিয়া অতি অদুরদর্শীর কার্য্য করিয়াছিলেন। যাহা হউক, রাজা মান হতমান হইয়া আহার সামগ্রী স্পর্শমাত্র করিয়া সহসা উঠিয়া পড়িলেন, তিনি কেবল শতান্নমাত্র অন্ন দেবকে দিয়াছিলেন। কিন্তু একটি অন্নও উদরে দেন নাই। উঠিয়াই তিনি একলম্ফে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন, এমন সময় প্রতাপ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রতাপকে দেখিবামাত্র তাঁহার নয়ন-যুগল দিয়া যেন অগ্নি উদ্গীরিত হইতে লাগিল। তিনি ক্রোধভরে তাঁহাকে বলিলেন—"প্রতাপ! যদি আমি তোমার দর্প চূর্ণ করিতে না পারি, তাহা হইলে আমি রাজা মানই নহি।" প্রতাপ তাঁহাকে বীরোচিত উত্তর প্রদান করিলেন—বলিলেন যে, তাঁহাকে গ্রহণ করিবার জন্য তিনি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিবেন। যে স্থানে মানসিংহের জন্য আহার-সামগ্রী বিস্তারিত

---

* রাজা মানসিংহ হিন্দুসংস্কারবশতঃ সিন্ধুনদী পার হইয়া যাইতে অস্বীকৃত হন। তিনি লিখিয়া পাঠান যে, হিন্দুর পক্ষে তাহার ওদিকে যাওয়ার প্রতিবন্ধকতা আছে। এই প্রতিবন্ধকতাকে তিনি আটক নামে অভিহিত করেন। আকবর তদুত্তরে নিম্নলিখিত কবিতাটি লিখিয়া পাঠান।—

সব হীন ভূম গোপালকা।
জিসমি আটক্ কহা।
জিস্‌কা মন্ মে আটক হায়।
সোই আটক হোয়গা।

মানসিংহ এই কবিতার মর্ম্ম বুঝিলেন, সুতরাং তিনি আর আপত্তি করিলেন না।

করা হইয়াছিল, সেই মৃত্তিকা-স্তূপকে অপবিত্রজ্ঞানে ভগ্ন করাইলেন এবং তথায় গঙ্গাজল প্রক্ষেপ করা হইল। যে সকল সামন্তেরা সেই আহারস্থলে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা আপনাদিগকে অপবিত্র বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন এবং সংশুদ্ধির নিমিত্ত স্নাত হইলেন ও বসন পরিত্যাগ করিলেন। এই সমস্ত ব্যাপার আনুপূর্ব্বিক আকবরের নিকট নিবেদিত হইল। তিনি এ অপমান নিজের অপমান বলিয়া মানিয়া লইলেন এবং ভীত হইলেন যে, তিনি এ যাবৎকাল যে সকল হিন্দুকুসংস্কারের মূলোচ্ছেদ করিবার এতদূর চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন, সে সমস্ত চেষ্টা বুঝি বিফল হইয়া যায়। এই জন্য তিনি সেই সকল কুসংস্কার স্থায়িকৃত-করণের মূলীভূত মিবাররাজবংশের ধ্বংসবিধানে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন। আকবরের আদেশে সমস্ত যবনশক্তি অচিরাৎ হলদীঘাটরণক্ষেত্রে যুবরাজ সেলিমের অধি-নায়কত্বে ও মানসিংহের তত্ত্বাবধায়কত্বে কেন্দ্রীকৃত হইল। যেন বিধাতা প্রতাপের নাম ভারতবক্ষে রুধিরাক্ষরে অঙ্কিত করিবার জন্যই—যেন প্রতাপের জন্য ভারতবক্ষে অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রোথিত করিবার জন্য—এই হলদীঘাট মহাসমরের অবতারণা করিলেন। যতদিন শিশোদীয়াবংশ মিবারের সিংহাসনে অধিরূঢ় থাকিবে, যতদিন একটিমাত্রও কবি মিবাররাজ্যে লেখনী চালনা করিবেন, ততদিন হলদীঘাট মিবারবাসীর অন্তর হইতে বিলুপ্ত হইবে না! হলদীঘাট—ভারতের থার্ম্মোপলি ভারতবাসীর পক্ষে মহাতীর্থস্থল। প্রত্যেক স্বজাতিপ্রেমিক ও স্বদেশানুরাগী ভারতবাসীর সেই মহা-তীর্থ জীবনে অন্ততঃ একবারও দেখা উচিত। একবার সেই পবিত্র রুধির-প্লাবিত রণক্ষেত্রে লুণ্ঠিতদেহ হইয়া এই ক্ষীণ ধমনীতে রক্তসঞ্চার করা উচিত। আর সেই তীর্থস্থলে গিয়া মহাপ্রাণ প্রতাপের পূজা করা উচিত। যতদিন এই মহাপ্রাণপূজা ভারতে অবতারিত না হইতেছে, ততদিন ভারতের আর কোন আশা নাই।

হলদীঘাটের মহাসমর

পাঠক! চল একবার কল্পনাবলে সেই বীরভূমি রাজস্থান—সেই পুণ্যপুঞ্জ মহাসাগর রাজপুতানা—সেই অগণ্যকীর্ত্তি মহাক্ষেত্র পবিত্র ক্ষত্রভূমি দর্শন করিয়া আসি। চল, একবার সেই পবিত্র তীর্থ-স্থল হলদীঘাটে—সেই ভারতীয় থার্ম্মোপলিতে—রাজসন্ন্যাসী ক্ষত্রিয়কুলগৌরব মহাপ্রাণ রাণা প্রতাপ স্বদেশের স্বাধীনতা-রক্ষার জন্য উৎসর্গীকৃতপ্রাণ দ্বাবিংশ সহস্রমাত্র রাজপুত-সৈন্য লইয়া বীরচূড়ামণি ক্ষত্রকুলাঙ্গার মানসিংহ কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত আকবরতনয় সেলিম ও তদীয় অগণ্য সৈন্যসাগরের সম্মুখীন হইয়া কেমনে অতিমানুষ বীরত্বের সহিত ঘোরতর সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, দেখিয়া আসি; চল পাঠক! কল্পনা-দেবীর সাহায্যে সেই মহাদিনে—যে দিনে চতুর্দ্দশ সহস্র রাজপুত বীর স্বদেশের স্বাধীনতা-রক্ষার জন্য—অপূর্ব্ব আত্মোৎসর্গের জলন্ত দৃষ্টান্তে অনন্তকালের জন্য হিন্দুজাতিকে ইহজীবনের কর্ত্তব্য শিখাইবার জন্য—সমরে অদ্ভুত শৌর্য্য প্রদর্শন পূর্ব্বক একে একে নিজ নিজ রুধিরে জন্মভূমিকে উক্ষিত করিতেছেন—চল, সেই মহাদিনে (১৬৩২ শক ৭ই শ্রাবণ ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দ ৭ই শ্রাবণ) চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতমালা-পরিশোভিত সঙ্কীর্ণ চতুষ্পথগম্য চত্বারিংশবর্গ-ক্রোশ-পরিমিত সেই হলদীঘাট মহাক্ষেত্র বা মহাশ্মশান পরিদর্শন করিয়া আসি। চল, যেখানে প্রতাপ স্বজাতির জন্য ও স্বদেশের জন্য অতিমানব বীরত্বের সহিত আত্মোৎ-সর্গের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছেন, একবার সেই স্থলে গিয়া তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহার অপূর্ব্ব কীর্ত্তি-কলাপ দিব্যচক্ষে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসি। ঐ দেখ, প্রতাপ কাপুরুষ কুলাঙ্গার মানসিংহের স্বজাতিদ্রোহিতার সমুচিত শাস্তিবিধানের নিমিত্ত নির্ভীকচিত্তে মোগলসৈন্য ব্যূহ আলোড়ন করিয়া বেড়াইতেছেন। মত্তমাতঙ্গ যেমন বনস্পতিগণকে উন্মূলিত করিয়া চলিয়া যায়, ঐ দেখ, প্রতাপও সেইরূপ গতিরোধকারী শত্রুগণকে ধরাশায়ী করিতে করিতে একাকী ঐ মোগলসৈন্যবন আলোড়ন করিয়া বেড়াইতেছেন; কেহ তাঁহার গতি-রোধ করিতে সমর্থ হইতেছে না। ঐ দেখ, কাপুরুষ মানসিংহ প্রাণভয়ে এক স্থান হইতে অন্যস্থানে সেনা-সাগরের অভ্যন্তরে লুকাইয়া বেড়াইতেছে। রণোন্মত্ত প্রতাপের শাণিত অসির সম্মুখীন হইতে কিছুতেই সাহসী হইতেছে না। ঐ দেখ, ক্রোধোন্মত্ত প্রতাপ মানসিংহের অনুসন্ধানে বিফলমনোরথ হইয়া যুবরাজ সেলিমের অভিমুখে ধাবিত হইতেছেন। দেখ, তাঁহার প্রচণ্ড অসি একে একে সেলিমের সমস্ত দেহরক্ষকগণকে ধরাশায়ী করিল,—শেষে সেলিমের

মাহুতও নিহত হইল। ঐ দেখ, সেলিমের মত্তমাতঙ্গ বিশ্বাসী ভৃত্যের ন্যায় আত্মরক্ষণে অসমর্থ সেলিমকে লইয়া রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতেছে। যদি সেলিমের হাওদা বর্ম্মক-পরিবর্দ্ধিত না হইত, তাহা হইলে প্রতাপের চালিত বর্শা নিশ্চয়ই তাঁহার দেহ ভেদ করিত। এইরূপে দিল্লীর সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী সেলিম দৈববলে আজ প্রতাপের উদ্যত বর্শার গ্রাস হইতে রক্ষা পাইলেন। ঐ দেখ, মোগলেরা অসহায় প্রতাপকে চতুর্দ্দিক্ হইতে আসিয়া ঘিরিবার উপক্রম করিতেছে, প্রতাপ তথাপি রাজচ্ছত্র ও লোহিত পতাকা স্বহস্তে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। ঐ দেখ, ঐ সুবর্ণ-সূর্য্যনিভ রাজচ্ছত্র লক্ষ্য করিয়া সমস্ত মোগল-সৈন্য তাঁহারই অভিমুখে দৌড়িতেছে। ঐ দেখ, ঝলাধিপতি সামন্তপ্রবর মান্না প্রভুর আসন্ন বিপদ্ দেখিয়া নিজে স্বদলে তাঁহার রক্ষার্থ গমন করিতেছেন। ঐ দেখ, আত্মোৎসর্গ ও রাজভক্তির অক্ষয়কীর্ত্তি জগতে রাখিবার জন্যই যেন তিনি প্রতাপের হস্ত হইতে কাড়িয়া লইয়া সেই রাজচ্ছত্র নিজহস্তে লইলেন—এবং প্রভুকে সৈন্যব্যূহ হইতে অতিকষ্টে অপসারিত করিলেন। ঐ দেখ, সমস্ত মোগলসৈন্য এক্ষণে ছত্রলক্ষণে তাঁহাকেই প্রতাপভ্রমে তাঁহারই উপর আসিয়া পড়িল। ঐ দেখ, তদীয় সৈন্যগণ অসাধারণ শৌর্য্যবীর্য্য প্রদর্শন পূর্ব্বক অবশেষে অগণ্য মোগলসৈন্যে পরিবেষ্টিত ও অভিভূত হইয়া একে একে রণক্ষেত্রের শোভা সংবর্দ্ধন করিতেছেন। ঐ দেখ, একে একে প্রতাপের সেই দ্বাবিংশ সহস্র রাজপুতের মধ্যে চতুর্দ্দশ সহস্র রাজপুত ভারত-জননীর গৌরব ও স্বাধীনতা রক্ষা করিতে করিতে তদীয় অঙ্কশায়ী হইলেন! মাটীর দেহ মাটীতে মিশিয়া গেল বটে, কিন্তু সেই দেহ-নিহিত শৌর্য্যবীর্য্য ও মহাপ্রাণ আত্মোৎসর্গের উপাদানসামগ্রী—অনন্ত কালের জন্য ভারতক্ষেত্রে পরিরক্ষিত হইল।

কই, আমাদের প্রাণের প্রাণ—ভারতের জীবন প্রতাপ কোথায়? আর সেই উৎসর্গীকৃত-প্রাণ মহাবল প্রভুপরায়ণ তদীয় নীল অশ্ব—যে অশ্ব সম্মুখের পাদদ্বয় সেলিমের হস্তীর মস্তকে উত্তোলিত করিয়া প্রতাপকে হস্তীপকের সম্মুখীন করিয়াছিল—সেই বিশ্বস্ত অশ্ব প্রভুকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে পৃষ্ঠে লইয়া রণস্থল হইতে কোথায় পলায়ন করিল? ঐ দেখ, প্রতাপ একাকী রণস্থল হইতে পলায়ন করিতেছেন! ঐ দেখ, অনুসরণকারী যবনদিগের হস্ত হইতে প্রতাপকে রক্ষা করিবার জন্য অশ্ববর এক উল্লম্ফে ঐ গিরি-নির্ঝরিণী পার হইয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতেছে। আহা! প্রতাপ শত্রুনিপাতনকালে শত্রুগণ হইতে যে তিন বর্শাঘাত, এক গুলীর আঘাত ও তিন অসি প্রহার পাইয়াছিলেন, সূর্য্যালোকের প্রতিফলনে সেই সপ্তবীরলাঞ্ছনে তাঁহার দেহ কি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে! প্রভুপরায়ণ অশ্ববর চৈতক যদিও নিজে আহত হইয়াছে, তথাপি পাছে শত্রুরা আসিয়া প্রভুকে ধরে, এই ভয়ে নিজের প্রাণের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া অথবা নিজের প্রাণের জন্য এক মুহূর্ত্তও না ভাবিয়া নক্ষত্রবেগে ছুটিতেছে। আজ যদি সমস্ত রাজপুতানা প্রতাপের প্রতি এইরূপ প্রভুভক্তি দেখাইত—তাহা হইলে ভারতের ইতিহাস অন্য আকার ধারণ করিত! আহত চৈতকের প্রাণ-বায়ু ক্রমেই ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছে। ঐ দেখ, চৈতকের গতি ক্রমশঃ মন্দা হইয়া আসায় অনুসরণকারী প্রতাপের অতিনিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল। গিরিপ্রস্তর-খণ্ডের সহিত অশ্বক্ষুরের সংঘর্ষে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উদ্গীরিত হইতেছে দেখিয়া প্রতাপ বুঝিলেন—অনুসরণকারীরা সমীপবর্ত্তী হইয়াছে। সহসা এক কর্ণবিদারী শব্দ পশ্চাদ্দিক্ হইতে আসিয়া সবেগে প্রতাপের কর্ণবিবরে প্রবেশ করিল—'হো! নীলা ঘোড়ার সোয়ার'—'ওহে! নীল ঘোটকের আরোহী!' এই শব্দে ঐ দেখ, প্রতাপের দৃষ্টি যেন রশ্মিসংযত হইয়া সেই দিকে নীত হইল। প্রতাপ দেখিলেন—এক জন মাত্র অশ্বারোহী তাঁহার দিকে ছুটিতেছেন—অচিরকালমধ্যে অশ্বারোহীও তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। প্রতাপ দেখিলেন, তাঁহার চিরশত্রু প্রতিদ্বন্দ্বী তদীয় ভ্রাতা শক্ত আজ বহুদিনের পর তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত।

আজ শক্ত জ্যেষ্ঠের প্রতিদ্বন্দ্বী বা শত্রু নহেন! শক্ত দূর হইতে দেখিয়াছিলেন যে, প্রতাপ নীল অশ্বে আরোহণ করিয়া রণস্থল হইতে একাকী পলায়ন করিতেছেন এবং যবনেরা তাঁহাকে জীবিত বা মৃত অবস্থায় ধরিবার জন্য তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতেছে। আজ শক্তের হৃদয় ভ্রাতার ভাবী বিপদের আশঙ্কায় বিগলিত হইল। আজ ভ্রাতৃপ্রেমের উচ্ছ্বাসে তিনি ভ্রাতৃ-অনুসরণকারী যবনদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন। তিনি প্রতাপকে ধরিবার জন্য

ছুটিতেছেন মনে করিয়া মোগলসেনা তাঁহার গতিরোধ করিল না। কিন্তু শক্ত আজ স্বজাতি-দ্রোহিতা ও জ্যেষ্ঠমর্য্যাদা-লঙ্ঘনরূপ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্যই যেন সেই অনুসরণকারী যবনসৈন্যগণকে একে একে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। আজ বস্তুতঃই তিনি প্রতাপের প্রাণরক্ষা করিলেন। ঐ দেখ, প্রতাপ আজ ভ্রাতার এই অপূর্ব্ব ভ্রাতৃপ্রেমে মুগ্ধ ও বিগলিত হইয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া অশ্বাবতীর্ণ ভ্রাতাকে প্রাণভরে আলিঙ্গন করিতেছে। ঐ দেখ, দরবিগলিত আনন্দাশ্রুতে উভয়ের বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতেছে!

আর ঐ দেখ, প্রভুপরায়ণ চৈতক প্রভুর অবতরণের পরই ধরাশায়ী হইয়াছে। প্রতাপ তাহার পৃষ্ঠদেশ হইতে জিন খুলিয়া দিতেছেন। প্রভুর জীবন রক্ষা হইল—এখন চৈতক এ পাপপূর্ণ পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া চলিল। ঐ দেখ, চৈতক চিরকালের জন্য নয়ন নিমীলিত করিল। দেখ, প্রতাপ অতি কষ্টে চৈতকের মৃত্যু-জনিত শোক সংবরণ করিয়া ঐ স্থানেই চৈতকের দেহ সমাধি নিহিত করিলেন—এবং সেই সমাধির উপর একটি মন্দির নির্ম্মাণ করাইলেন! ঐ সমাধি-মন্দির আজও 'চৈতক কা চাবুত্রা' নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। ইহা জারোলের (Jarrole) অদূরে অবস্থিত। শক্ত ভ্রাতার প্রাণরক্ষা করিয়া অঙ্কারো-নামক নিজ অশ্ব ভ্রাতাকে প্রদান করিলেন এবং স্বয়ং স্বহস্ত-নিহত খোরাসানী সেনাপতির অশ্বে আরোহণ করিয়া যুবরাজ সেলিমের শিবিরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ঐ দেখ, দুই ভাই বেগবান অশ্বে আরোহণ করিয়া নক্ষত্রবেগে দুই দিকে ছুটিতেছেন।

চল, আমরা প্রথমে ভ্রাতৃ-প্রাণদাতা শক্তের সঙ্গে গমন করি। ঐ শুন, শক্ত সেলিমের নিকট গিয়া কি বলিতেছে—'প্রতাপ তাঁহার অনুসরণকারী সৈন্যগণকে নিহত করিয়াছে, এবং তদায় অসি আমার উপর উত্তোলন করিয়াছিলেন—কিন্তু আমি উল্লম্ফে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করায় সেই উত্তোলিত অসি আমার অশ্বোপরি পতিত হইয়া তাহাকে ধরাশায়ী করে। আমি নিহত খোরাসান সেনানায়কের অশ্বে আরোহণ করিয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করিয়া আসিয়াছি, এক্ষণে প্রভুর যাহা আদেশ।' মুখভঙ্গীতে বোধ হইতেছে, সেলিম শক্তের এ কথা বিশ্বাস করিলেন না! পাঠক! শুনিলে, সেলিম কি বলিলেন?—'শক্ত! তোমার কথায় আমার বিশ্বাস হইতেছে না—তুমি সত্যকথা বল—আমি তোমায় অভয় দিতেছি।' শক্ত আর সত্যগোপন করা অনাবশ্যক মনে করিলেন। ঐ শুন, শক্ত গুরুগম্ভীরস্বরে কি উত্তর দিতেছেন—'আমাদের পিতৃ-পিতামহিক রাজ্যের রক্ষার ভার আমার ভ্রাতার মস্তকে রহিয়াছে। সুতরাং ভ্রাতাকে রণস্থল হইতে অসহায় পলায়ন করিতে দেখিয়া আমি অনুসরণকারী যবনসেনার হস্ত হইতে তাঁহাকে রক্ষা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।' সেলিম তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন, কিন্তু শক্তকে বিদায় দিলেন। শক্তের মনে এখন ভ্রাতৃপ্রেম ও স্বদেশানুরাগ জলন্তভাবে বিদ্যমান; সুতরাং তিনি ইহাতে পরম প্রীত হইয়া প্রস্থান করিলেন। শক্ত সেলিমের নিকট বিদায় লইয়া এখন প্রতাপের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। চল, আমরাও তাঁহার সঙ্গে যাই। শক্ত যাইবার সময় অদ্ভুত বীরত্বের সহিত ভ্রাতৃ-হস্তচ্যুত ভিনস্রোর নগর পুনরধিকৃত করিয়া ভ্রাতৃ-চরণে অঞ্জলি প্রদান করিলেন। ঐ দেখ, প্রতাপচরণে লুণ্ঠিত-শির শক্তকে তুলিয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং পুনরধিকৃত ভিনস্রোরের অধিপতিত্ব পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে ভোগ করিবার জন্য তাঁহারই হস্তে সমর্পণ করিলেন। প্রতাপ এখন উদয়পুরে ছিলেন। তাঁহার জননী বাইজীরাজও এতদিন উদয়পুরেই অবস্থিতি করিতেছিলেন। কনিষ্ঠ পুত্র শক্তের প্রতি অধিকতর স্নেহবশতঃ তিনি আজ হইতে শক্ত-নগরী ভিনস্রোরে গিয়া পুত্রের গৃহকার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন। আজ হইতে শক্তবংশ শক্তওয়াৎবংশ নামে প্রখ্যাত হইল—এবং শক্ত 'খোরাসানী মুলতানিকা আগগল' খোরাসান ও মুলতানের গতিরোধক উপাধিতে ভূষিত হইলেন। এইরূপে শক্তবংশ-প্রতিষ্ঠাতার অপূর্ব্ব ভ্রাতৃ-প্রেমের ও স্বদেশানুরাগের মহিমায় অনন্তকালের জন্য মিবারক্ষেত্র পূত হইয়া এইরূপে ভীষণ ভ্রাতৃবিদ্বেষ স্বদেশানুরাগ ও ভ্রাতৃ-প্রেমের প্রবল উচ্ছ্বাসে বিলীন হইয়া গেল।

ভ্রাতায় ভ্রাতায় মিলন হইল—এখন চল, আমরা ত্বরিতগতিতে সেই মহাশ্মশান হল্‌দীঘাট-ক্ষেত্রে গমন করি। দেখিয়া আসি, সেই মহাক্ষেত্রে কোন্ কোন্ মহারথী সমরশায়ী হইয়াছেন। অহো! কি হৃদয়বিদারক দৃশ্য! ঐ দেখ, হল্‌দীঘাট গিরিসঙ্কট

দিয়া রুধির তরঙ্গিণী প্রবাহিত হইতেছে। ঐ তরঙ্গিণী মিবারের উৎকৃষ্ট রক্ত বহিয়া লইয়া মিবারের ক্ষেত্র সকলকে উর্ব্বরা করিতেছে। ঐ দেখ, পাঁচশত মিবার-রাজবংশীয় বীরপুরুষ রণে নিহত হইয়া পড়িয়া আছেন। ঐ দেখ, গোয়ালিয়ার-রাজ রামসহায় ও তদীয় পুত্র খান্দ রাও সার্দ্ধত্রিশত আনুযাত্রিকবর্গসহ সমরশায়ী হইয়া ধরাতলে পতিত আছেন। বাবর কর্ত্তৃক স্বরাজ্য হইতে তাড়িত হইয়া তাঁহারা মবারে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। মিবাররাজ ইহাঁদিগকে নিজ ক্ষীণ রাজ্যের অংশ দিয়া আতিথ্যধর্ম্মের সম্মাননা রক্ষা করিয়াছিলেন। আজ ইহাঁরা সেই উপকারের প্রতিশোধ দিবার জন্যই প্রতাপের জন্য হলদীঘাট-রণক্ষেত্রে প্রাণোৎসর্গ করিলেন। আর ঐ দেখ, রাজভক্তির কীর্ত্তিস্তম্ভ ঝলাধিপতি মান্না সার্দ্ধ একশত সৈন্যসামন্তসহ রণস্থল উজ্জ্বল করিয়া রহিয়াছেন। আর ঐ যে অগণ্য শবশ্রেণী মাতৃক্রোড়ে শায়িত রহিয়াছে দেখিতেছ —উহার মধ্যে মিবারের প্রত্যেক গৃহস্বামী আপন আপন গৃহকে অনাথ করিয়া পতি-পদবিনা ভারত-জননীকে বীর শূন্যা করিয়া অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত রহিয়াছেন। আহা! আজ মিবারভূমি নববিধবাগণের আর্ত্তনাদে, পুত্রশোকাকুল জননীগণের বক্ষতাড়নে ও পিতৃহীন বালক-বালিকাগণের হৃদয় বিদারী ক্রন্দন-রোলে—সংস্পর্শ বিদীর্ণ হইতেছে।

এক দিকে যেমন শোকের তামসী নিশি সমস্ত মিবারগ্রামকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, অন্যদিকে তদ্বিপরীতে বিজয় লক্ষ্মীর আনন কিরণে সমস্ত মোগল-সৈন্যাবাস পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাময়ী শোভা সমুদিত হইয়াছে। আমোদ-প্রমোদ ও বিজয়োল্লাসে ঐ দেখ, মোগল-সৈন্য উন্মত্ত হইয়া পড়িয়াছে। যে রজনী মিবারের পক্ষে কালরজনী, সেই রজনীই আবার সেলিম ও তদীয় সৈন্যের পক্ষে যেন মহোৎসবরজনী। শোকের পার্শ্বে উল্লাস, ধ্বংসের পার্শ্বে অভ্যুদয়, এবং শ্মশানের উপরে প্রমোদনৃত্য! হা বিধাতঃ! তোমার মনে কি এই ছিল! অথবা তোমার মহিমা কে বুঝে? নিশা অবসান হইল—মোগল-সৈন্যাবাসেও শান্তি-রবি সমুদিত হইল। বিজয়-দর্পে অন্ধ হইয়া সেলিম সৈন্যাবাস ভাঙ্গিয়া অভিনন্দন পাইবার জন্য পিতৃ-সমীপে চলিলেন। ঐ দেখ, তদীয় সেনা-তরঙ্গিণী দিল্লী অভিমুখে ধাবিত হইতেছে। যেন হলদীঘাট গিরিসঙ্কট হইতে একটি নবনির্ঝরিণী নির্গত হইয়া দিল্লী অভিমুখে যাইতেছে।

এই যে, দেখিতে দেখিতে বর্ষাকাল আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাতে বুঝি মোগলেরা এ সময়ে গিরিগুহাসঙ্কুল প্রদেশে আগমন করিল না। আহা! প্রতাপ কয়েক মাসের জন্য বিশ্রাম করিতে পাইলেন। কিন্তু বসন্তাগমে মোগলেরা আবার যে এই মিবারভূমি আক্রমণ করিল। আবার যে যবনেরা প্রতাপকে পরাজিত করিল।* ঐ দেখ, প্রতাপ রণস্থল হইতে পলাইয়া কমলমীর নগরে গিয়া আশ্রয় লইয়াছেন। কিন্তু মোগলেরা নিবৃত্ত হইবার নহে। ঐ দেখ, মোগল-সেনাপতি বোক-বংশীয় সাবাজ খাঁ প্রতাপকে ঘিরিয়া ফেলিল! কিন্তু ঐ দেখ, প্রতাপ অতিমানুষ বীরত্বের সহিত ক্রমাগত তাহার আক্রমণ প্রতিহত করিতেছেন। দিনের পর দিন যাইতেছে—তথাপি প্রতাপ ক্লান্ত হইতেছেন না। মোগলের অধীনতা স্বীকার প্রতাপের নিকট মৃত্যু অপেক্ষাও ক্লেশকর। তাই তিনি মৃত্যুর বিকুল্লচি ও আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত আছেন, তথাপি মোগল-সেনাপতির হস্তে আত্ম সমর্পণ করিতে প্রস্তুত নহেন। মোগল সেনাপতি বীরত্বে পরাস্ত হইয়া এক্ষণে বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় লইতে প্রবৃত্ত হইলেন। নগরের একমাত্র বারিনিকেতন নোগমকূপে দুর্গন্ধময় পতঙ্গপুঞ্জ প্রক্ষিপ্ত হইল। একমাত্র পানীয় দূষিত হওয়ায় প্রতাপকে নগর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে হইল। আবুনগরাধিপতি দেওরা সামন্ত আকবরের অধীনতা স্বীকার করেন। তাঁহারই বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা এই নারকীয় কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। প্রতাপ পলাইয়া মিবারের দক্ষিণ পশ্চিম চপান নামক অধিত্যকাপ্রদেশে অবস্থিত চাওন্দনামক নগরে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই অধিত্যকাপ্রদেশে সার্দ্ধ তিনশত গ্রাম ও নগরী আছে। সকলগুলিতেই ভীল-দিগের অধিবাস। ঐ দেখ, ভীল অধিনায়ক সনিগুরা সামন্তপ্রবর প্রগাঢ় ভক্তিভাবে প্রতাপকে নগরমধ্যে গ্রহণ করিলেন এবং সেই নগর প্রাণপণে রক্ষা করিতে

---

* এই যুদ্ধ ১৬৩৩ শকের ৩রা মাঘ সংঘটিত হয়। ১৬৩৩ শক—১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে।

গিয়া মোগলদিগের হস্তে প্রাণ হারাইলেন! অতিথি-সৎকার-ব্রতের ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট উদ্যাপনা আর কি হইতে পারে? এই যুদ্ধে মিবারের প্রধান কবিও নিহত হন। প্রতাপের বীরত্ব ও আত্মোৎসর্গের গীতি গায়িতে গায়িতে তিনি মানবলীলা সংবরণ করিলেন। প্রতাপের গুণ-গায়ী কবির মৃত্যু হইল বটে, কিন্তু সে কবিত্বের বহ্নি নির্ব্বাপিত হইল না। রাজা প্রজা, হিন্দু মুসলমান একবাক্যে ও সমস্বরে প্রতাপের যশোগীতি গায়িতে লাগিলেন। সেই গীতিতে সমস্ত রাজপুতানা উদ্দীপিত হইল।

প্রতাপের জীবনের শেষাঙ্ক

চল পাঠক! আমরাও প্রতাপ-জীবনের শেষাঙ্ক অনুসরণ করি। কমলমীরের পতনের পরে ধর্ম্মেতী ও গোহগুণ্ড দুর্গ রাজা মানসিংহ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইল। মহাবৎ খাঁ উদয়পুর অধিকার করিলেন খাঁ ফেরিদ চম্পন প্রদেশ আক্রমণ করিয়া দক্ষিণ হইতে চোয়ান্দ নগরাভিমুখে ধাবিত হইলেন। অগুণ-পানোরার অধিবাসিবৃন্দ যে পথ দিয়া প্রতাপকে খাদ্য-সামগ্রী সংযোজনা করিতেছিল—একজন মোগলবংশীয় রাজকুমার সে পথ অবরুদ্ধ করিয়া রহিলেন। এইরূপে চতুর্দ্দিক অবরুদ্ধ ও গিরিগুহা হইতে গিরিগুহান্তরে অনুসৃত হইয়াও প্রতাপ দৈববলে ও ভীল প্রজাবৃন্দের অপূর্ব্ব রাজভক্তির সাহায্যে অভাবনীয়রূপে এক একটি করিয়া সমস্ত বিপদ কাটাইতে লাগিলেন। তাঁহার অনুসরণকারীরা কোন মতে তাঁহার সন্ধান পাইতে পারিল না। তিনি কোন অনির্দ্দিষ্ট গিরিগুহায় বিশ্রামসুখে নিমগ্ন আছেন—শত্রুরা এই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত মনে যখন বিশ্রাম করিতে আরম্ভ করে, প্রতাপ সেই সময় গৈরিক সঙ্কেত দ্বারা চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত সৈন্যগণকে সম্মিলিত করিয়া অতর্কিত ও অরক্ষিত অবস্থায় অবস্থিত শত্রুগণকে আক্রমণ করিয়া পরাস্ত করিতে লাগিলেন। মোগলের ধৈর্য্য তাহাতেও নির্ব্বাপিত হইবার নহে। সেনাপতি ফেরিদ তথাপি প্রতাপকে জীবিত অবস্থায় ধৃত ও কারারুদ্ধ করিবার জন্য দিন-রাত্রি চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শয়নে স্বপনে তাঁহার কেবল এই একই মাত্র চিন্তা। কিন্তু ঐ দেখ, প্রতাপ এমনই কৌশলে তাঁহাকে এক সঙ্কীর্ণ গুহামধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছিলেন যে, তাঁহার আর পলাইবার উপায় নাই। তাঁহার সৈন্যেরা তাঁহার রক্ষার্থ যেমন সেই গুহামধ্যে প্রবেশ করিতেছে, অমনই একে একে সকলেই বলি পড়িতেছে। মোগল-সৈন্যেরা গৈরিক যুদ্ধ-প্রণালীতে দীক্ষিত ছিল না। সুতরাং তাহারা ক্রমেই ভগ্ন-হৃদয় ও ভগ্নাশ হইয়া পড়িল। অদৃশ্য শত্রুর অনুসরণে তাহারা ক্রমেই ক্লান্ত হইয়া উঠিল। এ দিকে বর্ষাগমে গিরিনদী সকল ক্রমেই স্ফীতাবয়ব হইতে লাগিল। গুহার জলধারা ধাতব বিষে পরিপূরিত হইয়া উঠিল এবং প্রচণ্ড জলপ্রপাত সকল হইতে দূষিত বাষ্প সকল উদ্গারিত হইয়া চতুর্দ্দিকে পীড়া ও মৃত্যু বিস্তার করিতে লাগিল। এত বিভীষিকার মধ্যে বেতনভুক সৈন্যেরা আর কয় দিন থাকিতে পারে? ঐ দেখ, যবন সেনা দলে দলে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতেছে! এইরূপে প্রকৃতিদেবী প্রসন্না হইয়া প্রতাপকে কিছুদিনের জন্য বিশ্রাম প্রদান করিলেন।

এইরূপে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ও বৎসরের পর বৎসর যাইতে লাগিল এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রতাপের দুঃখের ভার বাড়িতে লাগিল। ক্রমেই এক একটি করিয়া সমস্ত প্রদেশগুলি শত্রুহস্তগত হইতে লাগিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রতাপের আয়ও কমিতে লাগিল। প্রতাপ নিজের দুঃখ-কষ্টকে তৃণবৎ বোধ করিতেছেন, কিন্তু নিজের পরিবারবর্গের দুঃখে তিনি অভিভূত হইতেছেন। বিশেষতঃ পাছে তাহারা যবনদিগের হস্তে পতিত হয়, এই ভয়ে তিনি আকুল হইতেছেন। যিনি পারিবারিক গৌরবের মর্ম্ম বুঝেন, তিনিই প্রতাপের অন্তরের বর্ত্তমান যাতনা বুঝিতে পারিবেন। যিনি রাজপুতরমণীকে মোগলসম্রাটের আদরিণী মহিষী করিতেও বিজাতীয় যাতনা অনুভব করেন, কোন্ প্রাণে তিনি সেই দেশের আরাধ্য রাজপুতরমণীরকে যবনবন্দিনী দেখিতে প্রস্তুত হইবেন? প্রতাপের আশঙ্কা যে অমূলক, তাহাও নহে। ঐ দেখ, ধূর্ত্ত যবনেরা শৃগালের ন্যায় প্রতাপের স্ত্রীপুত্রকন্যাগণের অনুসরণ করিতেছে। কিন্তু ঐ দেখ, রাজভক্ত ও রাজকার্য্যে উৎসর্গীকৃত-প্রাণ ভীলেরা বেতের ঝুড়িতে তুলিয়া তাঁহাদিগকে মাথায় করিয়া লইয়া সেই বন্ধুর পার্ব্বত্য প্রদেশের নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতেছে। অবশেষে শত্রুগণের নিরন্তর অনুসরণে ক্লান্ত হইয়া ঐ দেখ, সেই সকল ঝুড়ির বোঝা লইয়া

আওয়ার টিন্-খনির অভ্যন্তরে গিয়া প্রবেশ করিল। ঐ দেখ, ভীলেরা খাদ্যসামগ্রী লইয়া গিয়া সেই সুগভীর খনিপ্রদেশেও রাজমহিষা, রাজকুমার ও রাজকুমারী-গণকে অতি যত্নে খাওয়াইতেছে ও ভক্তিভাবে তাঁহা-দিগের পরিরক্ষণ করিতেছে। আজ এই অসভ্য ভীলে-রাও প্রভুভক্তি ও অতিথি-সৎকারধর্ম্মে রাজপুতানার অন্যান্য সুসভ্য রাজপুতগণকে পরাজিত করিল। এক দিন নয়—কত দিন—এইরূপে তাহারা রাজ-পরিবা-রের শুশ্রূষা ও পরিরক্ষণে নিযুক্ত রহিল। শুদ্ধ যে তাহারা অনুসরণকারী বৈরিগণের হস্ত হইতেই তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতেছে, তাহা নহে, ঐ যে বৃক্ষ-শাখাবিলম্বী বৃত্তমালা ও বৃক্ষশাখাসংলগ্ন অর্গলাবলী দেখিতেছ, ঐ গুলিতে ভীলেরা রাণার ভাবী আশাস্থল রাজপুত্র ও রাজকন্যাগণকে ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি হিংস্র জন্তুদিগের গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাদিগকে ঝুড়িতে পুরিয়া দড়ি দিয়া সেই ঝুড়িগুলি ঐ সকল বৃত্ত ও অর্গলে রাত্রিতে টাঙ্গাইয়া বাখিয়া দেয়। যে সুকুমারবপু রাজপুত্র ও রাজ-কন্যাগণ দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়াও ক্লেশ বোধ করিতেন, আজ এই বেতের শয্যাও তাঁহাদিগের নিকট পরম উপাদেয় বোধ হইতে লাগিল। প্রকৃতির কি অপূর্ব্ব সহনশীলতা!

এত বিপদ পরম্পরা ও কষ্টরাশির মধ্যেও প্রতাপের ধৈর্য্য বিচলিত হইল না। আকবরের হৃদয় প্রতাপ-মাহাত্ম্যে বিগলিত হইল। বলে যাহা সাধিত হইল না আকবর মিষ্টবাক্যে তাহা সাধিত করিবার চেষ্টা করিলেন। আকবরের দূত প্রতাপকে অনেক বুঝাইয়া সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিবার অনুরোধ করিল। কিন্তু উৎসর্গীকৃত-প্রাণ মনীষীর মন তাহাতে বিচলিত হইল না। দূত দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন যে, সেই নির্জ্জন গৈরিকাবাসেও প্রতাপ রাজোচিত আচার-ব্যবহার সমস্ত পরিরক্ষিত করিতেছেন। ভোজন-মণ্ডলীতে রাণা পূর্ব্বের মত যোগ্যতম সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে স্বহস্তে দ্বিগুণিত আহার পরিবেশন করিতেছেন। যদিও চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় বিবিধ আহারের স্থল

Rings

† Bolts, আজও ঐ সকল বৃত্ত ও অর্গল সেই সেই বৃক্ষশাখায় বিলম্বিত হইয়া প্রতাপের অলৌকিক আত্মোৎসর্গের পরিচয় দিতেছে।

এক্ষণে বন্য ফলমূল অধিকার করিয়াছে, তথাপি মিবা-রের সম্ভ্রান্তবর্গ রাজদত্ত প্রসাদ অতি ভক্তি ও সম্মানের সহিত গ্রহণ করিতেছেন। দূতের মুখে প্রতাপের তাদৃশ দুঃখের অবস্থাতেও এই মাহাত্ম্যের কথা শুনিয়া আক-বরের পাষাণ হৃদয়ও গলিত হইল। শুদ্ধ আকবর কেন—আকবরের অনুগসামন্ত শ্রেণী প্রতাপের এই মাহাত্ম্য কাহিনী শুনিয়া বিস্ময় ও ভক্তিভাবে বিগলিত হৃদয় হইলেন। যে সকল কুলাঙ্গার রাজপুত স্বদেশের স্বাধীনতায় জলাঞ্জলি দিয়া ও প্রতাপকে পরিত্যাগ করিয়া রাজপ্রসাদলোভে আকবরের চরণে শরণ লইয়া-ছিলেন, সেই ক্ষত্রিয়াধমেরা প্রতাপকাহিনী শুনিয়া লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিল। অধিক কি, সম্রাটের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান প্রতিনিধি খান্‌খানান প্রতাপের কার্য্যকলাপে এরূপ বিমুগ্ধ ও বিস্মিত হইয়াছিলেন যে, তিনি প্রতাপকে ধর্ম্মের পথে আরও উত্তেজিত ও অধ্য-বসায়শীল করিবার জন্য নিম্নলিখিত মর্ম্মে তাঁহাকে একটি কবিতা লিখিয়া পাঠান,—

'পৃথিবীতে কিছুই চিরস্থায়ী নহে। বিষয়সম্পত্তি ও ধনরত্ন সকলই অন্তর্হিত হইবে, কিন্তু মহাত্মার ধর্ম্মের কাহিনী অনন্তকাল রহিয়া যাইবে। প্রতাপ ভূমি ত্যাগ করিয়াছেন, ধন-সম্পত্তি ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু আজও কাহারও নিকট মস্তক অবনত করেন নাই। সুতরাং ভারতীয় রাজন্যদের মধ্যে একমাত্র তিনিই কেবল ক্ষত্রিয়গর্ব্ব গৌরব রক্ষা করিয়াছেন।"

কিন্তু মহাত্মার জীবনেও দুর্ব্বল মুহূর্ত্ত উপস্থিত হয়। যে প্রতাপ রণস্থলে জ্বলন্ত গোলক ও অলাজ্জ্বল্য তরবারির সম্মুখীন হইতে বিন্দুমাত্র ভীত হন না, অনাহার ও অনিদ্রায় বিন্দুমাত্র কাতর হন না, দুগ্ধফেননিভ শয্যার শয়নে অভ্যস্ত হইয়াও অনা-চ্ছাদিত স্তৃণ-শয্যায় শয়ন করিয়া স্বর্গসুখ অনুভব করিয়া থাকেন, সেই পরম সন্ন্যাসী দেবপ্রকৃতি প্রতাপও প্রাণসমা ভার্য্যা ও প্রাণাধিকা পুত্রকন্যা-গণের কষ্টে অভিভূত হইয়া পড়েন। যখন তিনি দেখিলেন যে, তাহাদিগকে গিরিশিখরে, অধিক কি, গিরিগুহাতেও লুকাইয়া রাখিয়াও নিস্তার নাই; যখন তিনি দেখিলেন যে, বার বার আহার প্রস্তুত করিয়াও প্রাণপুত্তলীগণকে খাওয়াইতে পারি-তেছেন না, আর তাহারা তাঁহার চতুর্দ্দিকে দাঁড়াইয়া আহারের জন্য কাঁদিতেছে, তখন সেই মহাপুরুষের ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। ঐ দেখ, পঞ্চ

স্থানে তাঁহাদের জন্য আহার প্রস্তুত হইয়া ভোজনের আয়োজন হইল, আর পঞ্চ স্থানেই অনুসরণকারী মোগলেরা আসিয়া পড়িল। কাজেই তাঁহাদিগকে আহার ফেলিয়া পলায়ন করিতে হইল। একবার রাজমহিষী ও রাজপুত্রবধূ প্রান্তরের তৃণের বীজের ময়দার পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া এক একখানি সকলকে দিয়া অর্দ্ধেকখানি এখন খাইতে ও অর্দ্ধেক বৈকালিক আহারের জন্য রাখিতে বলিয়াছেন এবং বালকবালিকারা তদনুরূপ করিতেছে, এমন সময় ঐ দেখ, এক ভীষণ বন্য বিড়াল আসিয়া বৈকালিক আহারের জন্য সঞ্চিত পিষ্টকভাগ হইতে কয়েকখানি তুলিয়া লইয়া পলায়ন করিল। ইহাতে ক্ষুধাতুরা রাজকুমারী উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। প্রতাপ এতক্ষণ গভীর চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন। দুহিতার ক্রন্দনে তাঁহার চৈতন্য হইল। দুহিতার আর্ত্তনাদে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। সবিশেষ অবগত হইয়া তিনি দুঃখভরে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। এতদিন প্রতাপের হৃদয়ের দৃঢ়তা অবিচলিত ছিল—কিন্তু আজ প্রতাপ সামান্য বিষয়ে বালকের ন্যায় অধীর হইয়া পড়িলেন। যে প্রতাপ রণস্থলে পুত্র ও জ্ঞাতিগণের মৃত্যুও অম্লানবদনে দেখিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, "ইহারই জন্য—রণস্থলে প্রাণোৎসর্গ করিবার জন্যই—রাজপুত্রের জন্ম",—আজ সেই প্রতাপ আহারের জন্য সন্তানের ক্রন্দনে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। আজ তাঁহার হৃদয় ধৈর্য্যসীমা অতিক্রম করিয়া দুঃখসমুদ্রে ডুবিয়া গেল। অমনি তিনি বলিয়া উঠিলেন যে, 'যে রাজসম্মান ও রাজসিংহাসন এই সকল কষ্টের বিনিময়ে লভ্য, তাহাতে ধিক্! আমি তাহা চাহি না।' প্রতাপ এই বলিয়াই যে ক্ষান্ত হইলেন, এরূপ নহে। আজ প্রতাপ আকবরের নিকট শান্তিভিখারী হইয়া দূত দ্বারা পত্র প্রেরণ করিলেন লিখিলেন যে, যদি শান্তিও না পাওয়া যায়, তথাপি আকবরের অনুসরণের কঠোরতা যেন কিঞ্চিৎ শিথিলিত হয়! আজ প্রতাপসূর্য্য ক্ষণকালের জন্য যেন রাহুগ্রস্ত হইল!

প্রতাপ অবনত হইয়াছেন, এই সংবাদ শুনিয়া আকবরের আনন্দের আর সীমা রহিল না। সম্রাটের আদেশে চতুর্দ্দিকে আনন্দোৎসব হইতে লাগিল। আকবর আনন্দোচ্ছ্বাসে প্রমত্ত হইয়া পৃথ্বীরাজকে প্রতাপের পত্র দেখাইলেন। পৃথ্বীরাজ বিকানীয়রাধিপতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনন্যোপায় হইয়া তাঁহাকে মাড়ওয়ারাধিপতি মালদেবের দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল। বিকানীয়ার রাজবংশ মাড়ওয়ারের রাঠোর রাজবংশের একটি শাখা। সেইজন্যও বিকানীয়ার রাজ্য সমতলক্ষেত্রে নিবন্ধন ইহা অধিকতর অরক্ষিত থাকায় তাঁহাদিগকে অগত্যা মাড়ওয়ার-রাজবংশের অনুবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল। কিন্তু পৃথ্বীরাজের নিকট এ অবস্থা অতিকষ্টের অবস্থা বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। তিনি নিজে তদানীন্তন কালের একজন অদ্বিতীয় বীর ও সুকবি বলিয়া ঘোষিত ছিলেন। তাঁহার হৃদয় বীরজনোচিত সৎসাহস ও হৃদয়তায় পরিপূর্ণ, দাসত্ব তাঁহার নিকট যে নরকবৎ প্রতীয়মান হইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? তিনি স্বাধীনতার বিনিময়ে সেই পদমর্য্যাদা—রাজ্য, ধন, সমস্ত কেবল যন্ত্রণার কারণ বলিয়া মনে করিতেন। আবদ্ধ পক্ষী স্বকীয় কারাস্বরূপ স্বর্ণপিঞ্জর ও বন্ধনভূত স্বর্ণশৃঙ্খলকে যে ভাবে দেখে, মহাপ্রাণ পৃথ্বীরাজও সম্রাটের প্রসাদলব্ধ ঐশ্বর্য্য ও ভোগবিলাসকে সেই ভাবে দেখিতেন। এই জন্য প্রতাপের সেই পত্র দর্শনে তিনি মর্ম্মাহত হইলেন। সহসা তাঁহার যেন ইহাতে প্রত্যয় হইল না, সেই ভাবে তিনি আকবরের নিকট স্বীয় বিশ্বস্ত দূত পাঠাইয়া ইহার সত্যতা পরীক্ষা করিবার জন্য অনুমতি চাহিলেন। তাঁহার গূঢ় অভিপ্রায় এই যে, যদি ইহা সত্য হয়, প্রতাপকে উদ্দীপনাবাক্যে এ কলঙ্ক হইতে রক্ষা করিবেন। তিনি প্রতাপচরিত্রের মাহাত্ম্য ও দৃঢ়তা জানিতেন। বুঝিয়াছিলেন যে, প্রতাপ সময়োচিত দুঃখভাবে অভিভূত হইয়া হঠাৎ এরূপ পত্র লিখিয়া থাকিবে। কিন্তু চৈতন্য হইলেই তিনি ইহার জন্য পরিতাপ করিবেন। এই বুঝিয়া পৃথ্বীরাজ নিম্নলিখিত মর্ম্মে কয়েকটি কবিতা লিখিয়া দূত দ্বারা তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন:—

হিন্দুর আশা হিন্দুর উপর নির্ভর করিতেছে। ইহা জানিয়াও রাণা সে আশায় জলাঞ্জলি দিতে উদ্যত হইয়াছেন। এক প্রতাপের জন্যই আকবর সমস্ত ভারতকে স্বশাসনাধীনে পরিণত করিতে পারিতেছেন না। আমাদের সামন্তগণ বীরত্ব ও

রমণীগণ সতীত্ব হারাইয়াছেন। ক্ষত্রিয়কুলের হাটে এখন আকবর একটি কুহকী দালাল। তিনি সে বাজারে সকলই কিনিয়াছেন—কেবল উদয়সিংহের পুত্র প্রতাপকে ক্রয় করিতে পারেন নাই। প্রতাপ অমূল্য ধন—প্রতাপকে ক্রয় করেন আকবরের এমন সম্পত্তি নাই। প্রকৃত ক্ষত্রিয় কয় জন নয় দিনের (নৌরোজার) মেলায় কুলসম্মান বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হইবেন? অথচ কয় জন না সেই আনন্দের হাটে অপার্থিব কুলগৌরবের বিনিময়ে পার্থিব ধন সংগ্রহ করিয়াছেন? যখন সকল ক্ষত্রিয় তাঁহাদিগের প্রধান পণ্যদ্রব্য এই হাটে বিক্রয় করিয়াছেন, তখন ভারতবংশধরও কি সেই হাটে নামিবেন? যদিও প্রতাপ তাঁহার অন্যান্য সম্পত্তিকে বিসর্জ্জন দিয়াছেন, তথাপি এতদিন তিনিই কেবল এই অমূল্য সম্পত্তির রক্ষা করিয়াছেন। [illegible]-তায় তাড়িত হইয়া অনেককে ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই হাটে আসিয়া জাতীয় দুর্গতি ও জাতীয় অসম্মান প্রত্যক্ষ করিতে হইতেছে; এই কলঙ্ক ও অপমান হইতে হাম্বিরের উত্তরাধিকারী কেবল পরিরক্ষিত হইয়াছেন। পৃথিবী জিজ্ঞাসা করিতেছে প্রতাপ এ গুপ্ত সাহায্য কোথায় হইতে পাইতেছেন? আমি জানি, প্রতাপ হৃদয়ের শান্তি ও নিজ বাহুবল ভিন্ন আর কোন গুপ্ত সাহায্য প্রাপ্ত হন নাই। ইহা দ্বারাই তিনি এতদিন ক্ষত্রিয়ের অহঙ্কার ও ক্ষত্রিয়ের গৌরব রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। যে কুহকী দালাল এই হাটে ভারতের জাতীয় গৌরব সামান্য মূল্য দিয়া ক্রয় করিতেছে, তাহাকে এক দিন আমরা অবশ্যই অতিক্রম করিতে পারিব। সে কিছু চিরদিনের জন্য ভারতের মৃত্তিকা ক্রয় করে নাই। একদিন তাহাকে ইহা পরিত্যাগ করিয়া যাইতেই হইবে। তখন ভারতের মরুভূমিতে ক্ষত্রিয়বীজ বপন করিবার জন্য ক্ষত্রিয়কুল প্রতাপের নিকট উপস্থিত হইবে। সেই বীজের পবিত্রতা রক্ষার জন্য সকলেই প্রতাপের দিকে তাকাইয়া আছে। প্রতাপ কর্ত্তৃক বীজের পবিত্রতা রক্ষা হইলে—তাহা আবার এক দিন উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।" দশ সহস্র সৈন্যদল অপেক্ষা পৃথ্বীরাজের এই উদ্দীপনাবাক্য প্রতাপের উপর অধিকতর প্রভাব প্রকাশ করিল। প্রতাপের নির্ব্বাণোন্মুখ বীর্য্যবহ্নিকে ইহা সন্ধুক্ষিত করিল—প্রতাপের অবসন্ন স্নায়ুমণ্ডলীতে ইহা নববল যোজনা করিল—প্রতাপের জড়প্রায় দেহকে ইহা আবার কার্য্য-প্রবণ করিয়া তুলিল। সামন্ত ক্ষত্রিয় ক্ষত্র-গৌরব রক্ষার জন্য তাঁহার দিকে তাকাইয়া আছে, এই চিত্রে প্রতাপের মন আবার তেজঃপুঞ্জময় হইয়া উঠিল। আবার তিনি ক্ষত্রোচিত বীরকীর্ত্তির জন্য প্রস্তুত হইলেন। উদ্দীপনাময়ী রচনার কি অপূর্ব্ব শক্তি! ইহা মৃতদেহে জীবনসঞ্চার করে। পতিত জাতিকে আবার জাতীয় গৌরবে প্রতিষ্ঠাপিত করে।

যখন আকবরের দূত পৃথ্বীরাজের উদ্দীপনাময়ী পত্রিকা লইয়া প্রতাপের নিকট আসিল, তখন প্রতাপ আরাবলী গিরিমালার অধিত্যকাপ্রদেশে অবস্থিত। পৃথ্বীরাজের পত্রিকা তাঁহার সমস্ত সঙ্কল্প পরিবর্ত্তিত করিয়া দিল। তিনি অবিশ্রান্ত সমরে ক্লান্ত হইয়া আকবরের নিকট শান্তি ভিক্ষা করিয়াছিলেন; ইচ্ছা ছিল, শান্তি লাভ করিয়া জীবনের অবশিষ্টকাল সেই অধিত্যকা প্রদেশে ভগবানের আরাধনায় নিমগ্ন থাকিবেন। কিন্তু পৃথ্বীরাজের উদ্দীপনাবাক্য তাঁহার সমস্ত সঙ্কল্প ওতপ্রোত করিয়া দিল। তিনি যবনের নিকট শান্তি ভিক্ষা করিয়া শান্তিময় জীবন অতিবাহিত করা এখন অতি লজ্জার বিষয় মনে করিলেন। অথচ সেই প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধে আর অধিক দিন দাঁড়াইতে পারিবেন না বুঝিতে পারিয়া তিনি নিজ আত্মানুরূপচরিত্র ও সেই সঙ্কটসময়ের উপযোগী এক অপূর্ব্ব সঙ্কল্প গ্রহণ করিলেন। যে মিবার একদিন রাজস্থানের উদ্যান বলিয়া প্রথিত ছিল এবং যে মিবার এখন মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে, স্বর্গাদপি গরীয়সী মিবারভূমি এবং যে চিতোর নগরী একদিন বিক্রমে ও ঐশ্বর্য্যে রাজরাজেশ্বরী ও বীরপুরুষ ও বীরাঙ্গনাগণের লীলাস্থলী ছিল এবং যে চিতোর-নগরী এখন ভগ্নাবশেষে পরিণত হইয়াছে ও সেই ভগ্ন-স্তূপ বীরপুরুষ ও বীরা-রমণীগণের পবিত্র রক্তে কলঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে, আর এই প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তরা শোচ্যা চিতোর নগরী—প্রতাপহৃদয়ের এই দুই প্রিয়তম বস্তুকে পরিত্যাগ করিয়া নিজ পরিবারবর্গকে ও শিশোদীয়বংশধরগণকে লইয়া সিন্ধুনদীর তীরাভিমুখে গমন করিতে উদ্যত হইলেন। ইচ্ছা, জলবেণী বেষ্টিত সোগদীরাজের রাজধানীতে গিয়া নিজ লোহিত ধ্বজা

নিরাপদে উড়াইবেন। কারণ, মধ্যস্থিত সুবিস্তীর্ণ ভীষণ মরুভূমি সেই দুর্দ্দান্ত শত্রুর গতিরোধ করিবে। এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি প্রাণপ্রিয়া রাজমহিষী ও প্রাণাধিক রাজনন্দন ও রাজনন্দিনীগণকে এবং মিবারের সম্ভ্রান্ত-শ্রেণী—সামন্তবর্গ ও অধীন জমীদারগণ উৎসর্গীকৃত-প্রাণ বীরদল—যাঁহারা অধীনতা স্বীকার করা অপেক্ষা নির্ব্বাসন শ্রেয়ঃ মনে করিলেন—সকলকে লইয়া আরাবলী গিরিমালা হইতে অবতরণ করিলেন; অবতরণ করিয়া মরুপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এমন সময় এমন একটি ঘটনা ঘটিল, যাহাতে তাঁহাকে সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া আবার পূর্ব্বপুরুষগণের আবাসভূমি মিবারভূমির অধিবাসী হইয়া থাকিতে হইল। প্রতাপ এত যে কঠোর শাসন করিতেন, তাহাতেও তাঁহার প্রজাবৃন্দের অবিচলিত রাজভক্তির হ্রাস হয় নাই। কারণ, সকলেরই বিশ্বাস, প্রতাপ যাহা করিতেছেন, তাহা মিবারের মঙ্গলের জন্যই। সকলেই তাঁহাকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিত, তাঁহার অলৌকিক আত্মোৎসর্গ দেখিয়া সকলেই তাঁহাকে মানবরূপী দেবতা বলিয়া মনে করিত। এই জন্য প্রতাপকে মিবার ছাড়িয়া যাইতে দেখিয়া প্রতাপের মন্ত্রীর আজ হৃদয় বিগলিত হইল। তাঁহারা পুরুষানুক্রমে মিবারের মন্ত্রী। সুতরাং রাজকার্য প্রসাদ-লব্ধ ধনে তাঁহাদের ভাণ্ডার পরিপূরিত। তিনি সে সমস্ত ধন প্রতাপের চরণে অঞ্জলি দিয়া তাঁহাকে স্বেচ্ছা-নির্ব্বাসন হইতে নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিলেন। এরূপ অভাবনীয় ও অলৌকিক রাজভক্তিতে প্রতাপ অভিভূত হইয়া পড়িলেন। যে দেশের এরূপ রাজভক্তির জগতে তুলনা নাই সে দেশ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে প্রতাপের আর প্রবৃত্তি হইল না। আজ মন্ত্রি-কুলতিলক ভাম সাহার অতিমানুষ আত্মত্যাগে মিবার রাজ্য রক্ষা পাইল। ভাম সাহার নাম অনন্তকালের জন্য ইতিহাসে সুবর্ণ অক্ষরে লিখিত থাকিবে। আজ ভাম সাধু প্রতাপের চরণে যে ধন অঞ্জলি প্রদান করিলেন, তাহা দ্বারা পঞ্চবিংশতি সহস্র সৈন্য দ্বাদশ বৎসর প্রতিপালিত হইতে পারে। মন্ত্রিবরের অসাধারণ প্রভুভক্তিতে ও পৃথ্বীরাজের কবিতাগ্নি উদ্দীপনাতে উত্তেজিত হইয়া প্রতাপ মিবারের লুপ্ত-গৌরব উদ্ধার করিবার জন্য আবার প্রাণপণ করিলেন।

এই সময় মোগল সেনাপতি সাহবাজখাঁ দেবীরে সৈন্যাবাস স্থাপন করিয়া তথায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন, প্রতাপ এত দিনে মরু পার হইয়া গমন করিয়াছেন। এই ভাবিয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইয়া উৎসবে দিনযাপন করিতেছিলেন। এমন সময় প্রতাপ বাহিনী সহসা স্বদেশাভিমুখিনী হইল। মোগল সেনাপতি এ সংবাদ না পাইতেই প্রতাপ সেই উৎসর্গীকৃত প্রাণ বীরদল লইয়া প্রচণ্ডবেগে মোগল-সৈন্যাবাসে আসিয়া পড়িলেন। সেই বীরদলের তরবারির আঘাতে মোগল সৈন্যগণ খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। অতি অল্পসংখ্যক মাত্র মোগল সৈন্য পলাইয়া আমাইতের দুর্গে গিয়া আশ্রয় লইল। কিন্তু ক্ষত্রিয়বীরদল মুহূর্ত্তমধ্যে তথায় গিয়া তাহাদিগকেও শমনসদনে প্রেরিত করিলেন। তাঁহারা বিশ্রাম না করিয়া কমলমীরাভিমুখে ধাবিত হইলেন। নিমেষমধ্যে সে দুর্গও আক্রান্ত ও পুনর্গৃহীত হইল। দুর্গাধিপতি আবদুল্লা ও তদীয় দুর্গরক্ষক সৈন্যগণ সকলেই প্রতাপের করাল অসিমুখে পতিত হইল। কমলমীরের পর একে একে দ্বাত্রিংশৎটি দুর্গ আক্রান্ত ও গৃহীত হইল। প্রতাপের কঠোর আদেশ সেই সকল দুর্গের সমস্ত অধিবাসী শমন-সদনে প্রেরিত হইল। প্রতাপকে দেখিয়া বোধ হইল, যেন পশুপতি সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সহসা মিবার মরুক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়াছেন—যেন যবনকুল ধ্বংস করিবার জন্য কালান্তক যম সহসা মিবারভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এই দুর্দ্ধর্ষ অথচ অনিবার্য্য ঘাতন-কার্য্য দেখিয়া জগৎ স্তব্ধ হইল। বোধ হইল যেন, প্রতাপ সর্ব্বসংহারিণী নিজ আসদেবীর মুখে মিবারের সমস্ত জীবকেই বলি দিতে উদ্যত হইয়াছেন। প্রতাপের এই অতিমানুষ অবদানপরম্পরায় এক সমরাবর্ত্তেই (১৫৮৩ শকাব্দা ১৫৩০ খৃষ্টাব্দ) চিতোর, আজমীর ও মণ্ডলগড় ভিন্ন সমস্ত মিবাররাজ্য পুনরধিকৃত হইল। রাজা মানসিংহ প্রতাপকে ভয়প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে চিরদিন বিপদে কাটাইতে হইবে এবং যে ভয়প্রদর্শন তিনি অক্ষরে অক্ষরে কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন - সেই ভয়প্রদর্শনের প্রতিশোধ লইবার জন্য আজ প্রতাপ তদীয় বিজয়-প্রদীপ্ত সৈন্যগণ লইয়া অম্বররাজ্য আক্রমণ করিলেন এবং ইহার প্রধান বাণিজ্যস্থান মালপুরা নগরী অবরোধ করিলেন।

উদয়পুর সর্ব্বশেষে পুনরধিকৃত হইল। উদয়পুর পুনরধিকৃত করিতে প্রতাপকে সবিশেষ কষ্ট পাইতে হয় নাই। কারণ, প্রতাপের সৈন্য উদয়পুরের তোরণ দ্বারে উপস্থিত হইবামাত্র যবনেরা ইহা পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। প্রতাপকে যবনেরা যেন এখন হইতে কালান্তক যমোপম দেখিতে লাগিল। দেবীরের যুদ্ধে প্রতাপের ও তদীয় অজেয় সেনার অলৌকিক বীরত্বের ও সেই নরমেধযজ্ঞে সমস্ত যবন-সেনার বাল পড়ার কাহিনী সমগ্র ভারতে প্রচারিত হইল। উদয়পুরস্থ যবনসেনা সেই জন্য আর প্রতাপের করালবদনে পতিত হইতে সাহস করিল না। সিংহের সম্মুখে মেষপালের ন্যায় পলাইয়া গেল।

এই ঘটনার পর আকবর আর প্রতাপকে মন্ত্রণা দিতে ইচ্ছা করিলেন না। প্রতাপের দেব-দুর্ল্লভ আত্মোৎসর্গে আকবরের কঠিন হৃদয়ও আপ্লুত হইল। তিনি ও তদীয় হৃদয়বান্ খান্খানা এখন হইতে প্রতাপের স্তুতিবাদক হইয়া উঠিলেন। কোন্ পাষাণ-হৃদয় প্রাণোৎসর্গের পূজা না করিয়া অধিক দিন থাকিতে পারে? "কঃ ঈপ্সিতার্থস্থির-নিশ্চয়ং মনঃ। পয়শ্চ নিম্নাভিমুখং প্রতীপয়েৎ" আর অভিলষিত বিষয়ে স্থিরসঙ্কল্প ব্যক্তির ও সাগরাভিমুখিনী স্রোতস্বিনার গতিই বা কে রোধ করিতে পারে?

প্রতাপ জীবনের অবশিষ্টাংশ শান্তিতে কাটাইলেন। আকবরের ঔদার্য্যই যে শুদ্ধ এই শান্তির মূল, তাহা নহে। আকবরের সেনার ও সেনানায়কগণের মধ্যে রাজস্থানের ক্ষত্রিয়গণই প্রধান। তাঁহারা স্বজাতি-প্রেমিক ও স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য উৎসর্গীকৃত-প্রাণ প্রতাপের বিরুদ্ধে আর অস্ত্রধারণ করিতে স্বীকৃত হই-লেন না। সুতরাং আকবরকে প্রতাপ-নির্য্যাতন হইতে অতঃপর একেবারেই নিবৃত্ত হইতে হইল।

কিন্তু এ শান্তি প্রতাপের নিকট যন্ত্রণার কারণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। যে গিরিপথ দিয়া উদয়-পুরে প্রবেশ করিতে হয় এবং যে গিরিমালা উদয়পুরের দুর্গস্বরূপ হইয়া ইহাকে রক্ষা করিতেছে, সেই গিরিশৃঙ্গে উঠিয়া প্রতাপ যখন শত্রুহস্তগত চিতোর নগরীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তখন প্রতাপের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইয়া যায়। সেই অমরাপুরীর ভগ্নস্তূপের দিক দৃষ্টি করিলে প্রতাপের হৃদয় ভগ্ন হইয়া যায়। পিতৃ-পৈতা-মহিক রাজধানী সেই চিতোরনগরীতে তিনি আর এ জীবনে প্রবেশ করিতে পারিবেন না,—এ চিন্তা প্রতাপের নিকট অসহনীয়া। যে প্রতাপ-হৃদয় জাতীয় লুপ্ত গৌরবের পুনরুদ্ধারের জন্য অগ্নিময় হইয়া আছে, সে প্রতাপ-হৃদয়ে শত্রুর দয়া—যে দয়া সে হৃদয়ের দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষাকে সীমাবদ্ধ করিয়া রহিয়াছে—শত্রুর সেই দয়া মৃত্যু অপেক্ষা অসহনীয়। ক্ষুধাতুরের সম্মুখে খাদ্য রাখিয়া তাহাকে খাইতে না দিলে তাহার যে কষ্ট, পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ ব্যক্তির সম্মুখে জল রাখিয়া তাহাকে সে জলপান করিতে না দিলে তাহার যে কষ্ট, এই শান্তির অবস্থায় প্রতাপ তাহা অপেক্ষা শতগুণ কষ্ট অনুভব করিতে লাগিলেন।

পাঠক! একবার কল্পনাবলে প্রতাপমূর্ত্তি তোমার মানস-নয়নের সম্মুখে আনিয়া সেই মহা-প্রাণ মহাবীরের চরণে প্রণিপাত করিয়া তাঁহার তাৎকালিক অন্তর্ব্বহ্নি অবলোকন কর, দেখ, কি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! বীরবর এখনও প্রৌঢ়াবস্থায় অবস্থিত, অথচ উঁহার মুখ কান্তিতে কি গভীর চিন্তার রেখাবলী বিদ্যমান রহিয়াছে। দেখিয়া বোধ হইতেছে, যেন তাঁহার হৃদয়ের প্রধান আকাঙ্ক্ষা এখনও পূর্ণ হয় নাই। তাঁর তপ্তকাঞ্চননিভ ঐ দেহে যে সকল কৃষ্ণ-লাঞ্ছন দেখিতেছ, সেগুলি প্রহরণক্ষত-চিহ্ন। ঐ দেখ, প্রতাপ উদয়পুরের গিরিশৃঙ্গে উপল-খণ্ডে বসিয়া সতৃষ্ণনয়নে চিতোরনগরীর দিকে তাকাইয়া আছেন। যে চিতোরের ভগ্নাবশেষের উপর এখনও পিতৃপুরুষগণের রুধির পতিত রহিয়াছে, যে চিতোরের প্রত্যেক স্থান বীরানারী ও বীর-পুরুষগণের অলৌ-কিক আত্মোৎসর্গে ও বীরত্বে পূত হইয়া রহিয়াছে,—সেই চিতোরের সহিত তাঁহার নয়নদ্বয় যেন রশ্মি-সংযত হইয়া রহিয়াছে। যে চিতোরে বীরচূড়ামণি বাদল ও বাপ্পারাও রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন; যে চিতোরের অধিপতি রণপণ্ডিত সমরসিংহ ভারতের স্বাধীনতা-রক্ষার জন্য রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া দৃশদ্বতী-নদী-তীরে যাবনিক গতিরোধ করিতে গিয়া ভারত রত্ন দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজের পার্শ্বে রণাঙ্গনে অনন্ত শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন; যে চিতোরের অধিত্যকাপ্রদেশ হইতে লোহিত পতাকা হস্তে করিয়া উর্মীর দ্বাদশ পুত্র রণক্ষেত্রে অবতরণ করত শত্রু-দলন করিয়া আবার সগৌরবে সেই অধিত্যকা-প্রদেশে উঠিয়াছিলেন; যে চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ভবানী অধিত্যকা প্রদেশ হইতে ভীষণ কটাক্ষ-নিক্ষেপণ দ্বারা শত্রুদিগকে প্রহরণ-

পাতের অগ্রেই নিহতপ্রায় করিয়া থাকেন; যে চিতোর-নগরীতে দেওলাদামন্দ ও জয়মল্ল ও পুত্ত আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন; যে চিতোর-নগরীতে চন্দাবতরমণী প্রাণাধিকা দুহিতা সঙ্গে রণস্থলে অবতীর্ণ হইয়া অকাতরে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন এবং সেই অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ অনন্ত কালের জন্য রাজপুতপুত্র ও রাজপুতস্বামিগণের চির-অনুকরণীয় হইয়া রহিয়াছে,—সেই অতীত দিনের চিতোরনগরীর সঙ্গে তিনি বর্ত্তমান তমসাচ্ছন্ন ভগ্নাবশেষ চিতোর-নগরীর গম্ভীরভাবে তুলনা করিতেছেন। তাই ঐ দুই নীলোৎপল ফাটিয়া যেন রক্ত বাহির হইতেছে। তাই আজ ঐ বিশাল বক্ষ ঘন ঘন তরঙ্গ উঠিয়া উহাকে অনবরত বিকম্পিত করিতেছে। আবার সেই দুর্দ্দিন—যে দুর্দ্দিনে চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চিতোর-দুর্গ-রক্ষার ভার পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন—সেই দুর্দ্দিনে—যে দিন হইতে চিতোরের পতন আরম্ভ হইয়াছে, সেই দুর্দ্দিন যখন কল্পনায় তাঁহার হৃদয় ফলকে আবির্ভূত হইতেছে, তখন জীবন তাঁহার নিকট যেন বিড়ম্বনার সামগ্রী বলিয়া প্রতীত হইতেছে! আবার ঐ দেখ, পিতৃদেব উদয়সিংহ যবন-হস্তে চিতোরনগরী সমর্পণ করিয়া কাপুরুষের ন্যায় পলায়ন করিতেছেন। কল্পনা যখন এই চিত্র তাঁহার সম্মুখে ধরিতেছে, তখন ক্রোধ ও ক্ষোভে তাঁহার অধরোষ্ঠ বিকম্পিত হইতেছে। এই সকল চিত্র শেলসম তাঁহার বক্ষে বাজিতেছে! এ সকলের প্রতিবিধান না করিয়া আজ তিনি যবনের অনুগ্রহে শান্তি ভোগ করিতেছেন—এ চিন্তা—তাঁহাকে যেন লৌহ-কটাহে নিরন্তর দগ্ধ করিতেছে। শত্রুর অনুকম্পায় শান্তি-সুখ ভোগ করা বীরের পক্ষে—স্বদেশের জন্য উৎসর্গীকৃত-প্রাণ প্রতাপের পক্ষে—নরক-যন্ত্রণা অপেক্ষাও সহস্র গুণে ক্লেশকর। শত্রুর অনুকম্পা, শত্রুর শাণিত তরবারি অপেক্ষা বীরের নিকট অধিকতর ভয়াবহ! ঐ দেখ, আজ তাই প্রতাপের মুখ-কান্তিতে এত যাতনার রেখা প্রতিভাত হইতেছে।

যে জীবন নিরন্তর সংঘর্ষে অতিবাহিত হইয়াছে—যে বীরদেহ কষ্টশৈলে নিরন্তর প্রতিহত হইয়াছে—যে হৃদয় কষ্টের উপর কষ্টের আঘাতে কঠিন হইতে কঠিনতর হইয়া গিয়াছে,—সে জীবনে অবিশ্রান্ত শান্তি, সে দেহে নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রাম ও সে হৃদয়ে শত্রুর অনুকম্পা অসহনীয় হইয়া উঠিল। অসহ্য সহিতে সেই অমূল্য জীবন অবসন্নপ্রায়, সেই সুদৃঢ় বীরদেহ জীর্ণপ্রায় ও সেই তেজঃপুঞ্জময় হৃদয় নির্ব্বাণ-প্রায় হইয়া আসিল। প্রতাপ বুঝিলেন, মৃত্যু আসন্ন-প্রায়। বুঝিয়া তিনি জীবনের অবশিষ্ট কয়দিন প্রিয়তর পুত্র অমরকে শত্রু নিসূদনরূপ কৌলিক ব্রতে দীক্ষিত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নিউমিডি-য়াধিপতি হামিল্কার জীবনের শেষ দিনে বীরপুত্র হানিবল্‌কে দেবালয়ে লইয়া গিয়া যেমন রোমের বিরুদ্ধে চির-রণ খ্যাপনা করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়াছিলেন, প্রতাপও যবনের বিরুদ্ধে চিরদিন অস্ত্রধারণ করিবার জন্য পুত্রকে বার বার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে বলিলেন। কিন্তু হামিল্কার হানিবলের নিকটে যে প্রতিশ্রুতি পাইয়াছিলেন, প্রতাপের ভাগ্যে সে প্রতিশ্রুতিপ্রাপ্তি ঘটিল না। প্রতাপ বুঝিলেন, অমরা শান্তি-সুখের চরণে জাতীয়-গৌরব ও পিতৃনাম বলি দিবেন। বুঝিয়া মৃত্যুকালে তাঁহার অতিশয় যন্ত্রণা হইতে লাগিল। সে দৃশ্য দেখিলে পাষাণও বিগলিত হয়।

ঐ দেখ, পেশোলা হ্রদের তীরে পর্ণকুটীরে * কুশশয্যায় দেবীর বিজয়ী বীরকুল-চূড়ামণি রাজর্ষি প্রতাপ জীবনের মধ্যাহ্নভাগে চিন্তাজ্বরাক্লিষ্ট হইয়া মৃত্যু শয্যায় শয়ান করিয়াছেন। অমাত্য ও সামন্তবর্গ—যাঁহারা কি সম্পদে, কি বিপদে, সকল অবস্থায় ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুবর্ত্তন করিয়া আসিতেছেন—চতুষ্পার্শ্বে তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়াছেন। জীবজন্তু নিস্তব্ধ। সেই তরঙ্গময় হ্রদ তরঙ্গলীলা-শূন্য! আশ্রমের বৃক্ষের সেই গম্ভীর ও শোকবহ সময়ে—তদীয় দুর্দ্দিনের বা গৌরবদিনের সহচরবৃন্দ নির্নিমেষ লোচনে তাঁহার দিকে তাকাইয়া আছেন, সেই মহাপ্রাণ সেই পার্থিব দেহ পরিত্যাগ করিয়া কখন্ পলায়ন করিবেন, সকলে উৎসুক ও কাতর অন্তরে

---

* অতিমনোহর হ্রদ পেশোলার তীরে কুটীরাবলী নির্ম্মাণ করিয়া রাজর্ষি প্রতাপ ও তদীয় সামন্তগণ যতিধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া বাস করিতেন। প্রতাপের প্রতিজ্ঞা ছিল যে, যতদিন চিতোর পুনরধিকৃত না হইবে, ততদিন তাঁহারা এই অবস্থায় কালযাপন করিবেন। সেই হ্রদ এখন চতুর্দ্দিকে মনোহর প্রস্তরময়ী হর্ম্ম্যমালায় সুশোভিত হইয়াছে।

তাহার প্রতীক্ষা করিতেছেন—এমন সময়ে প্রতাপের মুখ হইতে কাতরতাসূচক ধ্বনি উদ্গীরিত হইল।

সালুম্ব্রাধিপতি অতিকাতর ও বিনীতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"দেব! এ দেহ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে আপনি এত যন্ত্রণা পাইতেছেন কেন?" তদুত্তরে তিনি বলিলেন—"যতক্ষণ না আমার আত্মা এই প্রতিশ্রুতি পাইতেছেন—যে, আমার দেশ তুর্কের হস্তে পতিত হইবে না—ততক্ষণ আমার আত্মা এ দেহ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিতেছে না।" এমন সময় ঐ দেখ, যুবরাজ অমরসিংহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ দেখ, কুটীরের একখানি বংশ-খণ্ডে অমরের উষ্ণীষ সংলগ্ন হইয়া গেল। উষ্ণীষ বংশ-খণ্ডে ঝুলিতে লাগিল, আর অমর অনাবৃত-মস্তক কুটী মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ঐ দেখ, অমরের মুখ-কান্তিতে রাগ ও বিরক্তির চিহ্ন প্রতিভাত দেখিয়া প্রতাপের নয়নযুগল হইতে স্ফাটিকবিন্দু সকল নির্গত হইতেছে। প্রতাপ বুঝিলেন, তাঁহার অমর এ কঠোর ব্রত রক্ষা করিতে পারিবেন না। বুঝিলেন, অমর ব্যক্তিগত সুখে অভিভূত হইয়া, পিতার প্রতি ও স্বদেশের প্রতি যবনেরা যে সকল নির্যাতন করিয়াছে,—সে সমস্ত ভুলিয়া যাইবেন। এই ভাবিয়া তিনি নিদারুণ ব্যথিত হইলেন। ঐ শুন, তিনি অমাত্য ও সামন্তবর্গকে লক্ষ্য করিয়া কি বলিতেছেন—"বন্ধুগণ! এই যে কুটীরাবলী দেখিতেছ, আমার মৃত্যুর পর এগুলির উপর অপূর্ব্ব সৌধমালা বিরাজ করিবে। সেই সৌধমালায় বিলাসপ্রিয়তা রাজত্ব করিবে, এবং সেই বিলাস-প্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে তাহার আনুযাত্রিকবর্গও আসিয়া উপস্থিত হইবে। তখন মিবারের স্বাধীনতা—যে স্বাধীনতার জন্য আমরা শিরা চিরিয়া বিন্দু বিন্দু করিয়া রক্ত বাহির করিয়া দিয়াছি—সেই অমূল্য স্বাধীনতা উৎসর্গীকৃত হইবে, এবং অমাত্য ও সামন্তগণ! তোমরাও সেই বিষাক্ত দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তন করিবে",—বলিতে বলিতে ঐ দেখ, প্রতাপের অশ্রুজলে তদীয় কুশশয্যা ভাসিয়া গেল। তখন তদীয় অমাত্য ও সামন্তবর্গ এইরূপে প্রতিজ্ঞা করিলেন এবং যুবরাজ অমরসিংহও যে সে প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ থাকিবেন, তদ্বিষয়েরও ভার লইলেন—তাঁহারা বাপ্পারাওএর সিংহাসনের নামে শপথ গ্রহণ করিলেন যে, যতদিন মিবারের স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে পুনর্লব্ধ না হইবে, ততদিন তাঁহারা সেই কুটীরাবলীর উপর সৌধমালা নির্ম্মাণ করিতে দিবেন না। এই বাক্যে প্রতাপ আশ্বস্ত হইলেন। ঐ দেখ, ঐ নীল নলিনদ্বয় অনন্তকালের জন্য নিমীলিত হইল। ঐ দেখ, ও মুখকান্তিতে আর বিষাদের ছবি প্রতিবিম্বিত নাই। এতক্ষণে প্রতাপের পবিত্র আত্মা সুখে সেই পার্থিব দেহ পরিত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন। ধন্য প্রতাপ! ধন্য তোমার স্বদেশানুরাগ! ধন্য তোমার আত্ম-বিস্মৃতি! ধন্য তোমার আত্মোৎসর্গ!

এইরূপে বীরপ্রসবিনী রাজপুতানা হইতে বীরশ্রেষ্ঠ প্রতাপ অন্তর্হিত হইলেন। প্রতাপের তিরোভাবে সমস্ত মিবাররাজ্য শোকে অভিভূত হইল। প্রত্যেক প্রজা আপনাকে পিতৃহীন বলিয়া মনে করিতে লাগিল। এক প্রতাপচন্দ্রে সমস্ত রাজপুতানা জ্যোৎস্নাময়ী ছিল, সেই চন্দ্রের তিরোভাবে সমস্ত রাজপুতানা গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। শত শত ক্ষত্রিয়নক্ষত্রে সে তম নিরস্ত হইল না। সেই বিশ্বব্যাপী অন্ধকারের মধ্যে প্রত্যেক রাজপুতের অন্তরে প্রতাপ-স্মৃতি কেবল দীপ্তিমতী রহিল। যতদিন রাজপুত-হৃদয়ে স্বজাতিপ্রেম ও স্বদেশানুরাগ বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন সে স্মৃতির দীপ নিভিবে না; নিভিতে পারেও না।

পৃথিবীর অদ্বিতীয় সম্রাট্ আকবরের দিগ্বিজয়িনী অনন্ত অনীকিনীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া তাহার দর্প খর্ব্ব করিবার জন্যই যেন ভারতে প্রতাপের আবির্ভাব হইয়াছিল। রণপাণ্ডিত্যে ও সংখ্যার আনন্ত্যে যে সেনার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে, জগতে এরূপ সেনার অস্তিত্ব তৎকালে ছিল না, প্রতাপ সামান্য রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া—শূন্যপ্রায় ধনাগার, অস্ত্রাগার এবং দশমাংশমাত্র সৈন্য লইয়া সেই সেনার গতিরোধ করিয়াছিলেন, ইহা অপেক্ষা অধিকতর গৌরবের কাহিনী ইতিহাসের বর্ণনীয় আর হয় নাই।

যদি মিবারের থিউসিডাইডিস বা জিনোফনের মত ঐতিহাসিক আবির্ভূত হইতেন, তাহা হইলে প্রতাপের বীরত্ব-কাহিনী পিলোপনিসস্ সমরাবলী বা দশ সহস্র গ্রীকসৈন্যের প্রতিযান-কাহিনীকে নিজ গৌরবচ্ছায়ায় বিলুপ্ত করিয়া রাখিতে পারিত। নির্ভীক বীরত্ব, অদমনীয় সহিষ্ণুতা, অবিচলিত কলঙ্ক-স্পর্শ-শূন্য অধ্যবসায়, পরস্পরের প্রতি প্রগাঢ়

অনুরাগ এবং স্বদেশের প্রতি জ্বলন্ত ভক্তি—এই সকল মহীয়ান্ গুণে প্রতাপ ও তদীয় সহচরবৃন্দ—আকবরের গগনস্পর্শিনী আকাঙ্ক্ষা, অতুলনীয় রণবিষয়িণী প্রতিভা, অসীম ও অনন্ত সামরিক উপদানসামগ্রী এবং তদীয় সৈন্যগণের অগ্নিময় ধর্ম্মোন্মাদ এ সমস্তই বিফল করিতে পারিয়াছিলেন। আরাবলী গিরিমালার মধ্যে এমন গিরিপথ ছিল না, যাহার প্রত্যেক বিপ্র প্রতাপের বীরত্বে পূত হয় নাই। কি জয়ে কি পরাজয়ে প্রতাপের অলৌকিক রণপাণ্ডিত্য ও অসাধারণ আত্মোৎসর্গ তদীয় কীৰ্ত্তিকে মিবারভূমিতে অনন্ত-কাল স্থায়িনী করিয়া রাখিয়াছে। হল্‌দীঘাট মিবারের থার্ম্মোপলি, এবং দেবীর রণক্ষেত্র মিবারের ম্যারাথন্। প্রতাপ, একবার ভারতে আসিয়া এ পতিত জাতিকে উদ্ধার কর। একবার তোমার সেই রাজপুত সৈন্যে তোমার সেই অমিত তেজ সংক্রামিত কর। আইস, এবার সমস্ত ভারতবাসী হল্‌দীঘাটে ও দেবীরে তোমার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইতে প্রস্তুত আছে। ঐ দেখ, তোমার প্রতিদ্বন্দ্বিনী যবনসেনা আত্ম-দ্রোহিতা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য তোমার নিকট ক্ষমা চাহিয়া তোমার পতাকামূলে দণ্ডায়মান হইবার জন্য সোৎসুক-নেত্রে তোমার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। আর ঐ স্বল-সেনা তদীয় অজেয় অক্ষৌহিনী এবার যবনসেনার পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এবার তাহারা পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী নহে। এবার তাহারা পরস্পরের মর্ম্মপীড়ায় দাসত্বের মর্ম্মন্তুদ আঘাতে পরস্পর ভ্রাতৃপ্রেমে জড়িত ও এক স্বার্থে অনুস্যূত। প্রতাপ! একবার আসিয়া এ অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখ। তুমি আবার আসিয়া জাতীয় অধিনেতৃত্ব গ্রহণ কর, আবার ভারতের মুখ উজ্জ্বল হউক।

রাণা অমরসিংহ

প্রতাপের সপ্তদশ পুত্রের মধ্যে অমরসিংহ সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। সুতরাং জ্যেষ্ঠাধিকারনিয়মে প্রতাপের সিংহাসনে তিনিই আরূঢ় হইলেন। অমর অষ্টম বৎসর বয়ঃক্রম হইতে পিতার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত কি বিপদে, কি সম্পদে—কি অরণ্যে, কি নগরে—কি গিরিগুহায়, কি রাজপ্রাসাদে—কি শান্তিক্রোড়ে, কি সমরাঙ্গনে—সতত পিতার সহচর ছিলেন। তাঁহার বাল্য ও কৈশোর বিপদ্‌পরম্পরায় ও তদানুষঙ্গিক কঠোর শারীরিক পরিশ্রমে অতিবাহিত হইয়াছিল। সেই দেবোপম পিতা কর্ত্তৃক সেই নবীন বয়সে তিনি বৈদিকসমরপ্রণালীতে দীক্ষিত এবং সর্ব্ববিধ বিপদে বীরের ন্যায় অটলভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে শিক্ষিত হইয়াছিলেন। সিংহাসনারোহণকালে তিনি যৌবন-সীমা অতিক্রম করিয়া প্রৌঢ়াবস্থায় উপস্থিত হইয়াছেন মাত্র। প্রকৃতি ও শিক্ষা তাঁহাকে অনন্ত বলশালী করিয়া তুলিয়াছে। বিধাতা যেন তাঁহাকে পিতৃসঙ্কল্পসাধনের সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া পিতৃ-সিংহাসনে বসাইয়াছেন এবং সেই সঙ্কল্পসাধনের জন্যই যেন তাঁহাকে বীরপুত্রগণে বিভূষিত করিয়াছেন।

সময়ও এই সঙ্কল্পসাধনের উপযোগী হইয়া উঠিয়াছে। মিবারের প্রবল শত্রু আকবর প্রতাপের মৃত্যুর পর আট বৎসর কাল জীবিত ছিলেন। এই আট বৎসর কাল তিনি সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলাস্থাপনে ব্যাপৃত থাকায় মিবার আক্রমণ হইতে বিরত ছিলেন। সুতরাং অমরসিংহ এ আট বৎসর গভীর শান্তিতে অতিবাহিত করিলেন। এই অবসরে অমরসিংহ স্বরাজ্যে নূতন শৃঙ্খলা স্থাপন করিলেন; জমীর উপর নূতন কর নির্দ্ধারণ করিলেন; জমাদারীগুলির নূতন নিয়মে বন্দোবস্ত করিলেন; কোন্ জমীদারকে কোন্ কোন্ সময়ে কিরূপ সাহায্য করিতে হইবে, তাহার সুন্দর নিয়ম করিয়া দিলেন। তিনি রাজ্যের সম্ভ্রান্তশ্রেণী ও সামন্তবর্গের মধ্যে পদমর্য্যাদার সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মক্রমে নিয়মাবলী স্থাপন করিলেন। অমর-প্রতিষ্ঠাপিত পদমর্য্যাদার এই ক্রম ও নিয়মাবলী মিবারে আজও প্রচলিত রহিয়াছে। কিরূপে কাহাকে উষ্ণীষ বাঁধিতে হইবে, তাহা পর্য্যন্তও তিনি নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। এই সকল আদর্শ মিবারের স্তম্ভ সকলে আজও অঙ্কিত রহিয়াছে। আজও মিবারের রাণা ও সামন্তগণ উৎসবোপলক্ষে অমরসাহী উষ্ণীষ পরিধান করিয়া থাকেন।

কিন্তু এই শান্তি-সুখই কাল হইল। প্রতাপ যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন, এতদিনে তাহা ফলবতী হইতে চলিল। যে দারিদ্র্য ও আত্মত্যাগ প্রতাপকে দেবতা করিয়া তুলিয়াছিল প্রতাপের হৃদয়ে ও বাহুযুগলে অতিমানুষ বল দিয়াছিল এবং প্রতাপের অমর-কীৰ্ত্তির স্তম্ভীভূত হইয়াছিল, অমর এই দীর্ঘকালব্যাপী শান্তিসুখে

বিহ্বল হইয়া পিতৃ-গৃহীত সেই দারিদ্র্য ও আত্ম-ত্যাগ-ব্রত হইতে ভ্রষ্ট হইলেন।

এখন তিনি পিতৃনিষেধের বিরুদ্ধে সেই সুন্দর হ্রদের তীরে, পিতৃ-সন্ন্যাস-ক্ষেত্রে সেই কুটীরাবলীর স্থানে "অমরমহল" নামে এক অপূর্ব্ব ও সৌন্দর্য্যময় প্রাসাদ নির্ম্মাপিত করিলেন। সেই প্রাসাদের দুই ধারে হ্রদের তীরে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া এখন যে রমণীয় মার্ব্বেলময় সৌধাবলী উঠিয়াছে এবং যেগুলিকে এখনকার রাণারা বিলাস-ভবন করিয়াছেন, 'অমরমহল' সৌন্দর্য্যে ও দৃঢ়তায় আজও তাহাদিগকে পরিহাস করিতেছে।

এই বিলাসভবনের সঙ্গে সঙ্গে—দারিদ্র্য ও আত্ম-ত্যাগ-ব্রত-স্খলনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ—সর্ব্ববিধ বিলাস-প্রিয়তা ও সর্ব্ববিধ সুখ-শান্তির স্পৃহা অমরসিংহকে আসিয়া গ্রস্ত ও অভিভূত করিয়া ফেলিল। প্রতাপের ন্যায় অমরসিংহ আর রণস্থলকে সুখ-প্রাঙ্গণ বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন না। স্বাধীনতা ও বীরসম্মানকে তিনি আর প্রাণাপেক্ষা অধিকতর ভালবাসিতে লাগিলেন না। সমস্ত মিবার যেন তাঁহার দৃষ্টান্তের বিষময় প্রভাবে দুষ্ট হয় হয় হইয়া উঠিল।

এই সময়ে আকবর-তনয় সেলিম জাহাঙ্গীর নাম ধারণ করিয়া চারি বৎসরমাত্র পিতৃসিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছেন। তিনি রাজ্যের আভ্যন্তরীণ গোলযোগ থামাইয়া একমাত্র রাজ্য—যাহা এতদিন পর্য্যন্ত মোগল-শক্তিকে পর্য্যুদস্ত করিয়া আসিয়াছে—সেই একমাত্র রাজ্য পুণ্যভূমি মিবারকে অধীনতায় আনিয়া নিজ রাজত্বকে গৌরবান্বিত করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি সমস্ত মোগলসেনাকে একত্র করিয়া মিবারাভিমুখে যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন। সেই মহতী মোগলসেনা মিবারাভিমুখিনী হইয়াছে শুনিয়া অমরসিংহ ইতিকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইলেন। তিনি পারিষদ্বর্গ পরিবেষ্টিত হইয়া রাজসভায় সিংহাসনাধিরূঢ় রহিয়াছেন, এমন সময় দূত আসিয়া তাঁহাকে এই সংবাদ দিল। দ্বাদশ বৎসর নিরবচ্ছিন্ন শান্তি-সুখ ভোগ করিয়া রাণা-বংশাগত সমর প্রিয়তা-হারা হইয়া পড়িয়াছেন। সুতরাং তাঁহার চিত্ত-দোলা শান্তি ও সমর—এই সীমাদ্বয়ের মধ্যে দোলায়মান হইতেছে। স্বার্থ-জীবন, সুখপ্রিয় পারিষদেরা স্বাধীনতা ও জাতীয় গৌরবের বিনিময়ে তাঁহাকে ক্ষত্রবিগর্হিত শান্তি ও শান্তিময় আলস্য ক্রয় করিবার জন্য উপদেশ দিতেছে—এবং বিষাক্ত দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তনা করিতে প্রায় অধিকাংশ পারিষদ উদ্যত হইয়াছেন, এই সংবাদ শুনিয়া মিবারের সামন্তবর্গ রাজসভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা রাণাকে শান্তির প্রস্তাব পরিত্যাগ করিয়া আসন্ন বিপদের জন্য প্রস্তুত হইতে উপদেশ দিলেন। অমর তখনও ইতস্ততঃ করিতেছেন দেখিয়া মহাপ্রাণ স্থবির-শ্রেষ্ঠ চন্দাবত-সামন্ত মৃত্যুকালে প্রতাপ তাঁহাদিগকে যে প্রতি-শ্রুতিতে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা স্মরণ করাইয়া রাণাকে অচিরাৎ যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইবার জন্য আদেশ করিলেন। মিবারের মঙ্গলের জন্য—জাতীয় গৌরব রক্ষা করিবার জন্য—প্রতাপের নিকট তিনি যে প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হইয়াছেন—তাহা প্রতিপালন করিবার জন্য, সেই স্বজাতি-প্রেমিক দেশহিতৈষী প্রবয়াঃ সামন্তপ্রবর অমরের অভিভাবকস্বরূপ যেন তাঁহাকে আজ এই আদেশ করিলেন। সকলেই প্রতাপের উদার দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন। দাসত্বের জাঁকজমকপূর্ণ সুবর্ণময় প্রাসাদ অপেক্ষা স্বাধীনতার কাঠিন্যময় কণ্টসঙ্কুল কুটীর তাঁহারা অধিকতর উপাদেয় বলিয়া মনে করিলেন।

কিন্তু তাহার সে হিতময় আদেশ বা উপদেশ-বাক্য রাজার কর্ণে লব্ধ-প্রবেশ হইল না দেখিয়া চন্দাবত-বংশতিলক সালুম্ব্রাধিপতি 'কার্পেট দাসকে'* তুলিয়া কার্পেটের উপর সবেগে প্রক্ষিপ্ত করিলেন এবং সহসা আসন হইতে উঠিয়া রাজার হস্ত ধারণ করিয়া তাঁহাকে সিংহাসন হইতে নামাইলেন এবং জলদগম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠিলেন—"সামন্তগণ, আপনারা স্ব স্ব অশ্বে আরোহণ করুন এবং প্রতাপের পুত্রকে অশ্বোপরি আরূঢ় করাইয়া অকীর্ত্তি হইতে রক্ষা করুন।" এই আপাত দৃশ্যমান রাজমর্য্যাদালঙ্ঘনে পারিষদেরা সালুম্ব্রাধিপতিকে রাজবিদ্রোহী বলিয়া অভিযুক্ত করিলেন এবং ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া তাঁহার উপর অযথা গালিবর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি পবিত্র কর্ত্তব্যের অনুরোধে এ কলঙ্কের ডালি আহ্লাদপূর্ব্বক মস্তকে ধারণ

---

* কাংস্য অলঙ্কারবিশেষ। বায়ুবেগে কার্পেট যাহাতে উড়িয়া না যায়, এই জন্য কার্পেটের চারি-কোণে ইহার চারিটি রক্ষিত হয়।

করিলেন এবং অটল-অচল-সম হইয়া অর্ব্বাচীনগণের সেই গালিবর্ষণ সহ্য করিলেন। মিবারের গণ্যমান্য সামন্তগণ একবাক্যে সালুম্ব্রাধিপতির এই অপূর্ব্ব রাজভক্তির অনুমোদন করিলেন। তিনি অবিলম্বে স্বহস্তে অমরকে রাজকীয় অশ্বোপরি বসাইলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে মিবারের রণবীরগণ স্ব স্ব অশ্বে আরূঢ় হইয়া রাজাকে পরিবেষ্টন করিলেন। তখন রাগে ও অভিমানে অমরসিংহের চক্ষু ফাটিয়া জল পড়িতে লাগিল। এই অবস্থায় সেই অশ্বারোহী সেনা সৌধমালা-পরিশোভিত অধিত্যকাপ্রদেশ হইতে অবতরণ করিতে লাগিল। বোধ হইল যেন, দেব-সেনাধিপতি কার্ত্তিকেয় অমরপুরী হইতে দেবরাজ ইন্দ্রকে লইয়া অসুরবিজয়ে বহির্গত হইলেন। কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! কি অপূর্ব্ব রাজভক্তি! আজ সালুম্ব্রাধিপতির নিকট প্রতাপ-তনয় ও তদীয় রাজ্য অনন্ত ঋণে আবদ্ধ হইল! আজ আর্য্যজাতি জাতীয় গৌরবরক্ষার জন্য তাঁহার নিকট চির-কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হইল

সেই অশ্বসেনা—যেখানে এখন জগন্নাথদেবের মন্দির উঠিয়াছে, ক্রমে সেই স্থানে গিয়া পৌছিল। এতক্ষণে অমরসিংহ ক্রোধ-রাহুর গ্রাস হইতে মুক্ত হইলেন। অশ্রুস্রোত এতক্ষণ পরে তাঁহার নয়ন-যুগল হইতে প্রবাহিত হইতে ক্ষান্ত হইল। এতক্ষণে তদীয় কর শ্মশ্রুমণ্ডলে পতিত হইল। * এতক্ষণে তিনি সামন্তবর্গকে যথাযোগ্য সম্মানসূচক অভিনন্দন করিলেন এবং সেই কৌলিক অভিনন্দন করিতে যে বিলম্ব হইয়াছে, তজ্জন্য ক্ষমা করিতে অনুরোধ করিলেন। বিশেষতঃ তিনি সালুম্ব্রাধিপতির নিকট কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন—"আপনি রণস্থলে অগ্রবর্ত্তী হউন। আপনাকে পূর্ব্ব রাজার অভাবজনিত শোক আর কখন করিতে হইবে না।" রাজার এই বাক্যে সকলেরই মনে বীরত্ব ও রাজভক্তি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। সেই জলন্ত ও নবীভূত রাজভক্তি ও বীরত্ব লইয়া সেই বীরবৃন্দ দেবীর-রণক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই মহাক্ষেত্রে—সেই পবিত্র গিরিসঙ্কটে—এই দ্বিতীয়বার রাজপুত সেনা মোগল-সেনার সম্মুখীন হইল। উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রামের পর—সেই ভীষণ নরমেধ-যজ্ঞে—বিজয়লক্ষ্মী রাজপুতগণের অনুকূল হইলেন। ১৬৬১ শকে (১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে) এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধ দ্বারা অমরসিংহ প্রতাপের উপযুক্ত পুত্র বলিয়া জগতে কীর্ত্তিত হন। শৌর্য্য ও বীর্য্যে তিনি পিতৃসম ছিলেন। মহাপ্রাণতায় পিতার ন্যূন হইলেও প্রতাপের সহচরবৃন্দের হৃদয়-মাহাত্ম্যে সে ন্যূনতা কথঞ্চিৎ পূরিত হইয়াছিল। এই যুদ্ধের গৌরবের প্রধান অধিকারী রাণার খুল্লতাত কথ। অতঃপর কথ হইতে কথাবত-বংশ প্রতিষ্ঠাপিত হইল। মোগলেরা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া অমরসিংহের নিকট সন্ধি ভিখারী হইল। এতদিনে প্রতাপের শাস্তিভিক্ষার প্রায়শ্চিত্ত হইল। অমরসিংহ মোগল-দিগের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন বটে, কিন্তু সে সন্ধি স্বল্পকালমাত্র স্থায়ী হইয়াছিল। মোগলেরা কেবল আপনাদের অপচিত বল উপচিত করিবার জন্যই এই সময় লইয়াছিল। অবশেষে বলসঞ্চার করিয়া তাহারা ১৬৬৬ শকাব্দার বসন্তকালে আবার রাজপুতানায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

১৬৬৬ শকাব্দা বা ১৬০০ খৃষ্টাব্দের ৭ই ফাল্গুন তারিখে পবিত্র রণপুর গিরিসঙ্কটে উভয় সৈন্যে ভীষণতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। এই মহারণে প্রত্যেক রাজপুত যেন, এক এক রুদ্রাবতারে পরিণত হইয়াছিলেন। মোগল সৈন্যমনে যেন সহসা শত শত রুদ্রতেজ আবির্ভূত হইয়া ইহাকে মুহূর্ত্তমধ্যে ভস্মস্তূপে পরিণত করিল। মোগল সেনাপতি আবদুল্লা ও তদীয় সৈন্যগণ সকলেই রাজপুতগণের করাল অসিমুখে নিপতিত হইলেন। সংবাদ দিবার জন্য একজনও জীবিত রহিল না। এই মহাসমরে রাজপুতদিগেরও অনেক সেনাপতি নিহত হইলেন। সেই স্বজাতি-প্রেমিক জাতীয় কার্য্যে উৎসৃষ্ট-প্রাণ মহাপুরুষগণের * নাম ও কীর্ত্তি ভারতবক্ষে রুধিরাক্ষরে অনন্ত-

---

* ইহা দ্বারা পরামর্শ ও আত্মমানিতা উভয়ই সূচিত হয়।

* ইঁহাদের মধ্যে দেবগড়ের সঙ্গাবতবংশধর দাহু, নারায়ণদাস, সুরজমল, আশাকরণ এই কয় জন সম্ভ্রান্ত শিশোদীয়; শুক্তাবতংস পুরু; রাঠোর-বংশীয় হরিদাস; ঝালবংশীয় ভূপৎ; কচ্ছবংশীয় কবীরদাস; চোহানবংশীয় কৃষ্ণদাস; রাঠোরবংশীয় মুকুন্দদাস; জয়মল্লবংশীয় জয়মলট—এই কয়জন প্রধান।

কালের জন্য লিখিত হইল। এই বিজয়ই রাজপুত-দিগের সর্ব্বনাশের মূল হইল। তাঁহারা বিজয়দর্পে প্রমত্ত হইয়া সমস্ত মিবার-রাজ্যে আন্দোৎসব করিলেন। মিবারের সমস্ত দুর্গের উপর সুবর্ণ-সূর্য্য-মণ্ডল-পরিশোভিত লোহিত পতাকা স্ফীতবক্ষে উড়িতে লাগিল। যে মিবার তরঙ্গের উপর তরঙ্গের আঘাতে জর্জ্জরিত, অসির উপর অসির আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া আসিতেছিল, আজ সেই মিবার মহতী মোগল সেনার উপর দুই বৎসরের উপ-র্য্যুপরি দুইবার জয়লাভ করিয়াছে, রণপুর গিরিসঙ্কট সেনাপতিসহ সমস্ত মোগল-সৈন্যকে বলি দিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব অত্যাচারের প্রতিশোধ লইয়াছে, আজ মিবারের প্রকৃত উৎসবের দিন; সুতরাং মিবার বাসীরা উৎসবে উন্মত্ত হইবে না কেন? রাজপুতগণ! তোমরা উৎসব কর, তাহাতে অপত্তি নাই। কিন্তু এখনও যে মোগলশক্তি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। যতক্ষণ সেই মোগল-শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকিবে, ততক্ষণ দুই একটি মোগলসেনাকে পরাজিত ও হত করিলে কি হইবে? বশিষ্ঠের কামধেনুর মুখ হইতে যেমন অনন্ত অনীকিনী বিনির্গত হইয়াছিল, সেইরূপ এই মোগল-শক্তিরূপ-কামধেনু হইতে অনন্ত সেনা নির্গত হইতে থাকিবে। তোমরা একটি সেনাকে নির্ম্মূল করিবে, অমনি শত শত সেনা সে মুখ হইতে উদ্গীরিত হইবে। তাহার কি ভাবিতেছ? দ্বারে শত্রু দণ্ডায়মান, এখনও কি উন্মত্তের ন্যায় উৎসবে প্রমত্ত থাকিবে?

অমরসিংহ! তুমি বহু আয়াসে ও বহু রক্তব্যয়ে যে চিতোর পুনরধিকৃত করিয়াছিলে, ঐ দেখ, জাহাঙ্গীর সেই চিতোর আবার দখল করিয়া লইয়া পিতৃ-পুরুষগণের সেই অপূর্ব্ব রাজধানীতে তদীয় খুল্লতাত আশ্রিত সুগ্রকে মিবারের অধীশ্বর করিয়া পাঠাই-লেন। সুগ্র প্রতাপের আধিপত্য সহিতে না পারিয়া আকবরের শরণাগত হইয়াছিলেন। সেই অবধি তিনি দিল্লীর রাজসভায় একজন সদস্যরূপে কাল-যাপন করিতেছিলেন। জাহাঙ্গীর পুনঃ পুনঃ পরা-জয়ে ভীত ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া, যাহা বলে পারিলেন না, তাহা কৌশলে সিদ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন। সেই পুণ্যপুঞ্জময় হলদীঘাট-রণক্ষেত্রে তিনি রাজপুত-গণের বীর্য্য স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছেন। প্রতাপের করাল অস্ত্রমুখ হইতে তিনি কেবল দৈববলে রক্ষা পাইয়াছিলেন। যদিও সেই মহারণে বিজয়লক্ষ্মী তদঙ্কশায়িনী হইয়াছিলেন, তথাপি তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ক্ষত্রিয়-তেজ সহজে নির্ব্বাপিত হইবার নহে। এই ভাবিয়া তিনি বল পরিত্যাগ করিয়া কৌশল অবলম্বন করিলেন। আশ্রিত ও শরণাগত সুগ্রকে চিতোরের সিংহাসনে বসাইলে যদি সমস্ত মিবারবাসী প্রতাপ-তনয় অমরকে পরিত্যাগ করিয়া সুগ্রের অধীনতা স্বীকার করে,তাহা হইলে বিনা রক্তপাতে তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধি হইবে। এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি স্বহস্তে সুগ্রকে রাজবেশে বিভূষিত করিয়া সসৈন্যে চিতোর নগরীতে প্রেরণ করিলেন। সুগ্র মোগলসৈন্য-পরিরক্ষিত হইয়া চিতোরনগরীর ধ্বংসের উপর রাজত্ব করিতে আসিলেন। কিন্তু জাহাঙ্গীরের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না! কেহই সেই ক্ষত্রিয়াধমের অধীনতা স্বীকার করিল না। কেহই সেই উদয়সিংহ-তনয়কে রাজসম্মান প্রদান করিল না। ইহা অপেক্ষা মিবারের রাজ-পুত্রগণের অধিকতর গৌরবের বিষয় আর কি হইতে পারে? মিবারের প্রজাবৃন্দ যে প্রতাপের নামে মুগ্ধ! প্রতাপ যে প্রত্যেক মিবারবাসীর হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা! মিবারের প্রত্যেক স্থান যে প্রতাপের কীর্ত্তিকলাপে পূত হইয়া রহিয়াছে! মিবারবাসীরা সুতরাং কোন্ প্রাণে আজ প্রতাপ-তনয় অমরকে পরিত্যাগ করিয়া যবনের ক্রীতদাস সুগ্রের অধীনতা স্বীকার করিবে?

আজ পতিতে পতিতে মিশিয়া এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে! যে প্রতাপ স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য পৃথিবীতে যাহা কিছু প্রিয়,—সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন; বনে বনে পর্ব্বতে পর্ব্বতে ফিরিয়া অনাহারে ও অনিদ্রায় কালযাপন করিয়াছিলেন, আজ সেই প্রতাপের সহোদর সুগ্র যবনের আশ্রিত দাস হইয়া শত শত স্বাধীন রাজার রাজধানী চিতোরের সিংহাসনে আরূঢ় হইয়াছেন। আর যে চিতোর একদিন অমরাবতীর ন্যায় সমৃদ্ধি-শালিনী ছিল, যে চিতোরের অনন্ত মন্দিরশ্রেণী ও অপূর্ব্ব সৌধমালা একদিন গগনতল আচ্ছন্ন করিয়া-ছিল, সেই চিতোর আজ শ্রীভ্রষ্ট ও প্রস্তর স্তূপে পরিণত! যে চিতোর অতি উচ্চ পর্ব্বতের উপর স্থাপিত হওয়ায় শত্রুগণের অলঙ্ঘ্য হইবার জন্য পঞ্চক্রোশী গগনস্পর্শী প্রাকারে পরিবেষ্টিত, যে চিতোরে প্রবেশ করিবার গিরিগাত্রবাহী চতুর্দ্বার

পরিরক্ষিত একটিমাত্র পথ, যে চিতোরে প্রবেশ করিতে একদিন যমও ভয় পাইতেন, সেই চিতোর আজ ব্যাঘ্রাদিরও অধিগম্য হইয়াছে! ঐ দেখ, ইহার শত শত ভগ্ন মন্দিরের চূড়ায় পক্ষিগণ কুলার নির্ম্মাণ করিয়াছে! ঐ শুন, ইহার এক লক্ষ প্রস্তরময় ভগ্ন প্রাসাদে সিংহ-ব্যাঘ্রাদি গর্জ্জন করিতেছে!

এই ভীষণ স্থানে রাজত্ব করিতে আসিয়া সুগ্রের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল! যে রাজধানী এক সময়ে জনাকীর্ণ ছিল, আজ তথায় মানবকণ্ঠধ্বনি প্রায় শ্রুত হয় না! সুগ্র ও তদীয় রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত মোগলসৈন্য ভিন্ন ইহার আর কোন অধিবাসী নাই —মরুভূমির নির্জ্জনতা ইহা অপেক্ষা অল্প ভয়ঙ্কর! এই ভীষণ হইতে ভীষণতর স্থানে মোগল-শক্তি-পরিরক্ষিত হইয়া সাত বৎসরকাল এক অপূর্ব্ব ও অশ্রুতপূর্ব্ব রাজত্ব করিলেন। যদিও সুগ্রের হৃদয় প্রতাপ বা তদীয় পুত্রের প্রতি পাষাণসম ছিল, তথাপি তিনি প্রতিপাদবিক্ষেপে অন্তর্দাহে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। চিতোরে এমন উপলখণ্ড নাই, যাহার উপর কোন না কোন রাজপুতবীর ইহার রক্ষার জন্য আত্মবলি দেন নাই! সেই উৎসৃষ্ট প্রাণ বীরবৃন্দের প্রেতময়ী মূর্ত্তি যেন সর্ব্বদা তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিতেন। সর্ব্বদা তাঁহাদিগের আত্মোৎসর্গের সেই সকল জলন্ত কীর্ত্তিকলাপ তাঁহার মানসনেত্রের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, তাঁহারা এই জঘন্য জাতীয় বিশ্বাসহনন-কার্য্যের জন্য তাঁহাকে লজ্জা দিত ও তাঁহার এই অযোগ্যতার জন্য তাঁহাকে ধিক্কার প্রদান করিত! একদিন চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কালভৈরব-মূর্ত্তিতে তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে এই বলিয়া তিরস্কার ও ভয় প্রদর্শন করিলেন যে, "ওরে ক্ষত্রিয়াধম! তুই অবিলম্বে চিতোর নগরী পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন কর, নতুবা তুই এই জাতীয় বিশ্বাস-হনন-পাপের জন্য অচিরাৎ শমন-সদনে প্রেরিত হইবি!" কালভৈরবের সেই ভীষণ উক্তিতে সুগ্রের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। তিনি আর চিতোরে থাকিতে সাহস করিলেন না। তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রকে অবিলম্বে ডাকিয়া পাঠাইয়া তাঁহার হস্তে চিতোর সমর্পণ করিয়া নির্জ্জন পার্ব্বতীয় নগরী কান্ধারে * গিয়া বসতি করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে তিনি দিল্লীতে গমন করিলে, জাহাঙ্গীর তাঁহাকে অতিশয় তিরস্কার করেন। উদয়সিংহের পুত্র সুগ্রের ইহা অসহ্য হইল। তিনি নিজের অসি নিষ্কোশিত করিয়া সম্রাটের সম্মুখেই আত্মবক্ষে প্রোথিত করিলেন। এইরূপে তিনি স্বহস্তে জাতিবিদ্রোহিতা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সেই যন্ত্রণাময় জীবনের পর্য্যবসান করিলেন। আজ অবিচলিত স্বজাতিপ্রেম ও স্বদেশানুরাগের নিকট রাজশক্তি পরাজিত হইল।

অমরসিংহ সেই পিতৃব্য-পরিত্যক্তা পিতৃপৈতামহিকী রাজধানীর দখল লইলেন বটে, কিন্তু সেই ভগ্নপুরী পরিরক্ষণোপযোগী উপকরণ-সামগ্রীর অভাবে তাঁহাকে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইল। চিতোর—গৌরবের চিতোর—করতলস্থ হইয়াও মিবারের রাজধানী হইতেই পারিল না। অমরসিংহ কিছুদিন তথায় উৎসবে যাপিত করিয়া চতুর্দ্দিকস্থ নগরীসকল দখল করিবার জন্য নির্গত হইলেন। ক্রমে ক্রমে অশীতি-সংখ্যক দুর্গ-রক্ষিত নগরী—তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিল বা তদীয় বিজয়িনী সেনার অনিবার্য্য আক্রমণে বল গৃহীত হইল। এই সকল দুর্গরক্ষিত নগরীর মধ্যে অন্তল একটি ঘটনায় চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। ইহা দখল করিবার সময় চন্দাবত ও শুক্তাবতবংশে প্রাধান্য লইয়া ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইল। সেই ক্ষত্রিয়সেনার অগ্রে স্থান পাইবার জন্য উভয়বংশেই দাবীদার হইয়া দাঁড়াইলেন। স্বদেশের গৌরবরক্ষার জন্য কে অগ্রে প্রাণ দিবে—ইহা লইয়া আর কোন্ দেশে এরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইয়া থাকে? স্বজাতিপ্রেমের ও স্বদেশানুরাগের এরূপ জলন্ত দৃষ্টান্ত আর কোথায়? এই অদ্ভুত ঘটনার বিবরণ স্বতন্ত্ররূপে বর্ণন করিব।

এই ভীষণ আক্রমণে শুক্তের সপ্তদশ বীরপুত্রের মধ্যে পাঁচজন ও চন্দাবতবংশের প্রধান প্রধান কয় জন ও সালুম্ব্রাবংশের তিন জন বীর সমরশায়ী হন। সেই মহাপুরুষগণ স্বজাতির লুপ্তপ্রায় গৌরব পুনরুদ্ধৃত করিয়া অমর-ভবনে গমন করিলেন। অন্তলদুর্গ অমূল্য বীররুধিরের বিনিময়ে অধিকৃত হইল। এই অদ্ভুত আত্মোৎসর্গে চন্দাবত ও শুক্তাবত উভয় বংশেরই চারণগণ উভয় বংশের যশোঘোষণা করিতে লাগিল।

---

* এই নির্জ্জন প্রস্তরময় স্থান—পার্ব্বতী, চম্বল ও ক্ষিপ্রধর নদীত্রয়ের মধ্যবর্ত্তী সমতল ক্ষেত্রে অবস্থিত।

এই সকল উপর্য্যুপরি পরাজয়ে জাহাঙ্গীর নিতান্ত ভীত হইয়া উঠিলেন। তিনি রাণাকে নিষ্পেষিত করিবার জন্য যুদ্ধের বিরাট আয়োজন আরম্ভ করিলেন। এবার তিনি স্বয়ং সৈন্যাপত্য গ্রহণ করিয়া আজমীরে সৈন্যাবাস সংস্থাপন করিলেন। তাঁহার নিজের তত্ত্বাবধানে যুদ্ধের সমস্ত উদ্যোগ সম্পন্ন হইল। রাণার পরাজয়বিষয়ে এবার তিনি এত নিঃসন্দেহ হইলেন যে, আপনার থাকা আর আবশ্যক বলিয়া মনে করিলেন না। তিনি নিজ-পুত্র পর্ভেজকে সৈন্যাপত্যে বরণ করিয়া স্বয়ং রাজধানীতে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় পুত্রকে এই মর্ম্মে উপদেশ দিয়া গেলেন যে, "যদি রাণা কি তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র কর্ণ তোমার শিবিরে আগমন করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের পদমর্য্যাদার উপযোগী অভ্যর্থনা করিবে এবং তদীয় রাজ্যের অধিবাসিবৃন্দের উপর কোন উৎপাত করিবে না।

এ দিকে শিশোদীয়াধিপতি অমরসিংহ উপর্য্যুপরি বিজয়লাভে প্রোৎসাহিত হইয়া সমর-সজ্জায় সজ্জিত হইতে লাগিলেন। অধীনতা স্বীকারের চিন্তাও এক্ষণে তাঁহার মনে উদিত হয় নাই। তিনি বিজয়োন্মাদিনী মহতী সেনা লইয়া খাম্‌নোর গিরিপথে মোগলসেনার সম্মুখীন হইলেন। ভীষণ সমরানলে রণস্থল অগ্নিময় হইয়া উঠিল। রক্তস্রোতে গিরিপথ প্রচণ্ড নিঝরিণীর আকার ধারণ করিল। মুহূর্ত্তমধ্যে সেই মহতী মোগলসেনা প্রচণ্ড ঝটিকার সম্মুখে মেঘের ন্যায় যেন কোথায় উড়িয়া গেল। অধিকাংশই সেই সমরাঙ্গনে সমাধিনিহিত হইল। যাহারা জীবিত রহিল, তাহারা প্রাণভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে আজমীরাভিমুখে পলায়ন করিল। মোগল ঐতিহাসিক স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন যে, খাম্‌নোরের যুদ্ধের দিন মিবারের সবিশেষ গৌরবের দিন। এই যুদ্ধ ১৬১১ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত হয়। এই পরাজয় মোগলসেনার পক্ষে সম্পূর্ণ লজ্জাকর। কারণ, মোগলসৈন্য সংখ্যায় অনন্ত ও অস্ত্র-শস্ত্রে সবিশেষ সুসজ্জিত ছিল এবং ইহা মোগল সাম্রাজ্যের বিপুল সম্পত্তির অনুরূপ পরিচ্ছদ ও খাদ্যসামগ্রী দ্বারা সংযোজিত ছিল। তথাপি সেই মহতী মোগল সেনা-বাহিনী সেই ক্ষুদ্র প্রচণ্ড রাজপুতবাহিনীর নিকট পরাস্ত হইল।

জাহাঙ্গীর তৎকালে লাহোরে ছিলেন। তিনি পুত্র পর্ভেজকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে—"তুমি নিজ পুত্রকে মহাবৎ খাঁর অধিনায়কত্বে রাখিয়া স্বয়ং আমার শিবিরে চলিয়া আসিবে।" পর্ভেজ পিতৃ-আদেশ পালন করিলেন। তিনি মহাবৎ খাঁর অধিনায়কত্বে নিজ পুত্র ও কতিপয় সামন্তকে রাণার গতি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য রাখিয়া নিজে লাহোরাভিমুখে গমন করিলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র তাঁহা অপেক্ষা অধিকতর সৌভাগ্যবান্ হইতে পারেন নাই। তিনি রাণা কর্ত্তৃক রণে পরাস্ত ও হত হইলেন। কিন্তু রক্তবীজের বংশ নির্ম্মূল হইবার নহে, একজন রক্তবীজের রক্তে শত শত রক্তবীজ উৎপন্ন হইতে লাগিল। একটি মোগল বিনষ্ট হইল, অমনি শত শত মোগল আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করিতে লাগিল। অমরসিংহ পিতার উপযুক্ত সন্তান। তাঁহা হইতে পিতার কীর্ত্তি লোপ পায় নাই। পিতার মৃত্যুর পর তিনি মোগলদিগের সঙ্গে সপ্তদশবার যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছেন। প্রতি যুদ্ধেই জয়লক্ষ্মী তাঁহাকে বরণ করিয়াছেন। কিন্তু সে বিজয়-মুকুট তাঁহার বীরবৃন্দের রক্তে অভিষিক্ত হওয়ায় তাঁহার পক্ষে শেলসম হইয়া উঠিল। প্রতি রণক্ষেত্রেই মিবারের বীরচূড়ামণিগণ রণদেবীর নিকট বলি পড়িতে লাগিলেন। অমরসিংহ শূন্য-কোষ পূর্ণ করিতে ও হত বীরবৃন্দের স্থানে নব বীরবৃন্দের সংযোজনা করিতে অবসর পাইলেন না। এ দিকে জাহাঙ্গীর পুনঃ পুনঃ পরাজয়ে উন্মত্তপ্রায় হইয়া সমস্ত মোগলশক্তি সমবেত করিয়া যোগ্যতম পুত্র যুবরাজ খুরমকে মিবারাভিমুখে প্রেরণ করিলেন। এই খুরমই ইতিহাসে সাজিহান নামে খ্যাত হইয়াছেন। জাহাঙ্গীরের পর ইনিই দিল্লীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হন।

আবার রাণা ও তদীয় বীরপুত্র কর্ণ—মিবারের অধিকার-প্রদেশ হইতে বাছিয়া বাছিয়া সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। কিন্তু নিরন্তর রণে বীরভূমি মিবার বীর-শূন্য হইয়া পড়িয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদিগের সবিশেষ চেষ্টাতেও অতি অল্পসংখ্যক মাত্র সৈন্য সংগৃহীত হইল। এই নগণ্য সৈন্য লইয়া রাণা বীর পুত্রসহ সেই অগণ্য মোগল-সৈন্যের সম্মুখীন হইলেন। কিন্তু বালির বাঁধ কয় দিন সাগরের বেগ ধারণ করিতে পারে? এতদিন যে বীরবৃন্দের সাহায্যে মিবারের বীরচূড়ামণি প্রতাপ ও তদীয় বীরপুত্র অমরসিংহ—মোগল-শক্তিকে প্রতিহত করিয়া আসিতেছিলেন, আজ সেই বীরবৃন্দের অভাবে

প্রতাপ-পুত্র অনন্ত-কীর্ত্তি অমরকে সেই মোগল-শক্তির নিকট নত-শির হইতে হইল! হায়! যে সুবর্ণসূর্য্যমণ্ডল-পরিশোভিত লোহিত ধ্বজা অষ্ট শতাব্দীর অধিককাল সদর্পে মিবারের স্বাধীন গগনে উড্ডীয়মান হইয়া আসিতেছিল, আজ সেই মিবার-গৌরব লোহিত ধ্বজাকে জাহাঙ্গীরের পুত্রের নিকট মস্তক অবনত করিতে হইল! এত দিনে হিন্দু-স্বাধীনতা-সূর্য্য যবনরাহুগ্রস্ত হইয়া ভারতকে অনন্ত তিমিরে ভাসাইয়া গেল! হায়! সে সূর্য্য ভারত-গগনে আর উদিত হইল না! যে তামসী নিশি আজ আসিল, তাহা আর পোহাইল না! হায়! এত দিন হইল, আজও পোহাইল না!! *

মহাপ্রাণ অমরসিংহ অধীনতায় রাজত্ব করা অপেক্ষা কুটীরবাসী হওয়া শ্রেয়ঃ মনে করিলেন। তিনি নিজ পুত্র কর্ণকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া নগরের অদূরে গিয়া আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। মৃত্যুকালে পিতা যে উপদেশ দিয়া গিয়াছিলেন, এতদিনে সেই উপদেশ প্রতিপালন করিতে আরম্ভ করিলেন। দারিদ্র্য-ব্রত ব্যতীত মিবারের স্বাধীনতা রক্ষা হইবে না, আজ মিবারের স্বাধীনতা-রত্ন হারাইয়া অমরসিংহ পিতার মৃত্যুকালীন এই উপদেশ প্রতিপালন করিতে আরম্ভ করিলেন। ব্রতের ফল তিনি পাইলেন, কিন্তু মিবার পাইল না। দারিদ্র্য-ব্রতের মোহিনী শক্তি বলে তাঁহার স্বাধীনতা রক্ষা হইল—কিন্তু ব্রত উপযুক্ত সময়ে আরম্ভ না করায় মিবার সে ব্রতের ফলে বঞ্চিত হইল। আজ অমরসিংহ এই ব্রতের বলে আত্মোৎসর্গের পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন। তিনি প্রৌঢ়াবস্থায় পুত্রকে রাজসিংহাসন প্রদান করিয়া স্বয়ং যতিবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক জীবনের অবশিষ্ট সময় অতিবাহিত করিলেন! ধন্য অমরসিংহ, ধন্য তোমার মহাপ্রাণতা! ধন্য তোমার আত্মোৎসর্গ!

---

* ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে অমরসিংহ মোগল-সৈন্যের নিকট পরাস্ত হন, এবং যুবরাজ খুরমের প্রস্তাবিত সন্ধিতে সম্মত হন।

হৃদয়োচ্ছ্বাস

বিজ্ঞপ্তি

কতিপয় বন্ধুর বিশেষ অনুরোধে "আর্য্যদর্শনে" প্রকাশিত সম্পাদকের রচনাবলীর মধ্যে, রাজনীতি ও সমাজবিজ্ঞান-সংক্রান্ত কতিপয় প্রবন্ধ একত্র সংগ্রহ করিয়া স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রচারিত হইল। শুদ্ধ বন্ধুগণের প্ররোচনা-প্রেরিত উত্তেজনায় এই গ্রন্থের উৎপত্তি হয় নাই। সাময়িক পত্রিকা-লিখিত সন্দর্ভের অতি অল্পসংখ্যকই সাধারণের বিষয়-গোচর থাকে। অনুসন্ধিৎসাশালী পঠনশীল ব্যক্তি ব্যতীত অন্যের নিকটে তাহাদের অস্তিত্ব অবাস্তব। কিন্তু অর্দ্ধশিক্ষিত চৌর্য্যপ্রিয়দলের তাহার প্রধান উপজীব্য হইয়া উঠে। উপরে যাহা বলা হইল, তাহার মধ্যে কল্পনার বর্ণে অনুরঞ্জিত বর্ণমাত্রও নাই। হীনাবস্থ বর্ত্তমান বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের এক দলের চৌর্য্যই আজকাল প্রধান অবলম্বন—একমাত্র ব্যবসায়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ এই স্থলেই নির্দ্দেশিত হইতে পারে "স্বজাতিপ্রেম ও স্বদেশানুরাগ" "আধুনিক ভারত" ও "ভারতের ভাবী পরিণাম" এই কয়েকটি অবলম্বন করিয়া কিছুদিন হইল, এক বক্তৃতা-পুস্তক প্রচারিত হইয়াছে। অধিক কি, হৃদয়োচ্ছ্বাসের প্রণেতার অন্যতম গ্রন্থ মিলের "অবতরণিকার" প্রথমাংশের সুব্যক্ত ছায়ায় একখান জীবনীর সূচনা পর্য্যন্তও হইয়াছে। এইরূপেই মূলীভূতের অসম্মাননা ও নকলের আধিপত্য হয়। তাই বলিতেছিলাম, "হৃদয়োচ্ছ্বাসের" জন্মের কারণ একাধিক।

এই পুস্তকনিবদ্ধ সন্দর্ভসকলে যথেষ্ট উদ্দীপনার প্রসব ও ভাব-তরঙ্গের খেলা আছে; এজন্য গ্রন্থের আখ্যা "হৃদয়োচ্ছ্বাস" দেওয়া গিয়াছে। ইহাতে ক্রমান্বয়ে দশটি বিষয়ের বিবরণাত্মক প্রবন্ধ সমাবেশিত আছে। তন্মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রস্তাব আদৌ 'হিন্দুমেলা' ও 'বঙ্গভাষাসমালোচনী' সভায় পঠিত হইবার জন্য বিরচিত হয়। এই সকল রচনার ভাষা বা ভাব-সম্বন্ধে সাধারণকে আমাদের আত্ম-অভিমতি প্রদান করা অপেক্ষা, বহুজ্ঞ ব্যক্তিগণের মতের সারাংশ নির্দ্দেশ করা আবশ্যক। গুণগ্রাহী পাঠক তাহা দেখিয়া রচয়িতার গভীর প্রত্নতত্ত্বালোচনা, কাব্যোপম সুন্দর বর্ণনাচ্ছটা ও সহৃদয় ভাবোচ্ছ্বাসাদির বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন। বহু আড়ম্বর করা নিষ্প্রয়োজন। এই স্থলে আমরা কেবল 'অতীত ও বর্ত্তমান ভারত' সম্বন্ধে বিজ্ঞগণের মতামত প্রকটন করিলাম।

"অতীত ও বর্ত্তমান ভারত" কলিকাতাস্থ "বঙ্গভাষাসমালোচনী সভার" ৬ষ্ঠ বার্ষিক ১ম ও ২য় অধিবেশনে (১) আলবার্ট হলে প্রদত্ত হয়। উভয় দিবসেই মহামান্য রেভারেণ্ড শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসনে আসীন ছিলেন। সভাস্থলে সমবেত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, বিদ্যার্থিবৃন্দ ও সমাচার-পত্রিকাসম্পাদক প্রভৃতির উপস্থিতিতে সভার নয়ন-মনোরম এক অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছিল। সে যাহা হউক, সভাপতি মহাশয় সেই সুদীর্ঘ ও প্রীতিপদ, মহান্ ভাবব্যঞ্জক অথচ গবেষণা-সঙ্কুল বক্তৃতার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তাঁহার মতে বক্তৃতার ভাষা 'অমৃতময়'। (২)

আদি ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয় আমাদিগকে কোন পত্রে (৩) লিখিতেছেন :—যোগেন্দ্রবাবুর প্রবন্ধ পাঠ করিয়া পুলকিত হইলাম। যদ্যপি কোন কোন বিষয়ে তাঁহার সহিত আমার মতের ঐক্য নাই, তথাপি লেখাটি অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে বলিতে হইবে। তিনি আমাদের বক্তাদিগকে যে বঙ্গভাষায় বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করেন, (৪) ইহাতে আমি সন্তুষ্ট হইলাম।

---

(১) ১২৮৭ সাল, ২৭শে বৈশাখ ও ২রা জ্যৈষ্ঠ।

(২) 'বঙ্গভাষাসমালোচনী' সভার কার্য্য-বিবরণ।

(৩) ১২৮৭ সাল, ২২শে শ্রাবণের পত্র।

(৪) 'অতীত ও বর্ত্তমান ভারতের বক্তার যোগেন্দ্র

সাধারণ সম্পাদকও ইহাকে "চিন্তাপ্রসূত * বলিয়াছেন ইত্যাদি। আর অধিক মন্তব্য-উদ্ধারের প্রয়োজন নাই। সম্পাদকের অন্যান্য রচনা-সম্বন্ধে আমরা আমাদের স্বতন্ত্র কোন মন্তব্য প্রকাশ করিতে চাহি না। সুধী পাঠকগণের উপর তাহার ভার অর্পণ করিতেছি। তাঁহারা পাঠ করিয়া দেখুন যে, উক্ত বর্ণনার মধ্যে কবিত্ব ও গবেষণা, নীতিজ্ঞতা ও ভূয়োদর্শন, ভাষার পারিপাট্য ও ঔদার্য্যগুণের সত্তা বর্ত্তমান কি না। ফলে রচনাবলী যে মৌলিকতা-বিবর্জ্জিত নহে, এ নির্দ্দেশ অত্যুক্তিমাত্র।

ভারতবিষয়ক এই সকল চিত্র যদি ভারতীয়-গণের অন্তর-মুকুরে প্রতিফলিত হয়, তাহা হইলেই এই পুস্তক-মুদ্রণের উদ্দেশ্য সফল।

২৫নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট,
১২ই মাঘ, ১২৮৭ সাল

শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায়।
সঙ্কলয়িতা।

বাবুর) নিম্নোক্ত লেখা পাঠ করিয়া রাজনারায়ণ বাবু এ কথা বলিয়াছেন :—

* সাধারণী ; ১৪ ১৪ ভাগ, ১৬ সংখ্যা [১৮ই শ্রাবণ, ১২৮৭ সাল]।

"এই প্রস্তাবটি বঙ্গভাষাসমালোচনী সভায় পঠিত হয়। বঙ্গ-ভাষাসমালোচনী সভার অধ্যক্ষগণ বঙ্গ-ভাষার চর্চ্চার জন্য যেরূপ যত্ন ও আত্মত্যাগ স্বীকার করিতেছেন, তাহাতে তাঁহাদিগকে আমরা অন্তরের সহিত ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। যে দিন দেখিব যে, অন্যান্য সভার অধ্যক্ষগণ তাঁহাদিগের উদার দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তন করিয়া বঙ্গভাষায় বক্তৃতাদি আরম্ভ করিয়াছেন, সেই দিন বুঝিব যে, আমাদিগের প্রকৃত জাতীয় জীবন আরম্ভ হইয়াছে। [আর্য্যদর্শন, ৬ষ্ঠ খণ্ড ১ম সংখ্যা (১২৮৭, বৈশাখ)]

হৃদয়োচ্ছ্বাস

বা

ভারতবিষয়ক প্রবন্ধাবলী

স্বজাতিপ্রেম ও স্বদেশানুরাগ

অদ্য উনবিংশ শতাব্দী। চতুর্দ্দিকে সংস্কার বা পরিবর্ত্তনের স্রোত তর্ তর্ বেগে প্রবাহিত হইতেছে। ধর্ম্মের মূল পরিবর্ত্তিত হইতেছে, সামাজিক নীতির আদর্শ পরিবর্ত্তিত হইতেছে, রাজনীতি নূতন ভিত্তির উপর সংস্থাপিত হইতেছে, জীবনের লক্ষ্য নূতন আকার ধারণ করিতেছে। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যেন আবার নূতন করিয়া গঠিত হইতেছে। এই বিশ্বব্যাপী প্রলয়-কালে—যখন সকল বস্তুই আমূল আলোড়িত হইতেছে, যখন সুসভ্য দেশমাত্রই নবীন উৎসাহে মাতিয়া উঠিতেছে—জগতের আদি সংস্কারক, সভ্যতামার্গের প্রথম অধিনায়ক, মানবকুলের শৈশবদোলা, ভারত কেন ঘুমাইয়া রয় ?

যে তারে এক দিন আর্য্য-হৃদয় পরস্পর গ্রথিত ছিল, যে তারে একদিন ভারতবাসিমাত্রেরই হৃদয় অনুস্যূত ছিল, সে তার আজ কেন ছিন্ন ? যে তারের বৈদ্যুতিক বলে একদিন কতিপয়মাত্র আর্য্য ঔপনিবেশিক অমানুষী শক্তি লাভ করিয়াছিলেন, যে তারের বৈদ্যুতিক সংযোগে একটি আর্য্য-হৃদয়ে আঘাত লাগিলে একদিন সমস্ত আর্য্য-হৃদয় আহত হইত, আজ কেন সেই তার বিযুক্ত ? ভারতকে জগতের আদর্শ বলিয়া পরিচয় দিয়া যে আর্য্যজাতি এক দিন স্বদেশানুরাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, যে আর্য্যজাতি আপনাদিগকে "আর্য্য" (পূজ্য, বা মানবকুলের শ্রেষ্ঠ) এই উপাধি প্রদান করিয়া একদিন স্বজাতিপ্রেমের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সে আর্য্যজাতি আজ কোথায় ? স্বজাতি-প্রেম ও স্বদেশানুরাগের সে জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আজ কোথায় ?

যৎকালে ঋগ্‌বেদ-প্রণেতা ঋষিগণ কতিপয় বীর-পুরুষ ও কতিপয় বণিক-সমভিব্যাহারে ধীরে ধীরে হিন্দুকুশ বাহিয়া সিন্ধু উত্তরণ পূর্ব্বক পঞ্চনদ প্রদেশে অবতরণ করেন, তখন তাঁহারা কয়জন ছিলেন ? রাক্ষসদিগের উপদ্রবে যখন ঋষিদিগের পদে পদে তপোবিঘ্ন ঘটিত, তখন তাঁহারা কয় জন ছিলেন ? অভ্রভেদী হিমশৃঙ্গ হইতে পাতাল-ভেদী দক্ষিণ-পয়োধি পর্য্যন্ত এবং প্রবল স্রোতস্বিনী সিন্ধু হইতে সুদূর ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত এই বিশাল ভারত-ক্ষেত্রের প্রায় সমস্তই তখন অসুর ও রাক্ষসাদি দ্বারা অধিষ্ঠিত ছিল। এই বিশাল ভারতক্ষেত্রের এক সহস্রাংশমাত্রও তৎকালে আর্য্যগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত ও উপনিবেশিত হয় নাই। ভারতের আদিম অধি-বাসীদিগের সংখ্যার সহিত তুলনায় তদানীন্তন আর্য্য ঔপনিবেশিকদিগের সংখ্যা অনন্ত সাগরে জলবিন্দু-পতনের ন্যায় বিলীন হইয়া যাইত! অসুর ও রাক্ষসাদি যে শুদ্ধ সংখ্যায় অনন্ত ছিল, এরূপ নহে; তাহাদিগের প্রবল পরাক্রমের অজস্র দৃষ্টান্ত প্রাচীন ঋগ্‌বেদ হইতে আধুনিক কাব্য-পুরাণাদি পর্য্যন্ত সমস্ত সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায়। তবে কি বলে ও কি সাহসে সেই অসংখ্য ও প্রবল শত্রুগণের বিরুদ্ধে

কতিপয়মাত্র আর্য্য যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন? কি সাহসেই বা তাঁহারা শক্র সমাচ্ছন্ন ভারত-ক্ষেত্রে প্রথম প্রবেশ করিলেন? তাঁহাদের জীবনে কি মায়া ছিল না? অসুর-রাক্ষসাদির প্রবল পরাক্রমের সংবাদ কি তাঁহাদিগের কর্ণগোচর হয় নাই? জীবনে মায়া না থাকিলে তাঁহারা স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া অসংখ্য গিরি নদী উত্তরণপূর্ব্বক সুদূর প্রাচ্য প্রদেশে কখনই আগমন করিতেন না। অধিকতর সুখের আশা না থাকিলে তাঁহারা জন্মভূমির মায়া জন্মের মত পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না। আর বৃহস্পতি যে আর্য্যদিগের উপদেষ্টা, তাঁহাদিগের বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছিল, এ কথা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়, এবং চাণক্য যে আর্য্যদিগের মন্ত্রী, তাঁহারা যে ভারতের শূদ্রাসুর-রাক্ষসাদির প্রবল পরাক্রমের বিষয় অবগত ছিলেন না, এ কথাও বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না। তবে তাঁহারা কি বলে ও কি সাহসে গিরি-নদী সাগর পরিবেষ্টিত অনন্ত ভারত-ক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন এবং অবতরণ করিয়া কি বলে ও কি সাহসেই বা প্রবলপরাক্রান্ত আদিম অধিবাসীদিগের সহিত ঘোরতর সমরে প্রবৃত্ত হইলেন? কি বলেই বা তাঁহারা অবশেষে রাক্ষস ও অসুরকুল ধ্বংস করিয়া অসীম ভারত-ক্ষেত্রে একাধিপত্য বিস্তার করিলেন? কি বলেই বা তাঁহারা শেষে অসংখ্য বিজিত আদিম অধিবাসীদিগকে বিনয়াবনত দাস করিতে সমর্থ হইলেন? এ মর্ম্মভেদী গভীর প্রশ্নের কে উত্তর দিবে? স্বজাতি-প্রেমের বলের এরূপ উদাহরণ আর কোথায়?

যৎকালে অসংখ্য জেরাক্সিস্-সেনা প্রবল সাগরতরঙ্গের ন্যায় উত্তর গ্রীস প্লাবিত করিয়া থার্ম্মোপিলি-সমীপে উপনীত হয়, তখন কি সাহসে ও কি বলে বীরচূড়ামণি লিওনিডাস ত্রিশতমাত্র সহচর সমভিব্যাহারে সেই প্রবল সাগরতরঙ্গের প্রতিরোধে বক্ষ পাতিয়া দিয়াছিলেন? কি আভ্যন্তরীণ বলেই বা সালামিসযুদ্ধে কতিপয় গ্রীক যোদ্ধা জেরাক্সিসের অনন্ত সেনাসাগরের অপ্রতিহত গতি প্রতিরুদ্ধ করিলেন?

যৎকালে বীরবর হানিবল মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় ইতালী বিলোড়ন পূর্ব্বক অবশেষে কানিসমরে অধিকাংশ রোমীয় জননীকে পুত্র-বিরহে ও অধিকাংশ রোমীয় পত্নীকে পতি-বিরহে বিধুরা করিয়াছিলেন, তখন কোন্ দৈবীশক্তিবলে কতিপয় দিবসের মধ্যেই রোমরাজ্য অনন্ত সেনা সংগ্রহ করিলেন?

যৎকালে আফ্রিকবিজয়ী সিপিয়ো জামাসমরে অজেয় হানিবল্‌কে পরাজিত করিয়া দুরন্ত সেনা-সমভিব্যাহারে হানিবলের প্রতিহিংসাবিধানার্থ কার্থেজাভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলেন, তখন কি আভ্যন্তরীণ বলের প্রবোচনায় কার্থেজ-রমণীগণ রজ্জু ও অস্ত্র প্রস্তুতকরণার্থ আপনাদিগের কেশমুণ্ডন ও অলঙ্কারোন্মোচন করিয়াছিলেন?

যৎকালে দৃপ্ত বৃটিশ-সিংহ সোদর-প্রতিম আমেরিকাবাসীদিগের ক্রন্দনে বধির হইয়া তাঁহাদিগের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহাদিগের উপর করস্থাপনে বদ্ধপরিকর হন, তখন কি বলে অস্ত্রশস্ত্রে অসজ্জিত, শিল্পবাণিজ্য-বিসর্জ্জিত আমেরিকা বৃটিশ-সিংহের গতিরোধ করিতে সাহসিনী হন? যখন আমেরিকা বৃটিশ-সিংহের কোপানলে পতিত হন, তখন আমেরিকাকেও সামান্য সূচিকা হইতে পারধেয় বস্ত্র পর্য্যন্ত সমস্ত গৃহসামগ্রীর জন্যই বৃটনের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইত। ভারত অপেক্ষাও আমেরিকা তখন বৃটনের অধিকতর মুখাপেক্ষী ছিলেন; ভারতে স্বদেশজাত অনেক দ্রব্য পাওয়া যায়, কিন্তু তৎকালে আমেরিকাকে চিনিটি পর্য্যন্তের জন্য বৃটনের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইত। এরূপ অবস্থায় কি বলে আমেরিকা দৃপ্ত বৃটিশ-সিংহের কোপানল উদ্দীপিত করিতে সাহসিনী হইলেন? কি আভ্যন্তরীণ তেজ তাঁহাদিগকে বহির্জ্জাত দ্রব্য মাত্রেরই ব্যবহার হইতে একেবারেই নিরস্ত করিল? কোন্ বলেই বা তাঁহারা অচিরকালমধ্যেই আপনাদিগের সমস্ত অভাব বিদূরিত করিতে পারিলেন? কোন্ বলেই বা নিরস্ত্র বীরশূন্য মার্কিণ ভূমি অচিরকালমধ্যে অনন্ত-বীর-প্রসবিনী হইয়া উঠিলেন? কোন্ বলেই এই অনতিপ্রৌঢ় বীরমণ্ডলী বৃটিশ কেশরীদিগকে রণে পরাস্ত করিলেন? যে একদিন বৃটনের পদভরে বিকম্পিত, যে আমেরিকা একদিন কিশোর-বয়স্কা বালিকার ন্যায় সকল বিষয়ে বৃটনের মুখাপেক্ষিণী ছিল, যে আমেরিকা একদিন অনন্ত জাতি-সাগরে একটি নগণ্য জলবুদ্বুদমাত্র ছিল, আজ কোন্ বলে সেই আমেরিকা—জগতের সভ্য জাতিগণের অগ্রগামিনী? কেন আজ সেই স্বগর্ভচ্যুতা দুহিতার বীরদর্পে বৃদ্ধ বৃটনজননী কম্পিতকলেবরা?

অজেয় জর্ম্মাণ সেনা রাজরাজেশ্বরী প্যারীনগরী অবরোধ করিল; দিন গেল, পক্ষ গেল, মাস গেল,

অর্দ্ধ-বৎসর অতীত হইল; ক্রমে ধনাগার শূন্য, অস্ত্রাগার শূন্য, খাদ্যাগার শূন্য; ক্রমে শৃগাল, কুক্কুর, অশ্ব, মূষিক, ভেক প্রভৃতি মনুষ্যের অখাদ্যও উপাদেয় খাদ্যমধ্যে পরিগণিত হইল, তথাপি কোন্ আভ্যন্তরীণ বলে বলীয়ান্ হইয়া বীরকেশরী ফরাসীগণ অদম্য বীরদর্পে শত্রুসেনার ভীষণ গর্জ্জন উপেক্ষা করিলেন? কোন্ বলেই বা তাঁহারা তাদৃশ বিপৎপাতের পরও অচিরকালমধ্যেই পরাজয়ের নিষ্ক্রয়স্বরূপ অগণিত মুদ্রা উত্তোলিত করিলেন? কি বলেই বা সেই মৃতপ্রায় জাতি প্রতাপে আবার দিঙ্মণ্ডল পরিপূরিত করিল?

আবার যাও, একবার ইতালীর দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ কর। যে ইতালী এক সময়ে তদাপরিজ্ঞাত জগতের অধীশ্বরী ছিলেন, যে ইতালী ইউরোপে দুইবার সভ্যতা ও স্বাধীনতা বিস্তার করিয়াছিলেন, সেই ইতালী প্রায় সহস্র বৎসর দাসত্বে জর্জ্জরিতপ্রায় হইয়াছিলেন; ইতালীর নাম লুপ্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল; ইতালীর ইতিহাস—বৈদেশিক প্রবঞ্চকদের অসত্য বর্ণে রঞ্জিত হইয়া বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল, ইতালীর বীরপুরুষগণ নির্ব্বাসিত, জল্লাদহস্তে হত, কারাগারে রুদ্ধ বা অন্যান্য নানা নিষ্ঠুর উপায়ে পর্য্যুদস্ত হইতেছিলেন, পুণ্যভূমি ইতালী ভীষণ শ্মশান-ভূমিতে পরিণত হইয়া উঠিয়াছিল; তথাপি কোন্ দৈবী-শক্তিবলে সেই ভীষণ প্রেতভূমি হইতে সেই বীরপুরুষগণের রুধির সিঞ্চনে আবার দুই প্রকাণ্ড বীরতরু অভ্যুত্থিত হইল? কোন্ আভ্যন্তরীণ বলে ঋষিপ্রবর ম্যাট্‌সিনি ও বীর-চূড়ামণি গ্যারিবল্ডী সেই শ্মশান-ভূমিতে বহুদিনের পর আবার জীবন-সঞ্চার করিলেন? কোন্ বলে বলীয়ান্ হইয়াই বা অসংখ্য ইতালীয় বীর-পুরুষ স্বদেশ উদ্ধারব্রতে জীবন আহুতি প্রদান করিলেন? আজ কিঞ্চিদধিক সার্দ্ধ-দ্বিশত বৎসরমাত্র ব্রিটিশ কেশরী ভারতে পদার্পণ করিয়াছে। এই অল্পকালমধ্যে কোন্ দৈবী-শক্তিবলে ব্রিটিশকেশরীর গর্জ্জনে সমস্ত ভারত কম্পান্বিত? আজ কয়দিন হইল, কয়জনমাত্র শ্বেত বণিক্ পশ্চিমসাগরের উপকূলে আসিয়া কেমন অদ্ভুত কৌশলে ধীরে ধীরে গগনস্পর্শী হিমশৃঙ্গ হইতে সিংহল ও আফগানস্থান হইতে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত ভারতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী আধিপত্যবিস্তার করিল? কেন এই কয়েকটিমাত্র শ্বেতপুরুষের সম্মুখে মোগল, পাঠান, মহারাষ্ট্র, শিখ—একে একে সকলেই বায়ুর নিকট তুষের ন্যায় উড়িয়া গেল? কেন আজ এই গুটিকত শ্বেতপুরুষের সম্মুখে বিংশতি কোটি ভারতবাসী মৃৎপুত্তলীর ন্যায় নিস্পন্দ নীরব? কেন আজ কাশ্মির, সিন্ধু, বরদা, হোল্‌কার, সিন্ধিয়া, নিজাম, নেপাল, ভুটান—সকলেই এই শ্বেতচরণে লুণ্ঠিত-শির? কেন আজ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কনিষ্ঠের নিকট গললগ্নী-কৃতবাস? রাজরাজেশ্বর হইয়া কেন আজ আমরা পথের ভিখারী? রত্নপ্রসবিনী জননীর সন্তান হইয়া কেন আজ আমরা অন্নের কাঙ্গালী? জগতের সভ্যতামার্গের নেতা হইয়া, কেন আজ আমরা লজ্জা নিবারণের জন্য শ্বেতদ্বীপের মুখাপেক্ষী? জগতের শিক্ষক হইয়া কেন আজ আমরা সকলের অশ্রদ্ধা-ভাজন? বীরত্বরত্নাকর ভারতের সন্তান হইয়া কেন আজ আমরা সকলের চরণতলে? যে সিংহাসন সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয় রাজগণ কর্ত্তৃক অলঙ্কৃত হইয়াছিল, কেন আজ সেই সিংহাসন শূন্য? যে বেদী ঋক্ ও সামগায়ী ঋষিবৃন্দ দ্বারা উদ্বোধিত হইয়াছিল, কেন আজ সেই বেদী নীরব? যে ক্ষত্রিয়জানু ও ক্ষত্রিয়-শির কেবল অভীষ্টদেবত ও বেদগায়ী ব্রাহ্মণগণের নিকটেই বিনত হইত, কেন আজ সেই ক্ষত্রিয়জানু ও ক্ষত্রিয়-শির সদা বিলুণ্ঠিত? যে আর্য্য-পতাকা এক দিন জগতে হিন্দুজয়-ঘোষণা করিয়াছিল, কেন আজ সেই আর্য্যজাতির সময় নিরন্তর মসীমর্দ্দনে ও পাদুকা-বহনে অতিবাহিত হইতেছে? যে আর্য্য-জাতির সেনা এক দিন পারস্য, আফগান বিদলিত করিয়া সুদূর স্কন্দনভ (স্কান্দিনেভিয়া) পর্য্যন্তও উন্মথিত করিয়াছিল, দূরতম আমেরিকা পর্য্যন্তও বিজয়পতাকা উড্ডীন করিয়াছিল, কেন আজ জগদুন্মাথিনী সেই আর্য্য-সেনা মন্ত্রৌষধি রুদ্ধবীর্য্য ভোগীর ন্যায় নিস্পন্দ ও নির্জীব? যে আর্য্যজাতির রণতরি এক দিন পূর্ব্বে, দক্ষিণে ও পশ্চিমে—জাবা, সুমাত্রা, সিংহল, সকুট্রা, মিশর প্রভৃতি আলোড়িত করিয়াছিল, কেন আজ সেই আর্য্যজাতি সমুদ্র-যাত্রায় ভীত? যে আর্য্য-ললনা একদিন বক্ষঃস্থল হইতে স্তন্যপায়ী শিশুকে উন্মোচিত করিয়া রণক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়াছেন, কেন আজ সেই আর্য্যললনা পুত্রকন্যাগণের সাহসিকতা ও বীরত্ব-প্রদর্শনের প্রতিকূল? যে আর্য্য-বীরনারী একদিন স্বামী সঙ্গে অসিহস্তে সমর-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া স্বদেশহিত-ব্রতে সোনার অঙ্গ আহুতি প্রদান করিয়াছিলেন,

কেন আজ সেই আর্য্য-নারী স্বামীর স্বদেশানুরাগ-প্রদর্শনের অন্তরায়? যে আর্য্য-বীরনারী একদিন ধনু নির্ম্মাণার্থ অঙ্গের সুবর্ণাভরণ খুলিয়া দিয়াছেন, আবার সেই ধনুকের ছিলা নির্ম্মাণার্থে একটি একটি করিয়া মস্তকের কেশও কাটিয়া দিয়াছেন, কেন আজ সেই আর্য্য-নারী স্বদেশ-হিত-ব্রতে আত্মত্যাগ-বিধুরা?

যে আর্য্যাবর্ত্ত একদিন কুরুক্ষেত্র-রণে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা প্রেরণ করিতে পারিয়াছিলেন, কেন আজ সেই বীরভূমি বীরশূন্য? যে আর্য্যতেজ একদিন দিগ্বিজয়ী আলেক্‌জান্দারের অপ্রতিহত গতিরোধ করিয়াছিল, কেন আজ সেই আর্য্যতেজ প্রভাহীন? যে আর্য্যপ্রতাপের সম্মুখীন হইতে এক দিন বীরবর মহম্মদ ঘোরীও ভীত ও চকিত হইয়াছিলেন, কেন আজ সে প্রতাপ তেজোহীন? সহস্র বৎসরের দাসত্বেও যে প্রতাপ নির্ব্বাপিত হয় নাই, কেন আজ সে প্রতাপ নিষ্ক্রিয়? রাজপুত-যুদ্ধে, মহারাষ্ট্রীয়-যুদ্ধে, শিখ-যুদ্ধে যে বীর্য্যবহ্নি বিস্ফুরিত হইয়াছিল, কেন আজ সে বীর্য্যবহ্নি নির্ব্বাণপ্রায়? যে ভারতসন্ততিগণ একদিন বীরদর্পে মেদিনী বিকম্পিত করিয়াছিলেন, কেন আজ সেই ভারতসন্ততিগণ বীরত্বে মেষপ্রায়? কি শাপে আজ ভারত শ্মশানপ্রায়? কি শাপে আজ ভারতের জাতীয় জীবন বিলুপ্তপ্রায়?

এ হৃদয়-আলোড়নকারী গভীর প্রশ্নসকলের কে মীমাংসা করিবে? কিসের অভাবে ভারতের এ দুর্গতি? কিসের জন্য পাশ্চাত্য দেশ সকলের এত উন্নতি? এই প্রশ্নের একই মীমাংসা—একই উত্তর। স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতিপ্রেমের অভাব ও সত্তা। স্বদেশহিতব্রতে জীবনের পূর্ণ আহুতির ভাবাভাব। ইহার অভাবে ভারতের এ দুর্গতি—ইহার ভাবে পাশ্চাত্যদেশ সকলের এত উন্নতি। যাও, আমেরিকায় যাও, যাও, শ্বেতদ্বীপে যাও, বীরভূমি ফ্রান্সে যাও, যাও, জগদীশ্বরী ইতালীতে যাও, যাও, জার্ম্মাণীতে যাও, যাও, মৃতোত্থিত গ্রীসে যাও, যাও জগদ্বিজয়ী রুসে যাও, তাঁহাদিগের স্ব স্ব দেশের বিরুদ্ধে একটি কথা বল, দেখিবে, অচিরাৎ অগ্নি জ্বলিয়া উঠিবে! দেখিবে, বালক হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত, মূর্খ হইতে পণ্ডিত পর্য্যন্ত, অধিক কি, বালিকা হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেই ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিবে! জলে স্থলে জঙ্গলে পাহাড়ে—যিনি যেখানে আছেন, স্বদেশ ও স্বজাতি তাঁহার একমাত্র উপাস্য দেবতা, একমাত্র চিন্তার বিষয়। শয়নে, স্বপ্নে, অশনে, উপবেশনে, লেখনে, কথনে, স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতি-প্রেম তাঁহার হৃদয়ে জাজ্বল্যমান! তাঁহার প্রতি কার্য্যে ও প্রতি চিন্তায় স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতিপ্রেম সুস্পষ্টরূপে পরিব্যক্ত। সাহারার ভীষণ মরুভূমিতে, গ্রীন্‌ল্যাণ্ডের তুহিনরাজিসমাচ্ছাদিত অনুর্ব্বর স্বদেশে, হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শিখরে, অসভ্য দস্যুসমাচ্ছন্ন মধ্য-আসিয়ায়—একটি ইউরোপীয় যে যেখানে আছে, স্বদেশের ও স্বজাতির পরিরক্ষণীয়। একটি ইউরোপীয়ের কেশ স্পর্শ কর, একটি ইউরোপীয়ের প্রাণনাশ কর, দেখিবে - তাহার জাতি ও তাহার দেশ, তোমার জাতি ও তোমার দেশকে রসাতলে দিবে—দেখিবে, সেই ক্রোধানলে তোমার জাতি, তোমার দেশ, চিরজীবনের জন্য স্বাধীনতা-হারা হইবে। এক অন্ধকূপ-হত্যার অপরাধে মুসলমানেরা চিরকালের মত ভারত হারাইল। এক মার্গের সাহেবের মৃত্যুতে চীন ব্রহ্ম হুলস্থূল। এক সৈনিক-বধে আবিসিনিয়া সমাকুল! এক দূতবধে আফ-গানিস্থান ওতপ্রোত!

প্রত্যেক ইউরোপীয়ের হৃদয় স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতি-প্রেমে বিচ্ছুরিত। তাঁহার ধর্ম্ম, কর্ম্ম, যাগ, যজ্ঞ, কাম, মোক্ষ সমস্তই—স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতি-প্রেম। তাঁহার স্নেহ, তাঁহার ভক্তি—প্রবলতর হৃদয়ভাব, স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতি-প্রেমের অন্তর্লীন। আমাদিগের রাজ্ঞীর দ্বিতীয় পুত্র ডিউক্ অব এডিনবরা স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতি প্রেমের বশবর্ত্তী হইয়া পত্নী-প্রেমে বিসর্জ্জন দিলেন। ফ্রান্স, ইতালী, আমেরিকা প্রভৃতিতে স্বদেশানুরাগের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া পাঠকগণকে অক্লান্ত করিতে চাহি না। যাহা প্রদত্ত হইল—যদি দৃষ্টান্তের উদ্দীপনা-শক্তি থাকে—ইহাতেই স্বদেশবাসিগণের অন্তরে স্বজাতি-প্রেম ও স্বদেশানুরাগ উদ্দীপিত হইতে পারিবে।

বহু দিনের দাসত্বে স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতি-প্রেম ভারতবাসীদিগের হৃদয় হইতে একেবারে উন্মূলিত হইয়াছে। যে প্রবল স্বজাতি-প্রেমের বলে এক দিন কতিপয়মাত্র আর্য্য ঔপনিবেশিক অনন্ত ভারত-ক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, আবার যে প্রবল স্বজাতি-প্রেমের বলে

এক্ষণে কতিপয়মাত্র শ্বেতবণিক ভারতে অভূতপূর্ব্ব প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছেন, সে স্বজাতি প্রেম ও সে স্বদেশানুরাগ ভারতবাসীর হৃদয় হইতে এক্ষণে অন্তর্ধান করিয়াছে। ইংলণ্ডের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে সেই স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতিপ্রেম ধীরে ধীরে দুই একটি মনীষীর হৃদয় কোটরে প্রবেশ করিতেছে। ইংলণ্ডের উদ্দীপক সাহিত্য ও স্বাধীন ইতিহাস ধীরে ধীরে দুই চারি জনের অন্তরে সেই মূলমন্ত্র—স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতি-প্রেম—উদ্ঘোষিত করিতেছে। ইংলণ্ড! তোমার নিকটে যদি আমরা কোন বিষয়ে ঋণী থাকি, তবে ইহারই জন্য। কিন্তু তোমার ভাষা, তোমার দৃষ্টান্ত ভারতে বিংশতি কোটি অধিবাসীর কয় জনের অধিগম্য? একলক্ষ লোকের নিকটেও ইহা অধিগম্য কি না সন্দেহ। অবশিষ্ট উনবিংশ কোটি একোনশত লক্ষ লোকের স্বজাতি-প্রেম ও স্বদেশানুরাগ-শিক্ষার কি উপায়? ইংলণ্ড! শুনিয়াছি, তোমার অনন্ত ঐশ্বর্য্য! একবার চক্ষু বুজিয়া সেই অনন্ত ঐশ্বর্য্যের কিয়দংশ তোমার অসংখ্য প্রজার উদার শিক্ষায় বিন্যস্ত কর; উদার শিক্ষা-বিধান দ্বারা তোমার বিংশতি কোটি প্রজাকে স্বদেশ-হিত ব্রতে দীক্ষিত কর; তাহাদিগকে স্বদেশহিতব্রতে জীবনকে পূর্ণাহুতি দিতে শিক্ষা দাও; স্বদেশী ও স্বজাতীয় ভ্রাতৃগণের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিতে শিক্ষা দাও; স্বদেশের জন্য ও স্বজাতির জন্য আত্ম ভুলিতে শিক্ষা দাও; স্বদেশের জন্য স্বদেহের রুধির বিন্দু বিন্দু করিয়া বিসর্জ্জন দিতে শিক্ষা দাও, পিতা যেমন শিশুসন্তানকে হাঁটিতে শিখায়, তেমনই ধীরে ধীরে আমাদিগকে স্বাধীনতার পথে লইয়া চল। যখন আমাদিগকে স্বাধীনভাবে চলিতে সমর্থ দেখিবে, তখন আমাদিগকে স্বাতন্ত্র্য ও স্বাবলম্বন প্রদান কর, তোমার জ্যেষ্ঠের সন্ততিগণকে পূর্ব্বগৌরবে প্রতিষ্ঠাপিত কর। ইংলণ্ড! এ সৌভাগ্য কয়জনের অদৃষ্টে ঘটে? ইংলণ্ড! এই অনন্ত কীর্ত্তি তোমার হস্তেই রহিয়াছে! ইংলণ্ড! এই অপ্রাপ্তবয়স্ক জ্যেষ্ঠ-সন্ততিগণের ধন, মান, প্রাণ সকলই তোমার হস্তে। তুমি ইচ্ছা করিলে তাহাদিগের উদার শিক্ষাবিধান পূর্ব্বক তাহাদিগকে পূর্ব্বগৌরবে প্রতিষ্ঠাপিত করিতে পার ও তাহাদিগের ন্যস্ত ধন তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিতে পার। আবার ইচ্ছা হইলে তাহাদিগের সর্ব্বস্ব হরণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে চির-অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন রাখিতে পার। একে অনন্ত কীর্ত্তি ও অক্ষয় স্বর্গ, অপরে অনন্ত অযশ ও অনন্ত নিরয়! এক্ষণে তোমার যাহা অভিলাষ।

আবার ভারতবাসিন্! তোমায় বলি। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইতালী, আমেরিকা প্রভৃতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্তেও যদি তোমার স্বজাতি-প্রেম ও স্বদেশানুরাগ উদ্দীপিত না হয়, যদি ইহাতেও তুমি একতা ও আত্মত্যাগ শিখিতে না পার, যদি ইহাতেও তোমার মনে জাতিগত ও দেশগত গৌরবের ভাব অঙ্কিত না হয়, যদি ইহাতেও তুমি প্রত্যেক ভারতবাসী ও প্রত্যেক জাতীয় ভ্রাতার জন্য ধন, প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে না শিখ, যদি ইহাতেও তুমি কেবল আত্ম লইয়া ব্যতিব্যস্ত থাক,—তাহা হইলে বুঝিব যে, নরকেও তোমার আর স্থান নাই। তাহা হইলে বুঝিব যে, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইতালী ও আমেরিকার পবিত্র নাম গ্রহণে তোমার কোন অধিকার নাই! বুঝিব, তুমি মৃন্ময়, সুতরাং মৃৎপিণ্ডে ইংলণ্ড, ইতালী প্রভৃতির উদার শিক্ষা ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রতিফলিত হইল না।

"প্রভবতি শুচির্বিম্বোদ্ গ্রাহে
মণির্ন মৃদাং চয়ঃ।"

বিশুদ্ধ মণিই বিম্বগ্রহণে সমর্থ, মৃৎপিণ্ড কখনই প্রতিবিম্বধারণে সমর্থ নহে। জাপান সেই বিশুদ্ধ মণি, এই জন্য জাপানেই ইংলণ্ড প্রভৃতির উদার শিক্ষা ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রতিফলিত হইল। ভারত-বাসিন্! ইহাতেও যদি তোমার চৈতন্য না হয়, তাহা হইলে আর তোমার কোন আশা নাই।

আধুনিক ভারত *

ভ্রাতৃগণ! আমি অদ্য অনুরুদ্ধ হইয়া আপনাদিগের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াছি। বক্তৃতা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। কারণ, আমার সাহস ও শক্তি বক্তৃতার অনুকূল নহে।

* এই প্রবন্ধটি ১২৮০ সালে হিন্দুমেলার পঠিত হইবে বলিয়া লিখিত হয়। কিন্তু পুলিসের অদ্ভুত মহিমায় মেলাস্থলে যে দুর্ঘটনা উপস্থিত হয়, তাহার জন্য ইহা তথায় পঠিত হয় নাই।

তবে আমার কতিপয় বন্ধুর অনুরোধ এই যে—আমি তাঁহাদিগের নিকটে যেমন হৃদয়ের কপাট খুলিয়া ভারতের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার বিষয়ে মধ্যে মধ্যে আলোচনা করিয়া থাকি, আপনাদিগের নিকটেও আজ সেইরূপ নির্ম্মুক্ত ভাবে ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা-বিষয়ে দুই চারিটি কথা বলি। আমি এই গুরুতর বিষয় ভাবিতে একদিনমাত্র সময় পাইয়াছি, সুতরাং এ প্রস্তাব যে অসম্পূর্ণ হইবে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

কিঞ্চিদধিক এক শতাব্দী হইল, এই সোনার ভারত ইংরাজ বণিকদিগের হস্তগত হইয়াছিল। পলাশীযুদ্ধের দিন হইতে ভারতের অদৃষ্টচক্রের গতি-পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে! মুসলমান রাজাদিগের অত্যাচার দুর্ব্বিষহ হওয়ায় কতিপয় সম্ভ্রান্ত হিন্দু চক্রান্ত করিয়া বঙ্গের রাজমুকুট মুসলমানের মস্তক হইতে তুলিয়া ইংরাজবণিকের মস্তকে অর্পণ করেন। সকলেই জানেন, কেমন করিয়া সেই বন্যার জল সমস্ত ভারত প্লাবিত করে। সকলেই জানেন, কেমন করিয়া সেই ধূর্ত্ত বণিক সূচ্যগ্র-পরিমাণে প্রবেশ লাভ করিয়া, এক্ষণে বিশাল শালরূপে পরিণত হইয়াছেন। হিমালয় হইতে কুমারিকা ও সিন্ধুর পশ্চিম উপকূল হইতে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত ভারত এক্ষণে ইংরাজ বণিকের প্রচণ্ড প্রতাপে কম্পান্বিত। ইহাঁদিগের দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপের ভয়ে আজ আমাদিগের হৃদয় এত দূর আকুল যে, এরূপ প্রকাশ্য স্থলে আমরা হৃদয়ের দ্বার সম্পূর্ণরূপে উদ্‌ঘাটিত করিয়া কাঁদিতেও অক্ষম। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র যখন পূর্ব্বপ্রভু সিরাজদ্দৌলার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া, এই দুর্দ্দান্ত বণিকদিগকে বঙ্গের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন, তখন তাঁহার মনে কত অভিলাষ ছিল! তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, ইংরাজেরা যখন হিন্দুদিগের ষড়যন্ত্রে বিনাযুদ্ধে বা কাল্পনিক যুদ্ধে বঙ্গের সিংহাসন পাইলেন, তখন অবশ্যই তাঁহাদিগকে মন্ত্রিত্ব, সেনাপতিত্ব প্রভৃতি উচ্চপদে প্রতিষ্ঠাপিত করিবেন। মনুষ্যমাত্রেরই হৃদয়ে যে কৃতজ্ঞতা বিরাজমান, তিনি ইংরাজদিগেরও অন্তরে সেই কৃতজ্ঞতার অস্তিত্ব অনুমান করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুমান অস্বাভাবিক বা অমানুষ গুণের উপর ন্যস্ত হয় নাই বটে, কিন্তু তাঁহার একটি ভ্রম হইয়াছিল। তিনি জানিতেন না যে, যাঁহারা বিশ্বাসঘাতকতা উত্তেজিত করিয়া তাহার ফলভোগ করিতে কুণ্ঠিত নহেন, তাঁহাদিগের পক্ষে স্বকার্য্যসাধন হইলে উপকর্ত্তার প্রতিও বিমুখ হওয়া অতি সহজ।

তিনি ইংরাজদিগকে উপলক্ষ করিয়া মুসলমান ভ্রাতৃগণের চরণে শৃঙ্খল পরাইতে গেলেন, ধূর্ত্ত ইংরাজদিগের বুদ্ধিকৌশলে আপনারাও সেই শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলেন। কান্যকুব্জাধিরাজ জয়চন্দ্রের বিশ্বাসঘাতকতায় ভারতের চরণে যে শৃঙ্খল অর্পিত হয়, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বিশ্বাসঘাতকতায় সেই শৃঙ্খল উন্মুক্ত না হইয়া দৃঢ়সংবদ্ধ হইয়াছে। আমরা সকলেই আজ তাঁহাদিগের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছি।

যৎকালে ভারত ইংরাজাধিকৃত হয়, তখন ভারতবাসিমাত্রেরই মনে বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, ভারতে ইংলণ্ডের ন্যায় প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠাপিত হইবে, সকলেই বিশ্বাস করিতেন যে, যে জাতি স্বাধীনতার জন্য শ্বেতদ্বীপকে রাজ-রুধিরে অভিষিক্ত করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই, সে জাতি দ্বারা জাত্যন্তরের স্বাধীনতাপহরণ অসম্ভব। সে জাতি দ্বারা জাত্যন্তরের উপকার ভিন্ন অপকার হওয়া অসম্ভব। দাসত্ব উন্মোচনের নিমিত্ত যে জাতির সহস্র সহস্র রণতরি সদা সপ্তসাগর আলোড়িত করিতেছে, সেই জাতি যে স্থানান্তরে দাসত্ব-বীজ-বপনে এত পটু হইবেন, তাহা কে জানিতে পারিয়াছিল! কে জানিত যে একাধারে এরূপ পরস্পর-প্রতিদ্বন্দ্বী গুণদ্বয়ের সমাবেশ হইতে পারে?

ইংরাজেরা মনে করিতে পারেন, তাঁহারা আমাদিগের উপর রাজত্ব করিতেছেন বলিয়া আমাদিগের মনে এরূপ ঈর্ষার ভাব উদিত হইয়াছে; কিন্তু তাহা নহে। ভারত এক্ষণে যেরূপ বিচ্ছিন্নাঙ্গ ও হীনবল, তাহাতে কোন প্রবলতর রাজ্যের আশ্রয়ে থাকা তাহার পক্ষে সম্পূর্ণরূপে শ্রেয়স্কর। আমরা কেবল এইমাত্র চাই, যেন বৈদেশিক সাহায্য আমাদিগের ভবিষ্য জাতীয় সঞ্জীবনের প্রতিকূল না হয়। ইংরাজদিগের বর্ত্তমান ভারত-শাসন-প্রণালী যে আমাদিগের ভবিষ্য জাতীয় সঞ্জীবনের প্রতিকূল, তাহা আমরা সহজেই দেখাইতে পারি।

যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে ভারতের শাসনভার অর্পিত ছিল, তখন উক্ত কোম্পানী এই গুরুতর ভারের সদ্ব্যবহারের নিমিত্ত ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্ট

ও ব্রিটিশ সিংহাসনের নিকট দায়ী ছিলেন। তাঁহাদের ভারত-প্রতিনিধি ভারতের গর্হিত শাসনের জন্য পার্লিয়ামেন্টের নিকটে দণ্ডার্থ আনীত হইতেন। লর্ড হেষ্টিংসের বিচার তাহার নিদর্শন। তখন কোম্পানীর কর্ম্মচারীকে বিধির কঠোর শাসনে পরিরক্ষিত করায় পার্লিয়ামেণ্ট বা মন্ত্রিদলের কোনও স্বার্থসাধন হইত না, সুতরাং তাঁহাদিগের উপর পার্লিয়ামেণ্ট ও মন্ত্রিদলের সতত কঠোর দৃষ্টি থাকিত! এই জন্য তৎকালে কোম্পানীর প্রতিনিধিকৃত কোন অত্যাচার তাঁহাদের নিকটে ভাল করিয়া জানাইতে পারিলে, তাহার প্রতিবিধান হইতে পারিত।

কিন্তু এক্ষণে তাহার সম্পূর্ণ বৈপরীত্য ঘটিয়াছে! এক্ষণে ভারত-মহারাণী ও পার্লিয়ামেণ্টের অব্যবহিত শাসনের অধীনে আসিয়াছে। এক্ষণে ভারত-প্রতিনিধি অপরের কর্ম্মচারী নহেন, তাঁহাদিগেরই খাসের চাকর। তাঁহার গৌরব রক্ষা করা, দোষ করিলে তাঁহাকে দণ্ড হইতে উন্মুক্ত করা, এক্ষণে মহারাণী ও পার্লিয়ামেণ্টের স্বার্থ। সুতরাং এক্ষণকার ভারত-শাসনপ্রণালী যে সম্পূর্ণরূপে যথেচ্ছাচার প্রণালী হইয়া উঠিয়াছে, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। অর্থাৎ গবর্ণর জেনারেল ও ষ্টেট সেক্রেটারী যাহাই ভাল বুঝেন, তাহাই ভারতের অখণ্ডনীয় বিধি হইয়া উঠে। ইহার উপর আর আপীল নাই। দুই জন ব্যক্তির ইচ্ছাই ভারতের বিংশতি কোটি অধিবাসীর দুর্লঙ্ঘনীয় বিধি, ইহা ভাবিতে গেলেও হৃদয় আকুলিত হয়।

আমরা স্বীকার করি, আকবরের ন্যায় নরপতির হস্তে যথেচ্ছাচার প্রণালী সমর্পিত হইলে রাজ্যের মঙ্গল বই অমঙ্গল নাই। কিন্তু ইতিহাসের আরম্ভ হইতে এতাবৎকাল পর্য্যন্ত আমরা কয়টি আকবর প্রাপ্ত হইয়াছি? সহস্রবর্ষে একটি আকবর জন্মে কি না সন্দেহ। এরূপ স্থলে আমরা দুই একটি ব্যক্তির ইচ্ছার উপর আমাদিগের ধন, প্রাণ ও মান অর্পণ করি কিরূপে? ভারতের বিংশতি কোটি অধিবাসীর মঙ্গলের নিমিত্ত আমরা দুই একটি ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভর করি কিরূপে? ইংরাজ-রাজত্ব-কালমধ্যে যদি একটি আকবরও আবির্ভূত হইত, তাহা হইলেও আমাদিগের মনে কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হইত। যদি ইংরাজ-রাজত্ব-কালে একটি বীরবল, একটি মানসিংহ, একটি টোডরমল্ল- সেনাপতিত্ব, শাসনকর্তৃত্ব বা মন্ত্রিত্বপদে অভিষিক্ত হইতেন তাহা হইলেও আমাদিগের মনে এক দিন আশার সঞ্চার হইত। কিন্তু সমস্ত ইংরাজ ইতিহাসেই এরূপ দৃষ্টান্ত একটিও দেখা যায় না। তবে আমরা মনকে কি বলিয়া প্রবোধ দিই? আমাদিগকে কোন নূতন স্বত্ব প্রদান করা দূরে থাকুক, আমরা দেখিতেছি যে, একটি একটি করিয়া আমাদিগের স্বভাবদত্ত স্বত্ব অপহৃত হইতেছে। কাল বলিলেন, তোমাদিগকে এই এই স্বত্ব প্রদান করা যাইবে। আজ বলিলেন, না—তোমরা অদ্যাপি উপযুক্ত হও নাই, সুতরাং এক্ষণে তোমাদিগকে সে সকল স্বত্ব প্রদান করা যাইতে পারে না; যদি কখন উপযুক্ত হও, তবে পরে বিবেচনা করা যাইবে। ১৮৫৮ সালে, সিপাহী বিদ্রোহের পর শান্তি-সংস্থাপনের জন্য রাজ্ঞী বলিলেন, "অতঃপর জাতি, ধর্ম্ম, বর্ণ ভেদ না করিয়া শুদ্ধ গুণ বিচার পূর্ব্বক তোমাদিগকে রাজ্যে উচ্চতম পদে প্রতিষ্ঠাপিত করা যাইবে। এখন হইতে ভারতবাসী ও ব্রিটনবাসী বলিয়া কোন বিষয়েই কোন প্রভেদ করা যাইবে না।" প্রজারা কিছুদিন মুগ্ধ আশ্বাসে রহিল; ভাবিল, তাহাদের আরাধ্য রাজ্ঞীর বাক্য কখন মিথ্যা হইতে পারে না। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাহাদিগের সেই ভ্রম বিদূরিত হইল। বিংশতি বৎসর অতীত হইল, তথাপি তাহারা রাজ্ঞীর বাক্য কার্য্যে পরিণত হইতে দেখিল না। আজ হইবে, কাল হইবে, এইরূপ লব্ধ আশ্বাসে রহিয়াছে, এমন সময় দিল্লীর দরবার আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলেই ভাবিল যে, এই শুভ লগ্নে তাঁহার পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা কার্য্যে পরিণত করিবেন। অসংখ্য প্রজা নব নব স্বত্ব-লাভের আশায় দিল্লীর অভিমুখে বহ্নিমুখে পতঙ্গের ন্যায় ধাবিত হইল। কত ব্যক্তির অন্তরের কত আশা, কত অভিলাষ ও কত উৎসাহ! রায় বাহাদুর, রাজা বাহাদুর, রাজা, মহারাজা, আমীর, ওমরা সকলেই ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতেছে। সকলেই ভাবিয়াছিলেন, ভারতে কি এক নবীন সৌভাগ্যের দিন অভ্যুদিত হইবে। ব্যক্তিগত ও জাতীয় আশায় সকলেরই অন্তর আপ্লুত। নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে নৃত্যগীত ও মহোৎসব। মুগ্ধ আশ্বাসে সমস্ত ভারত যেন ক্ষেপিয়া উঠিল। সামান্য প্রজা হইতে মহারাজ

পর্য্যন্ত সকলেরই গৃহে মহাসমারোহ উপস্থিত হইল। আমাদিগের ভয় হইল, বুঝি ভারতের মস্তিষ্কে কোন বিপর্য্যয় উপস্থিত হইয়াছে। যাহা হউক, এই বিশ্বব্যাপী আনন্দোৎসবের পরিণাম কি হইল, না—দুই চারিজন ভারতবাসী রায় বাহাদুর রঙ্গে অতিরঞ্জিত হইলেন। দুই চারিজন রায় বাহাদুর ও রাজা বাহাদুর হইলেন। দুই চারিজন রাজা-বাহাদুর মহারাজ হইলেন। যাহারা উনবিংশ তোপ পাইতেন, তাহারা একবিংশ তোপ পাইলেন; যিনি একবিংশ তোপ পাইতেন, তাঁহার একত্রিংশ তোপ হইল; যিনি তোপ পাইতেন না, তাঁহার ত্রয়োদশ তোপ হইল, মহারাণীর একশত এক তোপ হইল। স্বাধীন রাজাদিগের কণ্ঠে অধীনতাপদক লম্বমান হইল, তাঁহারা রাজা হইতে উচ্চতম পদ সেনাপতিত্বে বৃত হইলেন। অবশেষে শ্রাদ্ধের চূড়ান্ত পরিণাম-স্বরূপ লর্ড লীটন স্বাধীন রাজাদিগকে এই মর্ম্মে বলিলেন—তোমরা আর এখন হইতে স্বাধীন রাজা বলিয়া পরিগণিত হইবে না; তোমরা এখন হইতে মহারাণীর মন্ত্রসভায় সভ্যমাত্র বলিয়া পরিগণিত হইবে। ইহাতে তোমরা যদি আপনার ইচ্ছায় রাজভক্ত না হও তাহা হইলে তোমাদিগকে বল-পূর্ব্বক রাজভক্ত করিব। আর সাবধান! তোমরা অদ্যাপি কোন কাজেরই হও নাই, সুতরাং এক্ষণে তোমাদিগের কোন উচ্চপদের আকাঙ্ক্ষা বামন হইয়া চাঁদে হাত দেওয়ার ন্যায় হাস্যাস্পদ হইবে। তোমরা এরূপ দুরাকাঙ্ক্ষা করিও না। আমরা যে দুই চারি টাকা অনুগ্রহ করিয়া দিতেছি, তাহাতেই তোমরা শাক করিয়া খাইয়া কথঞ্চিৎ সন্তুষ্ট থাক। মহারাণী তোমাদিগকে পূর্ব্বে যে আশ্বাস-বাক্য প্রদান করিয়াছিলেন, সে আশ্বাসবাক্যে আপাততঃ মুগ্ধ হইও না। তোমরা যদি কখনও উপযুক্ত হও, তাহা হইলে মহারাণীর সে কথা বিচার করা যাইবে। আর তোমরা উপযুক্ত হইয়াছ কি না, সে বিচারের ভার আমাদিগেরই হাতে এবং আমরাও বিশেষ বিবেচনা না করিয়া তোমাদিগকে উপযুক্ত বলিয়া স্বীকার করিব না। ইহাতেও তোমরা যদি রাজভক্ত না হও, তাহা হইলে তোমাদিগকে বলপূর্ব্বক রাজভক্ত করিতে চেষ্টা করিব।

মহারাণীর ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের বক্তৃতায় আমাদিগের মনে যে কিছু আশা-ভরসা হইয়াছিল, লর্ড লীটনের দিল্লীর বক্তৃতায় আমাদিগের সে সমস্ত আশা একেবারে সমূলে উন্মূলিত হইয়াছে। প্রলয়-ঝটিকার পর যে স্তব্ধভাব, আমাদিগের হৃদয়ের এক্ষণে ঠিক সেই স্তব্ধভাব। আমরা কোন্ দিকে যাইব, কি করিব, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। যে দুই চারি জন উপাধি পাইয়াছেন, তাঁহারা ভিন্ন ভারতের আর সমস্ত অধিবাসী হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন। সকলেই কোন না কোন প্রকারে মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। সকলে যেন এতদিন মোহ-নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন, এতদিন পরে যেন তাঁহাদের চৈতন্য হইল। চৈতন্যলাভের পর সকলেরই মনে এই প্রশ্ন সমুদিত হইল, "ইংরাজরাজত্বে আমাদের কি আশা?" ইংরাজদিগের সহিত স্বাধীন বাণিজ্য-যুদ্ধে ভারতের বাণিজ্য-প্রতিভা অঙ্কুরে বিদলিত হইল। শিল্পও ক্রমে ক্রমে অন্তর্দ্ধান করিল। ভারতের যে বস্ত্র ও অলঙ্কার জগতের বিস্ময়োদ্দীপক ছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে অপমানিত ও অধঃকৃত হইল, সুতরাং কর্ম্মকার ও তন্তুবায়কুল একেবারে উৎসন্ন হইয়া পড়িল। যে অর্থে অসংখ্য ভারতীয় শিল্পীরা প্রতিপালিত হইতে পারিত, সেই অর্থে এক্ষণে অসংখ্য বৈদেশিক শ্রমোপজীবি প্রতিপালিত হইতেছে। এক দিকে ভারতের শিল্পীরা দিন দিন [illegible] উদরান্নের জন্য লালায়িত হইতেছে, অন্য দিকে বৈদেশিক শিল্পীরা দিন দিন ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া পড়িতেছে। শিল্প ও বাণিজ্য ত এইরূপ ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। এক্ষণে কৃষিই সাধারণ লোকের জীবনধারণের একমাত্র উপায় হইয়াছে। কিন্তু ইহাও অর্থসাধ্য। অর্থাভাবে কৃষকেরা ইহার উন্নতিসাধন করিতে পারিতেছে না। মহাত্মা আকবর তাঁহার করগ্রাহক-দিগকে আদেশ করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা যেন কৃষকদিগকে প্রয়োজন হইলেই অর্থসাহায্য করেন, তাঁহারা যেন সকল অবস্থাতেই তাহাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেন, তাহারা যেন সর্ব্বতোভাবে তাহাদের অবস্থার উৎকর্ষসাধন করিতে সচেষ্ট হন। কই, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ত কলেক্টর-দিগের প্রতি এরূপ কোন আদেশ প্রদান করেন নাই, অথবা যদি করিয়া থাকেন, তাহা ত কার্য্যে পরিণত হয় নাই। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অধীনে

কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্পের ত এই দশা গেল। আমাদিগের একমাত্র আশা ছিল, রাজকর্ম্ম। লর্ড লীটনের বক্তৃতাও সেই চিরলালিত আশালতাকেও সমূলে উন্মূলিত করিল। এক্ষণে আমরা করি কি, যাই বা কোথায়? আমরা প্রতি বৎসরে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অসংখ্য ছাত্রকে প্রশংসাপত্রসহ বহির্গত হইতে দেখিতেছি। আমাদিগের প্রথমে ইহাতে বড়ই আনন্দ বোধ হইত। কিন্তু এক্ষণে এই শোচনীয় দৃশ্যে আমাদিগের হৃদয় কাঁপিয়া উঠে। আমরা যখন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এল, এ পরীক্ষা দিয়া বহির্গত হইয়াছিলাম, তখন আমাদিগের মনে কতই আশা, কতই উৎসাহ ছিল। তখন স্বদেশের "এ করিব" "ও করিব" বলিয়া আমাদিগের মনে কত প্রকার ইচ্ছা হইত, কিন্তু এক্ষণে—

"উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে
দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ"

দরিদ্রের মনোরথের ন্যায় সেই সকল ইচ্ছা আমাদিগের হৃদয়ে উত্থিত হইয়াই অন্তর্লীন হইতেছে। আমাদিগের জ্ঞান, আমাদের শিক্ষা আমাদিগের কেবল যাতনার কারণ হইয়া উঠিয়াছে। আমরা জানিতে পারিতেছি, এই সকল কার্য্য করিলে আমাদের জাতীয় গৌরব ও মনুষ্যনামের মহত্ব পরিরক্ষিত হইতে পারে। কিন্তু যে যে উপায়ে আমরা সে সকল করিতে সমর্থ, আমরা সে সকল উপায়ে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত। আমরা সকলের ঘৃণার কারণ হইয়াছি, যেহেতু আমরা চাকরী ও ওকালতী প্রভৃতি ভিন্ন অন্য কোন জীবিকা অবলম্বন করি না। কিন্তু আমরা জানি না যে, চাকরী ও ওকালতী প্রভৃতি ভিন্ন আমরা অন্য কোন জীবিকা অবলম্বন করিতে পারি। আমাদিগের শিক্ষা আমাদিগকে যাহা করিয়া দিতেছে, তাহা ভিন্ন আমরা আর কি করিতে পারি? আমরা অন্য যে দিকেই যাইব, সেই দিকেই মূলধনের প্রয়োজন। মূলধন আমাদের নাই। আমাদের ধনিবৃন্দও নিতান্ত স্বার্থপর। তাঁহারা সঞ্চিত অর্থ কেবল আপনাদিগের বৃথা আমোদ-প্রমোদে ব্যয়িত করিয়া থাকেন। তদবশিষ্ট যাহা থাকে, তদ্দ্বারা অল্প সুদে গবর্ণমেণ্টের কাগজ ক্রয় করিবেন, তথাপি অধিক লাভকর বহির্বাণিজ্য কৃষি বা শিল্পে প্রবৃত্ত করিবেন না। তাহা হইলে তাঁহাদিগের অধিকতর লাভ হইতে পারে এবং দেশীয় মস্তিষ্ক পরিচালিত ও দেশীয় শোণিত পরিপোষিত হইতে পারে। কিন্তু তাঁহারা তাহা করিবেন কেন? উদরান্নের জন্য তাঁহাদিগকে ত লালায়িত হইতে হয় না। তাঁহাদিগের স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণের দুরবস্থার সহিত তাঁহাদিগের কি সম্বন্ধ আছে যে, তাঁহাদিগের সঞ্চিত ধন তাঁহারা এরূপ সংশয়িত কার্য্যে প্রযুক্ত করিবেন? এক দিকে অধিকতর লাভের সম্ভাবনা, সেইরূপ অন্যদিকে মূলধনের সমূলে বিনষ্ট হওয়ারও সম্ভাবনা রহিয়াছে। এরূপ স্থলে তাঁহারা কি জন্য এরূপ অসমসাহসিকতায় প্রবৃত্ত হইবেন? সুতরাং অধিকতর লাভের আশা দেখাইয়া তাঁহাদিগকে ইহাতে প্রবৃত্ত করা অসম্ভব। তাঁহাদিগের অন্তর যদি স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণের দুরবস্থা দেখিয়া আপনি না কাঁদে, তাহা হইলে, তাঁহাদিগকে ইহাতে প্রবৃত্ত করে, কাহার সাধ্য? কিন্তু কবে যে তাঁহাদিগের অন্তর প্রদেশীয় ভ্রাতৃগণের জন্য কাঁদিবে, আমরা জানি না এবং তাহা না হইলেও আমাদিগের সুশিক্ষিত দলের আর কোন আশা নাই।

সুতরাং একটিমাত্র দ্বার সুশিক্ষিতদিগের সম্মুখে উন্মুক্ত রহিয়াছে। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে সরস্বতীর বরপুত্র হইয়া মসীমর্দ্দন ও মস্তিষ্ক-পরিচালন দ্বারা জীবন দগ্ধ করিতে পারেন। কিন্তু সরস্বতীর বরপুত্রদিগের সাধারণ অবস্থা দেখিয়া কেহ সহজে এই পথে অগ্রসর হইতে চাহেন না। এই ব্যবসায়ে দুই চারি জনকে সৌভাগ্যশালী হইতেও দেখা গিয়াছে সত্য, কিন্তু এই ব্যবসায়ের ব্যবসায়ীদিগের সাধারণ অবস্থা অতি শোচনীয়। বাঙ্গালাভাষা যেরূপ সর্ব্বতঃ অনাদৃত, তাহাতে নবন্যাস, নাটক ও স্কুল বই ব্যতীত ইহাতে অন্য কোন গ্রন্থ লিখিলে মুদ্রাঙ্কন-ব্যয় পর্য্যন্ত নির্ব্বাহ হইয়া উঠা দুষ্কর। নবন্যাস, নাটক ও স্কুল-বইয়ে কিঞ্চিৎ লাভ হয় বলিয়া, অধিকাংশ গ্রন্থকারই সেই দিকে ঝুঁকিয়াছেন; এই কারণে এই শ্রেণীর গ্রন্থকারদিগের আয়ও ক্রমে সহস্রভাগে বিভক্ত হইয়া কমিয়া যাইতেছে। এব্যবসায়ে প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা বাড়িতেছে, কিন্তু প্রতিযোগিতাক্ষেত্র পূর্ব্ববৎ একইরূপে সঙ্কীর্ণ রহিয়াছে। সুতরাং দুর্ভিক্ষপীড়িতের ন্যায় এই শ্রেণীর গ্রন্থকারেরা পরস্পরের মাংস ভক্ষণ আরম্ভ

করিয়াছেন। এই দুর্ভিক্ষের সময় আবার বৈদেশিক অর্থলোলুপ গ্রন্থকারেরা প্রতিদ্বন্দ্বিতাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া ইংরাজী হইতে বাঙ্গালা পুস্তকের অনুবাদ আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা নানা প্রকারে আমাদিগের শোণিত শোষণ করিতেছেন, আমাদিগের মাংসে তাঁহাদিগের উদর পরিপূরিত করিতেছেন, আমাদিগকে কঙ্কালমাত্রে পর্যবশিষ্ট করিয়াছেন, তথাপি তাঁহাদিগের পরিতৃপ্তি ও নিবৃত্তি নাই। যখন এ দেশীয় গ্রন্থকারেরা অন্ন বিনা মারা যাইতেছেন, যখন দুর্ভিক্ষের জ্বালায় তাঁহারা পরস্পরের মুখের গ্রাস পরস্পরের মুখ হইতে কাড়িয়া লইতে বাধ্য হইতেছেন, সেই ভীষণ যাতনার সময়ে তাঁহারা কৌতুক দেখিবার নিমিত্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতাসমরে অবতীর্ণ হইয়াছেন। পুস্তক-নির্ব্বাচন বিষয়ে তাঁহাদিগেরই হাত, সুতরাং তাঁহারা অনায়াসে নিরুপায় বাঙ্গালীকে পরাস্ত করিয়া আপনাদের অভীষ্ট সাধন করিতেছেন। গ্রন্থকারদিগের মধ্যে যাঁহাদিগের কিঞ্চিৎ লাভ ছিল, তাঁহাদিগের ত দশা-পরিণাম এই হইল। আর এক শ্রেণীর গ্রন্থকার আছেন, তাঁহাদিগের অবস্থা আরও শোচনীয়। ইহাঁরা সাধারণতঃ সম্পাদক নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ইহারা সাময়িক পত্রের প্রচার দ্বারা পৈতৃক ধনের বা স্বোপার্জ্জিত অর্থের ধ্বংস করিয়া থাকেন। দেশের মঙ্গলসাধন করা তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য। কিন্তু দেশের মঙ্গল সংসাধিত হউক বা না হউক, তাঁহাদিগের নিজের অমঙ্গল নিশ্চিত। ক্রমে তাঁহাদিগের মনের স্বাধীনবৃত্তি সকল এতদূর তেজস্বিনী হইয়া উঠে যে, তাঁহারা ক্রমে পরের উপাসনা ও পরের দাসত্ব করিতে অক্ষম হইয়া উঠেন। কিন্তু সাহেবের উপাসনা ও সাহেবের দাসত্ব ব্যতীত আজকাল যে অর্থসম্বন্ধে আমাদের কোন উন্নতির আশা নাই, তাহা বলা কেবল বাহুল্যমাত্র। সেই সাহেবদিগের সহিত সম্পাদকদিগের ত চিরশত্রুতা দাঁড়াইয়া যায়। তাঁহারা অনেক সময়ে সাহেবের বিচারকর্ত্তা হইয়া দাঁড়ান। এই জন্য সাহেবদিগের অধীনে চাকরী করাও তাঁহাদিগের পক্ষে অতিশয় ক্লেশকর হইয়া উঠে। এই জন্য তাঁহাদিগের অর্থবিষয়ক উন্নতির দ্বার এক প্রকার রুদ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু যে দেশের উন্নতিসাধন করিবেন বলিয়া, তাঁহারা নিজের উন্নতির আশায় জলাঞ্জলি দেন, সে দেশের লোকের তাঁহাদিগের প্রতি কিরূপ ব্যবহার? নিঃস্বার্থভাবে সম্পাদকদিগের উৎসাহবর্দ্ধন করা দূরে থাকুক, কাগজ লইয়া তাঁহারা অনেকেই দাম দিতে চাহেন না। সম্পাদকেরা যে কি লইয়া তাঁহাদিগের জন্য লড়িবে, তাহা তাঁহারা একবারও ভাবিয়া দেখেন না। সম্পাদকদিগের নিজের উদরপূরণ করা দূরে থাকুক, কি দিয়া তাঁহারা মুদ্রাঙ্কনের ব্যয়নির্ব্বাহ করিবেন, তাহাও তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না। স্বদেশীয় রাজা হইলে সম্পাদকদিগের সহিত রাজার সহযোগিতা হইতে পারিত, কিন্তু বৈদেশিক রাজার সহিত সম্পাদকদিগের স্বভাবসিদ্ধ প্রতিযোগিতা। সুতরাং তাঁহাদিগের রাজার নিকট কোন উৎসাহ পাইবার আশা নাই। তাঁহাদিগের একমাত্র আশাস্থল স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণ, কিন্তু আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, সম্পাদকদিগের কষ্টে স্বদেশবাসিগণের হৃদয় বিচলিত হয় না। সুতরাং সম্পাদকদিগের ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়ান ভিন্ন অন্য উপায় নাই। আর এক শ্রেণীর গ্রন্থকার আছেন, যাঁহাদিগের লিখিত গ্রন্থ নবন্যাস, নাটক বা স্কুলের বইএ কোন শ্রেণীর অন্তর্গত নহে। তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিসাধনের নিমিত্ত উচ্চদরের পুস্তক লিখিয়া থাকেন। ইহাদিগেরও দশা সম্পাদকদিগের ন্যায়, সুতরাং ইহাদিগের বিষয় আর অধিক বলা বাহুল্য। সুতরাং এ জীবিকা সাধারণের প্রলোভনীয় হইতে পারে না। সুশিক্ষিত দলের সম্মুখে আর কোন স্বাধীন জীবিকাদ্বার উন্মুক্ত আছে কি না, আমরা জানি না।

পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সহানুভূতি না থাকায় আজ আমাদের এই দশা! এখনই আমাদিগের দুরবস্থার পরিসীমা নাই। এর পর আরও কি হইবে, ভাবিতে গেলে ভয় হয়। আমাদিগের পুত্রপৌত্রদিগের যে কি দশা হইবে, তাহা আমরা ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না। ক্রমে শিক্ষার ব্যয় গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। একজন ভদ্রবংশোদ্ভব কেরাণীর বেতন বিশ টাকা, কিন্তু পুত্রের সংখ্যা পাঁচটি। পাঁচটিকে ভাল করিয়া লেখাপড়া শিখাইতে হইলে, তাহাদের বিদ্যালয়ের বেতন দিতে হইলেই, তাঁহার নিজের বেতন পর্য্যবসিত হয়। মূর্খ করিয়া রাখিলেও তাহারা চিরজীবন গলগ্রহ

স্বরূপ হইবে এবং সমাজে তাহাদিগকে লইয়া তাঁহাকে সতত অবমানিত হইতে হইবে; সুতরাং তাহাদিগকে মূর্খ করিয়াও রাখিতে পারেন না। এ স্থলে তিনি কি করেন? কেরাণীর উপরিলাভের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং অগত্যা তাঁহাকে পরের শরণাপন্ন হইতে হয়। একজন এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন, তাঁহার উর্দ্ধসংখ্যা একশত টাকা বেতন হইল। অসংখ্য নিরন্ন কুটুম্ব আসিয়া তাঁহার গললগ্ন হইল। স্নেহ-কোমল হিন্দুহৃদয় আত্মীয়-স্বজনের দুঃখে উপেক্ষা করিতে না পারিয়া সোনামুখ করিয়া সেই গুরুভার বহন করিতে লাগিলেন। যত দিন তাঁহার পুত্রাদি না হইল, তত দিন তিনি দুঃখ কষ্টে সেই গুরুভার কথঞ্চিৎ বহন করিতে লাগিলেন, কিন্তু সন্তানাদি হইবামাত্র নানাপ্রকার খরচ বাড়িয়া গেল; যে আত্মীয়-স্বজনের গুরুভার মস্তকে গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও বলিতে পারেন না, অথচ দেখিতেছেন, তাঁহার আয়েও সঙ্কুলান হয় না। সাহেবের নিকট বলিলেন, "সাহেব! একশত টাকায় আর কুলায় না।" সাহেব পূর্ব্বসংস্কার মনে করিয়া আছেন। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি যখন জাহাজ হইতে নামিয়াছিলেন, তখন শুনিয়াছিলেন, এক শত টাকায় একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের বেশ চলিতে পারে। সেই পূর্ব্বসংস্কার তাঁহার মনে বদ্ধমূল হইয়া আছে। এ দিকে তাঁহারা আসিয়া আমাদের যে কি সর্ব্বনাশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার মনে নাই। আগে আমাদের একখানি ধুতি ও একখানি চাদর হইলেই যথেষ্ট হইত; কিন্তু এক্ষণে আমাদিগের বুট জুতা চাই, ষ্টকিং চাই, পিরান চাই, চাদর চাই, আবার বাহিরে যাইতে হইলে ইহার উপর পেণ্টুলন, চাপকান, টুপী বা পাগড়ী প্রভৃতি আসবাব চাই। এ সকল না হইলে আবার সাহেব! তুমি আমাদিগকে তোমার নিকটে যাইতে দিবে না। বাটীর কর্ত্তা যখন এই সকল পরিচ্ছদ ধারণ করিলেন, তখন যে বাটীর অন্যান্য লোক কিয়ৎ-পরিমাণেও তাঁহার অনুকরণ করিবে, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। সুতরাং প্রত্যেকের এক দফা করিয়া পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিতে হইলে গড়ে দশ টাকা করিয়া পড়িয়া যায়। ইহার উপর আবার প্রত্যেক দ্রব্যের মূল্য চতুর্গুণ করিয়া বাড়িতেছে। এ সকল কারণ সত্ত্বেও সাহেব বলিলেন, "একশত টাকায় বেশ চলিতে পারে!" বেশী পীড়াপীড়ি করিলে বলেন যে, "ইহাতে সন্তুষ্ট না হও, উন্নতির জন্য অন্য চেষ্টা দেখ।"

যাঁহারা উচ্চশিক্ষার উচ্চতম শাখায় আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের ত এই দশা। যাঁহাদিগের ইহার মধ্যে পদস্খলন হয়, তাঁহাদিগের অবস্থা আরও শোচনীয়। যিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না, তিনি ত মনুষ্যমধ্যেই পরিগণিত হইলেন না। ১০ টাকার চাকরীর জন্য তাঁহাকে দ্বারে দ্বারে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে হয়। যিনি প্রবেশিকা পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইলেন, তাঁহার মাসিক উর্দ্ধ সংখ্যা ১৫ টাকার সংস্থান হইল। যিনি এল, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন, তাঁহার উর্দ্ধসংখ্যা মাসিক পচিশ টাকার সংস্থান হইল; এবং যিনি বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন, তাঁহার উর্দ্ধতনসংখ্যা ৫০ টাকায় সংস্থান হইল। বাজারের দর ক্রমেই কমিতেছে। ক্রমেই কর্ম্ম অপেক্ষা কর্ম্মচারীর সংখ্যা বাড়িতেছে। ২০ বৎসর পরে যে কি হইবে, তাহা ভাবিতে গেলে হৃদয় বিকম্পিত হয়। যাঁহারা বিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা পাইতেছেন, তাঁহাদিগের ত এই দশা। আবার যে সকল ভদ্রসন্তান অবস্থার দোষে ইংরাজী শিক্ষা পাইতে পারেন নাই, অথচ হলচালন করিতেও অক্ষম, তাঁহাদিগের অবস্থা দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। যাঁহারা বলেন যে, তাঁহারা হলচালন করেন না কেন, তাঁহারা অতিশয় মূর্খ। অধিকতর বলিষ্ঠ ও পরিশ্রমসহিষ্ণু কৃষকদিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা দুর্ব্বলতর ও শারীরিক পরিশ্রমকাতর ভদ্রসন্তানের পক্ষে একান্ত অসম্ভব। আর কৃষকদিগের অবস্থা এত কি লোভনীয় যে, তাহাদিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতাসমরে ভদ্রসন্ততিগণের অবতরণ করা উচিত? আমরা বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা জানিতে পারি যে, টাকার সুদ ও খরচা বাদে কৃষকের গড়ে মাসিক ৫ টাকার উর্দ্ধ লাভ হয় না। এক জন মধ্যবিত্ত লোকের ৫ টাকায় কখনও সংসার চলে না। এরূপ স্থলে তাঁহারা কি করিবেন? হয় তাঁহাদিগকে পরের গলগ্রহ হইয়া থাকিতে হইবে, নয় ভিক্ষাব্যবসায় অবলম্বন করিতে হইবে। কিন্তু এরূপ জীবিকা যে কিরূপ ক্লেশকর, তাহা যাঁহারা অবলম্বন করিয়াছেন,

তাঁহারাই জানেন। এই ভীষণ অন্নযুদ্ধের সময় আবার লর্ড লীটন কর্ত্তৃক আশার মূলে কুঠারাঘাত। ভারতবাসীর মনে আশা ছিল যে, ক্রমে ক্রমে তাঁহারা রাজ্যের অধিকাংশ উচ্চকর্ম্ম প্রাপ্ত হইবেন। তাঁহাদিগের বিশ্বাস ছিল যে, ক্রমে ক্রমে ভারতে শ্বেতাঙ্গের আমদানী কমিয়া যাইবে। কিন্তু এক্ষণে সে বিশ্বাস তিরোহিত হইয়াছে, সে আশা সমূলে উন্মূলিত হইয়াছে। আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, ইংরাজেরা সহজে আমাদিগের মুখের গ্রাস আমাদিগকে প্রত্যর্পণ করিবেন না।

এই নিরাশ সময়ে আমাদিগের একটিমাত্র উপায় করতলস্থ রহিয়াছে। আমরা ইচ্ছা করিলে সেই উপায় দ্বারা বিনা যুদ্ধে, বিনা রক্তপাতে, ইংরাজদিগের উপর জয়লাভ করিতে পারি। এই উপায় একতা ও আত্মত্যাগ। ইংরাজজাতি অতিশয় স্বাধীনতাপ্রিয়, এই জন্য সাধারণ মতকে (public opinion) ইহাঁরা বিশেষ মান্য করিয়া থাকেন। সমস্ত ভারতবাসী যদি একস্বর হইয়া ইংলণ্ডের নিকট কোন বিষয় প্রার্থনা করিতে পারেন, ইংলণ্ড সে প্রার্থনা কখনই অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না। ইংলণ্ডের এ ঔদার্য্য ও এ মহত্ব আছে। সমস্ত ভারতবাসীর একস্বর হইতে হইলে তাঁহাদিগকে অগ্রে একত্র মিলিত হইতে হইবে। বিংশতি কোটি ভারতবাসী যদি বৎসরে অন্ততঃ একদিনও জাতি, ধর্ম্ম, সমাজের পার্থক্য ভুলিয়া ভ্রাতৃভাবে একত্র মিলিত হইতে পারেন, তাহা হইলে জানিতে পারিব যে, ভারতের সৌভাগ্য-সূর্য্য উদিত হওয়ার আর বিলম্ব নাই। ভারতের সমস্ত অধিবাসী বৎসরে অন্ততঃ এক দিনও একত্র মিলিত হইতে পারেন, এমন একটি উপলক্ষ চাই, এমন একটি স্থান চাই। আমরা মেলার অধ্যক্ষদিগের নিকট করযোড়ে এই ভিক্ষা চাই, তাঁহারা যেন এই মেলাকে কোন সঙ্কীর্ণ ভিত্তির উপর সংন্যস্ত না করেন। আমাদিগের ভিক্ষা, তাঁহারা যেন এই মেলাকে এখন হইতে হিন্দু-মেলা নাম না দিয়া ভারত-মেলা নাম দেন। যেন ইহা এখন হইতে ভারতবাসিমাত্রেরই উৎসব-স্থল হয়। হিন্দু ভিন্ন অন্য কোন জাতি ইহাতে যোগ না দেন—আমরা কাঁদিব। কিন্তু আমরা ভারতবর্ষীয় কোন ভ্রাতার বিরুদ্ধে ইহার দ্বার অবরুদ্ধ করিব না। আমরা সকলকেই ইহার অভ্যন্তরে আহ্বান করিব। আমরা কোন ক্রমেই দলাদলির ভিতর যাইব না। দলাদলি ও গৃহবিচ্ছেদে ভারতের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে। যে দলাদলি ও গৃহবিচ্ছেদ আমাদিগের সর্ব্বনাশসাধন করিয়াছে, আমরা আর তাহার শরণাপন্ন হইব না।

ভারতবাসী! হৃদয়ের প্রিয়তম বন্ধু!—আসুন, আমরা এই প্রস্তাবিত প্রকাণ্ড ভারতবর্ষীয় মেলায় একত্র মিলিত হইয়া একতানে সমস্বরে একবার ইংলণ্ডের নিকট আমাদিগের অপহৃত স্বত্ব যাচ্ঞা করি। ইংলণ্ড সমস্ত ভারতবাসীর মিলিত ক্রন্দনে কখনই উপেক্ষা করিতে পারিবেন না। কিন্তু ইংলণ্ডকে স্বার্থত্যাগ করিতে অনুরোধ করার পূর্ব্বে আমাদিগকে দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইতে হইবে যে, আমরা স্বদেশবাসীর জন্য—প্রিয়তম ভ্রাতার জন্য—আত্মত্যাগ করিতে সমর্থ। আমাদিগের নিজের নৈতিক উৎকর্ষ দেখাইয়া আমরা ইংরাজদিগের নিকট নৈতিক উৎকর্ষ ভিক্ষা করিব। ভারতবাসী ধনিবৃন্দ! আপনাদিগের নিকটে করযোড়ে আমরা এই ভিক্ষা করিতেছি যে, সাধারণের উপকারার্থ আপনারা প্রত্যেকে এই জাতীয় সভায় আপনাদিগের বিপুল আয়ের কিয়দংশ অর্পণ করুন। যদি ভারতকে আবার একটি জাতি করিতে চাহেন, তবে কিয়ৎপরিমাণে স্বার্থবিহীন হউন, কিয়ৎপরিমাণে আপনাদিগের বিলাসিতা ভুলিয়া যাউন। স্বার্থপরতা ও বিলাসিতায় কখন জাতির উদ্ধারসাধন হইতে পারে না। যখন অসংখ্য ভ্রাতা অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ করিতেছেন, তখন আপনারা কোন্ প্রাণে আত্মসুখে নিমগ্ন থাকিবেন? এ সুখের সময় নয়! জাতীয় মৃত্যু সন্নিকট! এ সময়ে শেষ চেষ্টা করুন, নতুবা আর কিছুদিন পরে সমস্ত চেষ্টা বিফল হইবে। মৃতদেহে ঔষধ-প্রয়োগের ন্যায় তখন ইহা নিতান্ত উপহাসাস্পদ হইবে। আপনাদিগের আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া ইংরাজদিগকে স্বার্থত্যাগ করিতে শিক্ষা দিউন। দেখিবেন, সেই দৃষ্টান্তের বলে ইংরাজদিগের পাষাণ-হৃদয়ও বিচলিত হইবে।

অতীত ও বর্ত্তমান ভারত

অতীতের সহিত তুলনায় আমাদের বর্ত্তমান ধর্ম্মনৈতিক, নৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা পর্য্যালোচনা, বর্ত্তমান দুরবস্থার কারণানুসন্ধান ও তদপনোদনের উপায়-চিন্তন—এই প্রস্তাবের প্রতিপাদ্য। এই কয়টি গুরুতর বিষয় একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে নিঃশেষিতরূপে সমালোচিত ও পরিস্ফুটরূপে পরিব্যক্ত হইতে পারে না। তথাপি যতদূর সাধ্য, আমি এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখিব।

আমাদের বর্ত্তমান দুরবস্থা কি, তাহার কারণই বা কি এবং তদপনোদনের উপায়ই বা কি? জানি, এ প্রশ্নের উত্তরে নানাপ্রকার মতভেদ আছে, কিন্তু মতভেদ আছে বলিয়া আমি অসঙ্কুচিত-চিত্তে নিজের মত বলিতে কুণ্ঠিত হইব না।

মানব-সমাজ সভ্যতা ও উন্নতির ক্রম-পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, সাম্য মানবজাতির আদিম অবস্থা, বৈষম্য সভ্যতার ফল। আদিম অবস্থায় যখন প্রত্যেক মনুষ্যই প্রাতঃকাল হইতে সায়ংকাল পর্য্যন্ত মৃগয়া প্রভৃতি একইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা জীবনধারণ করিত, তখন তাহাদের মধ্যে যে কোন বৈষম্য ছিল না, ইহা বলা বাহুল্য। পরে যখন মানব-জীবনে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কার্য্যানুষ্ঠান সকল স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যক্তিতে বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইতে লাগিল, তখন হইতে বৈষম্যের সূত্র আরম্ভ হইল। কার্য্য সকলের স্বাতন্ত্র্য হইতে কার্য্যকারকদিগের স্বাতন্ত্র্য আরম্ভ হইল। স্পেন্সর প্রভৃতি দার্শনিকেরা সভ্যতা ও কার্য্য সকলের স্বাতন্ত্রীকরণ একই অর্থে ব্যবহার করেন। তাঁহারা বলেন, যেমন নিম্নতর জীবের জীবনীক্রিয়া সকল সর্ব্বশরীরে সমভাবে ব্যাপ্ত থাকে, আর সেই ক্রিয়া সকল শরীরের স্থানবিশেষে যত সীমাবদ্ধ হইতে থাকে, ততই জীব উচ্চ শ্রেণীতে উঠে; তেমনই মানব-জীবনের ক্রিয়া সকল যতই বিভক্ত হইয়া ব্যক্তি বা শ্রেণীবিশেষে আবদ্ধ হইতে থাকে, ততই মানবের উন্নতি, ততই সভ্যতার বৃদ্ধি। ফলতঃ কার্য্য সকলের স্বাতন্ত্র্য ভিন্ন মানবজাতির উন্নতি অসম্ভব; এবং এই স্বাতন্ত্র্য হইতে কার্য্যকারকদিগের যে স্বাতন্ত্র্য, তাহাও অপরিহার্য্য। কিন্তু যখন এই স্বাতন্ত্র্য কার্য্যসকলের বিভিন্নতারূপে কারণ অতিক্রম করে বা পুরুষানুক্রমে সংক্রামিত হইয়া অন্যাকার ধারণ করে, তখনই তাহা হইতে বৈষম্যের উৎপত্তি হয়। এই বৈষম্যই নির্দ্দিষ্ট অতিক্রম করিলে সভ্যতা-স্রোতের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হয়। যেমন উচ্চতম জীবে জীবনী ক্রিয়া সকল স্থানবিশেষে বিভক্ত হইয়া সকলই এক উদ্দেশে পরস্পরের সহায়স্বরূপ হইয়া কার্য্য করে, একটি প্রতিকূলে দাঁড়াইলে হয় ত সমস্ত জীবনীশক্তি লুপ্ত হয়, সেইরূপ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কার্য্যকারক একই উদ্দেশে পরস্পরের সহায় হইয়া কার্য্য না করিলে উন্নতির জীবন লুপ্ত হয়। বস্তুতঃ কার্য্যকারকদিগের পরস্পরসহকারিতার অভাবেই সমাজে নানাপ্রকার অশুভকর বৈষম্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেই বৈষম্য হইতেই জাতির পতন হয়। ভারতেও সেই কারণে নানাবিধ বৈষম্য ঘটিয়াছে। সেই বিবিধ বৈষম্য হইতেই ভারতের পতন।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, সেই বিবিধ বৈষম্য, কি কি?

উত্তর—বর্ণ-বৈষম্য, ধর্ম্ম-বৈষম্য, জাতি বৈষম্য পরিচ্ছদ-বৈষম্য, ভাষা-বৈষম্য, শাসন-বৈষম্য, ধনবৈষম্য ও স্ত্রী-পুরুষ. বৈষম্য।

তন্মধ্যে বর্ণ-বৈষম্যই ভারতের বর্ত্তমান অধঃপতনের প্রথম ও প্রধান কারণ। যখন প্রাচীন আর্য্যেরা সিন্ধু পার হইয়া সপ্তনদবিধৌত প্রদেশে অসংখ্য অনার্য্য শত্রুর সম্মুখীন হন, তখন কার্য্যসৌকর্য্যার্থে তাঁহারা আপনাদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। যাঁহাদিগের উপর মন্ত্রণাবিভাগ অর্পিত হয়, তাঁহারা ব্রাহ্মণ নামে আখ্যাত হয়েন; যাঁহাদিগের উপর সমরবিভাগ অর্পিত হয়, তাঁহারা ক্ষত্রিয় নামে আখ্যাত হয়েন; এবং যাঁহাদিগের উপর বাণিজ্যবিভাগ অর্পিত হয়, তাঁহারা বৈশ্যনামে আখ্যাত হয়েন। যদি বৈশ্যেরা পূর্ব্বে জানিতে পারিতেন যে, সাময়িক প্রয়োজনানুসারে বাণিজ্যবিভাগের ভার গ্রহণ করার অপরাধে তাঁহাদিগকে চিরকাল বর্ণদ্বয়ের দাসত্ব করিতে হইবে এবং যদি ক্ষত্রিয়েরা জানিতে পারিতেন যে, সমরক্ষেত্রে নামিয়া নিজ রুধিরব্যয়ে ও শত্রুনিপাত করার অপরাধে তাঁহাদিগকে চিরকাল ব্রাহ্মণদিগের অধঃস্থ থাকিতে হইবে, তাহা হইলে তাঁহারা কখনই এরূপ শ্রমবিভাগে সম্মত হইতেন না। নিশ্চয়ই এই কার্য্যবিভাগ লইয়া প্রথমেই

তাঁহাদিগের মধ্যে ঘোরতর অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত হইত। তৎকালে এরূপ শ্রেণীবিভাগ পুরুষানুক্রমিক বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। যাহাদিগের চিন্তাশক্তি বলবতী ও যাহাদিগের বুদ্ধি সূক্ষ্মার্থদর্শিনী—তাঁহাদিগের উপর মন্ত্রণাবিভাগ ন্যস্ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাই বলিয়া এরূপ কোন চিরন্তন নিয়ম সংস্থাপিত হয় নাই যে, অন্য বিভাগের লোক চিন্তাশক্তির উৎকর্ষ ও বুদ্ধির প্রাখর্য্য দেখাইয়া মন্ত্রণা-বিভাগে আসিতে ইচ্ছা করিলে তথায় আসিতে পারিবেন না; অথবা আদি ব্রাহ্মণগণের পুত্রপৌত্রাদিগণকে চিন্তাশক্তিহীন ও স্থূলবুদ্ধি হইলেও প্রথম শ্রেণীতে রাখিতেই হইবে। এরূপ চিরন্তন নিয়ম ব্রাহ্মণদিগের কূটমন্ত্রণাজালের পরিণত ফল। এইরূপে আর্য্যজাতির মধ্যে বর্ণ-বৈষম্য প্রয়োজনীয়, সাময়িক ও শুভপ্রদ হইতে কালে অপ্রয়োজনীয় চিরন্তন ও অশুভপ্রদ হইয়া উঠিল। এইরূপে ব্রাহ্মণদিগের বুদ্ধিকৌশলে আর্য্যজাতি রোমের পেট্রিসীয় ও প্লীবীয় শ্রেণীদ্বয়ের ন্যায় উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট বর্ণে বিভক্ত হইলেন। ক্রমে বিজয়ের গতিতে একটি অনার্য্য জাতি আসিয়া এই আর্য্য স্রোতস্বিনীর সহিত মিলিত হইল। মিলিত হইল বটে, কিন্তু ইহা পূর্ণ মিলন নহে; গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমের ন্যায় এই সঙ্গমের শ্বেতকৃষ্ণ রেখা অদ্যাপিও বিলীন হইল না। আর্য্যজাতি পরাজিত আদিমনিবাসীদিগকে ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করিলেন বটে, কিন্তু তাহাদিগকে রাজনৈতিক বা সামাজিক সাম্য প্রদান করিলেন না। ইহাঁদিগের শূদ্র বা দাস আখ্যা দিয়া একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীতে পরিণত করিলেন। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের উপর ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব ততদূর খাটে নাই। কারণ, এই তিন বর্ণই এক জাতি-সম্ভূত এবং এই তিন বর্ণই ভারতের বিজেতা। সুতরাং ব্রাহ্মণকে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের কিঞ্চিৎ মুখাপেক্ষা করিয়া চলিতে হইত। কিন্তু শূদ্রদিগের সহিত ব্রাহ্মণদিগের সেরূপ কোন সম্বন্ধ ছিল না। শূদ্রেরা প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রাহ্মণদিগের দাসরূপে হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত হইল। সেই সময় হইতেই আর্য্যক্ষেত্রে বিষবৃক্ষের বীজ রোপিত হইল।

এই আর্য্য উপনিবেশের সহিত আমেরিকায় ইংরাজোপনিবেশ ও ইংলণ্ডে সাক্ষন ও নর্ম্মান্ উপনিবেশের অনেক বৈসাদৃশ্য আছে! আমেরিকায় ইংরাজেরা ভারতীয় আর্য্যদিগের ন্যায় মহত্ত্ব প্রকাশ করিয়া বিজিতদিগকে আপনাদিগের ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহারা আদিমনিবাসীদিগের সমূলে বিনষ্ট করিয়া বৈষম্যের মূলোচ্ছেদ করিয়াছিলেন। বিজিত জাতি বৈষম্যপীড়িত হইলে ক্রমেই অবনতিসোপানে নামিতে থাকে এবং সেই অবনমন-কালে প্রক্ষেপ্তা বিজয়ী জাতিকেও সঙ্গে সঙ্গে নামাইতে থাকে। বিজিতদিগের সংখ্যাবল অধিক, সুতরাং ক্রমে তাহারা অল্পসংখ্যক বিজয়ীকে আপনাদিগের অধঃপতনের সঙ্গী করিয়া লইতে সমর্থ হয়। আমেরিক ইংরাজেরা তাঁহাদিগের আসুরিক ঘাতকতার গুণে এই বিশ্বজনীন অবনতির হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। জাতীয় বৈষম্যের বীজ রোপিত হয় নাই বলিয়াই ইউনাইটেডষ্টেট্‌সের আজ এত উন্নতি! জগতে সকল দেশ অপেক্ষা এই দেশে উন্নতির গতি ক্ষিপ্রতর। আর রোমান, আঙ্গলো ও সাক্ষনেরা আসিয়া যখন শ্বেতদ্বীপে উপনিবেশ সংস্থাপন করিলেন, তখন তাঁহাদিগের নির্য্যাতনে আদিমনিবাসী ব্রিটনেরা উচ্ছিন্ন বা সুদূর পার্ব্বত্যপ্রদেশে অপসারিত হইল। আঙ্গল ও সাক্ষনেরা বৈষম্যবিষের সংক্রামণ হইতে রক্ষা পাইল। এই নবীন জাতি ক্রমেই উন্নতিমার্গে অগ্রসর হইতেছিল। এমন সময় আর একটি বলবত্তর জাতি আসিয়া তাহাদিগের সহিত মিশ্রিত হইল। বিজয়ী নর্ম্মানেরা আঙ্গলো-সাক্ষনদিগকে বিজিত করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগেকে দাসরূপে পরিণত করিতে পারিলেন না, তাঁহাদিগকে অগত্যা সজীবনাশ ও বিশিষ্ট উন্নতিশীল আঙ্গলো-সাক্ষন জাতির সহিত সামাজিক ও রাজনৈতিক সমতায় মিশিয়া যাইতে হইল। আঙ্গলো সাক্ষন ও নর্ম্মান জাতির এরূপ একীভাব হইয়াছে যে, কখন যে তাহাদিগের মধ্যে বৈষম্য ছিল এরূপ বোধ হয় না। এই একীভাবের পরিণাম ইংলণ্ডের বর্ত্তমান উন্নতি। এই সাম্যের বলে ইংলণ্ড ইউরোপীয় জাতিবৃন্দের সিংহপ্রায়। এই সাম্যের প্রসাদে ইংলণ্ড এতদূর বিক্রমশালী!

আর সেই সাম্যের অভাবেই ভারতের আজ এই দুর্দ্দশা। আর্য্যজাতি যে ঔদার্য্য দেখাইয়া বিজিত শূদ্রদিগকে সমূলে উৎসাদিত না করিয়া

আপনাদিগকে সম্প্রদায়ভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন, সেই ঔদার্য্যের বশীভূত হইয়া যদি তাহাদিগকে পূর্ণ সাম্য প্রদান করিতেন, তাহা হইলে আমরা আজ ভারতের অন্য মূর্ত্তি দেখিতাম। তাহা হইলে আমাদিগকে আজ ভারতবক্ষোপরি বৈদেশিক ধ্বজস্তম্ভ নিখাত ও ভারতগগনে বৈদেশিক পতাকা উড্ডীন দেখিতে হইত না। তাহা হইলে ইতিহাসও এই মর্ম্মন্তুদ বার্ত্তা বহন করিত না যে, অল্পসংখ্যক যবনসেনা ভারত-হৃদয়ে আসিয়া অসংখ্য হিন্দু-সেনাকে মোহমুগ্ধ করিয়া ভারত-সিংহাসন অধিকার করিল।

সদাপবিজ্ঞাত জগতের অধীশ্বরী রোমনগরী প্রথমে সাম্যের মোহিনী শক্তি অনুভব করিতে পারেন নাই। এই জন্য পেট্রিসান, প্লিবীয় এবং নাগরিক ও অনাগরিক এই দ্বিবিধ প্রকার বৈষম্যে তাঁহার অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ জর্জরিত ছিল. পেট্রিসীয় ও প্লীবীয়দিগের মধ্যে এরূপ বিদ্বেষভাব ছিল যে, এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের উচ্ছেদসাধন করিতে পারিলে ছাড়িতেন না। কিন্তু দুই সম্প্রদায়ই প্রবল, সুতরাং পরস্পর কেহই কাহারও উচ্ছেদসাধন করিতে পারিতেন না। অবশেষে [illegible] যে ক্রমে এই দুই সম্প্রদায়ের আভ্যন্তরীণ বৈষম্য অপনীত হইল। রোমের তেজঃপ্রতিভা অধিকতর প্রদীপ্ত হইতে লাগিল। আভ্যন্তরীণ বৈষম্য ঘুচিল বটে, কিন্তু বহিশ্চর বৈষম্য বেশ সুরক্ষিত রহিল। বিজিত ইতালীয় প্রদেশ সকলকে রোম প্রথমে সমনাগরিকত্বের স্বত্ব প্রদান করেন নাই। সেই জন্য তখন বিজিত ইতালীয় প্রদেশ সকল সুবিধা পাইলেই রোমের প্রতিকূলে অভ্যুত্থিত হইত। মহাবীর হানিবল্ যখন আল্পস পর্ব্বত উত্তরণ করিয়া ইতালীক্ষেত্রে অবতরণ করেন, তখন তাঁহার সহিত ত্রিশ সহস্রমাত্র সৈন্য ছিল। তিনি সেই অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়াই প্রবলপরাক্রান্ত রোম-নগরীর অভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁহার কি আশা ও কি সাহস ছিল? তিনি জানিতেন—রোম বিজিত ইতালীয় প্রদেশ সকলকে সমনাগরিকতা প্রদান করেন নাই। এই জন্য ইতালীয় প্রদেশ সকল মনে মনে রোমের বিরুদ্ধে চটিয়া আছে, তাঁহার সৈন্য উপস্থিত হইলেই তাহারা তাঁহার সহিত মিলিত হইবে। বাস্তবিকও তাহাই ঘটিল। হানিবলের সৈন্যসংখ্যা ইতালীক্ষেত্রে এত বাড়িয়াছিল যে, কানি-সমরে তিনি একলক্ষ রোমীয় সেনার সম্মুখীন হইয়া ইহাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। রোম ইহার পর আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিলেন ও ক্রমে ক্রমে সমস্ত ইতালীয় প্রদেশকে সমনাগরিকত্ব প্রদান করিতে লাগিলেন। ক্রমেই রোমের বলবীর্য্য বাড়িতে লাগিল। শেষে রোম পৃথ্বীশ্বরী হইয়া উঠিলেন।

বুদ্ধিদোষে ও প্রবৃত্তিবলে আর্য্যেরা কোন কালেই বৈষম্যের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারিলেন না। তাহার পরিণাম অন্তর্বিপ্লব ও বহিরাক্রমণ। আর্য্যদিগের অন্তর্বিপ্লবের অনেক পরিচয় সংস্কৃত-কাব্যপুরাণাদিতে পাওয়া যায়। যখন ব্রাহ্মণেরা অত্যন্ত অত্যাচারী হইয়া উঠিলেন, ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণদিগের নির্যাতন আরম্ভ করিলেন, ব্রাহ্মণদিগের [illegible] হইল। ব্রাহ্মণবীর পরশুরাম একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া ক্ষত্রিয়রুধিরে পিতৃতর্পণ করিয়া তবে এ ক্রোধ উপশমন করেন।

ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ পৃথিবীং
কৃত্বা নিঃক্ষত্রিয়াং প্রভুঃ ।
সমন্তপঞ্চকে পঞ্চ
চকার রৌধিরান্ হ্রদান্ ॥

সেই অবধি ক্ষত্রিয়সংখ্যা ভারতে এতদূর কমিয়া গিয়াছে যে, ব্রাহ্মণসংখ্যার সহিত তুলনায় ইহা গণনীয়ের মধ্যেই নহে। ব্রাহ্মণদিগের বৈষম্য-প্রবণতার কোন অন্তরায়স্বরূপ ক্ষত্রিয়দিগের ধ্বংসের পর ব্রাহ্মণেরা আরও যথেচ্ছাচারী হইয়া উঠিলেন। শূদ্রদিগের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া উঠিল। তাঁহারা শাস্ত্রকর্ত্তা, সুতরাং নূতন নূতন শাস্ত্র করিয়া শূদ্রের দাসত্বশৃঙ্খল আরও কষিতে লাগিলেন। ব্যবস্থা হইল, শূদ্রকে ব্রাহ্মণের চরণে লুটাইয়া তাঁহার চরণরেণু মস্তকে গ্রহণ করিতে হইবে, অথচ শূদ্র অস্পৃশ্য; শূদ্রের জল অব্যবহার্য্য। নীচবৃত্তি তাহার অবলম্বনীয়; কোন উচ্চ সুখে তাহার অধিকার নাই; বেদাদি শাস্ত্রে তাহার অধিকার নাই, অথচ সেই শাস্ত্রের শাসনে তাহাকে চলিতে হইবে। তাহার ইহকাল ও পরকালের একমাত্র

গতি ব্রাহ্মণ। তাহার যথাসর্ব্বস্ব ব্রাহ্মণকে দান না করিলে তাহার পরকালের গতি নাই, অথচ যে ব্রাহ্মণ শূদ্রের দান গ্রহণ করিবেন, তিনি পতিত হইবেন। সুতরাং শূদ্র দান করিতে ইচ্ছুক হইলেও তাহার পক্ষে গ্রহীতা ব্রাহ্মণ মিলা কঠিন হইত।

শূদ্রদিগের উপর প্রভুত্ব বাড়াইবার জন্য ব্রাহ্মণেরা—ব্রাহ্মণের উপর ব্রাহ্মণ, উপনিষদের উপর উপনিষদ, আরণ্যকের উপর আরণ্যক, সূত্রের উপর সূত্র, তার উপর ভাষ্য, তার টীকা, তার ভাষ্য—করিয়া অসংখ্য—বৈদিক ধর্ম্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থে ভারত-সাহিত্য সমাচ্ছন্ন করিলেন। শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শনাদি প্রকৃত বিদ্যার আলোচনা ভারত হইতে বিলুপ্ত হইল। শূদ্রদিগের জন্য যে শুদ্ধ কঠিন ধর্ম্মশাসন প্রতিষ্ঠাপিত হইল, এরূপ নহে। তাহাদিগের উপর কঠোরতর দণ্ডবিধি সংস্থাপিত হইল। আমরা ভারতবাসীদিগের উপর ইংরাজদিগের পক্ষপাত ও অত্যাচার দেখিয়া কুপিত হই। কিন্তু ইংরাজদিগের প্রশংসায় আমাদিগকে অবশ্য বলিতে হইবে যে, এ পক্ষপাত বা অত্যাচার দণ্ডবিধির দোষে নহে, ব্যবস্থাপক সভার মসীমসী লেখনীর ফল নহে, ইহা সেই দণ্ডবিধির প্রয়োগকর্ত্তা কতিপয় অজাতশ্মশ্রু উষ্ণশোণিত বিজয়দর্পী শ্বেতযুবকের প্রয়োগদোষ। ইংরাজদিগের দণ্ডবিধিতে শ্বেতকৃষ্ণ বলিয়া কোন প্রভেদ নাই; ইহা ইংরাজদিগের ভারত-শাসনের একটি প্রকাণ্ড কীর্ত্তিস্তম্ভ! কিন্তু ব্রাহ্মণ-ব্যবস্থাপক সমাজ কর্তৃক প্রণীত দণ্ডবিধি কিরূপ? ইহা আমূল পক্ষপাতদোষে দূষিত। মনুপ্রণীত দণ্ডবিধি পাঠ করিতে করিতে আমাদিগের মুখ লজ্জায় মাটীর সঙ্গে মিশিয়া যায়। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের অকীর্ত্তিস্তম্ভ দেখিয়া আমাদের হৃদয়ে নিদারুণ ব্যথা উপস্থিত হয়।

আবার সেই ভীষণ দণ্ডবিধির প্রয়োগকর্ত্তা কে? প্রণেতা প্রয়োগকর্ত্তা নহেন। ব্রাহ্মণ দণ্ডবিধাতা হইলে, ইচ্ছা করিলে দণ্ডের লাঘব বা মাপ করিতে পারিতেন। কিন্তু ক্ষত্রিয় ইচ্ছা করিলেও ব্রাহ্মণের দণ্ডবিধির অন্যথাচরণ করিতে পারিতেন না। ব্রাহ্মণের গৃহে অকালমৃত্যু ঘটিল, ব্রাহ্মণ আসিয়া রাজদ্বারে তারস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন, বলিলেন, "মহারাজ! আপনার রাজ্যে নিশ্চয়ই কোন শূদ্র মুনিব্রত অবলম্বন করিয়াছে, সেই পাপেই আমার শিশু-সন্তানটি মরিয়াছে।" ব্রাহ্মণের ক্রন্দনে রাজা স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি বন উপবন সমস্ত খুঁজিয়া দেখিলেন, এক নিবিড় বনে এক জন শূদ্র প্রগাঢ় তপস্যায় নিমগ্ন আছে। অমনি তাঁহার শাণিত অসি শূদ্র তপোধনের মস্তক দ্বিধা বিচ্ছিন্ন করিল। শূদ্রের মস্তক ত এইরূপে কথায় কথায় কাটা পড়িত, কিন্তু ব্রাহ্মণের কেশ স্পর্শ করে, কাহার সাধ্য? ব্রাহ্মণ কোন অপরাধেই শীর্ষচ্ছেদ্য নহেন। ব্রাহ্মণ স্ত্রীহত্যা, নরহত্যা, শিশুহত্যা প্রভৃতি যাহাই করুন না কেন, নির্ব্বাসন তাঁহার চরম দণ্ড!

এই ত গেল রাজনৈতিক ও ধর্ম্মনৈতিক শাসন। সামাজিক শাসন ইহা অপেক্ষা কোন মতে ন্যূন নহে। ব্রাহ্মণ চতুর্ব্বর্ণ বিবাহ করিতে পারিবেন; ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণেতর বর্ণত্রয়ে বিবাহ করিতে পারিবেন; বৈশ্য নিম্নতর দ্বিবর্ণে বিবাহ করিতে পারিবেন; কিন্তু শূদ্রকে কেবল নিজ বর্ণ হইতেই ভার্য্যা মনোনীত করিতে হইবে। শূদ্র ব্রাহ্মণ-কন্যাতে অভিগমন করিলে শীর্ষচ্ছেদ্য হইবে এবং তাহাদিগের সঙ্গমের ফলস্বরূপ অপত্য অস্পৃশ্য শূদ্র অপেক্ষাও ঘৃণিত চণ্ডাল হইবে। শূদ্র অস্পৃশ্য বটে, কিন্তু চণ্ডালের আবার ছায়া পর্য্যন্তও অস্পৃশ্য। কিন্তু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য—শূদ্রকন্যাতে অভিগমন করিলে তাঁহারা যে কেবল দণ্ড হইতেই নিস্কৃতি পাইবেন, এরূপ নহে, তাঁহাদিগের সঙ্গমের ফলস্বরূপ অপত্যসমাজে সুপ্রতিষ্ঠ হইবে। ব্রাহ্মণের অন্নজল সকলকে গ্রহণ করিতে হইবে, কিন্তু তিনি কাহারও অন্নজল গ্রহণ করিবেন না। শূদ্রের অন্নজল গ্রহণ করিলে ব্রাহ্মণ পতিত হইবেন, কিন্তু ব্রাহ্মণের প্রসাদভক্ষণে শূদ্রের ঐহিক বিশুদ্ধি ও পারলৌকিক মুক্তি।

এক্ষণে দেখিতে হইবে, এই বর্ণগত বৈষম্য বর্ত্তমান ভারতে বিদ্যমান আছে কি না। ইংরাজশাসনের অধীনে বর্ণগত রাজনৈতিক বৈষম্য অপনীত হইয়াছে বটে, কিন্তু সামাজিক ও ধর্ম্মনৈতিক বৈষম্য প্রবলতররূপ বর্ত্তমান আছে। পূর্ব্বে অনুলোম-বিবাহ থাকায় নিম্নবর্ণস্থ কন্যার উচ্চবর্ণের স্বামী লাভের আশা ছিল, কিন্তু এক্ষণে উচ্চবর্ণের পুরুষ নিম্নবর্ণের কন্যাকে বিবাহ করিলে সমাজচ্যুত

হইবেন। অন্নগ্রহণ সম্বন্ধেও সেইরূপ কঠোরতা অদ্যাপি বর্ত্তমান। ধর্ম্মশাসনও সেইরূপ কঠোর রহিয়াছে। সেই যাগযজ্ঞ, সেই মন্ত্র, সেই দানধ্যান, সেই দক্ষিণা, সেই প্রায়শ্চিত্ত। আমরা পরিবার-বিদ্বেষের কথা বলিতেছি না, কিন্তু ভারতবর্ষীয় হিন্দুজাতি সাধারণের কথা বলিতেছি। ব্রাহ্মণেরা এইরূপে অন্য বর্ণকে আপনাদিগের কূট উপধর্ম্ম-জালে আচ্ছন্ন করিতে গিয়া আপনারাও তাহাতে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। যাহারা প্রথমে যাগ-যজ্ঞের ব্যবস্থা ও মন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাঁহারা যাগযজ্ঞের উপকারিতা বা মন্ত্রের শক্তি বিশ্বাস করিতেন, এরূপ বোধ হয় না। সূক্ষ্মদর্শী চার্ব্বাক্ সত্যই বলিয়াছেন যে, ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণেরা দক্ষিণাদির লোভেই যাগযজ্ঞাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন। বস্তুতঃ আদি ব্রাহ্মণেরা যেরূপ বুদ্ধিমান্ ছিলেন, তাহাতে কোন প্রকার উপধর্ম্মে তাঁহাদিগের যে বিশ্বাস থাকিতে পারে, এরূপ বোধ হয় না। হীনবর্ণের মূর্খতার সুবিধা লওয়াই তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু হীনবর্ণের সর্ব্বনাশের জন্য তাঁহারা যে উপধর্ম্মের সৃষ্টি করিলেন, কালে তাঁহাদিগের বংশধরগণ সেই উপধর্ম্ম-জালে জড়িত হইলেন! তাঁহাদিগের বংশধরগণ তাঁহাদিগের অন্তর্নিহিত গূঢ় অভিপ্রায় জানিতে না পারিয়া, স্বার্থসাধনোদ্দেশে পিতৃগণ-প্রবর্ত্তিত সেই উপধর্ম্মকেই সনাতনধর্ম্ম বলিয়া মনে করিলেন। অন্যান্য বর্ণের ন্যায় তাঁহারাও সেই উপধর্ম্মের ঘোরতর গোঁড়া হইয়া উঠিলেন, অন্ধবিশ্বাসে ও পূর্ব্বপুরুষগণের অন্ধ অনুসরণে ক্রমে তাঁহাদিগের বুদ্ধিভ্রংশ হইতে লাগিল। কেবল শাস্ত্র আশ্রয় করিয়া কোন কর্ত্তব্য নির্ণয় করিবে না, যুক্তিহীন সিদ্ধান্তে নিশ্চয়ই ধর্ম্মহানি হয়,—

> কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য
> ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
> যুক্তিহীনবিচারেণ
> ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥

দেবগুরু পণ্ডিতশিরোমণি সূক্ষ্মবুদ্ধি বৃহস্পতির এই অমূল্য উপদেশ তাঁহারা ক্রমেই ভুলিয়া গেলেন, কালে বৃহস্পতির বংশধরেরা গণ্ডমূর্খ হইয়া উঠিলেন। ক্রমে ঘোর অজ্ঞানতিমির সমস্ত ভারত আচ্ছন্ন করিল। বর্ত্তমান ব্রাহ্মণদিগের অবস্থা এই জন্য তদুৎপীড়িত শূদ্রজাতি অপেক্ষাও অধিকতর শোচনীয়। ইহারা পাণ্ডিত্যাভিমানী অথচ চূড়ান্ত মূর্খ। ইহাদের পাণ্ডিত্য শাস্ত্রের গৎ মুখস্থ রাখায়, অথচ ইহাদিগের মধ্যে অনেকে সে শাস্ত্র কখন চক্ষে দেখেন নাই। যে দেবভাষায় সে শাস্ত্র রচিত, সে দেবভাষার বর্ণমালা পর্য্যন্তও কখন নয়নগোচর করেন নাই। যাঁহাদিগের সে ভাষায় কিঞ্চিৎ প্রবেশলাভ হইয়াছে, তাঁহাদিগেরও শব্দজ্ঞান ভিন্ন অন্য জ্ঞান নাই। শাস্ত্রকারেরা কি উদ্দেশ্যে সেই সকল শাস্ত্র করিয়াছিলেন, যে সকল শাস্ত্র সঙ্গত কি না, এখনকার কালের উপযোগী কি না, এ সকল বিচার করিবার শক্তি তাঁহাদিগের নাই। শূদ্রেরা, দেখিবার অধিকার নাই বলিয়া, চক্ষু মুদিত করিয়া ব্রাহ্মণেরা যে দিকে যাইতে বলিতেছেন, সেই দিকেই যাইতেছেন, কিন্তু ব্রাহ্মণেরা পিতৃপুরুষগণ খানায় পড়িতে বলিয়াছেন বলিয়া উন্মীলিত নয়নে খানায় গিয়া পড়িতেছেন।

এই বর্ণবৈষম্য এক্ষণে এত বাড়িয়াছে যে, ভাবিতে গেলে ভয় হয়। খৃষ্টানেরা খৃষ্টানকে দেখিলে ও মুসলমানের মুসলমানকে দেখিলে যেরূপ আনন্দ হয়, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকে ও শূদ্রের শূদ্রকে দেখিলে সেরূপ আনন্দ হয় না। বঙ্গে ব্রাহ্মণ—রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক, সপ্তশতী প্রভৃতি কয় প্রধান ভাগে বিভক্ত। সেই কয় প্রধান ভাগের ভিতর আবার কুলীন, ভঙ্গকুলীন, শ্রোত্রিয়, বংশজ প্রভৃতি এত অবান্তরভেদ জন্মিয়াছে যে, সে সকলের সংখ্যা করা সহজ নহে। এক একটি ভাগ এক একটি স্বতন্ত্র জাতি। এক একটি অবান্তরভাগ এক একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায়। রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক, সপ্তশতী ইহাঁরা পরস্পরের সহিত আদান-প্রদান বা পরস্পরের অন্নগ্রহণ করেন না। কুলীন বিনা দক্ষিণায় ভঙ্গকুলীন বা বংশজের অন্ন গ্রহণ করিবেন না, বিপুল অর্থ বিনা তাঁহার কন্যা গ্রহণ করিবেন না। শ্রোত্রিয়, বংশজ বা ভঙ্গ-কুলীন অর্থব্যয়েও সহজে কুলীন কন্যা বিবাহ করিতে পারিবেন না। যদি কোন কুলীন দুর্বুদ্ধিবশতঃ তদীয় কন্যাকে বংশজের হস্তে সমর্পণ করেন, তিনি সবংশে কৌলীন্যচ্যুত হইবেন। এতদ্ভিন্ন শূদ্রযাজনা ও যাবনিক সংস্রবে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে পীরআলি ও গোব্রাহ্মণাদি অসংখ্য শ্রেণীবিভাগ জন্মিয়াছে।

ইহাদিগের পরস্পরের ভিতর হিন্দু মুসলমান পার্থক্য বর্ত্তমান। এতদ্ভিন্ন পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণদিগের ভিতরও অসংখ্য শ্রেণীবিভাগ আছে। প্রস্তাব-বাহুল্যভয়ে সে সকলের উল্লেখ হইতে বিরত থাকিতে হইল। ভারত ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এত প্রাদেশিক বিদ্বেষ জন্মিয়াছে যে, এক জন কাশ্মীরী বা পাঞ্জাবী ব্রাহ্মণ প্রাণান্তেও কখন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণকে কন্যাদান বা তাঁহার অন্ন-গ্রহণ করিবেন না। ইরূপে দ্রাবিড়ী, কর্ণাটী, মহারাষ্ট্রী, গুজরাটী, ভোজপুরী, কনোজী, বাঙ্গালী, উড়িয়া প্রভৃতি ব্রাহ্মণেরা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জাতি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহারা পরস্পরকে বিধর্ম্মীর ন্যায় ঘৃণা করেন। এই গৃহবিচ্ছেদ হইতেই ব্রাহ্মণদিগের বর্ণ-প্রাধান্য বিলুপ্ত হইয়াছে। যে স্বশ্রেণীহিতৈষিতা শক্তিপ্রভাবে ব্রাহ্মণেরা এক সময় চতুর্ব্বর্ণের উপর অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রভুতা সংস্থাপন করিয়াছিলেন, যে স্বশ্রেণীহিতৈষিতাবলে ইহারা দিগন্তব্যাপী প্রবল-প্রতাপ বৌদ্ধধর্ম্মেরও মূলোচ্ছেদ করিয়াছিলেন, সেই স্বশ্রেণীহিতৈষিতা এক্ষণে সঙ্কীর্ণতম সীমায় আবদ্ধ হইয়াছে।

এক্ষণে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণসংখ্যায় ব্রাহ্মণ ও শূদ্রবর্ণের সহিত তুলনায় নগণ্য মাত্র, সুতরাং তাহাদিগের বিষয় লইয়া সবিশেষ আন্দোলন অনাবশ্যক। তবে ইহারাও বর্ণবৈষম্য দোষে উৎপীড়িত ও উৎপীড়ক। ক্ষত্রিয়দিগকে আজও সামাজিক ও ধর্ম্ম-নৈতিক বিষয়ে ব্রাহ্মণদিগের প্রভুতা স্বীকার করিতে হয়। রাজ্যশাসনভার তাঁহাদিগের হস্তে সমর্পিত ছিল বলিয়া পূর্ব্বে তাঁহাদিগের এ দাসত্ব তত ক্লেশকর বোধ হইত না। এক্ষণে তাঁহারা পূর্ব্ব-অধিকার হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন, তথাপি পূর্ব্ব-দাসত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই; কিন্তু তাঁহাদিগের এক সান্ত্বনাস্থল আছে। তাঁহারা এখনও বৈশ্য ও শূদ্রের উপর আধিপত্য করিতেছেন। তাঁহারা যেমন পদদলিত হইতেছেন, তেমনই পদদলিত করিতেছেন।

বৈশ্যদিগের অবস্থা ক্ষত্রিয়দিগের অবস্থা অপেক্ষা অধিকতর শোচনীয়। বঙ্গের সুবর্ণ-বণিক্‌দিগের সামাজিক অবস্থা এতদিন শূদ্রদিগের অপেক্ষাও নিকৃষ্ট ছিল। আজকাল মাত্র ইহাঁরা বৈশ্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। এতদিন ইহারা অন্ততঃ অস্পৃশ্য-চণ্ডাল-সম ছিলেন। লক্ষ্মীর বরপুত্র বলিয়া ইহাঁরা ব্রাহ্মণদিগের কৃপার পাত্র ছিলেন মাত্র। অন্যান্য প্রদেশের বৈশ্যদিগেরও সামাজিক অবস্থা সম্পূর্ণ সুখপ্রদ নহে।

আমরা এক্ষণে হিন্দুসমাজের প্রাণভূত অথচ অত্যন্ত অবহেলিত শেষ শাখায় উপনীত হইলাম। আমরা শূদ্রবর্ণকে হিন্দু সমাজের প্রাণভূত বলিলাম; কারণ, শূদ্রেরা সংখ্যায় আর্য্য বর্ণত্রয় অপেক্ষা অনেক অধিক। বিজিত ও বিজেতা জাতির মধ্যে এরূপ সংখ্যাবৈলক্ষণ্য ঘটিবেই ঘটিবে। যদি ইংরাজেরা কখন ভারতবর্ষে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়া ভারত-বাসীদিগের সহিত মিশিয়া যান, তাহা হইলে তাঁহাদিগের বা তাঁহাদিগের ভবিষ্য বংশধরগণের সংখ্যা ভারতের বিজিত অধিবাসীদিগের সংখ্যা অপেক্ষা চিরকালই ন্যূন থাকিবে।

এই শূদ্রদিগের মধ্যে আবার এত সাম্প্রদায়িকতা জন্মিয়াছে যে, এক একটি সম্প্রদায়কে এক একটি স্বতন্ত্র বর্ণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। উচ্চশ্রেণীর শূদ্র ও নিম্নশ্রেণীর শূদ্রের মধ্যে ব্রাহ্মণ-শূদ্র-পার্থক্য বর্ত্তমান। আর্য্য ও অনার্য্য বর্ণ সংমিশ্রণে যে সঙ্কর-বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাদিগের অবস্থা বিজিত শূদ্রগণের অপেক্ষা বড় অধিক ভাল নহে। সঙ্করবর্ণে আর্য্যশোণিত প্রবাহিত হইতেছে বটে, তথাপি ইহারা আর্য্যবর্ণত্রয়ের অনৌদার্য্য বশতঃ উক্ত বর্ণত্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারেন নাই; সুতরাং তাঁহাদিগকে অগত্যা শূদ্রশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকিতে হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন আর্য্যজাতির পরস্পর মিশ্রণে যে সঙ্করবর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাদিগের সামাজিক অবস্থা পূর্ব্বোক্ত বর্ণসঙ্করের অবস্থা অপেক্ষা অনেক উচ্চ। যাহা হউক, সঙ্করবর্ণ, সৎশূদ্র, অন্ত্যজ-শূদ্র ও তাহাদিগের শাখা-প্রশাখা লইয়া শূদ্রবর্ণ অসংখ্য ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। তাহাদিগের পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদান বা অন্নগ্রহণাদি প্রচলিত নাই।

এইরূপে হিন্দুসমাজ অসংখ্য শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পরস্পর মমতাশূন্য, বিচ্ছিন্নাঙ্গ ও জাতীয় ভাব-বিবর্হিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন জেতার হস্তে পতিত হইতেছে। মোগল, পাঠান, তুর্কী, দিনেমার —পর্টুগিজ, ওলন্দাজ, ফরাসী, ইংরাজ—ক্রমেই এই ধিকলাঙ্গ অন্তর্বিচ্ছিন্ন ভারতে আধিপত্য বিস্তার

করিয়াছেন। যত দিন এক অঙ্গে বেদনা লাগিলে অন্যান্য অঙ্গে তাড়িতবেগে সমবেদনা উপস্থিত না হইবে, যত দিন বর্ণমধ্যে ব্রাহ্মণ শূদ্র ভেদ উঠিয়া না যাইবে, তত দিন হিন্দুজাতির বৈদেশিক অধীনতা হইতে রক্ষা নাই। ইংরাজ যায়, রুস আসিবে, রুস যায়, জর্ম্মান আসিবে, জর্ম্মান যায়, ফরাসী আসিবে। এইরূপে অনন্ত বিজয়প্লাবনে ভারতবক্ষ আপ্লুত হইবে।

ভারতের অধঃপতনের দ্বিতীয় কারণ *ধর্ম্ম-বৈষম্য।* যখন আর্য্যজাতি ইরিণ বা ঈরাণ দেশ হইতে আসিয়া প্রথমে ভারত বিজয় করেন, তখন উহাঁরা বুদ্ধিবলে দেখিতে পান যে, বিজিতদিগকে আপনাদিগের ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করিতে না পারিলে তাঁহাদিগের উপর চিরকাল আধিপত্য করিতে পারিবেন না; বিজিতদিগকে স্বধর্ম্মে আনিয়াছিলেন বলিয়াই রাজনৈতিক প্রভুতার বিলোপেও বিজিত শূদ্রগণের উপর ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্মনৈতিক প্রভুতা অদ্যাপি অক্ষুন্ন রহিয়াছে। এই ধর্ম্মনৈতিক একীভাবের নিমিত্তই আর্য্য ও অনার্য্যে জেতা ও বিজিত ভাব একবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। কখনও যে আর্য্যেরা শূদ্রদিগকে বিজিত করিয়াছিলেন, ঐতিহাসিক স্মৃতি পর্য্যন্তও শূদ্রসাধারণের মন হইতে তিরোহিত হইয়াছে। অশিক্ষিত শূদ্রেরা আজও বুঝাইয়া দিলেও বুঝিতে পারে না যে, তাহাদিগের এ দুর্গতির প্রধান কারণ আর্য্য ব্রাহ্মণ। তাহারা জানে, ব্রাহ্মণ তাহাদিগের পারত্রিক মুক্তি-দাতা। তাহাদিগের পারত্রিক মুক্তিদাতা ব্রাহ্মণ কখন তাহাদিগের ঐহিক সুখের হন্তা হইতে পারেন, শূদ্রসাধারণ ইহা মনে করিতেও পাপ মনে করে। ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদিগের এই সূক্ষ্মদর্শনের ফল আরও কত দিন ভোগ করিবেন, তাহারও ইয়ত্তা নাই।

ভারতে আর্য্যদিগের ন্যায় আর কোন বিজেতৃ জাতি বিজিতদিগকে আমূল স্বধর্ম্ম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারেন নাই। এই জন্য মুসলমান রাজত্বকাল দীর্ঘকাল ভারতে স্থায়ী হয় নাই। মুসলমানেরা আংশিক কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাদিগের রাজত্ব সহস্রবর্ষব্যাপী হইয়াছিল। মোগল রাজবংশ হিন্দুজাতির প্রতি ধর্ম্মনৈতিক উদারতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়াই মোগল সাম্রাজ্যের গৌরব-রবি এত উজ্জ্বল বিভা ধারণ করিয়াছিল।

নব্য ভারত ধীরে ধীরে অল্পে অল্পে এক্ষণে জাতীয় জীবন উপলব্ধি করিতেছেন, কিন্তু ধর্ম্ম-নৈতিক একতা ভিন্ন জাতীয় জীবন অঙ্গহীন। আমি যতই কেন উদার হই না, মুসলমান খৃষ্টীয়ান্ য়িহুদীকে একটু দূরে রাখিব। সেইরূপ খৃষ্টীয়ান্ মুসলমান য়িহুদী যতই উদার হউন না, বিধর্ম্মী বা পৌত্তলিকোপাসক বলিয়া হিন্দু তাঁহার ঘৃণার পাত্র বা শোচ্য। অন্নজলাদি গ্রহণ ও অন্নদানপ্রদান ব্যতীত কখনই সম-সামাজিকতা জন্মে না। সম-সামাজিকতা ব্যতীতও জাতীয় জীবন দৃঢ় হয় না। ধর্ম্মনৈতিক একতা ব্যতীতও এই সমসামাজিকতা কখনই সম্ভবে না; সুতরাং ভারতের জাতীয় একতা-স্পন্দনের জন্য ধর্ম্মনৈতিক একতা প্রয়োজনীয়।

ভারতের অধঃপতনের তৃতীয় কারণ *জাতি-বৈষম্য।* এ জাতিবৈষম্য হেতুবিহিত-জাতি-বৈষম্য বা বর্ণ-বৈষম্য হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইহা ভৌগোলিক বা প্রাদেশিক জাতীয়তা। প্রদেশভেদে ভারতবাসিগণের পরস্পরের প্রতি জাতীয় বিদ্বেষ ইহার প্রতিপাদ্য। এই ভৌগোলিক সাম্প্রদায়িকতা বহু কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। যখন ভারত অসংখ্য ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল, তখনই এই সাম্প্রদায়িকতার উৎপত্তি। তখন ইহা অনিবার্য্য ও কতকটা প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। কালক্রমে এই অনিবার্য্য ও প্রয়োজনীয় ভৌগোলিক বিভাগ আজ ঘোরতর জাতীয় ভাবে পরিণত হইল। এক আর্য্য জাতি ও এক অনার্য্য জাতি এই সকল বিভিন্ন ভৌগোলিক সীমায় আবদ্ধ হইয়া ক্রমে আপনাদিগের প্রকাণ্ড জাতীয় ভাব ভুলিয়া যাইতে লাগিলেন। মহারাষ্ট্রী বা পাঞ্জাবী প্রভৃতি অন্য বাঙ্গালী উড়িয়া প্রভৃতি আর্য্যকে স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। বিভিন্নদেশীয় অনার্য্যদিগের মধ্যেও এইরূপ বিজাতীয় ভাব। এই প্রাদেশিক জাতীয় ভাব ক্রমে জাতীয় শত্রুতায় পরিণত হইল। এই প্রাদেশিক জাতীয় শত্রুতা হইতেই আর্য্যজাতির যবন হস্তে পতন হয়। এই শত্রুতা থাকিতে আমাদিগের ভারতীয় জাতীয় মাহাত্ম্য কখনই হইবে না। রোমীয় রাজতন্ত্রের সময় ইতালীতে এই প্রাদেশিক জাতীয় বিদ্বেষ ছিল; এই জন্য তখন রোমের তেজঃপ্রতিভা তত দূর বিকাশ পায় নাই। রোমীয় সাধারণতন্ত্র সময় এই

প্রাদেশিক জাতীয়বিদ্বেষ বিলুপ্ত হয়; এই জন্য এই সময়ে রোমের এত প্রতাপ, এত মাহাত্ম্য! রোমীয় সাম্রাজ্যের সময়ও এরূপ প্রাদেশিকতা ছিল না, রোমীয় সাম্রাজ্যেরও গৌরবের ইয়ত্তা ছিল না। রোম-সাম্রাজ্যের পতনের পর আবার ইতালী এই প্রাদেশিক জাতীয় সাম্প্রদায়িকতায় ছিন্ন-ভিন্ন হইল। তাহার পরিণাম বৈদেশিক অধীনতা। ম্যাটসিনি ও তৎসহচরবৃন্দকে এই প্রাদেশিক জাতীয় সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে অসংখ্য লেখনী-সমরে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। সেই মহতা উদ্দীপনা শক্তিপ্রভাবে ইতালীয় প্রদেশ সকল যখন আপনাদিগের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন, তখন তাঁহারা পীডমণ্টরাজ ভিকটর ইমানুয়েলের অধীনে একটি সমবেত ইটালীয় জাতিরূপে পরিণত হইলেন। অমনি তাঁহাদিগের পায়ের শৃঙ্খল খুলিল। গ্যারিবল্ডী সমবেত ইতালীয় সেনা লইয়া বিজয়ী অষ্ট্রীয়দিগকে বিজিত করিয়া তুষরাশির ন্যায় তাহাদিগকে ইতালীক্ষেত্র হইতে উড়াইয়া দিলেন। এইরূপ যখন জর্ম্মানী কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাদেশিক রাজ্যে বিভক্ত ছিল, তখন ফ্রান্সের পদাঘাতে মধ্যে মধ্যে জর্ম্মানদিগের মস্তক চূর্ণীকৃত হইত। প্রথম নেপোলিয়নের সময় তাঁহাদিগের দুর্গতির আর পরিসীমা ছিল না। তৃতীয় নেপোলিয়নেরও ভয়ে জর্ম্মানেরা কম্পিত হইতেন। স্বদেশহিতৈষী বিস্মার্ক তাঁহাদিগের জাতীয় অবনতির কারণ বুঝিলেন। জাতীয় একতাসম্পাদনে তিনি প্রাণপণ করিলেন। তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টায় বিচ্ছিন্ন জর্ম্মানপ্রদেশ সকল প্রসিয়ার রাজার অধীনে একটি প্রকাণ্ড জাতিরূপে পরিণত হইল! সমবেত জর্ম্মান্ সাম্রাজ্যের প্রতাপ অচিরকালমধ্যে বিজয়ী ফ্রান্সে অনুভূত হইল। সিডান্ রণক্ষেত্রে ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন সমবেত জর্ম্মান্ সেনার পদানত হইলেন। অবরুদ্ধ পারিস্ ছয় মাস আত্মরক্ষার পর বিজয়ী জর্ম্মান্ সেনার নিকট আপনার দ্বারোদ্ঘাটন করিলেন এবং সুবর্ণরাশির বিনিময়ে অবরুদ্ধ ফরাসীগণ প্রাণভিক্ষা পাইলেন। ইতিহাস এইরূপ অসংখ্য দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ, কিন্তু আর নিদর্শনের প্রয়োজন নাই। এক্ষণে সকলেই বুঝিবেন যে, এই প্রাদেশিক জাতীয় সাম্প্রদায়িকতার পরিহার ব্যতীত ভারতে জাতীয় একতাবন্ধনের কোন আশা নাই। এই প্রাদেশিক জাতীয় ভাবের নিরাকরণের তিনটি প্রধান অন্তরায় আছে;—পরিচ্ছদ-বৈষম্য, ভাষা-বৈষম্য ও শাসন-বৈষম্য। সুতরাং এ তিনটি বৈষম্যকেই আমরা ভারতের অধঃপতনের কারণ বলিয়া ধরিব।

ভারতের অধঃপতনের চতুর্থ কারণ **পরিচ্ছদ-বৈষম্য**। পরিচ্ছদের একতা ভিন্ন কখন মমত্বজ্ঞান হয় না। একজন সাহেব যদি আমাদের পরমহিতৈষী হন, তথাপি তাঁহাকে দেখিলেই যেন পর পর বলিয়া বোধ হইবে; একজন বাঙ্গালী যদি আমার পরম শত্রু হয়, তথাপি তাহাকে দেখিলেই যেন কেমন আপন আপন বলিয়া বোধ হইবে। এই পরিচ্ছদ-সাম্যপ্রিয়তা হইতেই আমরা একজন দেশীয়কে বৈদেশিক পরিচ্ছদে আবৃত দেখিলে সহিতে পারি না। পরিচ্ছদসাম্য জাতীয় জীবনের প্রথম লক্ষণ; কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, ভারতের ন্যায় পরিচ্ছদ-বৈষম্য আর কোন দেশে দেখা যায় না। সমস্ত ইউরোপে প্রায় একই রকম পরিচ্ছদ; কিন্তু এক ভারতে অসংখ্য বিভিন্ন পরিচ্ছদ। একজন ভারতবাসী বিদেশে যাউন, তাঁহাকে ভারতবাসী বলিয়া চিনিবার কোন লক্ষণ নাই। তাঁহাকে বাঙ্গালী, পঞ্জাবী, কি মহারাষ্ট্রী বলিয়া চিনিতে হইবে। গুরুগোবিন্দ পরিচ্ছদ-সাম্যের মোহিনী শক্তি বুঝিয়াছিলেন, এই জন্য তিনি খালসামাত্রকেই এক বর্ণের এক রকম পরিচ্ছদে আবৃত করিয়াছেন। সমস্ত ভারতবাসী যদি একটি প্রকাণ্ড জাতীয় জীবনের প্রার্থী হন, তাহা হইলে সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাদিগকে জাতীয় জীবনের প্রথম লক্ষণ পরিচ্ছদ-সাম্য অবলম্বন করিতে হইবে।

ভারতের অধঃপতনের পঞ্চম কারণ **ভাষা-বৈষম্য**। ভিন্ন ভিন্ন ভাষা-কথনশীল ব্যক্তিগণের মধ্যে কখন জাতীয় সহানুভূতি হইতে পারে না। ইংরাজ কখনও ফরাসীকে এক জাতি বলিয়া মনে করিতে পারে না; সেইরূপ বাঙ্গালী কখন মহারাষ্ট্রীগণকে এক জাতি বলিয়া মনে করিতে পারিবেন না। মহারাষ্ট্রীগণও বঙ্গে আসিয়া একটি বিভিন্ন জাতির সহিত মিলিত হইতেছি বলিয়া মনে করিবেন। ভাষা-বৈষম্য নিমিত্তই বাঙ্গালীর ও মহারাষ্ট্রীয়গণের মধ্যে কখনই জাতীয় সহানুভূতি জন্মে নাই। এই জন্য আমাদিগকে বর্গীর হাঙ্গামা পোহাইতে হইয়াছিল। আবার যদি মহারাষ্ট্র-প্রতাপ কখন

পুনরুদিত হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে হয় ত সেই হাঙ্গাম আবার পোহাইতে হইবে। এইরূপ তৈলঙ্গী, মহারাষ্ট্রী, দ্রাবিড়ী, কর্ণাটী, গুজরাটী, ভোজপুরী, মাড়ওয়াড়ী, পঞ্জাবী, গুরুমুখী, হিন্দী, উর্দ্দু, পারশী, বাঙ্গালী, উড়িয়া, আসামী, ইংরাজী প্রভৃতি অসংখ্য ভাষা যে দেশে প্রচলিত, সে দেশের জাতীয় একতা বড় সহজ ব্যাপার নহে। প্রত্যেক ভাষা-কথনশীল জাতির স্বতন্ত্র জাত্যভিমান আপনিই হইয়া পড়ে। এই সাম্প্রদায়িক জাত্যভিমান হইতে পরস্পর বিদ্বেষ অতিশয় বাড়িয়া উঠে! ভারতের দুর্ভাগ্যবশতঃ ইংরাজ রাজনীতির কৌশলে এই ভাষাগত ভেদ দিন দিন আরও বাড়িতেছে। যে সকল প্রাদেশিক ভাষা এখনও পুষ্টাবয়ব হয় নাই, অথচ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, কোন প্রধান ভাষার সহিত তাহার অনেক ঐক্য আছে, তখন অপুষ্ট ভাষাকে অঙ্কুরে বিদলিত করিয়া সেই পুষ্ট মূল ভাষাকে তৎস্থানে সন্নিবেশিত করাই জাতীয় হিতাকাঙ্ক্ষী গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য; কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ এরূপ স্থলে আমাদের গবর্ণমেণ্ট বিপরীত নীতি অবলম্বন করিয়া থাকেন। এইরূপ বিকেন্দ্রীকরণ নীতি (Decentralization policy) আর কিছু দিন চলিলে ভারত অচিরকাল-মধ্যে অসংখ্য বিভিন্নভাষাবলম্বী জাতিতে পরিণত হইবে। ভাষা-সংখ্যা যত বাড়িতে থাকিবে, ততই ভারতের একীকরণ কার্য্য সুদূর-পরাহত হইবে। এইরূপে প্রাদেশিক বিদ্বেষানল যতই প্রজ্বলিত হইবে, ততই বৈদেশিক শৃঙ্খল কঠিনতর হইয়া আসিবে। ভাষাবৈষম্যে যে কেবল প্রাদেশিক বিদ্বেষানল অধিকতর প্রজ্বলিত হয়, এরূপ নহে, ইহাতে এক প্রদেশের উন্নতিতে প্রদেশান্তরের উন্নতি হয় না। তাহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তস্থল বঙ্গভাষা। বাঙ্গালীর বুদ্ধিবৃত্তির অধিকতর পরিমার্জ্জনার সহিত বাঙ্গালীর ভাষাও অধিকতর পরিমার্জ্জন ও পুষ্টাবয়ব হইতেছে। ইহার সহিত তুলনায় ভারতীয় অন্যান্য ভাষা দিন দিন অধিকতর হীনপ্রভ হইয়া পড়িতেছে। যদি বাঙ্গালা ভাষা সমস্ত ভারতবাসীর ভাষা হইত, তাহা হইলে ভারতের কি সৌভাগ্য হইত! কিন্তু তাই বলিয়া আমরা আশা করিতেছি না যে, সমস্ত ভারতবাসীই বঙ্গভাষাকে ভারতীয় জাতীয় ভাষা বলিয়া গ্রহণ করিবেন। প্রার্থনীয় হইলেও সে আশা সফল হওয়ার সম্ভাবনা অল্প। যাহা হউক, যে ভাষাই ভারতীয় জাতির ভাষা হউক না কেন, ইহা স্থির যে, এরূপ একটি জাতীয় সাধারণ ভাষা ব্যতীত ভারতের-সমীকরণ অসম্ভব। যাহারা ইংরাজীতে বক্তৃতা করিয়া বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে মাতাইয়া ভারত মাতাইলাম বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন, তাঁহারা নিতান্ত অন্ধ; কারণ বৈদেশিক ভাষায় কখন একটি জাতিকে মাতান যাইতে পারে না। বৈদেশিক ভাষা সমাজের অধস্তল স্পর্শ করিতে পারে না। এই জন্য বৈদেশিক ভাষায় বক্তৃতাদি সমাজের অধস্তলকে উদ্দীপিত করিতে পারে না। ইহা উচ্চ ও মধ্য শ্রেণীর কয়েক জন মাত্রকে চালিত করিয়া থাকে। সে কয়েক জন অঙ্গুলিমাত্রে গণনীয়। এই জন্য আমরা দেখিতে পাই যে, টাউন হল প্রভৃতিতে যে সকল সভা হয়, তাহাতে কতিপয় অজাতশ্মশ্রু যুবক ব্যতীত জাতিসাধারণ সমবেত হয় না। ইংলণ্ড ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশে প্রকাশ্য সভা সকলে যে অসংখ্য লোক সমবেত হয়, উহার প্রধান কারণ স্বদেশীয় ভাষায় বক্তৃতা। স্বদেশীয় ভাষার উদ্দীপনা শক্তি অতি চমৎকার! ইহা মৃতদেহেও জীবনসঞ্চার করে, নির্ব্বাণপ্রায় বীর্য্যবহ্নিকে সন্ধুক্ষিত করে, তথাপি যাঁহারা বলিবেন যে, ইংরাজী ভারতের জাতীয় ভাষা হইবে, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি যে, তাঁহাদিগের মতের পরিপোষক কোন পূর্ব্ব-নিদর্শন আছে কি না? আমরা ত ইতিহাসে ইহার অনুরূপ একটি দৃষ্টান্তও পাই না। রোম ত অসংখ্য রাজ্যকে পরাজিত করিয়া নিজ আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু রোমীয় ভাষা কোন্ বিজিত দেশে মাতৃভাষাকে তাড়িত করিয়া তৎস্থান অধিকার করিয়াছিল? বিজিত দেশ সকলের ভাষানিচয় রোমীয় ভাষা দ্বারা কেবল মার্জ্জিত ও পুষ্টাবয়ব হইয়াছিল মাত্র। এইরূপ নর্ম্মান্ জাতি যখন আঙ্গলোসাক্সণদিগকে বিজিত করিয়া ইংলণ্ডে নর্ম্মান্ জাতির আধিপত্য স্থাপন করিলেন, তখন আইন-আদালত সব ফ্রাঙ্কোনর্ম্মান ভাষায় চলিতে লাগিল বটে, কিন্তু আঙ্গলোসাক্সণ ভাষাই ইংলণ্ডে মাতৃভাষা রহিয়া গেল, কেবল বিজেতৃ জাতির ভাষা দ্বারা পুষ্টাবয়ব হইল মাত্র। আমরা ঘরের মধ্যেই ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি।

যে আর্য্যজাতি প্রায় পঞ্চ সহস্র বৎসর ভারতে রাজত্ব করিয়াছিলেন, যাঁহারা বিজিত অনার্য্যজাতির সহিত অনেক বিষয়েই একীভূত হইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারাও অনার্য্য ভাষাকে সম্পূর্ণ বিদূরিত করিয়া তৎপরিবর্ত্তে দেবভাষাসম অনুপম সংস্কৃত ভাষাকে ভারতীয় জাতীয় ভাষা করিতে পারেন নাই, দেশীয় বা প্রাকৃত ভাষাই জাতীয় ভাষা রহিল। কেবল সংস্কৃতের সহিত সংমিশ্রণে, সংঘর্ষণে পরিপুষ্ট ও অধিকতর সুললিত হইল মাত্র। আর্য্যেরা বিজিত জাতির ভাষাকে যে শুদ্ধ বিদূরিত করিতে পারিলেন না, এরূপ নহে, তাঁহারা সেই প্রাকৃত ভাষাকে আদর করিয়া সংস্কৃত নাটকাদিতে ব্যবহার করিতে লাগিলেন। সেই মুসলমানেরা ভারতে সহস্র বৎসর রাজত্ব করিয়াও পারস্যভাষাকে ভারতের জাতীয় ভাষা করিতে পারেন নাই। প্রতি গৃহে পারস্য-ভাষার চর্চ্চা; প্রতি আদালত ও প্রতি বিদ্যালয়ে পারস্যভাষার আলোচনা! তথাপি পারস্যভাষা কিছুতেই ভারতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইল না। শেষে একটা সামঞ্জস্য হইল। পারস্যভাষার সংমিশ্রণে জাতীয় ভাষা হিন্দী কিঞ্চিৎ বিকৃত হইয়া হিন্দু মুসলমান উভয়ের উপযোগী একটি মিশ্র ভাষারূপে পরিণত হইল। বলা বাহুল্য যে, এই ভাষার নাম উর্দ্দূ। ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, আর্য্যজাতি বা মুসলমানজাতি ইংরাজদিগের ন্যায় নির্লিপ্তভাবে ভারতে রাজ্য করেন নাই। তাঁহারা ভারতের অধিবাসী হইয়া ভারতের শাসন করিয়াছিলেন, সুতরাং ভারতের বিজিত অধিবাসীদিগের সহিত তাঁহাদিগের অনেক পারিবারিক ও সামাজিক সংমিশ্রণ হইয়াছিল, তথাপি তাঁহারা আপনাপন ভাষা দ্বারা দেশীয় ভাষাকে বিদূরিত করিতে পারেন নাই। ইংরাজেরা আমাদিগের সহিত সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। তাঁহাদিগের সহিত আমাদের আফিস, আদালত ও বিদ্যালয়াদিতে যাহা দেখা-শুনা হয়। তবে তাঁহাদিগের ভাষা আমাদিগের (Lingua Franca) জাতীয় ভাষা হইবে কিরূপে? তবে এক উপায় আছে। ইংরাজ যদি এরূপ আইন জারী করেন যে—আবালবৃদ্ধ-বনিতা ভারতে যে কেহ ইংরাজী ভিন্ন আর যে কোন ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিবে, তাহাতে দণ্ড-বিধির কঠোর দণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা হইলে, একদিন ইংরাজী আমাদের জাতীয় ভাষা হইলেও হইতে পারে; কিন্তু ইংরাজেরা এরূপ অস্বাভাবিক আইন জারি করিতে সমর্থ হইলেও করিবেন না; কারণ, এরূপ আইন জারী করা যত সহজ, এরূপ আইন কার্য্যে পরিণত করা তত সহজ নহে। রুসিয়া যে পোলণ্ডস্থলে এরূপ অসাধ্যসাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহার কারণ বিজিতদিগের সংখ্যার অল্পতা; কিন্তু বিজিত ভারতবাসিগণের সহিত তুলনায় বিজয়ী ইংরাজ কয়জন? সমস্ত ভারত-বাসী ইংরাজীগ্রহণে প্রস্তুত হইলেও পঞ্চবিংশকোটি ভারতবাসীকে ইংরাজী শিখায়, এরূপ লোক কই?

ভারতের জাতীয় অধঃপতনের ষষ্ঠ কারণ **শাসন-বৈষম্য।** ভারত প্রকৃত প্রস্তাবে কখনই এক শাসনের অধীন হয় নাই। অতি প্রাচীন-কাল হইতে দেখা যায় যে, ভারত কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে সতত সংবিভক্ত। আর্য্যদিগের ভারত-বিজয়ের পূর্ব্বেও ভারতের এই দশা ছিল। এই জন্যই অতি অসংখ্যক আর্য্য যোদ্ধা সেই অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শূদ্ররাজ্যকে এক একটি করিয়া পরাস্ত করিয়া প্রথমে সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে, পরে সমস্ত ভারতে আপনাদিগের আধিপত্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; কিন্তু ভারত সাম্রাজ্য সংস্থাপনের পর আর্য্যেরাও বিজিত অনার্য্যদিগের ভ্রমে পতিত হইলেন। ইঁহারাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে সংবিভক্ত হইয়া ভারতশাসন করিতে লাগিলেন। এক এক জন রাজচক্রবর্ত্তী এই সকল ক্ষুদ্র রাজমণ্ডলীর অধিনেতৃত্বপদে অভিষিক্ত হইতেন বটে, কিন্তু সে অধিনেতৃত্ব নাম মাত্র। আভ্যন্ত-রীণ ও বহিশ্চর সকল বিষয়েই তাঁহারা সম্রাট হইতে স্বাধীন ছিলেন। তাঁহাদিগকে কেবল সেই মণ্ডলে-শ্বর রাজচক্রবর্ত্তীকে সম্রাট্ বলিয়া মানিতে হইত ও প্রয়োজনমত তাঁহাকে অর্থ ও সৈন্য দিয়া সাহায্য করিতে হইত। ইংরাজসিংহের সহিত ভারতীয় মিত্র-রাজগণের যে সম্বন্ধ আছে এবং ফিউডাল-তন্ত্রের ফিউ-ডাল সামন্তগণের মণ্ডলেশ্বরের সহিত যে সম্বন্ধ ছিল, ইঁহাদিগের সহিত সেই রাজচক্রবর্ত্তীরও সেই সম্বন্ধ ছিল।

এইরূপে ভারতের জাতীয় সহানুভূতি সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতর সীমায় আবদ্ধ হইতে থাকিল। জাতীয় সহানুভূতির হ্রাসে প্রাদেশিক বিদ্বেষানল প্রবল হইয়া উঠিল। আর্য্যজাতির অদ্ভুত

স্বজাতি-প্রেমিকতা ও আর্য্যধর্ম্মের অবিচলিত সম্প্রদায়-হিতৈষণা নিবন্ধন এই বিদ্বেষভাব সহস্র সহস্র বৎসর ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় অন্তর্নিগূহিত ছিল, কালে সেই স্ফুলিঙ্গ প্রকাণ্ড বহ্নিরূপে পরিণত হইল! শেষে সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য পরস্পরের উচ্ছেদসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইল! জয়চন্দ্রের বিশ্বাসঘাতকতায় পৃথুরাজের পতন তাহার চরম দৃষ্টান্তস্থল। পৃথুরাজের রাজত্বকালে যখন অন্তর্বিচ্ছেদে ভারতবক্ষঃ ক্ষতবিক্ষত হইতেছিল, তখনই যবনসেনা সিন্ধু পার হইতে সাহস করিয়াছিল। আবার মোগলসাম্রাজ্যের পতনের সময় যখন ভারত অসংখ্য প্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়াছিল, তখনই আমেদ সা আবদালী যবনসেনাসহ আবার সিন্ধু পার হইয়া পাণিপথ রণক্ষেত্রে সমবেত হিন্দু ও মুসলমান সেনাকে পরাস্ত করিল। সেই পরাজয়ের ব্যবহিত ফল, ইংরাজ কর্ত্তৃক ভারতাধিকার। এক্ষণে যদিও ইংরাজসিংহ হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত, সলিমান হইতে অমরাবতী পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক সীমায় আবদ্ধ সমস্ত ভারতে অভূতপূর্ব্ব আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন, তথাপি এখনও অনেক ক্ষুদ্র রাজ্য মিত্র বা করদ রাজ্যরূপে বিভিন্ন শাসনাধীন রহিয়াছে। আমরা ভারতের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য এরূপ অবস্থা প্রার্থনীয় মনে করি না। সমস্ত ভারত যদি কখন একজাতীয় শাসনের অধীন হইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে অগ্রে তাঁহাদিগকে এক প্রবল বৈদিশিক শাসনসমিতির অধীনে আসিয়া সেই মহান জাতীয় ভাব শিক্ষা করিতে হইবে। যখন সেই মহান্ জাতীয় ভাব আমাদের হৃদয়ের স্তরে স্তরে নিহিত হইবে, সিদ্ধি আপনা হইতেই আমাদের করতলস্থ হইবে। এখন যদি ইংরাজজাতি তাঁহাদিগের জাতীয় মহত্বগুণে আমাদিগকে তাঁহাদিগের অধীনতা হইতে মুক্ত করেন, তাহা হইলে আমরা এই প্রকাণ্ড সাম্রাজ্য লইয়া কি করি? আজ সিন্ধিয়া আসিয়া বলিবেন, 'এ বিপুল ভারতে আমার অপেক্ষা বাহুবল কাহার অধিক? আমি ইহার সম্রাট হইবার উপযুক্ত, আর কে? যদি প্রতিবাদ কর ত আমার সুশিক্ষিত সেনা তোমাদিগের রুধিরে ভারতবক্ষঃ প্লাবিত করিবে।' নেপাল, ভুটান, কাশ্মীর, বিকানীয়ার, জয়পুর, ভূপাল, উদয়পুর, হোলকার, বরোদা, মহীশূর, নিজাম, ত্রিবাঙ্কুর ক্রমে ক্রমে ইঁহারা সকলেই আমাদের নিকট তাঁহাদের বলবীর্য্য খ্যাপন করিবেন। আমরা এ ছত্রিশ কোটি দেবতার কাহাকে মনোনীত করিব? আমরা কাহাকেও অসন্তুষ্ট করিতে সাহস করিব না; সুতরাং তাঁহারা আপন আপন আধিপত্য সংস্থাপন করিবার নিমিত্ত ঘোরতর গৃহানল প্রজ্বলিত করিবেন। সেই সময় হয় ত রুসিয়া সুযোগ পাইয়া ভারতে প্রবেশ করিয়া আবার শত শত বৎসরের জন্য ভারতের সৌভাগ্য-তপন তমসাচ্ছন্ন করিবে। সুতরাং রাজ্যতন্ত্রের মূল ছিন্ন করিয়া নিয়োচ্চকে এক সমতল ক্ষেত্রে পরিণত করিয়া, ভারতক্ষেত্রকে ভবিষ্য প্রকাণ্ড সাধারণতন্ত্রের বীজধারণোপযোগী করিয়া রাখিতে হইবে; কিন্তু এ বিষয়ে কোন আন্দোলন করা আমাদের নিজের অনধিকারচর্চ্চা মাত্র। আমাদের নিজের বিষয়ে কথা কহিবার আমাদের অধিকার নাই।

ভারতের অধঃপতনের সপ্তম কারণ প্রজা-বৈষম্য। এই বৈষম্য যে কেবল ভারতের দুরদৃষ্টের ফল, এরূপ নহে। সকল দেশই এই বৈষম্যে অল্প-বিস্তর প্রপীড়িত। যে দেশের যখন এই বৈষম্যের পরিমাণ পূর্ণ হয়, তখনই এক একটি বিপ্লব উপস্থিত হয়। প্রসিদ্ধ ফরাসীবিপ্লব ইহার প্রধান দৃষ্টান্তস্থল। চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ লুইয়ের সময়ে এই বৈষম্যে ফরাসী জাতির যেরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল, তাহা বর্ণনার অতীত। অন্নাভাব-প্রপীড়িত প্রজার শেষ গ্রাস কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে পেষণ করিয়া, শোষকে শোষণ করিয়া, দাহকে দাহন করিয়া যে অর্থরাশি সংগৃহীত হইত, তাহা রাজপ্রণয়পাত্রী বারাঙ্গনাগণের অঙ্গাভরণে ব্যয়িত হইত। উচ্চশ্রেণী রাজানুগৃহীত ও রাজ-প্রসাদ-ভোগী বিপুল সম্পত্তির অধীশ্বর হইয়াও রাজ-কর হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। কৃষক-বহুল নিম্নশ্রেণীই কেবল করভারে প্রপীড়িত। প্রজারা এতদূর নিঃস্ব ও করপ্রদানে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছিল যে, কর আদায়ের সৌকর্য্য বিধানের নিমিত্ত রাজাকে নাবিক-দাসত্ব, ফাঁসীকাষ্ঠ ও পীড়নযন্ত্র প্রভৃতিও অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। এক দিকে প্রজাসাধারণ—দারিদ্র্য, আহার, পীড়া ও নিষ্ঠুর দণ্ডবিধির তাড়নে মৃতপ্রায়;—অন্যদিকে রাজগণের চিন্তাশূন্য উদ্যানকেলি, বনবিহার, নৃত্যগীত ও বারাঙ্গনাদিগের সহিত হাস্য-পরিহাসাদি ধারাবাহিক প্রমোদ-লহরী।

পাপের ভরা পূর্ণ হইবামাত্র ভাঙ্গিয়া পড়িল। ফ্রান্সে জমীদার ও কৃষকের মধ্যে যেরূপ ভীষণ ধন বৈষম্য ঘটিয়াছিল, আমাদের দেশে আজও তদ্দূর ঘটে নাই বটে, আজও পাপের ভরা পূর্ণ হয় নাই সত্য, কিন্তু যে যে কারণ সত্বে সেই ভরা পূর্ণ হইবে, সে কারণ এখানেও বর্ত্তমান। সমাজ ও আইনের যেরূপ ব্যবস্থা, তাহাতে উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে এই ঘোরতর ধন-বৈষম্য কখন যে অপনীত হইবে, তাহার সম্ভাবনা অল্প। এই স্থানে যে উচ্চশ্রেণীর উল্লেখ করা হইল, তাহা ধনিমাত্রেরই উপলক্ষণ এবং যে নিম্নশ্রেণীর উল্লেখ করা হইল, তাহা দরিদ্রমাত্রেরই উপলক্ষণ। বর্ণ-বৈষম্য ভারতে যে উচ্চ ও নিম্নশ্রেণী সংগঠিত হইয়াছে, তাহার সহিত ইহার সম্পূর্ণ পার্থক্য। ধনী ও নির্ধন—জগতে এ প্রভেদ থাকিবে না, বা থাকা উচিত নয়, এ কথা আমরা বলিতে প্রস্তুত নহি। যিনি পরিশ্রম ও বুদ্ধিবলে ধনোপার্জ্জন করিয়াছেন, তিনি আজীবন সমস্ত সম্পত্তি ভোগ করুন, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই; কিন্তু তাঁহার পুত্র বা পৌত্র সমাজের কিছুই করিল না, অথচ সেই পুত্র বা পৌত্র পুত্রপৌত্রাদিক্রমে পিতা বা পিতামহার্জ্জিত ধনভোগ করিবেন, আমরা তাহা সহ্য করিতে পারি না। যতদিন না শ্রমোপার্জ্জিত ধনের বিভাগ জন্মের দৈবঘটনার উপর নির্ভর না করিয়া অপক্ষপাতী ন্যায়ের তুলাদণ্ডের দ্বারা নিয়মিত হইবে, যত দিন না অযত্নলব্ধ দ্রব্যজাতের উপর সাধারণে অধিকার প্রতিষ্ঠাপিত হইবে, তত দিন জগতের ভাবভূত অলসশ্রেণীর জগৎ হইতে তিরোভাবের সম্ভাবনা নাই। কি অধিকারে ধনীর পুত্র বা জমীদারতনয় বিনা পরিশ্রমে অন্যোপার্জ্জিত ধন বা অযত্নলব্ধ বিষয় গ্রহণ করিবেন? সেই ধনে বা সেই বিষয়ে তাঁহাদিগেরও যেমন অধিকার, সমাজসাধারণেরও সেইরূপ অধিকার। সংসারে প্রবৃত্ত হইবার জন্য তাঁহারা নয় পিতৃসম্পত্তির কিঞ্চিদংশ গ্রহণ করিলেন; কিন্তু তাঁহারা সমস্ত লইবার কে? একজন দৈবক্রমে এক ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করিলেন। পিতৃ-বিয়োগের পর প্রাপ্তবয়স্ক হইবামাত্র তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইলেন। তাঁহার প্রণয়পাত্রী বারাঙ্গনা বৎসরে লক্ষ লক্ষ টাকা পাইতে লাগিল। তাঁহার চতুরশ্বযানের তাড়িত-সম্প্রেষণে অনেক দীন-দুঃখী হতপ্রাণ বা বিকলাঙ্গ। তাঁহার নির্ম্মম শোষণে প্রজাবৃন্দ হৃতসর্ব্বস্ব! তিনি সমাজের কি করিয়াছেন যে, সমাজ তাঁহার জন্য এত সহ্য করিবে? আর নিয়ে গেঁয়ো দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ চাষার ঘরে জন্মিয়াছে। সে ভূমিকর্ষণ করিয়া কথঞ্চিৎ উদরপূর্ত্তি করিতে প্রস্তুত আছে; তথাপি সে যে সামান্য টাকার জন্য কর্ষণোপযোগী হাল-হেতেল কিনিতে অক্ষম, তাহার জন্য কি সমাজ একটুকুও ভাবিবেন না? কে ভাবিবে? উচ্চশ্রেণীর ভাবিতে গেলে স্বার্থহানি হয়, সুতরাং উচ্চশ্রেণী কখনই ভাবিবেন না। আমাদের শাসনসমিতিও লক্ষ্মীর বরপুত্র, সুতরাং বৈষম্যের নিদান। উচ্চ শ্রেণীর পরিরক্ষণে তাঁহাদেরও স্বার্থ আছে; কারণ কোন প্রকার বিপ্লব উপস্থিত হইলে উচ্চশ্রেণীর সমূহ ক্ষতি। সুতরাং উচ্চশ্রেণী সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকার বিপ্লবের গতিরোধ করিতে চেষ্টা করিবেন। বিপ্লবের গতিরোধক বলিয়া উচ্চশ্রেণীর অধিকার-নিচয় শাসনসমিতির কঠোর বিধিপরম্পরা পরিলক্ষিত করিতেছেন। যখন শাসনসমিতি ও উচ্চশ্রেণী পরস্পর-সংবদ্ধ হইয়া নিম্নশ্রেণীর প্রতি উৎপীড়িত আরম্ভ করিয়াছেন, তখন নিম্নশ্রেণীর উঠিবার আর আশা কই? সংখ্যা-গণনায় নিম্নশ্রেণী উচ্চশ্রেণী অপেক্ষা অসংখ্যগুণ অধিক। সুতরাং সেই নিম্নশ্রেণী এরূপ অবনত থাকিতে ভারতের গৌরবের আর কি আশা! আমরা আবার বলিব যে, সেই নিম্নশ্রেণী অধঃপতিত থাকিতে ভারতের কোন আশা নাই! যাঁহারা সেই নিম্নশ্রেণীকে তুলিতে চেষ্টা না করিয়া কেবল উচ্চশ্রেণীর সাহায্যে ভারতের গৌরব-রবির পুনরুদয় দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত।

ভারতের জাতীয় অবনতির অষ্টম ও চরম কারণ স্ত্রীপুরুষ-বৈষম্য। এই স্ত্রীপুরুষ-বৈষম্য যে আজ প্রচলিত রহিয়াছে বা শুদ্ধ আমাদের দেশে রহিয়াছে, এরূপ নহে। ইহা অতি প্রাচীনকাল হইতেই অল্পবিস্তরপরিমাণে সকল দেশেই চলিত হইয়া আসিতেছে। আমরা অতি প্রাচীন গ্রন্থ ঋগ্বেদ ও মনুসংহিতা প্রভৃতিতেও ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ দেখিতে পাই। সেই ঋগ্বেদের সময় হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত স্ত্রীপুরুষে ব্রাহ্মণ-শূদ্র পার্থক্য বিদ্যমান। মনুষ্যে মনুষ্যে সমানাধিকারবিশিষ্ট। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই মনুষ্যজাতি। সুতরাং স্ত্রী

পুরুষের তুল্যাধিকারশালিনী। সাম্যতত্ত্বের এই মূল সত্য সেই পুরাকাল হইতেই অস্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। সাম্যতত্ত্বের এই মূল মত প্রতিবাদীরা এই বলিয়া চিরকাল খণ্ডন করিয়া আসিতেছেন যে, প্রকৃতি স্ত্রীজাতিকে যখন পুরুষজাতি অপেক্ষা বুদ্ধিবৃত্তিতে ও শারীরিক বলে হীন করিয়াছেন, তখন সকল বিষয়ে স্ত্রীজাতি পুরুষজাতির সমান হইবে কিরূপে? এই যুক্তি আপাততঃ অখণ্ডনীয় বোধ হইতে পারে। কিন্তু বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে, ইহা নিতান্ত অসার বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। স্ত্রীজাতির শারীরিক গঠন কোন কোন বিষয়ে পুরুষজাতির অপেক্ষা বিভিন্ন, তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে? কিন্তু তাই বলিয়া স্ত্রীজাতি যে সাধারণ-পরিশ্রমসাধ্য কার্য্যে পুরুষজাতির সমকক্ষ নহেন, ইহা স্বীকার করিতে আমরা প্রস্তুত নহি। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই যে, অসভ্য সমাজের স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই সমান শারীরিক পরিশ্রম করে। পাহাড়ী জঙ্গলী স্ত্রীরা পুরুষের সঙ্গে সমানে কাঠ কাটে, মাটী খোঁড়ে, বোঝা বয়। তাহাদের স্নায়বীয় বল পুরুষগণের অপেক্ষা নিতান্ত ন্যূন নহে। দীন-দুঃখীর ঘরের স্ত্রীলোকেরাও বহুপরিশ্রম-সাধ্য কার্য্য করিয়া থাকে, সুতরাং তাহাদেরও স্নায়বীয় বল নিতান্ত কম নহে। তবে যে মধ্য ও উচ্চ শ্রেণীর ললনাগণ দিন দিন ননীর পুত্তলী হইতেছেন, তাহার কারণ অস্বাভাবিক পরিশ্রমবিরতি। পুরুষ পরম্পরায় শারীরিক পরিশ্রম হইতে বিরত হইলে পুরুষজাতিরও এইরূপ স্নায়বীয় অবনতি ঘটিতে পারে ও ঘটিয়াও থাকে। উচ্চশ্রেণীর পুরুষদিগের সহিত তুলনায় পাহাড়ী স্ত্রীলোকদিগের স্নায়বীয় পরিণতি অনেক অধিক। সুতরাং স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, শারীরিক বৃত্তির পরিপুষ্টিও অন্যান্য বৃত্তির পরিপুষ্টির ন্যায় চর্চ্চা-সাপেক্ষ। তুমি স্ত্রীলোকদিগকে পুরুষদিগের সমান শারীরিক পরিশ্রমে নিয়োগ কর, কালে তাহারা পুরুষদিগের সমান সবল হইয়া উঠিবে।

বুদ্ধিবৃত্তিতে যে স্ত্রীজাতি পুরুষজাতির ন্যূন নহেন, তাহা আমেরিকায় একরূপ পরীক্ষিত হইয়াছে। আমেরিকায় চিকিৎসাবিজ্ঞান, ব্যবহার-বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন ও শিল্পাদি সকল বিদ্যায় স্ত্রীজাতি পুরুষজাতির সমকক্ষতা করিতেছেন। তথায় স্ত্রীজাতি জজ, মাজিষ্ট্রেট, ব্যারিষ্টার, অধ্যাপক, চিকিৎসক—এই সকল মহোচ্চপদে অভিষিক্ত হইয়া তাহার গৌরব বর্দ্ধন করিতেছেন। কোন বিষয়ে যে তাঁহারা ন্যূন, এ কথা বলিতে আর কাহারও সাহস নাই। স্ত্রীজাতি যে শুদ্ধ এই উচ্চ-পদগুলিতে পুরুষের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন, এমন নহে, আমেরিকায় সামান্য পোষ্ট-মাষ্টারী হইতে সকল কার্য্যেই স্ত্রীলোকের সমান প্রতিযোগিতা।

হৃদবৃত্তির পরিপুষ্টিবিষয়ে যে স্ত্রীজাতি পুরুষ-জাতির ন্যূন নহেন, বরং শ্রেষ্ঠ, এ বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই।

সুতরাং প্রতিপন্ন হইল যে, স্ত্রী-পুরুষ-বৈষম্য অপ্রাকৃতিক ও সাম্যনীতি বিগর্হিত।

তর্কের অনুরোধে যদি আমরা স্বীকার করি যে, সম্পূর্ণ সমান অবস্থায় রাখিয়া দেখা গেল যে, স্ত্রীজাতি পুরুষজাতির সমকক্ষ নহেন; যখন সমকক্ষ নহেন, তখন সমান অধিকার পাইবেন কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলি, সমকক্ষ না হইলে সমান অধিকার পাইবার যোগ্য নহে, এ নীতি পূর্ব্বকালের পাশব নীতি, ইহা সাম্যনীতির সম্পূর্ণ বিপরীত। বলবান্ হইলেই দুর্ব্বলের প্রতি উৎপীড়ন করিতে হইবে, দুর্ব্বলের প্রাকৃতিক স্বত্ব কাড়িয়া লইতে হইবে, বিদ্বান হইলেই মূর্খের বিদ্বেষী হইতে হইবে, বা ধনী হইলেই নির্ধনের উৎপীড়ক হইতে হইবে—এরূপ নিয়ম আর উনবিংশ শতাব্দীতে নীতিসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয় না। এরূপ নীতি এখন উঠিয়া গিয়াছে বলিয়াই দুর্ব্বল ও প্রপীড়িত ভারতবাসী ইংরাজকৃত অত্যাচারের নালিশ ইংরাজেরই নিকট করিতে যান। এই নীতির উপর নির্ভর করিয়াই আমরা ভারতবাসী ইংরাজের নিকট সদ্বিচারের সম্ভাবনা না দেখিতে পাইলে, কাঁদিয়া বিলাতের মাটী পর্য্যন্ত ভিজাইয়া থাকি। ভারতবাসী জানেন যে, ইংরাজ সাধারণ সাম্যবাদী, সুতরাং একজন ইংরাজ অবিচার করিতে পারেন, কিন্তু ইংরাজজাতি কখন অবিচার করিতে পারেন না। এই জন্যই তাঁহাদের এত সভা! এই জন্যই তাঁহাদের এত আবেদন।

আচ্ছা, তাঁহারা যখন একটি ভিন্ন জাতির সাম্যনীতির ফলভোগী হইতে আপনারা ইচ্ছা করিতেছেন, তখন আপন গৃহে সেই নীতি প্রয়োগ করিবেন না কেন? অগ্রেই গৃহপিঞ্জরে আবদ্ধ

স্ত্রী-কন্যাগণকে দাসত্ব-শৃঙ্খল হইতে উন্মুক্ত না করিয়া অপরকে নিজের পায়ের শৃঙ্খল উন্মুক্ত করিতে বলা বিড়ম্বনামাত্র! ইংরাজেরা ভারতে বিংশতি কোটি অধিবাসীকে রাজনৈতিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখিয়াছেন সত্য, কিন্তু ভারতের পুরুষগণ যে সেই বিংশতি কোটির অর্দ্ধেককে ঘোরতর সামাজিক ও ধর্ম্মনৈতিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার কি হইবে? তাঁহারা গৃহে সেই ঘোরতর দাসত্ব প্রথার পরিপোষক হইয়া কোন্ মুখে ইংরাজদিগের নিকট আপনাদিগের শৃঙ্খল-মোচন ভিক্ষা করেন? তাঁহারা স্ত্রীজাতিকে যে দুর্গতিতে রাখিয়াছেন, সহস্র রাজনৈতিক শৃঙ্খলেও তাঁহাদিগের তাদৃশ দুর্গতি হইবে না।

দাসদিগের যে অধিকার আছে, ভারতীয় নারী জাতির সে অধিকার নাই। দাসেরা বাহিরে যাইতে পারে, ভারতের নারীর নির্দ্দিষ্ট সীমার বাহিরে যাইবার অধিকার নাই। দাসেরা নিজ নিজ উদরান্ন আপনারা উপার্জ্জন করিতে পারে, ভারতের নারীর কোন প্রকার উপার্জ্জনে অধিকার নাই। দাসেরা সর্ব্বপ্রকার শিক্ষায় অধিকারী। অধিক কি, প্রাচীন রোমে উচ্চ শ্রেণীর লোকদিগের সন্তানগণের শিক্ষার ভার প্রধানতঃ দাসদিগের উপর ন্যস্ত থাকিত, কিন্তু ভারতীয় ললনাগণ সে শিক্ষায় অধিকারিণী নহেন। দাস নিজ মনোমত ভার্য্যা মনোনীত করিতে পারে, কিন্তু ভারতললনার চিরজীবনের সহচর-নির্ব্বাচনে অধিকার নাই। নির্ব্বাচনশক্তি পরিপূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তাহার মতামত উপেক্ষা করিয়া তাহাকে এক অপরীক্ষিত যুবকের হস্তে সমর্পণ করা হয়। স্ত্রী থাকিতেও পুরুষ সংসার বার বিবাহ করিতে পারেন, কিন্তু ভারতললনা বিধবা হইলেও তাহার পুনর্ব্বিবাহে অধিকার নাই। পুত্র পিতার সমস্ত ধনে অধিকারী, কিন্তু দুঃখিনী কন্যার তাহাতে কিছুমাত্র অধিকার নাই। পুত্র-কন্যার অবর্ত্তমানে মৃত স্ত্রীর স্ত্রীধনে স্বামীর নির্ব্যূঢ় স্বত্ব, কিন্তু অপুত্রক স্বামীর মৃত্যুতেও স্বামি-ধনে স্ত্রীর জীবনস্বত্ব মাত্র। এরূপ স্থলে স্ত্রীর স্ত্রীধন লইয়া স্বামী যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন, কিন্তু মৃত পতির সম্পত্তির দান-বিক্রয়ে স্ত্রীর কোন অধিকার নাই। নিজের গ্রাসাচ্ছাদন ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে সে সম্পত্তির ব্যয় করিবার তাঁহার অধিকার নাই। (১) তিনি যদি অতুল সম্পত্তির অধীশ্বরের ভার্য্যা হন, তথাপি তিনি একাশন বই করিতে পারিবেন না। (২) ইচ্ছা হইলেও একখানি সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিতে পারিবেন না। (৩) যে পর্য্যঙ্কে তিনি স্বামীর সহিত শয়ন করিতেন, সে পর্য্যঙ্কে বৈধব্যদশায় শয়ন করিলে স্বামীকে পাতিত করিবেন। (৪) যে গন্ধ-দ্রব্যের ব্যবহারে তিনি আশৈশব অভ্যস্তা, তাহা তিনি স্পর্শও করিতে পারিবেন না। (৫) অধিক কি, একটি সামান্য পান খাইতে ইচ্ছা হইলেও তাঁহার খাইবার অধিকার নাই। (৬) বিধবা স্ত্রীর পক্ষে ত এই ব্যবস্থা। এ দিকে মৃতপত্নীক পতির পক্ষে সমস্ত দ্বার উন্মুক্ত। তিনি যত ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারেন, যত ইচ্ছা খাইতে পারেন, যেমন ইচ্ছা করিতে পারেন, যেমন ইচ্ছা বিহার করিতে পারেন, কিছুতেই শাস্ত্রের আপত্তি নাই।

পুরুষ অষ্টাদশ বা একবিংশ বৎসর অতিক্রম করিলে সকল বিষয়েই স্বাধীন হইবেন; কিন্তু রমণীর স্বাধীনতা কোন কালেই নাই। তাঁহাকে কন্যাকালে পিতার, পরিণয়ের পর স্বামীর, স্বামীর অবর্ত্তমানে পুত্রের, পুত্রাভাবে পতিকুল বা পিতৃকুলের যে কোন অভিভাবকের শাসনাধীনে থাকিতে হইবে। (৭) পুরুষ সতত নির্ম্মুক্ত থাকিবেন, কিন্তু রমণীর বাহিরে যাইলেই চরিত্র কলঙ্কিত হইবে।

জগতের যাবতীয় উচ্চপদে পুরুষের অধিকার; কিন্তু রমণীর অধিকার সামান্য পরিচারিকার

(১) স্ত্রীণাং স্বপতিদায়স্তু উপভোগফলঃ স্মৃতঃ নাপহারং স্ত্রিয়ঃ কুর্য্যুঃ পতিদায়াৎ কথঞ্চন॥—স্মৃতি।

(২) একাহারঃ সদা কার্য্যো ন দ্বিতীয়ঃ কথঞ্চন। —স্মৃতি।

(৩) উপভোগোঽপি ন সূক্ষ্মবস্ত্রপরিধানাদিনা। —দায়ভাগ।

(৪) পর্য্যঙ্কশায়িনী নারী বিধবা পাতয়েৎ পতিম্।

(৫) গন্ধদ্রব্যস্য সম্ভোগো নৈব কার্য্যস্তয়া পুনঃ।

(৬) তাম্বূলং বিধবাস্ত্রীণাং যতিনাং ব্রহ্মচারিণাম্। তপস্বিনাঞ্চ বিপ্রেন্দ্র! গোমাংসসদৃশং ধ্রুবম্॥

ব্র, বৈ ২৭ অ।

(৭) বাল্যে পিতুর্বশে তিষ্ঠেৎ পাণিগ্রাহস্য যৌবনে। পুত্রাণাং ভর্ত্তরি প্রেতে ন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাম্॥—মনু।

কার্য্যে। দাসীবৃত্তি রমণীর গৌরবের জিনিস। গৃহকার্য্যে দক্ষতা লাভ করিতে পারিলেই তিনি সকলের আদরণীয়া হইলেন। তাঁহার দৈনন্দিন কার্য্য-প্রণালী বহ্নিপুরাণে অতিসংক্ষেপে সুন্দররূপে প্রদত্ত হইয়াছে। 'তিনি প্রতিদিন শয্যা হইতে উঠিয়া পতিদেবতাকে নমস্কার করিয়া গৃহতল ও প্রাঙ্গণ-দেশ গোময় বা জলদ্বারা অনুলিপ্ত করিয়া ও অন্যান্য গৃহকার্য্য সম্পন্ন করিয়া স্নান করিতে যাইবেন; স্নান করিয়া আসিয়া আবার তাঁহাকে পতির চরণে প্রণিপাত করিতে হইবে; তাহার পর অন্যান্য গৃহ-দেবতার পূজা সমাপন পূর্ব্বক অবশিষ্ট গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া পতিকে ভোজন করাইতে হইবে; পতির আহারান্তে উপস্থিত অতিথিদিগকে ভোজন করাইয়া সর্ব্বশেষে যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিবে, তদ্দ্বারা তাঁহাকে কথঞ্চিৎ উদরপূর্ত্তি করিতে হইবে (১)।' ইউরোপে বা আমেরিকায় সামান্য দাসের অবস্থাও ইহা অপেক্ষা অধিকতর উন্নত। অধিক কি, মহর্ষি ব্যাস নিজকৃত সংহিতায় স্ত্রীকে দাসী বলিয়া স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভার্য্যা দাসীর ন্যায় সতত স্বামীর আদেশের অনুবর্ত্তন করিবেন (২)। দাম্পত্য-জীবনের অতি কষ্টকর অঙ্গ যে সন্তান-পরিপালন, পুরুষ জাতির অপূর্ব্ব কৌশলে তাহা স্ত্রীর হস্তেই অর্পিত আছে। মনুও এই ব্যবস্থার অনুমোদন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে সন্তানের উৎপাদন ও পরিপালন, এ দুই-ই স্ত্রীর অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য (৩)।

স্ত্রী যে শুদ্ধ স্বামীর দাসী ও সন্তানের ধাত্রী, এরূপ নহে, তিনি শ্বশুর, শাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনগণেরও পরিচারিকা। কণ্বমুনি পতিগৃহে গমনকালে শকুন্তলাকে যে সকল নৈতিক উপদেশ প্রদান করেন, তাহার মধ্যে গুরুজনদিগকে সেবা করিবে, (১) এইটিই সর্ব্বপ্রধান। স্ত্রীর অধীনতা যে শুদ্ধ দেহেই পর্য্যবসিত হয়, এরূপ নহে; তিনি মানসিক ও হৃদ্বৃত্তিবিষয়ক স্বাতন্ত্র্যে বঞ্চিত। তাঁহার কর্ত্তব্যবুদ্ধি তাঁহাকে যে কার্য্য করিতে বলিবে, সে কার্য্য করিবার তাঁহার অধিকার নাই। স্বামীর যাহাতে অভিরুচি, তাঁহাকে তাহাই করিতে হইবে (২)। পৃথক যজ্ঞ, পৃথক ব্রত, বা উপাসনা করিবার তাঁহার অধিকার নাই (৩)। স্বামীর বাক্যানুরূপ কার্য্য করাই তাঁহার সনাতন ধর্ম্ম (৪)। যে শৃঙ্খল স্ত্রীর মত না লইয়া তাঁহার অজ্ঞানাবস্থায় তাঁহার পায়ে পরান হইয়াছে, সে শৃঙ্খল এ জীবনে আর ভাঙ্গিবার তাঁহার অধিকার নাই। সমাজ যে পতি তাঁহার স্কন্ধে চাপাইবেন, তিনি তাঁহার সম্পূর্ণ অযোগ্য ও সম্পূর্ণ অপ্রিয় হইলেও কায়মনোবাক্যে তাঁহার শুশ্রূষা করিতে হইবে। সে পতির উপাসনায় তিনি স্বর্গে প্রতিষ্ঠাভাজন হইবেন (৫)।

শাস্ত্রে কয়েকটি গুরুতর স্থলে স্ত্রীপক্ষে সে বন্ধনচ্ছেদনের ব্যবস্থা আছে বটে, কিন্তু নিষ্ঠুর বর্ত্তমান সমাজে সে শৃঙ্খল সকল অবস্থাতেই অভেদ্য। উদ্বাহবন্ধনে বদ্ধ হইয়া পুরুষ যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন, শাস্ত্র ও সমাজ তাঁহার অনুমোদন না করুন, তাঁহার উপর খড়্গহস্ত হইবেন না। কিন্তু অভাগিনী নারীর পক্ষে ব্যবস্থা স্বতন্ত্র। দুর্ভাগ্যক্রমে যদি নারীর একবার পদস্খলন হয়, অমনি শাস্ত্র জলদগম্ভীরস্বরে বলিয়া উঠিবেন, ব্যভিচারিণীকে নির্ব্বাসিত কর। ব্যভিচারিণীর কথা দূরে থাকুক, অপ্রিয়বাদিনী স্ত্রীও তৎক্ষণাৎ পরিত্যাজ্যা ও নির্ব্বাস্যা (৬)। সামাজিক শাসন শাস্ত্রীয় শাসন অপেক্ষা ন্যূন নহে।

---

(১) সা শুদ্ধা প্রাতরুত্থায় নমস্কৃত্য পতিং স্বয়ম্। প্রাঙ্গণে মণ্ডনং দদ্যাৎ গোময়েন জলেন বা॥ গৃহকৃত্যঞ্চ কৃত্বা চ স্নাতা গৃহং সতী। স্বয়ং বিপ্রং পতিং নত্বা পূজয়েদ্ গৃহদেবতাম্॥ গৃহ-কৃত্যং সুনির্ব্বর্ত্ত্য ভোজয়িত্বা পতিং সতী। অতিথিং পূজয়িত্বা চ স্বয়ং ভুঙ্‌ক্তে সুখং সতী॥

(২) দাসীবদিষ্টকার্য্যেষু ভার্য্যা ভর্ত্তুঃ সদা ভবেৎ।

(৩) উৎপাদনমপত্যস্য জাতস্য পরিপালনম্। প্রত্যহং লোকযাত্রায়াঃ প্রত্যক্ষং স্ত্রীনিবন্ধনম্॥

(১) শুশ্রূষস্ব গুরূন্।—অভিজ্ঞানশকুন্তলম্।

(২) যত্র যত্র রুচির্ভর্ত্তুস্তত্র প্রেমবতী সদা।—কাশীখণ্ড।

(৩) নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক্ যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপাসনম্।—বিষ্ণুসংহিতা।

(৪) স্ত্রীভির্ভর্ত্তৃবচঃ কার্য্যমেব ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।

(৫) পতিং শুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে।—বি, সং।

(৬) নির্ব্বাস্যা ব্যভিচারিণ্যঃ প্রতিকূলাস্তথৈব চ। যাজ্ঞবল্ক্য।

স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে অষ্টম বৎসরে, মৃতপুত্রা হইলে দশম বৎসরে, কন্যামাত্র-প্রসবিনা হইলে একাদশ বৎসরে, কিন্তু অপ্রিয়বাদিনী হইলে তৎক্ষণাৎ পরিত্যাজ্যা (১)। স্ত্রী সুরাপা চিররুগ্না, ধূর্ত্তা, অর্থনাশিনী ও পুরুষদ্বেষিণী হইলেও তাহাকে পরিত্যাগ করিবার ব্যবস্থা আছে (২)। কিন্তু এই সকল পরিত্যক্তা রমণী কি উপায় অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন, তাঁহাদের দাম্পত্য-জীবন-স্পৃহা কিরূপে চরিতার্থ করিবেন, শাস্ত্রে তাহার কোন ব্যবস্থা নাই। এই অবস্থায় একমাত্র বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করা ভিন্ন তাঁহাদের আর গত্যন্তর নাই।

শাস্ত্রের শাসন অপেক্ষা আমাদের বর্ত্তমান সমাজ শাসন কঠোরতর। শাস্ত্রবৈষম্য দূষিত হইলেও স্থানে স্থানে স্ত্রীজাতির প্রতি কৃপা-কটাক্ষপাত করিয়াছেন; কথায় কথায় স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া ভার্য্যান্তর পরিগ্রহের অনুমতি করিয়াছেন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে অন্য জাতীয়, পতিত, ক্লীব ও চিররুগ্ন স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া পত্যন্তর গ্রহণেরও ব্যবস্থা দিয়াছেন। (৩) শাস্ত্র যেমন এক দিকে স্বামীর মরণে বা অদর্শনে নারীকে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতে আদেশ করিয়াছেন সেইরূপ স্বামী বহুদিন নিরুদ্দেশ হইলে, সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিলে, ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিলে বা মরিলে স্ত্রীকেও অন্য স্বামী গ্রহণ করিতে আদেশ করিয়াছেন (৪)। কিন্তু আমাদের পৈশাচিক সমাজ কোন অবস্থাতেই স্ত্রীর পত্যন্তর গ্রহণের ব্যবস্থা দেন নাই। স্বামী একবার বিবাহ করিয়া গিয়া চিরকাল নিরুদ্দেশ থাকুন, স্ত্রীকে চিরকালই স্বামীর শয্যা রক্ষা করিতে হইবে। স্বামী ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করুন, স্ত্রীকে হয় চির ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকিতে হইবে অথবা প্রবৃত্তি ও ধর্ম্মবুদ্ধির বিরুদ্ধে স্বামি-ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবে। স্বামী চির-রুগ্ন হউক, স্ত্রীকে আশৈশব স্বামীর সেই রুগ্ন শয্যায় বসিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতে হইবে। স্বামী মৃত্যুগ্রাসে পতিত হউন, তথাপি তাঁহার অব্যাহতি নাই। তাঁহাকে আজীবন অতি কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া সমাজের তুষ্টিবিধান করিতে হইবে। এরূপ কঠোর সমাজশাসন কখনই সম্পূর্ণ প্রতিপালিত হইতে পারে না। প্রকৃতির বিরুদ্ধে তুমি যতই কেন কঠোর নিয়ম কর না, প্রকৃতি আপনার হৃত-স্বত্ব দখল করিতে চেষ্টা করিবেই করিবে। এই সংঘর্ষের পরিণাম ব্যভিচার, ভ্রূণহত্যা ও বেশ্যাসংখ্যার বৃদ্ধি।

শাস্ত্রে বিবাহ নানাপ্রকার ছিল। পুরুষজাতি যেমন আপনার মনোমত পত্নী বাছিয়া লইতে পারিতেন, স্ত্রীজাতিও এক পদ্ধতি অনুসারে সেইরূপ আপনার মনোমত পতিনির্ব্বাচন করিতে পারিতেন। গান্ধর্ব্ব-বিবাহ তাহার দৃষ্টান্তস্থল। শাস্ত্রের এই কারুণ্যবলেই পতিপরায়ণা শকুন্তলা ব্যভিচারিণী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্তা হন নাই।

শাস্ত্রে নানাপ্রকার পুত্র স্বীকৃত হইত; এই জন্য ভ্রূণহত্যার আবশ্যকতা হইত না। বর্ত্তমান সমাজের প্রণয়-সঙ্গমের উত্তেজক কারণ, পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান; অথচ প্রণয়সঙ্গমোৎপন্ন সন্ততি সমাজে গৃহীত হইবার ব্যবস্থা নাই। শাস্ত্রের এই ব্যবস্থা ছিল বলিয়াই আমরা পঞ্চ পাণ্ডবের নাম শুনিতে পাই। শাস্ত্রের এই ব্যবস্থা ছিল বলিয়াই আমরা বীরচূড়ামণি কর্ণের গৌরবে গৌরবান্বিত হইতে পাই। বর্ত্তমান সমাজের কঠোর শাসনে অসংখ্য রমণীকে হয় এই দুরপনেয় ভ্রূণহত্যাপাপে নিমগ্ন হইয়া সমাজের দাসীত্ব করিতে হইতেছে, অথবা দুর্নিবার মাতৃস্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া সমাজ পরিত্যাগ পূর্ব্বক জঘন্য বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইতেছে। সেই ভ্রূণহত্যা ও সেই বেশ্যাবৃত্তির জন্য সমাজ দায়ী। কেন না, সমাজ স্খলিতপদ রমণীর জন্য উপায়ান্তর রাখেন নাই। সমাজ যাহাদিগকে পাপীয়সী বলিয়া ঘৃণা করেন, তাহারা

---

(১) বন্ধ্যাষ্টমেঽধিবেদ্যাব্দে দশমে তু মৃতপ্রজা।
একাদশে স্ত্রীজননী সদ্যস্ত্বপ্রিয়বাদিনী ॥—মনু।

(২) মদ্যপাঽসত্যবৃত্তা চ প্রতিকূলা চ যা ভবেৎ।
ব্যাধিতা ব্যাধিবেত্তব্যা হিংস্রার্থঘ্নী চ সর্ব্বদা ॥ —মনু।

সুরাপী ব্যাধিতা ধূর্ত্তা বন্ধ্যার্থঘ্ন্যপ্রিয়ংবদা।
স্ত্রীপ্রসূশ্চাধিবেত্তব্যা পুরুষদ্বেষিণী তথা ॥
—যাজ্ঞবল্ক্য।

(৩) স তু যদ্যন্যজাতীয়ঃ পতিতঃ ক্লীব এব বা।
বিকর্ম্মস্থঃ সগোত্রো বা দাসো দীর্ঘাময়োঽপি বা ॥
উঢ়াপি দেয়া সান্যস্মৈ সহাবরণভূষণা ॥—পরাশরভাষ্য ও নির্ণয়সিন্ধুধৃত কাত্যায়নবচন। (৪) নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ। পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে ॥—পরাশর-সংহিতা।

কখন আপন ইচ্ছায় ভ্রূণহত্যাপাপে লিপ্ত হইতে বা বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিতে চাহে না।

স্ত্রীজাতির প্রতি পুরুষজাতির অত্যাচারের আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু আমরা পাঠকবৃন্দকে সেই তালিকা দ্বারা আর অক্রান্ত করিতে চাহি না।

আমরা যে কয় প্রকার বৈষম্যের উল্লেখ করিলাম, ভারতের অস্থিচর্ম্ম সেই সকল বৈষম্যে জর্জ্জরিত। ইউরোপীয় সমাজেও এই কয়েকটি বৈষম্যের কোন কোনটি কিয়ৎপরিমাণে বর্ত্তমান আছে বটে, কিন্তু এরূপ বিশ্বজনীন বিবিধ বৈষম্য আর কোন দেশেই দেখা যায় না। এত বিভিন্ন বর্ণ, এত বিভিন্ন ধর্ম্ম, এত বিভিন্ন জাতি, এত বিভিন্ন পরিচ্ছদ, এত বিভিন্ন ভাষা, এত বিভিন্ন শাসন, এত স্ত্রী-পুরুষ-বৈষম্য আর কোন দেশেই দেখা যায় না। এত বৈষম্য যে দেশে বর্ত্তমান, সে দেশের একতা বড় সহজ ব্যাপার নহে। এই সকল বৈষম্য বিদূরিত না করিয়া যাঁহারা ভারতে রাজনৈতিক একতা সংস্থাপন করিতে প্রয়াস পান, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। অগ্রে সামাজিক একতা, পরে রাজনৈতিক একতা। অগ্রে সমস্ত ভারতবাসী আপনাদিগকে এক সমাজভুক্ত বলিয়া মনে করুন, পরে রাজনৈতিক একতা আপনিই আসিবে, কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না। গৃহে বিচ্ছেদ থাকিতে বাহিরে জয় কখন হয় নাই, কখন হইবেও না। যত দিন না ব্রাহ্মণ, শূদ্র, হিন্দু, মুসলমান—এক প্রকাণ্ড ভারতীয় জাতিতে পরিণত হইতেছে, যত দিন না হিমালয় হইতে কুমারিকা ও সিন্ধু হইতে প্রাচ্যসীমা পর্য্যন্ত সমস্ত ভারত এক রবে ও এক ভাষায় পরস্পরের দুঃখ ব্যক্ত করিতে পারিতেছেন,—যত দিন না ধনি-নিধন-ভেদ ভুলিয়া সমস্ত ভারতবাসী আপনাদিগের দাসত্বে মর্ম্মপীড়িত হইয়া পরস্পরকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিতেছেন,—যত দিন না সমস্ত ভারতবাসী এক ধর্ম্মভাবে উদ্দীপিত হইতেছেন,—যত দিন না স্ত্রী-পুরুষ-বৈষম্যজনিত সামাজিক কুরীতি এবং স্ত্রীজাতির অবরোধবন্ধন, অধীনতা ও অজ্ঞানরাশি ভারত-গগন হইতে বিদূরিত হইতেছে,—যত দিন না সমস্ত ভারতবাসী এক শাসনের অধীন হইয়া এক দাসত্বশৃঙ্খলের মর্ম্মন্তুদ আঘাতে এক সহানুভূতিসূত্রে গ্রথিত হইতেছেন,—যত দিন না একটি ভারতবাসীর কেশ স্পর্শ করিলে ভারতবাসিমাত্রেরই শিরে বেদনা লাগিতেছে,—যত দিন না একটি ভারতবাসীর হৃদয়ে আঘাত লাগিলে তাড়িত-বেগে ভারতবাসিমাত্রেরই হৃদয়-তন্ত্রী ক্রন্দনস্বরে বাজিয়া উঠিতেছে,—যত দিন না আমরা জননী মাতৃভূমির অনুরোধে ইতিহাসের স্মৃতি মুছিয়া সহস্র-সিরাজ-কৃত অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া যবনদিগকে ভ্রাতা বলিয়া আলিঙ্গন করিতে শিখিতেছি,—যত দিন না আমরা বৌদ্ধ, জৈন, য়িহুদী, খৃষ্টান ভেদ ভুলিয়া এক জননীর সন্তান বলিয়া ভারতবাসিমাত্রকেই প্রাণের সহিত ভালবাসিতে শিখিতেছি, —যত দিন না রাজা জমীদার ধনগর্ব্ব পরিত্যাগ করিয়া প্রজাসাধারণের সহিত মিশিতেছেন,—যত দিন না সুশিক্ষিত ভারত-যুবক জ্ঞানগর্ব্ব পরিত্যাগ করিয়া অশিক্ষিত প্রজাসাধারণের সহিত মিলিয়া তাহাদিগের নিদারুণ দুঃখ-বিমোচনের চেষ্টা করিতেছেন,—যত দিন না কৃতবিদ্য নব্য-সম্প্রদায় দেশাচাররূপী রাক্ষসের করাল গ্রাস হইতে নারীজাতির উদ্ধারসাধন করিতেছেন,—তত দিন ভারতের চিরস্থায়ী ও বিশ্বজনীন মঙ্গলের আশা নাই।

যাঁহারা এরূপ আমূল সংস্কার অসম্ভব বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদিগের সম্মুখে আজ আমি তিনটি প্রকাণ্ড চিত্র ধারণ করিব। বলা বাহুল্য যে, প্রথমটি বৌদ্ধবিপ্লব, দ্বিতীয়টি শিখবিপ্লব ও তৃতীয়টি বৈষ্ণববিপ্লব। যে বৈষম্যবিষে ভারতদেহ জর্জ্জরিত রহিয়াছে, তাহার আমূল বিশোধন এই তিন বিপ্লবেরই লক্ষ্য ছিল। তিনটিই এই অভীষ্টসাধনে আশ্চর্য্য কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছিল। ভারতের দুর্ভাগ্য বশতঃ তিনটির একটিও অধিক দিন ভারতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ রহিল না।

প্রথম বিপ্লবের অধিনেতা—ভারতের প্রথম সাম্যাবতার—কপিলবস্তুনগরের রাজা শুদ্ধোদনের পুত্র অনন্তকীর্ত্তি শাক্যসিংহ। ইনি খৃষ্টীয় শকের ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন। যখন সমস্ত ভারত ব্রাহ্মণ-ধর্ম্মের প্রপীড়নে বিষণ্ণ, ব্যস্ত ও শঙ্কিত হইল, যখন বিপ্রেতর বর্ণ দেখিলেন যে, ব্রাহ্মণ-প্রচারিত ধর্ম্মের ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালন করা তাঁহাদিগের পক্ষে অসাধ্যসাধন-চেষ্টা আর তাহার লঙ্ঘনেও তাঁহাদিগের পারত্রিক মুক্তির কোন আশা নাই; তখন তাঁহারা এ বিপদে তাঁহাদিগকে কে

উদ্ধার করিবে, এই ভাবনায় আকুল হইলেন। এখন সময়ে বুদ্ধদেব আবির্ভূত হইয়া দিগন্তপ্রসারী রবে তাহাদিগকে বলিয়া উঠিলেন, "ভ্রাতৃগণ! ভয় নাই, আমি তোমাদিগকে এই ভীষণ বিপদ হইতে পরিত্রাণ করিব। মৎপ্রচারিত ধর্ম্মের বীজমন্ত্র সাম্য। এই মন্ত্রবলে বর্ণ-বৈষম্য উঠিয়া যাইবে, ব্রাহ্মণ-শূদ্র পার্থক্য থাকিবে না। এই ধর্ম্মের সাধনায় পাপী, তাপী, দীন, দরিদ্র, রাজা, প্রজা সকলেই মুক্তিলাভ করিবে। এ ধর্ম্মের মতে যাগ-যজ্ঞ মিথ্যা, বেদ মিথ্যা, স্বর্গ মিথ্যা, ঐহিক সুখ মিথ্যা। তোমরা সকলে বৈষম্য-দুষ্ট ব্রাহ্মণ্য উপধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া এই সনাতন ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ কর, শান্তি পাইবে।" তিনি মুখে প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি অশেষ গুণশালিনী, পরমরূপবতী যুবতী ভার্য্যা ও একমাত্র শিশু সন্তান এবং রাজসিংহাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৌপীনধারী হইয়া আত্মত্যাগের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইলেন। তাঁহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্তে ভারত আলোড়িত হইল। ভারতের মৃতদেহে আবার জীবনসঞ্চার হইল। ব্রাহ্মণ প্রপীড়িত বিপ্রেতর বর্ণ দলে দলে এই নব-ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ শূদ্রবর্ণের ইহা প্রধান আশ্রয়স্থল। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের মোহিনী শক্তিবলে স্ত্রীজাতিও ঘোরতর অবনতি-গহ্বর হইতে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিল। এই নবধর্ম্মের প্রচার-কার্য্যে স্ত্রীলোকদিগকে পুরুষদিগের সমান অধিকার প্রদত্ত হইল। বেদীতে বসিয়া বৌদ্ধ প্রচারিকাগণ বৌদ্ধধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। বৌদ্ধগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন;—মঠধারী, শ্রাবক ও গৃহস্থ। প্রথম শ্রেণী মঠে থাকিয়া উঞ্ছবৃত্তি ও ভিক্ষা দ্বারা কথঞ্চিৎ জঠরানল নিবারণ করিয়া বুদ্ধত্ব লাভের নিমিত্ত ধ্যান-ধারণায় রত থাকিতেন। দ্বিতীয় শ্রেণী সংসারী লোকদিগকে প্রকাশ্য স্থলে নীতি, ধর্ম্মনীতি, বিনয় প্রভৃতি শিক্ষা দিতেন। অবশিষ্ট লোক সংসারী হইয়া বিষয়-কার্য্য নির্ব্বাহ করিত। প্রথম দুই সম্মানের পদ স্ত্রীজাতির পুরুষজাতির সহিত সমান প্রতিদ্বন্দ্বিতা। আমরা বৌদ্ধ মঠধারী ও বৌদ্ধ-মঠধারিণী এবং বৌদ্ধ শ্রমণ ও বৌদ্ধ শ্রমণা যুগবৎ শুনিতে পাই। এইরূপ ঐ সকল উচ্চপদে শূদ্রদিগেরও অন্যান্য উচ্চবর্ণের সহিত সমান অধিকার ছিল। অধিক কি, বুদ্ধদেব তাঁহার অসংখ্য শিষ্যবর্গের মধ্যে শূদ্র উপাধিকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ভালবাসিতেন। বিপ্রেতর বর্ণের ও স্ত্রীজাতির এই উন্নতিতে ভারত অপূর্ব্ব জীবনী-শক্তি প্রাপ্ত হইল। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবকাল ভারতের গৌরবের অদ্বিতীয় যুগ। যে সহস্র বৎসর বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছিল, সেই সহস্র বৎসরই ভারতের প্রকৃত গৌরবের সময়। যদি ভারত কখন এক শাসনের অধীন হইয়া থাকে ত সে বৌদ্ধধর্ম্ম বলম্বী মগধরাজ অশোকের সময়। অশোকের সময়েই বৌদ্ধ ধর্ম্মের অতিশয় প্রাদুর্ভাব। যদি ভারতের কীর্ত্তিস্তম্ভ কখন সুদূর প্রাচ্যে, সুদূর প্রতীচ্যে, সুদূর উত্তরে, সুদূর দক্ষিণে নিখাত হইয়া থাকে ত সে বৌদ্ধ অশোকের সময়। চীন, সিংহল, মিসর, আফগানিস্থান অদ্যাপিও বৌদ্ধ-নরপতি অশোকের কীর্ত্তিস্তম্ভ বক্ষে ধারণ করিতেছে। ভারতীয় নরপতিবৃন্দ যদি কখন বৈদেশিক নরপতিবৃন্দের সহিত সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়া থাকেন ত তাহা এই বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবকালেই। প্রবলপরাক্রমশালী এন্টিয়োকস, টলেমি, আণ্টিগোনাস্ প্রভৃতি যবন নৃপগণ মগধের বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী শূদ্র-রাজবৃন্দের সহিত সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়া আপনাদিগকে শ্লাঘ্য মনে করিয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত, শিলাদিত্য, অশোক, মহেন্দ্র প্রভৃতি নরপতিবৃন্দের যশোরাশি ভারতসীমা অতিক্রম করিয়া নানাদেশ ধ্বনিত করিয়াছে। যদি কখন ভারত হইতে ধর্ম্ম-প্রচারকগণ নানা দেশ গমনপূর্ব্বক নানা জাতিকে ভারতীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া থাকেন, তবে সে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবকালে। চীন, তিব্বত, মোঙ্গালিয়া, জাপান, শ্যাম, সিংহল, অধিক কি, সুদূর সাইবেরিয়া ও লাপল্যাণ্ড পর্য্যন্তও—ভারতীয় বৌদ্ধ-প্রচারকদিগের মোহিনী বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া অদ্যাপিও বৌদ্ধধর্ম্মের সুশীতল ছায়ায় বিশ্রাম করিতেছে। পৃথিবীর লোকসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বুদ্ধ-প্রচারিত সত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রহিয়াছে; কিন্তু যে ভারতে সেই ধর্ম্মের উৎপত্তি ও প্রাদুর্ভাব, সে ভারতে সে ধর্ম্মের জ্যোতিঃ বহু দিন বিলুপ্ত হইয়াছে। সে দীপালোক বিনা আজ ভারত অন্ধকার! সে দীপালোক নিভাইয়া বৈষম্যপূর্ণ ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম আবার সমস্ত ভারত তমসাচ্ছন্ন করিয়াছে।

আবার বিপ্রেতর বর্ণ ও স্ত্রীজাতি কঠিন দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াছে। এই প্রতিক্রিয়ায় সেই শৃঙ্খলে এখন কঠিনতর হইয়াছে। ভারতের উন্নতি-স্রোতে এখন প্রবলতর ভাঁটা পড়িয়াছে!

খৃষ্টদেব ছয়শত বৎসর পরে যে অমূল্য সাম্যনীতি প্রচার করিয়া রোম-সাম্রাজ্যের দাসত্ব-প্রপীড়িত ইউরোপে নবজীবন সঞ্চারিত করিয়াছিলেন, তাঁহার জন্মের ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধদেব সাম্যনীতি প্রচার করিয়া ভারতের সমীকরণ করিয়াছিলেন। আজ ভারতে সাম্যনীতি প্রচারিত থাকিলে ভারত আজ ইউরোপের সমকক্ষ হইতে পারিত; কিন্তু কি পাপে ভারত আজ সেই অমূল্য ধনে বঞ্চিত? কোন্ পাপে বুদ্ধের জন্মভূমি ভারতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া আমাদিগকে বৈদেশিক খৃষ্টানের নিকট নীতি শিক্ষা করিতে হয়? বুদ্ধধর্ম্মে নাই, এমন কোন্ নীতি খৃষ্টধর্ম্মে বিদ্যমান? আজ ভারতের যুবককে কম্‌তের নিকট পজেটিব্ ধর্ম্ম শিখিতে যাইতে হইবে কেন? পজেটিব ধর্ম্মের মূল সূত্র বৌদ্ধধর্ম্মেও নিহিত আছে। তবে ঐ অমূল্য ধর্ম্মের ভারতে কেন বিলয় হইল? এ গুরুতর বিষয় একবার ভাবিয়া দেখা যাউক।

কম্‌তের ন্যায় বুদ্ধদেব ঈশ্বরের অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব লইয়া কোন তর্ক তুলেন নাই বটে, কিন্তু প্রকারান্তরে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন; কারণ, তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, জগতের কোন চৈতন্যবান্ স্বতন্ত্র কর্ত্তা নাই। সাংখ্যের ন্যায় বুদ্ধের মতেও প্রকৃতি স্বয়ংসৃষ্ট। বুদ্ধ যে পরলোক স্বীকার করিয়াছেন, তাহার নাম জন্মান্তর। সেই পুনর্জন্মরূপ পরলোকের উচ্ছেদসাধন করাই নাম মুক্তি। সেই মুক্তিলাভ করাই বৌদ্ধ-জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীরা এক প্রকার নিরীশ্বর ও পরলোকবিদ্বেষী। অথচ বৌদ্ধধর্ম্ম পৃথিবীর লোকসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের শান্তিনিকেতন। এইরূপ বিশ্বজনীন অস্তিত্ব সত্ত্বেও কে বলিলেন যে, বৌদ্ধ-ধর্ম্মে ঈশ্বর ও পরলোক নাই বলিয়াই ইহা ভারতে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ হইল না? সুতরাং ইহার ধ্বংসের কারণ অন্যত্র অনুসন্ধান করিতে হইবে।

ভারতে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের পতনের প্রধান কারণ ব্রাহ্মণদিগের অলৌকিক ধর্ম্মানুরাগ, অবিচলিত স্বশ্রেণী-হিতৈষিতা এবং অদ্ভুত আত্মীকরণনৈপুণ্য। ব্রাহ্মণেরা দেখিলেন যে, ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম লুপ্তপ্রায়, তখন তাঁহারা আপনাদিগের ধর্ম্মের জন্য, স্বশ্রেণীর গৌরব-রক্ষার জন্য—প্রাণবিসর্জ্জন করিতেও প্রস্তুত হইলেন। শঙ্করাচার্য্য ও তৎসদৃশ আচার্য্য-মুখ্যগণ চতুর্দ্দিকে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের আধিপত্যরক্ষার জন্য আর্য্য-ধর্ম্মের নূতন করিয়া প্রচার আরম্ভ করিলেন। যেমন বৌদ্ধেরা বেদীতে বসিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন, ব্রাহ্মণেরাও সেইরূপ বেদীতে বসিয়া বৈদিক ধর্ম্মের ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন। বৌদ্ধেরা যেরূপ বিপ্রেতর বর্ণকে বিনয়-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন, ব্রাহ্মণেরাও সেইরূপ অনার্য্য জাতি সকলকে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন। এই অসভ্য আদিমনিবাসীরা সাকারোপাসক ছিল। ব্রাহ্মণেরা ইহাদিগের তুষ্টিবিধানার্থ তাহাদিগের দেব-দেবীকেও আপনাদিগের দেবতা বলিয়া গ্রহণ করিয়া লইলেন।—

"উপাসকানাং কার্য্যার্থং
ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।"

সাধকেরা নিরাকার ব্রহ্মের ধ্যান-ধারণায় অসমর্থ। তাঁহাদিগের বোধগম্য করিবার নিমিত্ত নিরাকার ব্রহ্মের রূপকল্পনা করা গেল—এই বলিয়া তাঁহারা আর্য্যধর্ম্মের অদ্বৈতবাদের সহিত এই নবাবতারিত পৌত্তলিকতার সামঞ্জস্যবিধান করিলেন।

ভারতে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের পতনের দ্বিতীয় কারণ বৌদ্ধ-ধর্ম্মের আড়ম্বর-শূন্যতা। সাকারোপাসনার সহিত হিন্দুধর্ম্মে নানাপ্রকার উৎসব আসিয়া জুটিল, কিন্তু বৈরাগ্যমূলক বৌদ্ধ-ধর্ম্মে কোন প্রকার উৎসব, কোন প্রকার আড়ম্বর ছিল না। সংসার-বৈরাগ্যই বৌদ্ধ-ধর্ম্মের মূলমন্ত্র, বাহ্য-বস্তুতে অনাস্থাই বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রধান মুক্তি-সাধন। সংসারী লোক সাধারণ ও শূন্য-আড়ম্বরপ্রিয়। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্মের বাঁধ ভাঙ্গিতে লাগিল।

লোকসাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণেরা আর একটি যন্ত্রের উদ্ভাবনা করিলেন। বৌদ্ধধর্ম্ম জ্ঞানমূলক। সুতরাং এ ধর্ম্মের ধারণায় চিন্তাশক্তির কিঞ্চিৎ উদ্দীপনা চাই। লোকসাধারণ চিন্তাশক্তির পরিচালনে নিতান্ত অনিচ্ছুক। সুতরাং অশিক্ষিত জনসাধারণের নিকট বৌদ্ধধর্ম্ম

কিঞ্চিৎ নীরস বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল। এমন সময় ব্রাহ্মণেরা প্রচার করিতে লাগিলেন যে, জ্ঞান ও ভক্তি উভয়েতেই মুক্তি; জ্ঞানবানের মুক্তি জ্ঞানে, অজ্ঞানের মুক্তি ভক্তিতে। ভক্তির মোহিনীশক্তি-প্রভাবে অশিক্ষিত বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী জনসাধারণ আবার ফিরিয়া ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল।

ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের পতনের চতুর্থ কারণ প্রচারকার্য্যে অবহেলা। যখন ব্রাহ্মণেরা প্রাণ-বিসর্জ্জনেও বৌদ্ধদিগের উচ্ছেদসাধনে ব্রতী ছিলেন, তখন বৌদ্ধেরা প্রধানতম শ্রাবকদিগকে দেশদেশান্তরে প্রচারকার্য্যে পাঠাইলেন। কেবল মঠধারীরা প্রচারকার্য্যের নিমিত্ত দেশে রহিলেন, কিন্তু রাজ-প্রদত্ত ধনে মঠধারীরা অতিশয় ধনশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। প্রচার কার্য্যের সহিত তাহাদিগের জীবিকার কোন সম্বন্ধ না থাকায় তাঁহারা ক্রমে প্রচারকার্য্যে অতিশয় উদাসীন হইয়া উঠিলেন। এ দিকে প্রচার-কার্য্যের সহিত ব্রাহ্মণদিগের জীবিকার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায়, ব্রাহ্মণেরা প্রাণপণে জনসাধারণকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন।

ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের পতনের পঞ্চম ও শেষ কারণ বৌদ্ধদিগের অন্তর্বিচ্ছেদ। যে অবিচলিত স্বশ্রেণী-হিতৈষিতানিবন্ধন ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম অদ্যাপ ভারতে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, বৌদ্ধদিগের মধ্যে সে স্বশ্রেণীহিতৈষণা অধিক দেখা যায় না। প্রাচীন ব্রাহ্মণেরা স্বশ্রেণীর লোক নাস্তিক হউক বা প্রকৃতবাদী হউক,সকলকেই স্বশ্রেণীভুক্ত বলিয়া আলিঙ্গন করিতেন; কিন্তু বৌদ্ধেরা সামান্য মতভেদ লইয়া আপনাদিগের মধ্য হইতে অনেককে সম্প্রদায়-বহিষ্কৃত করিয়া দিতে লাগিলেন; কিন্তু বহিষ্কৃতের সংখ্যা ক্রমে এত বাড়িতে লাগিল যে, তাঁহারা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সম্প্রদায়রূপে পরিণত হইলেন। এইরূপে শাক্য সিংহের মৃত্যুর পর দুই শত বৎসরের মধ্যেই বৌদ্ধগণ অসংখ্য সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া উঠিলেন। এক দিকে বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত সংঘর্ষে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের নব-জীবন-প্রাপ্তি, অন্য দিকে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের এই ভীষণ সাম্প্রদায়িকতা। সুতরাং এই সকল কারণে অচিরকালমধ্যেই বৌদ্ধ-ধর্ম্ম ভারতে বিলুপ্ত হইয়া গেল।

ভারতে দ্বিতীয় সাম্যাবতার গুরুগোবিন্দ সিংহ। নানক শিখসম্প্রদায়ের জন্মদাতা মাত্র, গুরুগোবিন্দই এই সম্প্রদায়ের অদ্বিতীয় উন্নতিবিধাতা। ইঁনিই শিখ সম্প্রদায়কে একটি সামান্য ধর্ম্মসম্প্রদায় হইতে একটি প্রকাণ্ড রাজনৈতিক সাধারণতন্ত্রে পরিণত করেন। তাঁহারই সাম্যতন্ত্রের মোহিনী-শক্তি-প্রভাবে অতি অল্পদিনের মধ্যেই শিখগণ একটি নগণ্য ধর্ম্মসঙ্ঘ হইতে অদ্ভুত জীবনীশক্তি-বিশিষ্ট একটি প্রকাণ্ড জাতিরূপে পরিণত হয়। গুরু গোবিন্দ একজন সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক না হউন, বুদ্ধ, খৃষ্ট ও নানকের ন্যায় তিনি অতি মহান ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত না হউন, কিন্তু তাঁহার ন্যায় সর্ব্ববিষয়িক সংস্কারক ভারতে আর দ্বিতীয় জন্মে নাই! এরূপ বিশ্বজনীন সাম্যের ভাবে ভারতে আর কোন সংস্কারক কখন উদ্দীপিত হইয়াছিলেন কি না সন্দেহ। আমরা এ প্রস্তাবে যত প্রকার বৈষম্যের উল্লেখ করিয়াছি, তন্মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ-বৈষম্য ভিন্ন আর সর্ব্বপ্রকার বৈষম্যের মূলে গুরুগোবিন্দসিংহ কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্রাহ্মণ-শূদ্র ভেদ ছিল না, রাজা প্রজা ভেদ ছিল না; ধনি নির্ধন ভেদ ছিল না, এবং পণ্ডিত মূর্খ ভেদ ছিল না। এক ভাষা, এক ধর্ম্ম, এক সমাজ, এক শাসন এবং এক প্রাণ। শিখ-সম্প্রদায়ের হৃদয় যেন এক তারে গাঁথা। একের উন্নতিতে সাধারণের সুখ এবং একের দুঃখে সাধারণের দুঃখ। একটি শিখের গাত্র স্পর্শ কর, সমবেদনার মোহিনীশক্তিপ্রভাবে তাড়িতবেগে সমস্ত শিখসম্প্রদায়ে বেদনা অনুভূত হইবে। প্রধান আচার্য্য হইতে সামান্য মন্ত্রশিষ্য পর্য্যন্ত সকলেই ভ্রাতৃভাবে অনুপ্রাণিত। সমস্ত শিখসম্প্রদায় যেন একটি প্রকাণ্ড পরিবার। সকলেরই এক লক্ষ্য এবং এক উদ্দেশ্য। মাতৃভূমি ও ঈশ্বর সকলেরই সমান উপাস্য। মাতৃভূমির উদ্ধারসাধন সকলেরই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যের প্রধান সাধন বিশ্বজননী ভ্রাতৃত্ববন্ধন। সেই ভ্রাতৃত্ববন্ধন দৃঢ় করিবার নিমিত্ত শিখেরা আপনাদিগকে এক জননীর গর্ভ-সম্ভূত বলিয়া ব্যক্ত করিতেন। হিন্দু, মুসলমান, য়িহুদি, খৃষ্টান—যিনিই এই সম্প্রদায়ভুক্ত হইবেন, তিনিই "খালসা পবিত্র বা বিমুক্ত সংজ্ঞায় আখ্যাত হইবেন। দীক্ষার দিন হইতেই শিখমাত্রেরেই কয়েকটি গুরুতর ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে। তাঁহাকে

জাত্যাভিমান, কুলমর্য্যাদা, বর্ণভেদ, পণ্ডিত মূর্খ ভেদ, ইতর-ভদ্রভেদ ভুলিয়া বিভিন্ন ক্রিয়াপদ্ধতি, বিভিন্ন ধর্ম্মশাসন পরিত্যাগ করিয়া এক বন্ধনে ও এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজন করিতে হইবে;—এক ঈশ্বরের উপাসনায় নিমগ্ন হইতে ও এক ধর্ম্মশাসনের অধীন থাকিতে হইবে; দুশ্চেদ্য একতাসূত্রে সংবদ্ধ হইয়া এক প্রাণে জীবনবিসর্জ্জনেও মাতৃভূমির উদ্ধার সাধন করিতে হইবে; এবং মাতৃভূমির দাসত্ব প্রদায়িনী যবনজাতির উচ্ছেদসাধনে সতত বদ্ধপরিকর থাকিতে হইবে।

যে শিখসম্প্রদায় এত দিন নিরীহ যোগীর ন্যায় নির্জ্জনে কেবল ঈশ্বরচিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন, গুরুগোবিন্দের মন্ত্র-প্রভাবে সেই শিখসম্প্রদায় এক্ষণে একটি মহান্ জাতীয় ভাবে উদ্দীপিত হইলেন। প্রত্যেক শিখ এক একটি দুর্জ্জয় রণবীর হইয়া উঠিলেন। দুর্দান্ত আরঙ্গজীবের সিংহাসন টলিল। সমস্ত ভারত খাল্‌সা সৈন্যের সিংহনাদে কাঁপিয়া উঠিল। শিখসম্প্রদায়ের পবিত্রতা ও তেজঃপ্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া অসংখ্য হিন্দুমুসলমান এই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইতে লাগিলেন। আরঙ্গজীবের ধর্ম্মান্ধতা ও কঠোর ব্যবহার-নিবন্ধন দীক্ষিতের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। ক্রমে ধর্ম্মান্ধ সম্রাটের নয়ন উন্মীলিত হইল; কিন্তু গুরুগোবিন্দ যে অনল জ্বালিয়াছিলেন, তাহা সহজে নির্ব্বাপিত হইবার নহে, বরং মোগল-সৈন্যরূপ ইন্ধনে সে অনল দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল। অজেয় শিখসেনা মোগল-সেনাকে পরাস্ত করিয়া যবনাধিকৃত দুর্গ সকল দখল করিতে লাগিল; কিন্তু ভারতের অদৃষ্টে এ সৌভাগ্য অধিক দিন থাকিবার নহে। শিখসম্প্রদায় একটি পরিণত জাতি না হইতেই আরাধ্য গুরুগোবিন্দসিংহ কোন ঘাতকের অতর্কিত অস্ত্রাঘাতে মানবলীলা সংবরণ করেন। ভারতের পিটার্ ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে গোদাবরীর তীরবর্ত্তী নাদর নামক স্থানে এইরূপে অকালে কালকবলে পতিত হইলেন। গুরুগোবিন্দসিংহ আর কিছুকাল জীবিত থাকিলে, ভারতের ইতিহাস অন্য আকার ধারণ করিত। যদি গুরুগোবিন্দের স্থান পূরণ করিতে সমর্থ শিখসম্প্রদায়ের মধ্যে এমন এক জনও থাকিতেন, তাহা হইলে আজ ভারতের এ দুর্দ্দশা ঘটিত না।

কিন্তু শিখ-সম্প্রদায় গুরুগোবিন্দসিংহের নিকট হইতে যে সঞ্জীবনী শক্তি পাইলেন, তৎপ্রভাবেই ভারতে একটি অজেয় জাতি বলিয়া পরিগণিত হইলেন। এই জাতির রণপ্রতিভা রণজিৎসিংহের সময়েই সমধিক বিকাশ প্রাপ্ত হয়। ইহাদিগের সাহায্যে রণজিৎসিংহ ব্রিটিশসিংহের নিকট হইতেই "পাঞ্জাব-সিংহ" উপাধি প্রাপ্ত হন। রণজিতের মৃত্যুর পর এই অজেয় জাতি উপযুক্ত অধিনায়ক অভাবে বিশীর্ণ ও বিকলাঙ্গ হইয়া পড়িল। এই জাতি মরণকালেও চিলেন্‌ওয়ালায় আপনাদিগের অদ্ভুত রণ-নৈপুণ্যের ও অবিচলিত আত্মত্যাগের প্রকাণ্ড কীর্ত্তিস্তম্ভ রাখিয়া গিয়াছে। চিলেনওয়ালা ভারতের থাম্মাপিলি!

এখনও ভারতে শিখসম্প্রদায় আছে বটে, কিন্তু এ শিখসম্প্রদায় গুরুগোবিন্দের শিখসম্প্রদায় নহে। হিন্দুধর্ম্মের অদ্ভুত মহিমায় আবার সর্ব্বপ্রকার বৈষম্য সর্ব্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা ইহাতে প্রবেশ করিয়াছে এবং বৈষম্য ও সাম্প্রদায়িকতার অনুচর দাসত্বও সেই সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। গুরুগোবিন্দ ও রণজিতের শিখদল জাতির স্বাধীনতার পুনরুদ্ধারে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু আধুনিক শিখদল ভারতচরণে বৈদেশিক শৃঙ্খল দৃঢ়বদ্ধ করিতে জীবন বিসর্জ্জন করিতেছে।

ভারতের তৃতীয় সাম্যাবতার চৈতন্য। নানকের ন্যায় চৈতন্যও একমাত্র হরিভক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। গুরুগোবিন্দের ন্যায় চৈতন্যও ব্রাহ্মণ, শূদ্র ও হিন্দু-মুসলমান—একচাল করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কি ব্রাহ্মণ, কি শূদ্র, কি হিন্দু, কি মুসলমান—ভক্তমাত্রই চৈতন্যের নিকট সমান আদরণীয়। চৈতন্যের নিকট স্ত্রীজাতিও অশ্রদ্ধেয় ছিলেন না। বুদ্ধের ন্যায় তিনিও প্রচারকের উচ্চ আসন স্ত্রীজাতিকে প্রদান করেন এবং অনেক বিষয়ে তাহাদিগকে পুরুষের সমান অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবদিগের মধ্যে পত্নীনির্ব্বাচনে পুরুষদিগের যেমন অধিকার, স্বামিনির্ব্বাচনেও স্ত্রীলোকদিগের সেইরূপ অধিকার। স্ত্রী ব্যভিচারিণী বা প্রতিকূলাচারিণী হইলে, পুরুষ যেমন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে পারেন, স্বামী ব্যভিচারী ও প্রতিকূলাচারী হইলে স্ত্রীও সেইরূপ স্বামীকে পরিত্যাগ করিতে পারেন। পত্নীবিয়োগে স্বামীর যেমন পুনর্ব্বার পত্নীগ্রহণে অধিকার,

পতি-বিয়োগে স্ত্রীরও পুনঃপরিণয়ে সেইরূপ অধিকার। বৈষ্ণবীদিগের অবরোধবন্ধন নাই! বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সংস্পর্শে স্ত্রী শূদ্র সর্ব্বপ্রকার অধীনতা-শৃঙ্খল হইতে নির্ম্মুক্ত! অধিক কি—যে চণ্ডাল ব্রাহ্মণের অস্পৃশ্য, যে বেশ্যা সকল সমাজেরই পরিত্যজ্যা, তাহারাও ভক্ত হইলে বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে সমাদরে গৃহীত হইয়া থাকে (১)। বৈষ্ণবমাত্রকেই পরস্পরের অন্নগ্রহণ ও পরস্পরের সহিত আদান-প্রদান করিতে হইবে। আধুনিক বৈষ্ণবেরা যাহাই হউন, প্রাথমিক বৈষ্ণবদিগের মধ্যে কোন প্রকার বৈষম্য ছিল না। তথাপি এ সম্প্রদায়ের এত শীঘ্র অবনতি ও এ ধর্ম্মের এত শীঘ্র পতন হইল। প্রথম কারণ—বৈষ্ণবদিগের নিরবচ্ছিন্ন ভক্তিমূলতা। চৈতন্যের মতে নিরবচ্ছিন্ন ভক্তিতেই মুক্তি। বৌদ্ধধর্ম্ম যেমন নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞানমূলক হওয়ায় জনসাধারণের নিকট নীরস বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল, বৈষ্ণবধর্ম্মও সেইরূপ নিরবচ্ছিন্ন ভক্তিমূলক হওয়ায় জ্ঞানী জনের অশ্রদ্ধাভাজন হইয়া উঠিল। জ্ঞানী লোকে অন্ধ ভক্তি-পরবশ হইতে লজ্জা বোধ করিয়া থাকেন; সুতরাং জ্ঞানী ও পণ্ডিত এ ধর্ম্ম-সম্প্রদায়-ভুক্ত হইলেন না, কেবল অশিক্ষিত স্ত্রী-পুরুষেই এ সম্প্রদায় পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। এই অশিক্ষিত বৈষ্ণব সম্প্রদায় চৈতন্যের অদ্বৈতবাদ ভুলিয়া ক্রমে ঘোর পৌত্তলিক হইয়া উঠিল। রোমান ক্যাথলিকেরা যেমন যিশু ও মেরী প্রভৃতির উপাসনা করিয়া থাকেন, ইহারাও সেইরূপ চৈতন্য ও চৈতন্যজননীর উপাসনা আরম্ভ করিল। অন্ধবিশ্বাসে তাহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি ক্রমেই অধিকতর হীনপ্রভা ধারণ করিল। আধুনিক বৈষ্ণবগণ ইহার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত।

বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অবনতির ও বৈষ্ণবধর্ম্মের পতনের দ্বিতীয় কারণ বৈষ্ণব-সাধারণের সংসার-বৈরাগ্য। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, বৌদ্ধেরা স্বসম্প্রদায়কে তিনি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন—মঠধারী, শ্রাবক ও আশ্রমী। বৌদ্ধধর্ম্মের পরিপুষ্টি-সাধন ও প্রচারকার্য্য প্রথম দুই শ্রেণীর হস্তে ন্যস্ত থাকিত। ইহারাও সংসারত্যাগী ও জীবিকা-নির্ব্বাহের নিমিত্ত পরপ্রত্যাশী। আশ্রমী বৌদ্ধদিগের সহিত তুলনায় ইহাদিগের সংখ্যা নগণ্য মাত্র। বৌদ্ধ আশ্রমীরা বৈষয়িক উন্নতি বিষয়ে সতত রত থাকিতেন, সুতরাং বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতীয় দারিদ্র্য ঘটিতে পারে নাই; কিন্তু বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মধ্যে এরূপ কোন শ্রেণীবিভাগ নাই।

বৈষ্ণবমাত্রই অনাশ্রমী, বৈষ্ণবমাত্রেই ভিক্ষোপজীবী। বৈষ্ণবেরা বিবাহ করিতে পারে বটে, কিন্তু বৈষ্ণব বৈষ্ণবী উভয়কেই ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইবে। যে সম্প্রদায়ের সকলেই ভিক্ষুক, সে সম্প্রদায় জগতে কখন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ হইতে পারে না। সুতরাং ক্রমে বৈষ্ণবেরা সকলেরই অশ্রদ্ধার পাত্র—সকলেরই বিরাগভাজন হইয়া উঠিল।

বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অবনতির ও বৈষ্ণবধর্ম্মের পতনের তৃতীয় কারণ বৈষ্ণবদিগের মধ্যে জাতীয় ভাবের অভাব। গুরুগোবিন্দের ন্যায় চৈতন্য বৈষ্ণব-সম্প্রদায়কে একটি প্রকাণ্ড জাতিরূপে পরিণত করিবেন বলিয়া কখন ভাবেন নাই। এ মহান্ ভাব তাঁহার সঙ্কীর্ণ ও ধর্ম্মান্ধ অন্তরে স্থান পায় নাই। সুতরাং মহান্ জাতীয় ভাবের উদ্দীপনায় ধর্ম্ম-সম্প্রদায় কখন অনুপ্রাণিত হয় নাই। নানকের ন্যায় তিনি একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মাত্র। চৈতন্য গুরুগোবিন্দের ন্যায় সমস্ত ভারতকে এক ধর্ম্মশাসন ও এক রাজনৈতিক শাসনের অধীনে আনিবার মহৎ সঙ্কল্প কখন মনে ধারণা করিতেও সমর্থ হন নাই। তাঁহার অপরিপক্ক বুদ্ধিবৃত্তি এরূপ প্রকাণ্ড ভাবধারণে সম্পূর্ণ অক্ষম ছিল। এই জাতীয় ভাববিরহেই বৈষ্ণব-সম্প্রদায় অচিরকালমধ্যেই আপনাদিগের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারাইল। ক্রমে ক্রমে ইহা হিন্দু জাতির একটি ক্ষীণ শাখারূপে পরিণত হইল। হিন্দুধর্ম্মের সংস্রবে সেই সকল বৈষম্য অনেক পরিমাণে আসিয়া জুটিল। এই জন্য এখন আমরা বৈষ্ণবদিগের মধ্যেও ব্রাহ্মণ শূদ্র পার্থক্য দেখিতে পাই।

বুদ্ধ গিয়াছেন, গুরুগোবিন্দ গিয়াছেন, চৈতন্য গিয়াছেন—এবং তাঁহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগের অতুল কীর্ত্তিও বিলুপ্তপ্রায়! ভারত আবার ঘোরতর তিমিরে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ব্রাহ্মণ-প্রচারিত ঘোর বৈষম্য আবার ভারতবাসীর স্বাধীনতা হরণ করিয়াছে। আবার সেই বর্ণভেদ, সেই জাতিভেদ,

---

(১) চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো বিষ্ণুভক্তিপরায়ণঃ।—বি, পু।

সেই ধর্ম্মভেদ! আবার ব্রাহ্মণ-শূদ্রে ও হিন্দু-মুসলমানে সেই ঘোরতর বিদ্বেষ! স্ত্রীজাতির প্রতি আবার সেই ঘোর অত্যাচার! জাতীয় ভাবের অভাবে আবার সেই ছত্রভঙ্গতা! আবার স্ত্রী-শূদ্রের শাস্ত্রে অনধিকার!

একটি প্রকাণ্ড জাতীয় ভাবের অভাবে সমস্ত ভারতবাসী সহস্র জাতিতে—সহস্র সম্প্রদায়ে বিভক্ত রহিয়াছে। একটি জাতীয় ভাষার অভাবে ভারত অসংখ্য প্রাদেশিকতায় পরিণত হইয়াছে। একটি সমগ্র ভারতব্যাপী ধর্ম্মের অভাবে, অসংখ্য ধর্ম্মসম্প্রদায় পরস্পরের প্রতি পরস্পর বিদ্বেষবিশিষ্ট! বিদ্যা বৈষম্যে পণ্ডিত মূর্খ পরস্পর বিদ্বেষবিশিষ্ট! স্ত্রী-পুরুষ-বৈষম্যে স্ত্রী পুরুষ পরস্পর সহানুভূতিশূন্য! জেতৃ-বিজিত-বৈষম্যে আমরা সর্পী ভূত!

সমস্ত ভারত এক শাসনের অধীন না হওয়ায়, ভারতে বিশ্বজনীন সমবেদনা নাই। দুর্ভিক্ষে কাশ্মীর উচ্ছিন্ন হইল, তাহা কয় জন শুনিলেন, তদ্বিষয়ে কয়জন ভাবিলেন, কয়জন তাঁহাদিগের দুঃখ দূর করিবার নিমিত্ত একটি কপর্দ্দকও পাঠাইলেন? মান্দ্রাজ-দুর্ভিক্ষের সময় কত সভা, কত চাঁদা! কিন্তু কাশ্মীর দুর্ভিক্ষের জন্য কয়টি সভা হইয়াছিল? কি চাঁদা উঠিয়াছিল? সভা দূরে থাক, চাঁদা উচ্ছিন্ন যাউক, কই, এ বিষয়ে কোন কথোপকথনও ত শুনিতে পাই নাই। কেন না, কাশ্মীর স্বতন্ত্র, কাশ্মীর স্বাধীন, কাশ্মীরের সহিত আমাদের জাতীয় সমবেদনা নাই! কিন্তু কাশ্মীর স্বাধীন কিসে? কাশ্মীরের রাজা ইংরাজের গোলাম, তাঁহার কর্ত্তব্যজ্ঞান ইংরাজ-ইঙ্গিতে চালিত; কাশ্মীরের প্রজাসাধারণ এই গোলামের গোলাম; সুতরাং তাঁহাদিগের অবস্থা আমাদিগের অপেক্ষাও শোচনীয়। তাঁহাদিগকে দাসত্বের সমস্ত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে, অথচ তাহারা ইংরাজ-সভ্যতার ফলভোগে অনধিকারী। যখন দাসত্ব অনিবার্য্য, তখন প্রবলতম দাসপতির অধীনে থাকাই সর্ব্বথা শ্রেয়স্কর, তখন সুসভ্য দাসপতির অধীনে থাকিয়া সভ্যতা শিক্ষা করা প্রার্থনীয়, তখন সাম্যবাদী দাসপতির অধীনে থাকিয়া সাম্যের মোহমন্ত্রে দীক্ষিত হওয়াই ভাল। আমাদের এক্ষণে জাতির শিক্ষার সময়। এ সময় একটি প্রবলপরাক্রান্ত সভ্যতম শাসন-সমিতির অধীনে থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়। একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়াই প্রাকৃতিক বা ঐশ্বরিক নিয়মানুসারে ইংরাজ আমাদিগের উপর রাজত্ব করিতেছেন। যত দিন এই প্রয়োজন থাকিবে, যত দিন আমাদের একতাবন্ধন পূর্ণ না হইবে, তত দিন ইংরাজ আমাদের উপর রাজত্ব করিবেন, কেহ নিবারণ করিতে পারিবে না। প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে ইংরাজ আপনিই যাইবেন; আপনি না যান, যে প্রাকৃতিক বা দৈবীশক্তিপ্রভাবে তাঁহারা ভারতে সাম্রাজ্য সংস্থাপন করিতেছেন, সেই প্রাকৃতিক বা দৈবী শক্তিপ্রভাবেই তাঁহারা ভারত হইতে বিদূরিত হইবেন। সে সময়ের অনেক বিলম্ব আছে; সুতরাং সে ভাবনায় আমাদিগের প্রয়োজন নাই।

আমাদের ভাবনার আরও যথেষ্ট জিনিস আছে। যে যে উপাদান-সামগ্রীতে জাতীয় জীবন গঠিত হয়, আমাদিগকে এক্ষণে সেই সেই উপাদান-সামগ্রীর আহরণ করিতে হইবে। আমাদের এক্ষণে আমাদিগকে এক ভারতীয় জাতি বলিবার অধিকার নাই। ভৌগোলিক একতা ভিন্ন আমাদের এখন আর কোন একতা নাই। আমাদিগকে নূতন করিয়া একটি ভারতীয় জাতি গঠিত করিতে হইবে। এই মহতী সিদ্ধি বহুকালব্যাপী প্রগাঢ় সাধনাসাপেক্ষ। সুতরাং আমরা এক্ষণে সেই সাধনায় নিমগ্ন হইবে।

এক্ষণে দেখি, আমাদের কি সাধন-সামগ্রী আছে। আমরা কোন্ ভিত্তির উপর বসিয়া এই শবসাধন করিব? হিন্দুধর্ম্ম অতি প্রাচীন ও অতি প্রকাণ্ড ভিত্তি বটে; কিন্তু সে ভিত্তি অতি জীর্ণ আর বিশেষতঃ তাহা আত্মপৃষ্ঠোপরি সকল জাতিকে ধারণ করিতে অনিচ্ছুক। সুতরাং প্রিয় হইলেই অগত্যা আমাদিগকে সে ভিত্তি পরিত্যাগ করিতে হইবে। সে ভিত্তি পরিত্যাগ করিব বটে, কিন্তু সে ভিত্তির যে উপাদান-সামগ্রী সতেজ আছে, তাহা গ্রহণ করিব। মুসলমানধর্ম্মও অতি বিদ্বেষপূর্ণ, সুতরাং সে ভিত্তিও পরিত্যাগ করিতে হইবে; কিন্তু তাহাতেও যে সজীব উপাদান আছে, তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। খৃষ্টধর্ম্ম বিজেত্রী জাতির ধর্ম্ম, সুতরাং সে কখন বিজিত জাতির প্রীতিকর হইবে না; সুতরাং সে ভিত্তিও আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হইবে; অথচ সে

ভিত্তিরও গ্রহণযোগ্য উপাদান-সামগ্রী গ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপ অন্যান্য ধর্ম্মের অভ্যন্তরেও রত্ন নিহিত আছে। সেই সকল উপাদান-সামগ্রী লইয়া একটি নূতন ধর্ম ভিত্তি গঠিতে হইবে। মূল ব্রাহ্মধর্ম্ম এই সকল উপাদানে গঠিত, সুতরাং এক-মাত্র ব্রাহ্মধর্ম্মেরই ভারতের জাতীয় ধর্ম হইবার সম্পূর্ণ অধিকার। যদি একটি লৌকিক ধর্ম্মের আব-শ্যকতা থাকে ত ব্রাহ্মধর্ম্মই ভারতের জাতীয় ধর্ম্ম হইবে। কারণ, ব্রাহ্মধর্ম্ম ভারতীয় সমস্ত ধর্ম্মেরই —বিশেষতঃ হিন্দুধর্ম্মের সারসঙ্কলন মাত্র; এই জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্য, ভারতীয় সমস্ত ধর্ম সম্প্র-দায়েরই আদরণীয়। সুতরাং এ ধর্ম-গ্রহণে ভার-তীয় ধর্ম্মসম্প্রদায় সমূহের বিশেষ আপত্তি হইবে না। এতদ্ভিন্ন আর একটি কারণ আছে। উন্নতিশীল ব্রাহ্মসমাজ একটি প্রকাণ্ড ভিত্তির উপর ন্যস্ত, সে ভিত্তি সাম্য। খৃষ্টধর্ম্ম ব্যতীত বর্ত্তমান ভারতের আর কোন প্রাচীন ধর্ম্মের সহিত বিশ্বজনীন সাম্যের ভাব মিশ্রিত নাই। কারণ সাম্যমূলক বৌদ্ধ, শিখ ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম ভারতে এখন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। এ সকল ধর্ম্মে এখন আবার বিবিধ বৈষম্য আসিয়া জুটিয়াছে।

কিন্তু ভারতের দুর্ভাগ্যবশতঃ ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানে শাক্যসিংহ, যিশু বা গুরুগোবিন্দের ন্যায় একজন অলৌকিক প্রতিভাশালী নিষ্কাম ও আত্ম-ত্যাগী সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক নাই। এই জন্যই এত অল্প দিনের মধ্যে ইহাতে এত দলাদলি ও এত মতভেদ ঘটিয়াছে। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর ৪।৫ শত বৎসর পরে উপযুক্ত নেতা বিরহে বৌদ্ধধর্ম্মের যেরূপ দুরবস্থা ঘটিয়াছিল, এই নবোদিত ব্রাহ্মধর্ম্মের অঙ্কুরেই সেই অবস্থা ঘটিয়াছে। কৈশর ব্রাহ্মধর্ম্মের আরও দুই একটি দোষ ঘটিতেছে। ইহা বৈষ্ণব-ধর্ম্মের ন্যায় কেবল ভক্তিমূলক হইয়া উঠিতেছে। এরূপ হইলে ইহা অচিরকালমধ্যেই শিক্ষিত সমাজের অসেব্য হইয়া উঠিবে। দ্বিতীয়তঃ ইহা আবার স্ত্রী-পুরুষ-বৈষম্যে আচ্ছন্ন হইবার উপক্রম হইয়া উঠিয়াছে। বৈষ্ণব-ধর্ম্মের ন্যায় ইহাতে বৈরাগ্যও আসিয়া জুটি-তেছে। সুতরাং বৈষ্ণব-ধর্ম্মের ন্যায় ইহার পতন অনিবার্য্য। এই সকল দোষ পরিহার করিয়া উন্নতিশীল নূতন ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠাপিত হইতেছে। আমরা ইহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। ইহার কৃতকার্য্যতার উপর ভারতের অনেক মঙ্গল নির্ভর করিতেছে; কিন্তু এ গুরুতর কার্য্যের উপযোগী নেতা কই? উন্নতিশীল ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের বুদ্ধ ও গুরু-গোবিন্দ কই? যে বিনয়ধর্ম্মে শাক্যসিংহ পাষাণও দ্রবীভূত করিয়াছিলেন, সে বিনয় কই? যে বিশ্ব-প্রেমিকতা বুদ্ধপ্রচারিত ধর্ম্মের বীজমন্ত্র, সে বিশ্ব-প্রেমিকতা কই? ধর্ম্ম-ভ্রাতা ও অধর্ম্ম-ভ্রাতায় পূর্ণ সমবেদনা কই? মনের দুঃখে বুদ্ধহৃদয় যেরূপ কাঁদিত, ব্রাহ্ম-হৃদয় সেরূপ কাঁদে কই? যে আত্ম-বিস্মৃতিতে বুদ্ধের হৃদয় স্বর্গীয় ভাব ধারণ করিয়াছিল, সে আত্মবিস্মৃতি কই? যে মাহাত্ম্যে গুরুগোবিন্দ বিদ্বেষপূর্ণ যবনদিগকে নিজ সম্প্রদায়ে আনিয়া-ছিলেন, সে মাহাত্ম্য কই? এই প্রকাণ্ড জাতীয় ব্রতের উদ্যাপনার নিমিত্ত ব্রাহ্মদিগের বুদ্ধের নিকট বিনয়াদি ধর্ম্ম গুরুগোবিন্দসিংহের নিকট মাহাত্ম্য শিক্ষা করিতে হইবে; তাঁহাদিগকে আত্মাভিমানে ও সাম্প্রদায়িকতায় পূর্ণাহুতি প্রদান করিতে হইবে। এই সকল সাধনায় সিদ্ধ হইলে তাঁহাদিগের দ্বারা ভারতের সমীকরণ-কার্য্য সংসিদ্ধ হইবে; অন্যথা তাঁহাদিগেরও পতন অনিবার্য্য।

ভারতের সুশিক্ষিত সম্প্রদায়মধ্যে আর একটি রমণীয় ধর্ম্মের জ্যোতিঃ অতি সমুজ্জ্বল। বিদ্যুত বিকাশ যেমন নয়ন ঝলসিয়া দেয়, সেইরূপ ইহা নিজ প্রচণ্ড আলোক মানব-হৃদয়কে উদ্ভাসিত করে। ব্রাহ্মধর্ম্ম চন্দ্র-কিরণের ন্যায় স্নিগ্ধকারক, কারণ ইহা ঐহিক দুঃখযন্ত্রণার বিনিময়ে, পুণ্যবান্‌দিগের পক্ষে স্বর্গসুখ নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। অনুতাপে পাপীর পক্ষেও স্বর্গভোগ বলিয়া দেয়; পরলোকরাজ্যে যে অনুপাতে দুঃখভোগ, পুরস্কার রাজ্যে সেই অনু-পাতে সুখভোগের আশা প্রদান করে। কিন্তু এ কঠোর নিষ্কাম ধর্ম্মে পুণ্যের পুরস্কারের আশা নাই। মানব-প্রেম সে ধর্ম্মের বীজমন্ত্র। নিরভিসন্ধি পূর্ব্বক মানবের উপকার-সাধন সেই ধর্ম্মের একমাত্র ব্রত। নিষ্কামভাবে মানব-হিতে জীবন-আহুতিদান এই ধর্ম্মের একমাত্র সাধনা। সেই সাধনায়,—সেই ব্রত উদ্যাপনায় এবং সেই বীজমন্ত্রের অনুধ্যানে যে বিমল আনন্দ, সেই ইহার স্বর্গ। ইহার বিপরীতা-চরণে যে দুঃখ, সেই ইহার নরক। ইহাতে স্বতন্ত্র পারলৌকিক স্বর্গ-নরক নাই। ইহাতে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি ঈশ্বরমূলক নহে, সৎকার্য্যে প্রবৃত্তি হইলে

ঈশ্বর সন্তুষ্ট হইবেন, স্বর্গে সিংহাসন প্রদান করিবেন; অসৎকার্য্য হইতে নিবৃত্ত না হইলে, তিনি বিরক্ত হইবেন এবং নরকের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিবেন, এরূপ প্রলোভন ও ভীতি-প্রদর্শন দ্বারা ধর্ম্মে প্রবৃত্তি ও অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি জন্মাইবার চেষ্টা নাই। সৎকার্য্য কর, আপনিই সুখী হইবে, বিমল আনন্দ লাভ করিবে, অসৎকার্য্য কর, আপনিই দুঃখ পাইবে, আপনিই অসুখী হইবে। পাপপুণ্যের ভোগ ইহলোকেই। প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন কর, তৎক্ষণাৎ—কি কিছু দিন পরে তাহার ফলভোগ করিতে হইবে, অনুতাপে সে দণ্ড হইতে মুক্তিলাভের আশা নাই। পরের অনিষ্ট কর, মন নরকময় হইবে; সকলে তোমাকে ঘৃণা করিবে; পাপের শাস্তি হাতে হাতে পাইবে। সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান কর, তোমার অন্তর স্বর্গময় হইয়া উঠিবে। তুমি সকলের প্রীতিভাজন হইবে। স্বর্গসিংহাসন তুমি এখানেই পাইবে। ঈশ্বর থাকেন ভালই, না থাকেন কোন আপত্তি নাই। সে বিষয়ে আন্দোলন নিষ্প্রয়োজন। আমাদের কর্ত্তব্যসাধন করিয়া আমরা চলিয়া যাই। এই ধর্ম্ম এখনও ভারতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হয় নাই; সুতরাং ইহা দ্বারা এখন ভারতের সমীকরণ হওয়া কতদূর সম্ভব, বলিতে পারি না।

যাহা হউক, সম্পূর্ণ জাতীয় জীবনের আস্বাদ পাইবার পূর্ব্বে ভারতবাসিগণ এক্ষণে এক প্রকার আংশিক জাতীয় জীবন আস্বাদন করিতে পারেন। অন্যান্য সহস্র বিষয়ে ভারতের অনৈক্য থাকুক, ভারত এক্ষণে এক বিষয়ে মিলিতে শিখিতেছেন। ইংরাজকৃত অত্যাচারের প্রতিবাদ বিষয়ে সমস্ত ভারতের ঐক্যমত দেখিতে পাওয়া যায়। এই উপাদান-সামগ্রী লইয়া ভারত সভা ভারতবাসীদিগের অন্তরে এক আংশিক জাতীয় ভাব উদ্দীপিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। অতি উপযুক্ত পাত্রগণের হস্তেই এই উদ্দীপনা-কার্য্যের ভার ন্যস্ত হইয়াছে। ভারত সভার নেতৃবৃন্দের প্রতিভা এই সাধনার সম্পূর্ণ উপযোগিনী, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ যে ভাষায় তাঁহারা এই উদ্দীপনা-কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা বৈদেশিক ভাষা। সুতরাং ভারতীয় জাতি সাধারণ কখন সেই উদ্দীপনায় উদ্দীপিত হইবেন না। এই জন্য একটি ভারতীয় সাধারণ ভাষা চাই। হিন্দী ভিন্ন আর কোন ভাষাই ভারতীয় ভাষা হইতে পারে না। কারণ, হিন্দী ভারতবাসী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই কিছু কিছু বুঝিতে পারে। আর সকল ভাষা অপেক্ষা এই ভাষাই ভারতে অধিক লোকের মাতৃভাষা। সুতরাং আমরা ইচ্ছা করি, বঙ্গদেশে তাঁহারা বঙ্গভাষায়, তদ্ভিন্ন ভারতের আর সকল স্থলে হিন্দীতে এই উদ্দীপনা কার্য্য আরম্ভ করেন। কারণ, জাতীয় ভাষায় উদ্দীপনা ব্যতীত জাতীয় জীবনের কোন সম্ভাবনা নাই।

ভারতের ধনিবৃন্দ! আমরা যেমন ব্রাহ্মণদিগকে নামিয়া শূদ্র ও যবনের সহিত একত্র মিশিয়া একটি প্রকাণ্ড জাতিতে পরিণত হইতে বলিতেছি, সেইরূপ আপনাদিগকে ধনগর্ব্ব পরিত্যাগ করিয়া ভারতের দীন দুঃখী প্রজাসাধারণের সহিত এক সমভূমিতে নামিয়া তাহাদিগের দুঃখ-বিমোচনে আপনাদিগের অর্থের সদ্ব্যয় করিতে আহ্বান করিতেছি। যদি আপনারা ভারতের প্রকৃত হিতৈষী হন, যদি ভারতকে একটি প্রকাণ্ড রাজনৈতিক জাতিতে পরিণত দেখিতে চান, তবে বিলাসভোগে অর্থব্যয় না করিয়া কোটি কোটি দীন-দুঃখীর দুঃখ বিমোচন করিয়া এবং তাহাদের সুশিক্ষা বিধান করিয়া, তাহাদিগকে উচ্চে তুলিতে চেষ্টা করুন। জানিবেন, তাহারাও এক দিন আপনাদিগকে অতি উচ্চ রাজনৈতিক-শিখরে তুলিবে। এ বিশ্বব্যাপী পতনের সময়, এ বিশ্বজনীন দাসত্বের সময়, আপনাদিগের এ বিলাস কেন? এ রোদনের সময়—এখন এ ধনোন্মাদ কেন?

আর ভারতের সুশিক্ষিত সম্প্রদায়! আপনাদিগকে বলি, ভারতের ভবিষ্য মঙ্গলের জন্য হিন্দুদিগকে যেমন জাত্যভিমান পরিত্যাগ করিয়া দীন দুঃখী প্রজাসাধারণের সহিত এক সহানুভূতিসূত্রে অনুস্যূত হইতে হইবে, তেমনই আপনাদিগকেও বিদ্যাভিমান ও জ্ঞান-গর্ব্ব পরিত্যাগ করিয়া, ভারতের অশিক্ষিত কোটি নিচয়ের সহিত এক সমভূমিতে নামিয়া, তাহাদিগের অজ্ঞানতিমির দূর করিতে হইবে, তাহাদিগের দুরবস্থা বিমোচনের চেষ্টা করিতে হইবে, তাহাদিগের শোক তাপে ও দুঃখ-যন্ত্রণায় তাহাদিগকে অন্তরের সহানুভূতি দেখাইতে হইবে। জানিবেন যে, সেই অগণ্য জনসঙ্ঘ পতিত থাকিতে ভারতের

কোন আশা নাই। জানিবেন যে, সেই অগণ্য জনসঙ্ঘকে না লইয়া আপনারা কখন উঠিতে পারিবেন না। উঠিতে চেষ্টা করিলেও আপনাদিগকে তাহাদিগের গুরু ভারে আবার নামিয়া পড়িতে হইবে।

আপনাদিগের মস্তকে আর একটি গুরুভার ন্যস্ত রহিয়াছে। ভারতীয় নারীজাতির উদ্ধারের একমাত্র আশাস্থল আপনারা। যখন রাজনৈতিক দাসত্বের নিদারুণ যন্ত্রণা আপনারা স্বয়ং অনুভব করিতেছেন, তখন ভারতীয় জাতির অর্দ্ধাংশকে সামাজিক দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখা আপনাদিগকে ভাল দেখায় না। পুরাকালে ভারতললনার যেরূপ অবস্থা ছিল, তাঁহাদিগের বর্ত্তমান অবস্থা তাহা অপেক্ষা সহস্রগুণে অধিকতর শোচনীয়। স্বাধীনতা ব্যতীত শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিনিচয় স্ফূর্ত্তি পায় না। সে স্বাধীনতায় পুরাকালে ভারতের রমণীরা সম্পূর্ণ বঞ্চিতা ছিলেন না। তাঁহারা ছায়ার ন্যায় সর্ব্বত্র স্বামীর অনুগমন করিতে পারিতেন। অধিক কি, তাঁহারা পুরুষদিগের সহিত এক চতুষ্পাঠীতে পড়িতেও পাইতেন। উত্তররামচরিতে লিখিত আছে, বাল্মীকির আশ্রমে থাকিয়া আত্রেয়ী কুশ-লবের সহিত একত্রে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। স্ত্রীজাতির স্বয়ংবরও স্ত্রীজাতির স্বাধীনতার পরিচায়ক। স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা ব্যতীত আমরা দুর্গাবতী, ঝানসীর রাণী প্রভৃতি বীরনারীগণের বীর্য্যবত্তার পরিচয় পাইতাম না। স্পার্টার অতি গৌরবের সময় স্ত্রীজাতির সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল; অধিক কি, স্ত্রী-পুরুষ প্রকাশ্যস্থলে পরস্পর মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ হইতেও লজ্জা বোধ করিতেন না। স্পার্টার রমণীর স্বাধীনতা ছিল বলিয়াই স্পার্টান্ রমণী বীর প্রসবিনী হইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারা যে শুদ্ধ বীরসন্তান প্রসব করিতেন, এরূপ নহে, বীরপুত্রদিগকে উদ্দীপনা-বাক্যে রণোৎসাহে মাতাইতেন। স্পার্টার রমণীরা যুদ্ধ-যাত্রাকালে প্রাণসম প্রিয়তম পুত্রের হস্তে ঢাল দিয়া তাহাকে অবাধে বলিতেন —"যাও পুত্র! যাও! হয় যুদ্ধে জয়ী হইয়া, এই ঢাল হাতে জয়োৎসাহে জননীর চরণ বন্দন করিও অথবা যুদ্ধে হত হইয়া ঢালোপরি জননীর নিকট আনীত হইও।" জননীর মুখোচ্চারিত এ উদ্দীপনা-বাক্যে কোন্ পুত্রের হৃদয়ে বীর্য্য-বহ্নি সন্ধুক্ষিত না হয়? যখন রাজবারায় স্ত্রীস্বাধীনতা ছিল, তখন রাজপুত-রমণীরাও এক দিন এইরূপ উদ্দীপনা-বাক্যে পুত্রগণের ভস্মাচ্ছাদিত বীর্য্য-বহ্নি প্রজ্বলিত করিতেন। সে সময় অনেক রাজপুত-রমণীর অসি অনেক যবনকে শমনসদনে প্রেরণ করে। কিন্তু আজ ভারতললনার কি দশা! আজ ভারতসন্তান অন্তঃপুরের বাহিরে যাইতে চাহিলেই ভারত-জননী বাধা দিতে উদ্যত—কেন না, অন্তঃপুরের বাহিরের খবর তিনি কিছু জানেন না; সুতরাং কোন্ প্রাণে তিনি প্রাণসম পুত্রকে অজ্ঞাত স্থানে প্রেরণ করেন?

ইউরোপ ও আমেরিকার বর্ত্তমান উন্নতির অনেকটা কারণ স্ত্রী-স্বাধীনতা ও স্ত্রী-শিক্ষা। স্ত্রী-শিক্ষা স্ত্রী-স্বাধীনতার সহচরী। স্ত্রী-স্বাধীনতা ব্যতীত স্ত্রীশিক্ষা পূর্ণ হইতে পারে না। স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা ব্যতীত যেমন পূর্ণ শিক্ষা হয় না, সেইরূপ সাহস ও বীর্য্যবত্তাও স্ফূর্ত্তি পায় না। আমরা ইউরোপীয় ইতিহাসে এলিজাবেথ্, ক্যাথেরাইন্, ম্যাডেম্ রোলাণ্ড, এণ্টয়নেটী, জোসেফাইন প্রভৃতি যে সকল অদ্ভুত রমণীর ইতিবৃত্ত পাঠ করি, তাঁহারা সকলেই স্ত্রীস্বাধীনতার ফল। কয় জন রাজা এলিজেবেথ্ ও ক্যাথেরাইনের ন্যায় রাজ-সিংহাসন সমুজ্জ্বল করিয়াছেন? ফরাসী বিপ্লব-কালে ম্যাডেম্ রোলাণ্ড জিরণ্ডিষ্ট দলের জীবন-স্বরূপিণী ছিলেন এবং এণ্টয়নেটী রাজতান্ত্রিক দলের একমাত্র নেত্রী ছিলেন। জোসেফাইন্ বীরচূড়ামণি নেপোলিয়নের সমর-বিষয়িণী প্রতিভার জনয়িত্রী ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। যে ইতালীক্ষেত্রে নেপোলিয়ন অসংখ্য বিজয়লাভ করেন, সেই সকল রণক্ষেত্রে জোসেফাইন্ নেপোলিয়নের পার্শ্ববর্ত্তিনী থাকিতেন। গ্যারিবল্ডী-পত্নীও জাতীয় সমরাঙ্গনে অশ্বপৃষ্ঠে সতত স্বামিসহচারিণী থাকিতেন।

ভারতবাসী পতিত আর্য্য! পতিত অনার্য্য! যদি ভারতকে আবার উন্নতির উচ্চশিখরে তুলিতে চাও, যদি আবার ভারতজননীকে বীরপ্রসবিনী দেখিতে চাও, তবে আজ ভারত-ললনাকে স্বাধীনতা প্রদান কর, স্বাধীনতা প্রদান করিয়া জ্ঞানালোকে তাঁহার অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন অন্তরকে সমুজ্জ্বলিত কর। দেখিবে, এই সঞ্জীবনী-শক্তিপ্রভাবে ভারতে নবজীবন সঞ্চারিত হইবে। বীর জননীর কুক্ষি হইতে বীর-সন্তান প্রসূত হইয়া, ভারতগগনে অপূর্ব্ব

সৌভাগ্য-রবি সমুদিত করিবে ; এবং অসংখ্য ম্যাডেম রোলাণ্ড, অসংখ্য জোসেফাইন্‌, অসংখ্য এলিজাবেথ —ভারতের তিমিরাচ্ছন্ন আকাশে অসংখ্য-পূর্ণচন্দ্র-রূপে উদিত হইবে।

ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা! ভারতের আত্ম-রক্ষিণী শক্তি! এ ভীষণ বিপৎ-কালে আমাদিগকে রক্ষা কর ; ত্বদাশ্রিত ছিন্নভিন্ন জাতিনিচয়কে পরস্পর বিদ্বেষশূন্য একটি প্রকাণ্ড জাতিরূপে পরিণত কর ; এ ঘোর দাসত্বের সময় আমাদিগের মন হইতে সর্ব্ব-প্রকার সাম্প্রদায়িকতা, সর্ব্বপ্রকার প্রাদেশিকতা, সর্ব্বপ্রকার জাত্যভিমান এবং সর্ব্বপ্রকার আত্মাভিমান বিদূরিত কর ; সমস্ত ভারতবাসীর হৃদয়কে এক সম-বেদনা-সূত্রে এরূপে অনুস্যূত কর, যেন একটি হৃদয়ে বেদনা লাগিলে সকল হৃদয় মর্ম্মপীড়িত হয়, অবাধ্য গুরুগোবিন্দসিংহকে যে মহান্‌ জাতীয় ভাবে উদ্দী-পিত করিয়াছিলে, আমাদিগের অন্তরেও সেই মহান জাতীয় ভাবের উদ্দীপনা কর,—সমস্ত শিখজাতিকে যে ভ্রাতৃত্বভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া-ছিলে, সমস্ত ভারতবাসীকে আজ সেই ভ্রাতৃত্বভাবে অনুপ্রাণিত কর। এই মহান্‌ জাতীয় ভাবের অনু-প্রবেশ এই উদার ভ্রাতৃত্বভাবের সঞ্চারে, ব্রাহ্মণ শূদ্রের প্রতি বিদ্বেষ ভুলিবে ; যবন হিন্দুর প্রতি এবং হিন্দু যবনের প্রতি বিদ্বেষ ভুলিবে, ধনী ধনগর্ব্ব ও জ্ঞানী জ্ঞানগর্ব্ব পরিত্যাগ করিবে ; উচ্চশ্রেণীর—নিম্নশ্রেণীর প্রতি চিরলালিত ঘৃণার ভাব পরিত্যাগ করিবে। এই সঞ্জীবনী-শক্তি-প্রভাবে মৃতপ্রায় ভারতে আবার নবজীবন সঞ্চা-রিত হইবে। ভারতের এই শ্মশানভস্ম হইতেই আবার রণবীর, জ্ঞানবীর ও ধনবীর—অগণ্য সংখ্যায় সমুদ্ভূত হইবে। এই জাতীয় জীবনের অরুণোদয়েই ভারতের ওয়াসিংটন, ভারতের গ্যারি-বল্ডী, ভারতের কাভুর ভারতক্ষেত্রে আবির্ভূত হইবেন।

যখন ইতালী পড়িয়া দুইবার উঠিয়াছে, গ্রীস পড়িয়া আবার উঠিয়াছে, দাস আমেরিকা স্বাধীন হইয়াছে, ঘৃণিত জাপান ধুঁইয়া উঠিতেছে, নিপী-ড়িত আয়র্লণ্ড মাথা তুলিয়াছে—তখন কার সাধ্য বলে, পতিত ভারত আর উঠিবে না, জগতের গৌরব ভারত আর বাঁচিবে না?

বৈদেশিক সংমিশ্রণ
ও
তাহার উপকারিতা

হিন্দুসমাজ প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া একটি নূতন আবর্ত্তনে আলোড়িত হইতেছে। বৈদেশিক সংমিশ্রণে হিন্দুসমাজের বন্ধন শিথিলিত হওয়ায়, ইহাতে বিবিধ সমাজবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে! মনুর সময় হইতে ইংরাজদিগের আগমন পর্য্যন্ত যুগসহস্র ব্যপিয়া যে হিন্দুসমাজ অচলমালার ন্যায় অটলভাবে স্ফীতবক্ষে দণ্ডায়মান ছিল, মুসলমান-রাজগণের ভীষণ অত্যাচারেও যে হিন্দুসমাজ বিন্দু-মাত্রও বিচলিত হয় নাই—বরং অধিকতর ঘনীভূত হইয়াছিল, আজ পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহিনী-শক্তি-প্রভাবে সেই হিন্দুসমাজে সর্ব্বাঙ্গীন বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। কোন দেশ ম্যালেরিয়াদি দোষে দুষ্ট হইলে, প্রাকৃতিক নিয়মে যেমন প্রচণ্ড ঝটিকা বা জলপ্লাবনাদি উপস্থিত হইয়া সে দেশকে আলো-ড়িত করে এবং সেই আলোড়নে যেমন সেই দেশের ম্যালেরিয়াদি দোষ কাটিয়া যায়, সেই-রূপ হিন্দুসমাজ বহুদিন জড়পিণ্ডের মত থাকিয়া ক্রমেই জীবনীশক্তি হারাইতেছিল, এমন সময় দৈবানু-গ্রহে পাশ্চাত্য সভ্যতার সহিত ইহার সংঘর্ষ উপ-স্থিত হইল। যেমন ঝটিকা-জলপ্লাবনাদির আনুষঙ্গিক নৈমিত্তিক অনিষ্টপাত অপরিহার্য্য, সেইরূপ এই সংঘর্ষের আনুষঙ্গিক অব্যবহিত নৈমিত্তিক অমঙ্গল-নিচয়ও দুর্ম্মোচ্য ; কিন্তু ঝটিকা বা জলপ্লাবনাদির ব্যবহিত ফল যেরূপ শুভদ, এইরূপ সংঘর্ষেরও পরি-ণাম সেইরূপ শুভপ্রদ।

হিন্দুসমাজ এক্ষণে যে কয়টি সমাজ-বিপ্লবে আলোড়িত হইতেছে, বিলাত গমন তাহার অন্য-তম। বহুকাল ধরিয়া ভারত-বহিশ্চর জাতি-নিচ-য়ের সহিত ভারতীয় আর্য্যগণের কোন সংমিশ্রণ না হওয়ায় তাঁহারা এতদিন জানিতে পারেন নাই যে, তাঁহারা সভ্যসমাজে এক সময়ে যে স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, এখন সে স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছেন ; এবং যে সকল জাতি পূর্ব্বে তাঁহাদিগের সহিত তুলনায় সভ্য জাতি বলিয়াই গণিত হইত না, এখন তাহারা সভ্যতা-শৈলের সর্ব্বোচ্চ শিখরে

আরোহণ করিয়াছে। পূর্ব্বে বড় ছিলাম বলিয়া অভিমান করিয়া এখন যাহারা বড় হইয়াছে, তাহাদিগের হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকিলে, আমাদিগের ভাবী উন্নতির আশা সুদূরপরাহত হইবে। আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা যাহাদিগকে যবন বলিয়া ঘৃণা করিতেন, এক সময়ে যাহাদিগকে অস্পৃশ্য চণ্ডাল বলিয়া মনে করিতেন, তাহারা বস্তুতঃ তখন ঘৃণার্হ ও অস্পৃশ্যই ছিল। কিন্তু এখন সে তুলামান আবর্ত্তিত হইয়াছে। এক্ষণে পরিচ্ছদ, আহার, বাসের পরিচ্ছন্নতা, বিদ্যা, বুদ্ধি, শৌর্য্য বীর্য্য—সকল বিষয়েই সেই যবন আমাদিগের শ্রেষ্ঠ। এক সময়ে আমরা যেমন তাঁহাদিগকে 'অসভ্য বর্ব্বর' বলিয়া ঘৃণা ক'রতাম, এখন তাঁহারাও তেমনই আমাদিগকে 'অসভ্য নিগার' বলিয়া অশ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। আমরা যদি বস্তুতঃ বুঝিয়া থাকি যে, আমরা এখন বস্তুতই তাঁহাদিগের অপেক্ষা সকল বিষয়েই হীন হইয়া পড়িয়াছি, তাহা হইলে অভিমানভরে তাঁহাদিগের হইতে দূরে থাকিলে আমাদিগের বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। গুণের অনুকরণে কোন দোষ নাই। আমাদিগের যখন ভাল সময় ছিল, তখন তাহারা আমাদিগের অনুকরণ করিয়াছে, আমাদিগের নিকট হইতে অনেক শিক্ষা পাইয়াছে; এখন তাহাদিগের উন্নতির ও আমাদিগের অবনতির সময়। এখন আমরা তাহাদিগের নিকট যাহা ভাল পাইব, তাহা শিখিব, তাহাদিগের সমস্ত গুণের অনুকরণ করিব—তাহাতে দোষ কি? যে এক সময় অধমর্ণ ছিল, তাহার কি চিরকালই অধমর্ণ থাকিতে হইবে; এবং যে এক সময় উত্তমর্ণ ছিল, সে কি চিরকাল উত্তমর্ণ থাকিবে? তাহা কখনই হইতে পারে না। প্রকৃতি কাহারও অদৃষ্টে চিরকাল দুঃখ বা কাহারও অদৃষ্টে চিরকাল সুখ নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখেন নাই। প্রকৃতির নিয়মানুসারে জগতে সুখ-দুঃখ নিয়ত চক্রবৎ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। * সুতরাং, সভ্য ইউরোপের নিকট আমাদিগের সভ্যতা ও জ্ঞান শিক্ষা করিতে কুণ্ঠিত হইবার প্রয়োজন নাই। বৃথা অভিমানভরে ইহা হইতে বিরত থাকিলে আমাদিগের সৌভাগ্য-তপন সমুদিত হইতে অনেক বিলম্ব হইবে; যাঁহারা আপনারা অভিমানভরে রহিবেন বা অভিমান-ত্যাগী ব্যক্তির উন্নতিশীল গতির অন্তরায় হইবেন, তাঁহারা অন্তরে দেশহিতৈষী হইলেও কার্য্যতঃ দেশের পরম শত্রু।

আধুনিক সভ্য ইউরোপের নিকট সভ্যতা ও জ্ঞান শিক্ষা করিতে হইলে, সভ্যতা ও জ্ঞানের রঙ্গভূমি ইউরোপ ক্ষেত্রে গমন করা একান্ত প্রয়োজন। অভিনয়ের বর্ণনা শুনিয়া যেমন অভিনয়-দর্শনের তৃপ্তি লাভ করা অসম্ভব, শুদ্ধ পুস্তক পড়িয়া সেই জীবন্ত সভ্যতা ও জ্ঞানের অনুভূতি করা সেইরূপ অসম্ভব। যেমন শবচ্ছেদ না করিয়া শারীর-বিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তিলাভের চেষ্টা বিড়ম্বনামাত্র, সেইরূপ সভ্য সমাজের আভ্যন্তরীণ চিত্র স্বচক্ষে না দেখিয়া সভ্যতার অনুকরণচেষ্টা উপহাসাস্পদ মাত্র। আমরা এইজন্যই ইউরোপযাত্রার বিশেষ পক্ষপাতী। বিশেষতঃ বিলাতগমনে আমাদিগের দ্বিবিধ উপকার আছে। এক দিকে সভ্যতা ও জ্ঞানলাভ, অন্যদিকে ধন, মান ও পদলাভ। এ দ্বিবিধ উপকারই আমরা এখানে থাকিয়া সম্পূর্ণরূপে ও সহজে লাভ করিতে পারি না।

এই সকল উপকার আছে বলিয়াই অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া পশ্চিমাভিমুখে প্রবল জনস্রোত বহিয়াছে। মহাত্মা রামমোহন রায়ের সময় হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত অনেকগুলি ভারতবর্ষীয় ক্রমে ক্রমে নানা উদ্দেশে বিলাতগমন করিয়া তথা হইতে ভারতে ফিরিয়া আসিয়াছেন, এবং কতকগুলি এখনও তথায় অবস্থান করিতেছেন। রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, জঙ্গবাহাদুর, কেশবচন্দ্র সেন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি কয় জন ভিন্ন আর প্রায় সকলেরই বিলাতগমনের উদ্দেশ্য বিদ্যোপার্জ্জন বা বাণিজ্য। আমাদিগের বিশ্বাস, যদি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের বিলোপ না হয়, তাহা হইলে, সেই স্রোত দিন দিন অধিকতর প্রবল হইবে। এ স্রোতের গতি বা বেগ নিবারণ করা হিন্দু সমাজের এক্ষণে অসাধ্য।

কেন অসাধ্য, তাহা আমরা বলিতেছি। উচ্চপদে আরোহণ করার ইচ্ছা ও তদনুষ্ঠানচেষ্টা মানবজাতির হৃদয়ের একটি বলবতী স্বাভাবিকী বৃত্তি। সামান্য গার্হস্থ্য ভৃত্য হইতে সম্রাট্ পর্য্যন্ত সকলেই এই প্রবল বৃত্তির দাস। বস্তুতঃ পরিশ্রমের বা

---

* চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ। —মহাভারত।

মস্তিষ্কপরিচালনের বিনিময়ে যখন বেতন লইতেই হইল, তখন যাহাতে অধিক বেতন পাওয়া যায়, তাহার চেষ্টা করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। সেইরূপ বাণিজ্য-স্থলেও বলিতে পারা যায় যে, যখন বাণিজ্য করিয়াই অর্থোপার্জ্জন করিতে হইল, তখন যাহাতে সেই বাণিজ্যের সর্ব্বতোভাবে শ্রীবৃদ্ধি হয়, তাহাই কর্ত্তব্য। যদি তাহাই কর্ত্তব্যস্থির হইল, তাহা হইলে, কি উপায়ে অধিক বেতনলাভ করা যাইতে পারে এবং কি উপায়েই বা বাণিজ্যের সবিশেষ শ্রীবৃদ্ধিসাধন করা যাইতে পারে, সেই উপায়ের উদ্ভাবন ও অনুবর্ত্তন কখন অকর্ত্তব্য বা নীতিবিগর্হিত হইতে পারে না। বিলাত-গমন সর্ব্বোচ্চ বেতনপ্রাপ্তির ও বাণিজ্যের উৎকর্ষ-সাধনের প্রধান উপায়; সুতরাং বিলাতগমন কখনও অকর্ত্তব্য বা নীতিবিরুদ্ধ হইতে পারে না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বিলাতগমন যেমন উচ্চপদ ও উচ্চবেতনপ্রাপ্তির প্রধান উপায়, ইহা সভ্যতা শিক্ষা ও জ্ঞানোপার্জ্জনের সেইরূপ প্রধান সোপান। আমরা এখানে যে সকল অধ্যাপকের নিকট ইংরাজী সাহিত্য, ইংরাজী গণিত, ইংরাজী বিজ্ঞান প্রভৃতি অধ্যয়ন করি, বিলাতে গমন করিলে, সেই অধ্যাপকদিগের অধ্যাপকের নিকট সেই সেই বিষয় শিক্ষা করিতে পারি। অনেক সময় এরূপ ঘটে যে, আমরা এখানে যাঁহাদিগের রচিত পুস্তক পাঠ করি, তাঁহারাই ব্রিটনে সেই সেই বিষয়ের অধ্যাপক। সুতরাং গ্রন্থকর্ত্তা অধ্যাপকের নিকট গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় পড়িয়া যে সুখ ও যে উপকার, অপরের নিকট তাহা পড়িয়া কখনই সে সুখ ও সে উপকার হইতে পারে না। গ্রন্থকর্ত্তা অধ্যাপক আপনার গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় যেরূপ বিশদরূপে বুঝাইতে পারিবেন, অপরে কখন সেরূপ পারিবেন না। এই জন্য যেখানে যে বিষয়ের উৎপত্তি, সেইখানেই নানাদেশের ছাত্রগণের সমাগম। নবদ্বীপে আধুনিক স্মৃতি ও দর্শন শাস্ত্রের উৎপত্তি ও আলোচনা বলিয়াই নানা দেশ হইতে তত্তদ্বিষয়ের অধ্যয়নাভিলাষী ছাত্রগণ আসিয়া তথায় সেই সেই শাস্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকেন। যুদ্ধবিদ্যায় দেবতারা বিশেষ পারদর্শী ছিলেন বলিয়াই অর্জ্জুনাদি অমরাবতীতে অস্ত্রশিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। এই রীতি চিরপ্রচলিত, স্বভাবসিদ্ধ ও শুভপ্রদ। ইহার ব্যতিক্রমে বরং অমঙ্গলেই সম্ভাবনা। যেমন এক ব্যক্তি সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ হইতে পারে না, সেইরূপ এক জাতিও সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারেন না। বিশেষ জাতির বিশেষ বিশেষ বিষয়ে বিশিষ্ট পারদর্শিতা দেখিতে পাওয়া যায়। পরের যাহা ভাল, তাহা শিখিয়া গৃহে আনিবে, আর তোমার যাহা ভাল, তাহাতে অপরকে শিক্ষা দিবে—এইরূপ উদারনীতি ব্যতিরেকে জগতে উন্নতির সামঞ্জস্য রাখিতে পারা যায় না। এই উদার নীতির অভাবেই জগতে জ্ঞান ও সভ্যতার এত বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই উদার নীতির অভাবই ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণের পতনের অন্যতম কারণ। ভারতবর্ষীয় আর্য্যেরা যে অতিশয় প্রতিভাশালী ছিলেন এবং অনেক বিষয়েই তাঁহারা যে মৌলিক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন—ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের লজ্জার সহিত স্বীকার করিতে হইবে যে, আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ অতিশয় জ্ঞানগর্ব্বিত ছিলেন। তাঁহারা নিজে যাহা উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, তাহা অপেক্ষা আর কিছু ভাল হইতে পারে, এরূপ সংস্কার তাঁহাদিগের ছিল না। তাঁহারা আপনাদিগের দ্রব্যজাত লইয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু মানুষ সর্ব্বজ্ঞ নহে। সুতরাং বৈদেশিক আলোক-বিরহে তাঁহাদিগের উন্নতি ক্রমে স্থিতিশীল হইয়া উঠিল। ইহা একটি নির্দ্দিষ্ট শৃঙ্গ উঠিয়া আর উঠিতে পারিল না। তাঁহারা পরিতৃপ্ত হইলেন যে, উন্নতি-শৈলের ইহা অপেক্ষা উচ্চতর শৃঙ্গ আর নাই। তাঁহাদিগের অগ্রগামিনী গতি নিবৃত্ত হইল, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে পতনও আরম্ভ হইল। কারণ, প্রকৃতির নিয়মে কোন পদার্থই চিরদিন এক ভাবে বা এক স্থানে থাকিতে পারে না। হয় ইহা উঠিবে, নয় নামিবে; হয় অগ্রসর হইবে, নয় পশ্চাদ্বর্ত্তী হইবে। জীবনের প্রথম নিয়ম গতি। যেমন সর্ব্বপ্রকার দৈহিক গতিরোধ হইলেই দেহীর মৃত্যু, সেইরূপ সর্ব্বপ্রকার সামাজিক গতিরোধ হইলেই সমাজের মৃত্যু। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ উন্নতি-শৈলের যে শৃঙ্গে উঠিয়াছিলেন, আমরা ধীরে ধীরে সেই শৃঙ্গের প্রায় পাদদেশে আসিয়া পড়িতেছি। সেই অধোগতির ধীরবেগে এখনও আমাদিগের জাতীয় দেহে সঞ্জীবনী শক্তি আছে। এখনও উঠিতে চেষ্টা করিলে, আমরা

উঠিতে পারিব। কিন্তু যখন সেই শৃঙ্খল চরণ-তলে পড়িয়া আমাদিগের সর্ব্বপ্রকার গতিরোধ হইয়া সঞ্জীবনীশক্তি একেবারে বিনষ্ট হইবে, তখন আর কোন আশা থাকিবে না, তখন আমাদের জাতীয় মৃত্যু অপরিহার্য্য। সেই অবশ্যম্ভাবী জাতীয় মৃত্যুর দিন দূর-প্রসারিত করিতে হইলে, আমাদিগকে উঠিতে হইবে। কিন্তু কি উপায়ে আমরা উঠিতে পারি? বহুদিনব্যাপী অবনমন আমাদিগের জাতীয় অঙ্গ স্ফূর্ত্তি-বিহীন হইয়াছে। এ অবস্থায় অন্য-নিরপেক্ষ হইয়া উঠিতে গেলে, অভ্যুত্থান স্পৃহা হয় ত ফলবতী না হইতে পারে, যদি ফলবতী হয়, তবে অনেক বিলম্ব হইতে পারে। এ দুর্ব্বল শরীরে বৈদেশিক জাতির হস্তাবলম্ব একান্ত প্রয়োজন; প্রয়োজন বলিয়াই দৈবী শক্তি-প্রভাবে অথবা প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে ইংরাজ ভারতে। ভারতীয় ইংরাজ আমাদিগকে কথঞ্চিৎ করাবলম্ব প্রদান করিয়াছেন বটে, আমাদিগকে জাতীয় পতনাবস্থা হইতে কিঞ্চিৎ তুলিতেছেন, কিন্তু আমাদিগকে এখনও পূর্ণ জাতীয় জীবনের সুখে সুখী করিতে পারেন নাই। সে দেবদুর্লভ সুখ কিরূপ, আমরা ভারতীয় ইংরাজের সংসর্গে আসিয়া জানিতে পারি না। জাতীয় জীবনের চিরদোলা শ্বেতদ্বীপে গমন না করিলে সে সুখের পূর্ণ প্রতিবিম্ব আমরা দেখিতে পাই না। জাতীয় জীবনের জ্বলন্ত ভাব আমরা ভারতে কখনই উপলব্ধি করিতে পারি না। জাতীয় কার্য্যে জীবন্ত ভাব এ পতিত ভারতে থাকিয়া আমাদিগের দেখিবার সম্ভাবনা নাই। আজ গ্লাডষ্টোন বক্তৃতা করিবেন, পঞ্চাশৎ সহস্র লোক হাইড পার্কে সমবেত; আজ ব্রাডল্ পার্লেমেণ্ট হইতে তাড়িত, বিংশ সহস্র লোক পার্লেমেণ্টের দ্বারে দণ্ডায়মান—জাতীয় জীবনের এ মূর্ত্তি যে কখন দেখে নাই, তাহার অন্তরে জাতীয় জীবনের জীবন্ত ভাব কিরূপে আবির্ভূত হইবে?

সুতরাং আমাদিগকে উন্নতি পথে অগ্রসর হইতে হইলে, কোন উন্নতিশীল জাতির জাতীয় জীবনের আভ্যন্তরীণ চিত্র স্বচক্ষে দেখিতে হইবে। কোন্ কোন্ নৈতিক ও সামাজিক উপাদান সেই উন্নতির ভিত্তিভূমি, তাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়া ভারতীয় সমাজে তাহার বীজ বপন করিতে হইবে। সেই বীজ যখন বৃক্ষরূপে পরিণত হইবে, তখনই আমাদিগের জাতীয় জীবনের পূর্ণ বিকাশ হইবে। ইহা না করিয়া যাঁহারা গৃহে বসিয়া সমাজশাসন-বহির্ভূত দুই একটি ভারতীয় ইংরাজ-গৃহের চিত্র দেখিয়া সমস্ত ইউরোপীয় সমাজের ভিত্তিভূমি দূষিত মনে করিয়া আপনার অন্তরে ভ্রান্ত জাতীয় গৌরব পরিপোষিত করেন, তাঁহাদিগের মত পাগল আর দেখিতে পাওয়া যায় না।

চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন যে—যে জাতির সমাজ ও নীতি দূষিত, সে জাতি কখনই সভ্যতা ও উন্নতিশৈলের উচ্চতম শৃঙ্গে উঠিতে পারে না। সামাজিক ও নৈতিক উৎকর্ষের সহিত সভ্যতা ও উন্নতির অব্যভিচারী কার্য্য কারণ-সম্বন্ধ। ইতিহাস ইহার প্রত্যক্ষ সাক্ষী। সুতরাং সভ্যতা ও উন্নতির রঙ্গভূমি ইউরোপ বা ব্রিটন যে নৈতিক ও সামাজিক উৎকর্ষে আধুনিক ভারতের নিম্নে অবস্থিত, এ কথা অশ্রদ্ধেয় ও অপ্রামাণ্য। কখন যে ভারতে নৈতিক ও সামাজিক উৎকর্ষ ছিল না, এ কথা আমরা বলি না। প্রাচীন ভারতে সামাজিক ও নৈতিক উৎকর্ষের প্রতি আমাদিগের শ্রদ্ধা অচলা। কিন্তু বর্ত্তমান পতিত ভারতে সে উৎকর্ষানলের কেবল ভস্মরাশি মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

ভারতে বসিয়া শুদ্ধ আমাদিগের অতীত গৌরবের জন্য অশ্রুবিসর্জ্জন করা অপেক্ষা পাশ্চাত্য-জাতিনিচয়ের গৌরব-তপনের প্রখর রশ্মিমালায় উদ্ভাসিত হওয়া সর্ব্বথা শ্রেয়ঃ। সেই রশ্মি-মালার সঞ্জীবনী শক্তিপ্রভাবে আমাদিগের জাতীয় জীবন নবজীবন ধারণ করিবে। স্বাধীন চীন, স্বাধীন জাপান—প্রাচ্য ফ্রান্স, প্রাচ্য ব্রিটন—অর্থকরী বিদ্যার অনুশীলনার্থ নহে, উচ্চতর সভ্যতা ও জ্ঞানের সংস্রবে আসিয়া অধিকতর সভ্যতা ও জ্ঞান লাভ করিবার জন্য, বর্ষে বর্ষে কত শত যুবককে ইউরোপে ও আমেরিকায় প্রেরণ করিতেছেন। যখন ভারত—প্রাচ্য ইতালী—স্বাধীন ছিল, তখন ভারতের বাণিজ্য-পোত সুদূর প্রাচ্যে ভারতের রত্নরাশি ছড়াইয়া তৎপরিবর্ত্তে নানাদেশের পণ্যজাত লইয়া গৃহভাণ্ডার পরিপূরিত করিত। তখন ভারতের সার্থবাহ বণিকনিচয় পদব্রজে ব্যাক্‌ট্রিয়, তাতার, কাস্‌পিয়ান, কৃষ্ণহ্রদ অতিক্রম করিয়া গ্রীস, ইতালী, ভিনিস, লম্বার্ডী—সর্ব্বত্র ভারতের পণ্যজাত লইয়া যাইত। সে লক্ষ্মীশ্রীর সময় ভারতে

সমুদ্রযাত্রা বা বৈদেশিকসংমিশ্রণ নিষিদ্ধ ছিল না। কিন্তু আজ পতিত ভারতের সকলই সাগল !

যদি বিদ্যা, বুদ্ধি ও সভ্যতাতে ভারত ইউরোপের সমকক্ষ হইত, তাহা হইলেও ইউরোপের সহিত সংমিশ্রণে ভারতের সবিশেষ উপকার হইত। নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া নানা জাতির রীতি নীতি ও সামাজিক আচার ব্যবহার দেখিলে, মানসিক জড়তা অপনীত এবং জাতীয় কুসংস্কার বিদূরিত হয়। এই জন্য ব্রিটন ও অন্যান্য ইউরোপীয় জাতির মধ্যে এরূপ প্রচলিত আছে যে, বিশ্বালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত হইলে, ছাত্রদিগকে দেশ পর্য্যটন করিতে হইবে। দেশপর্য্যটন বিনা শিক্ষা অসম্পূর্ণ হইবে। ব্রিটনের ছাত্রেরা ফেলোশিপ লইয়া ছয় মাস বা এক বৎসরকাল ইউরোপ মহাদেশ পর্য্যটন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন জাতির জাতীয় জীবনের আভ্যন্তরীণ চিত্র স্বচক্ষে দেখিয়া বেড়ান এবং যতদূর সাধ্য তাঁহাদিগের ভাষা কিঞ্চিৎ শিখিয়া লন। যাঁহারা ফেলোশিপ পান না, অথচ যাহাদিগের পিতা-মাতার অবস্থা ভাল, তাঁহারাও পিতৃমাতৃ-ব্যয়ে শিক্ষাসমাপ্তির জন্য ইউরোপযাত্রা করেন। এইরূপ ইউরোপের ছাত্রেরাও শিক্ষাসমাপ্তির জন্য ব্রিটন ও ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশে গমন ও অবস্থিতি করিয়া থাকেন। কিন্তু হতভাগ্য বঙ্গে কি হইয়া থাকে ? যাঁহারা প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ-প্রতিষ্ঠাপিত ফেলোশিপ প্রাপ্ত হন, তাঁহারা প্রায় সকলেই বলবতী অর্থোপার্জ্জন-স্পৃহার দাস হইয়া অন্যের কষ্টার্জ্জিত ধনে আপনাদিগের জ্ঞান বৃদ্ধি না করিয়া আপনাদিগের ব্যবহার-ব্যবসায়ের উন্নতিসাধন করিয়া লন। যে দিন ফেলোশিপ পান, সেই দিন হইতেই তাঁহাদিগের সমস্ত উন্নতির স্রোত রুদ্ধ হয়। যাহাদিগের পৈতৃক সম্পত্তি আছে, তাঁহারা প্রায়ই বিদ্যা-মন্দিরের উচ্চতম সোপানে উঠিতে পারেন না, যাঁহারা সমর্থ হন, তাঁহারা প্রায়ই বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া বিলাসিতার মোহন ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহাদিগের জ্ঞান-পিপাসা উপাধিপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই অন্তর্হিত হয়। সুতরাং যাঁহারা আশা করেন যে, ধনীর তনয় বিলাতগমন করিয়া, বিজেতৃ জাতির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা-সমরে জয়ী হইয়া ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিবে, তাহাদিগের কর-কবল হইতে পদ-মর্য্যাদা কাড়িয়া লইবে এবং আমাদিগের ললাট-ঘর্ম্মার্জ্জিত ধনের অন্ততঃ কিয়দংশ স্বদেশে পরিরক্ষিত করিবে, তাঁহাদিগকে আমরা নিতান্ত ভ্রান্ত মনে করি। উচ্চশ্রেণী দ্বারা কখনই কোন দেশের কোন বিপ্লব সাধিত হয় নাই। আজ উচ্চশ্রেণী নামিয়া ভারতের এই প্রকাণ্ড বিপ্লব সংসিদ্ধ করিবেন, ইহা কোন মতে বিশ্বাস করা যায় না। যদি এ বিপ্লব কাহারও দ্বারা সংসাধিত হয় ত মধ্য বা নিম্নশ্রেণীর দ্বারাই হইবে।

অনেকে এইরূপ প্রশ্ন তুলিয়া থাকেন যে, যখন এ দেশে থাকিয়াও জ্ঞান ও অর্থ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উপার্জ্জন করা যাইতে পারে, তখন এত ব্যয় করিয়া ও এত ক্ষতিস্বীকার করিয়া বিলাতে যাইবার প্রয়োজন কি ? তাঁহাদিগের প্রতি আমাদিগের বক্তব্য এই যে, বিলাত যাওয়া শুদ্ধ জ্ঞানপিপাসা বা অর্থলিপ্সা চরিতার্থ করিবার জন্য নহে, আমাদিগের বিজেতা ইংরাজের সমান পদ ও সমান ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবারই জন্য। বিজেতৃ জাতির অনৌদার্য্যদোষে আমরা এ দেশে থাকিয়া, কখন ইংরাজের সমান পদ ও সমান ক্ষমতা পাইতে পারি না। একজন ব্যারিষ্টার অপেক্ষা একজন হাইকোর্টের উকীল অধিক অর্থ পাইতে পারেন, কিন্তু ব্যারিষ্টারের ক্ষমতা ও স্বত্ব, হাইকোর্টের উকীলের ক্ষমতা ও স্বত্ব অপেক্ষা অনেক অধিক। সুশিক্ষিত নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহারা বাঙ্গালী ব্যারিষ্টারের দলবৃদ্ধি দেখিয়া ভীত ও দুঃখিত হন, তাঁহাদিগের প্রতি আমাদের একমাত্র বক্তব্য এই যে, বাঙ্গালী ব্যারিষ্টারের সংখ্যাবৃদ্ধির সহিত যদি সাহেব ব্যারিষ্টারের সংখ্যা হ্রাস হয়, তাহা হইলে আমাদিগের সমূহ মঙ্গল। ভারতের কষ্টোপার্জ্জিত অর্থের পশ্চিমবাহি-স্রোতঃ অন্ততঃ কিঞ্চিৎ রুদ্ধ হইলেও আমাদিগের যথেষ্ট লাভ। যদি বলেন, ইহাতে সাহেব ব্যারিষ্টারের সংখ্যা কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই, তাহা হইলে, সাহেব ব্যারিষ্টারগণের আয় কমিয়া গিয়াছে অথবা বাঙ্গালী ব্যারিষ্টারগণ অনশনে প্রাণত্যাগ করিতেছেন—আমাদিগকে অগত্যা এই দুই বিকল্পের অন্যতর স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু আমরা যত দূর জানি, তাহাতে সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, কোন বাঙ্গালী ব্যারিষ্টারকেই আজও অনশনে প্রাণত্যাগ করিতে হয় নাই ; তাঁহাদিগের যেরূপ আশা, সকলে তদনুরূপ উপার্জ্জন করিতে

পারিতেছেন না বটে, কিন্তু সকলেরই আয় সাধারণ উকীলের অপেক্ষা অনেক অধিক। আর আমরা যদি স্বজাতিপোষক হইতাম, যদি মোকদ্দমা উপস্থিত হইলেই ইংরাজ ব্যারিষ্টারের শরণাগত না হইতাম, তাহা হইলে কি অঙ্গুলিমাত্র গণনীয় কয়জন মাত্র বাঙ্গালী ব্যারিষ্টারের অবস্থা সাধারণ সাহেব ব্যারিষ্টারের অপেক্ষা হীন হইত? তাহা হইলে কি ভারতের অর্থ নদীস্রোতের ন্যায় অবাধে শ্বেতসাগরে গিয়া মিশিত? যাহাই হউক, আমাদিগকে পূর্ব্বকল্প স্বীকার করিতেই হইতেছে যে, বাঙ্গালী ব্যারিষ্টারগণের আবির্ভাবে সাহেব ব্যারিষ্টারগণের আয় কমিয়া ভারতের অর্থ অন্ততঃ কিছু পরিমাণে ভারতে রহিয়া যাইতেছে।

কেহ কেহ বলেন যে, ব্যারিষ্টার হইবার জন্য দশবার হাজার টাকা নষ্ট না করিয়া, তাহাতে একটা ব্যবসায় করিলে অধিক লাভ হইতে পারে, অনেক উচ্চশিক্ষার বিরুদ্ধেও এরূপ আপত্তি শুনিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, একটি পুত্রকে এম, এ. বি, এল, পর্য্যন্ত পড়াইতে যে ব্যয় হয়, আজ কাল সে ব্যয়ের প্রতিদান হয় না। এই দুই স্থলেই আমাদিগের বক্তব্য এই যে, যত দিন আমরা এই উভয় দলের আয়ের নিয়মিত গড় তালিকা গঠন না করিতেছি, তত দিন এরূপ নিশ্চয় করিয়া বলিবার আমাদের অধিকার নাই। যদি বাস্তবিকই ইহা হইত, তাহা হইলে, এই দীন ভারতের উচ্চশিক্ষা ও বিলাতযাত্রার স্রোতঃ দিন দিন বৃদ্ধি না পাইয়া নিশ্চয়ই হ্রাস প্রাপ্ত হইত। আমরা যত দূর জানি, তাহাতে আমাদিগের সংস্কার যে, একজন গ্রাজুয়েট কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইবার সময় প্রথম দুই এক বৎসর ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারেন, কিন্তু তাহার পর তাঁহাদিগের আয় তাঁহাদিগের উপর ব্যয়িত মূলধনের বাণিজ্যে নিয়োগোৎপন্ন লাভ অপেক্ষা অনেক পরিমাণ অধিক ব্যয় হইয়া থাকে। বাঙ্গালী ব্যারিষ্টারগণ সাধারণতঃ অতিশয় অপরিমিত ব্যয়ী। এই জন্য অনেক সময় তাঁহারা পর্য্যাপ্ত আয় সত্ত্বেও কষ্ট পাইয়া থাকেন। এই জন্যই তাঁহাদিগের সাধারণ গড় আয় বোধ হয় পাঁচ শত টাকার ন্যূন হইবে না। দুই এক জনের আয় মাসিক দশ সহস্র মুদ্রা শুনিতে পাওয়া যায়! এই ত গেল অর্থ সম্বন্ধে। তদ্ভিন্ন বাঙ্গালী ব্যারিষ্টারগণের যে মর্য্যাদা, যে স্বত্ব—বাঙ্গালী জজ ভিন্ন আর কোন বাঙ্গালীর সেরূপ স্বত্ব নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, দশ হাজার টাকার মূলধন লইয়া ব্যবসায় করা অপেক্ষা সেই টাকায় ব্যারিষ্টার হইয়া আসিতে পারিলে, অধিক অর্থ, অধিক মান, অধিক মর্য্যাদা ও অধিক ক্ষমতা পাওয়া যাইতে পারে। এতদ্ভিন্ন যাহারা সিবিল সার্বিস বা মেডিকেল সার্বিসের জন্য বিলাত গমন করেন, তাঁহাদিগের ব্যয়, ব্যারিষ্টার হইবার জন্য যে ব্যয় হয়, তাহা অপেক্ষা প্রায় অধিক। তাহারা কৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসিয়া কার্য্যে যোগ দিবার দিন হইতে তাহাদিগের আয় তাঁহাদিগের প্রতি ব্যয়িত মূলধনের সাধারণ বাণিজ্য লব্ধ আয় অপেক্ষা অনেক গুণ অধিক হইয়া পড়ে। ক্রমেই তাহাদিগের আয় বাড়িতে থাকে। এদিকে তাঁহাদিগের মান, সম্ভ্রম, স্বত্ব এ দেশে পদবীযোগ্য। সুশিক্ষিতগণের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির অপেক্ষা অনেক অধিক হইয়া থাকে। যে সকল উচ্চ পদ একমাত্র বিজেতা জাতির উপভোগ্য, তাহাতে তাঁহারা অধিষ্ঠিত হওয়ায় বিজেতাগণের সহিত তাঁহাদিগের বৈষম্য প্রায় তিরোহিত হয়। এরূপ সমাজের কিয়দংশও বিজেতা জাতির সমকক্ষ হওয়ায়, অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, বঙ্গ সমাজ অন্ততঃ কিঞ্চিৎপরিমাণেও দিন দিন অগ্রসর হইতেছে এবং বিন্দুপরিমাণেও দিন দিন উন্নতিশীল হইতেছে। এ শুভপদ সামাজিক স্বাস্থ্যের অগ্রগমনকে কেহ কেহ কি বলিয়া রোগপর্য্যায়ভুক্ত করেন, আমরা ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না।

সুশিক্ষিত দলের কেহ কেহ ছেলেপিলের বিলাত যাওয়া সমাজশাসন দ্বারা নিরুদ্ধ করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইয়াছিলেন। তাঁহারা বিংশতি বা তদূর্দ্ধ বর্ষ বয়স্ক ব্যক্তির বিলাত গমন অনুমোদন করেন, তন্ন্যূনবয়স্ক বালকের বিলাত যাওয়া রোগ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং কঠোর সামাজিক দণ্ডবিধি দ্বারা তাহা নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহেন। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত যাহারা স্বাধীন ভাবে বিলাত গিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে বিংশতি বর্ষ বয়সের ন্যূনবয়স্ক ত কাহাকেও দেখিতে পাই না। সুতরাং যখন অপরাধী নাই, তখন কঠোর দণ্ডবিধির অবতারণা করিতে সমাজকে

অনুরোধ কেন? যাহাতে সমাজের প্রকৃত উন্নতি, সেই সৎসাহস ও সাধু উদ্যমকে সামাজিক রোগ বলিয়া নির্দ্দেশ কেন? বিজেতৃ জাতির নিকট আপনাদিগের প্রাকৃতিক স্বত্ব কাড়িয়া লইবার যাহা একমাত্র উপায়, সে পথে নূতন কণ্টক-রোপণ করিবার চেষ্টা কেন?

যাহারা সত্য সত্যই বিশ্বাস করিয়া থাকেন যে, বিলাত যাওয়ায় যে পরিমাণ ব্যয়, কিছুতেই সে পরিমাণ লাভ নাই, তাঁহাদিগের প্রতি বক্তব্য এই যে, অলাভকর বাণিজ্যে স্বতই মনুষ্যের অপ্রবৃত্তি জন্মে, সুতরাং যদি স্বতই ইহা অলাভকর হয়, তাহা হইলে, লোকে ইহা হইতে আপনি নিরস্ত হইবে। দশ জনের ক্ষতি দেখিয়া, আর দশ জন আপনিই পশ্চাৎপদ হইবে। লাভ ক্ষতি গণনা মনুষ্যের অতি প্রবল স্বাভাবিক ধর্ম্ম। তাহাতে অপ্রবৃত্তি নিরাস্ত সমাজ-শাসনের অধীন নহে। সমাজ অন্য ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া ক্ষতিগ্রস্তের প্রতি যখন খড়্গহস্ত হন না, তখন বিলাতে যাইয়া ক্ষতি-গ্রস্ত হইলে ক্ষতিগ্রস্তের প্রতি সমাজ কেন দণ্ডবিধান করিতে যাইবে? ইহা সামাজিক অপরাধ নহে, সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত বিষয়। এ সকল বিষয়ে সমাজ হস্তক্ষেপ করিলে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা লোপ হইবে; সুতরাং ব্যক্তিগত উন্নতির পথও একেবারে রুদ্ধ হইবে। আর সমাজ ইচ্ছা করিলেই বা কিরূপে এই সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন?

"ক ঈপ্সিতার্থস্থিরনিশ্চয়ং মনঃ পয়শ্চ নিম্নাভিমুখং প্রতীপয়েৎ?" (কুমারসম্ভব)

নিম্নাভিমুখিনী স্রোতস্বিনীর গতি এবং অভিলষিত বিষয়ে কৃতসঙ্কল্প ব্যক্তির মনকে ফিরায় কাহার সাধ্য? যখন জননীর অশ্রুজল ও পত্নীর ক্রন্দন বিলাত-গমনে স্থিরসঙ্কল্প ব্যক্তির মনকে ফিরাইতে পারে না, তখন সামাজিক শাসনের ভয়ে তাঁহারা নিরস্ত হইবেন, এরূপ আশা করা বিড়ম্বনা-মাত্র। ফিরিয়া আসিলে সমাজ তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিতে না পারেন, কিন্তু তাঁহাদিগের যাওয়া নিবারণ করায় সমাজের কি হাত? হিন্দু-সমাজ যেরূপ অদূরদর্শী ও অনুদার, তাহাতে সাধ্য থাকিলে যে এ পথ রুদ্ধ করিতে ক্ষান্ত থাকিতেন, এরূপ নহে। যেখানে সমাজের ক্ষমতা দেখাইবার সুবিধা আছে, সেখানে হিন্দু সমাজ ক্ষমতা দেখাইতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করেন না। বিলাত হইতে প্রত্যাবৃত্ত যুবক-মণ্ডলীর প্রতি হিন্দুসমাজ যেরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই! যে পুত্রকে পিতা এক দিন পুনঃ পুনঃ ক্রোড়ে লইয়া ও পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিয়াও পরিতৃপ্ত হইতেন না, সেই পুত্র বিলাত হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আজ পিতার চরণতলে লুণ্ঠিতশিরঃ; কিন্তু পিতৃদেব আজ সমাজের ভয়ে বা হৃদয়ের কাঠিন্য-বশতঃ তাঁহার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া ভূমিবিলুণ্ঠিত পুত্রকে তুলিয়া আলিঙ্গন না করিয়া—অধিক কি, মুখের কথায় তাঁহাকে আশ্বস্ত না করিয়া—অন্তর্হিত হইলেন। যদি পিতা মানবসুলভ অপত্য-স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া, পুত্রকে গৃহে স্থান দিলেন, সমাজ সেই অস্পৃশ্য চণ্ডালসম পুত্রের আশ্রয়দাতা পিতাকেও পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহাদিগের সহিত সমাজের সর্ব্বপ্রকার সংমিশ্রণ, সর্ব্বপ্রকার আদান ও প্রদান একেবারে রহিত হইল। সামাজিক নির্য্যাতনের ইহা অপেক্ষা অধিকতর শোচনীয় দৃশ্য আর কি হইতে পারে?

এই সমাজ-প্রত্যাখ্যাত বিলাত-প্রত্যাগত যুবক-মণ্ডলী ক্রমে দলবদ্ধ হইতেছেন। কিন্তু ইহাঁদিগের ভবিষ্যৎ এক্ষণে সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। হিন্দু-সমাজ হইতে তাড়িত ও ইউরোপীয় সমাজে অগৃহীত—এই নবীন দলের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। ইহাঁদিগের পদমর্য্যাদা-ধন—সাধারণ যুবকমণ্ডলীর অপেক্ষা অনেক অধিক বটে, কিন্তু সামাজিক সংমিশ্রণ অভাবে ইহাঁদিগের হৃদয় শুষ্ক ও জীবন মরুতুল্য। এ শোচনীয় অবস্থার জন্য দায়ী কে? আমরা বলি, প্রধানতঃ হিন্দুসমাজ। হিন্দুসমাজ যদি প্রত্যাবৃত্ত যুবক-মণ্ডলীকে সস্নেহে বক্ষে ধারণ করিতেন, তাহা হইলে, এই নবীন দল কখনই সমাজকে পদদলিত করিতে পারিতেন না। মাতৃক্রোড়ে থাকিয়া, মাতৃ-বক্ষে পদাঘাত করিতে পারে কয় জন? কিন্তু যখন তাঁহারা বিদেশ হইতে আসিয়া দেখেন যে, হিন্দু-সমাজ আর তাঁহাদিগকে পূর্ব্বের মত স্নেহনয়নে দেখিতেছেন না, তখন তাঁহাদিগের আত্মাভিমান স্বতই উদ্দীপিত হয়। তখন তাঁহারা আপনাদিগের ইচ্ছানুরূপ আচার-ব্যবহার আরম্ভ করেন। হতাশা-প্রপীড়িত হৃদয় ক্রমেই স্বজাতির প্রতি মমতাশূন্য হইয়া উঠে। ঘৃণার পরিবর্ত্তে ভক্তি বা মমতা দেখাইতে

সমর্থ, এরূপ মহাত্মা জগতে কয় জন আবির্ভূত হইয়াছেন? ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন— এই-ইসাধারণ নিয়ম। সাধারণ লোকে ইহারই অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে।

এই পরম্পর বিদ্বেষণের শুধু যে এই অনুবর্ত্তন দলই ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন, এরূপ নহে। হিন্দুসমাজ ক্রমে মস্তকবিহীন হইয়া পড়িতেছেন। যাঁহারা ধন, মান ও পদে সম্বেচ্ছ তাঁহারা সমাজের বাহিরে গিয়া পড়ায় হিন্দুসমাজ ক্রমে ক্ষীণ ও বিকলাঙ্গ হইয়া পড়িতেছেন। যাঁহারা সকল বিভাগেই বিজেতৃ জাতির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সমর্থ, তাঁহারা হিন্দু-সমাজের বহির্ভূত হওয়ায়, হিন্দু-সমাজের মর্য্যাদাও কমিয়া যাইতেছে। অন্তর্বিচ্ছেদে বহিঃশত্রুর আশা বাড়িতে হইতেছে। ভারতের ভাবী গৌরবের দিন সুদূরপরাহত হইতেছে। এমন অবস্থায় কোথায় আমরা ধর্ম্মান্ধ বা ব্যবহারান্ধ প্রাচীন দলকে বুঝাইয়া আমাদিগের জাতীয় জীবনের অভ্যন্তরে নব বল সঞ্চার করিব,—না কোথায় আমরা তাহাদিগের মুসংস্কারানল প্রজ্বলিত প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছি। ধিক্ আমাদিগের শিক্ষায়! ধিক্ আমাদিগের স্বদেশ হিতৈষিতায়!

সামাজিক নির্য্যাতন

আজকাল ব্রাহ্মসমাজ যে আন্দোলনে আমূল আলোড়িত হইতেছে, সেই আন্দোলনে সমস্ত শিক্ষিত হিন্দুসমাজও কিয়ৎপরিমাণে আন্দোলিত হইতেছে। এইরূপ আমূল আন্দোলন আমাদিগের মতে অশুভ লক্ষণ নহে, বরং ভারতের ভাবী উন্নতির অগ্রদূত। হিন্দুরাও যে ব্রাহ্মদিগের সুখে দুঃখে ও সামান্য গৃহকার্য্যে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে শিখিতেছেন, ইহাও একটি বিশেষ শুভলক্ষণ বলিতে হইবে।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, এরূপ আকস্মিক ভীষণ বিপ্লবের কারণ আমাদিগের চক্ষে অতি লঘু। ব্যক্তিবিশেষ ব্যক্তিবিশেষের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিলেন। বিবাহ সর্ব্ববাদিসম্মত হইল না। কত ব্রাহ্মণ অনুমোদন করিলেন, অনেকে করিলেন না। পক্ষে হউক, বিপক্ষে হউক, প্রকাশ্যে হউক, অপ্রকাশ্য লিপিতে হউক—ব্রাহ্মগণ আপন আপন অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। আমাদিগের মতে এই স্থানেই বেদব্যাসের বিশ্রাম হওয়া উচিত ছিল। ব্যক্তিগত কার্য্য লইয়া যদি সমাজ সতত সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হন, তাহা হইলে সমাজের উন্নতি ব্যাহত ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ভাব তিরোহিত হইবে।

ব্যক্তিগত স্বাধীনতা যে সামাজিক উন্নতির মূল, সুবিখ্যাত দার্শনিক জন ষ্টুয়ার্ট মিল্ তদীয় 'স্বাধীনতা' নামক পুস্তকে তাহা সবিশেষ প্রমাণীকৃত করিয়াছেন। সে সকল প্রমাণ উদ্ধৃত করা এ প্রস্তাবের কার্য্য নহে। সুতরাং এক্ষণে আমরা কেবল এ স্থলে সেই সিদ্ধান্তটি মূলভিত্তিস্বরূপ ধরিয়া লইব। একত্র সংবদ্ধ ব্যক্তিগণের সমষ্টির নাম সমাজ। যদি সেই ব্যক্তিগণের প্রত্যেকের চিন্তা ও কার্য্যে সর্ব্বতোমুখী স্বাধীনতা না থাকে, তাহা হইলে ব্যক্তিগত কার্য্যকরী ও চিন্তাবিধায়িনী স্বাধীনতার সহিত সামাজিক কার্য্যকরী ও চিন্তাবিধায়িনী স্বাধীনতাও লোপ হইবে। চিন্তা ও কার্য্যে সামাজিক স্বাধীনতা না থাকিলে যে সমাজ এক পাও অগ্রসর হইতে পারে না, তাহা বোধ হয় যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে হইবে না; ইহা এক প্রকার স্বতঃসিদ্ধ সত্যের মধ্যে সর্ব্বতঃ পরিগৃহীত হইয়াছে। এই সামাজিক স্বাধীনতা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সমূহের সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং ইহা বলা বাহুল্য যে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ব্যতীত স্বাধীনতার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অসম্ভব। অতএব ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সামাজিক স্বাধীনতা প্রার্থনীয় হইলে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অগ্রে প্রার্থনীয়।

এক্ষণে দেখা যাউক, এই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কিরূপে সুরক্ষিত হইতে পারে। যতক্ষণ না অপরের স্বাধীনতার সহিত এক জনের চিন্তা ও কার্য্যের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, ততক্ষণ তাহাকে অনিয়ন্ত্রিতভাবে কার্য্য করিতে ও চিন্তা করিতে দিলেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষিত হইতে পারে। আমি যাহা ভাল বুঝিলাম, তাহা লিখিলাম বা কার্য্যে পরিণত করিলাম, তাহাতে অপরের সুখ বা স্বাধীনতার কোনও ব্যাঘাত জন্মিল না। তথাপি তাহাতে অপরের আপত্তি কেন হইবে? সমাজের কি অধিকার আছে যে,

এই সকল বিষয়ে আমার স্বাধীনতা হরণ করেন? তবে সমাজ বলবান্, আমি দুর্ব্বল। সমাজ শক্তি-সমষ্টি, আমি এক শক্তির আধার। আমি সেই এক সূক্ষ্ম শক্তি লইয়া, সেই শক্তিরাশির প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইতে অক্ষম। এই আমার অপরাধ! আমি দুর্ব্বল, তাই আমি অপরাধী। দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচার চিরপ্রসিদ্ধ। সেই চিরকৃত নিয়মের অধীনে বলবান্ সমাজ আজ বলহীন অধীনকে এরূপ নির্য্যাতন করিতেছেন। আমি কি করিয়াছি? আমি বলিয়াছিলাম, কন্যার চতুর্দ্দশ বৎসরে এবং পাত্রের অন্যূন অষ্টাদশ বর্ষে বিবাহ হওয়া উচিত। আমি এখনও তাই বলি। কিন্তু এখনও তাই বলিয়া কি, যে শৃঙ্খল সখ করিয়া একবার পায়ে পরিয়াছি, তাহা কি ইচ্ছা হইলেও এ জন্মের মত আর খুলিতে পারিব না? ভাল লাগিয়াছিল বলিয়া শৃঙ্খল পায়ে পরিয়াছিলাম, ইচ্ছা হইল, একবার খুলিলাম; ইচ্ছা হইলে, হয় ত আবার তাহা পরিতে পারি। যতক্ষণ অপরের সুখ ও স্বাধীনতার প্রতিঘাত না করিতেছি, ততক্ষণ অপরের নির্য্যাতন করিবার অধিকার কি? তবে আমি সুন্দর বলিয়া সেই শৃঙ্খল বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনকে পরিতে বলি। ভাল লাগিয়াছিল বলিয়া, তাঁহারা তাহা পরিয়াছেন। আমি ত স্বহস্তে তাঁহাদিগকে তাহা পরাইতে যাই নাই। আমার ভাল লাগিয়াছিল, তাঁহাদিগকে পরিতে বলিয়াছিলাম; তাঁহাদিগের ভাল লাগিয়াছিল, তাঁহারাও পরিয়াছেন। আমার ইচ্ছা হইল, আমি একবার খুলিলাম। তাঁহাদিগের ইচ্ছা হয়, তাঁহারাও খুলিতে পারেন। যদি তাঁহারা এমন করিয়া পরিয়া থাকেন যে, সে শৃঙ্খল খুলিবার আর আশা নাই, সে দোষ তাঁহাদের। সে দায়িত্ব তাঁহারা নিজ নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছেন। তবে আমার উপর কোপ কেন? আমি বলিলাম, তোমাদিগের এইটি করা উচিত। আমার ভাল বলিয়া বোধ হইল, আমি বলিলাম, ভাল কি না, সে বিচার তোমরা করিবে। সে পছন্দ তোমাদিগের হাতে। তোমরা কেন আমি যাহাই বলিব, তাহাই করিবে? আমি যাহা ভাল বলিলাম, তাহা যদি তোমাদিগেরও ভাল লাগিল, তোমরা তাহা করিতে পার; কিন্তু দুই দিন পরে যদি তাহা মন্দ বলিয়া তোমাদের বোধ হয়, আমাকে গালাগালি দিও না, নিজ বুদ্ধিকে তিরস্কার করিও। আমি যাহা ভাল বলিয়া খ্যাপন করিয়াছিলাম, কার্য্যতঃ তাহা করিতে অক্ষম হইলাম—তজ্জন্য আমার উপর খড়্গহস্ত হইও না, কারণ, আমি ঘটনার দাস—হয় ত ইচ্ছা থাকিতেও যাহা ভাল বলিয়া জানি, অবস্থা বৈষম্যে তাহা করিতে পারিলাম না। ইহাতে তোমার কিছু অনিষ্ট হইতেছে না, তুমি রাগ কর কেন? অসৎ দৃষ্টান্ত? ইহার মানে না হওয়া উচিত। তুমি বলিবে, তুমি যাহা ভাল বলিয়া জান, তাহার প্রতিকূলাচরণ করিলে সকলে তোমার দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তন করিবে। আমি বলিব, আমি যে অবস্থায় পড়িয়া যাহা ভাল বলিয়া জানি তাহার প্রতিকূলাচরণ করিলাম। ঠিক সেই অবস্থায় পড়িয়া, যদি আর এক জনও ঠিক সেই কাজ করে, আমি তাহাকে দূষিব না। তুমি বলিবে, 'কোন স্থানেই নিয়মের ব্যভিচার হওয়া উচিত নয়।' আমি বলিব, যেখানেই নিয়ম—সেইখানেই ব্যভিচারের সম্ভাবনা—কারণ, মানুষ ঘটনার দাস, মানুষ অভ্রান্ত নহে, মানুষ সম্পূর্ণ সর্ব্বদর্শী নয়, ভবিষ্যতে ব্যভিচারের সম্ভাবনা নাই, এমন করিয়া কোন নিয়ম নির্দ্ধারণে অক্ষম। আমার এই আচরণে কোন অবোধ ব্যক্তি আমার ন্যায়, বিশেষ অবস্থায় না পড়িয়াও, পাছে আমার মত কার্য্য করে—পাছে আমার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করে—এই ভাবনায় যদি আমাকে অহরহ কাটাইতে হয় তাহা হইলে আমার মত দুঃখী জগতে আর নাই। আমি কি দোষে কি অবস্থায় পড়িয়া একটি কাজ করিলাম, তাহা সকলের জানিবার সুবিধা নাই। সকলের নিকট আমি হয় ত তাহা বলিতেও ইচ্ছা করি না। আর একজন অবোধ হয় ত উদ্দেশ্য ও অবস্থা না বুঝিয়া, শুদ্ধ আমি করিয়াছি বলিয়া—বিভিন্ন অবস্থায়, বিনা উদ্দেশ্যে বা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে—ঠিক সেইরূপ একটি কাজ করে, তাহার নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য কি আমি জবাবদিহি করিব? তাহার অজ্ঞতা অপরাধের দণ্ড কি সমাজ আমার মস্তকে অর্পণ করিবেন? সমাজ এরূপ উৎপীড়ন করেন ত আমি সামাজিক জীব নহি। আমি সামাজিক সুখের জন্য এরূপ অধীনতা স্বীকার করিতে বা এরূপ অকারণ অত্যাচার সহ্য করিতে প্রস্তুত নহি।

আমি আজ সমাজকে বলিলাম, এই কাজটি ভাল, এই কাজটি মন্দ। আজ আমার মতে এই কাজটি ভাল বটে, কিন্তু সেই মত যে আমার চিরদিন থাকিবে, তাহার প্রমাণ কি? জগতে সকলই পরিবর্ত্তনশীল। দিন যাইতেছে, আমার শরীর পরিবর্ত্তিত হইতেছে। যখন আমার শরীর পরিবর্ত্তিত হইতেছে, প্রকৃতির সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তখন মন অপরিবর্ত্তিত রহিবে, হৃদয়-ভাব একইভাবে থাকিবে, তাহার প্রমাণ কি? দশ বৎসর পূর্ব্বে আমি যাহা সত্যের আদর্শ বলিয়া জানিতাম, আজ হয় ত আমার নিকট তাহা সত্যের আদর্শ বলিয়া বোধ না হইতে পারে। দশ বৎসর পূর্ব্বে আমি যাহা লিখিয়াছি, কি বলিয়াছি, মত-পরিবর্ত্তন হইলেও, শুদ্ধ অবিসংবাদের (consistency) অনুরোধে আমাকে যদি চিরজীবন তাহার দাস হইয়া চলিতে হয়, তাহা হইলে আমার জীবন বিড়ম্বনা মাত্র। দশ বৎসর পূর্ব্বে আমি নিজের জন্য যে গণ্ডী কাটিয়াছিলাম, যাহা উল্লঙ্ঘন করা তখন পাপ মনে করিতাম, সে গণ্ডী ছেদন করা আমার মতে এখন পুণ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

আর সত্য কি, পুণ্য কি? আমরা হিতবাদীদিগের সহিত বলি, জগৎই সত্যস্বরূপ এবং সেই জগতের মঙ্গল-সাধন করাই পুণ্য। জগৎ সত্যস্বরূপ এবং যে নিয়মে সেই জগৎ পরিচালিত হইতেছে—সে নিয়মাবলী সত্যরূপিণী। 'জগৎ' শব্দে আমরা এখানে বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ উভয় জগৎই গ্রহণ করিলাম। আমরা বলিয়াছি, সেই জগতের নিয়মাবলীও সত্যরূপিণী। পৃথিবী ঘুরিতেছে—যে নিয়মে পৃথিবী ঘুরিতেছে, তাহা একটি অলঙ্ঘনীয় সত্য; তাহার অপলাপ অসম্ভব। কিন্তু সেই নিয়মটি কি, কিসের ফল, তদ্বিষয়ে মতভেদ হইতে পারে; সেই মত সত্য হইতেও পারে, নাও পারে। আজ যাহা মাধ্যাকর্ষণ বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে, কাল আর একজন চিন্তাশীল ব্যক্তি হয় ত প্রমাণ করিতে পারেন, ইহা অন্য কিছু। যাহা জগতের মঙ্গল-সাধক, তাহাই পুণ্য—এ বিষয়ে মতভেদ নাই। কিন্তু কি উপায়ে সেই মঙ্গল সাধিত হইতে পারে সে বিষয়ে মতভেদ হইতে পারে। যাহাতে শরীর সবল হয়, তাহা করা উচিত, করিলে পুণ্য, না করিলে পাপ। কিন্তু কিসে শরীর সবল হয়, তদ্বিষয়ে মতভেদ হইতে পারে। কেহ বলিবেন, মাংস খাইলে শরীর সবল হয়। কেহ বলিবেন, উদ্ভিদ খাইলে শরীর সবল হয়। কেহ বা শরীরের পুষ্টি-সাধনে উভয়েরই উপযোগিতা স্বীকার করিবে। কেহ বলিবেন, বাল্য-বিবাহ উঠাইয়া দিলেই শরীর আপনি পুষ্ট হইবে, মাংস না খাইলেও চলিবে। কেহ বা বলিবেন, বাল্য-বিবাহও রহিত করা চাই, মাংস খাওয়াও চাই! আবার কতক লোক হয় ত বলিবেন, অধিক বয়সে যোগের সন্তান দুর্ব্বল হয়। সুতরাং এ সব বিষয়ে নানা মুনির নানা মত, একমাত্র বিশ্বব্যাপিনী মীমাংসা হওয়া দুর্ঘট। চিকিৎসকদিগেরও এ বিষয়ে মতের সম্পূর্ণ একতা নাই। এ সকল বিষয়ে সত্যাসত্য পাপ-পুণ্য-নির্ণয় হওয়া দুরূহ ব্যাপার। সুতরাং এ সকল বিষয়ে বিশ্বব্যাপী নিয়ম সংস্থাপন না করিয়া, ব্যক্তিমাত্রেরই যুক্তি ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যজ্ঞানের উপর সমাজের নির্ভর করা উচিত। যেখানে সমাজ তাহা না করিয়া, ১৯ জনের মধ্যে ১০ জনের মত লইয়া আর ৯ জনকে অপর ১০ জন কর্তৃক গৃহীত নিয়মের অধীনে আনিতে চেষ্টা করেন, সেইখানেই আমরা ব্যক্তির উপর সমাজের যথেচ্ছাচার বলিয়া নির্দ্দেশ করিব। ১০ জনের সুবিধার জন্য, দশ জনের সুখোৎপাদনের জন্য, সমাজ ৯ জনের অসুবিধা—৯ জনের অসুখ—উৎপাদন করেন। এ পক্ষপাতিতা সমাজের পক্ষে সাজে না। সমাজ জননী, সমাজের কোড়ে সকলেই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে; সুতরাং সমাজকে সকলেরই মুখের দিকে তাকাইতে হইবে, সকলেরই সুবিধা ও সুখ দেখিতে হইবে। যদি সেই উনিশজনমাত্রে সমাজ গঠিত হয়, তাহা হইলে সমাজকে সেই উনিশজনের প্রত্যেকেরই মুখের দিকে তাকাইতে হইবে, প্রত্যেকেরই সুবিধা ও সুখ উৎপাদন করিতে হইবে। যদি একজনের প্রতিও অবিচার করা হয়, তাহা হইলেও সে সমাজ-দূষিত হইল। সেই এক জনের পক্ষেও সমাজ বিমাতা। বিমাতার কোড়ে বাস করা অপেক্ষা সেই ব্যক্তির মরুশয্যা বা বনবাস সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ। আমার অস্তিত্ব আমার জন্য, কিন্তু সমাজের অস্তিত্ব আমার (ব্যক্তিমাত্রের) জন্য। আমার সুবিধার জন্য সমাজ গঠিত হইয়াছে, সমাজের সুবিধার জন্য আমি

গঠিত হই নাই; সুতরাং সমাজ প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ভাবিবে, প্রত্যেক ব্যক্তির সুখোৎপাদন করিতে চেষ্টা করিবে; না হইলে সমাজের অস্তিত্বের প্রয়োজন নাই। অল্পের নিমিত্ত বহুকে পরিত্যাগ করাও সমাজের পক্ষে যেমন অত্যাচার, আবার বহুর নিমিত্ত অল্পকে পরিত্যাগ করাও সেইরূপ অত্যাচার। তবে প্রভেদ এই যে, বহুর নিমিত্ত অল্পকে পরিত্যাগ করিলে, সমাজকে ধন্যবাদ দিবার জন্য অধিক লোক থাকিবে; কিন্তু অল্পের নিমিত্ত বহুকে পরিত্যাগ করিলে, সমাজের নির্যাতন হওয়ার অধিক সম্ভাবনা। আবার সেই অল্প যদি প্রবল হয়, তাহা হইলে সমাজের কোন আশঙ্কা নাই। যাহা হউক, এই উভয়বিধ অত্যাচারকেই আমরা সামাজিক পীড়া মনে করি। এই পীড়া আরোগ্য না হইলে, সমাজের মৃত্যুর—পতনের—সবিশেষ সম্ভাবনা। এই সামাজিক পীড়াই সামাজিক বিপ্লবের মূল। পূর্বকালে ব্রাহ্মণগণের শূদ্রদিগের উপর—এবং অধুনা ইংরেজদিগের ভারতবাসীদিগের উপর অত্যাচার, বহুর উপর অল্পের আধিপত্যের ফল। ব্রাহ্মণ শূদ্র স্থলে এই অত্যাচার রাজনৈতিক হইতে সামাজিক আকারে পরিণত হইয়া হিন্দু-সমাজের উচ্ছেদসাধন করিয়াছে, শ্বেত-কৃষ্ণ-স্থলে ইহা অদ্যাপি সামাজিক আকার ধারণ করে নাই—এই জন্যই আমরা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীনে সামাজিক সম্বন্ধে পরম সুখে আছি। এরূপ সামাজিক স্বাধীনতা আমরা আর কখন কোন রাজার অধীনে ভোগ করি নাই। কোন দেশের প্রজা কোন রাজার অধীনে কখন এরূপ ভোগ করিয়াছে কি না, জানি না। যদি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অস্তিত্ব ভারতে কোন কারণে প্রার্থনীয় হয়, তাহা ধর্ম্মনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতার জন্য। আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা হারাইয়াছি বটে, কিন্তু তাহার বিনিময়ে সামাজিক ও ধর্ম্মনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করিতেছি: রাজ হস্তক্ষেপ না থাকায়, হিন্দুসমাজও দিন দিন উদাসভাব ধারণ করিতেছে, ব্যক্তিগত কার্য্য ও চিন্তার উপর আজকাল ইহা অল্পই হস্তক্ষেপ করিতেছে।

এক দিকে যেমন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ও হিন্দু-সমাজ ব্যক্তিগত চিন্তা ও কার্য্য-বিষয়িণী স্বাধীনতার অনুকূল, ভারতে অতর্কিতভাবে আর একটি সমাজ উত্থিত হইতেছে, যাহা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার তেমনই প্রতিকূল! একটি শৃঙ্খল ভাঙ্গিতেছে, আর একটি শৃঙ্খল নূতন করিয়া গঠিত হইতেছে। হিন্দুরা যেমন অন্ন-প্রাশন, নামকরণ হইতে আরম্ভ করিয়া, বিবাহ, মৃত্যু পর্য্যন্ত জীবনের সমস্ত ঘটনাকে কঠোর ধর্ম্ম শাসনের অধীনে আনিয়া আপনাদিগের মৃত্যুর পথ আপনারাই প্রস্তুত করিয়াছিলেন—লূতা-তন্তুর ন্যায় আপনাদের জালের অভ্যন্তরে আপনারাই নিহিত হইয়াছিলেন, এই সম্প্রদায়ও সেইরূপ জীবনের সমস্ত ঘটনাকে কঠোর ধর্ম্মশাসনের অধীনে আনিয়া আপনাদিগের মৃত্যুর পথ আপনারাই পরিষ্কৃত করিয়া রাখিতেছেন। সমাজ ও ধর্ম্ম যে দুইটি স্বতন্ত্র পদার্থ, ইহা তাঁহারা স্বীকার করেন না। ধর্ম্মের ভিত্তি বিশ্বাস, সমাজের ভিত্তি যুক্তি। ধর্ম্ম পরকালের, সমাজ ইহকালের। ধর্ম্মের ভিত্তি বিশ্বাস—স্থিতিশীল; সমাজের ভিত্তি যুক্তি—উন্নতি-শীল, সুতরাং পরিবর্ত্তন-শীল। ভূয়োদর্শনের বৃদ্ধির সহিত যুক্তিশক্তি দিন দিন অধিকতর পরিমার্জ্জিত হইবে, কিন্তু বিশ্বাস যেখানে থাকিবে, সেখানে একই ভাবে থাকিবে। বিশ্বাসের বিষয়—পরলোক ও ঈশ্বর; দুইই অতীন্দ্রিয়, সুতরাং ভূয়োদর্শনের অধীন নহে। কিন্তু ভূয়োদর্শনই যুক্তির প্রধান আহার্য্য। ভূয়োদর্শন দিন দিন পুষ্টাবয়ব হইবে, সুতরাং যুক্তিশক্তিও দিন দিন প্রবলতর হইয়া উঠিবে। যুক্তিশক্তির প্রবলতার সহিত সামাজিক নিয়ম সকলও দিন দিন পরিবর্ত্তিত হইবে, এই পরিবর্ত্তন স্রোত ব্যাহত হইলেই সমাজ সংরুদ্ধ জলাশয়ের ন্যায় দূষিত হইয়া যাইবে; সুতরাং সামাজিক বিপ্লব অনিবার্য্য এবং পঙ্কোদ্ধার দুষ্পরিহার্য্য হইবে। ব্রাহ্মসমাজ সামাজিক ঘটনা সকলকে কঠোর ধর্ম্ম-শাসনের অধীন করিতে গিয়া, এই স্রোতের গতি রুদ্ধ করিতেছেন। ইহার বিপদ তাঁহারা হাতে হাতেই পাইতেছেন ও পাইবেন। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল যে, বহুর উপর অল্পের অত্যাচার বা অল্পের উপর বহুর অত্যাচার—ইহা আমরা দুই একটি উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দিব। বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন ধর্ম্মের সহিত সামাজিক সংস্কার মিশাইতে অস্বীকৃত হন, তখন বাবু কেশবচন্দ্র সেন নব্য ব্রাহ্মগণের সহিত তাঁহার মতের ঘোরতর প্রতিবাদ করেন। কেশব

বাবু বলিলেন, "যাহার কণ্ঠে পবিত্র ঝুলিবে, সে আবার ব্রাহ্ম কিসে? যে অসবর্ণ বিবাহ না করিবে, সে বেদিতে বসিবার অযোগ্য। যে যবনান্ন গ্রহণ না করিবে, সে অস্পৃশ্য ও অব্রাহ্ম।" দেবেন্দ্র বাবু ধর্ম্ম-বিষয়ে ব্রাহ্ম বটে, কিন্তু সামাজিক বিষয়ে সম্পূর্ণ হিন্দু; সুতরাং তাঁহার সহিত কেশব বাবুর বনিল না। কেশব বাবু নব্য ব্রাহ্মগণ সঙ্গে করিয়া একটি নূতন উপাসনা মন্দির প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন, নাম দিলেন কি না, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ। ইহার অর্থ এই যে, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আদি ব্রাহ্মগণ অব্রাহ্ম, নূতন ব্রাহ্মেরাই প্রকৃত ব্রাহ্ম। তাঁহাদিগের অপরাধ যে, তাঁহারা সামাজিক বিনয় ধর্ম্মের সহিত মিশ্রিত করিতে চাহেন নাই। কেশব বাবু এই নব্য ব্রাহ্মগণের সাহায্যে ও নিজের অসাধারণ সৃষ্টিকরী বুদ্ধিবলে নব নব সামাজিক নিয়ম গঠিতে বসিলেন, গঠিয়া, তাহাদিগকে কঠোর ধর্ম্মশাসনের অধীনে আনিলেন। শাসনপত্র বাহির হইল যে, তাঁহার গঠিত সামাজিক নিয়ম সকল যে লঙ্ঘন করবে, সে অব্রাহ্ম হইবে ও ব্রহ্ম সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইবে। দুই এক স্থলে শুনিতে পাওয়া যায় যে, এই শাসন অক্ষরে অক্ষরে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তিনি একটি নিয়ম করিয়াছিলেন যে, কন্যা চতুর্দ্দশ বৎসর ও পাত্র অষ্টাদশ বৎসরের নিম্নে বিবাহ করিতে পারিবে না। এই নিয়মের উপর তিনি কঠোর ধর্ম্ম-শাসন সংস্থাপিত করেন। যে ইহা লঙ্ঘন করিবে, তাহাকে ব্রাহ্ম সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করা হইবে। কিন্তু মানুষ ঘটনার দাস—তিনি স্বয়ং আজ সেই নিয়ম লঙ্ঘন করিলেন। তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহার নিকট হইতে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিষয়ে যে শিক্ষা পাইয়াছিলেন, সেই শিক্ষাবলে তাঁহাকেও সিংহাসনচ্যুত করিলেন। এইরূপে অন্নের উপর বহুর ঘোরতর অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইল। তিনি লূতাতন্তুর ন্যায় নিজ-কৃত জালের অন্তর্নিহিত হইলেন। তিনি যদি এই কঠোর নিয়মকে ঘোরতর ধর্ম্ম শাসনের অধীনে না আনিতেন, তাহা হইলে তাঁহার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বজায় থাকিত। তাঁহার নিজের কন্যার বিবাহ দিবেন, তাহাতে অপরে একটি কথাও বলিবার অধিকার থাকিত না। তাঁহার এমন সুখের দিনে আজ এমন বিষাদ ঘটিত না। আজ তাঁহার শিষ্যেরা—উন্মত্ত হস্তী যেমন মাহুতকে পদ-দলিত করে—সেইরূপ তাঁহার অসংখ্য গুণ বিস্মৃত হইয়া, কীটের ন্যায় তাঁহাকে পদদলিত করিতে পারিতেন। তাঁহার এই পতনে কাহার নয়ন হইতে না অশ্রুপাত হইবে? তিনি দেশের একটি মস্তক; তাঁহাকে আজ সামান্য কীটেও ভক্ষণ করিতেছে; সামান্য অজাতশ্মশ্রু বিদ্যালয়ের ছাত্রেও তাঁহার মস্তকে পদার্পণ করিতেছে। আমরা ব্রাহ্ম নহি—আমরা হিন্দু, তথাপি আমরা তাঁহার দুঃখে—তাঁহার অপমানে—সহানুভূতি না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। অল্পের উপর বহুর অত্যাচারে আমাদিগেরও হৃদয় ব্যথিত হইতেছে, কিন্তু এ দোষ কার? এ দোষ তাঁহার নিজেরই; সুতরাং আমরা কি করিব? উৎপীড়িত মানবের জন্য অশ্রুপাত করা ব্যতীত আমাদিগের আর কি ক্ষমতা আছে?

আর যে বহু এই অল্পের উপর অত্যাচার করিতেছেন, তাঁহাদিগকে বলি, তাঁহারা কেশব বাবুর ন্যায় গুরুর বধের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া আপনাদিগের জন্য ভবিষ্য শৃঙ্খল প্রস্তুত করিয়া রাখিতেছেন! যে উন্মত্ত তরলমতি যুবকদিগকে তাঁহারা ধর্ম্মোন্মাদে উন্মাদিত করিতেছেন, তাঁহারা যে এক সময়ে তাঁহাদিগকেও মত্ত হস্তীর ন্যায় মস্তক হইতে নামাইয়া পদতলে উন্মথিত করিবে না, তাহার প্রমাণ কি? যে সকল কঠোর সামাজিক নিয়মে তাঁহারা ঘোরতর ধর্ম্মশাসনের অধীনে আনিতেছেন, তাহা যে তাঁহারাই সাকল্যে প্রতিপালন করিয়া উঠিতে পারিবেন, তাহার প্রমাণ কি? কেশব বাবুর ন্যায় ওরূপ গঠিত চরিত্রেরও যখন স্খলন হইল, তখন তাঁহাদিগেরও যে হইবে না, তাহার প্রমাণ কি? তাঁহারা কি একবার ভাবিয়া দেখিতেছেন না যে, তাঁহাদিগেরও একবার স্খলন হইলে, যে হস্তিরূপী বহুত্বকে (Majority) তাঁহারা উন্মাদিত করিয়া রাখিলেন, সেই উন্মত্ত হস্তী তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে ও পদদলিত করিবে; সুতরাং অভ্রান্ত নেতা ভিন্ন কেহই অধিক দিন এই সমাজের অধিনেতৃত্ব পদে অভিষিক্ত থাকিতে পারিবেন না। কিন্তু জগতে কোন মনুষ্যই অভ্রান্ত নহে, সুতরাং কাহারই অধিক দিন এই সমাজের নেতৃত্বপদে অভিষিক্ত থাকিবার সম্ভাবনা নাই। এইরূপে নেতার পর নেতা বহুরূপী হস্তীর পদ-তলে দলিত হইবে। সুতরাং এখনও বলি, বর্ত্তমান নেতৃবৃন্দ যেন ধর্ম্ম হইতে সামাজিক নিয়ম

সকল বিশ্লিষ্ট করিয়া, সামাজিক নির্যাতনের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত করেন এবং ভারতবাসী ব্রাহ্মদিগের ভাবী উন্নতি ও সুখের পথ পরিষ্কৃত করিয়া রাখেন। যেন নবনির্ম্মিত শৃঙ্খল ভাঙ্গিতে ভবিষ্যতে আর একটি বিপ্লবের প্রয়োজন না হয়।

ভারতের ভাবী পরিণাম

হতভাগ্য ভারতবাসীর অদৃষ্টে এ দুঃখ কতকাল থাকিবে, তাহা কে বলিতে পারে? আজ প্রায় সহস্র বর্ষ হইতে চলিল, দিল্লী-সমরে পৃথুরাজের পরাজয় ও মৃত্যুর সহিত ভারতের সুখ সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছে! মহম্মদ ঘোরী হইতে লর্ড ক্লাইব পর্য্যন্ত অসংখ্য আক্রান্ত যে ভারত-ক্ষেত্রে আপনাদিগের রণ-নৈপুণ্য ও বুদ্ধিকৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন—বীরত্ব ও ধূর্ত্ততার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন—সে ভারত যে এখনও জীবিত আছে, সে ভারতের অধিবাসীরা যে এখনও আত্মস্বত্ব পুনঃ সংস্থাপনের জন্য ব্রিটিশ জাতির সহিত বাগ্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছেন, ইহাই আশ্চর্য্য! যে ভারতবর্ষীয় আর্য্যেরা এতদিন বীরদর্পে মেদিনী বিকম্পিত করিয়াছিলেন, যাঁহাদিগের দর্শন, যাঁহাদিগের বিজ্ঞান, যাঁহাদিগের সাহিত্য—সেই আর্য্যজাতির সন্ততিগণ এক্ষণে ব্রিটিশ সিংহের প্রতাপে কম্পিতকলেবর। তাঁহাদিগের তেজ, বীরত্ব, ধৈর্য্য, অধ্যবসায় প্রভৃতি গুণগুলি একে একে সমস্তই অস্তমিত হইতেছে। জগন্নামভূতা যে আর্য্যললনা একদিন অসিহস্তে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন, সেই আর্য্যললনা এক্ষণে পুত্র-কন্যাদিগেরও শৌর্য্য-বীর্য্য-প্রকাশের প্রতিকূল। অস্ত্রধারণ, যুদ্ধে গমন ও অন্যান্য দুঃসাহসিক কার্য্যে অবতরণ—এক্ষণে তাঁহাদিগের গভীর ভীতির কারণ। পুত্র-কন্যাগণ কোনও দুঃসাধ্য-সাধনে প্রবৃত্ত হন, ইহা তাঁহাদিগের একান্ত অনিচ্ছা যাহা অল্পায়াসসাধ্য, যাহা বিপৎসঙ্কুল নহে, এরূপ নিরীহ কার্য্যে তাঁহাদিগের সন্তানসন্ততিগণ প্রবৃত্ত হয়েন, ইহাই তাঁহাদিগের আন্তরিক ইচ্ছা। তাঁহাদিগের ইচ্ছা, তাঁহাদিগের আশীর্ব্বাদ, ফলেও পরিণত হইয়াছে। নিরন্তর মসীমর্দ্দনে, গ্রন্থভারবহনে, জিহ্বাসঞ্চালনে ও শ্বেতাঙ্গ চর্ম্মপাদুকা প্রহার-সহনে, ভারত-সন্ততিগণের এক্ষণে সুখে দিনাতিপাত হইতেছে—অভ্যাসক্রমে প্রকৃতি-স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে আর্য্য জাতি এক সময়ে পরের ভ্রূকুটিমাত্রও সহিতে পারিতেন না, এক্ষণে পরের চরণরেণু সেই আর্য্যজাতির শিরোভূষণস্বরূপ হইয়াছে। দাসত্ব, অপমান—এক্ষণে তাঁহাদিগের অঙ্গের আভরণ হইয়া উঠিয়াছে।

এ দিকে যে প্রবলপরাক্রম মুসলমানেরা এক সময় হস্তিনাপতি পৃথ্বীরাজের সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া গভীর নিনাদে ভারত প্রতিধ্বনিত করিয়াছিলেন, বীরদর্পে হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সমস্ত ভারতকে কম্পমান করিয়া তুলিয়াছিলেন,—মোগল, পাঠান প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় সেই মুসলমানেরা একে একে দিল্লীর সিংহাসন হইতে বিচ্যুত হইয়া বিজিত আর্য্যদিগের সহিত সমদশাপন্ন হইলেন। ব্রিটিশ সিংহের প্রবলপ্রতাপে জেতা ও বিজিত এক সমান হইয়া গেল। বিশ্বব্যাপী প্রলয়কালে যেমন গো-ব্যাঘ্রে ও ভেক-সর্পে একত্রে বাস করে, সেইরূপ জেতা বিজিত এক্ষণে আত্মরক্ষায় ব্যাকুল হইয়া এক ভ্রাতৃসূত্রে সংবদ্ধ হইয়াছেন। এক্ষণে রাজনৈতিক সম্বন্ধে হিন্দু ও মুসলমান এক সহানুভূতি-সূত্রে সংবদ্ধ।

ভারতবাসিগণ মুসলমানদিগের অধীনে নানা কষ্ট, নানা যন্ত্রণা পাইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা সে সমস্ত কষ্ট, সে সমস্ত যন্ত্রণা এই বলিয়া সহ্য করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদিগের পরিশ্রমের ধন দেশের বাহিরে যাইতেছে না। তাঁহাদিগের মনে এই সান্ত্বনা ছিল যে, সিংহাসন ব্যতীত ভারতের আর সমস্ত পদই তাঁহাদিগের অধিগম্য। তাঁহারা জানিতেন যে, তাঁহাদিগের বীরবল, তাঁহাদিগের টোডরমল্ল, তাঁহাদিগের মানসিংহ—দিল্লীশ্বরের সখিত্ব, মন্ত্রিত্ব ও সেনাপতিত্বপদ অলঙ্কৃত করিয়া রহিয়াছেন। রাজ-সিংহাসনের নিম্নে ঐগুলিই সর্ব্বোচ্চ পদ। তাঁহারা জানিতেন, উপযুক্ত হইলে তাঁহারা যখন সেই সর্ব্বোচ্চ পদেও অধিরোহণ করিতে সমর্থ, তখন অন্যান্য পদ নিশ্চয়ই তাঁহাদিগের করতলস্থ। তাঁহারা জানিতেন যে, মুসলমানেরা যতই কেন যথেচ্ছাচারী হউন না, যতই কেন প্রজাশোষক হউন না, তাঁহারা এক্ষণে ভারতের অধিবাসী, সহবসতিতে ভারতবাসী আর্য্যদিগের ভ্রাতা; তাঁহাদিগের দেহ

ভারতের পঞ্চভূতে মিশাইয়া যাইবে—তাঁহাদিগের সন্তানসন্ততিগণের দেহ ভারতের পঞ্চভূতে গঠিত হইবে—তাঁহাদিগের অতুল সম্পত্তি ভারতক্ষেত্রেই ব্যয়িত হইবে। এই আশা—এই সান্ত্বনা—ভারতবাসী আর্য্যদিগের নয়ন জল মুছাইয়া দেয়, তাঁহাদিগের হৃদয়ের বেদনা কথঞ্চিৎ অপনীত করে এবং অধীনতা শৃঙ্খল কিঞ্চিৎ মসৃণিত করে। তাঁহারা জানিতেন যে, ভারতকে দরিদ্র করা, ভারতের অধিবাসীদিগকে হীনাবস্থায় রাখা, মুসলমানদিগের স্বার্থবিরোধী। তাঁহারা জানিতেন যে, মুসলমানদিগের ভারত ভিন্ন অন্য কোন দেশ ছিল না, যে দেশকে অলঙ্কৃত করা, যে দেশকে অর্থভাবে সমুদ্র জলে নিমগ্ন করা মুসলমানদিগের প্রাণপণ চেষ্টার বিষয়ীভূত হইতে পারে। মুসলমানেরা ভারতের সুখে সুখী। সুতরাং যে ভারতের ধনে তাঁহারা ধনী, যে ভারতের মানে তাঁহারা মানী এবং যে ভারতের সুখে তাঁহারা সুখী, সে ভারতকে সর্ব্বস্বান্ত, অপমানিত ও অসুখিত করার, মুসলমানদিগের কোন প্রলোভন হইতে পারে না—এই জ্ঞান তদানীন্তন ভারতবাসীদিগকে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা প্রদান করিয়াছিল। এই জন্য ভারতবাসী মুসলমানেরা ভারতের অধিবাসীদিগের তত দূর বিদ্বেষের ভাজন হন নাই। তাঁহাদিগের রাজনীতি, তাঁহাদিগের শাসনপ্রণালী, তাঁহাদিগের বিধি, তাঁহাদিগের ব্যবহার-বিজ্ঞান দূষিত হইলেও, তাঁহাদিগের সর্ব্বদোষনাশী এক গুণ ছিল—তাঁহারা ভারতবাসী ছিলেন। তাঁহাদিগের সর্ব্বস্ব এই দেশেই ছিল। তাঁহাদিগের লুণ্ঠন-সংগৃহীত ধন এই দেশেই ব্যয়িত হইত। তাঁহারাও প্রজা-শোণিতশোষী ছিলেন বটে; কিন্তু তাঁহারা সেই শোণিতে ভারতক্ষেত্রকেই উর্ব্বরা করিতেন; এই জন্য প্রজারা বক্ষ চিরিয়া রক্ত দিতেও ততদূর কাতর হইতেন না।

কিন্তু এক্ষণে সুসভ্য ইংরাজ-জাতির অধীনে আমাদিগের কি সান্ত্বনা, কি প্রবোধ? সত্য, তাঁহাদিগের লৌহ-বর্ত্ম শতধা বিচ্ছিন্ন ভারতকে ক্রমে পরস্পর সন্নিকট করিয়া তুলিয়াছে; সত্য, তাঁহাদিগের তড়িৎবার্ত্তাবহ সংবাদদানে দূর-বিক্ষিপ্ত বন্ধু-বান্ধবদিগের বিচ্ছেদ-দুঃখ কথঞ্চিৎ অপনীত করিতেছে; সত্য, তাঁহাদিগের বাষ্পীয় পোত দেশ-দেশান্তরের ও দ্বীপ-দ্বীপান্তরের অধিবাসীদিগের সহিত ভারতের অধিবাসীদিগের সখ্যভাব সংস্থাপিত করিতেছে; নানাস্থানের নানা দ্রব্য আনিয়া ভারতের ভোগ-সীমা পরিবর্দ্ধিত করিতেছে; সত্য, —তাঁহাদিগের সাহিত্য, তাঁহাদিগের দর্শন, তাঁহাদিগের বিজ্ঞান, তাঁহাদিগের ইতিহাস, তাঁহাদিগের রাজনীতি, তাঁহাদিগের সমাজ-নীতি, আমাদিগকে অনেক নূতন বিষয় শিক্ষা দিয়াছে; সত্য, তাঁহাদিগের প্রচণ্ড গোলক ভারতকে বিদেশীয় আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতেছে, সত্য, তাঁহাদিগের কঠিন দণ্ডনীতি তস্করতা প্রভৃতিকে প্রায় শ্রুতিমাত্রে পর্য্যবসায়িনী করিয়াছে; সত্য, তাঁহাদিগের শাসনপ্রণালী ভারতে অপূর্ব্ব শৃঙ্খলাস্থাপন করিয়াছে; সত্য তাঁহাদিগের শিল্প ভারতের বিচিত্র শোভা সম্পাদন করিয়াছে; কিন্তু সে সহস্র গুণ এক দোষে নষ্ট হইয়াছে—ইংরাজেরা বিদেশী। বিদেশী বিজেতার প্রতি বিদেশী বিজিতের কখনই সহানুভূতি হইতে পারে না। ধর্ম্ম ভিন্ন, জাতি ভিন্ন, ভাষা ভিন্ন, দেশ ভিন্ন, বর্ণ ভিন্ন, অশন বসন ভিন্ন, রীতি-নীতি ভিন্ন, বল-বুদ্ধি ভিন্ন, এরূপ জাতির সহিত ভারতবাসীর সহানুভূতি কত দূর সম্ভব জানি না। এরূপ বিভিন্ন-প্রকৃতির জাতিদ্বয়কে পরস্পর সখ্যসূত্রে সংবদ্ধ করিবার চেষ্টা প্রশংসনীয় হইলেও, কতদূর সফল হইবে, বলিতে পারি না।

শ্বেতদ্বীপের প্রতি পরিবার ভারত দ্বারা কোন না কোন প্রকারে উপকৃত হইতেছে। হিমালয় হইতে কুমারিকা এবং সিন্ধু হইতে সুদূর ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত ভারতের প্রত্যেক নগর হইতে প্রতিমাসে অসংখ্য মুদ্রা শ্বেতদ্বীপে প্রেরিত হইতেছে। ভারতের সমস্ত উচ্চপদই প্রায় শ্বেতপুরুষ কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। ভারতের সবিশেষ লাভকর বহির্বাণিজ্য প্রায়ই শ্বেতপুরুষ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইতেছে। ক্ষুদ্র সূচিকা ও সামান্য দেশলাই হইতে পরিধেয় বস্ত্র পর্য্যন্ত আমাদিগের সমস্ত গৃহ-সামগ্রীর জন্য আমাদিগকে শ্বেতপুরুষদিগের শ্বেত-চরণে প্রতিদিন কোটি কোটি মুদ্রা অঞ্জলি প্রদান করিতে হইতেছে। কত কোটি টাকা ভারত হইতে প্রতি মাসে শ্বেতদ্বীপে যাইতেছে, তাহার সংখ্যা করিতে আমাদের দুর্ব্বল হৃদয় বিদীর্ণ হয়। ভারতের ভাবি পরিণাম কি হইবে, ভাবিতে গেলে, আমাদিগের বক্ষঃস্থল

নয়নজলে ভাসিয়া যায়! ভারত দিন দিন কঙ্কালাবশিষ্ট হইতেছে! ভারতের শিল্পীরা অন্নাভাবে তনুত্যাগ করিতেছে! ভারতের কৃষকেরা আমাদিগের পরিশ্রমের ধনে বঞ্চিত হইতেছে। ভারতের মধ্যশ্রেণীর লোকেরা দারিদ্র্য ভারে ক্রমে রসাতলে যাইতেছে! ভারতের উচ্চশ্রেণী ইংরাজ-তুষ্টিবিধানে সমস্ত অর্থ ব্যয় করিয়া ক্রমে কৌপীন-ধারী হইতেছে, বোধ হইতেছে, যেন ভারতে প্রলয়-কাল উপস্থিত! বোধ হইতেছে, যেন বিধাতা ভারতে ধ্বংস-বিধানের নিমিত্ত শ্বেতপুরুষদিগকে এ দেশে প্রেরণ করিয়াছেন। যে জাতি দ্বারা ভারতের এতাদৃশ দুরবস্থা সংঘটিত হইয়াছে, সে জাতির সহিত ভারতের সখ্য-ভাব প্রার্থনীয় হইলেও, কখন বদ্ধমূল হইবে কি না, জানি না।

মুসলমানদিগের সময়ে ভারত অনেক পরিমাণে স্বাধীন ছিল। প্রত্যেক জমীদার এক এক স্বাধীন রাজা-স্বরূপ ছিলেন। তাঁহাদিগকে বৎসরে বৎসরে মুসলমান রাজাদিগকে কিছু কিছু কর দিতে হইত বটে, কিন্তু অন্য অন্য সকল বিষয়েই তাঁহারা স্বাধীন ছিলেন। তাঁহাদিগের নিজের সৈন্য ছিল, তাঁহাদিগের নিজের বিচারালয় ছিল, তাঁহাদিগের নিজের দণ্ডবিধি ছিল, তাঁহাদিগের নিজের বিধি-ব্যবস্থা-পনের শক্তি ছিল, প্রজাদিগের দেহ-প্রাণের উপর তাঁহাদিগের সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা ছিল। প্রজারা স্বজাতীয় রাজার অধীনে সহস্র গুণে অধিকতর সুখী ছিল। এক্ষণে ব্রিটনের প্রচণ্ড শাসনে রাজা প্রজা সকলেই থরথরি কম্পমান। স্বাধীনভাব ভাব সকলেরই অন্তর হইতে একেবারে তিরোহিত হইয়াছে। আমরা যে দিকে তাকাই, সেই দিকেই ব্রিটনের রুদ্রমূর্ত্তি দেখিতে পাই! বোধ হয় যেন, ভীষণ ব্রিটিশ কামান আমাদিগকে লক্ষ্য করিতেছে! বোধ হয়, যেন শাণিত ব্রিটিশ বেয়নেট আমাদিগের প্রতি ভ্রুকুটি করিতেছে! বোধ হয়, যেন আমরা চতুর্দ্দিকে এক প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত রহিয়াছি! যেন শ্বেতপুরুষেরা আমাদিগের সেই প্রকাণ্ড কারার প্রহরী নিযুক্ত রহিয়াছেন! আমরা তাঁহাদিগের সেই ভীষণ মূর্ত্তিই সতত দেখিতে পাই। তাঁহাদিগের হৃদয়ে দয়া, স্নেহ, মমতা প্রভৃতি মানবোচিত গুণগুলি আছে কি না, তাহা জানিবার আমাদের বিশেষ উপায় নাই। এরূপ জাতির সহিত ভারতের সখ্য-ভাব সংস্থাপনের চেষ্টায় কিছু ফলোদয় হইবে কি না, বলিতে পারি না।

ব্রিটিশ দণ্ড-বিধির ন্যায়পরতা, ব্রিটিশ বিধি-সকলের লক্ষ্যের উদারতার নিকট আমরা মস্তক অবনত করি। আমরা জানি, ভারতবর্ষীয় আর্য্যেরা বিজিত শূদ্রদিগের প্রতি এবং ভারতবর্ষীয় মুসলমানেরা বিজিত হিন্দুদিগের প্রতি এরূপ অপক্ষপাতিতা ও এরূপ উদারতা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। সেই নিমিত্ত অনন্তকালের জন্য ভারতের ভবিষ্যপুরুষের নিকট ব্রিটনের গৌরব পরিরক্ষিত হইবে। কিন্তু যে প্রণালীতে ব্রিটিশ শাসনকর্ত্তৃগণ সেই দণ্ডবিধির পরিচালন করেন, তাহাতে তাঁহাদিগকে * * * * *
বলিয়া প্রতীতি হয়। * * * *
প্রভৃতি তাঁহাদের আদর্শ। এই সকল শ্বেতপুরুষেরা দুর্ব্বল ভারতবাসীদিগকে মানবকুলের অনুপযুক্ত মনে করিয়া তাহাদিগের প্রতি পশুবৎ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইঁহারাই ইংলণ্ডের বিপুল যশে কলঙ্কারোপ করিতেছেন। আমাদিগের দেহ, প্রাণ, ধন, মান ইহাদিগেরই হস্তে নিহিত রহিয়াছে। ইঁহারাই আমাদিগের প্রকৃত রাজা—প্রজা-বন্ধু ভক্তিভাজন মহারাণী সাক্ষিগোপাল মাত্র। ইঁহাদিগেরই দোষে তাঁহার পবিত্র-চরিত্রে কলঙ্কারোপ হইতেছে। তাঁহার প্রতি আমাদিগের ভক্তি অচলা; কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহার সহিত আমাদিগের সাক্ষাৎসম্বন্ধ নাই। ইংলণ্ডের বিশ্বপ্রেমিক মনীষিগণের সহিতও আমাদিগের সাক্ষাৎসম্বন্ধ নাই। আমরা মিল্, ফসেট, ব্রাইট, গ্লাডষ্টোন্ প্রভৃতিকে দেখিতে পাই না; তাঁহাদিগের মানব-প্রেম, তাঁহাদিগের স্বদেশানুরাগ, তাঁহাদের ভারত-হিতৈষিতা আমরা সংবাদপত্রে ও পুস্তকাদিতে পাঠ করি মাত্র। কিন্তু তাহাতে কি হইবে? প্রতিদিন অসংখ্য ভারতবাসী যে এই সকল যথেচ্ছাচারী পাষাণ-হৃদয় শাসনকর্ত্তাদিগের হস্তে দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, তাহাদিগের তাঁহারা কি করিবেন? রাজচন্দ্রের দুর্ব্বিষহ কারা-যন্ত্রণার তাঁহারা কি করিবেন? লালচাঁদের অপমান তাঁহারা কেমন করিয়া নিবারণ করিবেন? ময়ন-তারার নয়নের জল তাঁহারা কেমন করিয়া মুছাইবেন? কত সহস্র রাজচন্দ্র, কত সহস্র সইস, কত সহস্র

লালচাঁদ, কত সহস্র নয়নতারা যে ভারতের গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে প্রতিদিন ঐরূপ অদৃষ্ট ভোগ করিতেছে, তাহাদিগের জন্য তাঁহারা কি করিতে পারেন? লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিতে না পারিলে আর তাহাদের ক্রন্দন, তাহাদিগের মৃত্যুশয্যায় রোদন —সেই মনীষীদিগের কর্ণগোচর হইবে না। কিন্তু তাহার সম্ভাবনা কই? আর কর্ণগোচর হইলেই বা তাঁহারা কি করিতে পারেন? পার্লিয়ামেণ্টে তাঁহারা সততই হীনবল। পার্লিয়ামেণ্টের অধিকাংশে সভ্যই ভারতবিষয়ে হয় উদাসীন, নয় বিদ্বেষপরিপূর্ণ। সুতরাং ভারতবাসীদিগের অশ্রু মোচনে তাঁহাদিগের কয়েকজনের সামর্থ্য কি? তাঁহাদিগের কয়েক জনের গুণাগুণে ভারতবাসীদিগের সুখ-দুঃখের সম্ভাবনা কি? ভারতবাসীর সুখ-দুঃখ প্রধানতঃ ভারতবাসী ইংরাজদিগের গুণাগুণের উপর নির্ভর করিতেছে। বিশেষতঃ নূতন কার্য্য-বিধির বলে আজকাল ম্যাজিষ্ট্রেটেরাই ভারতের প্রকৃত রাজা! সুতরাং ভারতবাসীর সুখ-দুঃখ সেই ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের গুণাগুণেরই উপর প্রধানতঃ নির্ভর করিতেছে। ইঁহারা কিরূপ গুণশালী, তাহা আমরা প্রতিদিন স্বচক্ষে দেখিতেছি। প্রতিদিন সংবাদ-পত্রযোগে তাঁহাদিগের অতুল গুণের বিপুল পরিচয় পাইতেছি। যে ইংরাজ-জাতির সভ্যতাবিষয়ে জগতের আদর্শস্থল, স্বাধীনতার অদ্বিতীয় সমর্থক; সেই ইংরাজ জাতির প্রতি আমাদের বিদ্বেষ বুদ্ধি, সেই ইংরাজ জাতির প্রতি আমাদের ঘৃণা—এই মহাত্মাদিগের জন্যই দিন দিন অধিকতর বলবতী হইতেছে। এই বিদ্বেষ এবং এই ঘৃণার পরিণাম কি হইবে, ভাবিতে গেলে, আমাদিগের হৃদয় বিকম্পিত হয়। যত দিন এই ঘৃণা ও বিদ্বেষানল ভারতবাসীদিগের অন্তরে প্রধূমিত থাকিবে, তত দিন ইংরাজজাতির প্রতি ভারতবাসীর মনকে প্রীতি-প্রবণ করার চেষ্টা স্রোতের মুখে তৃণ-নিক্ষেপের ন্যায় হইবে. সন্দেহ নাই।

ইংলণ্ডের সাহিত্য, ইংলণ্ডের বিজ্ঞান, ইংলণ্ডের দর্শন এবং ইংলণ্ডের ইতিহাস আমাদিগকে অনেক শিক্ষা দিয়াছে সত্য, কিন্তু ভারতবর্ষীয় শিক্ষা-প্রণালী স্বার্থপরতা, অনুদারতা ও স্বেচ্ছাচারিতা-দোষে দূষিত না হইলে এত দিন আমরা আরও অনেক শিক্ষা করিতে পারিতাম। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট দিন দিন উচ্চশিক্ষার বিরোধী হইয়া উঠিতেছেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে সার চার্লস উড ভারতবর্ষের শিক্ষা-বিষয়ে যে উৎকৃষ্ট ডেস্‌প্যাচ প্রেরণ করেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে তাহার অনুসরণ করিতেছেন না। তাহারা লোক-সাধারণের শিক্ষাবিধানচ্ছলে উচ্চশিক্ষার পথে অনেক কণ্টক রোপণ করিতেছেন। লোকসাধারণের শিক্ষার জন্য যে উপায় অবলম্বন করিতেছেন, তাহা নিতান্ত হাস্যাস্পদ। যে ইতিহাস পাঠে লৌকিক জ্ঞান পরিপুষ্ট হয়—স্বাধানতার ভাব প্রবল হয়, যে বিজ্ঞানপাঠে বহির্জগতের উপর মনুষ্যের সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা জন্মে, যে দর্শনপাঠে অন্তর্জগতের উপর মনুষ্যের শক্তি প্রচুরপরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হয়, যে উচ্চতর অঙ্ক শাস্ত্রের আলোচনায় বুদ্ধিবৃত্তি অতিশয় পরিমার্জ্জিত হয় এবং যে সাহিত্য পাঠে হৃদয়ের কোমলতর বৃত্তি সকল তেজস্বিনী হয়; সে ইতিহাস, সে বিজ্ঞান, সে দর্শন, সে সাহিত্য ও সে উচ্চতর অঙ্ক শাস্ত্রের আলোচনা হইতে জন-সাধারণ একেবারে বঞ্চিত। সাহিত্যের মধ্যে বর্ণ-পরিচয়, অঙ্ক-শাস্ত্রের মধ্যে গণিতের মূলসূত্র—তাহাদিগের পাঠনার আদি ও অন্ত। ভারতের বিংশতি কোটি অধিবাসীর মধ্যে এক কোটিরও অল্প লোক সেইরূপ জঘন্য শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে। বাকি উনবিংশ কোটির মধ্যে এক লক্ষ লোকও উচ্চশিক্ষা পাইতেছে কি না, সন্দেহস্থল। সেই উচ্চশিক্ষা আবার এরূপ জঘন্য প্রণালীতে সম্পাদিত হয় যে, তাহাকে উচ্চশিক্ষা বলিতেও লজ্জা বোধ হয়। যে সকল গ্রন্থ ইংলণ্ডীয় সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস ও অঙ্ক শাস্ত্রের ভূষণ বলিয়া পরিগণিত, তাহার মধ্যে দুই একখানি ভিন্ন ভারতবর্ষীয় প্রবেশিকা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য পরীক্ষায় অসার পুস্তকের সংখ্যাই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষীয় সুশিক্ষিত যুবকেরা এক্ষণে আপনাদিগের দুরবস্থা জানিতে পারিয়াছেন। তাঁহারা আপনাদিগের প্রাকৃতিক স্বত্ব উপলব্ধি করিতে শিখিয়াছেন, তাঁহারা আপনাদিগের অবস্থার উৎকর্ষসাধনে কৃত-সঙ্কল্প হইয়াছেন। তাঁহারা ইংরাজদিগের কার্য্যের দোষ দেখাইতে শিখিয়াছেন। তাঁহারা ইংরাজ-পূজারূপ পৌত্তলিকতার মূলচ্ছেদসাধনে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছেন। সংক্ষেপতঃ তাঁহারা এক্ষণে মানুষ

হইতে শিখিয়াছেন। এ সুখ-সমাচার শ্বেতপুরুষদিগের অসহনীয়। শ্বেতপুরুষেরা ষড়্‌যন্ত্র করিলেন যে, এই গুরুতর পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তাঁহাদিগকে প্রকৃত উচ্চশিক্ষা হইতে বঞ্চিত রাখিতে হইবে, তাঁহাদিগের চক্ষু ফুটিতে দেওয়া হইবে না। শিক্ষা-বিভাগের উচ্চপদবীস্থিত কতিপয় শ্বেতপুরুষ অপার জলধিপারে আসিয়া, অতি ক্লেশে বিপুল অর্থব্যয়ে কতিপয় অসার গ্রন্থ প্রসব করিলেন, অমনি সিন্‌ডিকেটের কোমল হৃদয় বিগলিত হইল! স্বজাতিপক্ষপাতিতায় ন্যায়পরতা ও কর্ত্তব্য-জ্ঞান তিরোহিত হইল! সেই অসার গ্রন্থগুলি আপনারা ক্রয় করিয়া গ্রন্থকারদিগের উৎসাহবর্দ্ধন করেন, স্বজাতিপক্ষপাতিতানলে আহুতি প্রদান করেন, এরূপ সাধ্য নাই। এই জন্য হতভাগ্য ভারত-যুবকের উপর সেইগুলির ক্রয়ভার অর্পিত হইল। শুদ্ধ ইহাতেই নিস্তার নাই—হতভাগ্য ভারত-যুবক সেই অসার তুষরাশি উদরস্থ করিতে আদিষ্ট হইলেন। ভারতবর্ষীয় যুবকের ক্ষীণ মস্তিষ্ক এই গুরুভারে প্রপীড়িত হইল, অদ্ধাশনে জীর্ণ দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িল। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে একটি অসার কঙ্কাল বাহির হইল। শিরোবেদনায় অস্থির—গ্রহণী-পীড়ায় প্রপীড়িত একটি অকাল-বৃদ্ধ বিদ্যালয় হইতে কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতারিত হইল। চির-রুগ্ন, জীর্ণ-কলেবর, অন্নচিন্তায় সমাকুল, নিরুৎসাহ ও দয়ার পাত্র এই ভারত-যুবক হইতে ভারতের কি মঙ্গলের আশা?

ভারতের বিংশতি কোটি অধিবাসীর মধ্যে দশ কোটির অধিক স্ত্রী-জাতি। সেই দশাধিক কোটির প্রায় সমস্তই অনক্ষর। যে দুই চারি জন লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছে, তাহাদিগেরও কেহই উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হয় নাই। অশিক্ষিতা বা অদ্ধ-শিক্ষিতা রমণী-কুল যে ভারতের কলঙ্ক, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। মানব-কুলের অদ্ধাঙ্গস্বরূপিণী স্ত্রী-জাতির পূর্ণ-শিক্ষা বিনা জগতের কোনও গুরুতর মঙ্গল সংসাধিত হইবার যে সম্ভাবনা নাই, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। ভারতের ললনাকুল অশিক্ষিতা বা অদ্ধশিক্ষিতা থাকিতে ভারতের যে কোনও শুভ নাই, তাহা বলা দ্বিরুক্তিমাত্র। চতুর্দ্দিকে অসংখ্য পাঠশালা, অসংখ্য স্কুল ও অনেক কলেজ সংস্থাপিত হইতেছে বটে, কিন্তু সে রমণী-কুলের জন্য নহে—মানবকুলের প্রবলতর শাখার জন্য। আজ শতাধিক বৎসর ভারতে সভ্যতাভিমানী ইংরাজ-রাজ্য প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে, তথাপি —লজ্জার কথা, ভারতে আজ পর্য্যন্ত রমণী-কুলের জন্য একটিও উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাপিত হইল না! যে কয়েকটি পাঠশালা ও যে কয়েকটি সামান্য স্কুল তাহাদিগের জন্য এতাবৎকাল পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে, তাহা অঙ্গুলিমাত্রে গণনীয়! যাঁহারা ভারতের ভাবী বংশধরগণের জননী, যাঁহারা বর্ত্তমান ভারত-সংস্কারকদিগের হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, যাঁহারা ভারতের গৃহের লক্ষ্মীস্বরূপিণী, যাঁহারা দুঃখভার-প্রপীড়িত ভারতবাসীর তমসাচ্ছন্ন হৃদয়াকাশের একমাত্র জ্যোৎস্না—সেই ভারত-ললনার অন্তর অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিতে ভারতের কি মঙ্গলের আশা?

ভারত! আর্য্যজাতির প্রদীপ্ত প্রতিভার বিলসনভূমি! রাম-ভার্গব, কর্ণার্জ্জুন, ভীষ্মকৃষ্ণের বিচিত্রবীর্য্যপ্রদর্শনাঙ্গন! ব্যাসবাল্মীক ও কালিদাস-ভবভূতির কবিত্বসরোজসরোবর! শঙ্কর ভাস্করের ক্রীড়াস্থল! মনু পরাশর ও বুদ্ধ-চৈতন্যের জন্মভূমি! লীলাবতীর লীলাস্থল! দুর্গাবতী ঝান্সীর বীরত্বরঙ্গভূমি! বেদের জননি! জগতের আরাধ্য! মানবকুলের উপদেশক! তোমার অদৃষ্টে শেষে কি এই ছিল? তোমার ভাবী পরিণামে কি হইবে, এই ভাবিয়া আমাদিগের হৃদয় আকুল? যে ঘোর দুর্দ্দশা-পঙ্কে তুমি এক্ষণে পতিত, তাহা হইতে তোমায় উদ্ধার করে, এমন লোক কই?

জননি! আমরা তোমার অন্নে প্রতিপালিত, তোমার শোণিতে পরিপুষ্ট, তোমার মৃত্তিকায় গঠিত, তোমার মলয়-পবনে অনুপ্রাণিত, তোমার নির্ম্মল জলে অভিষিক্ত, তোমার বিশ্বব্যাপী ধবল যশে উজ্জ্বলিত—কিন্তু আমরা অক্ষম! সেই অনন্ত উপকারের একটিরও প্রতিশোধ করিতে অক্ষম! অক্ষম—কিন্তু অকৃতজ্ঞ নহি? সেই অসংখ্য উপকারের প্রতিশোধ করিতে না পারি, তাহার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশে কুণ্ঠিত নই। জননি! সহস্র বৎসর দাসত্বে আমাদিগের শোণিত শুষ্কপ্রায়, দেহ মৃতপ্রায়, মন ভগ্নপ্রায়। জননি! সহস্র বৎসরের দাসত্ব তোমার বিপুল দেহ শ্মশানভূমিতে পরিণত হইয়াছে। চতুর্দ্দিক্ তোমার অপগণ্ড সন্তানদিগের ক্রন্দনে আকুলিত। চতুর্দ্দিকে শকুনি, গৃধিনী, শৃগাল, কুক্কুরগণ

বিকট শব্দ করিয়া আমাদিগের গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। এই ঘোর বিপৎকালে তাহারা কাহার শরণাপন্ন হইবে? যাহারই আশ্রয় গ্রহণ করে, সেই রক্ষক হইয়া তাহাদিগকে ভক্ষণ করে। দুর্ব্বলের প্রতি উৎপীড়ন করা বলবানের স্বধর্ম্ম। বলবানের প্রতি উৎপীড়ন করে, কাহার সাধ্য? জননি! তোমার দুর্ব্বল সন্ততিগণের বলাগমের উপায় কি? জননি! বহুকালব্যাপী দাসত্বে জীর্ণ কলেবরে প্রকৃত বলাগমের অনেক বিলম্ব। সে বিলম্ব অসহনীয়। এক্ষণে দাসত্বের অবস্থায় বলাগমের উপায় কি? জননি! তবে আমাদিগের কি কোন আশা নাই? যেন কোন দেবতা গম্ভীরস্বরে আমাদিগের এই প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, "আছে।" কি?—এই প্রশ্নের উত্তরে আবার বলিলেন, "একতা ও আত্মত্যাগ।" —ভারতের উদ্ধারসাধনের একমাত্র উপায় একতা ও আত্মত্যাগ—ভারতের জীর্ণদেহে বলসঞ্চারের একমাত্র উপায় একতা ও আত্মত্যাগ।

"তৃণৈর্গুণত্বমাপন্নৈর্বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ।"

তৃণেরও সমষ্টি দ্বারা মত্ত হস্তী বন্ধন করা যায়। বিংশতি কোটি ভারতবাসী একতাবন্ধনে বদ্ধ হইলে কাহাকে ভয়? বিংশতি কোটি ভারতবাসী স্বদেশের মঙ্গলসাধনব্রতে আত্মবিসর্জ্জন করিলে ভারতের কি অভাব? বিংশতি কোটি ভারতবাসার নয়নের জলেও শ্বেতদ্বীপ সমুদ্রগর্ভে নিমগ্ন হইতে পারে। বিংশতি কোটি ভারতবাসীর দীর্ঘ নিশ্বাসেও ভারতের শ্বেতপুরুষ কয়েকটি উড়িয়া যাইতে পারে। সমস্ত ভারত সমবেত হইলে, অস্ত্রধারণের প্রয়োজন কি? দুর্ব্বলের মহাস্ত্র ক্রন্দন। আমরা বিংশতি কোটি দুর্ব্বল ভারতবাসী কাঁদিয়া ইংলণ্ডের উপর জয়লাভ করিব! আমরা বিংশতি কোটি ভারতবাসী কাঁদিয়া ইংলণ্ডের নিকট স্বাধীনতা ভিক্ষা করিব? হিন্দু, মুসলমান—পারসী, য়িহুদী —ফিরিঙ্গী, সাঁওতাল—শিখ, বৌদ্ধ—আমরা সমস্ত ভারতবাসী একতানে কাঁদিয়া ইংলণ্ডের নিকট আমাদিগের প্রকৃতিসিদ্ধ স্বত্ব ভিক্ষা করিব! আমাদিগের ঐকতানিক ক্রন্দনে ইংলণ্ডের ভারত-সিংহাসন টলিবে! যে জাতি স্বাধীনতার নামে উন্মত্ত, যে জাতি আত্মস্বাধীনতা রক্ষার জন্য দেহ, প্রাণ, ধন, মান সমস্ত বিসর্জ্জন দিতেও উদ্যত যে জাতির রণতরি অসভ্য আফ্রিক, তাতারদিগের ও দাসত্বমোচনে সতত সুসজ্জিত,—সেই জাতি যে—সভ্যতার শৈশবদোলা—সভ্যতার জন্মভূমি—ভারতের বিংশতি কোটি অধিবাসীর ক্রন্দনে বধির থাকিবেন, বিশ্বাস হয় না! ভারতের বিংশতি কোটি অধিবাসী যদি প্রত্যেকে স্বাধীনতার মূল্য বুঝিতে শিখেন, যদি প্রত্যেকে স্বদেশের মঙ্গলসাধন-ব্রতে জীবন উৎসর্গীকৃত করিতে শিখেন, যদি প্রত্যেক ভারতের একোনবিংশতকোটি অধিবাসীকে সোদরোচিত স্নেহ করিতে শিখেন, যদি সকলে জাতি, ধর্ম্ম, সমাজ ভুলিয়া, এক রাজনৈতিক সম্বন্ধে সংবদ্ধ হইতে শিখেন, তাহা হইলে আমাদিগের দৃঢ়বিশ্বাস, ইংলণ্ড পুত্রবৎসল পিতার ন্যায় উপযুক্ত সন্তানদিগের হস্তে তাহাদিগের আত্মশাসন ও আত্মপালন কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়া, এই গুরুতর পালন কার্য্য হইতে অপসৃত হইবেন! যে দিন ইংলণ্ড ভারতের প্রতি এই উদার ও নিরভিসন্ধি ব্যবহার করিবেন, সেই দিনই ইংলণ্ড ভারতবাসীদিগের প্রকৃত ভক্তি ও প্রকৃত কৃতজ্ঞতার আধার হইবেন! সেই দিনই ইংলণ্ড ও ভারত এক সহানুভূতিসূত্রে সংবদ্ধ হইবে! পরস্পরের দুঃখে পরস্পর দুঃখী হইবে। পরস্পরের সুখে পরস্পর সুখী হইবে! পরস্পরের বিপদে পরস্পর প্রাণ দিবে। স্বাধীনতা ও সমতা ব্যতীত সে সহানুভূতি ঘটে না। বর্ত্তমান অবস্থায় এক পক্ষে সমতা ও স্বাধীনতার অভাব রহিয়াছে, সুতরাং এ অবস্থায় সে সহানুভূতি ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।

যাহাতে ভারতের বিংশতি কোটি অধিবাসীর প্রত্যেকে স্বাধীনতার মূল্য বুঝিতে শিখেন; যাহাতে ভারতের বিংশতি কোটি অধিবাসীর প্রত্যেকে স্বদেশের মঙ্গলসাধনব্রতে জীবন উৎসর্গীকৃত করিতে শিখেন; যাহাতে ভারতের বিংশতি কোটি অধিবাসী পরস্পরের প্রতি পরস্পর সোদরোচিত স্নেহ করিতে শিখেন, যাহাতে ভারতের বিংশতি কোটি অধিবাসী জাতি, ধর্ম্ম, সমাজ ভুলিয়া এক পক্ষ নৈতিক সম্বন্ধে সংবদ্ধ হইতে শিখেন, যাহাতে ভারতে বিংশতি কোটি অধিবাসী একবাক্যে স্বাধীনতা-প্রিয় ব্রিটনের নিকটে আত্মদুঃখ ব্যক্ত করিতে

শিখেন ; সেই সকল গুরুতর উদ্দেশ্যসাধন করিবার নিমিত্ত—জননী ভারতভূমির প্রতি অসংখ্য উপকারের কৃতজ্ঞতা চিহ্নস্বরূপ ১২ই শ্রাবণ বুধবার কলিকাতা মহানগরীস্থিত আলবার্ট হলে "ভারত সভা" নামক এক নূতন রাজনৈতিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এইদিনে ভারতের পুনর্জন্মদিন! এই দিনে সমস্ত ভারতে এক অপূর্ব্ব রাজনৈতিক ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠাপিত হইল। পারলৌকিক ধর্ম্ম পৃথক্ হউক, জাতি পৃথক হউক, সমাজ পৃথক হউক, তথাপি এ ধর্ম্মের একতা পরিরক্ষিত হইবে। এ ধর্ম্মে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, সেশ্বর, নিরীশ্বর, সাকার, নিরাকার, খৃষ্টান, য়াহুদি—সকলই সমান। সকলেই নির্ব্বিরোধে এই ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারেন। এই ধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ার কেবল একটিমাত্র নিয়ম আছে—দীক্ষিতদিগের প্রত্যেকেই ভারতবাসী হওয়া চাই। ইহাতে রাজা, জমীদার, প্রজা প্রভৃতি বিষাক্ত শ্রেণীবিভাগ নাই, ইহা সাম্যবাদী। এই ধর্ম্মই ভারত-সভার মূলভিত্তি। এই জন্য ভারতসভা সকলকেই ভ্রাতৃভাবে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছে। ভারতবাসী! হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ! আপনারা সকলেই আসিয়া এই সভায় যোগ দিউন। দেখিবেন, ভারতের সুখ-সূর্য্য অচিরাৎ সমুদিত হইবে। বৎসরে বৎসরে ভারতের প্রতি গৃহে যেন এই দিন উপলক্ষে মহান্ উৎসব হয়। যেন এই দিনে হিমালয় হইতে সিংহল এবং সিন্ধু হইতে সুদূর ব্রহ্মদেশে ভারতের যশোগান করে! ভারত এক দিন জগতের সভ্যতামার্গের নেতা ছিলেন, এক দিন সমস্ত জগতের শিক্ষক ছিলেন, এক দিন যাহার বীরত্বে মেদিনী বিকম্পিত হইয়াছিল, আবার এমন দিন আসিবে—সে দিন বহুদূরবর্ত্তী নয়—যে দিনে ভারত আবার জগতের সভ্যতামার্গের নেতা হইবেন, যে দিনে ভারত আবার সমস্ত জগতের শিক্ষক হইবেন, যে দিনে ভারতের বীরত্ব জগতে পুনর্ব্বার উদ্বোষিত হইবে!!! ভারত-সভা! এই গভীর লক্ষ্য সাধনের ভার তোমার অনতিপ্রৌঢ় মস্তকে অর্পিত হইল! দেখিও, এই গুরুভার—এই গভীর বিশ্বাসের অপব্যবহার না কর।

ভারতে দুর্ভিক্ষ

হায়! কি কুদিনে বৈদেশিক চরণ ভারতবক্ষে অর্পিত হয়। সেই দিনেই ভারতবাসীদিগের সৌভাগ্য সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছে। সেই দিন হইতেই ভারতবাসীদিগের দুঃখ-যন্ত্রণা আরম্ভ হইয়াছে।

"ছিদ্রেষ্বনর্থা বহুলীভবন্তী"

একটি ছিদ্র ধরিয়া অনর্থরাশি জলপ্লাবনের ন্যায় ভারতবর্ষকে প্লাবিত করিতেছে। আজ সাইক্লোন (ঝড়), আজ জলপ্লাবন, আজ দুর্ভিক্ষ, আজ মহামারী—এইরূপ প্রতি বৎসরেই শুনা যাইতেছে। আমাদিগের প্রাচীন গ্রন্থ সকলে, অস্মদ্দেশীয় প্রচলিত জনশ্রুতিতে এরূপ ধারাবাহিক দৈবী আপৎপরম্পরার কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহা যে কখন ঘটিত না, এরূপ বলিতেছি না, শত বা সহস্র বর্ষে এক আধবার ঘটিত মাত্র। তাহাও যে রাজ-পাপ বিনা সংঘটিত হইত না, আর্য্যেরা তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেন। রাজ্যে কোন প্রকার দৈবী আপৎ উপস্থিত হইলে, তখনকার রাজারা আপনাদিগের দুরাচার বলিয়া আশঙ্কা করিতেন। তাঁহারা ভাবিতেন, অবশ্যই রাজ্যের শাসন-কার্য্যে তাঁহাদিগের কোন প্রকার স্খলন হইয়া থাকিবে, নতুবা এরূপ ঘটিবে কেন? অধিক কি, প্রাকৃতিক নিয়মের লঙ্ঘন-জনিত অকালমৃত্যু প্রভৃতিকেও রাজারা তাহাদিগের দুঃশাসনের ফল বলিয়া মনে করিতেন। উত্তররামচরিতের একস্থলে লিখিত আছে—"ততো ন রাজাপচার-মন্তরেণ প্রজানামকালমৃত্যুশ্চরতীতি আত্মদোষং নিরূপয়তি করুণাময়ে রামভদ্রে॥" অর্থাৎ ব্রাহ্মণবালকের অকাল-মৃত্যু শুনিয়া, করুণাময় রামচন্দ্র মনে মনে ভাবিতেছিলেন যে, রাজদোষ বিনা কখনই এরূপ অকালমৃত্যু সম্ভবে নাই। বস্তুতঃ প্রজাদিগের দুঃখ সুখের মূল যে রাজা, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। রাজা ভাল হইলে প্রজাদিগের অশেষ সুখ, রাজা মন্দ হইলে প্রজাদিগের দুঃখের সীমা নাই। রাজা ভাল হইলে প্রজাদিগকে সর্ব্বপ্রকার দৈবী আপৎ হইতে রক্ষা করিতে পারেন, এরূপ আমরা বলি না। তবে আমরা বলি এই যে, রাজা ভাল হইলে সেগুলির

অনেক স্থলে পরিহরণ করিতে পারেন। যেখানে নিতান্ত অনিবার্য্য, সেখানে তজ্জনিত প্রজাদিগের দুঃখের অনেক উপশমন করিতে পারেন। গভর্ণমেণ্ট ঝটিকা নিবারণ করিতে পারেন না বটে, কিন্তু ঝটিকাজনিত প্রজাদিগের অশেষ যন্ত্রণা নিবারণ করিতে পারেন। গবর্ণমেণ্ট উপযুক্ত বাঁধ দ্বারা জলপ্লাবনের পরিহরণ করিতে পারেন এবং যেখানে বাঁধ-ভঙ্গ বা জলোচ্ছ্বাসের অসাধারণ উচ্চতানিবন্ধন জল-প্লাবন-নিবারণে একান্ত অসমর্থ হয়েন, সেখানে আন্তরিক চেষ্টা করিলেই জলপ্লাবন-জনিত অনিষ্টের অনেক পরিমাণে নিরাকরণ করিতে পারেন। গবর্ণমেণ্ট উৎকৃষ্ট পয়ঃপ্রণালী নিম্মাণ দ্বারা অনাবৃষ্টি জনিত দুর্ভিক্ষের পৌনঃপুন্যে আবির্ভাব দূর প্রসারিত করিতে পারেন; এবং জল-প্রসরণ-পথ পরিষ্কৃত রাখিয়া ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করিয়া, অনেক পরিমাণে মহামারী নিবারণ করিতে পারেন। যেখানে সেই সেই উপায়, সেই সেই দৈবী আপৎ অনিবার্য্য, সেখানে রাজকর্ম্মচারীদিগের যত্নে সেই সেই অনিবার্য্য-আপৎজনিত প্রজাদিগের অশেষ দুঃখের নিবারকরণ হইতে পারে, ইংলিশ গবর্ণমেণ্ট যে সেই সকল দৈবী আপৎপরম্পরার নিবারকরণে অথবা নিরাকরণ অসম্ভব হইলে তজ্জনিত প্রজাদিগের শোচনীয় দুরবস্থার উপশমনে বিন্দুমাত্রও চেষ্টা করে না, এ কথা আমরা বলিতে পারি না। তবে আমরা এই বলি যে, ইংলিশ গবর্ণমেণ্ট আমাদিগের দুরদৃষ্টবশতঃ বৈদেশিক গবর্ণমেণ্ট, সুতরাং আন্তরিক ইচ্ছা সত্ত্বেও বৈদেশিক কর্ম্মচারীদিগের স্বার্থপরতাবশতঃ চেষ্টা করিয়াও, ফলে কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন না।

কোন বৈদেশিক গবর্ণমেণ্ট যে ইংলিশ গবর্ণমেণ্ট অপেক্ষা ভারতের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইবে, তাহা আমরা বিশ্বাস করিব না। এই জন্য আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, যতদিন আমাদিগকে বৈদেশিক শাসনের অধীনে থাকিতে হইবে, ততদিন যেন আমাদিগকে অন্য কোন গবর্ণমেণ্টের অধীনে যাইতে না হয়। আমরা বৈদেশিক গবর্ণমেণ্টনিচয়ের মধ্যে ইংলিশ গবর্ণমেণ্টকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গবর্ণমেণ্ট বলি, সুতরাং আমরা বিশেষরূপে তাহারই পক্ষপাতী। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে? বৈদেশিক শাসনের বিষময় ফল আমাদিগকে ভোগ করিতে হইবে। বৈদেশিক শাসনের বিষময় ফল কি তাহা বর্ণনা করা এ প্রস্তাবে উদ্দেশ্য নহে। তবে কথা তুলিয়া দুই একটি না বলিয়া ক্ষান্ত থাকা অনুচিতবোধে যথাস্থানে সংক্ষেপে এ প্রস্তাবের উপযোগী দুই একটি বলা যাইবে।

এক্ষণে দেখা যাউক, দুর্ভিক্ষের কারণ কি এবং দুর্ভিক্ষ-নিবারণের উপায় বা কি। দুর্ভিক্ষের কারণ কি? এ প্রশ্নের উত্তরে আমাদিগকে বলিতে হইবে—খাদ্যাভাবই দুর্ভিক্ষের কারণ অথবা খাদ্যাভাবই দুর্ভিক্ষ। এক্ষণে দেখিতে হইবে, খাদ্যাভাব কত প্রকারে ঘটিতে পারে। যে সকল দেশের শস্যাদির উৎপত্তি পর্জ্জন্যদেবের দয়ার উপর নির্ভর করে, সে সকল দেশে বৃষ্টি না হইলেই, শস্যাদি উৎপন্ন হয় না। ভারতবর্ষ নদীমাতৃক দেশ নহে, এজন্য মধ্যে মধ্যে ইহার স্থানে স্থানে অনাবৃষ্টি নিবন্ধন শস্যাদি জন্মে না এবং তজ্জনিত খাদ্যাভাব সংঘটিত হইয়া, সেই সেই প্রদেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। আমরা জিজ্ঞাসা করি, এই দুর্ভিক্ষের জন্য দায়ী কে? আমরা বলি, দৈব ও রাজা। কিন্তু দৈবের প্রতি আমাদের কোন অভিমান ও কোন অনুযোগ চলে না বলিয়া, আমরা রাজস্কন্ধেই সমস্ত দোষ চাপাইব। দুর্ভিক্ষ ঘটিতে না দেওয়া ও ঘটিলে তাহার তৎক্ষণাৎ নিরাকরণ করা, এ দুইই অনেক পরিমাণে রাজার করায়ত্ত। যাহা তাঁহার করায়ত্ত ও যত্নসাধ্য, তিনি যদি তৎসাধনে উপেক্ষা করেন, তাহা হইলে তিনি ধর্ম্মের নিকটে ও মানবজাতির নিকটে পতিত।

আমরা দেখাইব, দুর্ভিক্ষের অত্যন্তাভাব সাধন ও উপশমন রাজার করায়ত্ত ও যত্নসাধ্য কিরূপে। ভারতবর্ষ ত কোন কালেই নদীমাতৃক দেশ নহে, সুতরাং অনাবৃষ্টিনিবন্ধন শস্যাদির অনুৎপত্তি বা ধ্বংস ত চিরকালই চলিয়া আসিতেছে। তথাপি পূর্ব্বেই বা কালভদ্রে কখন দুর্ভিক্ষের নাম শ্রুত হইত কেন, আর এক্ষণই বা বৎসরে বৎসরে ভারতের কোন না কোন প্রদেশ দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত হইতেছে কেন? দেবতারা কি এক্ষণে ভারতের উপর অধিকতর কুপিত হইয়াছেন? তাহা নহে। ইহার অভ্যন্তরে মানব কারণই নিহিত আছে। ভারতবর্ষের ন্যায় শস্যশালী দেশ পৃথিবীতে আর নাই। ইহাতে এত অপর্য্যাপ্ত শস্য জন্মে যে, এক বৎসরের অনাবৃষ্টিতে

ও তজ্জনিত অজন্মায় কখন শস্যাভাব ও তন্নিবন্ধন দুর্ভিক্ষ সংঘটিত হইতে পারে না। পূর্ব্বে অধিবাসীদিগের আহার যোজনা করিয়াও ইহা এত শস্য সঞ্চয় করিয়া রাখিত যে, উপর্য্যুপরি তিন চারি বৎসর অনাবৃষ্টি হইলেও শস্যাভাব বা তজ্জনিত দুর্ভিক্ষ ঘটিতে পারিত না। কিন্তু এক্ষণে সুসভ্য রাজার অধীনে স্বাধীন বাণিজ্যের অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছে! খাদ্য সঞ্চয় এ সভ্যতার অনুমোদিত নহে। তোমার এ বৎসরের খোরাক চলিতে পারে, এরূপ রাখিয়া তুমি অবশিষ্ট সমস্ত বিক্রয়ার্থ বিদেশে প্রেরণ কর। বিদেশের খাদ্য-সৌকর্য্য ঘটুক, কিন্তু তুমি আগামী বৎসরে কি খাইবে, তাহা ভাবিও না। আগামী বৎসর আসিল, বৃষ্টি হইল না, শস্য জন্মিল না। তুমি রাজার নিকট জিজ্ঞাসা করিলে "কি খাইব?" রাজা বলিলেন, "তুমি কি খাইবে, তাহার ভাবনা ভাবিতে আমি বাধ্য নহি। তবে তোমাদিগের সমূহ বিপৎ দেখিতেছি। আচ্ছা, কিঞ্চিৎ সাহায্য করা যাইবে।" রাজা বস্তা কত চাউল আনিয়া, সেই অগণ্য মানবমণ্ডলীর সম্মুখে ধারণ করিলেন। তাহারা অনাহারের জ্বালায় অস্থির হইয়া দুই চারিটি করিয়া দানা খুঁটিয়া খাইল। আবার ক্রন্দন-রোল উঠিল। আবার গগন বিদারিয়া এই চীৎকার ধ্বনি উত্থিত হইল—"আমরা খাই কি, অনাহারে মরি যে!" অনাহারে অসংখ্য প্রজার মৃত্যু হইতে আরম্ভ হইল। তখন রাজকর্ম্মচারীদিগের চৈতন্য হইল। রাজ্ঞীর সিংহাসন টলিল। হুকুম হইল যে, দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত প্রদেশে যেন পর্য্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য-সামগ্রী প্রেরিত হয়। রাজ-কোষ হইতে প্রচুর অর্থ প্রদত্ত হইল। তাহার অর্দ্ধেক বৈদেশিক রিলীফ কর্ম্মচারীদিগের উদরস্থ হইল। অবশিষ্ট অর্দ্ধেকের কিয়দংশ দেশীয় রিলীফ, কর্ম্মচারীদিগের পাপ-ধন-লিপ্সা চরিতার্থ করিল। যে যৎকিঞ্চিৎ অবশিষ্ট রহিল, তাহাতে দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত ব্যক্তিদিগের দুঃখের উপশমন হইল না। তাহারা দলে দলে মরিতে লাগিল! উপশমন-শিবির সকল তাহাদিগের সমাধি-মন্দিররূপে পরিগণিত হইতে লাগিল। গবর্ণমেণ্ট ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তাকাইয়া রহিলেন।

প্রতি দুর্ভিক্ষের সময়েই ত এইরূপ প্রহসন অভিনীত হইয়া থাকে। ইহার জন্য দায়ী কে? আমরা বলি রাজা। রাজা ইচ্ছা ও যত্ন করিলে দুর্ভিক্ষের পরিহরণও করিতে পারেন, উপশমনও করিতে পারেন।

স্বাধীন বাণিজ্য ভাল বটে, কিন্তু তাহার নিয়ন্ত্রণ ও নিয়মন একান্ত প্রয়োজনীয়। সেই নিয়মনের শক্তি রাজহস্তে নিহিত আছে; সুতরাং রাজা যদি তাহার পরিচালন না করেন এবং সেই পরিচালনাভাবে রাজার যদি কোন অমঙ্গল ঘটে, তাহার জন্য দায়ী রাজা।

এ স্থলে রাজার কর্ত্তব্য কি, তাহা আমরা বলিতেছি। উদ্বৃত্ত শস্য বিদেশে প্রেরণ করিয়া তাহার বিনিময়ে মুদ্রা বা বৈদেশিক পণ্য আনয়ন করা প্রার্থনীয় বটে, কিন্তু কি পরিমাণ শস্য বিনা বিপদে প্রেরণ করা যাইতে পারে, তাহা নির্ণয় করা ও তদতিরিক্ত বিদেশে যাইতে না দেওয়া রাজার কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্যের অকরণে রাজার গুরুতর প্রত্যবায় আছে। প্রত্যেক প্রদেশের, প্রত্যেক জেলার লোকসংখ্যা গ্রহণ করিতে হইবে। প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক জেলার লোক-সংখ্যা অনুসারে তত্তৎপ্রদেশের ও তত্তৎ-জেলার খাদ্য পরিমাণ নির্ণয় করিতে হইবে। সেই পরিমাণ অনুসারে দুই তিন বৎসরের খাদ্য রাখিয়া অতিরিক্ত অংশ প্রদেশান্তরে, জেলান্তরে বা দেশান্তরে যাইতে দিতে হইবে। যদি কোন প্রদেশে বা জেলায় শস্য কম জন্মে, তাহা হইলে অন্য প্রদেশ বা জেলা হইতে শস্য আনিয়া সেই অভাব পূরণ করিয়া রাখিতে হইবে। যখন রাজা জানিতে পারিবেন যে, ভারতে সমস্ত প্রদেশে, সমস্ত জেলায় এইরূপে দুই তিন বৎসরের খাদ্য মজুত হইয়াছে, তখন তিনি অতিরিক্ত শস্য বিদেশে চালিত করিতে অনুমতি প্রদান করিতে পারেন। এরূপ চালানী কার্য্যে ভারতের কোন অমঙ্গল না হইয়া বরং সৌভাগ্য-সীমা পরিবর্দ্ধিত হইবে; এবং দুর্ভিক্ষেরও পরিহরণ হইবে।

কিন্তু বৈদেশিক বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধন যাঁহাদিগের ইষ্ট, ভারতের মঙ্গলসাধন যাঁহাদিগের একমাত্রও প্রধান লক্ষ্য নহে, তাঁহারা যে ভারতের ভাবী অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া বৈদেশিক বাণিজ্যের স্বাধীনতা সঙ্কোচ করিবেন, এরূপ আশা করা যায় না। এই জন্যই বলিতেছিলাম, বৈদেশিক শাসনের বিষময় ফল আমাদিগকে ভোগ করিতে হইবে।

অনাবৃষ্টিনিবন্ধন শস্যের অনুৎপত্তি জন্য দুর্ভিক্ষের

সম্ভাবনার পরিহরণ করার ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। কিন্তু অনাবৃষ্টিনিবন্ধন শস্যের অনুৎপত্তি যাহাতে না ঘটে, আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাহার উৎকৃষ্ট উপায় সর্ব্বত্র পয়ঃ-প্রণালী-নির্ম্মাণ। এইটি ভারতবর্ষে বিশেষ অভাব। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট যে ইহার আবশ্যকতা বুঝেন না, তাহা নহে। কিন্তু আমাদিগের দুভাগ্যবশতঃ শ্বেত ইঞ্জিনীয়ারগণের উদরের আয়তন এত বিস্তৃত হইয়াছে যে, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে। পয়ঃপ্রণালী-নির্ম্মাণের জন্য গবর্ণমেণ্ট যত কেন অর্থব্যয় করুন না, অধিকাংশই শ্বেত ইঞ্জিনীয়ারদিগের উদরসাৎ হইবে; অবশিষ্ট অর্থে যাহা সম্পন্ন হইবে, তাহাতে এই গুরুতর অভাবের কণামাত্র বিদূরিত হইবে। সুতরাং পয়ঃ-প্রণালী-নির্ম্মাণ দ্বারা অনাবৃষ্টি-নিবন্ধন শস্যের অনুৎপত্তি-নিবারণের আশাও সুদূর-পরাহত। তবে যদি আমরা এক টাকার কাজ হইতে পাঁচ টাকা খরচ করিতে পারি, তাহা হইলে, আমাদিগের সে আশা পূর্ণ হইতে পারে। কিন্তু আমরা এত দীন ও দুঃস্থ যে, এক টাকা ব্যয় করাই আমাদিগের পক্ষে দুরূহ ব্যাপার, পাঁচ টাকার ত কথাই নাই। সুতরাং ধরিয়া রাখিতে হইবে যে, পয়ঃ-প্রণালী-নির্ম্মাণ দ্বারা দুর্ভিক্ষ-নিবারণের আমাদিগের কোন আশাই নাই।

এই জন্যই বলিতেছিলাম, বৈদেশিক শাসনের বিষময় ফল আমাদিগকে ভোগ করিতেই হইবে।

দুর্ভিক্ষের পরিহরণের দুইটি উপায় বলিলাম। এক্ষণে দুর্ভিক্ষের উপশমনের দুই একটি উপায় বলিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

দুর্ভিক্ষে যদি প্রজানাশ হয়, তাহার জন্য দায়ী কে? আমাদিগের মতে রাজা। যদি ঘোর বিপাকের সময়ে রাজা তাহাদিগের প্রাণরক্ষা না করিবেন, তাহা হইলে রাজার সহিত তাহাদের সম্বন্ধ কি? কি জন্য তাহারা রাজাকে কর দিবে? কি জন্যই বা তাহারা স্বাধীনতার বিনিময়ে তাঁহার নিকটে অধীনতা কিনিবে? প্রজাদিগের প্রাণরক্ষা যখন রাজার কর্ত্তব্য স্থির হইল, তখন দেখা যাউক, দুর্ভিক্ষ অনিবার্য্য হইলে, রাজা কি কি উপায়ে তাহার উপশমন করিতে পারেন।

খাদ্যাভাবে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। এক্ষণে সেই অভাব দূর করিলে দুর্ভিক্ষের উপশমন হয়। এক্ষণে এই অভাবের দূরীকরণ বণিকবৃন্দ দ্বারাও হইতে পারে, গবর্ণমেণ্ট দ্বারাও হইতে পারে। বণিকেরা নানা দেশ হইতে খাদ্য আহরণ করিয়া দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত দেশে আনয়ন করেন, গবর্ণমেণ্টও ইচ্ছা করিলে তাহা আনিতে পারেন। উভয়েই যদি দ্রব্যাদি আনিয়া উচ্চ মূল্যে বেচিতে বসেন, অতি অল্প লোককেই ভারতে ক্রেতা পাইবেন। কারণ, অর্থ-প্রাচুর্য্য থাকিলে দুর্ভিক্ষের প্রভাব কখনই অনুভূত হয় না। দারিদ্র্য দুর্ভিক্ষের একটি গৌণ কারণ। এই জন্য আজকাল ভারতে এত দুর্ভিক্ষ। সুতরাং সে স্থলে বাণিজ্যের স্বাধীনতার যদি কিঞ্চিৎ সঙ্কোচ না করা যায়, যদি দ্রব্যের মূল্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া না দেওয়া যায়, তাহা হইলে, দ্রব্যাদি বিক্রীত হওয়ার কোন আশা থাকে না। এই জন্য গবর্ণমেণ্ট নিজেই সংযোজক (Supplier) হউন, আর বণিক্-বৃন্দই সংযোজক হউন, গবর্ণমেণ্টকে একটা সম্ভবতঃ ন্যূনতম মূল্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবে। সম্ভবতঃ ন্যূনতম মূল্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলে ক্রেতার সংখ্যা বাড়িবে, মৃত্যু-সংখ্যার হ্রাস হইবে এবং গবর্ণমেণ্টের স্কন্ধেও অল্পসংখ্যক কাঙ্গালীর ভার পড়িবে। কিন্তু ইংলিশ গবর্ণমেণ্টের একটি গুরুতর রোগ আছে। লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণনাশ হইবে সেও ভাল, তথাপি ইঁহারা বাণিজ্যের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিবেন না।

দুর্ভিক্ষ-প্রশমনের দ্বিতীয় উপায় দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত প্রদেশে দুর্ভিক্ষের সময় গুরুতররূপে পূর্ত্তকার্য্যের অনুষ্ঠান। যত লোক উপস্থিত হউক্ না কেন, পূর্ণ অশনে বা উপযুক্ত বেতনে তাহাদিগের দ্বারা কাজ লইলে অনাহার-জনিত মৃত্যু প্রায় ঘটিতে পারে না। অনুপযুক্ত বেতনে বা অর্দ্ধ-অশনে তাহাদিগের দ্বারা ভাল কাজ লওয়া সম্ভব নহে এবং অধিক দিন তাহাদিগের জীবিত রাখাও সহজ নহে। লীটন ও টেম্পল এই অর্দ্ধ-অশন নীতি অবলম্বন করিয়া অসংখ্য লোকের প্রাণনাশ করিয়াছেন।

যাহা হউক, আমরা আর শুদ্ধ বৈদেশিক গবর্ণমেণ্টকে গালি দিয়া দেশহিতৈষিতার পরাকাষ্ঠা দেখাইব না। মান্দ্রাজ দুর্ভিক্ষের অবস্থা ও সেই দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে আমাদিগের কি কর্ত্তব্য—এবং ভবিষ্য দুর্ভিক্ষ সকলের যথাসাধ্য পরিহরণ করিতেই

করিতেই বা আমাদিগের কি কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, দ্বিতীয় প্রস্তাবে আমরা সেই সমস্তের আলোচনা করিব।

মান্দ্রাজ-দুর্ভিক্ষ

আমরা পূর্ব্ব-প্রস্তাবে রাজার উপর অভিমান করিয়া অনেক তিরস্কার করিলাম—অনেক কাঁদিলাম, কিন্তু তাহাতেই আমাদিগের জাতীয় কর্ত্তব্য পরিসমাপ্ত হইল না। আমাদিগের জানা উচিত যে, ইংরাজেরা আমাদিগের জেতা অথবা জেতৃত্বাভিমানী। যাঁহাদিগের মনে জেতৃত্বাভিমান প্রবল রহিয়াছে, তাঁহারা যে বিজিত দেশের প্রতি যথোচিত কর্ত্তব্যসাধন—বিজিতদিগের সুখ-দুঃখে পূর্ণ সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারিবেন, এরূপ আশা করা যায় না। যত দিন ইংরাজদিগের মন হইতে সেই জেতৃত্বাভিমান অপনীত না হইবে, যতদিন তাঁহারা আমাদিগকে অসভ্য বিজিত দাসজাতি বলিয়া ঘৃণা করিবেন, তত দিন তাঁহাদিগের কাছে সমদুঃখসুখতা আশা করা বাতুলমাত্র। স্বাধীন জাতি তাঁহাদিগের গবর্ণমেণ্টের নিকট যে সকল দাবীদাওয়া করিতে পারেন, আমাদিগের তাহা করিবার অধিকার নাই। আজ লর্ড লীটন ও টেম্পল সাহেবের অর্দ্ধাশননীতি অবলম্বন করায়, মান্দ্রাজ দুর্ভিক্ষে পাঁচ লক্ষ লোকের মৃত্যু হইল। এ সংবাদে কেন আজ ভারত নীরবে নির্জ্জনে কাঁদিল? ইহার একই উত্তর—ভারত পরাধীন—ভারত বিজিত।

মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষে সহস্র সহস্র ভ্রাতা ভগিনী মরিতে লাগিল, আর আমরা অম্লানবদনে দেখিতেছি—নির্ভাবনায় খাইতেছি। এমন সহৃদয় ব্যক্তি আমাদিগের মধ্যে কি কেহ আছেন, যাঁহারা দিনের মধ্যে অন্ততঃ একবারও সেই হতভাগ্য ও হতভাগিনীদের জন্য ভাবিয়া থাকেন বা এক বিন্দু অশ্রুজল ফেলেন? ইতিহাসের অতীত ঘটনা ও নবন্যাসের কল্পনাসম্ভূত উপাখ্যান আমরা যেরূপ নির্লিপ্ত ও নির্জ্জীব ভাবে পাঠ করি, মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত ব্যক্তিদিগের শোচনীয় অবস্থাও আমরা সেইরূপ ভাবে পাঠ করি। তাহাদিগের দুঃখে আমাদিগের জীবন্ত ও জলন্ত সহানুভূতি নাই। তাহা থাকিলে আমরা এরূপ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতাম না; আমরা গবর্ণমেণ্টের উপর সমস্ত ভার—সমস্ত দায়িত্ব—চাপাইয়া সুখে নিদ্রা যাইতে পারিতাম না, আমরা শুদ্ধ গবর্ণমেণ্টকে গালি দিয়া স্বজাতিপ্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে চাহিতাম না। গবর্ণমেণ্টের স্খলনে—গবর্ণমেণ্টের অনবধানে—গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্যের অকরণে—যদি দুর্ভিক্ষের ভীষণ পরিণাম ঘটে, পূর্ব্ব হইতেই তাহার উপায় স্থির না করিয়া এরূপ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতাম না।

যদি স্বজাতির বিপদে সহোদর-সহোদরার দুঃখে—আমরা কাতর না হইলাম, তবে বিজাতিতে—বৈমাত্রেয় ভ্রাতা-ভগিনীতে—কেন তাহাদিগের দুঃখে—তাহাদিগের বিপদে কাতর হইবে? আমরা সহোদর-স্নেহের অভাবের জন্য আপনাদিগকে তিরস্কার করিব না। কিন্তু বিজাতীয়দিগের অন্তরে প্রবল মানব-প্রেমের অভাব দেখিলে তাহাদিগকে তিরস্কার করিব। আমরা রায় বাহাদুর রাজা বাহাদুর প্রভৃতি উপাধি পাইবার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিব, কিন্তু লক্ষ লক্ষ ভ্রাতা-ভগিনীর প্রাণরক্ষার্থে তাহার কিয়দংশও দিতে পারিব না। কোন সম্ভ্রান্ত লোক মরিলে আমরা তাঁহার স্মৃতি চিরস্থায়িনী করিবার জন্য সহস্র সহস্র মুদ্রা চাঁদা দিতে পারিব, কিন্তু সহস্র সহস্র সহোদর-সহোদরার জীবনরক্ষার্থে তাহাদিগের গ্রাসাচ্ছাদনোপযোগী যৎকিঞ্চিৎ অর্থ দিতেও কুণ্ঠিত হইব। অতএব আইস, অগ্রে আমরা নিজের দোষ সংশোধন করি, তাহার পর পরকে গালি দিব। অগ্রে আমরা কার্য্যতঃ দেখাই যে, আমরা সমস্ত ভারতবাসী মিলিয়া মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষ-নিবারণ জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছি, তখন যদি দেখি, গবর্ণমেণ্ট তৎপক্ষে উদাসীন, আমরা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হইব।

এক্ষণে এতৎসম্বন্ধে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বে দেখা যাউক, মান্দ্রাজ দুর্ভিক্ষের অবস্থা কি। আমরা স্বচক্ষে কিছুই দেখি নাই, সুতরাং পরোক্ষে যাহা শুনিয়াছি বা পড়িয়াছি, তাহা হইতেই আমাদিগকে প্রকৃত ঘটনার একটি চিত্র, একটি প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিতে হইবে। আমরা পাঠকদিগের

গোচবার্থে মান্দ্রাজ দুর্ভিক্ষ নিবারণী সভায় দীনবন্ধু মহাত্মা ডিউক অব বকিম্হাম মান্দ্রাজ-দুর্ভিক্ষ বিষয়ে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাব মর্ম্ম নিম্নে প্রদান করিল'ম :—পূর্ব্বে যেরূপ অনুমান করা গিয়াছিল, দুর্ভিক্ষ এক্ষণে তাহা অপেক্ষা অন্যতর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। এরূপ মনে করা গিয়াছিল যে সাময়িক জলবর্ষণে জনসাধারণ এই আকস্মিক বিপৎপাতের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ কবিবে; এবং যে, সকল লোব উপশমনকেন্দ্রসকলে সমবেত হইয়াছে, তাহাবাও চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইবে। কিন্তু বিধাতাব ইচ্ছা অন্যরূপ। তাহারা এক্ষণে দুর্ভিক্ষের এমন একটি নারকলায উপনীত হইয়াছে, যাহার প্রতাপ কৃষ্ণা হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত প্রদেশে অনুভূত হইতেছে। দুর্ভিক্ষের যন্ত্রণার পরিসব দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। খাদ্য-সংযোজনা কমিতেছে, গো-মেষাদি কড়ঙ্করীয় পালে পালে কমিতেছে; শস্য সকল শুকাইয়া যাইতেছে, অধিক কি, এই প্রদেশ সকলের কষ্টযন্ত্রণা বাক্যে বর্ণনা করা অসাধ্য। প্রাদশিক কর্ম্মচারীদিগেব কার্য্যবিবরণে অবগত হওয়া গিয়াছে যে, এক কোটি অশীতি লক্ষ লোক এই দুর্ভিক্ষে প্রপীড়িত হইয়াছে। তাঁহাদিগেব অবস্থা অতি শোচনীয়। ইহাদিগকে এক্ষণে প্রধানতঃ গবর্ণমেণ্টেব দাতব্যেব উপর নিভর কবিতে হইযাছে। কইম্বাটুর, আর্কট, ও নীলগিবি প্রভৃতি প্রদেশে অনেক সপ্তাহ ধবিয়া যৎসামান্য শস্য সংযোজনার উপর নির্ভব করিয়া লোকের প্রাণধাবণ কবিতে হইয়াছিল। এত শস্যের প্রয়োজন যে, যাহা সংগৃহীত হইয়া প্রেরিত হয়, তাহা আসিতে না আসিতেই যেন কোথায় চলিয়া যায়। যদিও এক্ষণে দিন দিন শস্যসংযোজনা বাড়িতেছে, তথাপি এখনও এত শস্যেব প্রয়োজন যে, ইহাতেও পর্য্যাপ্ত হইতেছে না। মহীশূরেরও অবস্থা এত শোচনীয় যে, এখান হইতে শস্য না পাঠাইলে চলিতেছে না। প্রাদেশিব কর্ম্মচারীদিগের কার্য্যবিবরণে আবও জানা গেল যে, মান্দ্রাজের কৃষিজীবী প্রজাগণ ই দুর্ভিক্ষে এতদূব ভগ্নহৃদয় হইয়াছে যে, তাহাবা কৃষিকার্য্যে সম্পূর্ণরূপে অমনোযোগী হইয়া পড়িয়াছে। গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য, এই শোচনীয় অবস্থা যতদূর সাধ্য নিবারণ করা এবং যাহাতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্যের সংযোজন ও বিতরণ হয়, তাহার বন্দোবস্ত করা। যদিও এই কার্য্য নিতান্ত লঘু নহে, তথাপি কর্ম্মচারীদিগের যত্নে ও ভাবত-বাণিজ্যের গৌরবে, বৎসরের প্রথমাদ্ধে অতি কষ্টে কথঞ্চিৎ শস্যসংযোজনা করা গিয়াছিল। কিন্তু একমাস পূর্ব্বে হঠাৎ দেখা গেল যে, এক সপ্তাহের বই খাদ্যসামগ্রী নাই। শস্যের মূল্য সুতরাং অসম্ভব বাড়িয়া উঠিল। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, এই সংবাদ চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হওয়ায় বাঙ্গালা এবং অন্যান্য প্রদেশ হইতে বণিক্‌দিগের অসাধারণ অধ্যবসায়ে প্রচুব শস্য আসিয়া পড়িল। কিন্তু খাদ্যাভাবই এখানকার প্রজাদিগেব একমাত্র কষ্ট নহে। আমি একবার প্রদেশেব অভ্যন্তরে নির্গত হইয়া দেখিলাম যে, প্রজাদিগের পরিধান-বস্ত্র নাই, চালের খড় দিয়া অনাহারে মরণোন্মুখ গোমেষাদির উদরপূরণ করা হইয়াছে। এ শোচনীয় দৃশ্যে পাষাণও বিগলিত হয়। গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত প্রজাদিগের সমস্ত অভাব পূরণ হওয়া দুষ্কর। যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, কোনখানেই প্রফুল্লতার চিহ্ন পরিদৃষ্ট হয় না, প্রত্যুত সর্ব্বত্রই দুঃখযন্ত্রণা ও অভাব উপলক্ষিত হয়। দীন ও দবিদ্র প্রজাদিগেব তৈজসপত্র বিক্রীত হইয়াছে, তাহাদিগের শেষ আশা—শস্যভাণ্ডাব ফুরাইয়াছে। তাহারা সমীপবর্ত্তী উপশমন-শিবিবে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। তাহাদিগকে স্ব স্ব গ্রামে রাখিবাব কোন প্রকাব প্রলোভনবস্তুই নাই। নূতন তৈজসপত্র, গো-মেষাদি ও অঙ্গাচ্ছাদন ক্রয় করিতে এবং ঘরের চাল প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে প্রজাদিগের যে ব্যয়ের প্রয়োজন, গবর্ণমেণ্ট হইতে তাহার সমস্ত নির্ব্বাহ হওয়া অসম্ভব। এই জন্য আমবা ইংলণ্ডীয় জনসাধারণের নিকটে অর্থসাহায্য চাহিতেছি। তাঁহাদের নিকটে দুর্ভিক্ষের প্রকৃত অবস্থা ও প্রজাদিগের দুঃখ-যন্ত্রণা শুদ্ধ ব্যক্ত করিলেও প্রচুর অর্থসাহায্য আসিবে। যখন ইংলণ্ডের জনসাধারণ শুদ্ধ জানিতে পারিবেন যে, ভারতের যে খণ্ড দুর্ভিক্ষে প্রপীড়িত হইয়াছে, তাহার পরিসর ইংলণ্ড অপেক্ষাও অধিকতর, যখন তাঁহাবা জানিতে পারিবেন যে, ইংলণ্ডে ভীষণতম দুর্ভিক্ষেব সময়েও শস্যের মূল্য যেরূপ বাড়িয়াছিল, এখানে শস্যেব মূল্য তাহা অপেক্ষাও অধিকতর দাঁড়াইয়াছে এবং ভারতেও পূর্ব্বে কখন

শস্যের মূল্য এতদূর বাড়ে নাই, তখন সাহায্য আপনি আসিয়া জুটিবে। বিগত দুর্ভিক্ষের সময়ে বঙ্গদেশে শস্যের মূল্য যেরূপ বাড়িয়াছিল, মান্দ্রাজে এ বৎসরে তাহা অপেক্ষা অনেক গুণে অধিক বাড়িয়াছে। সমস্ত মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর তিন ভাগের একভাগ এই ভীষণ দুর্ভিক্ষে প্রপীড়িত হইয়াছে। এই অভাব বিদুরিত করা মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর সাধ্যাতীত, এই জন্য আমাদিগের অন্যান্য প্রেসিডেন্সীর নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইতে হইতেছে।"

আমরা ডিউক্ অব্ বকিংহামের হৃদয়বিদারক বক্তৃতার সারমর্ম্ম প্রদান করিলাম; এক্ষণে মান্দ্রাজের সুবিখ্যাত ডাক্তার কর্ণিস বেলারী ও কার্ণল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকটে যে বিবরণ দিয়াছিলেন, পাঠকদিগের গোচরার্থ তাহার এক স্থানের মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল:—তিনি প্রজাদিগের সাধারণ অবস্থা দেখিয়া নিতান্ত দুঃখিত ও বিস্মিত হইয়াছেন। তাহারা কঙ্কালমাত্রে পরিণত হইয়াছে এবং দলে দলে উপশমন-শিবিরে বা অনাথ নিবাসে গমন করিতেছে। দুর্ভিক্ষের ভীষণতার এই আরম্ভ মাত্র। দিন দিন দুর্ভিক্ষের পরিসর বাড়িতেছে। শুষ্ক শস্যের অবস্থা আরও শোচনীয় হইতেছে। শীঘ্র যে উপশমন হইবে, তাহারও কোন আশা নাই। প্রজাসাধারণ এখন প্রদেশান্তরানীত শস্যের উপরই নির্ভর করিতেছে এবং আগামী জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত তাহাদিগকে এই প্রদেশান্তরানীত শস্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইবে। পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বৃষ্টি হয় নাই এবং অচিরাৎ অদ্যাপি পর্য্যাপ্তপরিমাণে বৃষ্টি না হইলে কৃষ্টভূমিতে চাষের আশা পরিত্যাগ করিতে হইবে, আগামী পাঁচ ছয় মাস দুর্ব্বহ কষ্ট-যন্ত্রণা উপস্থিত হইবে। সেই ভীষণ সময়ে দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত ব্যক্তিদিগকে শমন-সদন হইতে রক্ষা করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে ও জনসাধারণকে বদ্ধপরিকর থাকিতে হইবে।

সিবিল্ এবং মিলিটেরী গেজেটের মান্দ্রাজ পত্রপ্রেরক মান্দ্রাজ-দুর্ভিক্ষ বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন, তাহারও মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল—

"চতুর্দ্দিকে খৃষ্ট উপাসকমণ্ডলী বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাঁহারা উপসনায় বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে কোন উল্লেখই করিতেছেন না। অথচ তাঁহারা এই দুর্ভিক্ষের ও এই মহামারীর অভ্যন্তরে উদ্দীপনার যথেষ্ট সামগ্রী পাইতে পারেন। এই উপাসকমণ্ডলীর স্তোত্রে অদৃশ্য মানবশত্রু সয়তানের কথা অনেক শুনা যায়; কিন্তু মানবজাতির প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান শত্রু যে পীড়া, দুর্ভিক্ষ, মৃত্যু প্রভৃতি—তাঁহাদিগের স্তোত্রসকলে, তাহাদের ত কোন উল্লেখই দেখিতে পাই না।

"উৎকৃষ্ট চাউলের অভাবে ও শস্যের উচ্চমূল্য নিবন্ধন চতুর্দ্দিকে হাহাকার রব উঠিয়াছে। কোচিন হইতে যে সংবাদ আসিয়াছে, তাহা সাতিশয় মর্ম্মোপঘাতী; বেল্লারীর অবস্থা আরও শোচনীয় এবং ইহা অপেক্ষাও অধিকতর শোচনীয় হইবার সম্ভাবনা। সমস্ত মান্দ্রাজের অবস্থা ইহা অপেক্ষা আরও শোচনীয়তর দাঁড়াইবে, ইহা ভাবিতে গেলেও হৃদয় ফাটিয়া যায়। আমি একজন উপশমন-কর্ম্মচারীর মুখে শুনিলাম যে, লোক অনাহারে এরূপ উন্মত্ত ও কাণ্ডাকাণ্ডশূন্য হইয়াছে যে, দুই সহস্র কুলী অকারণে তাঁহাকে আক্রমণ করে। তিনি অতি কষ্টে তাহাদিগের হস্ত হইতে প্রাণ বাঁচাইয়া আসিয়াছেন। তিনি বলিলেন, এক দিন আমি ভ্রমণে যাইবার সময় দেখিলাম, দ্বাদশ জন ব্যক্তি মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। তাহাদিগের মাংসাদি শৃগাল-কুক্কুরে ভক্ষণ করিয়াছে, কয়খানি কঙ্কালমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। কোন কোন স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, শৃগাল-কুক্কুরে সমাধিনিহত মানবদেহ উত্তোলিত করিয়া ভক্ষণ করিতেছে। কল্য প্রত্যূষে মান্দ্রাজনগরে অশ্বারোহণে পরিভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলাম, গবর্ণমেণ্ট-প্রাসাদের রেলে পৃষ্ঠ দিয়া একটি কঙ্কাল মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে।"

এইরূপ অসংখ্য লোমহর্ষণ বিবরণ পাঠ করিয়া আমাদিগের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিতেছে। আমরা ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া জড়ের ন্যায় অবস্থিত রহিয়াছি।

আমরা শুনিয়া পরম আহ্লাদিত হইয়াছিলাম যে, মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষ উপশমিত হইয়াছে। কিন্তু সংপ্রতি মান্দ্রাজ হইতে প্রত্যাগত আমাদিগের একজন বন্ধুর নিকট অন্য প্রকার শুনিয়া

শোকে অধীর হইলাম। তিনি দুর্ভিক্ষ-চিকিৎসক নিযুক্ত হইয়া মান্দ্রাজে গমন করিয়াছিলেন। তিনি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন যে, মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষ কিছুমাত্র উপশমিত হয় নাই। যত দূর দৃষ্টি চলে, চতুর্দ্দিকেই মৃতদেহ অথবা অর্দ্ধমৃত কঙ্কাল পরিদৃষ্ট হয়। শয্যাগত না হইলে পরিশ্রমের বিনিময় ব্যতীত উপশমন-শিবিরে কোনপ্রকার সাহায্য পাইবার আশা নাই। পরিশ্রমের বিনিময়েও যে সাহায্য পাওয়া যায়, তাহাও অতি সামান্য—প্রত্যেক ব্যক্তি ছয় পয়সা পরিমাণে। আমরা আশ্চর্য্য হইলাম যে, টেম্পল সাহেবের অর্দ্ধাশন-নীতি অদ্যাপিও পরিত্যক্ত হয় নাই, যেখানে চাউল টাকায় আড়াই সের করিয়া, সেখানে ছয় পয়সায় এক পোয়া-পরিমিত চাউলও পাওয়া যায় না। অর্দ্ধসের চাউলের কমে দুই বেলা এক জনের চলিতে পারে না। এতদ্ভিন্ন কিছু উপলক্ষ্য চাই। সুতরাং ন্যূনতঃ চারি আনার কমে ঐরূপ দুর্ভিক্ষের সময়ে এক জনের চলিতে পারে না। গবর্ণমেণ্ট অর্দ্ধাশনে মান্দ্রাজবাসীদিগকে কঙ্কালাবিশিষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহারা এরূপ অবস্থায় দাড়াইয়াছে যে, ইংলণ্ডের অসামান্য বদান্যতাও বুঝি তাহাদিগকে আর রক্ষা করিতে পারিল না। যদি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আর ছয় মাস পূর্ব্বে ইংলণ্ডীয় ও ভারতবর্ষীয় জনসাধারণের নিকটে আপনাদিগের অক্ষমতা জানাইয়া সাহায্য-প্রার্থী হইতেন, তাহা হইলে, মান্দ্রাজ আজ মরুভূমি হইত না। ইংলণ্ডীয় জনসাধারণের অলোকসামান্য বদান্যতা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের এই অক্ষালনীয় পাপের যথোচিত প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে বটে এবং ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টও পূর্ব্বকৃত পাপের গুরুতর প্রায়শ্চিত্ত করিতেছেন বটে, কিন্তু তাহাতে দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িতদের অতি অল্পই উপকার হইতেছে। আমরা প্রত্যাগত বন্ধু-মুখে শুনিলাম যে, দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িতগণ এরূপ অবস্থায় আনীত হইয়াছে যে, কোন দৈবশক্তির সাহায্য ব্যতীত তাহাদের জীবনরক্ষা কিয়ৎ পরিমাণে অসাধ্যসাধন হইয়া উঠিয়াছে, বহু কালের অনশনে বা অর্দ্ধাশনে তাহাদের পাকস্থলী এরূপ ক্ষীণ হইয়া উঠিয়াছে যে, শুদ্ধ অন্নও তাহারা জীর্ণ করিতে পারে না। অন্ন পাইতেছে, আর ওলাউঠারোগে আক্রান্ত হইতেছে, উপশমন-শিবিরে এই জন্য প্রধানতঃ অন্নের কাঁজি বিতরিত হইতেছে। অন্ন জীর্ণ করিতে পারে না বটে, কিন্তু ইহাদের অন্ন-স্পৃহা এতদূর বলবতী হইয়াছে যে, কোন পথিক অন্নাহার করিতেছে দেখিলে অসংখ্য দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত আসিয়া তাহাকে বেষ্টন করে এবং তাহার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইতে চেষ্টা করে। আমাদিগের মান্দ্রাজ-প্রত্যাগত বন্ধু এক দিন কোন রেলওয়ে ষ্টেশনের সমীপবর্ত্তী বাজারে গমন করিয়া দেখেন যে, তথায় অর্দ্ধ-কাঁকর-মিশ্রিত মোটা চাউল টাকায় আড়াই সের করিয়া, কাঁচা লঙ্কা ও প্যাঁজ-মাত্র রহিয়াছে, আর কিছুই নাই। তিনি সে সকল লইয়াই কথঞ্চিৎ আহারীয় প্রস্তুত করিয়া আহার করিতে বসিয়াছেন, এমন সময়ে অসংখ্য দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত আসিয়া তাঁহার অন্নাগারের দ্বারে দণ্ডায়মান হইল। তাহাদিগের কাতরস্বরে ব্যথিত হইয়া তিনি অন্ন পরিত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন তাহাদিগকে প্রদান করিলেন। অমনি তাহাদিগের মধ্যে ঘোরতর সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। সকলেই সেই অন্নের প্রার্থী। পরস্পর সংঘর্ষে সেই তণ্ডুলরাশি ধুলায় পতিত হইল। অবশেষে সেই ধূলি-বিমিশ্রিত তণ্ডুল সকলেই এক একটি করিয়া খুঁটিয়া খাইতে লাগিল। আমাদিগের বন্ধু অভুক্ত ও অনিদ্রিত অবস্থায় অতিকষ্টে তথায় রাত্রিযাপন করিয়া প্রত্যূষে উঠিয়া দেখিলেন যে, রাত্রিতে যে সকল কঙ্কাল তাঁহার আহার কাড়িয়া লইতে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহারা চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়া ধরায় পতিত রহিয়াছে। এইরূপ ঘটনা প্রায় প্রতিদিনই তাঁহার নয়নগোচর হইত। উপশমন-শিবিরসকল এত দূরে দূরে অবস্থিত যে, এই সকল অর্দ্ধমৃত দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িতগণ যে তথায় হাঁটিয়া গিয়া সাহায্য লইবে, তাহার কোন আশা নাই।

এইরূপ ভীষণ অবস্থায় আমাদিগের কি করা কর্ত্তব্য? ইংলণ্ড অসামান্য বদান্যতা প্রদর্শন করিয়া জগতে অতুল কীর্ত্তি ও পরলোকে অক্ষয় পুণ্য লাভ করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয়েরা সে বদান্যতার এখনও একাংশও দেখাইতে পারেন নাই। কোন শ্বেতাঙ্গের উপাসনার জন্য আহূত হইলে তাঁহারা এত দিন অজস্র মুদ্রা বর্ষণ করিতেন, সন্দেহ নাই,

কিন্তু আজ তাঁহারা অসংখ্য ভ্রাতা-ভগিনীগণকে কালের করাল গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাহার শতাংশের একাংশের পরিমাণেও অর্থব্যয় করিতে নিতান্ত কুণ্ঠিত। গবর্ণমেণ্ট যদি এই কার্য্যের জন্য তাঁহাদিগের নিকট অর্থ সাহায্য চাহিতেন, তাহা হইলে এত দিন স্রোতঃসহস্র চতুর্দ্দিক হইতে অর্থরাশি আসিয়া উপস্থিত হইত; কারণ তাহা হইলে তাঁহাদিগের নিশ্চয় বিশ্বাস হইত যে, সে অর্থের বিনিময়ে তাঁহারা অবশ্যই রাজাবাহাদুর রায়বাহাদুর প্রভৃতি উপাধি ও রাজসম্মান পাইতে পারিবেন। কিন্তু অনাহূত দানে তাঁহাদিগের সে আশা পূরণের সম্ভাবনা কোথায়? আজ সে আশা নাই বলিয়া ভারত নিশ্চেষ্ট, ভারত জড়-পিণ্ডের ন্যায় এই ভীষণ লোমহর্ষণ ব্যাপার স্থির-ভাবে দেখিতেছে। রাজসম্মান পাইবার জন্য বা গবর্ণমেণ্টের প্রীতিভাজন হইবার জন্য দিল্লীর দরবার ও যুবরাজের আগমন উপলক্ষে প্রতি নগরে, প্রতি গ্রামে ও প্রতি গৃহে উৎসবে কত লক্ষ মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছে; কিন্তু আজ লক্ষ লক্ষ ভ্রাতা-ভগিনী মরিতেছে, আর আজ কিনা ভারত নীরব, ভারত নিশ্চেষ্ট!

ভ্রাতা-ভগিনীর মৃত্যুতে সমস্ত রুষক ও সমস্ত রুশিয়া গভীর শোকচিহ্ন ধারণ করিয়াছে; আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কৃষ্ণপরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছে; রমণীরা বসন ভূষণ ও বিলাস দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়াছে; বীরবৃন্দ অধরে হাস্য পরিহার করিয়াছেন; সমস্ত উৎসব আনন্দ পরিত্যক্ত হইয়াছে—তথাপি রুস যুদ্ধে মৃত্যুসংখ্যা অদ্যাপি এক লক্ষ অতিক্রম করে নাই। কিন্তু আজ সমস্ত মান্দ্রাজবাসী মৃত বা অর্দ্ধমৃত স্থাবর বা জঙ্গম কঙ্কাল—কিন্তু ভারত কি শোক-চিহ্ন ধারণ করিয়াছেন? আমরা দুর্গোৎসবের উৎসাহ ত এ বৎসর কিছু কম দেখিতেছি না। সমস্ত ভারতবাসী দুর্গাপূজার উৎসবে মাতিয়া উঠিয়াছেন। তাঁহারা যদি এক দিনও মান্দ্রাজের জন্য শোকোন্মাদ দেখাইতে পারিতেন, তাহা হইলেও ভাবিতাম, ভারতের আশা আছে; তাহা হইলেও ভাবিতাম, স্বজাতিপ্রেম ও স্বদেশানুরাগের স্ফুলিঙ্গও ভারত-শরীরে অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। কিন্তু যখন এক অঙ্গে এরূপ গুরুতর আঘাত লাগিতেও ভারতের চৈতন্য হইল না, অঙ্গান্তরে যাতনা অনুভূত হইল না, তখন আর ভারতের কি আশা?

ভারতবাসিগণ! এখনও মোহনিদ্রা পরিত্যাগ করুন্। যে শ্বেতাঙ্গ জাতিকে আপনারা বিজেতা বলিয়া অন্তরের সহিত ঘৃণা করেন, তাঁহাদিগের উদার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করুন্। মান্দ্রাজের সহিত তাঁহাদিগের স্নেহবিজড়িতভাবে মাত্র সহানুভূতি। তাহাতেই তাঁহাদিগের বদান্যতা সহস্র স্রোতে প্রবাহিত হইয়াছে। যে জাতি শত শত যোজন দূরে সাগরপারে অবস্থিত এবং জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণে বিভিন্ন হওয়ায় বৈদেশিক বিজিতগণের দুঃখে এত দূর কাতর হইতে পারেন, সে জাতিচরণে আমাদিগের কোটি কোটি নমস্কার। কিন্তু যে জাতি অদূরে অবস্থিত, এক মাতৃ-ভূমির ক্রোড়ে লালিত এবং জাতি ধর্ম্ম-বর্ণে অভিন্ন, ভ্রাতা ভগিনীগণের দুঃখে ও মরণে উদাসীন—সে জাতি জগতের ঘৃণার পাত্র, সে জাতির ভার বসুন্ধরারও অসহ্য। স্বদেশীয় ভ্রাতা-গণ! যদি দুরপনেয় কলঙ্ক অপনয়ন করার ইচ্ছা থাকে, তবে আসুন, আমরা সমস্ত ভারতবাসী অসংখ্য মান্দ্রাজবাসী ভ্রাতা-ভগিনীদিগের অনশনের জ্বালা অনুভব করিবার জন্য অন্ততঃ এক দিনও উপবাস করি। তাহা হইলে, আমাদিগের অসন্দৃক্ষিত সহানুভূতি উদ্দীপিত হইবে এবং সমস্ত ভারতবাসীর এক দিনেরও আহার মান্দ্রাজে প্রেরিত হইয়া অসংখ্য প্রাণীর প্রাণরক্ষা করিবে।

মান্দ্রাজ পরিত্যাগ করিলেও ভারতে প্রায় ১৬ কোটি লোকের বাস। প্রত্যেক ব্যক্তির একদিনের আহারের মূল্য গড়ে ।০ আনা করিয়া ধরিলেও ষোল কোটি লোকের আহারের মূল্য চারি কোটি হয়। চারি কোটি টাকা যদি প্রকৃত প্রস্তাবে উপশমনে ব্যয়িত হয়, তাহা হইলে, অসংখ্য প্রাণীর প্রাণ রক্ষা হইতে পারে। বেতনভুক্ অর্থগৃধ্নু গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীর হস্তে সেই অর্থভার সন্ন্যস্ত না করিয়া যদি কতিপয় অবৈতনিক ব্রতব্রত মনীষীর হস্তে এই কার্য্যের ভার অর্পণ করা যায়, তাহা হইলেই প্রকৃত ফল-লাভের সম্ভাবনা। এই বিশাল ভারতক্ষেত্রে—যেখানে পারলৌকিক ধর্ম্মের জন্য অসংখ্য মনীষী সন্ন্যাস অবলম্বন করিতেছেন, অসংখ্য মনীষী অতীত মানব আত্মত্যাগ করিতেছেন—সেই বিশাল ভারতক্ষেত্রে কি এমন এক সহস্র মনীষীও দুর্লভ—যাঁহারা ঐহিক ধর্ম্মের জন্য—অসংখ্য ভ্রাতা-ভগিনীর প্রাণরক্ষার জন্য—অন্ততঃ তিন মাসের

জন্য দুর্ভিক্ষ উপশমনরূপ পবিত্রতম ও গুরুতম ব্রত গ্রহণ করেন? শাক্যসিংহ ও চৈতন্যের জন্মভূমি কি সন্ন্যাসিশূন্য হইবে? এ কথা বিশ্বাস হয় না! এ কথা ভাবিতেও কষ্ট হয়!

আর ভারত-বিধবাগণ! আপনাদিগের চির-ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতের উদ্‌যাপনের এমন সুযোগ আর কখন ঘটিবে না। আপনারা পুণ্য-কার্য্যের অনুষ্ঠানের জন্য কখন অভিভাবকদিগেরও মুখাপেক্ষা করেন না! কাশী, গয়া, জগন্নাথ প্রভৃতি গমনের সময় সহস্র সহস্র বাধা-বিপত্তিও আপনাদিগের গতি-রোধ করিতে সমর্থ হয় না। তীর্থ-পর্য্যটনের জন্য আপনারা মৃত্যুমুখে পতিত হইতেও সঙ্কুচিত হন না। মান্দ্রাজের ন্যায় তীর্থস্থল আপনাদিগের ভাগ্যে আর কখন জুটিবে না। আপনারা দলে দলে চিরসঞ্চিত সম্বলসহ তথায় উপস্থিত হউন। আপনাদিগের স্নেহময় করস্পর্শে অসংখ্য বালক-বালিকা, অসংখ্য যুবক-যুবতী ও অসংখ্য বৃদ্ধ-বৃদ্ধা অনুপ্রাণিত হইবে। আপনাদিগের দেবীমূর্ত্তি দেখিয়া দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগের অন্তরে আবার জীবনাশা উদ্দীপিত হইবে। তাহারা যে এক্ষণে শুদ্ধ আহারপ্রার্থী, এরূপ নহে, শুশ্রূষাও এক্ষণে তাহাদিগের জীবনরক্ষার প্রধান উপযোগী। যখন বিংশ সহস্র তুরস্ক রমণী আহত তুরস্ক সৈন্যগণের শুশ্রূষার নিমিত্ত সমরক্ষেত্রে গমনে উদ্যত হইয়াছিলেন, তখন ব্রহ্মচর্য্য ও সন্ন্যাসের আদর্শভূমি ভারতক্ষেত্রে কি অন্যূন এক সহস্রও ব্রতধারিণী পাওয়া যাইবে না? পাওয়া যাইবে না—আমাদিগের এরূপ বিশ্বাস হয় না! আমাদিগের বিশ্বাস—এই ব্রতের গুরুত্ব তাহাদিগের হৃদয়ঙ্গম করাইতে পারিলেই তাঁহারা অকুতোভয়ে ইহাতে আত্মসমর্পণ করিবেন।

এইরূপ অসংখ্য ব্রতধারিণী মনীষিণী ও অসংখ্য ব্রতধারী মনীষী দেশীয় কোষ হস্তে মান্দ্রাজ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ না হইলে, আর মান্দ্রাজ দুর্ভিক্ষ উপশমনের কোন আশা নাই। গবর্ণমেণ্ট নিজ কর্ম্মচারী-দিগের রিপোর্টের উপর বিশ্বাস করিয়া প্রচার করিতেছেন যে, মান্দ্রাজ দুর্ভিক্ষ অনেক পরিমাণে উপশমিত হইয়াছে। কিন্তু আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি যে, দুর্ভিক্ষের কিছুমাত্র উপশম হয় নাই। উপশমনকেন্দ্র সকল এত দূরে দূরে অবস্থিত যে, অভ্যন্তরাস্থিত অধিবাসীরা সে সকলের কোনও সাহায্য পাইতে পারে না। তাহারা অনশনে ও বিনা শুশ্রূষায় আপন আপন কুটীরে সমাধি-নিহত হইতেছে। এইরূপে কত লোক মরিতেছে, গবর্ণমেণ্টের নিকট তাহার সংবাদ পর্য্যন্তও আসিতেছে না। উপশমন-কেন্দ্র সকলের মৃত্যুসংখ্যা লইয়াই প্রায় গবর্ণমেণ্ট দুর্ভিক্ষের মৃত্যুসংখ্যা নির্ণয় করিতেছেন।

আমাদিগের অভীপ্সিত ব্রতধারী ও ব্রতধারিণী-গণ জাতীয় ভাণ্ডার হস্তে সেই সকল অভ্যন্তরবাসী দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগের শুশ্রূষায় নিরত হউন। যদি তাঁহারা এক শতের মধ্যে একজনকেও বাঁচাইতে পারেন, তাহা হইলেও তাঁহাদিগের পুণ্যের ইয়ত্তা নাই।

ভারতবাসী ধনিবৃন্দ! আপনারা গবর্ণমেণ্টের রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া এরূপ মুমূর্ষু সময়ে নিদ্রিত থাকিবেন না। অক্ষয় কীর্ত্তি সঞ্চয়ের এমন সুবিধা সহসা পাইবেন না। আপনা-দিগের অর্থের সদ্ব্যয়ের এরূপ সুযোগ সহসা জুটিবে না। আপনারা ইংলণ্ডের ধনিবৃন্দের অত্যুদার দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তন করুন্। আর্য্যনামের গৌরব রক্ষা করুন্। ভারতের একাঙ্গ রসাতলে যাইতেছে—তাহার উদ্ধারসাধন করুন্।

ভারত সভা *

যখন ভারত-সভা প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন আমরা 'ভারতের ভাবী পরিণামে' ইহার ভাবী পরিণাম কি হইবে, অগ্রেই বলিয়া দিয়াছিলাম। অধুনা বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী, ভিন্ন সমাজবন্ধন, অসংখ্য ভাষা-কথনশীল ও নানা পরিচ্ছদ পরিশোভিত ভারতের মিশ্র-অধিবাসিবৃন্দের পরস্পর-মিলনের একমাত্র উপায় 'ভারত-সভা।' আমরা প্রথম হইতেই ইহার যে গতি নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলাম, ইহা ধীর ও নিশ্চিন্ত পদবিক্ষেপে ঠিক গতিপথে চলিতেছে। সমস্ত ভারতকে একটি কেন্দ্রীভূত রাজনৈতিক সমাজের সহিত গ্রথিত করিতে ইহা বিবিধ চেষ্টা ও উপায় উদ্ভাবন করিতেছে। ইহার

* The Third Annual Report of the India Association, 1878-79.

প্রচারকগণ নানা স্থানে গিয়া উদ্দীপনা-বাক্যে তত্রত্য অধিবাসিবৃন্দকে কেন্দ্রীভূত সভার সহিত সূত্রবদ্ধ করিতেছেন। সমস্ত ভারত যেন ক্রমে ঘনীভূত হইতেছে। কলিকাতা, এলাহাবাদ, লাহোর, বোম্বে ও মান্দ্রাজ—যেন একসূত্রে সংবদ্ধ হইতেছে। এ সূক্ষ্ম সূত্র সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি ভিন্ন এখনও সকলে দেখিতে পাইতেছেন না বটে, কিন্তু কালে যখন ইহা স্থূলতর ও বন্ধন গাঢ়তর হইবে—তখন ইহা সকলেরই দৃষ্টিগোচর হইবে। ভারত-সভা বিলাতের হাউস্ অব কমন্সের প্রতিরূপ; এবং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভা হাউস্ অব্ লর্ডের প্রতিরূপ। যখন ইংলণ্ডে পার্লিয়ামেণ্টের প্রথম সৃষ্টি হয়, তখন হাউস্ অব্ কমন্সের অস্তিত্ব ছিল না। ইংলণ্ডের রাজারা কোন বিষয়ে কোন পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে হইলে, কেবল ব্যারণ বা ভূম্যধিকারিগণকে ডাকিয়া তাঁহাদিগের সহিত পরামর্শ করিতেন। লোকসাধারণের প্রতিনিধিগণকে তাঁহারা পরামর্শ করিবার যোগ্য-পাত্র বলিয়া মনে করিতেন না। কিন্তু প্রকৃতির গতি কে রোধ করিতে পারে? অসংখ্য লোকের সুখ-দুঃখের নিয়মন অতি অল্প সংখ্যক লোকের হস্তে থাকা অস্বাভাবিক। তাহাতে অবিচার ও পক্ষপাত হইবেই হইবে। অসংখ্য লোকের রক্তশোষণ করিয়া অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তি বা পরিবার অস্বাভাবিকরূপে পরিতুষ্ট হইবে এবং সাধারণ লোক অনাহারে জীর্ণ শীর্ণ কলেবর হইবে, এইরূপ অবস্থা অধিক দিন চলিতে পারে না। লোকে বহুকাল নিমীলিতনেত্রে থাকিতে পারে না। ক্ষুধার জ্বালায় ও অবিচারের কশাঘাতে তাহারা উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠে। তখন অন্তর্বিপ্লবে ইংলণ্ডীয় প্রজাগণ ক্রমেই অপহৃত প্রাকৃতিক স্বত্ব সকল পুনঃপ্রাপ্ত হইতেছেন। হাউস্ অব্ কমন্স টিউডার রাজবংশীয়গণের সময় পদে পদে অপমানিত ও তিরস্কৃত হইত। সেই হাউস্ অব্ কমন্সই এখন ইংলণ্ডে সর্ব্বেসর্ব্বা। এখন ইহার প্রতাপে হাউস্ অব লর্ডস্ কম্পিত-কলেবর। অচিরকালমধ্যেই বোধ হয় হাউস্ অব লর্ডস্ হাউস্ অব কমন্সের কুক্ষিগত হইবে। আমেরিকাতে হাউস্ অব কমন্স ও হাউস্ অব লর্ডস্ বলিয়া দুইটি স্বতন্ত্র সভা নাই। একটিমাত্র সভা সমস্ত জাতির প্রতিনিধি। ইহাতে সকল শ্রেণীর লোকই সমানভাবে বসিয়া স্বদেশের মঙ্গলসাধন ও ব্যবস্থাপন-কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। ফ্রান্সের গবর্ণমেণ্টও এই আদর্শে সংগঠিত হইয়াছে। এই বিশ্বজনীন সাম্যের ভাব সর্ব্বপ্রথমে ফ্রান্সেই আবির্ভূত হয়। ফ্রান্স হইতে আমেরিকায় যাইয়া পরিশোধিত হইয়া আবার বিশুদ্ধ অবস্থায় ফ্রান্সে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছে। ইংলণ্ডের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা জাতীয় গবর্ণমেণ্টকে আমেরিকা ও ফ্রান্সের আদর্শে গঠিত করিতে সমুৎসুক হইয়াছেন। কত দিনে তাঁহারা যে কৃতকার্য্য হইবেন, তাহা কেহ বলিতে পারে না। যাহা হউক, যখন সভ্যতার অধিকতম সমুজ্জ্বল জাতি সকল বৈষম্যের ভিত্তিভূমি-স্বরূপ ব্যবস্থাপক ও নিয়ামক সভায় ঐকতানিকতা সম্পাদন করিয়াছেন বা করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন, তখন ভারতবর্ষ সেই পরিত্যক্ত সৌধের উপর রাজনৈতিক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে কেন ইচ্ছা করিতেছেন? যখন বিশ্বজনীন একতার নিতান্ত প্রয়োজন, তখন জমীদারগণ লৌকিক সমাজের সহিত মিলিত হইয়া কার্য্য করিতে স্বীকৃত না হন কেন? দাসগণের মধ্যে আবার ছোট বড় ভেদ কেন? জমীদারগণ ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান সভা নামক একটি স্বতন্ত্র সভা না রাখিয়া ভারতসভার সহিত সম্পূর্ণ মিলিত হইলে, জাতীয় উদ্দীপনাকার্য্য কত শীঘ্র সম্পাদিত হইতে পারে, তাহা বোধ হয়, তাঁহারাও বুঝেন। তবে আর কেন বৃথা অভিমানভরে এরূপ বিচ্ছিন্নভাবে কার্য্য করিয়া আপনাদিগের কার্য্যকরণশক্তির অপব্যবহার করেন? তাঁহাদিগের অর্থ লোক-তান্ত্রিকদলের অধ্যবসায় ও উৎসাহবত্তা একত্র সম্মিলিত হইলে, জাতীয় সমন্বয়কার্য্য অতি শীঘ্র সম্পাদিত হইতে পারে। ভারত-সভার অধ্যবসায় ও উৎসাহ অমিত, কিন্তু ইহার অর্থ নাই। জমীদারসভার অর্থ আছে, কিন্তু তত দূর উৎসাহ অধ্যবসায় নাই। এই দুই একত্র মিলিত হইলে, ভারতের আর কি অভাব? প্রজাগণের সহিত—জনসাধারণের সহিত জমীদারগণের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাঁহাদিগের উচ্ছেদ বৈ মঙ্গল নাই। লোকসাধারণ তাঁহাদিগের উচ্ছেদ-সাধন করিতে পারিবে, কিন্তু তাঁহারা কখন লোকসাধারণের উচ্ছেদ সাধন করিতে পারিবেন না। ভারতসভা সর্ব্বশুদ্ধ পোনরটি শাখা প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছেন। তন্মধ্যে বারটি বঙ্গে, দুইটি উত্তর-পশ্চিম-বিভাগে ও একটি

পঞ্জাবে। মান্দ্রাজ ও বম্বে এখনও ভারত-সভার অন্তর্ভুক্ত হন নাই। কিন্তু তাঁহারা সকল সাধারণ-বিষয়েই ভারত-সভার সহিত ঐকতানে কার্য্য করিতেছেন। তাঁহাদিগের সহানুভূতির অপ্রতুল নাই। তবে তাঁহারা প্রাদেশিক অভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া এখনও মাধ্যমিক সমাজের অধীনতা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন। কিন্তু তাঁহাদিগের জানা উচিত যে, ভারতে পূর্ণ একতা সংস্থাপিত করিতে হইলে আমাদিগকে সর্ব্বাগ্রে কোন মাধ্যমিক সভার অন্তর্ভুক্ত হইতে হইবে। জাতীয়শক্তির কেন্দ্রীকরণ ভিন্ন জাতীয় শৃঙ্খলা ও একতা সম্ভবপর নয়।

গত বৎসর ভারতসভা কয়টি গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। বৈদেশিক শাসনের বিষময় ফলে আমরা সর্ব্বপ্রকার উচ্চপদ হইতে বঞ্চিত। কোন বিভাগেরই শীর্ষস্থানীয় হইতে আমাদিগের কোন অধিকার নাই। যেন বিধাতা আমাদিগকে শ্বেতপুরুষের অধীন থাকিবার নিমিত্তই সৃষ্টি করিয়াছেন। রোম যখন গ্রীসের স্বাধীনতা হরণ করেন, তখন গ্রীসেরও এইরূপ দুরবস্থা ঘটিয়াছিল। গ্রীকেরা বুদ্ধিমত্তা ও পাণ্ডিত্য রোমীয়গণ অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তথাপি তাঁহাদিগের প্রতি অতি সামান্য সামান্য কার্য্যের ভার ন্যস্ত থাকিত মাত্র। আমরা বুদ্ধিমত্তা ও পাণ্ডিত্যে ইংরাজদিগের শ্রেষ্ঠ না হই, সুশিক্ষিতদলের অনেকেই তাঁহাদিগের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ। যদি সিবিল সার্ব্বিস্ পরীক্ষা ভারতে গৃহীত হইত, যদি ইংরাজদিগকে ভারতে আসিয়া পরীক্ষা দিতে হইত, তাহা হইলে বোধ হয় তীক্ষ্ণবুদ্ধি বাঙ্গালী কভেনেণ্টেড সার্ব্বিস একচেটিয়া করিয়া লইত। বিলাতে পরীক্ষা গৃহীত হওয়ায়, সে সার্ব্বিসের দ্বার অধিকাংশেরই নিকট রুদ্ধ হইয়াছিল। দুই চারিজন করিয়া প্রতি বৎসর সার্ব্বিসের জন্য যাইতেছিল; তাহারা প্রায় অধিকাংশই দেশীয় বিশ্ববিদ্যালয় সকল হইতে পরীক্ষিত। যাহা হউক, পূর্ব্বে বয়সকাল একবিংশতি বৎসর নির্দ্দিষ্ট থাকায়, তবু দুই চারি জন করিয়া প্রতি বৎসর যাইতেছিল এবং তাহার মধ্যে অনেকেই কৃতকার্য্যও হইতেছিল। কিন্তু এখন বয়সকাল অষ্টাদশ বৎসর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহার অর্থ, ভারতবর্ষীয়দিগকে আর কভেনেণ্টেড সার্ব্বিস্ দেওয়া হইবে না; কারণ, কোন্ অভিভাবক সপ্তদশবর্ষীয়, একাকী ও অসহায় বালককে সেই দূরদেশে প্রেরণ করিবেন? সুতরাং সে দ্বার ভারতবাসিগণের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়াছে বলিতে হইবে।

স্থিতিশীল গবর্ণমেণ্ট ব্যথিত ভারতবাসিগণকে ভুলাইবার জন্য একটি উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "ভারতবাসিগণকে অনেক অর্থব্যয়ে ও জাতীয় নির্যাতন সহিয়া বিলাতগমন করিতে হয়। লাভের সহিত তুলনায় যে ক্ষতি হয়, তাহার পূরণ হয় না। অতএব এখন হইতে তাহাদিগকে আর সে কষ্ট লইতে হইবে না। এখন হইতে ভারতে থাকিয়াই তাহারা অভীষ্টলাভ করিবে।" এই কথায় প্রথম প্রথম অনেকেই ভুলিয়াছিলেন, কিন্তু ভারতসভা তাহাতে ভুলিবার নন। ভারতসভা জানিতেন, ইহারই অভ্যন্তরে কোন গূঢ় অভিসন্ধি প্রচ্ছন্ন আছে; তাঁহারা জানিতেন যে, আন্দোলনকারিগণের মুখ বন্ধ করিবার নিমিত্তই তাঁহারা এই সাময়িক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। তাঁহারা জানিতেন যে, দুই একটি অযোগ্য পাত্রে সেই উচ্চ কার্য্যভার ন্যস্ত করিয়া তাহারা অক্ষম হইলে, তাহাদিগের অক্ষমতা লইয়া তাহারা বিশেষ আন্দোলন করিবেন এবং প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিবেন যে, ভারতবাসী এখনও উচ্চপদের যোগ্য হয় নাই। এই জন্য ভারতসভা প্রথম হইতেই এ প্রস্তাবে অসম্মতিপ্রকাশ করিলেন। তাঁহারা অনুগ্রহ চাহেন না, প্রতিদ্বন্দ্বিতা চাহেন। কারণ, তাঁহাদিগের মতে অনুগ্রহলব্ধ সৌভাগ্য, জাতীয় অধঃপতনের লক্ষণমাত্র। বিজেতৃ জাতির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা-সমরে অবতীর্ণ হইয়া বিজেতৃ হইয়া—তাঁহারা জাতীয়-গৌরব রক্ষা করিতে চাহেন। এই জন্য তাহারা স্থিতিশীল গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে পার্লামেণ্টে আবেদন করিবার নিমিত্ত এক জন প্রতিনিধি পাঠাইতে কৃত-সঙ্কল্প হন। সকলেই জানেন, প্রসিদ্ধনামা লালমোহন ঘোষ সেই প্রতিনিধিত্বপদে অভিষিক্ত হন। প্রতিনিধি পাঠাইতে যে বিপুল অর্থব্যয় হয়, তাহার জন্য ভারতসভাকে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে হইয়াছিল। হিমালয় হইতে কুমারিকা সিন্ধু হইতে ব্রহ্মদেশ সমস্ত ভারত একবাক্যে ভারতসভার এই উদ্যোগের অনুমোদন করেন। ইহার ফল আর কিছুই না হউক,

ভারতের গ্রন্থনসূত্র স্থূলতর হইয়াছে। ভারত যে একতানে কার্য্য করিতে পারেন, তাহার প্রমাণ হইয়াছে।

ভারতসভা দ্বিতীয়তঃ মুদ্রাযন্ত্র বিধির বিরুদ্ধে সবিশেষ আন্দোলন করিয়া উন্নতিশীল দলের অনেক সহায়তা করিয়াছিলেন। স্থিতিশীলদল ভারতে কিরূপ অপ্রিয় হইয়াছিলেন, ভারতসভা এরূপ আন্দোলন না করিলে ইংলণ্ডের নির্ব্বাচকেরা কিছুতেই তাহা জানিতে পারিতেন না, তাহা হইলে, নির্ব্বাচনকালে তাঁহাদিগের হৃদয় কোন্ দিকে লীন হইত, কে বলিতে পারে? মুদ্রাযন্ত্র-বিধির ব্যবস্থাপনের পর ভারত-সভা ভারতের গগন বিদারিয়া এইরূপ আন্দোলন না করিলে, ইহার পরিশোধন হইত কি না সন্দেহ। তাহা না হইলে সেই কঠোর বিধি কার্য্যে প্রযুক্ত হইয়া দেশ রসাতলে দিত, সাহিত্য-রাজ্য ছারখার করিত সন্দেহ নাই।

ভারতসভা আফগান্-যুদ্ধের ব্যয়ভার ভারতের স্কন্ধে ন্যস্ত করা ন্যায়বিগর্হিত -ইহা প্রতিপন্ন করিয়া পার্লামেণ্টে আবেদন করেন। ভারতসভার ক্রন্দনে পার্লামেণ্টের হৃদয় কাঁদিয়াছে কি না জানি না; তবে অন্ততঃ এই উপকার হইয়াছে যে, সেই মহতী সভার সভ্যেরা এখন জানিতে পারিয়াছেন, ভারতবাসীরা অন্তরের দুঃখ সাহস করিয়া প্রকাশ করিতে শিখিয়াছে। সম্মুখে কাতরস্বরে কাঁদিলে অতি পাষাণহৃদয়ও বিগলিত হয়। একবার দুইবার তিনবার—সে ক্রন্দন উপেক্ষা করিতে পারে, কিন্তু চতুর্থবারে—সে ক্রন্দন না শুনিয়া আর থাকিতে পারে না। সুতরাং এইরূপ বার বার ক্রন্দন করিতে করিতে আমরা একদিন নিশ্চয়ই সিদ্ধকাম হইব।

আমরা বোধ হয়, অনেকেই জানি, আমাদের লজ্জানিবারণের জন্য ইংরাজেরা আমাদিগের দেশ হইতে তুলা লইয়া গিয়া কাপড় বুনিয়া আমাদিগের জন্য ভারতে আনিয়া থাকেন। ইংরাজেরা আমাদিগকে কাপড় না দিলে, আমাদিগকে উলঙ্গ থাকিতে হইবে, ইহা অপেক্ষা আমাদিগের লজ্জার বিষয় আর কি কিছু আছে? জাতীয় অধঃপতনের ইহা অপেক্ষা অধিকতর প্রমাণ আর কি হইতে পারে? কিন্তু অপ্রিয় হইলেও ইহা অকাট্য সত্য যে, আমরা এ বিষয়ে অতি অসভ্য জাতিরও অধম। ইংরাজেরা কলে কাপড় বুনিতে পারেন বলিয়া আমাদিগের তন্তুবায়গণ অপেক্ষা অনেক সস্তায় কাপড় দিতে পারেন। এই জন্যই আমাদিগের তন্তুবায়কুল ক্রমেই নির্ম্মূল হইয়া যাইতেছে। ভারতের তন্তুবায়কুলকে রক্ষা করিবার জন্য একটি Protection Duty সংস্থাপিত হয়। ভারত হইতে ম্যানচেষ্টারে যত তুলা যায়, তাহার উপর কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে শুল্ক ধার্য্য করিলে বিলাতী কাপড়ের দর চড়িয়া যাইতে পারে, তাহা হইলেই দেশীয় কাপড় পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু অধিক কাটিতে পারে, সুতরাং ভারতের তন্তুবায়কুল একেবারে নির্ম্মূল হয় না এবং রাজস্বেরও বিশেষ বৃদ্ধি হয়। এইরূপ সঙ্গত উপায়ে রাজস্ববৃদ্ধি হইলে প্রজাদিগের প্রতি অযথা করস্থাপনের প্রয়োজন হয় না। কোন দুর্ব্বল জাতিকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবার জন্য স্বাধীন বাণিজ্যের গতিরোধ করিয়া বহির্বাণিজ্যের উপর যে করস্থাপন করা হয়, তাহারই নাম রক্ষা-কর; যেমন কোন পালওয়ানের সহিত মল্লযুদ্ধে দুর্ব্বলের প্রাণসংশয়, সেইরূপ অতি উন্নতিশীল জাতির সহিত স্বাধীন বাণিজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভারতের মত দুর্ব্বল জাতির প্রাণধ্বংসের সম্ভাবনা। এই জন্য রক্ষা-কর আমাদিগের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। লর্ড নর্থব্রুকের সময়ে স্যালিসবরী যখন রক্ষাকর উঠাইয়া দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন, তখন সেই সহৃদয় গবর্ণর জেনারেল ভারতের ভাবী দুঃখ অনিবার্য্য ভাবিয়া নিজের কর্ত্তব্য-বুদ্ধির প্ররোচনায় অসময়ে নিজের কার্য্য হইতে অবসৃত হন। যে ব্যক্তি সেই দুরূহ কার্য্য কার্য্যে পরিণত করিতে সমর্থ, তাঁহারই হস্তে ভারতের ত্রিশ কোটি অধিবাসীর অদৃষ্ট সমর্পিত হইল। সকলেই জানেন, এই নৃশংস কার্য্য লর্ড লীটন আসিয়া এক দিনে সম্পন্ন করিলেন।

এই রক্ষা-কর ভারতে পুনঃ প্রতিষ্ঠাপিত করিবার জন্য ভারত-সভা পার্লামেণ্টে আবেদন করেন। ইহারও ফল অব্যবহিত কিছু না হউক, ব্যবহিত কিছু আছেই সন্দেহ নাই।

সমাপ্ত

বিজ্ঞাপন

স্কুলসমূহের সুবিখ্যাত ইন্‌স্পেক্টর পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কথামত আমি এই জীবনী-মালা লিখিতে আরম্ভ করি। ইহা স্কুল-সমূহের পাঠ্য-পুস্তকরূপে নির্দ্দিষ্ট হইবে, এই আশা পাইয়া আমি এই জীবনীগুলি কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত করিয়া লিখি। এই সকল মহাপুরুষগণের বিস্তৃত জীবনী স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে বাহির করিতেছি বলিয়া এই সংক্ষেপ-ভাবে আমার ক্ষোভ জন্মে নাই, বিশেষতঃ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ঘটনারাশিতে বালকের অপরিপক্ক স্মৃতি-শক্তিকে ভারগ্রস্ত করা অবিধেয় মনে করিয়া এই সকল জীবনীতে কেবল স্থূল স্থূল ঘটনার চিত্র প্রদান করিয়াছি। যে যে মহাত্মার চরিত্রের যে যে অংশ পাঠ করিলে "আত্মোৎসর্গ" শিক্ষা হয়, সেই সেই অংশ উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়াছি। উপযুক্ত পুস্তকাভাবে আরও কয়েকটি মহাপুরুষের চিত্র অঙ্কিত করিতে পারি নাই। দ্বিতীয়বার সেগুলি অঙ্কিত করিব ইচ্ছা রহিল।

এক্ষণে শিক্ষাসমিতি, শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ ও সাধারণে আমার এই উদ্যমের উৎসাহ বর্দ্ধন করিলে আমি আপনাকে কৃতার্থ মনে করিব।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
গ্রন্থকার।

দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন

'আত্মোৎসর্গের' যে অংশটুকু বালকগণের পাঠনার যোগ্য নয় বলিয়া পুস্তক সমিতির কোন কোন সভ্য আপত্তি তুলিয়াছেন, তাহা পরিত্যাগ করিয়া বালকগণের জন্য শুদ্ধ প্রাতঃস্মরণীয় চরিতমালা নাম দিয়া এই স্বতন্ত্র পুস্তক প্রকাশ করা গেল। কোন কোন ইন্‌স্পেক্টরের উপদেশানুসারে আত্মোৎসর্গের উদ্দীপনা অংশগুলিও কিছু কিছু পরিত্যাগ করা গেল, দুইখানি বই-ই স্বতন্ত্র প্রচারিত হইবে। সাধারণের অসুবিধা-নিবারণের জন্য উভয় গ্রন্থের স্বতন্ত্র নামকরণ ও স্বতন্ত্র মূল্য নির্দ্ধারণ করা হইল। প্রাতঃস্মরণীয় চরিতমালায় মহাদেব ও খৃষ্ট ভিন্ন আত্মোৎসর্গের আর সমস্ত মহাত্মারই নাম সঙ্কীর্ত্তন করা হইয়াছে। তাঁহাদিগের নামের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। বিশ্বামিত্র। ২। শাক্যসিংহ। ৩। গুরুগোবিন্দ। ৪। চৈতন্য। ৫। ওয়ালেস। ৬। টেল। ৭। হ্যাম্‌ডেন। ৮। উইলবারফোর্স। ৯। হাউয়ার্ড। ১০। রোমিলী। ১১। গ্যারিবল্ডী। ১২। ম্যাট্‌সিনি। ১৩। ওয়াসিংটন।

চুচুড়া ৩০শে আশ্বিন ১২৮৩। গ্রন্থকার।

মুখবন্ধ

আত্মোৎসর্গের লীলা-স্থলী ভারতে আজ "আত্মোৎসর্গ" নুতন কথা বলিয়া বোধ হইবে। যে ভারতে একদিন আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা আত্মোৎসর্গের দীক্ষাগুরু ছিলেন, আজ সেই ভারতে আত্মোৎসর্গ শিক্ষা দিবার জন্ম বৈদেশিক মহাপুরুষগণের উজ্জল চরিত্র পতিত ভারতবাসীগণের সম্মুখে ধরিতে হইল, ইহা অপেক্ষা ক্ষোভের বিষয় আর কি হইতে পারে? পুরাকালীন স্বজাতিপ্রেমিক বা বিশ্বপ্রেমিক মহাপুরুষগণের জীবনী-রত্ন অতল কালসাগরে নিমগ্ন। সেই রত্নরাজির কিরণমালা কাল-সাগরের গভীরতা ভেদ করিয়াও তলদর্শী দর্শকের নয়ন কথঞ্চিৎ পরিতৃপ্ত করে সত্য, কিন্তু দর্শন-পিপাসা তাহাতে আরও উদ্দীপিত হয়। দর্শকের ইচ্ছা, কাল-সাগরের সেই গভীরতম প্রদেশে যাইয়া সেই রত্নরাজির সমুদ্ধার করেন। অনেক ডুবুরী সেই ঘনীভূত অনন্ত জলরাশি ভেদ করিয়া রত্ন লাভ করিতে চেষ্টা করিতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের চেষ্টা বালকের আকাশের চাঁদ ধরার উদ্যমের ন্যায় ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। যদি আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যত্ন করিয়া রাখিতে জানিতেন, তাহা হইলে আজ সেই অনন্ত রত্নরাজি কাল-সাগরের অতল জলে ডুবিত না। আজ তাহা হইলে আমাদিগকে দুরবগাহ কালসাগরের অতল জলে নামিবার বৃথা চেষ্টায় অমূল্য জীবন নষ্ট করিতে হইত না। পুরাকালে এই ভারতে কত কোটি মহাত্মা স্বদেশানুরাগ, স্বজাতি প্রেম বা বিশ্বপ্রেমানলে আত্ম-আহুতি প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। কিন্তু তাঁহাদিগের প্রকৃত জীবনী পাইবার কোন আশা নাই, তাহার আভাসমাত্র স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। সেই আভাসমাত্র লইয়া আমি সেই সময়ের দুই একটি চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছি। যদি তাহা সাধারণের প্রীতিকর হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে আরও অনেকগুলি চরিত্র অঙ্কিত করিব ইচ্ছা আছে।

হিন্দু-যবন-সংঘর্ষকালে আত্মোৎসর্গের অনেকগুলি জলন্ত দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সে চরিত্রগুলি স্বতন্ত্র অঙ্কিত করিব মানস আছে। এই জন্ম সে সকল চরিত্র এখানে অঙ্কিত করিলাম না। ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে যে কয়টি চরিত্র-রত্ন আহরণ করিয়াছি, তাদৃশ উজ্জল রত্ন আধুনিক সময়ে দুষ্প্রাপ্য। মহাভারত ও রামায়ণ পাঠে যে ফল, এই মহাত্মগণের চরিত্রপাঠেও সেই ফল। এই সকল চরিত্রের অনুকরণে মানুষ দেবতা হয়। জাতীয় চরিত্রগঠনের এমন উপাদান-সামগ্রী আর দেখিতে পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ সুকুমারমতি বালকগণের কোমল অন্তঃকরণে স্বর্গীয় ভাব চির-অঙ্কিত করিবার এমন উপকরণ আর নাই। চরিত্র-সংগঠন যদি শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক বালককে এই প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষগণের চরিতমঞ্জরী পড়িতে দেওয়া প্রত্যেক অভিভাবক ও প্রত্যেক শিক্ষকের একান্ত কর্ত্তব্য। কিমধিকমিতি—

সংবৎ ১৯৪০।৪১ ভাদ্র চুঁচুড়া।

গ্রন্থকারস্য।

প্রাতঃস্মরণীয় চরিতমালা

দারিদ্র্য-মাহাত্ম্য

জগতে অবিমিশ্র সুখ-দুঃখ দেখিতে পাওয়া যায় না। সুখের সঙ্গে দুঃখ, দুঃখের সঙ্গে সুখ নিরন্তর মিশাইয়া আছে। দরিদ্রের কুটীরে ও রাজার অট্টালিকায় খুঁজিলে এই দুইই মিলিবে। তবে অবস্থাভেদে বেশী কম মাত্র। অনেকের সংস্কার আছে, দারিদ্র্য দুঃখ অপেক্ষা অধিকতর ক্লেশকর বিষয় আর নাই। কিন্তু তাহা ভ্রম। চিন্তাশীলতা, পরদুঃখানুভাবকতা, সহিষ্ণুতা, দয়া, মমতা প্রভৃতি যে সকল গুণে মানবমন ও মানব-হৃদয় স্বর্গীয় ভাব ধারণ করে, তাহা রাজার অট্টালিকা অপেক্ষা দরিদ্রের কুটীরেই অধিকতর বিকাশমান। যে নৃত্যগীত ও আমোদপ্রমোদ লইয়াই সতত ব্যস্ত, তাহার ভাবিবার অবকাশ কই? যে অভাব কাহাকে বলে, কখন অনুভব করে নাই, সে পরের দুঃখে কাতর কিরূপে হইবে? মনে উদিত হইবামাত্র যাহার ইচ্ছা পূরণ হইয়াছে, সহিষ্ণুতাগুণ তাহার পরিপুষ্ট হইবে কিরূপে? দয়ার শান্তিজলে যাহার হৃদয় কখনও বিধৌত হয় নাই, সে দয়া প্রকাশ করিতে জানিবে কিরূপে? যে নিরন্তর তোষামোদকারিগণে পরিবেষ্টিত, সে অকৃত্রিম স্নেহ-মমতা কখন পায় নাই, সুতরাং স্নেহ-মমতা দেখাইবে কিরূপে?

স্বায়ত্ত-সুখের প্রাধান্য

যাহাদিগের সুখ-দুঃখ বাহ্য বস্তুর উপরে নির্ভর করে, তাহারা কখনই প্রকৃত সুখী নহে। রাজ-সিংহাসনে বসিয়া ও রাজমুকুট পরিয়াও তাহাদিগের হৃদয় সতত কম্পবান। এই জন্যই ভারতীয় নীতি বাহ্যবস্তুতে অনাস্থা শিক্ষা দিয়াছিল।* এই জন্যই গ্রীক নীতি-প্রবর্ত্তয়িতা সক্রেটিস উপদেশ দিয়াছিলেন, 'যে যে পরিমাণে অভাব সঙ্কোচ করিতে পারিবে, সে সেই পরিমাণে ঈশ্বরত্ব লাভ করিবে।'

প্রকৃতির উপরে জয়লাভ করাই প্রকৃত রাজত্ব। সে রাজত্ব রাজার অদৃষ্টে ঘটে না, কারণ, রাজার অভাব অনন্ত। যে মহাত্মা অভাব সঙ্কোচ করিয়া প্রকৃতির দাসত্ব হইতে উন্মুক্ত হইতে পারেন, তিনিই প্রকৃত রাজা। এ রাজত্বের গৌরব ভারতীয় আর্য্যেরাই বিশেষ বুঝিয়াছিলেন। এই জন্যই আর্য্য তাপসেরা সংসার ছাড়িয়া নিবিড় অরণ্যমধ্যে গিয়া যোগসাধনা করিতেন; তাঁহাদিগের আত্মসংযমে মুগ্ধ হইয়া অনেক নরপতি তাঁহাদিগের চরণে লুণ্ঠিত-শির হইতেন।

আমরা বলিয়াছি, মানুষের সকল অবস্থাই সুখ দুঃখ মিশ্রিত। নিরবচ্ছিন্ন সুখ মানুষের অদৃষ্টে নাই। সেইরূপ নিরবচ্ছিন্ন দুঃখও মানুষকে কখন ভোগ করিতে হয় না। যাহারা অভাবের প্রসর সঙ্কোচ না করিয়া, বরং বাড়াইয়া থাকেন, তাঁহারা যে নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ ভোগ করেন, এ কথা আমরা বলি না। অভাবে প্রসরবৃদ্ধিই বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার ভিত্তিভূমি। প্রাকৃতিক অভাবমোচনের চেষ্টাতেই শিল্প-বিজ্ঞানের আবির্ভাব। বিজ্ঞানবলে মানুষ প্রকৃতির উপরে অস্ত্র

---

* 'অনাস্থা বাহ্যবস্তুষু।'—কুমারসম্ভব।

প্রকার প্রভুতা লাভ করিয়া থাকেন। বিজ্ঞান মানুষকে অনেক পরিমাণে ঐশী শক্তিসম্পন্ন করে, ভারতীয় আর্য্যেরা প্রকৃতির আধিপত্য সহিতে না পারিয়া ক্রোধে প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ দমিত বা নির্ম্মূল করিয়াছিলেন, আধুনিক ইউরোপীয়েরা প্রকৃতিকে দমিত না করিয়া তাহাকে আজ্ঞাধীন দাসী করিয়া রাখিয়াছেন। ভারতীয় আর্য্যেরা প্রকৃতিকে তাঁহাদিগের উন্নতিপথে কোন অভাব-কণ্টক-রোপিত করিতে দিতেন না; আধুনিক ইউরোপীয়েরা তাহাতে আপত্তি না করিয়া প্রকৃতি দ্বারাই সেই কণ্টক উত্তোলিত করিয়া লইতেছেন। দুই অবস্থাতেই সুখ আছে বটে ; কিন্তু একে সুখ নিজায়ত্ত—অপরে সুখ প্রকৃতিসাপেক্ষ। যে সুখ নিজসাপেক্ষ, তাহাই অমূল্য ; তাহাই অধিকতর প্রার্থনীয়। সে সুখে ধনীরা সাধারণতঃ বঞ্চিত।

দরিদ্র-স্বভাব সন্ন্যাসী

সৌভাগ্যে মানুষের অন্তর এত শিথিলিত হয় যে, তাহা কঠোর ধর্ম্মপালনে অক্ষম হইয়া পড়ে। একটু সংযম অভ্যাস হইলেই, সৌভাগ্যবান ব্যক্তির যশ দেশ-বিদেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু দরিদ্রের সাধনা অতি কঠোর। দরিদ্রের পদে পদে বিপদ, সুতরাং দরিদ্রের অবিচলিত সহিষ্ণুতা প্রয়োজনীয়। দরিদ্রের সকল বিষয়েই অভাব, সুতরাং অনিবার্য্য অভাবে উপেক্ষা একান্ত শিক্ষণীয়। দরিদ্র নিজের অভাব বুঝে, সুতরাং পরের দুঃখে তাহার হৃদয় কাঁদিয়া উঠে। দরিদ্র জগতে ভালবাসা পায় না, ভালবাসার অভাবের মর্ম্মন্তুদ যাতনা সে বুঝে, এই জন্য পরকে ভালবাসিতে শিখে। দরিদ্রকে লোকে ঘৃণা করে, ঘৃণার মর্ম্মন্তুদ প্রহারে তাহার অস্থিচর্ম্ম জর্জ্জরিত, তাই তাহার হৃদয় দুঃখী দেখিলেই কাঁদিয়া উঠে, সহানুভূতির বেগে তাহার অশ্রু মুছাইতে যায়, নিজের অশ্রুজলে তাহার হৃদয়ে যাতনা ক্ষালিত করিতে চেষ্টা করে।

দরিদ্রে ও সন্ন্যাসীতে প্রভেদ অল্প। পর্ণকুটীর বা তরুতল উভয়েরই আবাসস্থল। কৌপীন বা জীর্ণ বসন উভয়েরই পরিধান। স্বচ্ছন্দ বনজাত শাকাদিই উভয়ের ভক্ষ্য। অনাচ্ছাদিত ভূমিতলই উভয়ের শয্যা। ধূলি বা ভস্ম উভয়ের অঙ্গাভরণ। তবে প্রভেদ এই যে, সন্ন্যাসীর এই অবস্থা স্বেচ্ছাকৃত, দরিদ্রের অবস্থা দৈবনির্দ্দিষ্ট। সন্ন্যাসী ভোগ্য বস্তুর অসারতা ও অনিত্যতা দেখিয়া ভোগাসক্তিতে জলাঞ্জলি দিয়া অতি কঠোর দারিদ্র্যব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু দরিদ্রের দারিদ্র্যব্রতে দীক্ষা স্বেচ্ছাধীন নহে। দীক্ষা স্বেচ্ছাকৃত হউক বা না হউক, ব্রত পালনের ফল উভয়েতে একইরূপ। সহিষ্ণুতা, সংযম, আত্মত্যাগ ও পরদুঃখানুভাবকতা প্রভৃতি যে সকল গুণে মানুষ দেবতা হয়—এই ব্রত-পরিপালনে সেই সকল গুণ স্বতঃই দরিদ্রের অভ্যস্ত হয়। সুতরাং দরিদ্র সংকল্প বিনাও সন্ন্যাসী, দীক্ষা ব্যতীতও যোগী, যে দরিদ্র সাধনায় সিদ্ধ, অন্তরের মাহাত্ম্যে সে জগতের পূজনীয়।

দারিদ্র্যে ঘৃণা জাতীয় পতনের মূল

যে জাতি দরিদ্র দেখিলেই ঘৃণা করে, ধনী দেখিলেই তাহার নিকটে নতশির হয়, সে জাতির অধঃপতন নিশ্চয় আরম্ভ হইয়াছে। যখন রোমের বিজয়দর্পে জগৎ কাঁপিয়াছিল, তখন রোমের ডিক্টেটরগণ রাজমুকুট, রাজ-পরিচ্ছদ তুচ্ছ করিয়া সামান্য কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। যত দিন রোম সংযমী ছিল, যত দিন রোম নিজের দারিদ্র্যে কুণ্ঠিত হইত না, প্রত্যুত গরিমা প্রকাশ করিত, তত দিন রোমের বীরত্বে, রোমের মাহাত্ম্যে জগৎ ঝলসিত হইত। কিন্তু যে অবধি রোম পরের সুবর্ণে মণ্ডিত হইলেন, দারিদ্র্যে লজ্জা বোধ করিলেন, সেই অবধি রোমের বীরত্ব, রোমের মাহাত্ম্য বিলুপ্ত হইল। অমনি রোম দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলেন।

আবার বিংশতি পুরুষ-পরম্পরার দাসত্বে যখন ইতালী জর্জ্জরিত হইল, তখন জাতীয় ভ্রম বুঝিতে পারিয়া গ্যারিবল্ডী ম্যাটসিনি-প্রমুখ ঋষিপ্রবরগণ দারিদ্র্য ব্রত গ্রহণ করিলেন। নিজ নিজ বাসনায় জলাঞ্জলি দিয়া তাঁহারা স্বদেশ উদ্ধার ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিলেন। ছদ্মবেশে, গুপ্তবেশে, অনাহারে দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া এই সন্ন্যাসীর দল জাতীয় উদ্ধারের উপকরণ-সামগ্রী সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

জননীর অশ্রুজল, প্রিয়তমার কাতর বচন, শিশুগণের ক্রন্দনও ইহাঁদিগের স্থিরসঙ্কল্প চিত্তকে জাতীয় ব্রত হইতে বিচলিত করিতে পারিল না। যাঁহারা দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়া, সুবর্ণে মণ্ডিত হইয়া, বিলাসিতার ক্রোড়ে লালিত হইয়া, স্বদেশের দুঃখ ভাবিবার অবসর পান নাই; এবং যাঁহারা, যে সকল সন্ন্যাসী স্বদেশের উদ্ধারব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে 'কপর্দ্দক-সম্বলী' 'উন্মাদগ্রস্ত' বলিয়া পরিহাস করিতেন, ইতালীর উদ্ধার তাঁহাদিগের দ্বারা সংসাধিত হয় নাই। যাহারা বেতনের লোভে বিদেশীয় গবর্ণমেণ্টের নিকটে আত্মবিক্রীত হইয়াছিল, যাহারা প্রভুকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত স্বদেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতক করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই এবং যাহারা ছদ্মবেশী আশ্রিত বৈপ্লবিক স্বজাতীয় ভ্রাতৃবৃন্দের রুধিরেও প্রভুর চরণ বিধৌত করিতেও লজ্জা-বোধ করে নাই; সেই জাতিকলঙ্ক কুলাঙ্গারগণ দ্বারা ইতালীর অনিষ্ট বই আর ইষ্ট হয় নাই। তাহা-দিগের দ্বারা বরং ইতালীর সৌভাগ্যের দিন, স্বাধীন-তার দিন দূরবিপ্রকৃষ্ট হইয়াছিল মাত্র। কিন্তু যে চীরধর কপর্দ্দকসম্বলী মনীষিগণ স্বজাতির উদ্ধারব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহাদিগের অর্দ্ধ শতা-ব্দীর নিরন্তর যত্নে—সহস্র রক্তমোক্ষণে—ইতালীর অভাবনীয় স্বাধীনতা, বৈপ্লবিকগণের স্বপ্নরাজ্য হইতে প্রকৃত ঘটনায় পরিণত হইল।

বীরবর গ্যারিবল্ডী ইতালীর বৈপ্লবিক সেনার অধিনায়ক হইয়া অষ্ট্রীয়গণকে ইতালীক্ষেত্র হইতে বিদূরিত করিলেন, কিন্তু স্বহস্তে রাজ্যভার না লইয়া রাজর্ষি ভিক্টর ইমানুয়েলের হস্তে রাজ্য সমর্পণ পূর্ব্বক আপনি নিজ আবাসে গিয়া আবার স্বহস্তে হল-চালন আরম্ভ করিলেন। ইচ্ছা হইলে, যিনি স্বয়ং সম্রাট্ হইতেও পারিতেন, তিনি জাতীয় পেনসন্ পর্য্যন্ত প্রত্যাখ্যান করিলেন। এই মহর্ষি-প্রবর এখন ক্যাপ্রেরা দ্বীপের কুটীরাবাসে স্বহস্তকৃষ্ট কৃষি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন।* বোধ হয়, যেন বিধাতা ইতালীর রক্ষার জন্য তাঁহাকে প্রহরী নিযুক্ত করিয়াছেন। তিনি সেই দ্বীপস্থ কুটীরাবাসে থাকিয়াও ইতালীর চিন্তায় নিরন্তর নিমগ্ন! একদিন ইতালীর সৌভাগ্য সূর্য্যের মধ্যোদয়কালে—ইতা-লীয় ডিক্‌টেটরগণও এইরূপ মাহাত্ম্য ও আত্মত্যাগ দেখাইয়াছিলেন। দারিদ্র্যব্রত উদ্‌যাপনেই ইতালী তিনবার জগতের রাজত্ব করিলেন।

ভারতে দারিদ্র্য-ব্রত-গ্রহণের আবশ্যকতা

যদি কোন দেশে এখন দারিদ্র্যব্রত-গ্রহণের প্রয়োজন হইয়া থাকে, তাহা এই ভারতে। ভারতের সৌভাগ্য-দিনে পারলৌকিক সন্ন্যাসিগণের প্রোজ্জ্বল চরিত্র-গৌরবে ভারত উদ্ভাসিত হইয়াছিল; তাঁহা-দিগের আত্মত্যাগের মোহিনী শক্তি-বলে ভারতীয় রাজবৃন্দও আত্মস্বার্থ জাতীয় স্বার্থে বলি দিতে শিখিতেন। বলা বাহুল্য যে, তখনকার ব্রাহ্মণেরা অনেকেই এই সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিতেন। কৃষক-দিগের ধান কাটিয়া লইয়া যাইবার সময়ে যে সকল পক্ক ধান্য স্তম্ব হইতে ভূতলে খসিয়া পড়িত, তাঁহারা খুঁটিয়া খুঁটিয়া সেই সকল ধান্য আহরণ করিতেন। গৃহপালিত হরিণদিগকে খাওয়াইয়া সেই ধান্যের যাহা অবশিষ্ট থাকিত, তাহাই সিদ্ধ করিয়া তাঁহারা উদর পূরণ করিতেন। ইহারই নাম উঞ্ছবৃত্তি। স্বচ্ছন্দ-বনজাত ফলমূল ও শাকাদিও তাঁহাদিগের খাদ্যের উপকরণ-সামগ্রী ছিল। তাঁহাদিগের প্রেম সর্ব্বজীবে পরিব্যাপ্ত ছিল। সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুকাদি হিংস্র জন্তুরাও সেই প্রেমে মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া থাকিত। তাঁহাদিগের নিঃস্বার্থ বিশ্বপ্রেমের মোহিনী শক্তি-বলে তাহারা আপন আপন হিংস্র প্রকৃতি ভুলিয়া যাইত। ঋষিগণের আশ্রমে ব্যাঘ্র-হরিণে ও ভেক-সর্পে একত্র জলপান করিত। এ গল্প নয়, কবিকল্পনা নয়, প্রকৃত ইতিহাস। চরিত্র-গৌরবে ও আত্ম-ত্যাগের মোহিনী শক্তিবলে জগৎ করতলস্থ করা যাইতে পারে। যে যোগী এ সাধনায় সিদ্ধ, তাঁহার অসাধ্য কিছুই নাই। ঋষিগণ এই সাধনায় সিদ্ধ ছিলেন বলিয়াই প্রবল-পরাক্রান্ত নরপতিগণও তাঁহাদিগের আদেশ শিরোধার্য্য করিতেন। আত্মোৎসর্গই নেতৃত্বের অদ্বিতীয় উপাদান।

ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম হইতে ঋষিপ্রবর বশিষ্ঠদেব মহারাজ রামচন্দ্রকে বলিয়া পাঠাইলেন, "মহারাজ,

---

* এ প্রস্তাবের এ অংশটুকু অনেক দিন পূর্ব্বে লেখা হয়। তখন গ্যারিবল্ডী জীবিত ছিলেন।

আপনি নূতন সিংহাসনে আসীন হইয়াছেন। আপনাকে একটি সেই উপদেশ দিই, সেই উপদেশের অনুবর্ত্তন করিলেই আপনি আদর্শ-রাজা হইতে পারিবেন। আপনি কদাচ প্রজাদিগের মতের বিরুদ্ধ আচরণ করিবেন না।" মহর্ষির এই গভীর উপদেশ রাম ভক্তিভাবে শিরোধার্য্য করিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, মহর্ষির এই উপদেশ-পালনে যদি আমাকে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তরা সীতাকেও পরিত্যাগ করিতে হয়, আমি তাহাতেও পরাঙ্মুখ হইব না। অনতিবিলম্বেই দুর্ম্মুখ আসিয়া সংবাদ দিল—'লোকে রাবণ-গৃহে বসতি জন্য সীতাদেবীর চরিত্রসম্বন্ধে সন্দিহান; লঙ্কায় অগ্নিপরীক্ষা তাহারা বিশ্বাস করে না।' এই সংবাদ শুনিয়া রামচন্দ্র প্রথমে বিদ্যুৎ স্পৃষ্টের ন্যায় হতচেতন হইয়া পড়িলেন। অচিরকালমধ্যে সেই রাজসন্ন্যাসীর সুদৃঢ় চিত্ত প্রাকৃতিক বল ধারণ করিল। তিনি এইমাত্র ঋষিবাক্যের উত্তরে প্রতিজ্ঞা করিলেন, প্রজাগণের মনস্তুষ্টি-বিধানানলে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম সীতাকেও আহুতি দিবেন। সে প্রতিজ্ঞা ও সে ঋষিবাক্য কখনই লঙ্ঘন করা হইবে না। ইহাতে হৃৎপিণ্ড দেহ হইতে উৎপাটিত হয় হউক, রামের প্রাণবিয়োগ হয় হউক, তাহাতেও রাম বিচলিত হইবার নহেন। কর্ত্তব্য স্থির হইল। অমনি লক্ষ্মণকে ডাকিয়া আদেশ দিলেন, 'পূর্ণাগর্ভা সীতাদেবীকে গঙ্গাতীরে পরিত্যাগ করিয়া আইস।' মনীষীর সে সুদৃঢ় তীব্র আদেশ লঙ্ঘন করিতে লক্ষ্মণেরও সাহস হইল না। সেই ভীষণ ও লোমহর্ষণ আদেশ তৎক্ষণাৎ অনুষ্ঠিত হইল। ঋষির উপদেশ প্রতিপালিত হইল। উপদেশক ও উপদেশের মহিমা জগতে উদ্ঘোষিত হইল। এরূপ উপদেশ ও এরূপ প্রজাস্বার্থে রাজস্বার্থের বলির উদাহরণ আর কোথায়?

বিশ্বামিত্র

দারিদ্র্যব্রত বা সন্ন্যাসের মহিমা বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই প্রবল-পরাক্রান্ত নরপতি বিশ্বামিত্র রাজসিংহাসন ও রাজকীয় ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন যে, যিনি উপদেষ্টা হইতে চান, যিনি মানবজাতির পরিচালক হইতে চান, তাঁহাকে সর্ব্বাগ্রে নিজস্বার্থ পরস্বার্থে বলি দিতে হইবে, নিজের ঐশ্বর্য্য পরহিতে ব্যয়িত করিয়া সন্ন্যাসী হইতে হইবে। তাই তিনি নিজের রাজ্য ও রাজ-সিংহাসন জ্ঞাতিহস্তে সমর্পণ করিয়া আপনি ঋষিব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঘোরতর তপস্যায় তিনি জগৎ কাঁপাইয়াছিলেন। তপোবলে তিনি নূতন জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। রাজা বিশ্বামিত্রকে কে চিনিত? কিন্তু রাজর্ষি বিশ্বামিত্র জগতে বিদিত, জগতে পূজিত।

শাক্যসিংহ

দারিদ্র্যব্রত বা সন্ন্যাসের মহিমা বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই মহর্ষি শাক্যসিংহ রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া ভিখারীর বেশ ধারণ করিয়াছিলেন। লক্ষ্মীরূপিণী প্রেমময়ী ভার্য্যা ও শশাঙ্কপ্রতিম পুত্রের দিকে না তাকাইয়া জগতের দুঃখমোচনার্থ তিনি গৃহীতব্রত হইয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন, সুখভোগ করিতে হইলে, তাহার অনুরূপ দুঃখভোগ করিতে হইবে। দুঃখ বাদ দিয়া নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগ করা কাহারই ভাগ্যে ঘটে নাই এবং প্রকৃতির শৃঙ্খলানুসারে কখন কাহারও ভাগ্যে ঘটিতে পারে না। জন্মের সঙ্গে মৃত্যু, উদয়ের সঙ্গে অস্ত, ভোগের সঙ্গে পীড়া, প্রণয়ের সঙ্গে বিচ্ছেদ, মৎস্যের সঙ্গে কণ্টকের ন্যায় সুখের সঙ্গে দুঃখ দুষ্পরিহার্য্যরূপে মিশাইয়া আছে। এই জন্য সেই ঘোর যোগী সঙ্কল্প করিলেন, সুখ ও দুঃখ উভয়েরই হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইবে। তাঁহার কঠোর সাধনায় মানবজাতি দুষ্পরিহার্য্য প্রাকৃতিক দুঃখ সকল হইতে মুক্তিলাভ করিল না বটে, কিন্তু কতকগুলি পরিহার্য্য আত্মকৃত দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইল। মৃত্যু জগৎ হইতে নিরাকৃত হইল না বটে, কিন্তু আত্মসংযমবলে বিদূরে বিক্ষিপ্ত হইল। জগৎ হইতে অকালমৃত্যু উঠিয়া গেল। বৌদ্ধজগতে সকলেই ভাই ভাই, সুতরাং বিষাক্ত শ্রেণীবিভাগজনিত দুঃখ জগৎ হইতে উঠিয়া গেল। কেহ কাহাকে ঘৃণা করে না, কেহ কাহারও বিদ্বেষী নয়, সুতরাং বৌদ্ধজগৎ হইতে বিবাদ-বিসংবাদ-বিগ্রহাদি উঠিয়া যাইতে লাগিল। শাক্যসিংহের বিশাল হৃদয়ক্ষেত্রের পবিত্র ছবি সমস্ত বৌদ্ধজগতে প্রতিবিম্বিত হইল। তাঁহার

চরিত্রের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে সহস্র সহস্র আশ্রমী সংসার ছাড়িয়া আত্মসুখ পরসুখে বলি দিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারকপদে ব্রতী হইলেন। তাঁহাদিগের পবিত্র চরিত্র দৃষ্টান্তে ও জ্বলন্ত ধর্ম্মপ্রচারে পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। সেই কপর্দ্দক-শূন্য সন্ন্যাসীর দল জগতের মৃত-দেহে নবজীবন সঞ্চারিত করিলেন। সে দারিদ্র্য ও সন্ন্যাসে জগৎ মুগ্ধ হইল। এখন বৌদ্ধপ্রচারকগণে সে দারিদ্র্যব্রত ও সন্ন্যাসের অভাব হইতেছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগের প্রভাবও কমিতে আরম্ভ হইয়াছে।

* * * *

গুরুগোবিন্দ

ভারতের এই দুর্ভেদ্য সমস্যার প্রকৃত মীমাংসা আধুনিক সময়ে আর এক যোগী করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং আত্মত্যাগবলে অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। ঐ যে শিখজাতি দেখিতেছ রণে অজেয়, দৃঢ়তায় অবিচলিত, ভ্রাতৃপ্রেমে বিগলিত, কৃতজ্ঞতাধর্ম্মে বিসৃষ্টপ্রাণ—ঐ ভারতগৌরব, ভারতপ্রাণ শিখজাতি সেই যোগিবরের আত্মত্যাগের ও স্বদেশানুরাগের জীবন্ত কীর্ত্তিস্তম্ভ। চিলেনওয়ালা সমরক্ষেত্রে যে শিখজাতির অমিততেজে ইংরাজ-বীর্য্যবহ্নি নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছিল, সিপাহী-বিদ্রোহে যে শিখজাতির অপ্রমেয় বীরত্ববলে ইংরাজ-জাতি কথঞ্চিৎ প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন, আফগান্ যুদ্ধে যে শিখজাতির অদ্ভুত রণনৈপুণ্যে ব্রিটন্‌জাতির মানরক্ষা হইয়াছিল, আর সে দিন যে শিখসেনার অতুল বিক্রমে ইংরাজ কীর্ত্তিস্তম্ভ মিসর-রণক্ষেত্রে নিখাত হইয়াছিল, সেই প্রকাণ্ড অজেয় শিখসেনা শিখগুরু গুরুগোবিন্দের গভীর সাধনার ফল—যখন যবন অত্যাচারে ভারতবক্ষ ক্ষতবিক্ষত হইতেছিল, সেই সময়ে গুরুগোবিন্দের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি দেখিলেন, এই হিন্দু-যবন-বিদ্বেষ প্রশমিত না হইলে উভয় জাতির ধ্বংস অনিবার্য্য। সে চিন্তা তাঁহার হৃদয়কে আলোড়িত করিল। সেই ঋষি সমাধিবলে দেখিলেন, এই অবশ্যম্ভাবী অনিষ্ট-নিবারণের একমাত্র উপায়, উভয় জাতির মধ্যে অভেদ্য ভ্রাতৃত্ববন্ধন সংস্থাপন। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া তিনি শিখধর্ম্মকে এক নূতন আকার দিলেন। নানকের শিখধর্ম্ম একেশ্বরবাদ ও পরকাল লইয়াই থাকিত, ইহলোকের সহিত তাহার বড় সংস্রব ছিল না, কিন্তু গুরুগোবিন্দ তাঁহার শিখধর্ম্মকে ঐহিক ইষ্টসাধনেই অধিকতর নিয়োজিত করিলেন। তিনি ঘোষণা করিলেন যে, এ ধর্ম্মে হিন্দু-যবন, ব্রাহ্মণ-শূদ্র ভেদ নাই! এ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবামাত্র সকলেই ভাই ভাই হইবে, সকলেই এক পরিবার হইবে। গুরুগোবিন্দ এই নবপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মে সর্ব্বাগ্রে দীক্ষিত হইলেন। দলে দলে হিন্দু, যবন তাঁহার মন্ত্রশিষ্য হইতে লাগিল। তিনি দীক্ষিতগণকে আলিঙ্গন করিয়া ভ্রাতৃপ্রেমে গ্রহণ করিতে লাগিলেন। নবদীক্ষিতের অন্ন সকলকেই গ্রহণ করিতে হইত। তাহাতে পাছে কাহারও কোন প্রকার অশ্রদ্ধা হয়, এই জন্য তিনি দীক্ষাদিনে প্রত্যেক নবদীক্ষিতকে অন্ন-ব্যঞ্জন রাঁধিয়া তাঁহাকে দিতে বলিতেন। শিষ্য ভক্তিভাবে গুরুকে অন্ন ব্যঞ্জন রাঁধিয়া দিত। গুরু তাহা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভোজন করিতেন। সুতরাং তাহার অন্নজল-গ্রহণে আর কাহারও কোন আপত্তি থাকিত না। শিখজাতির উন্নতি, শিখজাতির সুখ ভিন্ন গুরুগোবিন্দের আর কোন চিন্তা ছিল না। তিনি স্বয়ং নিষ্কাম যোগী ছিলেন। নিজের সুখ, নিজের সম্পত্তি, নিজের সৌভাগ্য কখন তাঁহার চিত্তকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিত না। তিনি শিখজাতির হিতানলে আত্মহিতের পূর্ণ আহুতি দিয়াছিলেন। এই জন্যই শিখজাতি তাঁহার নামে আজও মন্ত্রমুগ্ধ। এই জন্যই তাঁহার শিষ্যেরা কোন বিষয়ে তাঁহার অভিপ্রায় কি, জানিতে পারিলেই তৎসাধনে প্রাণবিসর্জ্জন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইত। রণস্থলে গুরুগোবিন্দের নামোচ্চারণে তাহাদিগের ধমনীতে সহস্রগুণ বলোপচয় হইত। গুরুগোবিন্দের অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ ও অপূর্ব্ব ভ্রাতৃপ্রেমে মুগ্ধ হইয়া অসংখ্য হিন্দু, যবন চির বিদ্বেষ ভুলিয়া এক ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ হইতে লাগিল। যে হিন্দু যবন পরস্পরকে দেখিলেই পরস্পর খড়্গহস্ত হইত, আজ তাহারা স্পর্শমণির স্পর্শে ভ্রাতৃ-প্রেমে গদগদ হইয়া পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতে লাগিল; আজ তাহাদিগের প্রেমপূর্ণ ভাই ভাই গানে জগৎ মুগ্ধ, আজ সেই সমবেত সেনার বিজয়দর্পে দিল্লীর সিংহাসন টলটলায়মান।

আজ এই সমবেত নারায়ণী সেনার নিকটে যবন সেনা প্রতিপদে পরাজিত। ভারতে যবন-সাম্রাজ্য যায় যায়, এমন সময় এক ঘাতকহস্তে সেই পরম যোগীর মৃত্যু হইল। গুরুগোবিন্দের সমস্ত সঙ্কল্প বৃথা হইল। ভারতে এতদিন হিন্দু যবন মিশিয়া একটি অবিমৃদ্দম বিশাল জাতির উৎপত্তি হইত। ভারতের অদৃষ্টে এত দুঃখ ছিল বলিয়াই অসময়ে গুরুগোবিন্দের মৃত্যু হইল। গুরুগোবিন্দ! আর একবার ভারতে আসিয়া তোমার অনন্ত প্রেমস্রোতে ব্রাহ্মণশূদ্র ও হিন্দু যবন ভেদ ভাসাইয়া দেও। প্রত্যেক ভারতবাসীর শিরায় শিরায় তোমার প্রগাঢ় ভ্রাতৃপ্রেম সঞ্চারিত কর। দেব আর একবার স্বর্গ ছাড়িয়া ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া সোনার ভারতকে নরক হইতে স্বর্গে লইয়া যাও; আর একবার তোমার আত্মত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে মরণোন্মুখ ভারতকে সঞ্জীবিত কর। বীর সন্ন্যাসীর মূর্ত্তিতে আর একবার ধরায় অবতীর্ণ হইয়া বীরত্ব ও সন্ন্যাস-ধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রচার কর। সব যায়, রসাতলে যায়, একবার দেখা দাও। তোমার অতিমানুষ শবসাধনার ফলস্বরূপ সেই নারায়ণী সেনা এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু যাহাতে তুমি যে ভ্রাতৃ-প্রেম ও স্বদেশানুরাগের ভাব সংক্রামিত করিয়াছিলে, তোমার সঙ্গে সঙ্গে তাহা চলিয়া গিয়াছে। তাহাদিগকে যে বীরত্বে সংক্রামিত করিয়া গিয়াছ, সে বীরত্ব এখনও অটুট রহিয়াছে। কিন্তু সে সন্ন্যাস ও সে আত্মত্যাগ তোমার তিরোধানে বিলুপ্ত হইয়াছে।

* * * *

আত্মত্যাগ ও সন্ন্যাসের কি অদ্ভুত মহিমা! একজন সন্ন্যাসীর আত্মত্যাগে লক্ষ লক্ষ লোক মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া প্রত্যেকে এক এক জন সন্ন্যাসী হইয়াছিল। সে পবিত্র আলোকে একদিন প্রত্যেক শিখ এক একটি ক্ষুদ্র গুরুগোবিন্দ সিংহ হইয়াছিল। কিন্তু আজ সে আলোকের প্রতিফলন অভাবে সে সকল গ্রহ উপগ্রহ অনন্ত তিমিরে বিলীন হইয়া গিয়াছে!

চৈতন্য

আমরা আর এক সন্ন্যাসীর নাম উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারি না। সে পবিত্র নাম এখনও বঙ্গের প্রতি নগরে সংকীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের ভীষণ বৈষম্যভাবে যখন জগৎ দগ্ধ হইতেছিল, তখন নীচ জাতি সকল কুকুর বা শৃগালের ন্যায় ব্রাহ্মণদিগের পরিত্যাজ্য হইয়াছিল, যখন সমাজের কঠিন শাসনে সমাজবন্ধন কেবল যন্ত্রণার কারণ হইয়া উঠিয়াছিল, যখন স্খলিতপদ রমণীরা বাত্যাহত নিরাশ্রয়া লতার ন্যায় ভূমি বিলুণ্ঠিত ও পদদলিত হইতেছিল, যখন শুষ্ক তার্কিকতার স্নেহ, প্রেম ও ভক্তি প্রভৃতি হৃদয়ের কোমলতার বৃত্তি সকল বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল, সেই সময় চৈতন্যদেবের আবির্ভাব। চৈতন্যদেব স্বয়ং অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার পাণ্ডিত্য নীরস ও হৃদয়ের পরিপুষ্টি বিরহিত ছিল না। স্বদেশের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া তাঁহার হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল। তিনি দেখিলেন, মানবজাতিগত অস্তিত্বানলে পূর্ণ ব্যক্তিগত অস্তিত্ব আহুতি না দিলে, দেশের মঙ্গল নাই। তিনি দেখিলেন, সেই লক্ষ্য-সাধনের একমাত্র উপায় সন্ন্যাস ও আত্মত্যাগ। আপনাকে ভুলিয়া পরের জন্য ভাবিতে শিখাইতে হইলে, স্বয়ং আত্মবিস্মৃত হইতে হয়। আপনার সুখ আপনার সম্পত্তি জাতীয় সুখ ও জাতীয় সম্পত্তিতে বিলীন করিতে হয়। চৈতন্যের যে চিন্তা, সেই কার্য্য। তিনি মানব-সাধারণের সুখ-পুঞ্জ পরিবর্দ্ধনার্থ পারিবারিক আত্মসুখে জলাঞ্জলি দিলেন। তিনি অনাথ-অনাথিনীর অশ্রুজল মুছাইবার জন্য প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তরা ভার্য্যাকে কাঁদাইলেন। বিশ্বপ্রেমে জগৎ মাতাইবার জন্য স্বয়ং মাতৃপ্রেম-সুধায় বঞ্চিত হইলেন। সেই সন্ন্যাসীর প্রেম-সংকীর্ত্তনে জগৎ মুগ্ধ হইল। নিদাঘের বিকিরণ-প্রতপ্ত মৃত্তিকায় যেন বারিধারা পতিত হইল। তিনি গাইয়া গাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন, 'আমরা সব ভাই ভাই, আমরা সব ভাই-বোন' সেই আহ্বানে—সেই প্রেমসংকীর্ত্তনে হিন্দু-মুসলমান ও ব্রাহ্মণ-শূদ্র একই সাম্যক্ষেত্রে আসিয়া একই গুরুর মন্ত্রশিষ্য হইতে লাগিলেন। খোল-করতালের ঝঙ্কারে সমস্ত ভারতবর্ষ

আলোড়িত হইল। গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে সংকীর্ত্তন হইতে লাগিল, 'আমরা সব এক পিতার সন্তান, আমরা সব ভাই ভাই, আমরা সব ভাই-বোন।' প্রেম ও ভক্তিস্রোতে ভারত প্লাবিত হইল। সেই পরম যোগীর অদ্ভুত আত্মত্যাগের মহিমায় অসংখ্য বৈষ্ণব বৈরাগ্যাশ্রম গ্রহণ করিলেন। প্রচারকের দলে ক্রমে ভারত ভাসিয়া গেল। কি আশ্চর্য্য! আজ যে কোন বিষয়ের প্রচারের জন্য দশ জন লোক জুটায়, কাহার সাধ্য? কিন্তু সেই সময়ে চৈতন্যের চরিত্র-মহিমায় সহস্র সহস্র লোক সংসার-সুখে জলাঞ্জলি দিয়া আপনা হইতেই প্রচারকার্য্যে ব্রতী হইতে লাগিলেন। আত্মত্যাগের দৃষ্টান্তের কি অদ্ভুত মহিমা! চৈতন্যের প্রেমসঙ্গীত আজও গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে সংকীর্ত্তিত হইতেছে। আজও বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে প্রচারকের সংখ্যার অপ্রতুল নাই বটে, কিন্তু তাহারা চৈতন্যের মহৎ লক্ষ্য হারাইয়া এখন কেবল প্রচারকের পরিচ্ছদ পরিয়া বেড়াইতেছে মাত্র। তাহারা এখনও মহৎ ভাব-ব্যঞ্জক প্রেম গান সকল গাইয়া বেড়াইতেছে বটে, কিন্তু তাহা নিজের স্বার্থসাধনের জন্য বিশ্বপ্রেমের প্রচারের জন্য নহে। এখনও তাহারা প্রেমগান গাইতে গাইতে নৃত্য করিয়া থাকে সত্য, কিন্তু তাহা অনিবার্য্য হৃদয়োচ্ছ্বাসে নহে, দাসের পরিবার প্রতিপালনের জন্য হৃদয়োচ্ছ্বাসের অভিনয়। চৈতন্যের বৈরাগ্য আত্মস্বার্থ ও আত্মস্বার্থে বলি দিয়াছিল; কিন্তু আধুনিক বৈষ্ণব-প্রচারকগণের বৈরাগ্য আত্মসুখ ও আত্মস্বার্থ সিদ্ধির অদ্বিতীয় সাধনস্বরূপ হইয়াছে। সেই জন্যই পূর্ব্বে বৈরাগীর এত সম্মান ছিল; কিন্তু বৈরাগীরা সেই মহৎ ব্রত হইতে স্খলিত হইয়াছে বলিয়াই আজ লোকের ঘৃণার পাত্র হইয়াছে।

* * * *

ওয়ালেস

—*—

চল, একবার ইউরোপখণ্ডে যাই। সেখানে অনেকগুলি সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইব। একবার সেই পবিত্র মূর্ত্তিগুলি দেখিয়া আসি। কল্পনাবলে চল, একবার ত্রয়োদশ শতাব্দীর স্কটলণ্ডে যাই। ঐ দেখ, দ্বাদশ জন রাজা স্কটলণ্ডের মুকুট লইয়া পরস্পর আত্মঘাতী হইতেছেন। ইংলণ্ডেশ্বর প্রথম এডওয়ার্ড মীমাংসকরূপে আহূত হইয়া তথায় কৌশলে আপনার আধিপত্য স্থাপন করিতেছেন। ঐ দেখ, ওয়ালেস্ প্রভৃতি কতিপয় যুবক ইংলণ্ডের আধিপত্যের প্রতিবাদ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। সেই বীরমণ্ডলী মহানুভাবে উদ্দীপিত হইয়া আপনাদিগের ধনসম্পত্তি ও পদমর্য্যাদা বিসর্জ্জন দিয়া বনে বনে, পর্ব্বতে পর্ব্বতে লুকাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অনাহারে, অনিদ্রায়—দিন, মাস, বৎসর কাটিয়া যাইতে লাগিল, তথাপি সে তেজঃ দমিত হইল না, সে প্রতিজ্ঞা বিচলিত হইল না। প্রতিজ্ঞা যে—হয় স্কটলণ্ডের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করিবেন, নয় সে যজ্ঞে আত্মবলি প্রদান করিবেন। ওয়ালেস্, ব্রুস, গ্রেহাম, কার্লাইল প্রভৃতি সন্ন্যাসিগণের অদ্ভুত আত্মত্যাগে ও অলৌকিক স্বদেশানুরাগে মুগ্ধ হইয়া ক্রমে অসংখ্য স্কচ—ওয়ালেসের পতাকা-মূলে আসিয়া দাঁড়াইল। এ দিকে ইংরাজ-সেনার অত্যাচারে স্কটলণ্ড বক্ষঃ ক্ষত-বিক্ষত হইতে লাগিল। লুণ্ঠন ও সতীত্ব নাশের সংবাদে চতুর্দ্দিকে হাহাকার রব উঠিল। দুর্ব্বল সৈনিকগণের নামে নালিশ করিতে গেলে সেনাপতি বাদীকে ফাঁসিকাষ্ঠে লটকাইয়া দেন। সুতরাং কেহ নালিশ করে না, মরমে মরিয়া সমস্ত সহ্য করে। চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার, অকারণ হৃত-পতি-বিয়োগ বিধুরা নববিধবার ক্রন্দন, অপহৃত-সতীত্ব সতীর আর্ত্তনাদ ও লুণ্ঠিত-সর্ব্বস্ব কৃষকের দীর্ঘশ্বাসে স্কটলণ্ডের আকাশ বিদীর্ণ হইতে লাগিল। কৃষকে আর চাষ করিতে চায় না, কারণ, তাহার বিশ্বাস নাই যে, তাহার পরিপক্ক শস্য ইংরাজ সৈনিক বলপূর্ব্বক লইয়া যাইবে না। গৃহিণীরা আর কাটনা কাটে না, কারণ, তাহারা জানিত যে, তাহাদিগের যত্নে কাটা সূতা ইংরাজ-লুঠেরারা আসিয়া লুঠ করিয়া লইয়া যাইবে। স্কটলণ্ডের প্রশস্ত গভীর ও সুন্দর হ্রদে রজত-মীন ধরিবার জন্য জেলেরা আর জাল ফেলিতে চাহে না, কারণ, তাহারা জানিত যে, ইংরাজ-দস্যু কোথায় লুকাইয়া আছে, শীকার হস্তগত হইবামাত্র তাহারা আসিয়া কাড়িয়া লইবে।

ভগবন্! স্কটলণ্ডের অদৃষ্টে এরূপ দুঃখ আর কতকাল রাখিবে? স্কটলণ্ডের সৌভাগ্য-রবি চিরদিনের জন্য কি অস্তমিত হইল? আর কি

ইহা কখন স্কটিশগগনে উদিত হইবে না? স্কটলণ্ডের উজ্জ্বল আশাতারা কি অনন্ত কালসাগরে চিরদিনের মত বিলীন হইল? স্কটলণ্ডের স্বাধীনতা-কমলিনী মৃত কি নিদ্রিত? না, মরেন নাই—ঐ দেখ, তিনি নিমীলিত-নেত্রে নিদ্রা যাইতেছেন। আবার দেখ—ঐ নীল কমল ছুটি সৌভাগ্যসূর্য্যের পুনরুদয়ে একটু করিয়া প্রস্ফুটিত হইতেছে। ঐ দেখ, কমলিনী পূর্ণ প্রস্ফুটিত-নেত্রে উঠিলেন; এ কি, স্বপ্ন না মায়া? এত যে ইংরাজ-সৈন্য ছিল, কোথায় গেল? ঐ যে তাহারা স্কটিশ বর্শা-ধারিগণের সম্মুখে বায়ুর সম্মুখে তুষের ন্যায় উড়িয়া যাইতেছে!—স্কটিশ বীর-সন্ন্যাসগণ কল্পনা-বলে ভাবী সমরের এইরূপ উজ্জ্বল ছবি দেখিতে পাইলেন।

প্রাতঃসূর্য্যের সুবর্ণময় কিরণমালায় সমুদ্ভাসিত আয়ার নদীর তীরে চিন্তামগ্নভাবে পাদচারণ করিয়া বেড়াইতেছেন, উনি কে? বিধাতা যাঁহাকে সুন্দর বুদ্ধিশালী পদ্মপত্রনিভ মুখকান্তি দিয়াছেন, উনি কে? যাঁহার চক্ষু হইতে প্রতিভা ও অগ্নি বাহির হইতেছে উনি কে? কোপে যাঁহার ওষ্ঠাধর বিকম্পিত হইতেছে, উনি কে? ঐ আজানুলম্বিতবাহু বিশালবক্ষঃ বৃষস্কন্ধ মহাপুরুষ, উনি কে? বিলম্বিনী অরাস কেশরাশি যাঁহার গ্রীবার উপর গৌরবে ক্রীড়া করিতেছে, উনি কে? যাঁহার কটিবদ্ধ অসি ঝকমক করিয়া বার বার ধরাতল চুম্বন করিতেছে, ঐ বীরপুরুষ কে? যিনি সম্পত্তি থাকিতেও সর্ব্বত্যাগী, স্বদেশের উদ্ধারসাধনরূপ এক মহামন্ত্রে দীক্ষিত, ঐ বীর সন্ন্যাসী কে? ইনিই সেই স্কটলণ্ডের উদ্ধার-কর্ত্তা ওয়ালেস্। যাঁহার প্রচণ্ড খড়্গাঘাতে অসংখ্য ইংরাজ বীরপুরুষ শমন-সদনে প্রেরিত হইয়াছিলেন, ইনিই সেই স্কটলণ্ড-রবি ওয়ালেস্। যাঁহার উদ্দীপনাপূর্ণ বাক্যে অসংখ্য অবদানপরম্পরা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, ইনিই সেই স্কট-সঞ্জীবন ওয়ালেস্। যাঁহার প্রতাপে ইংলণ্ডেশ্বর দৃপ্ত এডওয়ার্ডও কম্পিত কলেবর হইয়াছিলেন, ইনিই সেই স্কটিশ-সিংহ ওয়ালেস্। যাঁহার বিজয়িনী সেনা ইংলণ্ড-ভূমিকা অগ্নিময় করিয়া তুলিয়াছেন, ইনিই সেই স্কটবীর কেশরী ওয়ালেস্। যাঁহার চরণতলে পড়িয়া একদিন ইংলণ্ডেশ্বর এডওয়ার্ডের মহিষীও সন্ধি ভিক্ষা করিয়াছিলেন, ইনিই সেই স্কটলণ্ড-গৌরব ওয়ালেস্। বলিয়া দিতে হইবে না যে, ইনি চিন্তামগ্ন-মনে মাতৃভূমির বর্ত্তমান দুরবস্থা ও অতীত গৌরবের বিষয় ভাবিতেছিলেন। এই স্বাধীনতা-সমরে ওয়ালেস্ পিতা, মাতা ভ্রাতা, অবশেষে প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়তরা ভার্য্যা, একে একে সমস্ত হারাইয়াছিলেন। তথাপি সে সন্ন্যাসীর অন্তরের আগুন না নিভিয়া বরং অধিকতর উদ্দীপিত হইয়াছিল। ইংরাজদস্যুদিগকে বিদূরিত করিয়া স্কটলণ্ডকে স্বাধীন করিবেন—এই সর্ব্বগ্রাসিনী চিন্তা তাঁহার একমাত্র সহচরী ছিল। শয়নে স্বপনে, অশনে উপবেশনে—এ চিন্তা একবারও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিত না, তাঁহার কপর্দ্দকমাত্র সম্বল ছিল না; অথচ তিনি না ডাকিতেও কত সহস্র লোক আসিয়া তাঁহার পতাকামূলে দাঁড়াইত। তিনি দৈবশক্তিসম্পন্ন ছিলেন এবং সেই শক্তি নিজ সৈন্যে সংক্রামিত করিতে পারিতেন। এই জন্য তাঁহার সৈন্যেরা বার বার দশগুণ ইংরাজসৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া বিজয় লাভ করিয়াছিল। এই জন্যই অসংখ্য দুর্গ সহজেই তাঁহার করতলস্থ হইয়াছিল। ষ্টার্লিং সমরক্ষেত্র তাঁহার অসমানুষ বীরত্বের পরিচায়স্থল। এই যুদ্ধে তিনি দশমাংশ সৈন্য লইয়া দশগুণ ইংরাজসৈন্যের সম্মুখীন হন। কথিত আছে, এই যুদ্ধে চল্লিশ সহস্র ইংরাজ হত হন এবং বিজয়লক্ষ্মী সম্পূর্ণরূপে ওয়ালেসের করতলস্থ হন। স্কটিশদুর্গে জাতীয় পতাকা উড্ডীন করিয়া ওয়ালেস্ সেই বিজয়িনী সেনা লইয়া মত্ত হস্তীর ন্যায় ইংলণ্ড আলোড়িত করিয়া বেড়ান। কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী অধিক দিন তাঁহার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য এডওয়ার্ড অগণ্য সৈন্য সহ অচিরকাল মধ্যে স্কটলণ্ডের সিংহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এডওয়ার্ড জানিতেন, ওয়ালেসের সেনা রণে অজেয়। তিনি স্কটিশ শিবিরে ভেদ উৎপাদন করিয়া দিলেন। দলপতিগণের মধ্যে সৈনাপত্য লইয়া ঘোরতর বিবাদ বাধিয়া উঠিল। অন্তর্বিচ্ছেদের ফল ফলিল, ফল্কার্ক-যুদ্ধক্ষেত্রে স্কটিশ পৃথ্বীরাজ ইংরাজদিগের হস্তে পতিত হইলেন। স্কটলণ্ডের স্বাধীনতাসূর্য্য আবার অস্তমিত হইল। নিষ্ঠুর ইংরাজ সেই দেবদুর্লভ দেহখণ্ড খণ্ড করিয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত করিল। তাঁহার মস্তক লইয়া ইংরাজরা লণ্ডন সেতুর উপর বসাইয়া রাখিল। এইবার ওয়ালেস

মাতৃভূমির চরণে পূর্ণ আত্মবলি দিলেন। যেমন যোগিবর খৃষ্ট মানবজাতির পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য নিজ দেহ বলি দিয়াছিলেন, সেইরূপ ওয়ালেস্ স্কটিশ জাতীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য নিজ দেহ উৎসর্গ করিলেন। অমনি স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইল। অমনি দেব, যক্ষ, কিন্নর সমস্বরে গাহিয়া উঠিলেন, 'ধন্য ওয়ালেস্! ধন্য স্কটলণ্ড—ওয়ালেস্ জননী!' জগতে প্রতিধ্বনি উঠিল —'ধন্য ওয়ালেস্! ধন্য স্কটলণ্ড—ওয়ালেস্ জননী!' সে রক্তে ইংলণ্ডের বক্ষঃ পুড়িয়া ছারখার হইল। এই বীরহত্যা মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত ইংরাজকে ব্যান্‌কবরন্ সমরক্ষেত্রে করিতে হইল। সংবাদ দিবার জন্য সেই এক লক্ষ সেনার অল্পই স্বদেশে ফিরিয়া আসিল। ধন্য ওয়ালেস্! ধন্য তোমার স্বদেশানুরাগ! তুমি মরিয়াও স্বদেশের উদ্ধারসাধন করিলে! তুমি অমর; তাহা না হইলে এত দিন পরে সুদূর অঙ্গবঙ্গ প্রদেশে আর্য্য-যুবক আজ তোমার নাম সঙ্কীর্ত্তন করে কেন? তাহা না হইলে আজ তোমার নামমাত্র উচ্চারণে আর্য্য-যুবকের শিরায় শিরায় তাড়িতবেগে শোণিতস্রোতঃ প্রবাহিত হয় কেন?

* * * *

উইলিয়ম টেল

—*—

যে সময়ে স্কটলণ্ডে ওয়ালেস্ জাতীয় স্বাধীনতা-রক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিলেন, সেই সময় সুইজর্লণ্ডে আর একজন রাজনৈতিক সন্ন্যাসী অষ্ট্রীয়ার সহিত স্বাধীনতা-সমরে নিযুক্ত হন। সকলেই জানেন, ইঁহার নাম টেল। ইঁহার অদ্ভুত কার্য্যকলাপ পর্য্যালোচনা করিলে, ইঁহাকে বাস্তব মনুষ্য বলিয়া বোধ হয় না, যেন কবির কল্পনা বিজৃম্ভিত বলিয়া প্রতীতি জন্মে। কিন্তু তিনি বাস্তবিকই মানব—অথবা মানবরূপী দেবতা ছিলেন। বস্তুতঃ হৃদয়ের বিশালতা, ইচ্ছার অলঙ্ঘ্যতা, লক্ষ্যের অচঞ্চলতা এবং স্বজাতি-প্রেম ও স্বদেশানুরাগের গভীরতায় তিনি দেবোপম ছিলেন। তিনি স্বদেশের মঙ্গল-সাধনের জন্য মৃত্যুতে—অথবা তদপেক্ষাও ভয়ানক যদি কিছু থাকে, তাহাতেও—ঝাঁপ দিতে একবারও ভাবিতেন না। তাঁহার হৃদয়ে ভয় ছিল না। তিনি বিক্রমে কেশরী ছিলেন।

যখন চতুর্দ্দিকে অন্ধকার, যখন চতুর্দ্দিকে অত্যাচার, যখন সমস্ত সুইজর্লণ্ড অষ্ট্রীয়ার শৃঙ্খলভরে বসিয়া পড়িতেছিল, সেই সময় এই রণ-বীর সুইসক্ষেত্রে জাতীয় অধিনায়করূপে আবির্ভূত হন। তাঁহার দেহ হইতে তেজঃপুঞ্জ নির্গত হইতে দেখিয়া লোকে মনে করিত যে, বিজয়লক্ষ্মী তেজঃপুঞ্জচ্ছলে যেন তাঁহাকে কঞ্চুক-বেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছেন।

এই রণবীর যদিও সামান্য কৃষকের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার আত্মা অতি মহান্ ছিল। তিনি শত্রুহস্তে আত্ম-সমর্পণ করা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ঃ মনে করিতেন। একদিন এক কৃষক লাঙ্গল চষিতেছিল, এমন সময়ে অষ্ট্রীয়রাজ-প্রতিনিধির ভৃত্য অকারণে আসিয়া সেই হলবাহী বলদদ্বয়কে খুলিয়া লইল, বলিল, এ কাজের জন্য দুই জন সুইস নিযুক্ত করিলে ভাল হয়, কারণ, তাহারা ভারবহন করিবার জন্যই জন্মিয়াছে। কৃষকের ইহা দুর্ব্বিষহ হইল; সে তৎক্ষণাৎ তাহার হস্তস্থিত লগুড় দ্বারা তাহাকে ভূপাতিত করিল। মারিয়াই সে ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিল। ক্রোধোন্মত্ত অষ্ট্রীয়গণ তাহাকে না পাইয়া তাহার বৃদ্ধ পিতাকে গিয়া ধরিল। বৃদ্ধের যাহা কিছু ছিল, সমস্ত রাজকোষভুক্ত করিয়া অবশেষে পিশাচেরা তাহার চক্ষু দুটি উৎপাটিত করিল। যষ্টি-হস্তে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করা ভিন্ন অন্ধের আর কোন উপায় রহিল না। এই প্রকার অসহ্য অত্যাচারে সমস্ত সুইজর্লণ্ডবাসী ক্ষেপিয়া উঠিলেন। তাঁহারা দলে দলে আসিয়া এক জায়গায় জমা হইতে লাগিলেন। সকলেই একবাক্যে বীরকেশরী উইলিয়ম টেল্‌কে জাতীয় সেবার অধিনায়ক নিযুক্ত করিলেন। জাতীয় দলের অনেকগুলি গুপ্ত অধিবেশন হইল। পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস রক্ষা ও মন্ত্রগুপ্তির জন্য পরস্পরের সমীপে পরস্পর শপথ গ্রহণ পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। সাধারণ অভ্যুত্থানের জন্য একটি দিন স্থির হইল। সকলেই উৎসুক মনে সেই দিনের প্রতীক্ষা করিতেছেন, এমন সময় একটি দুর্ঘটনায় সব উলটাইয়া গেল। গবর্ণর আলটর্ফ নগরের বাজারে একটি গাছের

উপর তাঁহার টুপী রাখিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, 'সুইজর্লণ্ডের সমস্ত লোককে এই টুপীর নিকটে নতজানু ও অনাবৃত মস্তক হইতে হইবে। গবর্ণরের প্রতি তাহারা যে সম্মান করিতে বাধ্য, তাহাদিগকে ঐ টুপীর প্রতিও সেই সম্মান প্রদর্শন করিতে হইবে।' উইলিয়ম টেল এই আদেশ প্রতিপালনে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকৃত হইলেন। অষ্ট্রীয় পুলিশ তাঁহাকে ধরিয়া গবর্ণরের নিকট লইয়া গেল। গবর্ণর স্বাভাবিক নিষ্ঠুরতার বশবর্ত্তী হইয়া আদেশ করিলেন যে, টেলকে নিজ পুত্রের মস্তকে একটি আপেল ফল রাখিয়া শরবিদ্ধ করিতে হইবে। ধনুর্বিদ্যায় টেলের সবিশেষ পারদর্শিতা ছিল, সুতরাং তিনি নির্ভয়ে শরসন্ধান করিলেন। আপেল বিদ্ধ হইল, কিন্তু পুত্রের মস্তকে বিন্দুমাত্রও আঘাত লাগিল না। সকলেই মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া এই অদ্ভুত ঘটনা দেখিল। সুইজর্লণ্ডের লোকে এই ঘটনার স্মরণার্থে যে স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মিত করে, অদ্যাপি তাহা বিদ্যমান রহিয়াছে।

আপেল বিদ্ধ হইলেই টেল আর একটি শর লুকাইলেন। গবর্ণর তাহা দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি জন্য ঐ দ্বিতীয় শর আনিয়াছিলে? টেল উত্তর করিলেন যে, "যদি প্রথম শর আপেল ভেদ না করিয়া পুত্রের মস্তক স্পর্শ করিত, তাহা হইলে ঐ দ্বিতীয় শরে তোমায় শমনসদনে প্রেরণ করিতাম।" এই বাক্যে গবর্ণর ক্রোধে অধীর হইয়া টেলকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া নিজের নৌকায় লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন এবং নিজেও তাহাতে আরোহণ করিলেন। ইচ্ছা ছিল, কুস্‌নাচ দুর্গের কারাগারে তাঁহাকে ফেলিয়া আসিবেন; কিন্তু তাহা ঘটিল না। জলপথে হঠাৎ ঝড় উঠিল। গবর্ণর জানিতেন, টেল নৌচালনে বিশেষ দক্ষ, এই জন্য তাঁহাকে শৃঙ্খল-মুক্ত করিতে আদেশ দিলেন। টেল শৃঙ্খল-মুক্ত হইয়া অতিবেগে দাঁড় ফেলিয়া তরঙ্গমালা কাটিতে কাটিতে উপকূলাভিমুখে উপস্থিত হইলেন। দূর হইতেই সেই বিরাট পুরুষ একলম্ফে তীরে পতিত হইলেন। গবর্ণর তদীয় অষ্ট্রীয় অনুচরগণ সহ অতল জলে নিমগ্ন হইলেন। এ দিকে সেই মহাপুরুষের পুনরাবির্ভাবে সকল ক্যাণ্টনই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। অষ্ট্রীয় সেনা পরাস্ত হইল এবং সুইস্ দুর্গোপরি আবার জাতীয় পতাকা সগর্ব্বে উড্ডান হইল। উইলিয়ম টেলের অদ্ভুত অবদান পরম্পরা জানেন না, বোধ হয় এমন ইতিহাসপাঠক কেহ নাই। সুইজর্লণ্ডের প্রতি ক্যাণ্টনে উইলিয়ম টেলের কীর্ত্তিস্তম্ভ নিখাত আছে, এবং সেই পার্ব্বত্য প্রদেশের প্রতি অধিবাসীর হৃদয়-মন্দিরে তাঁহার স্মৃতি অদ্যাপি অতি যত্নে ও ভক্তিভাবে পরিরক্ষিত ও পূজিত হইয়া থাকে! ধন্য বীর! ধন্য তোমার স্বদেশানুরাগ।

জন্ হ্যাম্‌ডেন্

পাঠক, চল একবার শ্বেতদ্বীপে যাই। স্বাধীনতার আবাসভূমি ইংলণ্ডে কোন বীর সন্ন্যাসী জন্মিয়াছিল কি না, চল গিয়া সংবাদ লই। এই যে সম্মুখে এক পাষাণময়ী প্রতিমা রহিয়াছে, এ কোন্ দেবতার প্রতিকৃতি? কে যেন উত্তর দিল, এ দেবমূর্ত্তি নয়, নররূপী দেবতা জন্ হ্যাম্‌ডেনের প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি। ঐ দেখ, পাদপীঠবক্ষে কি খোদিত রহিয়াছে। একবার পড়িয়া দেখি। ইহা তাঁহার জীবনের ইতিহাস। যাহা লিখিত আছে, তাহার মর্ম্ম ও তৎসমালোচনা নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

১৫৯৭ খৃষ্টাব্দে এই মহাপুরুষ লণ্ডন নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। যখন প্রথম চার্লসের দুর্ব্বিষহ অত্যাচারে গ্রেট ব্রিটন আলোড়িত হইতেছিল, যখন কেহই সাহস করিয়া তাঁহার কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে সাহসী হন নাই, সেই সময় রাজনৈতিক সন্ন্যাসী জাতীয় স্বাধীনতা-রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। চার্লস অবৈধরূপে সকলের নিকট হইতে টাকা ধার করিতে লাগিলেন। সকলেই অবনত মস্তকে তাহা প্রদান করিতে লাগিল। কিন্তু হ্যাম্‌ডেন প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনি প্রাণ থাকিতে টাকা ধার দিবেন না। ইনি তৎকালে হাউস অব কমন্সের একজন প্রতিভাশালী মেম্বর ছিলেন। ইনি চার্লসকে দেখাইয়া দিলেন যে, প্রজার নিকট ঐরূপে টাকা ধার করা ম্যাগনাচার্টার বিরুদ্ধ। ইহাতে চার্লসের রাগের আর সীমা রহিল না। এত বড় স্পর্দ্ধা যে, সামান্য প্রজা হইয়া রাজার সম্মুখে

ম্যাগ্‌নাচার্টা আনিয়া তাঁহার গতি-রোধ করিতে চেষ্টা করে! এরূপ দুরাচারের—তাদৃশ পাপের—প্রায়শ্চিত্তের একমাত্র স্থান কারাগার। এই বলিয়া তিনি হ্যাম্‌ডেন্‌কে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিলেন। হ্যাম্‌ডেন্‌ কিছুকাল কারাগারে রহিলেন। কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ না থাকায়, অগত্যা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে হইল।

স্বাধীনতা!—এ শব্দ হ্যাম্‌ডেনের শ্রবণে অতি মধুর। বহুমূল্য হীরক অপেক্ষা ইহা তাঁহার নিকট অধিকতর মূল্যবান্‌। কিন্তু তিনি নিজের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার জন্য তত ব্যাকুল ছিলেন না। জাতীয় স্বাধীনতা—ধর্ম্ম, নীতি, রাজনীতি, সমাজ বিষয়ে জাতীয় মত, স্বাতন্ত্র্য—ইহারই জন্য তাঁহার হৃদয়ের অনিয়ন্ত্রিত আকাঙ্ক্ষা। তিনি ইহারই রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতে এবং প্রয়োজন হইলেই সে যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেও প্রস্তুত ছিলেন।

দুর্ভাগ্য চার্লস এ অন্তর্নিগূহিত বিশ্বব্যাপী জাতীয় ভাব বুঝিতে পারিলেন না; না বুঝিয়া অন্ধের ন্যায় সেই জাতীয় ভাবস্রোতের প্রতিকূলে দাঁড়াইলেন; ভাবিলেন না যে, এক শতাব্দী পূর্ব্বে অষ্টম হেন্‌রী যাহা করিতে পারিয়াছিলেন, এক শতাব্দী পরে এখন তিনি তাহা করিতে গেলে বিফলপ্রযত্ন হইবেন; ভাবিলেন না যে, রাজ্যসাগরে তরঙ্গ উঠিলে রাজকীয় তরি তরঙ্গের প্রতিকূলে চালাইলে তাহা নিশ্চয় ডুবিবে; ভাবিলেন না যে, এ সময় কমন্স-গণের সঙ্গে মিট না করিলে তাঁহার আর রাজ্যরক্ষার উপায়ান্তর নাই। এই সকল অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া চার্লস উন্মত্তের ন্যায় নিজপথে চলিলেন। এই সময় তাঁহার সম্মুখীন হইয়া এ কথা বলে, হ্যাম্‌ডেন্‌ ভিন্ন এমন বীরসন্ন্যাসী ইংলণ্ডে আর ছিলেন না। হ্যাম্‌ডেনের চক্ষু দিয়া যেন রক্ত বাহির হইতে লাগিল। তাঁহার ললাট চিন্তায় আকুঞ্চিত হইল। তাঁহার অপ্রতিহত দৃষ্টি ভবিষ্য-গগনে একখানি কাল মেঘ দেখিতে পাইল। তিনি দেখিলেন, চার্লস এই উন্মত্তগতি হইতে যদি নিবৃত্ত না হন, প্রজার সহিত তাঁহার সংঘর্ষ অনিবার্য্য; দেখিয়া তিনি স্পষ্টাক্ষরে চার্লসকে তাঁহার কার্য্যের দায়িত্ব বুঝাইয়া দিলেন; বলিলেন, চার্লস যেরূপ কার্য্য করিতেছেন, তাহা ম্যাগ্‌নাচার্টার সম্পূর্ণ প্রতিকূলে, যদিও হ্যাম্‌ডেন্‌ জাতীয় স্বাধীনতা-রক্ষার জন্য রাজশরীরে অস্ত্র প্রহার করিতেও সঙ্কুচিত ছিলেন না, তথাপি সেই ভাবী অমঙ্গল ভাবিয়া তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। উভয়দিক্‌ যাহাতে রক্ষা হয়, সেই জন্য সেই যোগী ঈশ্বরের নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করিলেন, "ঈশ্বর! তুমি আমার জন্মভূমিকে রক্তপাত হইতে রক্ষা কর; আমাদের রাজাকে তাঁহার ভ্রম দেখাইয়া দেও; তাঁহার মন্ত্রিগণের হৃদয়কে সেই ভ্রান্তপথ হইতে ফিরাইয়া আন।' তাঁহার এই প্রার্থনা ঈশ্বর পূর্ণ করিলেন না। কিন্তু এই প্রার্থনায় তাঁহার চরিত্রের পবিত্রতা ও লক্ষ্যের নির্ম্মলতা সুস্পষ্টরূপে পরিব্যক্ত হইল। বস্তুতঃ রাজতান্ত্রিকদলও তাঁহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে সাহস করেন নাই। বিনীত, সদানন্দ, সাহসী, একাগ্রচিত্ত, বাগ্মী ও উদার-চরিত হ্যাম্‌ডেন্‌ সকল দলেরই পূজিত ছিলেন।

রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে হইবে ভাবিয়া, হ্যাম্‌ডেন্‌ নিরতিশয় কাতর হইলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিলেন, ইহা অনিবার্য্য। তিনি দেখিলেন, জাতীয় স্বাধীনতা অক্ষত রাখিতে হইলে রাজবলি অপরিহার্য্য।

এ দিকে রাজার টাকার একান্ত অভাব হইয়া পড়িল। ধনাগার শূন্য, অথচ পার্লামেণ্ট টাকা দিতে অস্বীকৃত। ইহাতে রাজা ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। পূর্ব্বকালে যখন দিনেমারেরা ইংলণ্ডের উপকূলে আসিয়া লুঠপাট করিয়া লইয়া যাইত, সেই সময় ইংলণ্ডেশ্বর উপকূলবাসী প্রজাবৃন্দকে কয়েকখানি রণতরী সুসজ্জিত করিয়া দিতে বাধ্য করিতেন। তাহারা রণতরী বিনিময়ে কিছু কিছু করিয়া কর দিত। ইহাকে "সিপমনি" বা জাহাজ-কর বলিত। যত দিন দিনেমারদিগের উৎপাত থাকিত, তত দিনই এই কর আদায় করা যাইত। এ নৈমিত্তিক করে রাজার সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা ছিল। তিনি পার্লামেণ্টের অনুমতি না লইয়া, এ কর স্থাপন করিতে পারিতেন এবং আপন ইচ্ছামত সে টাকা ব্যয় করিতেন। তাঁহাকে এ টাকার জন্য কাহার নিকট জবাবদিহি করিতে হইত না। ১৬২৪ খৃষ্টাব্দের ২০শে অক্টোবর লণ্ডনের অধিবাসিবৃন্দের উপর হঠাৎ রাজনামাঙ্কিত এক পরওয়ানা বাহির হইল যে, ১লা নবেম্বরের মধ্যে তাঁহাদিগকে সর্ব্বোপকরণসম্পন্ন সাতখানি রণতরি, লোকজনের ছয় মাসের বেতন সহ রাজার

হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে। নগরবাসীরা এক-বাক্যে ইহার প্রতিবাদ করিলেন। কিন্তু কে সে প্রতিবাদ শুনে? রাজা বধিরের ন্যায় এই জাতীয় আপত্তি ও জাতীয় প্রতিবাদ কর্ণেও স্থান দিলেন না। নির্দ্দিষ্ট সময়ে জাহাজ ও টাকা তাঁহার চাই-ই, এরূপ পরওয়ানা উপকূলবাসী ও মধ্যপ্রদেশবাসী সকল প্রজাগণের উপরই জারী হইল। আবার আদেশ প্রচার হইল যে, জাহাজের পরিবর্ত্তে টাকা দিতে হইবে। প্রতি জাহাজের জন্য ৩,৩০০ পাউণ্ড করিয়া দিতে হইবে। চতুর্দ্দিকে উপদেশ পাঠান হইল যে, যাহারা টাকা না দিবে, তাহাদের যেন সম্পত্তি ক্রোক হয়।

এই বিশ্বজনীন বিপত্তিকালে হ্যাম্‌ডেন্ করদানে অস্বীকার হইলেন। যিনি স্বজাতির ও স্বদেশের মঙ্গলকামী, কারাগার তাঁহার সুখশয্যা, মৃত্যু তাঁহার স্বর্গদ্বার। হ্যাম্‌ডেন্ কারাগার ও মৃত্যু উপেক্ষা করিয়া রাজাজ্ঞার প্রতিবাদ করিলেন। ১০৲ টাকা মাত্র শুল্ক তাঁহার উপর ধার্য্য হইয়াছিল, ইহার জন্য তিনি দেহ, প্রাণ, সম্পত্তি সমস্ত বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইলেন কেন? হ্যাম্‌ডেনের বিপুল সম্পত্তি থাকিতে যে কারণে তিনি পূর্ব্বে রাজাকে টাকা ধার দিতে অস্বীকার হন, সেই একই কারণে আজ ১০৲ টাকা মাত্র সিপমনি কর দিতে অস্বীকৃত হইলেন। "রাজার এই টাকা ধার চাওয়া ও এই কর সংগ্রহ করায় জাতীয় স্বাধীনতার ভিত্তিভূমি 'ম্যাগনাচার্টা'র প্রতিকূলাচরণ করা হইয়াছে"—এই বলিয়াই তিনি বীরের ন্যায় তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। তিনি রাজার কার্য্যের অনুমোদন করিলে হয় ত ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রীর পদে অভিষিক্ত হইতে পারিতেন, কিন্তু জাতীয় স্বাধীনতার নিকট সে পদ তিনি তুচ্ছ মনে করিতেন। তিনি নিজ ব্যক্তিগত মঙ্গল, জাতীয় মঙ্গলে পূর্ণ আহুতি দিয়াছিলেন বলিয়াই, আজ সে প্রলোভনে আকৃষ্ট হইলেন না। তিনি জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য রাজপ্রাসাদ অপেক্ষা কারাগার সুখসেব্য মনে করিলেন। গ্রেট কিম্বল প্রদেশের ত্রিশ জন নিষ্করভোগী তাঁহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তন করিল। সুতরাং সন্ন্যাসীর দল সংখ্যায় বাড়িয়া গেল।

এক্সচেকর কোর্টে হ্যাম্‌ডেনের বিরুদ্ধে রাজপক্ষ হইতে নালিশ রুজু হইল। বার জন জজে বার দিন বসিয়া বিচার করিলেন। 'যাহার অতুল সম্পত্তি, সে বিশ সিলিঙ দিতে এত কাতর, ইহা অপেক্ষা অধিকতর লজ্জাকর আর কি হইতে পারে? হ্যাম্‌ডেনের উপর ২০ পাউণ্ড কর ধার্য্য করা উচিত ছিল'—রাজার উকীল হ্যাম্‌ডেনের প্রতি ইত্যাকার অনেক বাক্যবাণ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে বীরের হৃদয় বিচলিত হইবার নহে। কারণ, টাকার পরিমাণ লইয়া তাঁহার আপত্তি নহে—এরূপ কার্য্য ইংলণ্ডের মূল বিধির বিরুদ্ধ বলিয়াই তাঁহার আপত্তি। সে অলঙ্ঘ্য বিধির নিকট রাজারও অবনত হওয়া চাই—ইহাই হ্যাম্‌ডেনের সঙ্কল্প। দেহ-সংশ্লিষ্ট মস্তক যদি অবনত না হয়, দেহবিচ্ছিন্ন মস্তক তথায় বিলুণ্ঠিত হইবে—ইহাই হ্যাম্‌ডেনের স্থির সিদ্ধান্ত।

জজের অধিকাংশই রাজার পক্ষ অবলম্বন করিলেন। জষ্টিস ক্রাউলে বলিলেন, "রাজা রাখিতে হইলেই তাঁহাকে আপন ইচ্ছামত কর আদায়ের ক্ষমতা দিতে হইবে। এ প্রভুশক্তি বর্জ্জিত রাজা হইতে পারে না; কারণ, তিনি সর্ব্বোপরি প্রভু-শক্তি।" অন্যতর জজ জষ্টিস্ বার্ক্লে বলিলেন যে, "আইনে রাজাকে আবদ্ধ করিতে পারে না। আইন রাজার চিরবিশ্বাসিনী দাসী। প্রজা-শাসন করিবার জন্য ইহা রাজার প্রধান শাসনযন্ত্র। আইন রাজা—এ কথা আমি কখন শুনি নাই—কিন্তু রাজাজ্ঞাই আইন—এই কথাই বরাবর শুনিয়া আসিতেছি—এবং ইহাই সত্য।" জষ্টিস ফিন্স বলিলেন, "পার্লামেণ্টের বিধি রাজার উপর খাটে না; যদিও প্রজার ধন, প্রাণ ও দেহের উপর ইহার সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা আছে।" এইরূপে বার জনের মধ্যে সাত জন জজ রাজার অনিয়ন্ত্রিত প্রভুতার সাপক্ষে মত প্রদান করিলেন। এইরূপে তাঁহারা বিচার-স্বাধীনতা রাজপ্রসাদের নিকট বলি দিলেন। সামান্য চাকরীর অনুরোধে তাঁহারা সত্যের অপলাপ করিলেন। পাঁচ জন জজ হ্যাম্‌ডেনের অনুকূলে মত ব্যক্ত করিলেন। রাজা যে আইনের উপরি—এ কথা তাঁহারা স্বীকার করিলেন না। প্রজার ধন-সম্পত্তির উপরি যে তাহার সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা এবং তাঁহার কার্য্যের ও ইচ্ছার নিয়ামক যে কিছুই নাই—এ মত তাঁহারা অশ্রদ্ধেয় বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিলেন। কিন্তু হ্যাম্‌ডেনের প্রতিকূলে সংখ্যার বহুলতা ছিল বলিয়া, তাঁহাকে

হারিতে হইল। কিন্তু এ হার তাঁহার পক্ষে প্রকৃত বিজয়। এ পরাজয়ে তিনি স্বজাতির হৃদয়মন্দিরে অতি উচ্চ আসন পাইলেন। সিপ্‌মনি-ঘটিত ব্যাপারের পূর্ব্বে অতি অল্প লোকই হ্যাম্‌ডেনের মাহাত্ম্য জানিত। কিন্তু আজ বৃটনের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তাঁহার নাম প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তাঁহার যশ প্রতি গৃহে কীর্ত্তিত হইতে লাগিল। প্রতি জিহ্বা তাঁহার আন্দোলনে ব্যাপৃত হইল। যাহারা জানিত না, তাহারা অনুসন্ধান করিতে লাগিল, এ মহাপুরুষ কে? যিনি এরূপ নিজের দায়িত্বে স্বজাতির স্বাধীনতা ও ধনসম্পত্তি রক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এবং এরূপ অমিতসাহসে স্বদেশকে রাজার করাল গ্রাস হইতে মুক্ত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, সে দেবতা কে? এইরূপ প্রশ্ন ও প্রশ্নের উপরি উত্তর হইতে হইতেই সকলে হ্যাম্‌ডেনকে চিনিল। তখন বৃটনের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা উৎসুক নয়নে ইঁহার দিকে তাকাইয়া রহিল। ইঁহাকে স্বদেশের উদ্ধারকর্ত্তা জানিয়া সকলেই ইঁহার উপরি আত্মসমর্পণ করিল।

পরীক্ষার দিন ক্রমে নিকট হইয়া আসিল। হ্যাম্‌ডেন প্রভৃতি পাঁচ জন হাউস অব কমন্সের সভ্যকে চার্লস অভিযুক্ত করিলেন। কমন্সসভা বিচারের জন্য তাঁহাদিগকে রাজার হস্তে সমর্পণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। চার্লস প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, সশস্ত্র পুরুষ দ্বারা তাঁহাদিগকে বলপূর্ব্বক হাউস অব কমন্স হইতে গ্রেপ্তার করিয়া আনাইবেন। তিনি স্বয়ং শতাধিক সশস্ত্র পুরুষ লইয়া হাউস্ অব্ কমন্সের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। এ দিকে তিনি আসিবার পূর্ব্বেই অভিযুক্ত ব্যক্তিরা সরিয়া পড়িয়াছিলেন; সুতরাং পার্লামেণ্টে গিয়া তিনি নিতান্ত ক্ষুব্ধচিত্ত হইলেন। তিনি উপস্থিত সভ্যগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—'আমি দেখিতেছি, পিঞ্জরস্থ পক্ষিগণ উড়িয়া গিয়াছে। এক্ষণে আশা করি, পাখীগুলি ফিরিয়া আসিলে, আপনারা তাহাদিগকে আমার নিকটে পাঠাইয়া দিবেন।' পার্লামেণ্ট সভা নীরবে রাজার এই উন্মত্ত-প্রলাপ শুনিলেন, কোন উত্তর দিলেন না। তাঁহারা অন্তঃসঙ্ক্ষিত ক্রোধানল অতি কষ্টে সংযমিত করিলেন। কিন্তু যখন চার্লস গৃহ বহির্ভূত হইলেন, তখন তাঁহাদিগের হৃদয় ভেদ করিয়া শব্দ উঠিল, 'অধিকারে হস্তক্ষেপ!—অধিকারে হস্তক্ষেপ!' এই ঘটনার পরে তাঁহারা সভা ভঙ্গ করিয়া চলিয়া গেলেন। আর সে পুরাতন সভাগৃহে তাঁহারা বসিলেন না। এখন হইতে রাজধানীর অভ্যন্তরে একটি বাটীতে সভার অধিবেশন হইতে লাগিল। চার্লস নিরস্ত হইবার নহেন। তিনি রাজধানীর ভিতর দিয়া সেই পঞ্চ সভ্যের গ্রেপ্তারের জন্য কমন্স সভার অভিমুখে ধাবিত হইলেন। পথে প্রজারা সমস্বরে বলিতে লাগিল, 'ধিক্ সে রাজায়। যে প্রজার স্বত্বে হস্তক্ষেপ করে।' দশ দিকে প্রতিধ্বনি উঠিল—'ধিক্ সে রাজায়! যে প্রজার স্বত্বে হস্তক্ষেপ করে।' সকলেই একবাক্যে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল—'ঘাতক-হস্তে কারাগারের ভারার্পণ, দুর্গের সুদৃঢ়ীকরণ, এ সকল দেখিয়া আমাদের মনে ভয়ের সঞ্চার হইতেছে!' রাজা প্রজাদিগের এই সকল ধিক্কারে ও ক্রন্দনে কর্ণপাত না করিয়া, অভীষ্ট প্রদেশে গমন করিতে লাগিলেন। এই উপেক্ষায় প্রজাদিগের অন্তর্নিগূহিত বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। নাবিক, দোকানদার, ভদ্রলোক—সমস্ত নগরবাসী রাজবিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইল; সকলেই ঐ পঞ্চ সভ্যকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। সকলেই রাজার সম্মুখেই উচ্চৈঃস্বরে হ্যামডেনের যশোগান করিতে লাগিল, ক্রোধে ও অভিমানে চার্লস ফিরিয়া গেলেন; কিন্তু প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যদি তাঁহার সাধ্যাতীত না হয়, তাহা হইলে হাউস্ অব কমনস্ সভাকে তিনি পদ-দলিত করিবেন! চার্লসের এ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইল না। ইহার পরিবর্ত্তে তাঁহাকে অবনত-মস্তকে পঞ্চ সভ্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলিয়া লইতে হইল; এবং রাজবেশে তাঁহাকে আর লণ্ডনে ফিরিয়া আসিতে হইল না। তিনি আর একদিন লণ্ডনে প্রবেশ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে রাজবেশে নহে, কারাবাসীর বেশে। কমনস্ সভার সহিত রাজার বিবাদ শীঘ্র মিটিবার নহে। এক্ষণে উভয় পক্ষ হইতে বৃথা বাক্যব্যয় পরিত্যক্ত হইল। উভয় পক্ষ বুঝিলেন যে, আর একসঙ্গে রাজত্ব করা সম্ভব নহে। রাজা ও পার্লামেণ্ট মিলিত হইয়া আর ইংলণ্ডের শাসন করিতে সমর্থ নহেন, এক্ষণে অন্যতরের কাহার রাজত্ব থাকিবে, প্রবলতরের শক্তি তাহার মীমাংসা করিবে।

কমনস্ সভা সুতরাং সৈন্য সংগ্রহ আরম্ভ

করিলেন। হ্যাম্ডেন সর্ব্বাগ্রে সৈনিকপদে ব্রতী হইলেন। তিনি পদাতিক সেনাদলের কর্ণেল-পদে অভিষিক্ত হইতে স্বীকৃত হইলেন, এবং যুদ্ধের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থে স্বয়ং ২৪০০০ টাকা প্রদান করিলেন। ধন্য হ্যাম্ডেন! ধন্য তোমার আত্মত্যাগ! ধন্য তোমার স্বদেশানুরাগ!

১৬৪৩ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে হ্যাম্ডেন এক দল ভলন্টিয়ার সৈন্য লইয়া কুমার রুপার্টের অনুসরণে যাত্রা করিলেন। ম্যালগ্রেভ রণক্ষেত্রে তিনি সসৈন্য কুমারের সম্মুখীন হইলেন। উভয়ের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম বাধিল। যুদ্ধের প্রারম্ভেই একটি গুলী আসিয়া হ্যাম্ডেনকে আহত করিল। তাঁহার সেনা এই ঘটনায় ভগ্নহৃদয় হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। কুমার তাঁহাদিগের অনুসরণে কিয়দ্দূর গিয়া বিফলপ্রযত্ন হইলেন এবং সেতু পার হইয়া অক্সফোর্ডে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

এ দিকে বীরবর হ্যাম্ডেন অশ্বপৃষ্ঠে ধীরে ধীরে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অপসৃত হইলেন। তাঁহার হস্ত ক্রমে অবশ হইয়া অশ্বপৃষ্ঠে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল, দেহ ক্রমে ক্ষীণ হইতেও ক্ষীণতর হইতে লাগিল।

যে অট্টালিকায় তাঁহার শ্বশুর বাস করিতেন, যে অট্টালিকা হইতে তিনি প্রিয়তমা ভার্য্যা এলিজেবেথকে বিবাহ করিয়া আনিয়াছিলেন, অদূরে সেই অট্টালিকা দেখা যাইতেছিল। বড় সাধ, তথায় গিয়া জীবনের শেষ দিন অতিবাহিত করেন, কিন্তু সে সাধ পূরিল না—শত্রুসৈন্য সেই পথ অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। তিনি দেম্ অভিমুখে অশ্ব ফিরাইলেন, তথায় আসিয়া যখন পৌঁছিলেন—তখন তিনি যাতনায় প্রায় বাহ্যজ্ঞানরহিত। দেশের উদ্ধারসাধন করিতে পারিলাম না ভাবিয়া, তাঁহার হৃদয় ফাটিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু সেই মুমূর্ষু-অবস্থাতেও আশা তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই! তিনি ভাবিলেন—'আমি মরিলাম, তাহাতে দুঃখ কি? সহস্র হ্যাম্ডেন জীবিত রহিলেন—মায়ের কার্য্য তাঁহারাই উদ্ধার করিবেন।' এই আশায় প্রোৎসাহিত হইয়া হ্যাম্ডেন সেই মৃত্যুশয্যায় পত্র লিখিয়া বৈপ্লবিক অধিনায়কদিগের নিকট বিদায় চাহিলেন ও কিরূপে জাতীয় সমর চালাইতে হইবে, তদ্বিষয়ে তাঁহাদিগকে উপদেশ দিলেন। পত্র লেখা সমাপ্ত হইল—আর সেই হস্ত নিস্পন্দ হইল! সে দেহে আর চৈতন্য রহিল না। যেন জীবনের কার্য্য সমাপ্ত হওয়ায়, সেই চৈতন্যমূর্ত্তি এ পাপ পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন। চতুর্দ্দিকে গগন বিদারিয়া হাহাকার ধ্বনি উঠিল! ইংলণ্ডের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা হ্যাম্ডেনের শোকে অভিভূত হইয়া পড়িল।

ইংলণ্ডের অধিবাসিগণ হ্যাম্ডেনকে বীরোচিত সমাধি প্রদান করিলেন। জাতীয় সৈন্যদল বেয়নেট্ অবনত করিয়া তাঁহার মৃতদেহ সমাধি-নিহিত করিল। প্রত্যেক সৈনিকপুরুষ হ্যাম্ডেনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে উদ্দীপিত হইয়া প্রত্যেকে হ্যাম্ডেনের আত্মাকে সাক্ষী করিয়া মাতৃভূমির চরণে আত্মসমর্পণ করিল। তাহার পরে তাহারা ঈশ্বরের মহিমা ও হ্যাম্ডেনের যশোগান কীর্ত্তন করিতে করিতে সমাধিস্থল হইতে ফিরিয়া আসিল। ধন্য বীর, ধন্য! তুমি মরিয়াও অমরত্ব লাভ করিলে। তুমি মরিলে বটে, কিন্তু তোমার দৃষ্টান্তে ইংলণ্ডে সহস্র সহস্র হ্যাম্ডেন আবির্ভূত হইল। তুমি ভগ্নহৃদয়ে গমন করিলে বটে, কিন্তু তোমার আরব্ধ কার্য্য তোমার শিষ্যেরা সম্পন্ন করিল। তুমি এ যজ্ঞে আত্মবলি না দিলে, কখন এ যজ্ঞ সমাপ্ত হইত না। যে দুর্দ্দম চার্লস তোমার কেশস্পর্শ করিতে গিয়াছিল, ঐ দেখ, তাহার কাটামুণ্ড ভূমিতে গড়াগড়ি যাইতেছে। যে ইংলণ্ডের স্বাধীনতার জন্য তুমি প্রাণ দিয়াছিলে, ঐ দেখ, সেই ইংলণ্ড আজ স্বাধীন, উন্মুক্ত, উজ্জ্বল ও নববাসে বিভূষিত। আজ সাধারণতন্ত্রী ইংলণ্ডের প্রতাপে মেদিনী কম্পমান! যে মূর্খ, সেই বলে—মহাপুরুষের মৃত্যু হয়; না—মহাপুরুষের মৃত্যু নাই! তিনি অমর, তাঁহার কীর্ত্তি অনন্তকালস্থায়িনী!

বিশ্বপ্রেমিক উইলবারফোর্স, হাউয়ার্ড ও রোমিলী

—*—

যে দেশে স্বজাতি-প্রেম ও স্বদেশানুরাগের কার্য্য পরিসমাপ্ত হয়, সেখানে বিশ্বপ্রেম ও বিশ্ব-নাগরিকতার কার্য্য আরম্ভ হয়। উন্নতিশীল মন গতিপ্রবণ। সে কোন স্থানেই স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। ক্রমেই অগ্রসর হইতে থাকে এবং অগ্রসর হইতে হইতে ক্রমে কার্য্যপরিধি বাড়াইয়া লয়। আপনা হইতে পরিবার, পরিবার হইতে

আত্মীয়-স্বজন, আত্মীয়-স্বজন হইতে স্বদেশ ও স্বজাতি, স্বদেশ ও স্বজাতি হইতে সমস্ত পৃথিবী ও মানবজাতি, মানবজাতি হইতে প্রাণিজগৎ—ক্রমেই প্রেমের বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। হৃদয় প্রশস্ত হইতে ক্রমেই প্রশস্ততর হইয়া এই ক্রম অবলম্বন করে। প্রাণিজগৎ পর্য্যন্ত কেবল শাক্যসিংহ প্রভৃতি কতিপয় আর্য্য ঋষি উঠিয়াছিলেন।—'মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি।' "সর্ব্বভূতেষু সমদর্শী"—ভারত ভিন্ন এ প্রকাণ্ড নীতি আর কোন দেশ শিক্ষা দিতে পারে নাই। কিন্তু মানবজাতির প্রতি প্রেম অনেক দেশ শিক্ষা দিয়াছে। মানবজাতির জন্য অধুনাতন সকল দেশ অপেক্ষা ইংলণ্ড অধিক করিয়াছেন ও অধিক ভাবিয়াছেন। কারণ, ইংলণ্ডে স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতিপ্রেমের প্রধান প্রধান কার্য্য অনেক দিন পরিসমাপ্ত হইয়াছে। ব্যক্তিগত ও জাতিগত স্বাধীনতার পূর্ণতায় ইংলণ্ড জগতের আদর্শ। ইংলণ্ড—ইউরোপ ও আমেরিকার রাজনৈতিক শিক্ষা গুরু। ইংলণ্ড ছাড়িয়া যাইবার পূর্ব্বে তথায় মানবপ্রেম ও জগদনুরাগের কি কি কার্য্য হইয়াছে, কোন্ কোন্ সন্ন্যাসী সেই মহৎযজ্ঞে আত্ম-আহুতি প্রদান করিয়াছেন—এই সকল বিষয়ে কিছু আলোচনা করিব। আমরা তিন জনমাত্র সন্ন্যাসীর জীবনী অঙ্কিত করিব। বিশ্বপ্রেমিকের জীবন অতি মহৎ। বিশ্বপ্রেমিকের জীবনের ব্রত দেবতার অনুকরণীয়। যাহাকে সকলে অশ্রদ্ধা বা অবহেলা করে, তাহার জন্য ভাবিব; যে উৎপীড়িত, বুক দিয়া তাহাকে রক্ষা করিব; যাহাকে সকলে নির্যাতন করিতেছে, তাহাকে আশ্রয় দিব; যে কষ্ট পাইতেছে, তাহার কষ্ট-নিবারণ করিব; যে শোক পাইয়াছে, তাহাকে সান্ত্বনা দিব, তাহার অশ্রুজল মুছাইব; যে অসহায়, তাহার সহায় হইব; যে পড়িয়া যাইতেছে, তাহাকে ধরিয়া তুলিব; যে দুর্ব্বল, তাহার বলবৃদ্ধি করিব; যে জাতি পদদলিত, তাহার পক্ষসমর্থন করিব—যে মহাপুরুষ দেশ, জাতি, বর্ণ, ধর্ম্ম প্রভৃতি প্রভেদ ভুলিয়া সকলের প্রতি সমভাবে এই সকল কার্য্য করিতে পারেন, তিনি দেবতার দেবতা। কারণ, স্বজাতিপ্রেমিক আমাদের উপাস্য দেবতা। বিশ্বপ্রেমিক সে দেবতারও দেবতা। যেমন পারিবারিক প্রেম স্বজাতিপ্রেমের একটি ক্ষুদ্র অংশমাত্র, সেইরূপ স্বজাতিপ্রেমও বিশ্বপ্রেমের একটি সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র। মানবহৃদয়ের উঠিবার এই তিনটি ক্রম। এক একটিতে সিদ্ধ না হইলে, অপরটিতে উঠিবার অধিকার জন্মে না। ইংলণ্ড স্বজাতিপ্রেমের উৎকর্ষ দেখাইয়াছেন বলিয়াই তাঁহার সেই সর্ব্বোচ্চক্রমে যাইবার অধিকার জন্মিয়াছে। এই জন্যই ইংলণ্ডকে জগতের শিক্ষা-গুরু বলিয়া মনে করি। এ জন্যই ইংলণ্ডে অনেক বিশ্বপ্রেমিকের আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা এখানে কেবল তিন জনমাত্র বিশ্বপ্রেমিকের চরিত্র চিত্রিত করিব—উইলবারফোর্স, হাউয়ার্ড ও রোমিলী।

উইল্‌বারফোর্স

বহুকাল হইতে জগতে দাসত্বপ্রথা চলিয়া আসিতেছে। সকল দেশেই কোন না কোন প্রকারে এই প্রথার অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা লইয়া মধ্যে মধ্যে অনেক আন্দোলন হইয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা তুলিয়া দিবার চেষ্টা কেবল ইংলণ্ড ও আমেরিকাতেই হইয়াছে। স্পার্টার হেলট, রোমের গ্লাডিএটর ও আধুনিক নিগ্রো দাসদিগের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে, পাষাণও বিগলিত হয়। মানুষ স্বার্থে অন্ধ হইলে কি পৈশাচী মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারে—এই দাসপ্রভুগণ তাহার নিদর্শন।

১৪৪০ খৃষ্টাব্দে এনথনী গাব্‌সালেজ নামক এক জন পর্টুগীজ কাপ্তেন আফ্রিকার উপকূলে বাণিজ্যার্থ যাইয়া সাহারার প্রবেশপথ হইতে কয়েকজন মূরকে ধরিয়া আনিয়া দাসরূপে পরিণত করেন। দুই বৎসর পরে যুবরাজ হেনরী এই সংবাদ শুনিতে পান। তিনি পূর্ব্বোক্ত কাপ্তেনকে তৎক্ষণাৎ আদেশ করেন, 'উহাদিগকে যথাস্থানে রাখিয়া আইস।' কাপ্তেন তাহাদিগকে ফিরিয়া লইয়া যাওয়ায় মূরেরা তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সুবর্ণচূর্ণ ও দশ জন নিগ্রো উপহার দেয়। তিনি তাহাদিগকে লইয়া আসিয়া দাসরূপে পরিণত করেন। এইরূপে নিগ্রো দাসত্বের উৎপত্তি হয়।

যখন স্পেনীয়েরা প্রতীচ্য দ্বীপ দখল করে, তখন খনি-খনন ও কৃষিকার্য্য করণাদির জন্য তাহাদিগের

শ্রমজীবীর প্রয়োজন হইয়া উঠে। তাহারা দেখিল, আফ্রিকা-উপকূল হইতে দাস আনিয়া এই কার্য্য সম্পন্ন করা সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও সুলভ। ১৫০৩ খৃষ্টাব্দে পর্টুগীজেরা স্পেনীয় উপনিবেশ সকলে দাস বিক্রয় করিয়া আইসে। তৎপশ্চাৎ স্পেনীয় বণিকেরা অধিকতর লাভজনক দেখিয়া স্বয়ং এই দাস-ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়। সুবর্ণচূর্ণ আনিতে তাহারা পূর্ব্ব হইতেই গিনি উপকূলে যাইত, কিন্তু এক্ষণে সুবর্ণচূর্ণ ব্যবসায় তত দূর লাভজনক নহে দেখিয়া তাহারা অধিকতর লাভকর দাস-ব্যবসায় আরম্ভ করিল। ক্রমে গবর্ণমেণ্টও আইন দ্বারা ইহার বৈধতা সম্পাদন করিলেন। অনবরত জাহাজে করিয়া বোঝাই হইয়া নিগ্রো দাস সকল আমেরিকায় চালিত হইতে লাগিল। হতভাগ্যগণের অশ্রুজলে অ্যাটলাণ্টিক-বক্ষ ভাসিয়া গেল। ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ পঞ্চম চার্লস এক ব্যক্তিকে বৎসরে বৎসরে ৪০০০ করিয়া নিগ্রো দাস হিস্পানিওয়ালা, কিউবা ও জামেকা এবং পোর্টরিকোতে লইয়া যাইবার জন্য একচেটিয়া পাট্টা দিলেন। তাঁহাকে ইহার জন্য পরে অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কিছু ফল ফলে নাই। বীজ বপন করা যত সহজ, সেই বীজ দূরপ্রথিতমূল বৃক্ষরূপে পরিণত হইলে তাহা ছেদন করা তত সহজ নহে। ফরাসীরাজ ত্রয়োদশ লুইও 'ঈশ্বরের মহিমা বিস্তার ও নিগ্রোদিগের মঙ্গলের জন্য' দাসত্ব ব্যবসায় বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। রাজ্ঞী এলিজেবেথের সময় ইংরাজেরা সর্ব্বপ্রথমে এই ব্যবসায়ে লিপ্ত হন। সার্ জন হাকিংস সর্ব্বপ্রথম দাসব্যবসায়ী। তিনি এলিজেবেথের নিকটে প্রতিশ্রুত হন যে, যে ব্যক্তি নিগ্রো দাস হইতে আপত্তি করিবে, তাহার গাত্রস্পর্শ করিবেন না। কিন্তু তিনি সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন নাই। অচিরকালমধ্যে তিনি অসংখ্য নিগ্রোকে বলপূর্ব্বক জাহাজে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। অন্যান্য জাতি অর্থ দ্বারা রাজি করিয়া নিগ্রোকে দাস করিয়া লইয়া যাইত, কিন্তু ইংরাজেরাই সর্ব্বপ্রথমে দস্যুবৃত্তি আরম্ভ করিলেন। বলপূর্ব্বক নিগ্রোদিগকে ধরিয়া লইয়া যাইবার প্রথায়, তাঁহারাই পথপ্রদর্শক হইলেন। এই প্রথা ক্রমেই অতি ভীষণ আকার ধারণ করিল। ষ্টুয়াটবংশের রাজ্যকালে প্রতীচ্য দ্বীপপুঞ্জের প্রত্যেক হাটে নিগ্রো দাস পণ্যদ্রব্যের ন্যায় বিক্রীত হইত।

শুনিয়া পাঠকগণ বিস্মিত হইবেন যে, ১৭০০ হইতে ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ব্রিটেন্ শুদ্ধ জামেকাদ্বীপে ৬,১০,০০০ দাস প্রেরণ করেন; ১৬৮০ হইতে ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ব্রিটিশ উপনিবেশ সকলে ২১,৩০,০০০ দাস প্রেরিত হয়। ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে যখন এই জঘন্য ব্যবসায় ইহার চরম সীমায় উপনীত হয়, সেই বৎসরেই ১৯২ খানি ইংরাজ বাণিজ্যতরি ৪৭,১৪৬ জন নিগ্রো দাস লইয়া আমেরিকায় গমন করে। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দের তালিকা গ্রহণ করিয়া দেখিতে পাই, সমস্ত ইউরোপ বৎসরে ৭৪,০০০ হাজার করিয়া নিগ্রোকে দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে; তাহার মধ্যে একা ইংরাজ বাহাদুরই ৩৮,০০০ হাজার করিয়া আমদানী করিতেন। যাঁহার হৃদয়ে বিন্দুমাত্র দয়া আছে, যাঁহার কণামাত্র মনুষ্যত্ব আছে, এমন কোন্ ব্যক্তি এই কথা শুনিয়া লজ্জায় মুখ না লুকাইবেন? মানবকুলে এমন কোন্ ব্যক্তি আছেন, যাঁহার এই কথা শুনিয়া আপনাকে মানুষ বলিয়া পরিচয় দিতে মাথা কাটা না পড়িবে? উপরে যে সংখ্যাবলী প্রদান করিলাম, তাহা কাহারও কল্পনা নহে, সাম্যবাদিগণের অতিরঞ্জিত চিত্র নহে; দাসপ্রভুগণের প্রদত্ত তালিকা—মানবজাতির অক্ষালনীয় কলঙ্কের অসন্দিগ্ধ কীর্ত্তিধ্বজা! ধিক্ মানব! তোমার অসাধ্য কিছুই নাই। ধিক্ ইউরোপ!! শত ধিক্ তোমায় ইংলণ্ড!

ইংলণ্ডের পাপের ভরা পূর্ণ হইল দেখিয়া, কয়েকজন মনীষীর হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল। শার্প উইল্‌বার্‌ফোর্স, ক্রাম্ বক্‌স্টন্ প্রভৃতি মনীষিগণ স্বদেশের ও স্বজাতির এই গুরুতর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ইঁহারা প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যে কোন প্রকারে ইংলণ্ড হইতে দাসত্বব্যবসায় উঠাইয়া দিয়া ইংলণ্ডকৃত পাপের কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত করিবেন। উইলবার্‌ফোর্স এই মনীষিগণের অধিনায়ক মনোনীত হইলেন। এই কার্য্য সিদ্ধ করিতে এই মহাপুরুষ আপনার সমস্ত জীবন ব্যয় করিয়াছিলেন। এই স্থানে আমরা সেই ঋষিপ্রবরের জীবনের গুটিকত ঘটনা উল্লেখ করিব।

এই মহাত্মা ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে শরৎকালে ইংলণ্ডের অন্তর্গত হল নগরে জন্মগ্রহণ করেন। দশম বৎসরে পদার্পণ করিতেই তাঁহার পিতার পরলোকপ্রাপ্তি

হয়। পিতার মৃত্যুর পর তিনি পিতৃব্যের যত্নে লালিত ও পালিত হন। তিনি কলেজ ছাড়িয়াই একবিংশতি বৎসর বয়সের সময় হল নগরের প্রতিনিধিরূপে পার্লামেণ্টে প্রবিষ্ট হন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে মন্ত্রিপ্রবর পিটের সহিত তাঁহার সখ্য সংস্থাপন হয়। পার্লামেণ্ট কার্য্যক্ষেত্রে আসিয়া তাঁহাদের সেই সখ্য দৃঢ়ীভূত হয়। উইলবার্ ফোর্সের স্বাভাবিকী প্রতিভা নিরন্তর পরিমার্জ্জনে অধিকতর পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। তিনি বাগ্মী বলিয়া বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং হাউস্ অব্ কমন্সে তাঁহার প্রতিষ্ঠা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। তিনি বৈধিক সংস্কারকার্য্যে মন্ত্রিপ্রবর পিটের প্রধান হস্তাবলম্বন হইয়াছিলেন।

১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে দাসব্যবসায় সম্বন্ধে তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হয়। এই সময় হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি সন্ন্যাসী। নিজের সুখ, দুঃখ ও সৌভাগ্যে তিনি পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। কি নিদ্রায়, কি জাগরণে, কি গৃহে, কি বাহিরে—তাঁহার মনে এই একই সর্ব্বগ্রাসিনী চিন্তা—কেমন করিয়া ইংলণ্ডের অক্ষালনীয় কলঙ্কের অপনয়ন করিবেন, কেমন করিয়া দাস-ব্যবসায় উঠাইয়া দিবেন। তিনি দেখিলেন, দাস-ব্যবসায় ইংলণ্ডের অমল ধবল যশে গভীর কলঙ্ক-রেখা। তিনি দেখিলেন, এই প্রথা থাকিতে ইংলণ্ডের স্বাধীনতা-প্রিয়তা জগতের পরিহাসোদ্দীপক। অসংখ্য দাসপতি অগণ্য মুদ্রা দিয়া লক্ষ লক্ষ দাস ক্রয় করিয়াছেন, তাহাদের পরিশ্রমে অতুল সম্পত্তির ঈশ্বর হইয়াছেন—এক্ষণে কেমন করিয়া তাঁহাদিগকে এ লাভকর বাণিজ্য হইতে নিরস্ত করেন—ভাবিয়া ভাবিয়া নিরন্তর ভাবিয়া, তাঁহার তনু ক্ষীণ হইল। তথাপি তাঁহার একই সঙ্কল্প। কিরূপে ইহা সংসিদ্ধ করিবেন—তাহা জানেন না, অথচ এই লক্ষ্য সংসাধনে তিনি নিজ জীবন উৎসর্গ করিলেন। অবিচলিত, সুদৃঢ় ও ও একাগ্র চিত্তে তিনি এই কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হইলেন। সেই বহুকালব্যাপী তপস্যায় তিনি যে ধৈর্য্য, সূক্ষ্মদর্শিতা ও সৎসাহস প্রকটীকৃত করিয়াছিলেন, তাহাতে ইংলণ্ড বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে তিনি সর্ব্বপ্রথমে পার্লামেণ্টে এই প্রস্তাব অবতারণ করেন। তিনি প্রতিবার প্রস্তাব করিতেছেন, প্রতিবার তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হইতেছে। কিন্তু সেই নিঃস্বার্থ বিশ্বপ্রেমিক কিছুতেই ভীত বা বিচলিত হইবার নহেন। প্রোত্তুঙ্গ হিমাচলের ন্যায় তিনি অটলভাবে সমস্ত আপত্তি-ঝটিকা সহিতে লাগিলেন। বৎসর বৎসর তাঁহার প্রস্তাব উন্মত্ত-প্রলাপ বলিয়া প্রত্যাখ্যাত হইতে লাগিল। অথচ সে যোগীর ধ্যানভঙ্গ হইল না। সাগরগামিনী স্রোতস্বিনীর গতির ন্যায় অভিলষিত বিষয়ে কৃতসঙ্কল্প মনের গতিকে কে রোধ করিতে পারে? এক এক করিয়া ক্রমে বিশ বৎসর অতীত হইল, এ ঘোর তপস্যা পার্লামেণ্ট আর সহিতে পারিলেন না। এই তাপদানলে ক্রমে পাষাণ গলিয়া জল হইল। যে নয়ন এত দিন শুষ্ক ছিল, আজ তাহা হইতে অবিরল বারিধারা পড়িতে লাগিল। উইলবারফোর্স কাঁদিয়া কাঁদিয়া—অবিরাম কাঁদিয়া—শেষে পার্লামেণ্টেকেও কাঁদাইলেন। এত দিনে পার্লামেণ্টের চৈতন্য হইল, তাঁহারা কি কুকাজ করিয়া আসিয়াছেন! দাসব্যবসায়ের অনুমোদন করিয়া তাঁহারা কি দুরপনেয় কলঙ্কের অংশভাগী হইয়া আসিয়াছেন! আজ তাঁহাদের পাপ তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, বুঝিয়া তাহার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে যত দাস ছিল, পার্লামেণ্ট দাসপ্রভুদিগের নিকট সমস্ত কিনিয়া লইয়া, তাহাদিগকে পূর্ণ মুক্তি দিলেন, আর ভবিষ্যতের জন্য বিধান করিলেন যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে আর কেহ কখন দাস ক্রয় করিতে পারিবে না! যেমন পাপ, তেমনই প্রায়শ্চিত্ত! প্রায়শ্চিত্তে জগৎ বিমুগ্ধ হইল। জাতীয় আত্মত্যাগের এরূপ দৃষ্টান্ত জগতে আর কখন দেখা যায় নাই। এক উইলবারফোর্সের আত্মত্যাগের দৃষ্টান্তে সমস্ত ইংলণ্ড আত্মবিসর্জ্জন শিখিল। একজনের কঠোর তপস্যায় সমস্ত পার্লায়ামেণ্ট সভা সন্ন্যাসী-সমিতিতে পরিণত হইল। যে জাতি এক টাকা ছাড়িতে কাতর ছিলেন, সে জাতি আজ কোটি কোটি টাকা অকাতরে বিসর্জ্জন করিলেন; কোটি কোটি টাকা দিয়া দাসপ্রভুগণের নিকট দাসগণের স্বাধীনতা ক্রয় করিলেন। যে জাতি একদিন ঈশ্বরের মূর্ত্তিমতী প্রকৃত মানব আকৃতি লইয়া বাণিজ্যধ্বজা উড়াইয়াছিলেন, এই মহাপুরুষের চরিত্র-গৌরবে সেই জাতির রণতরী

সকল পৃথিবী হইতে দাস ব্যবসায় উঠাইবার জন্য আজও সপ্তসমুদ্র আলোড়ন করিয়া বেড়াইতেছে। ধন্য উইলবারফোর্স! ধন্য তোমার জীবন! কত দিন হইল তুমি পৃথিবী ত্যাগ করিয়া * বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়াছ, কিন্তু তোমার জীবন্ত বিশ্বপ্রেম আজও প্রতি ইংরাজকে দেবতা করিয়া রাখিয়াছে!

জন্ হাউয়ার্ড

—*—

আর একজন সন্ন্যাসীর জীবনী ধরি। চল, একবার অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় কারাগারের অভ্যন্তরে যাই—যথায় যমসদৃশ জেলারেরা কশাহস্তে হতভাগ্য এবং হতভাগিনীর দলকে তাড়াইয়া লইয়া বেড়াইতেছে, কোন কাজ করিতে একটু বিলম্ব হইলে তৎক্ষণাৎ কশাঘাতে তাহাদিগের পৃষ্ঠদেশ ক্ষতবিক্ষত করিতেছে, সমস্ত দিন কঠিন পরিশ্রম করাইয়া অনশনে বা অদ্ধাশনে তাহাদিগকে পশুপালের ন্যায় পবনদেবসম্পর্কবিরহিত ভীষণ অন্ধ কারাগারে পুরিয়া চাবি দিতেছে। তথায় দাঁড়াইয়া হতভাগা ও হতভাগিনীদিগের দুঃখে যিনি নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছেন, ঐ দেবতা কে? উনিই প্রাতঃস্মরণীয়-চরিত জন্ হাউয়ার্ড। সেই অভাগা ও অভাগিনীগণের দুঃখকাহিনী ইনিই মুক্তকণ্ঠে জগতে প্রচার করেন। যখন সমস্ত পৃথিবী অপরাধী ও অপরাধিনীগণের দুঃখ-যন্ত্রণায় সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল, সেই সময়ে তাহাদের অবস্থা ভাবিয়া হাউয়ার্ডের প্রাণ কাঁদিল। সমাজ যাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছে, বিস্মৃতিজলে বিসর্জ্জন দিয়াছে, সেই অভাগা ও অভাগিনীগণের প্রতি হাউয়ার্ডের হৃদয় প্রেমবিগলিত ভাব ধারণ করিল! কারাবাসীকে দেখিলে লোকের মনে ঘৃণার উদ্রেক হইত, কিন্তু তাহাদের দুঃখে, তাহাদের হতাশাপীড়িত অবস্থায়, তাঁহার হৃদয় নিদারুণ ব্যথিত হইত। তিনি প্রতি কারাগারে তাহাদিগের অবস্থা দেখিয়া বেড়াইতেন। শুদ্ধ ইংলণ্ড নয়, সমস্ত ইউরোপ তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র ছিল। তিনি ইউরোপের সমস্ত কারাগার পরিদর্শন করিয়া বিভিন্ন দেশের কারাবাসীদিগের অবস্থা তুলনায় সমালোচনা করিতেন। কারাগারের প্রস্তরময় প্রাচীর ভেদ করিয়া যে দুঃখের কাহিনী বাহিরে যাইত না, হাউয়ার্ড আজ সেই দুঃখের কাহিনী জগতে গাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অনাহারে, কশাঘাতে, কত শত নরনারী কারাগারের অভ্যন্তরে সমাধিনিহিত হইত, পৃথিবী তাহার সংবাদ রাখিত না; আজ হাউয়ার্ড সে সকল গুপ্তহত্যার সংবাদ জগতে প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কারাগারের তমোময় নিভৃত নিবাসে কত লোক মলমূত্রে পচিয়া মরিয়া থাকিত, জগৎ তাহার সন্ধান রাখিত না, আজ হাউয়ার্ড সেই সকল শোচনীয় ঘটনা জগতে প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কালে তাঁহার প্রচারের ফল সকল দেশেই ফলিতে লাগিল। ইউরোপের সকল কারাবাসীই তাঁহার পরিশ্রমের উপকার কিছু কিছু পরিমাণে পাইতে লাগিল। এখন যে ইউরোপের সর্ব্বত্র বায়ু-সঞ্চালিত সুপ্রশস্ত, সুপরিষ্কৃত, সুসজ্জিত, বিলাসদ্রব্যপূর্ণ কারাগার সকল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এই মহাপুরুষের কীর্ত্তির জলন্ত প্রমাণ।

১৭২৬ খৃষ্টাব্দে জন্ হাউয়ার্ড ইংলণ্ডের অন্তর্গত হ্যাক্‌নে নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা একজন ব্যবসায়ী লোক ছিলেন, এবং ব্যবসায় দ্বারা যথেষ্ট সম্পত্তি করিয়াছিলেন। তিনি পুত্রকেও ব্যবসায় শিখাইবার জন্য এক কারখানায় শিক্ষানবীশ রাখিলেন। সেই সময় তাঁহার মৃত্যু হইল। মৃত্যুকালে তাঁহার বিপুল সম্পত্তি তিনি উইল দ্বারা আপনার পুত্র ও কন্যাকে দিয়া গেলেন; কিন্তু বন্দোবস্ত করিয়া গেলেন যে, পুত্রের ২৫ বৎসর বয়স না হইলে, তিনি প্রাপ্তবয়স্ক বলিয়া বিবেচিত হইবেন না। পিতার মৃত্যুর পরে হাউয়ার্ড শিক্ষানবীশি ছাড়িয়া দিলেন। কারণ, ব্যবসায় তাঁহার ভাল লাগিল না। ছাড়িয়া দিয়া তিনি ষ্টোক নিউইংটন নগরের ক্রাইষ্ট ষ্ট্রীটে একটি বাসা লইলেন। তাঁহার শরীর এ সময়ে বড় অসুখ ছিল। সারা লাডেন্ নামক এক প্রবীণা বিধবা রমণী সেই বাসাবাড়ীর অধিস্বামিনী ছিলেন। তিনি প্রাণপণে হাউয়ার্ডের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। হাউয়ার্ড অচিরকালমধ্যে নিরাময় হইয়া উঠিলেন। তিনি কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ

---

* ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জুলাই এই মহাপুরুষের মৃত্যু হয়।

তাঁহার পাণিগ্রহণে ইচ্ছুক হইলেন। বিধবা রমণী তাঁহা অপেক্ষা প্রায় ২৪।২৫ বৎসরের বড়। এই জন্য তিনি অনেক আপত্তি করিলেন। কিন্তু হাউয়ার্ড সে আপত্তি গ্রাহ্য করিলেন না। প্রবীণা রমণী তাঁহার আগ্রহাতিশয়ে শেষে অগত্যা সম্মত হইলেন। হাউয়ার্ড লোকের নির্যাতন-ভয়ে গোপনে তাহাকে বিবাহ করিলেন। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে এই বিবাহ হয়; কিন্তু তিনি অধিক দিন এই পতিপরায়ণা রমণীর শুশ্রূষা ভোগ করিতে পারেন নাই। কারণ, তিন বৎসরের মধ্যেই তিনি বিপত্নীক হন। ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দের ১০ই নবেম্বর চুয়ান্ন বৎসর বয়সে তাঁহার পত্নীর মৃত্যু হয়। তাঁহারা এই তিন বৎসর অতি সুখে কাটাইয়াছিলেন। পত্নীর মৃত্যুতে হাউয়ার্ড অতিশয় শোকাকুল হইলেন।

পর-বৎসরে (১৭৫৬ খৃঃ) তিনি একখানি পর্টুগীজ জাহাজে করিয়া লিসবনে যাইতেছিলেন। একখান ফরাসী জাহাজ পথিমধ্যে তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করিল। ফরাসী কারাগারের দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা নিজে অনুভব করিয়া তিনি কারাগার-সংস্কারে জীবন উৎসর্গ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। দুই দিন নিরম্বু উপবাসী অবস্থায় তাঁহারা ফ্রান্সের অন্যতম বন্দর ব্রেষ্ট নগরের দুর্গে নীত হইলেন। সেখানে তিনি ছয় রাত্রি শুদ্ধ খড়ের উপরে পড়িয়া রহিলেন। তথাকার মর্টেক্স, কার্টেস, ব্রেণ্ট, মার্লেক্স, ও ডুইনাইন প্রভৃতি নগরের কারাগারে অনেক ইংরাজ বন্দী ছিল। তাহাদিগের সহিত তাঁহার লেখালেখি চলিতে লাগিল। তিনি বিবিধ প্রমাণ পাইলেন যে, ইংরাজ বন্দীদিগের প্রতি ফরাসীরা অতি নৃশংস ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই নৃশংস ব্যবহারে কত শত ইংরাজ-বন্দী শমন-সদনে প্রেরিত হইয়াছে। পাঠক! এই বলিলেই মৃত্যুসংখ্যা অনুমান করিতে পারিবেন যে, ডুইনানে একটি গর্ত্তে এক দিনে ছত্রিশ জন ইংরাজ-বন্দীকে জীবন্ত প্রোথিত করা হয়। হাউয়ার্ডের কোমল হৃদয় ইহাতে বিগলিত হইল! তিনি ইংলণ্ডে আসিয়া এই সকল কথা জানাইলে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ফরাসী গবর্ণমেণ্টকে ভৎসনা করিয়া চিঠি লিখিলেন। তাহাতে ফরাসী গবর্ণমেণ্ট লজ্জিত হইয়া অবশিষ্ট ইংরাজ বন্দীদিগকে ছাড়িয়া দিলেন।

তাহার পরে তিনি ইতালীয় কারাগার সকল পরিদর্শন করিতে ইতালী যাত্রা করিলেন: ইতালী হইতে প্রত্যাগত হইয়া তিনি আবার বিবাহ করিলেন। এই রমণী একটি পুত্র-সন্তান প্রসব করিয়া সূতিকাগারেই প্রাণত্যাগ করিলেন। সন্তানটিও কালে উন্মাদ-রোগগ্রস্ত হইল। হাউয়ার্ড ভগ্নমনে ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী বেডফোর্ড নগরের অদূরবর্ত্তী নিজ জমীদারীতে গমন করিলেন। এইখানেই তাঁহার জীবনের মাহাত্ম্য বিশেষরূপে প্রচারিত হয়।

১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে তিনি বেডফোর্ড কাউন্টির সেরিফ-পদে অভিষিক্ত হন। বেডফোর্ডের কারাগার সকল ও কারাবাসিগণের অবস্থা তাঁহার চিত্তকে আকৃষ্ট করে। তাঁহার প্রথমে বোধ হইয়াছিল যে, বেডফোর্ডের কারাগার সকলের মত জঘন্য ও নৃশংসতার আবাসভূমি কারাগার বুঝি ব্রিটনে আর কুত্রাপি নাই। এই বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ হইবার জন্য তিনি ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড ও আয়র্লণ্ডের কারাগার সকল পরিদর্শন করিয়া বেড়াইলেন। যতই অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, ততই মর্ম্মভেদী ঘটনা সকল বিদিত হইতে লাগিলেন। তিনি স্বচক্ষে দেখিলেন; সুতরাং তাঁহার প্রতীতি জন্মিল যে, ব্রিটনের কারাগার সকল নির্লজ্জতার গহ্বর ও পাপের অগ্নিকুণ্ড। যাহারা কারাগারে যায়, শুদ্ধ তাহাদিগেরই শরীর ও নীতি যে কলুষিত হয়, এরূপ নহে, কিন্তু তাহারা বাহির হইয়া আসিয়া সমাজমধ্যে সেই শারীরিক ও নৈতিক পীড়া সংক্রামিত করে। হাউয়ার্ড পার্লামেণ্টকে এই বিষয় বিদিত করিলেন। পার্লামেণ্ট তাঁহার সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া, তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলেন।

এই সকল কারাগারে তৎকালে এক প্রকার সংক্রামক জ্বরের অতিশয় প্রাদুর্ভাব ছিল। ইহাকে কারা-জ্বর বলিত। ঘাতকের হস্তে যত কারাবাসী না মরিত, সেই জ্বরের হস্তে তাহা অপেক্ষাও অনেক অধিক কারাবাসী মরিত! শুদ্ধ কারাবাসী নয়—জজ, মাজিষ্ট্রেট, জুরী, সাক্ষী, ও জেলদারোগা—যাঁহারা কার্য্য-গতিকে কারাবাসীর নিকটবর্ত্তী হইতেন, তাঁহারাও এই সংক্রামক জ্বরে আক্রান্ত হইয়া অকালে কাল-কবলে পতিত হইতেন। তিনি আরও দেখিলেন—দাওয়ানী ও ফৌজদারী জেল একত্র মিশিয়া আছে; অপরাধী ও ঋণী একপ্রকার শাসনের অধীনে রহিয়াছে; দেখিলেন, যাহারা আপীলে খালাস পাইয়াছে, তাহারা ফিজ দিতে না পারায়, এখনও কারাগারে রহিয়াছে। এই সমস্ত দেখিয়া তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে,—"এই কারাগার সকল 'সংশোধনাগার' না হইয়া পাপাগার হইয়া পড়িয়াছে; এই সকল

হইতে সমাজের যেরূপ ভীষণ অনিষ্ট হইতেছে, এমন আর কিছু হইতেই নয়; একজন লোক কারাগারে যাইবার সময়ে যে পরিমিত পাপ লইয়া যায়, ফিরিয়া আসিবার সময় তাহার শতগুণ পাপ লইয়া আইসে; সুতরাং বর্ত্তমান কারাগার সকল হইতে সমাজের যে পরিমাণে ইষ্ট হইতেছে, তাহার শতগুণ অনিষ্ট হইতেছে।"

এই হতভাগ্যগণের দুঃখে হাউয়ার্ডের হৃদয় ফাটিয়া গেল। তাঁহার সমস্ত মানসিক শক্তি, তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি এবং তাঁহার পদের সমস্ত প্রভাব, তিনি এই হতভাগ্যদিগের দুঃখাপনোদনে ব্যয়িত করিতে একান্ত কৃতসঙ্কল্প হইলেন। আহার নাই, নিদ্রা নাই, বিশ্রাম নাই—যোগী হাউয়ার্ড নিরন্তর এই কার্য্যে নিযুক্ত। তাঁহার উদ্দীপনায় গবর্ণমেণ্টও উত্তেজিত হইলেন। তাঁহার হস্তে গবর্ণমেণ্ট কারাসংস্কারের ভার অর্পণ করিলেন। তাঁহার অভীষ্ট কিয়ৎপরিমাণে সুসিদ্ধ হইল। তাঁহার তত্ত্বাবধানে অনেকগুলি কারাগার ভাঙ্গিয়া নূতন প্রণালীতে গঠিত হইল। অনেকগুলিতে কারাবাসিগণের আহারের সুব্যবস্থা করা হইল। প্রত্যেক ক্ষুদ্র কুঠারীতে বাইবেল রাখা হইল। কারাবাসিগণের ধর্ম্মবুদ্ধি পরিপুষ্ট করিবার জন্য প্রতি কারাগারে এক এক জন করিয়া ধর্ম্মযাজক নিযুক্ত করা হইল।

দেশে কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়া উৎসাহিত হইয়া হাউয়ার্ড সমস্ত ইউরোপের কারাগার পরিদর্শন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন; এই উদ্দেশে হাউয়ার্ড ফান্স, ফ্লাণ্ডার্স, হলাণ্ড, জার্ম্মাণী, সুইজর্লণ্ড, প্রুসিয়া, অষ্ট্রীয়া, ডেনমার্ক, সুইডেন, রুসিয়া, পোলাণ্ড, স্পেন ও পর্টুগেল—ক্রমে এই সমস্ত দেশ প্রদক্ষিণ করিলেন। পূর্ব্বে ইতালী দেখিয়া আসিয়াছিলেন, সুতরাং এবার আর ইতালীতে যাইলেন না। পাঠক! আজকাল ইউরোপের চতুর্দ্দিকে যেরূপ লৌহবর্ত্ম নির্ম্মিত হইয়াছে, ভাবিবেন না যে, তখনও সেইরূপ ছিল। ইউরোপের এ সকল উন্নতি বর্ত্তমান শতাব্দীতে ঘটিয়াছে মাত্র। সুতরাং সেই যোগী হাউয়ার্ডকে পাদযানে বা নৌযানে এই প্রকাণ্ড ইউরোপভূমি প্রদক্ষিণ করিতে হইয়াছিল। ইহাতে তিনি ধনে প্রাণে গিয়াছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রকৃতির শোভা-বৈচিত্র্য দর্শন বা রাজপ্রাসাদের প্রসাদভোগ করিতে তিনি যান নাই যে, তাঁহার দেহ ও মন পুলকিত হইবে। কারাগারের পূতিগন্ধ-বিশিষ্ট দুষ্প্রবেশ্য স্থান সকল তাঁহার একমাত্র তীর্থস্থল ছিল। সেই সকল তীর্থস্থলে চোর, ডাকাত, বদমায়েস—তাঁহার একমাত্র সহতীর্থ ছিল। তিনি তাহাদিগকে কখন অর্থ দিয়া, কখন উপদেশ দিয়া, কখন বা শুদ্ধ মিষ্ট কথা বলিয়া তাহাদিগের কষ্ট কথঞ্চিৎ দূর করিতে চেষ্টা করিতেন। এই অনন্ত বিশ্ব সেই বিশ্বপ্রেমিকের গৃহ ছিল। তিনি সকল স্থলেই আত্মনির্ব্বিশেষে সকলকে ভালবাসিতে পারিতেন। বিশেষতঃ যে সকল কারাবাসিগণের দুঃখ কেহ জানিত না, কেহ শুনিত না, তিনি পুত্রনির্ব্বিশেষে তাহাদিগকে ভালবাসিতেন। তাঁহার সময় ও সম্পত্তি তিনি তাহাদিগের কার্য্যে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার অতুল সম্পত্তি এই কার্য্যে ব্যয় করিয়া তিনি ভিখারী হইয়াছিলেন, তথাপি একদিনও স্খলিতব্রত হন নাই।

তাঁহার হৃদয় ইহাতেও পরিতৃপ্ত হইল না। তিনি দেখিলেন, কারাবাসিগণের ন্যায় গলিত-কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণের সংবাদ পৃথিবী লয় না। তাহারা চিকিৎসালয়ে দূষিত বায়ুতে যে জীবন্ত সমাধিনিহিত হইতেছে, পৃথিবী সে দিকে ভ্রূক্ষেপও করে না। কিন্তু যাহাদিগের দিকে তাকাইবার কেহ নাই, যাহাদিগের দুঃখ-কাহিনী শুনিবার কেহ নাই, হাউয়ার্ডের দৃষ্টি ও শ্রুতি তাহাদিগের দিকেই ধাবিত হইত। তিনি ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইতালী—অধিক কি, সুদূর স্মার্ণা ও কনষ্টাণ্টিনোপল পর্য্যন্ত এই উদ্দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইলেন। কুষ্ঠরোগের অব্যর্থ ঔষধ সঙ্গে লইয়া নিজে রোগীদিগকে খাওয়াইতে লাগিলেন, রোগীর রুগ্নশয্যার পার্শ্বে বসিয়া তাহার শুশ্রূষা ও সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। কুষ্ঠরোগীর রুগ্নাশ্রয়ের দূষিত বায়ুর অবিরাম অনুসেবনে তিনি কনষ্টাণ্টিনোপলের সংক্রামক জ্বরাক্রান্ত হইলেন। এবার অতি কষ্টে তাঁহার প্রাণরক্ষা হইল। তিনি অনেক দিন পরে ইংলণ্ডে প্রত্যাগত হইয়া দেখিয়া আহ্লাদিত হইলেন যে, তাঁহার কারাগার সংস্কার-বিষয়ক প্রস্তাব সকল প্রায়ই কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। তিনি ইংলণ্ডে আসিয়া আপনার পরিদর্শনের ফল পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিলেন। তাহা পাঠ করিয়া পাষাণও বিগলিত হইল।

কুষ্ঠরোগের দূষিত বায়ুর অনুসেবনে একবার প্রাণ হারাইতে হারাইতে রহিয়া গিয়াও হাউয়ার্ডের চৈতন্য হইল না, অথবা কেন হইবে? পরহিতব্রতে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ কোন্ মহাপুরুষ কবে মৃত্যুভয়ে কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান হইতে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন? হাউয়ার্ড ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে আবার ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া প্রাচ্যদেশাভিমুখে গমন করিলেন। সন্ন্যাসী কৃষ্ণসাগরতীরবর্ত্তী রুসীয় খার্সনে নগরী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু এবার তাঁহার জীবনের দিন সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিয়াছিল। অর্দ্ধাশনে বা অনিয়মিতাশনে নিবন্তর পর্য্যটনে তাঁহার শরীর ভগ্নপ্রায় হইয়া গিয়াছিল; সুতরাং এখানকার কুষ্ঠাশ্রম সকল পরিদর্শন করিতে করিতে তিনি সহসা জ্বরাক্রান্ত হইলেন। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সেই দুরন্ত ব্যাধি তাঁহাকে এ পৃথিবী হইতে লইয়া গেল। তথায় একজন ফরাসী ভদ্রলোক তাঁহার অতিশয় যত্ন করিয়াছিলেন। হাউয়ার্ডের ইচ্ছানুসারে সেই ফরাসী ভদ্রলোকের উদ্যানে তাঁহার দেহ সমাধি-নিহিত করা হইল। নরদেহ মাটীর জিনিস; মাটীতে মিশিয়া গেল। কিন্তু কীর্ত্তি অমর, সুতরাং হাউয়ার্ডের কীর্ত্তি অনন্তকাল রহিয়া গেল। কে জানিত যে, আজ সুদূর অনুগাঙ্গ প্রদেশের নির্জ্জন কুটীরে বসিয়া এই ভারত-যুবক সেই মহাপুরুষের যশোগান করিবে? কে জানিত—আজি সেই দেব হাউয়ার্ডের প্রেতদেহের উদ্দেশে এই ভারত-যুবকের নয়ন বহিয়া অশ্রুধারা পতিত হইবে? কোথায় তিনি আর কোথায় আমি? তথাপি কেন আজ আমি তাঁহাকে সম্মুখে দেখিতেছি? কে বলে, হাউয়ার্ড মরিয়াছেন, না,—তিনি মরেন নাই। যিনি অসংখ্য প্রাণের রক্ষার জন্য নিজের প্রাণ বলি দেন, তিনি কখনই মরেন নাই।

সার্ সামুয়েল রোমিলী

—*—

আমরা এখানে ইংলণ্ডের আর একজন মহাপুরুষের নাম উল্লেখ করিব। তাঁহার নাম সার সামুয়েল রোমিলী।

যে ইংরাজ জাতি আজ জগতের সভ্যতম জাতি বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন, উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের দণ্ডবিধি এরূপ নৃশংস ছিল যে, তাঁহাদিগকে যে ভারতবাসীরা রাক্ষস বলিত, তাহা নিতান্ত নিরর্থক বলিয়া প্রতীত হয় না। ভারতবর্ষে তাঁহাদিগের সেই রাক্ষসাচারের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসী। তাৎকালিক ব্রিটিশ দণ্ডবিধির সার্দ্ধ শত ধারায় প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। দুগ্ধপোষ্য শিশুও এই ভীষণ দণ্ডবিধির হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারিত না। চঞ্চলমতি বালক কাহারও একটি ফুল ছিঁড়িলেও কারাগারে প্রেরিত হইত। ফাঁসীকাষ্ঠ সর্ব্বদাই সজ্জিত থাকিত। রবিবার ভিন্ন এমন বার ছিল না, যে বারে কোন না কোন লোকের ফাঁসী না হইত। তবে সোমবার অতি প্রশস্ত বলিয়া বিবেচিত হইত। কারণ, যাহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইত, দয়া করিয়া তাহাকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইবার নিমিত্ত একদিন সময় দেওয়া হইত। শুক্রবার বিচার হইয়া তাহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইলে অভাগা শনি রবি দুই দিনের সময় পাইত। কারণ রবিবার নিষিদ্ধ দিন। এই জন্য সাধারণতঃ শুক্রবার বিচার ও সোমবারে ফাঁসী হইত।

ইংরাজ জজ কেবল ফাঁসীতেই সন্তুষ্ট হইতেন, এরূপ নহে। কখন কখন দণ্ডিতকে অশ্বপদে বাঁধিয়া অশ্ব ছাড়িয়া দিতেন। অশ্ব ক্রমাগত দৌড়িতে থাকিত এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে দণ্ডিতের দেহ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইত। কখন কখন তাহার শিরশ্ছেদনের আদেশ হইত। কখন বা তাহার প্রত্যঙ্গ সকল কাটিয়া দিবার এবং কখন বা তাহাকে জীবিত দগ্ধ-করণের আদেশ প্রদান করা হইত। তাহা অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর শাস্তি ছিল—জীবিত মনুষ্যের পেট চিরিয়া নাড়ীভুঁড়ি বাহির করিয়া লওয়া হইত। কখন বা তাহাকে টিকটিকিতে চড়াইয়া পাথর ছুড়িতে ছুড়িতে তাহার প্রাণ বাহির করিয়া ফেলা হইত। কখন বা তাহাকে বেত মারিতে মারিতে "নিউগেট" হইতে "টাইবরণে" লইয়া যাওয়া হইত এবং "টাইবরণ" হইতে "নিউগেটে" ফিরাইয়া আনা হইত। ফিনকি দিয়া রক্ত ছিটিয়া পড়িয়া সকলের গা ভাসিয়া যাইত, তথাপি বিচারকদিগের মনে দয়ার উদ্রেক হইত না। এই

যাতায়াতেই অনেক দণ্ডিতের প্রাণ বিয়োগ হইত! রাক্ষস-রাজার রাক্ষস-বিচারক এবং রাক্ষস বিচারকের রাক্ষসী শাস্তি।

ইংরাজ যে আজকাল কথঞ্চিৎ সভ্য হইয়াছেন, সে সার সামুয়েল রোমিলীর প্রাণোৎসর্গে। পূর্ব্ব অসভ্যতার চিহ্নস্বরূপ ফাঁসী ও বেত্রাঘাত ইংরাজ দণ্ডবিধিকে আজও দূষিত করিয়া রাখিয়াছে। ইংরাজ দণ্ডবিধির এই ঘোর নৃশংসতা-কলঙ্ক অপনোদন করিবার জন্যই যেন সামুয়েল রোমিলীর জন্ম হয়। তিনি তাঁহার অতি পরিমার্জ্জিত মন ও অত্যুদার হৃদয়কে এই মহৎ ব্রতসাধনে আজীবন নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার অন্তরে নিষ্ঠুরতার প্রতি বলবতী ঘৃণা পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার নিজের কথায় আমরা তাঁহার মনের ভাব ব্যক্ত করিব। "নরহত্যা বা অন্য কোন নৃশংস কার্য্যের বিবরণ পাঠ করিলে আমার হৃদয়ে ভয়ানক ভাবের আবির্ভাব হইবে। নিউগেট কারাগারে যে সকল উৎসৃষ্টপ্রাণ * ব্যক্তিগণকে জীবন্ত দগ্ধ করা হইত, তাঁহাদিগের বিবরণ পাঠ করিয়া আমি কত রাত্রি ভয়ে নিদ্রা যাইতে পারি নাই, নিদ্রা যাইলেও স্বপ্ন তাহার ব্যাঘাত সম্পাদন করিত। স্বপ্নে সেই সকল অৰ্দ্ধদগ্ধ বিকট মূর্ত্তি আমার সম্মুখে উপস্থিত হইত, অমনি নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যাইত। কল্পনা আমার সম্মুখে সতত ফাঁসী, নরহত্যা ও শোণিত-পাতের দৃশ্য অবতারিত করিত। আমি সেই সকল দেখিয়া ভয়ে অভিভূত হইয়া শয্যায় দেহ লুকাইবার চেষ্টা করিতাম। রজনীর গাঢ় অন্ধকারে আমি জাগিয়া থাকিতে ভয় করিতাম, কিন্তু ভীষণ উপদ্রবে নিদ্রা যাইতে পারিতাম না। এই জন্য আমি সান্ধ্য উপাসনার সময়ে প্রতিদিন ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতাম, যেন তিনি সে রাত্রি বিনা ভীষণ স্বপ্নদর্শনে আমাকে নিদ্রা যাইতে দেন।" নৃশংসতাবিদ্বেষের কি অপূর্ব্ব চিত্র!

এই সুযোগে আমরা রোমিলীর জীবন-চরিত সম্বন্ধে কিছু বলিব। রোমিলীর পিতা একজন ফরাসী প্রোটেষ্টাণ্ট ছিলেন। তিনি ক্যাথলিক গবর্ণমেণ্টের নির্য্যাতনে দেশ ছাড়িয়া লণ্ডনে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। লণ্ডনবাসিনী একটি ফরাসী রমণীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। এই বিবাহে অনেকগুলি সন্তান জন্মিয়াছিল, কিন্তু তিনটি বই দীর্ঘজীবি হয় নাই। সামুয়েল তাহার মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ। একজন সুশিক্ষিত ফরাসী-রমণী বাল্যে ইহাঁর শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ইনিও ক্যাথলিক নির্য্যাতনে স্বদেশ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার স্নেহ-প্রবৃত্তির মূল এই ধর্ম্মপরায়ণা বিদুষী ফরাসী রমণী।

রোমিলী কিছু বড় হইলে তাঁহাকে একটি স্কুলে দেওয়া হয়। এই স্কুলের শিক্ষক পড়াইতে যত পারুন আর নাই পারুন, বেত্রপ্রহারে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি নব নব শাস্তির উদ্ভাবন করিয়া বিদ্যার অভাব পরিপূরণ করিতেন। শিক্ষকের নিষ্ঠুরতায় রোমিলী নৃশংতাবিদ্বেষী হইয়া উঠিলেন। যাহা হউক, এই শিক্ষকের নিকট কিঞ্চিৎ ইংরাজী শিখিয়া তিনি স্কুল ছাড়িলেন। তাঁহার পিতার জহরতের ব্যবসায়ের হিসাব-পত্রাদি বিষয়ে পিতার সাহায্য করিতে লাগিলেন। হিসাবপত্র রাখিয়া তিনি অনেক অবসর পাইতেন, সেই অবসরকালে তিনি আপন চেষ্টায় গ্রীক্ ও লাটিন শিখিলেন। এইরূপে দুই তিন বৎসর যায়, এমন সময়ে কোন আত্মীয় মৃত্যুকালে উইল দ্বারা তাঁহাদিগকে দেড় লক্ষ টাকা দিয়া যান। এই অভাবনীয় ধনাগমে উৎসাহিত হইয়া রোমিলীর পিতা তাঁহাকে ব্যবহারাজীবের ব্যবসায়ে দীক্ষিত করিবার সঙ্কল্প করেন। তদনুসারে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে রোমিলী 'গ্রেজ-ইনে' প্রবিষ্ট হন এবং যথাসময়ে ব্যারিষ্টার হইয়া ব্যবহারাজীবের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন।

'বারে' প্রাধান্য লাভ করিতে রোমিলীর অনেক দিন লাগিল। দণ্ডবিধির সংস্কার-সাধনে তিনি যে কৃতসঙ্কল্প ছিলেন, এ কথা তিনি এক দিনও গোপন রাখেন নাই। দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতে আইনের দোহাই দিয়া প্রতিদিন যে সকল নীতিগর্হিত কার্য্য অনুষ্ঠিত হইত, তিনি মুক্তকণ্ঠে সে সকলের প্রতিবাদ করিতে কখনই ভীত হইতেন না। যদিও ইহাতে আপাততঃ তাঁহার পসারের কিছু ক্ষতি হইল—যদিও আপাততঃ বড় বড় জমীদার ও ধনী চটিয়া যাইতে লাগিলেন, তথাপি তাঁহার প্রতিভা কালে এত স্ফূর্ত্তি পাইল যে, সকল দুর্লঙ্ঘ্য বিঘ্ন সত্ত্বেও তাঁহার পসার অতিশয় বাড়িয়া গেল। ক্রমে তাঁহার নাম দিগন্তব্যাপী হইয়া উঠিল। এই উন্নতিমুখে ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে

* Martyrs.

তিনি ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী হার্টফোর্টশায়ারের মিস্ গার্কেট নাম্নী এক যুবতীকে বিবাহ করিলেন।

১৮০৬ খৃষ্টাব্দে রোমিলী সলিসিটার জেনারেলের পদে অভিষিক্ত হইলেন। সেই সময়েই তিনি 'কুইন্সবরার' প্রতিনিধিরূপে হাউস অব কমন্সে প্রবিষ্ট হন এবং সার সামুয়েল্ হন। এই সময় হইতেই তাঁহার জাতীয় জীবন আরম্ভ হয়। সাধারণ জীবনের ক্রমানুবর্ত্তী শান্তি ও তরঙ্গের মধ্যেও তিনি আপনার জীবনের লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত হন নাই। পার্লামেন্টের প্রতি সেসনেই তিনি ফৌজদারী আইনের সংশোধনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। তাঁহার বাগ্মিকতা—সত্য, ন্যায় ও মনুষ্যত্বের সমর্থনেই সতত ব্যয়িত হইত। আত্মীয়-স্বজনের আদরে সুখী, পতিপ্রাণা ভার্য্যার প্রেমে সুখী, সন্তান-সন্ততিদিগের প্রতি বাৎসল্যে সুখী এবং সাধু মহৎ লোকের শ্রদ্ধা-ভক্তিতে সুখী হইয়াও সার সামুয়েল দুঃখীদিগকে ভুলেন নাই। নিজের সৌভাগ্য-সূর্য্যের আলোকে সমাসীন হইয়াও, দুর্ভাগ্যের অন্ধতমসে যাহারা বসিয়া আছে, তাহাদিগকে ভুলেন নাই। তিনি জানিতেন যে, তিনি যে সময়ে সুখে কাল কাটাইতেছেন, তখন কত শত লোক দুঃখ-যন্ত্রণায় মরিয়া যাইতেছে। এই জন্য তাঁহার মনে হর্ষে বিষাদ উপস্থিত হইত। এই জন্য তিনি তাহাদিগের দুঃখ-মোচনে নিজের ধন-প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। যদিও তিনি নিজের জীবদ্দশায় আপনার অজস্র চেষ্টার বিশেষ ফল দেখিয়া যাইতে পারেন নাই, তথাপি ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টা নিষ্ফল হয় নাই। তাঁহার সেই জ্বালাময়ী বক্তৃতায় পাষাণও বিগলিত হইতে লাগিল। সেই বক্তৃতার মোহিনী শক্তিবলে ইংরাজ জাতির অয়োময় হৃদয় বিগলিত হইল। ইংলণ্ডের পার্লামেন্টে এই বিষয় লইয়া ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইল।

এই সময়ে (১৮১৮ খৃষ্টাব্দে) সহসা তাঁহার প্রণয়িনীর সাংঘাতিক পীড়া উপস্থিত হইল। উভয়ের জীবন যে একতারে কেমন গ্রথিত ছিল, রোমিলীর দৈনন্দিন আত্মবিবরণী হইতে একছত্র তুলিয়া পাঠককে উপহার দিয়া তাহা বুঝাইতেছি। "৯ই অক্টোবর—আজ স্ত্রী একটু ভাল ছিলেন বলিয়া কত দিন পরে ঘুমাইয়া বাঁচিয়াছি।" কিন্তু বিধাতা তাঁহার অদৃষ্টে অধিক দিন ঘুম লিখেন নাই। তাঁহার স্ত্রীর পীড়া তাহার পরেই আবার বাড়িয়া উঠিল। ২০শে অক্টোবরে তাঁহার স্ত্রী মানবলীলা সংবরণ করিলেন, শোকে রোমিলী ক্ষিপ্ত হইয়া গেলেন। সে আঘাত তাঁহার মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম ধমনীগুলকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ফেলিল। যে জীবন নিরন্তর মানবজাতির দুঃখাপনোদনে ব্যয়িত হইত, আজ সার্ সামুয়েল্ মনের অসহ্য বেদনায় নিজ হস্তে সেই জীবনের উপসংহার করিলেন। ধন্য রোমিলি! ধন্য বীর! ধন্য তোমার মানবপ্রেম! ধন্য তোমার পত্নীপ্রেম! পুরুষ হইয়া সহমরণে যায়, কে কোথায় শুনিয়াছে? আজ পুরুষজাতির সেই ঘোর কলঙ্ক তুমি অপনোদন করিলে। তুমি আজীবন যে ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলে, তাহার উদ্যাপনা করিয়া যাইতে পারিলে না, এই ক্ষোভ রহিয়া গেল। কিন্তু তোমার তপস্যার ফলে আজ ইংরাজ-জাতি ঘোরতম পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত। তোমার পুণ্যবলে আজ ইংরাজ জাতি সভ্যপদবাচ্য। তোমার মৃত্যুর পরে তোমার তপস্যার ফল ফলিল। ইংরাজ-দণ্ড-বিধির সার্দ্ধশত-সংখ্যক ধারায় প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। তোমার মৃত্যুর পরে সে ধারাগুলি দণ্ডবিধি হইতে একে একে অপসারিত হইল। দুই একটি আজও আছে বটে, কিন্তু তোমার অতীত তপোমাহাত্ম্যে তাহাও একদিন অপসারিত হইবে। তুমি যে লক্ষ্য-সংসাধনের জন্য ধন-প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলে, আসিয়া দেব! একবার দেখ, তাহা প্রায় সম্পন্ন হইয়াছে। আসিয়া আর একবার পার্লামেন্টের আসনে আসীন হইয়া তোমার হৃদয়ভেদকারিণী বক্তৃতায় পাষাণ গলাইয়া ইংরাজ দণ্ডবিধির এখনও যে দুই একটি কলঙ্ক আছে, শীঘ্র তাহার ক্ষালন কর। দেব! এই শেষ মিনতি ও পদে!

জর্জ্জ ওয়াসিংটন

পাঠক! এখন ইউরোপ ছাড়িয়া একবার আমেরিকায় চল। ঐ দেখ, দুই জন মহাপুরুষ—ওয়াসিংটন ও পার্কার—মার্কিণ ভূমির মুখ উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছেন! প্রথমে যে মহাত্মার নাম উল্লেখ করিলাম, ইনিই আমেরিকার দাসত্ববিমোচন করেন। ইঁহার জীবনী পাঠ করিলে, হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত হয়। আমরা ইঁহারই জীবনী আলোচনা করিয়া আপাততঃ নিবৃত্ত হইব।

যে সকল ইংরাজ-পরিবার ব্রিটিশ-সিংহের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া স্বদেশের মমতায় জলাঞ্জলি দিয়া আট-লান্টিক মহাসাগরের পাশ্চাত্য উপকূলে আশ্রয় গ্রহণ করেন, ওয়াসিংটনের পূর্ব্বপুরুষ তাঁহাদিগের অন্যতম। ওয়াসিংটন-বংশ ১৬৫৭ খৃঃ ভার্জ্জিনীয়ায় আসিয়া বসতি করেন। ওয়াসিংটনের পিতা মেরিল্যাণ্ডে যথেষ্ট বিষয়াদি করিয়াছিলেন এবং মৃত্যুকালে সেই সমস্ত বিষয় তাঁহার ছয় পুত্রকে বিভাগ করিয়া দেন।

ওয়াসিংটন তাঁহার তৃতীয় পুত্র। ১৭৩২ খৃঃ ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে এই মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন। পিতার মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স একাদশ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। তিনি মেরিল্যাণ্ডের কোন সামান্য বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন। তথাপি তিনি ত্রিকোণমিতি ও জরিপ বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। বিদ্যালয় ছাড়িয়া তিনি একাগ্রমনে কেবল গণিত-বিজ্ঞানের আলোচনায় নিযুক্ত হইলেন। তিনি লরেন্স নামক ভ্রাতার ভার্ণন গিরিস্থিত আবাসে শীতকাল যাপন করিতেছিলেন, এমন সময়ে লর্ড ফেয়ার ফ্যাক্সের চিত্ত আকৃষ্ট করিলেন। লর্ড ফেয়ারফ্যাক্স গণিত-বিজ্ঞান ও জরিপ-কার্য্যে তাঁহার সবিশেষ অভিজ্ঞতা দেখিয়া পটোমাক নদীতীরস্থিত সুবিশাল ভূমিখণ্ডের জরিপ-কার্য্যে তাঁহাকে নিযুক্ত করিলেন। তিনি এই কার্য্য এরূপ সুচারুরূপে সম্পন্ন করিলেন যে, অচিরকালমধ্যে গভর্ণমেণ্টের সার্ভেয়ারের পদে নিযুক্ত হইলেন। এই কার্য্যে থাকিয়া তাঁহাকে ক্রমাগত তিন বৎসর আলিঘানি পর্ব্বতের নিবিড় অরণ্যমধ্যে বিচরণ করিয়া বেড়াইতে হইয়াছিল। সেই সময়ে আমেরিকার প্রায় সকলেই রাজতান্ত্রিক ছিলেন। ওয়াসিংটনেরও রাজভক্তি এই সময় অচলা ছিল।

যখন ইউনাইটেড ষ্টেটসের প্রান্তসীমা আদিম অধিবাসিগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা উপস্থিত হয় এবং ফ্রান্সের সহিত ইংলণ্ডের যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম হয়, তখন ভার্জ্জিনীয়া ভাবী বিপদের আশঙ্কায় সামরিক প্রদেশ সকলে বিভক্ত হয়। এই সময়ে ওয়াসিংটন মেজরের পদে অভিষিক্ত হইয়া একটি প্রাদেশিক সেনার অধিনায়কত্ব প্রাপ্ত হন। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে তিনি ভার্জ্জিনীয় উপসেনার * দ্বিতীয় অধিনায়কত্ব প্রাপ্ত হন। এই বৎসরেই গ্রীষ্মের প্রারম্ভে ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ বাধিয়া উঠে। এই সময়ে ফরাসী-সেনার সহিত তাঁহার প্রথম সম্মুখ-যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে ফরাসী সেনা পরাজিত হয় ও ফরাসী সেনাপতি হত হয়েন। এই বিজয়ের জন্য তিনি ভার্জ্জিনীয় ব্যবস্থাপক সভা হইতে ধন্যবাদ প্রাপ্ত হন ও ভার্জ্জিনীয় উপসেনার প্রধান নেতৃত্বপদে অভিষিক্ত হন। তিনি সেনাপতিপদে বৃত হইয়া এরূপ কৌশল ও দক্ষতার সহিত পশ্চাৎপদ হইয়া মহতী ফরাসী সেনার করাল গ্রাস হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন যে, ব্যবস্থাপকসমাজ তাঁহাকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারেন নাই।

১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে ওয়াসিংটন সেনাপতি ব্রাড্ডকের সহযোগী হইয়া যুদ্ধে গমন করেন। এই যুদ্ধে তাঁহাদিগের পরাজয় ও মৃত্যু হয়। এই দুর্ঘটনার পরে তিনি ভার্ণনস্থ গৈরিক আবাসে প্রত্যাগত হন। তাঁহার ভ্রাতা লরেন্সের মৃত্যুতে ভার্ণন্‌গিরিস্থিত তাঁহার যাবতীয় বিষয় উত্তরাধিকারসূত্রে ওয়াসিংটনের হস্তগত হয়। এই সম্পত্তি হস্তে পাইয়া তিনি বিস্তৃত আকারে আতিথ্য ক্রিয়া আরম্ভ করিলেন। আমেরিকার আদি ইংরাজ ঔপনিবেশিকেরা অতিথিসৎকার-কার্য্যে বিশেষ আস্থাবান্ ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল; ওয়াসিংটন পূর্ব্বপুরুষগণের সেই কীর্ত্তি বজায় করিলেন। এই সময়ে ১৭৫৯ খৃঃ তিনি কষ্টিস্ নামক কোন ব্যক্তির বিধবা রমণীকে বিবাহ করেন।

এই সময়ে তিনি বিপুল সম্পত্তির অধীশ্বর ও সবিশেষ মান্য-গণ্য হইয়া উঠিলেন। এইরূপে সুখে ও স্বচ্ছন্দে তাঁহার বহুদিন অতীত হইল। যে সকল অমানুষ গুণে তিনি পরে জগতে উজ্জ্বল ও অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করেন, এখনও সে সকলের তাদৃশ কোন আভাস পাওয়া যায় নাই। যে জাতীয় স্বাধীনতা-সমর উপলক্ষে তাঁহার সেই সকল গুণ বিকাশ প্রাপ্ত হয়, যে সকল কারণে সেই সমরের উৎপত্তি, আমরা এক্ষণে তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলিব।

আদিম অধিবাসী ও ফরাসীদিগের সহিত সমরে ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সের সমূহ ক্ষতি হয়। বিখ্যাতনামা সেনাপতি উল্‌ফ এই সমরে হত হন। পীড়ায় ও শত্রুর অস্ত্রাঘাতে প্রায় ত্রিশ সহস্র জাতীয় সৈন্যের প্রাণ বিনষ্ট হয়। জাতীয় ঋণ চল্লিশ কোটি টাকায় পরিণত হয়। এই সমরের আংশিক ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ইংলণ্ডকেও চতুর্দ্দশ কোটি টাকা ঋণগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল

* Militia নাগরিক সৈন্য—যাহা কেবল যুদ্ধকালে আহূত হয়।

এবং বিজয়লব্ধ রাজ্য সকল সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্য উপনিবেশে স্থায়ী সেনা রাখিতে হইয়াছিল।

যখন সমরের কোলাহল তিরোহিত হইল, যখন শেষ কামানের শব্দ শূন্যে মিশাইয়া গেল, যখন সমরে হত বীরবৃন্দ আপন আপন সমাধি-শয্যায় শয়ান হইয়া চির-নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইলেন, যখন আহত সৈন্য সকল আপন আপন গৃহে আসিয়া পরিবারবর্গকে আনন্দাশ্রুতে ভাসাইল, যখন মহা-তেজা পার্ব্বতীয় সেনা আদিম অধিবাসিগণের নিভৃত স্থান সকলের আলোড়নে বিরত হইয়া আপন আপন সৈন্যাবাসে আশ্রয় গ্রহণ করিল ; সংক্ষেপতঃ যখন সমস্ত আমেরিকায় শান্তি বিরাজিত হইল ; তখন ইংলণ্ড ও আমেরিকা ভাবিবার সময় পাইয়া বিগত যুদ্ধে ক্ষতিলাভ গণনা আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, যদিও বিজয়লক্ষ্মী তাঁহাদিগের করতলস্থ হইয়াছে, যদিও তাঁহাদিগের বিজয়-গৌরবে জগৎ ঝলসিত হইতেছে, তথাপি তাঁহারা বিশেষ লাভবান্ হইতে পারেন নাই, বরং প্রভূত পরিমাণে জাতীয় রুধির ও জাতীয় অর্থ ব্যয়িত হওয়ায় তাঁহারা দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন। এ দিকে ইংলণ্ড এই সুযোগে জাতীয় ঋণপরিশোধচ্ছলে আমেরিকার নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিলেন।

এ দিকে বিগত সমরে আমেরিকাও সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহারা এরূপ প্রার্থনায় বড় সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তাঁহারা দেখিলেন যে, জাতীয় রুধিরে ও জাতীয় অর্থে তাঁহারাই এই বিজয় লাভ করিলেন। কিন্তু ইংলণ্ড আংশিকমাত্র এই ব্যয়-ভার বহন করিয়া এই বিজয়ের পূর্ণ ফলভোগী হইতে-ছেন। তথাপি তাঁহার দুরাকাঙ্ক্ষ মন পরিতৃপ্ত হইতেছে না। তিনি আমেরিকার উপরে কর ধার্য্য করিয়া সেই আংশিক ক্ষতি পূরণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। আমেরিকা এতদিন আপনাকে দুর্ব্বল বলিয়া জানিতেন, সুতরাং ইংলণ্ডের সমস্ত অত্যাচার মুখ বুজিয়া সহিয়া-ছিলেন। কিন্তু আজ আমেরিকা আপনার বল জানিতে পারিয়াছেন। সুতরাং ইংলণ্ডের অত্যাচার এখন তাঁহার দুর্ব্বিষহ বলিয়া বোধ হইল। বিগত সমরে ঔপনিবেশিকেরা বিশেষ বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন। তাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন যে, বন্দুক ধারণে ও কামান চালনে ইংলণ্ডীয় সেনা অপেক্ষা তাঁহারা কিছু-তেই ন্যূন নহেন। বিশেষতঃ তাঁহারা রণে এরূপ অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, সমর-নিবৃত্ত থাকা যেন তাঁহাদিগের পক্ষে কিছু ক্লেশকর হইয়া উঠিয়াছিল। আজ রণক্ষেত্র আমেরিকাবাসিগণের নিকট ক্রীড়া-প্রাঙ্গণস্বরূপ অনুমিত হইতেছে। এই আভ্যন্তরীণ বল বুঝিতে পারিয়াই আজ আমেরিকা ইংলণ্ডের সর্ব্বতোমুখী প্রভুতায় আপত্তি করিলেন।

ঔপনিবেশিকেরা দেখিলেন, ইংলণ্ড আমেরিকাকে সামরিক বিদ্যালয়ে পরিণত করিয়াছেন। সীমান্ত-প্রদেশের রাজ্য সকলের সহিত অকারণে যুদ্ধ বাধাইয়া আমেরিকার ব্যয়ে ও আমেরিকার বক্ষে কতকগুলি ইংরাজসৈন্য ও কতিপয় ইংরাজ-সেনাপতিকে রণদীক্ষিত করিয়া লইতেছেন। আজ আমেরিকা আপনার বল বুঝিতে পারিয়াছেন, তাই ইহা তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিল।

ইংলণ্ডের মনে মনে অভিমান ছিল, আমেরিক ঔপনিবেশিকেরা তাঁহার সন্ততি, তাঁহার যত্নে প্রতি-ষ্ঠাপিত, তাঁহার আদরে পরিবর্দ্ধিত এবং তাঁহার বাহু-বলে পরিরক্ষিত। ইউনাইটেড্ ষ্টেটসের কোষাধ্যক্ষ এই চিরলালিত অভিমানের প্রত্যুত্তরে লিখিয়াছেন—"ইংলণ্ড, তুমি বলিয়া থাক যে, আমরা তোমার যত্নে আমেরিকায় স্থাপিত! না, এ কথা সত্য নহে—বরং তোমারই দৌরাত্ম্যে আমরা আমেরিকায় অধিবাসিত। তুমি বল, আমরা তোমার স্নেহে লালিত! না, বরং তোমারই অবহেলায় পরিপুষ্ট। তুমি শ্লাঘা করিয়া থাক —আমরা তোমারই বাহুবলে পরিরক্ষিত! না ইংলণ্ড! বরং তোমারই গৌরব রক্ষা করিতে আমাদিগকে জাতীয় অর্থ ব্যয় করিতে হয়।"

এইরূপ ভাব এই সময় আমেরিকাবাসী সাধারণের অন্তরে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। আমেরিকার আদিম ঔপনিবেশিকগণ সকলেই সাধারণতান্ত্রিক ছিলেন। রাজা দেবানুগৃহীত, তিনি মানব-নিয়মের অধীন নহেন —ইত্যাদি রাজতান্ত্রিক মত সকল তাঁহাদিগের হৃদয়ে স্থান পায় নাই। তাঁহারা সংখ্যায় দুর্ব্বল বলিয়াই অগত্যা ইংলণ্ডের আধিপত্য স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের সন্ততিগণ এখন আত্মবল বুঝিয়া সে অধীনতাশৃঙ্খল ভেদ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

এ দিকে ইংলণ্ডের লোকে ভাবিতে লাগিলেন, আমেরিকা ইংলণ্ডের উপনিবেশমাত্র ; সকল বিষয়েই মাতৃরাজ্যের মুখাপেক্ষী ; তবে তাঁহার আদেশ মাথা পাতিয়া পালন না করিবে কেন ? এই ভাবিয়া তাঁহারা আইনের উপর আইন জারি করিয়া আমেরিকাকে

অষ্টপৃষ্ঠে বাঁধিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একটি আইন জারী হইল যে, কেহ ইংলণ্ডীয় জাহাজ ব্যতীত অন্য জাহাজে করিয়া উপনিবেশ হইতে ইংলণ্ডে মাল আমদানী করিতে অথবা ইংলণ্ড হইতে উপনিবেশসমূহে মাল রপ্তানী করিতে পারিবে না। ইহাতে ইংলণ্ডীয় বাণিজ্য-পোতের অধ্যক্ষগণ অতিশয় ধনবান্ হইয়া উঠিতে লাগিলেন। কতকগুলি দুর্নীতিকর নিষেধক আইন জারী হইল যে, যে সকল গাছের তক্তায় জাহাজ নির্ম্মিত হয়, আপন আপন সীমার বহির্ভূত এমন গাছ কেহ কাটিতে পাইবে না; কেহ লোহার কারখানা করিতে পারিবে না; কেহ ইস্পাত প্রস্তুত করিতে পারিবে না, যে দেশ বীবরে পরিপূর্ণ, সে দেশের কেহ বীবরের টুপী তৈয়ার করিতে পারিবে না; কোন কারবারী এক সময়ে দুইজনের অধিক শিক্ষানবীশ রাখিতে পারিবে না ইত্যাদি। এ দিকে বিলাতী মদ ও চিনি প্রভৃতির আমদানী বাড়াইবার জন্য দেশীয় চিনি, গুড় ও মদ প্রভৃতির উপরে বেজায় শুল্ক নির্দ্দিষ্ট করা হইল। এই সকল আইন অকেজো হইয়া পড়িয়া না থাকে, এই জন্য সন্দিগ্ধ ব্যক্তিমাত্রের ঘরে খানাতল্লাসী আরম্ভ হইল। এই সকল দুর্ব্বিষহ অত্যাচারে লোকে জর্জ্জরীভূত—এমন সময় ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে ষ্ট্যাম্প আইন প্রস্তাবিত হইল। পূর্ব্বে দলীলপত্র ও আদালতের দরখাস্তাদি সাদা কাগজে লিখিলেই হইত; কিন্তু এই আইন অনুসারে সকলকেই সাদা কাগজের পরিবর্ত্তে ষ্ট্যাম্পযুক্ত কাগজ ব্যবহার করিতে হইবে। সংবাদপত্র, সাময়িক পত্রিকা, পঞ্জিকা প্রভৃতিরও শুল্ক নির্দ্ধারিত হইল! এই আইনের পাণ্ডুলিপি ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে অবতারিত হইয়া আমেরিকাবাসিগণের ক্রোধানলে ঘৃতাহুতি প্রদান করিল। আমেরিকা এক্ষণে একবাক্যে ও মুক্তকণ্ঠে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের এ অধিকার অস্বীকার করিলেন, কিন্তু ইংলণ্ডের জর্জ্জ কিছুতেই বিচলিত হইবার লোক ছিলেন না। তাঁহার প্রভাবে ষ্ট্যাম্প-আইন হাউস্ অব্ কমন্স ও হাউস্ অব লর্ডস উভয়েই অবিসংবাদিতভাবে পাশ হইল। ভবিষ্য অভ্যুত্থানের সম্ভাবনায় ইহার সঙ্গে সঙ্গে একটি বিদ্রোহ-আইনও পাশ হইয়া গেল। যদি আমেরিকার কোন অংশে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তাহা নিবারণ করিবার জন্য ইংলণ্ড তথায় যত সৈন্য প্রেরণ করিবেন, এই আইনের বিধানানুসারে তথাকার অধিবাসিগণকে তাহাদিগের জন্য উপযুক্ত বাসস্থান, সুকোমল শয্যা, সুমধুর পানীয়, শুষ্ক কাষ্ঠ, সুগন্ধি সাবান ও সুনির্ম্মল বাতী প্রদান করিতে হইবে।

এই কঠোর আইন জারী হওয়ায় বেন্‌জামিন্ ফ্রাঙ্কলিন প্রভৃতি মনীষীর হৃদয় বিকম্পিত হইল। তিনি কোন প্রিয়বন্ধুর নিকটে লিখিয়া পাঠাইলেন, "আমেরিকার স্বাধীনতা-সূর্য্য অনন্তকালের জন্য অস্তমিত হইল। এক্ষণে আমাদিগের শ্রমশীলতা ও মিতব্যয়িতার বাতী জ্বালিয়া কিঞ্চিৎ জীবনধারণ করা ভিন্ন আর কোন আশা নাই!' সাহসিকতর প্রিয়বন্ধু প্রত্যুত্তর লিখিয়া পাঠান—"ভাই!" এক্ষণে আমাদিগকে অন্য প্রকার বাতী জ্বালিতে হইবে।" প্রত্যুত এই ঘটনার পরেই আমেরিকার সর্ব্বত্র বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠিল?

এই সময়ে ক্যাডওয়ালার কোল্ডেন নামক একজন অশীতিবর্ষবয়স্ক ইংরাজ নিউইয়র্কের গবর্ণর ছিলেন। অতি পবিত্রচরিত ও উদার প্রকৃতি বলিয়া ইহাঁকে সকলেই শ্রদ্ধা করিত। ইহাঁর সমিতির সভ্যগণও অতি উচ্চমনাঃ ছিলেন। এরূপ মন্ত্রিগণ-পরিবেষ্টিত হইয়াও এবং এরূপ মহদাশয় হইয়াও এই প্রবীণ শাসনকর্ত্তাকে রাজশাসনের অনুরোধে লোকসাধারণের অভ্যুত্থানের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইতে হইয়াছিল, ইতিহাসে এই জন্য তাঁহার নাম স্বাধীনতার শত্রু বলিয়া কলঙ্কিত হইয়াছে। তিনি স্বাধীনতার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইলেন বটে, কিন্তু সে গতিরোধ করা তাঁহার সাধ্যাতীত হইয়া পড়িল। স্বাধীনতার সম্প্রদায় চতুর্দ্দিকে দলবদ্ধ হইতে লাগিলেন। সংবাদপত্র সকল নির্ম্মোক পরিত্যাগপূর্ব্বক অকুতোভয়ে আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে লাগিল। ইংলণ্ডের সহিত বিচ্ছেদ অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে, এই কথা তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন। ১লা নবেম্বর ষ্ট্যাম্প আইন প্রচারের দিন স্থির ছিল। সেই দিন যত নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, ততই আমেরিকার অধিবাসিগণ অধীর হইয়া উঠিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে সভা বসিতে লাগিল। পথঘাট লোকে পরিপূর্ণ হইল। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা দেশের জন্য স্বাধীনতার জন্য—প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল। ধন্য জাতিপ্রেম! ধন্য স্বদেশানুরাগ!

৩১শে অক্টোবর একটি মহতী জাতীয় সভার

অধিবেশন হইল। এই সভায় ষ্ট্যাম্প-আইনের বিরুদ্ধে বৃটিশ পার্লামেন্টের নিকটে একখান আবেদনপত্র পাঠান স্থির হইল। দেশের সমস্ত বড় লোক ইহাতে স্বাক্ষর করিলেন। জেমস ইভারস নামক এক ব্যক্তি ষ্ট্যাম্প বিলি করিবার ভার প্রাপ্ত হইয়া ইংলণ্ড হইতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে অগত্যা কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেশে ফিরিয়া যাইতে হইল।

নিউইয়র্কের দুর্গের নাম ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জ। ২৩শে অক্টোবর ইংলণ্ড হইতে নূতন ষ্ট্যাম্প সকল আসিয়া এই দুর্গে সংরক্ষিত হইলে, এই দুর্গের উপর আক্রমণ সম্ভাবনা করিয়া ইংরাজেরা ইহার রীতিমত জীর্ণসংস্কার করিলেন এবং ইহাকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সুসংরক্ষিত করিয়া লইলেন। দুর্গের কামানগুলির মুখ নগরাভিমুখে সংস্থাপিত হইল এবং ইংলণ্ডীয় রণতরি সকল রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া নগরের বন্দরে আসিয়া লাগিল। নিউইয়র্ক অবরুদ্ধ নগরীর আকার ধারণ করিল। কিন্তু আমেরিকাবাসী ইহাতে ভীত না হইয়া দলে দলে নগরে আসিয়া জুটিতে লাগিলেন। যিনি—যে অস্ত্র পাইলেন, লইয়া নগরাভিমুখে ধাবিত হইলেন। বৃটিশ কামানরাজি যেন মন্ত্রৌষধিরুদ্ধবীর্য্য সর্পের ন্যায় অকর্ম্মণ্য হইয়া রহিল। কেন না, শত্রু হইলেও ইংরাজ-সেনাপতির এত লোকের উপরে গোলা চালন করিতে হৃদয় ব্যথিত হইল। ক্রমে জনতা এত বাড়িয়া উঠিল যে, ইংরাজেরা বিদ্রোহীদিগের হস্তে সমস্ত ষ্ট্যাম্প অর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। অবশেষ ইংলিশ পার্লামেন্টকে ষ্ট্যাম্প আইন অগত্যা রহিত করিতে হইল। কিন্তু অবিলম্বে আর একটি আইন জারী হইল; তাহা তুল্যরূপ দূষিত ও আপত্তিকর। এই আইন কাচ, কাগজ ও প্রধানতঃ 'চা'র উপরে কর ধার্য্য করিয়া দিল। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীকে অনুমতি দেওয়া হইল—ইংলণ্ডের যে চা তাঁহারা আমেরিকার পাঠাইতেন, আমেরিকাবাসীদিগকে সেই 'চার' উপরে প্রতি পাউণ্ডে তিন পেন্স করিয়া শুল্ক দিতে হইবে। কিন্তু আমেরিকাবাসীরাও প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, ঐ চা কখনই আমেরিকায় নামাইতে দিবেন না।

প্রভিডেন্স প্রদেশের অধিবাসীরাই সর্ব্বপ্রথমে এই আমদানীর বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইল। একদিন নগরের মধ্যে ঘোষণা হইল—যিনি যে চা কিনিয়াছেন, লইয়া বাজারে আসিবেন; আর রাত্রি দশটার সময়ে সেখানে এক অদ্ভুত অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইবে। অধিবাসীরা সঙ্কেত বুঝিতে পারিয়া সকলে যথাসময়ে যথাস্থানে আসিয়া চা সমর্পণ করিল। রাত্রি দশটার সময় চা-স্তূপে অগ্নি প্রদান করা হইল। বিশ্বাবসুর প্রচণ্ড শিখায় দশদিক আলোকিত হইল। লোকে সঙ্কল্প করিল, কিছুতেই বাজারে চা আনিতে দিবে না। যদি কোন ইংরাজ বণিক্ সশস্ত্র পুরুষ পরিরক্ষিত অবস্থায় চা আনিয়া বাজারের গুদামে রাখিত, অমনি রাত্রিতে গুদামে আগুন লাগিত! ফিলাডেল্ফিয়া নগরে 'চার' জাহাজগুলি নদীমুখেও প্রবেশ করিতে সাহস করিল না। যেমন অবস্থায় আসিয়াছিল, সেই অবস্থায় ইংলণ্ডে ফিরিয়া গেল। নিউইয়র্কে সেনার সাহায্যে চা নামান হইল বটে, কিন্তু কেহ চা কিনিল না। কারণ ঘোষণা হইয়াছিল, যে চা কিনিবে, তাহার মস্তক যাইবে। চার্লস টাউনেও ঐরূপে চা নামান হইল, কিন্তু ক্রেতা না জুটায়, চা গুদামে পড়িয়া পচিতে লাগিল এবং অবশেষে অগ্নিদগ্ধ হইল। বোষ্টনেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গোলযোগ উপস্থিত হয়। এখানে গবর্ণর ও তাঁহার বন্ধুবর্গের উদ্দেশে চা পাঠান হয়। সুতরাং ইহা নামাইবার জন্য বিশেষ উদ্যোগ হইবে ভাবিয়া, লোকে বিশেষ প্রতিবিধানের চেষ্টা করে। এক সুবিমল প্রশান্ত রজনীতে 'চার' জাহাজগুলি বোষ্টনের বন্দরে আসিয়া লাগিল। যেমন লাগিল, অমনি তিনশত বোষ্টনবাসী বালক ছদ্মবেশে সেই সকল জাহাজের উপরে গিয়া পড়িয়া 'চার' বাক্সগুলি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া সব ঝুপ্ঝাপ্ করিয়া জলে ফেলিয়া দিল। রক্ষকেরা প্রথমে বাধা দিয়াছিল, কিন্তু সে অগ্নিস্ফুলিঙ্গগুলির নিকটে পরাস্ত হইয়া শেষে চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। এইরূপে তিন শত বত্রিশটি বাক্স ভগ্ন ও জলে প্রক্ষিপ্ত হইল।

এইবার ইংলণ্ড গর্জ্জিয়া উঠিল। এই সংবাদ ইংলণ্ডে পৌঁছিবামাত্র স্থির হইল—যে কোন রকমে হউক, উপনিবেশগুলিতে ইংরাজ-প্রভুতা ও আইনের মর্য্যাদা পুনঃস্থাপিত করিতেই হইবে। বোষ্টনের ধ্বংস স্থিরীকৃত হইল। বোষ্টনের উপরে হুকুমজারী করা হইল যে, যত চা নষ্ট করা হইয়াছে, সমস্তের মূল্য দিতে হইবে। বোষ্টনের সহিত সর্ব্ববিধ বাণিজ্য নিষিদ্ধ হইল। কষ্টম হাউস প্রভৃতি সালেমে লইয়া যাওয়া হইল। কিন্তু সে বাণিজ্যে

সালেমের লোকে বোষ্টনের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে চাহিল না। সমস্ত আমেরিকা বোষ্টনের সহিত সহানুভূতি দেখাইতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে লোক সকল এ নগর হইতে ও নগরে যাইতে লাগিল। সর্ব্বত্র বিশ্বব্যাপী অসন্তোষ ও বিরাগের ভাব পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। বহুদিন সংরুদ্ধ-ক্রোধ, স্বজাতি-প্রেম, স্বাধীনতা-স্পৃহা যুগপৎ উদ্দীপিত হইয়া সমস্ত জাতিকে যেন একশরীরী করিয়া ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত করিল।

বোষ্টনে আর একটি ঘটনায় সন্ধুক্ষিত বিদ্রোহানল আরও প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। একদিন ইংরাজ সৈনিকগণের সহিত নগরবাসীদিগের হাতাহাতি বাধিল, তাহাতে জাতীয় রক্ত পতিত হইল। শীতল ধবল বরফের উপরে সেই লোহিত রক্ত পতিত হইয়া যেন ইংলণ্ড ধবলযশে কলঙ্কারোপ করিল। এই ঘটনায় সমস্ত আমেরিকা অগ্নিময় হইয়া উঠিল। ইংলণ্ডের ন্যায়পরতা, জাতীয় গৌরব, মনুষ্যত্ব, সমস্ত যেন আটলাণ্টিক গর্ভে নিমজ্জিত হইল। সমস্ত আমেরিকা সমস্বরে এই ঘটনার প্রতিবাদ করিলেন, সে স্বর আটলাণ্টিক-বক্ষঃ বিদারিয়া ইংলণ্ডে গমন করিল। কিন্তু ইংলণ্ডের হৃদয় গলিত হইল না। ইংলণ্ড আমেরিকার স্বাধীনতার ধ্বংস-সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। উভয় পার্লামেণ্টই ইংলণ্ডেশ্বর তৃতীয় জর্জ্জকে বুঝাইলেন যে, আমেরিকা অনেক দিন হইতে স্বাধীনতার জন্য স্থিরসঙ্কল্প হইয়াছিল; কেবল সামর্থ্য ও সুবিধার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। এক্ষণে সেই রাক্ষসী স্বাধীনতা-স্পৃহাকে সূতিকাগারেই বিনাশ করা প্রত্যেক ইংরাজেরই অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম; সুতরাং যে কোন মূল্যে ও যে কোন বিপদে হউক, ইহা প্রত্যেক ইংরাজেরই সাধনীয়।

এ দিকে আমেরিকাবাসীরাও আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। প্রাচ্য গগনে ভীষণ মেঘ উঠিয়াছে দেখিয়াই তাঁহারা স্থির করিলেন যে, পশ্চিমাভিমুখে প্রবল ঝটিকা বহিবে। নানাস্থানে জাতীয় সভার অধিবেশন হইতে লাগিল। সকলেই মুক্তহস্তে চাঁদা দিতে লাগিলেন। দলে দলে সৈন্য সংগৃহীত হইতে লাগিল। কর্ম্মচারিগণ মনোনীত হইতে লাগিলেন। আমাদের প্রবন্ধের অধিনায়ক জর্জ্জ ওয়াসিংটন সেনাপতির পদে অভিষিক্ত হইলেন। আমেরিকা এতদিন অনেক কোমল উপায় অবলম্বন করিয়া ব্যর্থ হইয়া এক্ষণে শাণিত অসি দ্বারা অদৃষ্ট পরীক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন।

ফিলাডেলফিয়া নগরে একটি জাতীয় মহতী সভার অধিবেশন হইল। আমেরিকাবাসীরা এখনও প্রকাশ্যরূপে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহারা জাতীয় দায়িত্বে ঋণ-সংগ্রহ ও অতি ত্বরা-সহকারে যুদ্ধের আয়োজন করিতে আরম্ভ করিলেন।

তখন বৃটিশ সেনাপতি গেজ্ সাহেব বোষ্টননগরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। পাছে তিনি সসৈন্য আমেরিকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন, এই ভয়ে আমেরিকাবাসীরা তাঁহাকে বোষ্টন সহরে অবরুদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। জর্জ্জ ওয়াসিংটনের হস্তেই এই গুরু ভার পড়িল। আমেরিকানেরা বোষ্টন অবরুদ্ধ করিবে, এই সংবাদ যখন বোষ্টনে উপস্থিত হইল, তখন ইংরাজেরা কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন। তাঁহারা এ কথা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তাঁহারা ভাবিলেন, যখন তাঁহাদিগের পুঞ্জীকৃত খাদ্যসামগ্রী রহিয়াছে ও নগর দুর্গ সংরক্ষিত রহিয়াছে, তখন বিদ্রোহীদিগের নিকট হইতে তাঁহাদিগের কোন ভয়ের আশঙ্কা নাই। অপর ব্রিটিশ সেনাপতি হাউএরই এই বিশ্বাস ছিল। সুতরাং নির্ব্বাণোন্মুখী দীপশিখার ন্যায় তাঁহাদিগের প্রমোদ-প্রিয়তা এই মুমূর্ষু কালে অতিশয় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। এই সময় একটি রঙ্গালয় নির্ম্মিত হইল; বলের * ধূম পড়িয়া গেল! প্রহসন, বর্লেস্ক, মাসকুইরেড প্রভৃতির জন্য ধড়াধড় চাঁদা উঠিতে লাগিল। উক্ত রঙ্গালয়ে এক রজনীতে বোষ্টন অবরুদ্ধ নামক একখানি প্রহসন প্রণীত ও অভিনীত হইতেছিল। তাহাতে একটি দৃশ্যে সেনাপতি ওয়াসিংটনকে বিকলাঙ্গ অবস্থায় একটি প্রকাণ্ড পরচুলা মাথায় দিয়া একখানি মরচেধরা তরবারি হস্তে একজন মাত্র পুরাতন বন্দুকধারী ভৃত্য সমভিব্যাহারে রঙ্গমধ্যে অবতারিত করা হইয়াছিল। এই অংশটুকুর অভিনয় হইতেছে, এমন সময় একজন সার্জ্জন সহসা রঙ্গস্থলে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে জানাইল যে,

* Balls—প্রমোদ নৃত্য।

আমেরিকানেরা আসিতেছে। দর্শকমণ্ডলী প্রথমে ইহা অভিনয়ের অংশ মনে করিয়া অসম্ভব হাসিয়া উঠিল। কিন্তু অচিরকালমধ্যেই তাঁহাদিগের সে ভ্রম দূরীকৃত হইল। সেনাপতি হাউ মুহূর্ত্তমধ্যে আসিয়া সুদৃঢ় ও গম্ভীর স্বরে আদেশ করিলেন, "কর্ম্মচারিগণ! অবিলম্বে সশস্ত্র আপন আপন স্থানে গমন কর।" সেই হর্ষ, সেই প্রমোদ, সহসা বিষাদে পরিণত হইল (Jest became earnest)। যথার্থই বোষ্টন অবরুদ্ধ হইয়াছিল, যথার্থই ওয়াসিংটন সসৈন্য ব্রিটনদিগকে আসিয়া ঘিরিয়াছিলেন। বোষ্টনের অবরোধ কয়েক মাস ধরিয়া রহিল। বঙ্কার্শ পাহাড়ে ইংরাজদিগের সহিত আমেরিকানদিগের একটি যুদ্ধ হয়, তাহাতে বিজয়লক্ষ্মী আমেরিকানদিগের অঙ্কশায়িনী হন। ইংরাজেরা ওয়াসিংটনের নিকট প্রস্তাব করিলেন যে, যদি তাঁহাদিগকে অক্ষতশরীরে নগর ছাড়িয়া যাইতে দেন, তাহা হইলে তাঁহারা নগরের কোন ক্ষতি না করিয়া নগর ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে প্রস্তুত আছেন। ওয়াসিংটন এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তদনুসারে ইংরাজেরা ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ্চ নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক হ্যালিফ্যাক্স যাত্রা করিলেন।

এই স্বাধীনতাসমরে ওয়াসিংটন যে অদ্ভুত অবদানপরম্পরা সম্পাদন করিয়াছিলেন, বীরত্বের ও আত্মত্যাগের যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সকল রাখিয়া গিয়াছেন, সে সকল আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করা এ প্রবন্ধে সম্ভব নহে। আমরা কেবল প্রধান প্রধান দুই চারিটি ঘটনা উল্লেখ করিয়া এই জীবনী সমাপ্ত করিব।

ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সে নিউইয়র্ক একটি প্রধান নগর। ইংরাজেরা তাহার উপর আক্রমণ করিবেন শুনিয়া তাহার রক্ষার্থ ওয়াসিংটন তথায় গমন করিলেন। তাঁহার সহিত ১৭০০০ মাত্র সৈন্য ছিল। ২২শে আগষ্ট ইংরাজ-সৈন্য নিউইয়র্কের অনতিদূরবর্ত্তী লঙ আইল্যাণ্ড নামক দ্বীপের উপকূলে নামিয়াই আমেরিক শিবিরাভিমুখে অভিযান করিল। ইংরাজসৈন্য আসিতেছে দেখিয়া আমেরিকানেরা দুর্ব্বুদ্ধিক্রমে শিবির পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহাদিগের দিকে অগ্রসর হইল। এই সময় সেনাপতি ক্লিণ্টন অন্যদিক্ হইতে আর এক দল ইংরাজসৈন্য লইয়া আমেরিকান্‌দিগকে আক্রমণ করিলেন। সুতরাং তাঁহাদিগের পলায়নের আশা পর্য্যন্ত রহিল না। দুই সেনার মধ্যে পড়িয়া সেই আমেরিকান সৈন্য ভস্মীভূত হইয়া গেল। সহস্র সৈন্য রণবন্দী হইল। অল্পসংখ্যক মাত্র রক্ষা পাইয়া পরাজয়বার্ত্তা গৃহে লইয়া গেল।

আমেরিক সৈন্য যুদ্ধে পরাস্ত হইল বটে, কিন্তু নিউইয়র্ক এখনও ওয়াসিংটনের হস্তে রহিল। ইংরাজেরা এই নগর অধিকার করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ওয়াসিংটন উপকূলে সৈন্য রাখিলেন—উদ্দেশ্য ইংরাজসৈন্যকে জাহাজ হইতে নামিতে দিবেন না। তিনি স্বয়ংও দুই রেজিমেণ্ট সৈন্য লইয়া দূর হইতে ঘটনা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। ইংরাজসৈন্য আবির্ভূত হইবামাত্র আমেরিকানেরা ভয়ে পলায়ন করিল—একটিমাত্র বন্দুকে আওয়াজ হইল না। বন্দুকের গুলী বন্দুকেই রহিয়া গেল। ওয়াসিংটন অল্পমাত্র অনুযাত্রিকসহ রণস্থলে পড়িয়া রহিলেন। তিনি নিজ সৈন্যগণের কাপুরুষতায় এতদূর বিরক্ত, দুঃখিত ও হতাশ হইয়াছিলেন যে, কাতরস্বরে বলিয়াছিলেন যে, 'এই সকল লোক দ্বারা কেমন করিয়া আমেরিকা রক্ষা হইবে?' যে সময় তিনি অশ্বপৃষ্ঠে আসীন হইয়া এই কথা ভাবিতেছিলেন, সে সময় তিনি শত্রুসৈন্য হইতে অশীতি-পদ-পরিমিতি দূরে অবস্থিত ছিলেন। ওয়াসিংটনের রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া যাইতে যেন কষ্ট হইতেছিল। কিন্তু তাঁহার অনুযাত্রিকেরা বিপদের আশঙ্কা করিয়া তাঁহার অশ্বের মুখ ফিরাইয়া দিল এবং অশ্বের বল্গা ধরিয়া টানিয়া তাঁহাকে সবেগে রণস্থল হইতে লইয়া গেল। পরদিনই ইংরাজদিগের সহিত একটি সামান্য যুদ্ধ হয়, তাহাতে আমেরিকানেরা জয়লাভ করেন। ইহাতে তাঁহাদিগের বিলুপ্ত গৌরব কথঞ্চিত পুনরুদ্ধৃত হয়। পরাজিত হইয়াও ইংরাজসৈন্য সংখ্যার আধিক্যবশতঃ আমেরিক সৈন্য ভেদ করিয়া নগরমধ্যে প্রবেশ করিল। নিউইয়র্কের রাজতান্ত্রিক দল মহোল্লাসে ইংরাজসৈন্যগণকে গ্রহণ করিলেন। কয় রাত্রি নগরে অগ্নি লাগিয়া নগরের তৃতীয়াংশ ভস্মরাশিতে পরিণত হইল।

ওয়াসিংটন নিউইয়র্ক পরিত্যাগ করিয়া হার্লেম নগরে শিবির সন্নিবেশিত করিলেন। তাঁহার সৈন্যমধ্যে গভীর হতাশতার ভাব দেদীপ্যমান হইল। ইংরাজসৈন্য তাঁহাদিগের অনুসরণ করিল। তাঁহারা

পদে পদে পরাজিত হইয়া অবশেষে নর্থ কাসল্ পাহাড়ের শিখরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বিজয়-লক্ষ্মী এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে ইংরাজদিগের করতলস্থ হইল। ইংরাজেরা ঘোষণা করিলেন যে, যে সকল বিদ্রোহী ৬০ দিনের মধ্যে অস্ত্র পরিত্যাগ করিবে, তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করা যাইবে।

এই হতাশতার সময় ওয়াসিংটন, আমেরিকার একমাত্র আশা ছিলেন। আমেরিকান্ মহাসভা তাঁহাকে ডিক্টেটরপদে অভিষিক্ত করিবার সঙ্কল্প করিলেন, তিনি তাহা স্বীকার করিলেন। কিন্তু সে অবস্থায় কিছু করিয়া উঠিতে পারিবেন, এরূপ সাহস তিনি ভিন্ন আর কেহ করিতে পারে কি না সন্দেহ।

ওয়াসিংটনের সৈন্যের দুরবস্থার ইয়ত্তা ছিল না। তাহাদিগের পায় জুতা ছিল না, গায় ভাল বস্ত্র ছিল না; সুতরাং নগ্নপদে নগ্নদেহে তাহাদিগকে হিমানীসমাচ্ছাদিত গিরিপথে ও গিরিশৃঙ্গে পলাইয়া বেড়াইতে হইয়াছে। অনাহারে ও অনিদ্রায় তাহাদিগকে কত দিন যাপন করিতে হইয়াছে। স্বয়ং সেনাপতি অভুক্ত ও বিনিদ্র থাকিতেন বলিয়া তাহারা সে ক্লেশ সহিতে পারিত। ভাল শিক্ষা ছিল না, ভাল অস্ত্র-শস্ত্র ছিল না বলিয়া ওয়াসিংটন নিজ সেনাকে সমতল ক্ষেত্রে শত্রুগণের সম্মুখীন করিতেন না। দিবসে পর্ব্বতগুহায় লুক্কায়িত থাকিয়া রজনীতে অতর্কিতভাবে ইংরাজ-শিবিরে পড়িয়া তাহাদিগকে মারিয়া তাহাদের খাদ্যসামগ্রী, অস্ত্রশস্ত্র ও পরিচ্ছদাদি লইয়া পলায়ন করিতেন। মহাসভা তাঁহাকে অস্ত্রশস্ত্র, অর্থ বা খাদ্য-সামগ্রী দিয়া সহায়তা করিতে পারিতেন না। সুতরাং এ সমস্ত তাঁহাকে নিজেই সংগ্রহ করিয়া লইতে হইত। কোন দেশের কোন সেনাপতিকে এরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল কি না সন্দেহ। কিন্তু তাঁহার অতিমানুষশক্তিবলে তিনি ক্রমে ক্রমে এ সমস্ত বাধা-বিপত্তি কাটাইয়া উঠিলেন। তাঁহার সৈন্যেরা ক্রমেই রণদীক্ষিত হইয়া উঠিল, হতশত্রুর অস্ত্রশস্ত্র ও পরিচ্ছদে ক্রমেই তাহারা সুসজ্জিত হইয়া উঠিল। বীরত্বে ও স্বজাতিপ্রেমের ভাবে তাহারা ক্রমেই রণোন্মত্ত হইয়া উঠিল। এতদিনের কষ্টযন্ত্রণায় ওয়াসিংটনের সৈন্যগণ স্বদেশের মঙ্গলার্থ আত্মবলি দিতে প্রস্তুত হইল।

শর-সানধায় সিদ্ধ হইয়া ওয়াসিংটনের সৈন্যগণ এখন শত্রুসৈন্যের সম্মুখীন হইল। জলে স্থলে একেবারে তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া গেল।

চল পাঠক, একবার কল্পনা-বলে ব্যোম-যানে উঠিয়া সেই সময়ের ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সের অবস্থা দেখি। ঐ দেখ, সমস্ত আমেরিকা জলে স্থলে যেন একটি প্রকাণ্ড যুদ্ধক্ষেত্র বলিয়া বোধ হইতেছে। ঐ দেখ, ইংরাজরণতরি বক্ষঃ স্ফীত করিয়া, পতাকা উড্ডীন করিয়া আমেরিকান্‌দিগের বিরুদ্ধে ধাবিত হইয়াছে, আর আমেরিকানেরা ভীষণ তোপধ্বনি করিয়া তাহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। ঐ দেখ, আর একখানি ইংরাজ-জাহাজ শ্বেতপালরাজি বিস্তার করিয়া নিউইয়র্কের বন্দর হইতে ভার্জ্জিনীয়া-অভিমুখে ধাবিত হইয়াছে। ঐ দেখ, ইহার সৈনিকেরা উপকূল-বিভাগ বিধ্বস্ত করিয়া লুণ্ঠনার্থ দেশমধ্যে প্রবেশ করিল। ঐ শুন, পীড়িত ও মুমূর্ষু ইংরাজ সেনাগণের আর্ত্তনাদে গগন বিদীর্ণ হইতেছে। ঐ দেখ, জ্বর-রোগে আক্রান্ত হইয়া ইংরাজ সৈন্য দলে দলে মরিতেছে, তথাপি লুণ্ঠন হইতে নিরস্ত হইতেছে না।

আবার দেখ, আমেরিকানেরা কোথা হইতে হঠাৎ আসিয়া ব্রিটিশ-শিবিরে পড়িয়া তাহাদের কামান, বন্দুক, তরবারি ও দ্রব্যসামগ্রী কাড়িয়া লইয়া যাইতেছে। ঐ দেখ, আর এক দল আমেরিকান্ তিমি-বোটে ও ছোট ছোট ষ্টীমারে করিয়া আসিয়া ইংরাজাধিকৃত উপকূল বিভাগে পড়িয়া ইংরাজেরও দ্রব্য সামগ্রী লুঠ করিয়া লইয়া যাইতেছে। যে সেণ্ট জর্জ্জ দুর্গের লোহিত ক্রসের নিকট একদিন প্রত্যেক আমেরিকান্ নতশির হইতেন, আজ সেই সেণ্ট জর্জ্জের দিকে কেহ ভ্রূক্ষেপ করিতেছে না। ঐ যে সহস্র বজ্রনাদী কর্ণভেদী শব্দ শুনিলে, উহা একটি দুর্গ উড়িয়া যাইবার শব্দ। আমেরিকানেরা সুড়ঙ্গ কাটিয়া ইংরাজ দুর্গের নিম্নে গিয়া বারুদে গর্ত্ত পূরিত করিয়া তাহাতে অগ্নি প্রদান করায় ঐ দুর্গ উড়িয়া গেল। ঐ দেখ, আমেরিকানেরা আর একটি ইংরাজাধিকৃত নগরের উপর গোলাবর্ষণ করিতেছে। আবার আর এক দিকে দেখ, ঐ একটি শস্যক্ষেত্র দেখিতে দেখিতে রক্তক্ষেত্রে পরিণত হইল। ঐ দেখ, দুই সেনা কি সুক্ষ্মদৃষ্টিতে পরস্পরের গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে এবং ভীষণ লম্ফে পরস্পরের উপর পড়িয়া

পরস্পরকে ছিন্ন-ভিন্ন করিবার জন্য কি একাগ্রতার সহিত অবসর প্রতীক্ষা করিতেছে। উভয়ের রণ-বিষয়িনী প্রতিভার পরীক্ষা দিবার এই একটি প্রকাণ্ড রঙ্গস্থল। ঐ শুন, একেবারে শত শত কামান গর্জ্জিয়া উঠিয়াছে। সহস্র সহস্র বন্দুক পরক্ষণেই তীব্র শব্দে তাহার উত্তর দিতেছে। চতুর্দ্দিকে ঘন মেঘ উঠিতেছে। ধূমপুঞ্জে দৃষ্টি আবরিত হইতেছে এবং উভয় সৈন্যের পরস্পর-সংহারী গুলীগোলার শব্দে কান ফাটিয়া যাইতেছে। ঐ দেখ, ইংরাজ-সৈন্য পরাস্ত হইয়া পশ্চাদ্‌গামী হইল। 'ওয়াসিংটনের জয়' 'জয় আমেরিকার জয়' শব্দে গগন বিদীর্ণ হইল। এতদিনে স্বাধীনতা রাজতন্ত্রকে পরাস্ত করিল। এতদিনে জাতীয় দুর্গে জাতীয় পতাকা উড্ডীন হইল। এই স্বাধীনতা সমরের প্রধান নেতা ও প্রাণভূত ওয়াসিংটনের যশঃ আজ সমস্ত আমেরিকায় উদ্ঘোষিত হইতে লাগিল। তখন স্বাধীন আমেরিকা, বিজয়ী আমেরিকা নির্দ্দিষ্ট নিয়মে ইংলণ্ডের সহিত সন্ধি করিতে প্রস্তুত আছেন জানাইবার জন্য ইংলণ্ডের কতিপয় ব্যক্তিকে দৌত্য-কার্য্যে পাঠাইলেন। যে আমেরিকা ইংলণ্ডের রাশি রাশি ষ্ট্যাম্প ভস্মস্তূপে পরিণত করিয়াছে, ইংলণ্ডের জাহাজ জাহাজ চা সাগরগর্ভে প্রক্ষেপ করিয়াছে, ইংরাজের ভয়-প্রদর্শন পরিহাস করিয়াছে, ইংরাজের অভয়প্রদান তুচ্ছ করিয়াছে, যে আমেরিকা ইংরাজ সেনাকে পদদলিত ও ইংরাজ-পতাকাকে অবমানিত করিয়াছে, এবং ইংরাজ-প্রভুতাকে চিরদিনের জন্য বিসর্জ্জন দিয়াছে, আজ সেই আমেরিক জাতিকে একটি স্বাধীনজাতি বলিয়া ইংলণ্ডের স্বীকার করিতে হইবে। তাহার সহিত সমান ক্ষেত্রে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইতে হইবে এবং সন্ধিপত্রে নাগরিকগণের স্বাক্ষর যেন রাজস্বাক্ষর বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে—সন্ততির এ প্রস্তাবে জননী ব্রিটানীয়াকে সম্মত হইতে হইল।

ইংলণ্ডের সহিত সন্ধি হইয়া গেল। কিন্তু ওয়াসিংটনের জীবনের কর্ত্তব্য এখনও শেষ হয় নাই। তিনি আজ পদ-দলিত আমেরিকাকে স্বাধীন জাতিতে পরিণত করিয়া, রণ-পাণ্ডিত্যে জগৎকে মুগ্ধ করিয়া, জগতের শিক্ষার জন্য আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে চলিলেন। তাঁহার যে সেনা অজেয় ইংরাজ সেনাকে রণে পরাস্ত করিয়াছে, সেই সেনার বলে আজ তিনি আমেরিকার সম্রাট্ হইতে পারিতেন। কিন্তু সেই যোগীর অন্তরে সে নীচভাব পদ-প্রবেশ হইল না। তাঁহার উদার অন্তরে বরং ইহার ঠিক বিপরীত ভাবের উদয় হইল। জাতীয় স্বাধীনতার জন্য তিনি অনিয়ন্ত্রিত জাতীয় সৈনাপত্য স্বীকার করিয়াছিলেন; কিন্তু আজ সে কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, সুতরাং তিনি এক্ষণে সে সৈনাপত্য পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু সে পদ পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে একবার সসৈন্য নিউইয়র্ক নগরে প্রবেশ করিবেন স্থির করিলেন।

নিউইয়র্কের আজ মহাদিন। নিউইয়র্ক ইংরাজ-সৈন্যের সেনানিবাস ছিল। আজ সে ইংরাজসৈন্য স্থলে স্থল না পাইয়া পয়োনিধির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। ঐ দেখ, অদূরে ইংরাজ রণতরি তাহাদিগকে বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। আজ সে দিকে কেহ দৃক্‌পাতও করিতেছে না। ওয়াসিংটন—বিজয়ী ওয়াসিংটন—আমেরিকার প্রাণের প্রাণ ওয়াসিংটন—আজ সসৈন্য নগরমধ্যে প্রবেশ করিবেন, তাই আমেরিকাবাসীরা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নগরাভিমুখে ছুটিতেছে। দেখিতে দেখিতে সমস্ত রাজপথ জনাকীর্ণ হইয়া উঠিল—যেন রাজপথে জীবন-প্রবাহ প্রবাহিত হইল—যেন শির-সমুদ্রে সমস্ত নগর প্লাবিত হইল—যেন তরঙ্গের উপর তরঙ্গ পড়িতে লাগিল—নবেম্বরের মৃদু মধুর সূর্য্যরশ্মি তাহাতে পতিত হইয়া জল-তরঙ্গের অপূর্ব্ব শোভা-বিধান করিল। এমত সময় সহসা 'জয় ওয়াসিংটনের জয়', 'জয় আমেরিকার জয়' ধ্বনি উত্থিত হইল। ধ্বনির উপর ধ্বনি, তাহার উপর ধ্বনিতে আকাশ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। সেই জয়ধ্বনি সঙ্গে করিয়া অশ্বসেনা-পরিবেষ্টিত, সুসজ্জিত অশ্বপৃষ্ঠে সমাসীন রণজিৎ লোকপ্রাণ ওয়াসিংটন নগরে প্রবেশ করিলেন। জয়ধ্বনিতে নগর পরিপূরিত হইল। রাজপথের উভয় পার্শ্বস্থ প্রাসাদাবলীর গবাক্ষমালা হইতে অনবরত পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। এত দিন আমেরিকার জাতীয় জীবন ছিল না, সুতরাং জাতীয় পতাকাও ছিল না। কিন্তু আজ আমেরিকা বিশাল ও প্রবল-পরাক্রান্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী অনন্তবলশালী প্রকাণ্ড সাম্রাজ্য। সুতরাং আজ আমেরিকার নবসৌভাগ্য-দ্যোতক পতাকা চাই। যে স্তম্ভের উপর ব্রিটিশ

পতাকা উড্ডীন হইত, ব্রিটনের নগর পরিত্যাগ-কালে তাহা ভাঙ্গিয়া রাখিয়া গিয়াছে। ঐ দেখ, আমেরিক বীর নাগরিকেরা অমিতবলে ও মহোৎসাহে আজ জাতীয় পতাকার স্তম্ভ গাঁথিতেছে। ঐ দেখ, তাহাদিগের ক্ষিপ্রহস্ততায় নিমেষমধ্যে স্তম্ভ নির্মিত হইল, ঐ দেখ, আজ আমেরিক জাতীয় পতাকা সগর্ব্বে ও সহর্ষে গগনে নৃত্য করিতেছে, যেন নৃত্যচ্ছলে সমরবিজয়ী ওয়াসিংটনকে আশীর্ব্বাদ করিতেছে। ঐ দেখ, বীরচূড়ামণি ওয়াসিংটন শিরস্ত্রাণ খুলিয়া নগ্নশিরে নগরমধ্যে প্রবেশ করিতেছেন ও অবনতমস্তকে স্বজাতীয়গণকে নমস্কার করিতেছেন। অনেকে আজও তাঁহাকে দেখে নাই অথবা দেখিয়াও তত আকৃষ্টচিত্ত হয় নাই। অনেকে আজও ওয়াসিংটনের নামও শুনে নাই। কোন্ দেবতা ছদ্মবেশে তাঁহাদিগের মধ্যে এত দিন বাস করিতেছিলেন, দেখিবার নিমিত্ত আজ সমস্ত আমেরিকা প্রায় সেখানে উপস্থিত। আমেরিকাবাসিগণের সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন আজ তাহাদিগের নয়নে সংক্রামিত হইয়াছে। তাহারা আজ প্রাণ ভরিয়া উপচিত শক্তিতে তাহাদিগের উদ্ধার-কর্ত্তাকে দেখিতে লাগিল। আজ ওয়াসিংটন প্রত্যেক আমেরিকাবাসীর হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা! আজ তিনি প্রত্যেক আমেরিকাবাসীর নয়নের অঞ্জন। তাঁহাকে বার বার প্রণাম করিয়া ও অনবরত দেখিয়াও আজ তাহাদিগের তৃপ্তি হইতেছে না! ধন্য ওয়াসিংটন! ধন্য তোমার জীবন! অনাহারে অনিদ্রায় তুমি যে এতদিন ঘোর শবসাধনা করিয়াছিলে, আজ তাহার সিদ্ধি দেখিয়া না জানি তোমার মনে কি সুখসাগর উথলিয়া উঠিয়াছে! তুমি আমেরিকার যে কাজ করিলে, যতকাল আমেরিকা থাকিবে, কখনই সে উপকার ভুলিতে পারিবে না। আমেরিকায় কখনই জাতীয় জীবন ছিল না, সুতরাং তুমি আজ একটি নূতন জাতি সৃষ্টি করিলে। তোমার তপোবলে ও চরিত্রমাহাত্ম্যে সেই জাতি একদিন জগতের তীর্থস্থল হইবে। ধন্য তোমার বীরত্ব! তুমি বিনা শিক্ষায়, বিনা অস্ত্রবলে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াও একটি বিশ্ব-বিজয়িনী জাতিকে পরাস্ত করিলে। তোমার অসাধ্য কিছুই নাই।

১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে ওয়াসিংটন আমেরিকার সৈন্যাপত্য গ্রহণ করেন। তাঁহার অসামান্য বীরত্বে আমেরিকার চরণ হইতে বৃটিশ শৃঙ্খল স্খলিত হইল। তাঁহার যত্নে আমেরিকাবাসিগণ পৃথিবীর একটি জাতিমধ্যে পরিগণিত হইলেন। তাঁহার জীবন-ব্রতের পূর্ণ উদ্যাপনা হইলে তিনি ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে জাতীয় সৈন্যাপত্যের পদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপন গ্রাম্য আবাসে গমন করিয়া সাধারণ লোকের ন্যায় সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অধিক দিন তিনি বিশ্রাম সুখ ভোগ করিতে পারিলেন না। অচিরকালমধ্যেই আমেরিকা আবার তাহার শরণাপন্ন হইল। তিনি যে শুদ্ধ বীরত্বে অদ্বিতীয় ছিলেন, এরূপ নহে। তিনি অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন ও প্রগাঢ় রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। বিশেষতঃ নিষ্কাম দেশহিতৈষণার জন্য তিনি আমেরিকাবাসিমাত্রেরই উপাস্য দেবতা ছিলেন। যখন প্রেসিডেন্টের পদ সৃষ্ট হয়, তখন সকলে একবাক্যে তাঁহাকেই ঐ পদে বরণ করিল। তাঁহাকে গ্রাম্য আবাস পরিত্যাগ করিয়া অগত্যা ঐ জাতীয় অধিনায়কত্ব পদ গ্রহণ করিতে হইল। পাঁচ বৎসরের অধিক এই পদে থাকার কাহার অধিকার নাই; কিন্তু ওয়াসিংটন তিনবার এই পদে মনোনীত হন, অবশেষে ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর তিনি মানবলীলা সংবরণ করেন। জাতীয় মহাসভার সভ্যেরা ও দেশের সমস্ত লোক এই শোচনীয় ঘটনায় একমাস কাল শোক-চিহ্ন ধারণ করেন।

এই মহাপুরুষের মৃত্যুতে জাতীয় হৃদয়ে শোক উদ্দীপিত করিবার জন্য কোন জাতীয় বিধি-ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় নাই। যে মহাপুরুষের প্রাণোৎসর্গের ফলে আজ আমেরিকা অনন্তসৌভাগ্যশালিনী ও অনন্ত সুখবতী; যাহার বীরত্বে ও ধর্ম্মবলে একদিন আমেরিকা অগণ্য বিপৎপরম্পরা হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছিল; যাহাকে আমেরিকাবাসীরা এতদিন পিতার ন্যায় ভক্তি করিয়া আসিয়াছিল;—সেই পবিত্রহৃদয় মহাপুরুষ আজ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে বলিয়া আজ আমেরিকার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা শোকে অভিভূত। সে গভীর শোক ব্যক্ত করা অসম্ভব। তথাপি যাহার যেরূপ সাধ্য, আমেরিকাবাসিমাত্রেই সেইরূপে তাহা ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। বাগ্মী সভাগৃহে বক্তৃতা করিয়া, যাজক ভজনালয়ে সাম্মান (ধর্ম্মনীতি-বিষয়ক বক্তৃতা) দিয়া, সম্পাদক সংবাদপত্রের স্তম্ভে

লিখিয়া, জাতিসাধারণ নীরবে অশ্রুজল ফেলিয়া—এই মহাপুরুষের মৃত্যুজনিত শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ওয়াসিংটন যে আমেরিকাবাসিগণের বাস্তব পিতা ছিলেন, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। বিপদের দিনে যখন আমেরিকাবাসিগণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন তিনি তাঁহাদিগের একমাত্র বন্ধু ও একমাত্র সহায় ছিলেন। অস্ত্র-শস্ত্র নাই, শিক্ষা নাই, ধন নাই, অতীত জাতীয় গৌরবের উদ্দীপনা নাই—এরূপ অবস্থায় জাতীয় গৌরবের ভাবে সৈন্যগণকে উদ্দীপিত করা অসাধ্য-সাধন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ওয়াসিংটন সেই নিরস্ত্র, বিবস্ত্র, অশিক্ষিত সেনাকে আপনার প্রাণোৎসর্গের মোহিনী মন্ত্রবলে অচিরকালমধ্যে অজেয় করিয়া তুলিয়াছিলেন। এ স্বাধীনতাসমরে জাতিসাধারণ তাঁহাকে অনিয়ন্ত্রিত প্রভুতা দিয়াছিল মাত্র, কিন্তু তাঁহাকে আর কোন প্রকারে সহায়তা করে নাই। তিনি স্বজাতির ধন লুণ্ঠন করিয়া আপনার ও সেনার উদরপূরণ করিতে ইচ্ছা করেন নাই। এই জন্য তিনি ও তাঁহার সেনা পার্ব্বতীয় বৃক্ষলতাদির ফলমূল ভক্ষণ করিয়া এই শব-সাধনা করিয়াছিলেন। সেই যোগবলেই এরূপ মহতী সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি আমেরিকাকে পূর্ব্ব-গৌরবে প্রতিষ্ঠাপিত করেন নাই, কারণ, আমেরিকার পূর্ব্বগৌরব ছিল না। তিনি আমেরিক জাতির সৃষ্টিকর্ত্তা, আমেরিকার জাতীয় গৌরবের ও জাতীয় স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠাতা এবং আমেরিকার জাতীয় জীবন ও জাতীয় ইতিহাসের প্রবর্ত্তয়িতা। এরূপ মহাপুরুষের জন্য শোকচিহ্ন ধারণ করিয়া ও এরূপ মহাপুরুষের নামে তাঁহাদিগের রাজধানীর নামকরণ করিয়া তাঁহার প্রকৃত সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন। এই মহাপুরুষের মৃত্যুতে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডও শোকচিহ্ন ধারণ করিয়াছিল। ৯ই ফেব্রুয়ারী এই সংবাদ প্রথমে ফ্রান্সে উপস্থিত হয়। তখন সুপ্রসিদ্ধ নেপোলিয়ন বোনাপার্ট সাধারণতন্ত্রী ফ্রান্সের প্রথম কনসলের পদে অভিষিক্ত ছিলেন, তিনি নিজ সৈন্যগণের প্রতি এই আদেশ প্রচার করেন:—

"সৈন্যগণ! ওয়াসিংটনের মৃত্যু হইয়াছে! এই মহাপুরুষ যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি স্বদেশের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ফরাসী জাতি ও পৃথিবীর স্বাধীন জাতিমাত্রেরই নিকট তাঁহার স্মৃতি অতিপ্রিয়। বিশেষতঃ ফরাসী সৈন্যগণের নিকট ইহা প্রিয়তম, কারণ, ফরাসী সৈন্য তাঁহার ন্যায় ও তাঁহার সৈন্যগণের ন্যায় স্বাধীনতা ও সাম্যের জন্য যুদ্ধ করিয়াছিল, অতএব তোমরা সকলেই তাঁহার জন্য শোকচিহ্ন ধারণ করিবে।" তিনি আরও আদেশ করিলেন যে, ফরাসী সাধারণতন্ত্রের সমস্ত পত্রিকায় ও পতাকাদণ্ডে দশ দিনকাল কৃষ্ণ ক্রেপ সংলগ্ন রাখিতে হইবে। প্যারিস নগরীর এক হোটেলে (Hotel des Invalides) ওয়াসিংটনের স্মৃতিসম্মানার্থ একটি আন্ত্যেষ্টিক বক্তৃতা করা হইল। সেই সেই বক্তৃতাস্থলে নেপোলিয়ন ও সমস্ত সিবিল ও মিলিটারী কর্ম্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন। ফ্রান্স কোন বৈদেশিকের জন্য আর কখন এরূপ শোক প্রকাশ করেন নাই।

যখন ইংলণ্ডের রণতরী সকল টোবে বন্দরে নোঙ্গর করিয়াছিল, সেই সময়ে পোতাধ্যক্ষ লর্ড ব্রেড্‌পোর্টের নিকট এই সংবাদ আসিল। এই শোচনীয় সংবাদে শত্রুর মন বিগলিত হইল। তাঁহার আদেশে তদীয় পোতের পতাকা অর্দ্ধ-নমিত করা হইল! অবশিষ্ট উনষাইটখানি রণতরি মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তন করিল। ধন্য ওয়াসিংটন! তুমি চরিত্র গৌরবে আজ শত্রুর হৃদয়ও বিগলিত করিয়া তাহার নিকট পূজা গ্রহণ করিলে। তোমার নিষ্কাম স্বদেশহিতৈষণা তোমাকে অনন্তকাল এইরূপে শত্রু মিত্র উভয়েরই পূজার্হ করিয়া রাখিবে। দেব! আমার হৃদয়-আসনে একবার আবির্ভূত হইয়া আমাকে এইরূপ নিষ্কামধর্ম্ম শিক্ষা দাও। একবার আবির্ভূত হইয়া ভারতের দারিদ্র্যব্রতের ও নিষ্কাম আত্ম-ত্যাগের মহিমা প্রচার কর। দেব! একবার দেখা দিয়া পতিত জাতিকে স্বজাতিপ্রেম ও স্বদেশানুরাগ শিখাও!

উপসংহার

—*—

আমরা এই প্রবন্ধে বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, বুদ্ধ, চৈতন্য, গুরুগোবিন্দ, ওয়ালেস্, টেল, হ্যাম্‌ডেন, হাউয়ার্ড, উইল্‌বারফোর্স, রোমিলী, ওয়াসিংটন প্রভৃতি যে সকল মহাপুরুষগণের নাম সঙ্কীর্ত্তন করিলাম, তাঁহারা প্রত্যেকেই আত্মোৎসর্গের এক একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। এই জন্যই এ প্রবন্ধের নাম প্রাতঃস্মরণীয় চরিতমালা রাখিলাম। কারণ, প্রতিদিন

প্রাতে উঠিয়া ইঁহাদিগের নাম স্মরণ করিলে মন স্বর্গীয়ভাব ধারণ করে। এই জন্য আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, সকলেরই প্রাতে উঠিয়া ইঁহাদিগের নাম স্মরণ করা উচিত। ইঁহারা প্রত্যেকেই এক একটি গুরুতর ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রত্যেকেই সেই সেই ব্রতের উদ্যাপনায় নিজ নিজ জীবন উৎসর্গীকৃত করিয়াছিলেন। প্রত্যেকেই নিজ নিজ সম্পত্তিতে জলাঞ্জলি দিয়া দারিদ্র্য-ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রত্যেকেই নিজ নিজ জীবনে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া গিয়াছেন যে, ধনস্পৃহা আত্মত্যাগের প্রতিকূল। যিনি পরদুঃখকাতর, তিনি পরদুঃখ দেখিয়া কখন ধন পুঞ্জীকৃত করিয়া রাখিতে পারেন না। ধর্ম্মজীবনের প্রথম কার্য্য—ধনোৎসর্গ, দ্বিতীয় কার্য্য—প্রাণোৎসর্গ * * * *।

বুদ্ধ ধনোৎসর্গের প্রধান বীর। তিনি রাজপুত্র হইয়াও ভাবী রাজ-সিংহাসনের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া মানবহিতব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এই জন্য আজও পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ অধিবাসী বুদ্ধ শাক্যসিংহের উপাসক। হিন্দু যবন মিশাইতে গিয়া গুরুগোবিন্দও ঘাতক-হস্তে প্রাণ হারাইয়াছিলেন। ওয়ালেস্ স্বজাতির উদ্ধারসাধন করিতে গিয়া ইংরাজ-ঘাতকের হস্তে প্রাণ-বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল সতীর অঙ্গের ন্যায় স্থানে স্থানে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল। হাম্‌ডেন্‌ও জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষা করিতে গিয়া প্রাণ হারাইয়াছিলেন। ওয়াসিংটন ও টেল্ জীবনের মমতায় জলাঞ্জলি দিয়া স্বদেশের উদ্ধারানলে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সৌভাগ্যক্রমে তাঁহারা সে অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। হাউয়ার্ড, উইল্‌বারফোর্স, রোমিলী, ইঁহারা মানব-প্রেমে উন্মাদিত হইয়া মানবজাতির দুঃখমোচনে ধন ও প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এই যোগি-বৃন্দের প্রত্যেকের জীবনেই ধনোৎসর্গ ও প্রাণোৎসর্গের বহুল দৃষ্টান্ত উপলক্ষিত হয়। কেহ পূর্ণ যোগী, কেহ বা অর্দ্ধসংসারী ও অর্দ্ধযোগী, এইমাত্র ভেদ। সকলেরই জীবনের একই লক্ষ্য মানবদুঃখ-নিবৃত্তি ও মানব-সুখবৃদ্ধি। দারিদ্র্য এই শব-সাধনার প্রধান উপকরণ-সামগ্রী বলিয়া ইঁহারা সকলেই দারিদ্র্যকে মিত্রভাবে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। * * ঘটসপ্তের পর্ব্বতগুহায় ওয়ালেস্, কারাগারের অন্ধকারে ও কুষ্ঠরোগাক্রান্তদিগের চিকিৎসালয়ে হাউয়ার্ড, দাসদিগের কুটীরে উইল্‌বারফোর্স, আলিঘানি পর্ব্বতের নীহারিণী অধিত্যকায় ওয়াসিংটন, সুইজর্লণ্ডের পাষাণে টেল, তপোবনে পর্ণকুটীরে বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র; রোগীর রুগ্নশয্যায় বা মৃত্যুশয্যায় বুদ্ধ, * * বৈরাগীর স্থণ্ডিল আসনে চৈতন্য, কারাগারের তমোময় গর্ত্তে হাম্‌ডেন ও অপরাধীর রুধিরকর্দ্দমিত বধ্যভূমিতে রোমিলী এবং পিতৃশবোপরি গুরুগোবিন্দ শবসাধন করিয়াছিলেন। রাজপ্রাসাদ উপযোগী স্থল নহে। ঐশ্বর্য্য শবসাধনার অনুকূল সাধনসামগ্রী নহে। পর্ণকুটীর, গৈরিক বসন, কমণ্ডলু, উঞ্ছবৃত্তি প্রভৃতিই শবসাধনার অনুকূল স্থান ও সাধন-সামগ্রী।

আবার ভারতের এই সকলের আবশ্যকতা হইয়াছে। কিন্তু এবার আমাদের শবসাধন-লক্ষ্য পরকাল নহে,—ইহকাল! এবার আমরা পরের দুঃখে উদাসীন হইয়া সংবাদ ছাড়িয়া নির্জ্জন কুটীরে বসিয়া কেবল নিজের পারলৌকিক হিতের চিন্তায় নিমগ্ন থাকিব না। এবার আমরা যে স্বার্থপরতা পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশের মঙ্গলার্থ শবসাধনা করিব। এবার আমরা নিজের স্বর্গ-নরক লইয়া ব্যতিব্যস্ত থাকিব না। আমি নরকে যাই, তাহাতে আমার দুঃখ নাই, কিন্তু আমার দেশ যেন আমার শবসাধনার বলে নরক হইতে উত্থিত হয়। আমি স্বর্গে যাইতে না পারি, তাহাতেও আমার দুঃখ নাই, কিন্তু আমি যেন অন্ততঃ মৃত্যুকালেও দেখিয়া যাই যে, আমার দেশ অপূর্ব্ব স্বর্গ রাজ্যে পরিণত হইয়াছে, আমার জাতি দেবোচিত সৌভাগ্য ভোগ করিতেছে। না জানি, সে সৌভাগ্যের দিন কত দিনে আসিবে! কে বলিতে পারে, কত দিনে আসিবে?

* * * * *

সম্পূর্ণ।

বীরপূজা

ভক্তিবীর সাধু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও অঘোরনাথ গুপ্ত

ভগবানের পূজার নিম্নেই সাধুর পূজা প্রশস্ত। ভক্তাধীন ভগবান্ ভক্তের সুখেই সুখী, ভক্তের দুঃখেই দুঃখী। এই জন্য ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদকে প্রহরীরা যে বেত্রাঘাত করিয়াছিল, তাহার দাগ ভগবানের পৃষ্ঠে পড়িয়াছিল। সেইরূপ ভক্তকে পূজা করিলে—সে পূজা ভগবানেই অর্পিত হয়। বস্তুতঃ ভক্তেরা নিজে কোন পূজা গ্রহণ করেন না। তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া লোকে যে কোন পূজা করে—তাহা তাঁহারা ভগবৎ-প্রতিনিধিস্বরূপ গ্রহণ করিয়া থাকেন। ভগবানে আত্মসমর্পণ করার পর হইতে ভক্তের আর স্বতন্ত্র পূজা গ্রহণ করিবার অধিকার থাকে না। তাঁহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বই লোপ হইয়া যায়। সুতরাং সাধু বা ভক্তকে যে পূজা করা যায়, তাহা ভগবৎপূজার সামিল হইয়া যায়। এই জন্যই আমি 'বীরপূজা' আরম্ভ করিয়াছি। বীরগণ এক এক বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া ভগবানের অংশাবতাররূপে পরিণত হন। ভগবানের শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণাবতার—যেহেতু, তিনি সর্ব্ব-বিষয়ে পূর্ণতা লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যকেও অনেকে পূর্ণাবতার বলিয়া থাকেন। দেবাদিদেব মহাদেবও পূর্ণ, যদিও তিনি অবতার নহেন—অনাদি ও অনন্ত। বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য্য, দত্তাত্রেয়, নানক প্রভৃতিও অবতারমধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। এ সমস্তই অংশাবতার। রামচন্দ্রও অংশাবতার—কারণ, তিনি চতুর্দ্দশ কলাপূর্ণ বলিয়া প্রখ্যাত। এতদ্ভিন্ন তেত্রিশ কোটি দেবতা আছেন। এ সকলেরই পূজা ব্রহ্মপূজা বলা যাইতে পারে। হিন্দুধর্ম্ম এইরূপে পৌত্তলিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জ্ঞানহীন ব্যক্তিরা মনে করেন যে, হিন্দুধর্ম্ম বহু ব্রহ্মবাদে দূষিত। বস্তুতঃ তাহা নহে। 'ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্'—'ওঁ তৎসৎ'—'তত্ত্বমসি'—হিন্দুধর্ম্মের মূল মন্ত্র। এক ব্রহ্মের সত্তা ভিন্ন হিন্দুধর্ম্ম অন্য সত্তাই স্বীকার করে না। নিরাকার ব্রহ্ম—'বহু স্যাম' বলিয়া যে বহুরূপ ধারণ করিয়াছেন, তাহার যে কোন রূপের পূজা করিয়া হিন্দু আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন, এই জন্যই তন্ত্রে গুরুপূজার এত প্রশংসা কীর্ত্তিত হইয়াছে। যে গুরু হইতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায়—যিনি জ্ঞানপ্রদীপ জ্বালিয়া আমাদের অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করেন—তিনি ব্রহ্মস্বরূপ, সুতরাং আমাদের অবশ্য পূজনীয়। নিরাকার ব্রহ্মের ধ্যান-ধারণায় সমর্থ হইতে হইলে ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর নিকট উপদেশ লওয়া চাই। গুরুকৃপা না হইলে সিদ্ধিলাভ করা অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। যখন ভগবান্ হরি ধ্রুবের তপস্যায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে দেখা দিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন, তখন বিনা গুরু-উপদেশে সিদ্ধিলাভ করিলে, ধ্রুবের মনে পাছে অহঙ্কার উৎপন্ন হইয়া তাঁহার পতন হয়—এই আশঙ্কায় তিনি দেবর্ষি নারদকে অগ্রে পাঠাইয়াছিলেন। নারদ ধ্রুবকে মন্ত্রের দ্বারা পূত করিলে, তিনি স্থূলমূর্ত্তিতে ধ্রুবকে দর্শন দেন। সাধন বিনা এ মন্ত্র-রহস্য অপরে বুঝিতে না পারেন, কিন্তু ইহা অকাট্য সত্য যে, ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে হইলে পথ-প্রদর্শকের সাহায্য একান্ত প্রয়োজনীয়। তাই যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন—'মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থা।' মহাত্মারা যে পথ দেখাইয়া দেন, সেই পথই মুক্তিপথ। 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে—মহাজন-প্রদর্শিত পথ দিয়া না যাইলে,

মুক্তিলাভের আর উপায়ান্তর নাই। এই জন্যই গুরুর আরাধনা করিতেই হইবে। যাঁহারা ভক্ত-প্রধান—তাঁহারা ভগবানের প্রিয়পাত্র, সুতরাং তাঁহারা জগদ্‌গুরু—জগতের আরাধ্য।

আজ আমি যে দুই ভক্তের পূজা করিতে বসিয়াছি, ইহাঁরা উভয়েই আমার সমপাঠী ও যৌবন-সুহৃৎ। ইহা আমার পক্ষে অল্প গৌরবের বিষয় নহে। বিজয়, অঘোর, শিবনাথ, উমেশ ও আমি এই পাঁচজনের মধ্যে এক সময় সুদৃঢ় প্রণয়-বন্ধন ছিল। সংস্কৃত কালেজের ঘোর নাস্তিকতার সময়—আমরা পাঁচ জন বন্ধু ভাবিত বলিয়া পরিহসিত হইতাম। সেই ঠাট্টা-বিদ্রূপের মধ্য দিয়া আমাদের ভগবদ্ভক্তি দিন দিন উপচিত হইতে লাগিল। গৃহে ও কালেজে নিরন্তর নির্য্যাতনে আমাদের পরস্পর প্রেম দিন দিন অধিকতর ঘনীভূত হইতে লাগিল। বিজয় আমাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন; সুতরাং তিনি আমাদের দলের একরূপ নেতা ছিলেন। আমরা নির্য্যাতন-ভয়ে কয়জনে মিলিত হইয়া নির্জ্জনে উপাসনা করিতাম। তখন ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দু-ধর্ম্ম অপেক্ষা অধিকতর পরিমার্জ্জিত মনে করিয়া আমরা আদি-ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে নিয়মিতরূপে যাইতাম। কিন্তু তখন ধারণা ছিল যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র নহে—হিন্দুধর্ম্মের সার সংগ্রহ মাত্র। যাহা হউক, এই ক্ষুদ্র সাধকদল পরস্পরের সাহায্য ও আচার্য্যগণের উপদেশে ধর্ম্মপথে ক্রমশ অগ্রসর হইতে লাগিল। কৈশোরের সে সরলতা ও পবিত্রতা, সে প্রেমিকতা—জীবনে কখন ভুলিব না। বিজয় ও অঘোর উভয়েই আমাকে যে কিরূপ ভালবাসিতেন, তাহা আমি বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারি না।

বিজয় কাব্যের শ্রেণী হইতে আমাদিগকে ছাড়িয়া মেডিকেল কালেজে গিয়া ভর্ত্তি হইলেন। অঘোর অলঙ্কারের শ্রেণী পর্য্যন্ত উঠিয়া কালেজ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রচারকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। আমি, শিবনাথ ও উমেশকে অলঙ্কারের শ্রেণীতে রাখিয়া স্মৃতির শ্রেণীতে উঠিয়া গেলাম। পরে এম-এ ক্লাশে শিবনাথ ও আমি—উভয়ে আবার মিলিত হইয়া ১৮৭২ সালে—দুই জনে M. A. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কালেজ হইতে বাহির হইলাম। উমেশ L. A. ক্লাশ পর্য্যন্ত পড়িয়া মেডিকেল কালেজে ভর্ত্তি হইলেন। তিনি বিদ্যারত্ন, শিবনাথ শাস্ত্রী ও আমি বিদ্যাভূষণ উপাধি পাইলাম। বিজয় ও অঘোর নিম্নশ্রেণী হইতে কালেজ পরিত্যাগ করায়, সংস্কৃত কালেজ হইতে কোন উপাধি পান নাই। অথবা সাধু হইবেন বলিয়াই বুঝি মা তাঁহাদিগকে কোন উপাধিভূষণে বিভূষিত করেন নাই।

বিজয় মেডিকেল কালেজে কিছুদিন পাঠ করিয়া ঢাকায় গিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করিলেন। বিনা ভিজিটে দীন-দুঃখীকে চিকিৎসা করাই তাঁহার চিকিৎসা-ব্যবসায় অবলম্বন করার মুখ্য উদ্দেশ্য। বিজয়ের হৃদয় দয়ার সাগর ছিল। তাঁহার কার্য্য-প্রণালী দেখিয়া বোধ হইত যেন, তিনি জগতের দুঃখভার মোচন করিবার জন্য জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অঘোর প্রেমের অবতার। তাঁহার বাহুযুগল প্রেমভরে ব্রহ্মাণ্ডকে যেন আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইত। তাঁহার হাসি সদা লাগিয়াই থাকিত। বিজয় অপেক্ষাকৃত গম্ভীরমূর্ত্তি ছিলেন। যেন বর্ণচোরা পাকা আম।

আমি উভয়ের বাসায় সর্ব্বদা যাতায়াত করিতাম। অঘোরের যখন চেতলায় বাসা ছিল—আমি মধ্যে মধ্যে তথায় গিয়া তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিতাম। অঘোর আমাকে পাইয়া যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইতেন। আমায় কোথায় রাখিবেন, কি খাওয়াইবেন—ইহার জন্য তিনি যেন ব্যস্ত হইয়া বেড়াইতেন। আমাকে আদর করিয়া, আমাকে খাওয়াইয়া, আমার অনুবর্ত্তন করিয়া—তিনি যেন কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করিতেন না। সে কৈশোর প্রেমের ছবি অঙ্কিত করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। এখনকার ক্ষতিলাভ গণনার দিনে সে অলৌকিক ভালবাসা আকাশ-কুসুমবৎ হইয়া উঠিয়াছে। বিজয়ের ভালবাসার যদিও তত বিকাশ ছিল না, তথাপি তাহা অতি গভীর ছিল। বিপদে না পড়িলে বিজয়ের ভালবাসার গভীরতা উপলব্ধি করা যাইত না। বন্ধুজনের বিপদে ইহা শতগুণ স্ফুরিত হইত। তখন বন্ধুজনের বিপদ্‌ভঞ্জনের জন্য তিনি বীরের ন্যায় দণ্ডায়মান হইতেন। কোন বাধা-বিপত্তি তখন তাঁহার গতিরোধ করিতে পারিত না। অঘোরের হৃদয় গলিত সোনা—ইহাতে প্রেমের ছবি সহজে অঙ্কিত হইত; কিন্তু বিজয়ের হৃদয় শোধিত সুবর্ণ। ইহাতে অঙ্কপাত সহজে হইত না বটে,

কিন্তু ইহা খোদিত করিলে ইহাতে স্থায়ী অঙ্কপাত হইত।

বিজয় সত্যই বলিয়াছিলেন যে, সাধুদের দয়া আছে—মায়া নাই। বিজয়ের জীবনের প্রতি ঘটনায় ইহা প্রমাণীকৃত হইয়াছিল। বিজয় ঢাকা ছাড়িয়া সপরিবারে ভারতাশ্রমে আসিয়া কিছুদিন সপরিবারে বাস করেন। যে স্থানে এক্ষণে সিটি কালেজ প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে—ঐ স্থানের পূর্ব্বের অট্টালিকায় তখন ভারত-আশ্রম প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই আশ্রমে ব্রাহ্ম পরিবারেরা একান্নবর্ত্তী হিন্দু-পরিবারের ন্যায় বাস করিতেন। এই সময় মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন বিলাত হইতে ফিরিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে স্বতন্ত্র আকার দিয়া ব্রাহ্মসমাজ গঠিত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে ব্রাহ্মগণ সাধক-সম্প্রদায় মাত্র ছিলেন। নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনাই তাঁহাদিগের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। রাজা রামমোহন রায় এই সাধক-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহার পোষণ-কর্ত্তা। যদিও সাকার ও নিরাকার উপাসনা লইয়া এই সাধক-সম্প্রদায়ের সহিত হিন্দু-সমাজের বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল—তথাপি চিন্তাশীল হিন্দুমাত্রেরই সহিত এই সাধক-সম্প্রদায় ক্রমশ ঘনীভূত হইতেছিলেন। আদি ব্রাহ্মসমাজে বেদ ও উপনিষদাদির পাঠ ও ব্যাখ্যা শুনিতে এবং বিশুদ্ধ ব্রহ্মসঙ্গীত শ্রবণ করিয়া জীবন সার্থক করিতে শুদ্ধ সুশিক্ষিত নব্যদল কেন—প্রবীণ গোঁড়া হিন্দুরাও অনেকে গমন করিতেন। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে, আদি ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে লোকের এত ভিড় হইত যে, অনেকেই বসিবার আসন পাইতেন না। অথচ সকলে চিত্রলিখিত পুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চলভাবে মহর্ষির উপদেশ, বৈদান্তিকের বেদ ও উপনিষদাদি পাঠ ও কলাবতের সুমধুর ব্রহ্মসঙ্গীত শ্রবণ করিতেন। অবিশুদ্ধ হৃদয় লইয়া যাঁহারা তথায় যাইতেন, তাঁহারা বিশুদ্ধ-হৃদয় হইয়া ফিরিয়া আসিতেন। সভাভঙ্গের পর নামিবার সময় বোধ হইত যেন স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে নামিতেছি, তখন 'ব্রহ্ম' শব্দে ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন ভক্তি-ভাজন কোন মহাজন বুঝাইত। বিরুদ্ধবাদীও তাঁহাকে ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। এই ক্ষুদ্র সাধকদল তখন যেন ব্রহ্মাণ্ডকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। সূর্য্যরশ্মি-মালার সম্মুখে মেঘমালার ন্যায় বাধাবিঘ্ন যেন ক্রমশ এই পবিত্র সাধকদলের সম্মুখ হইতে অন্তর্হিত হইতেছিল। হিন্দুগণ ক্রমশ বুঝিতেছিলেন যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম কোন নবধর্ম্ম নহে—বেদ ও উপনিষদাদি-মথিত ব্রহ্মজ্ঞানমূলক হিন্দুধর্ম্ম মাত্র। আমার জননীর নিকট আমি এই ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিয়া এই ধর্ম্মমন্দিরে গিয়া ধর্ম্মের উপদেশ শুনিবার অনুমতি চাওয়ায় তিনি মুক্তকণ্ঠে এই ধর্ম্মের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন এবং আমাকে এই ধর্ম্মমন্দিরে গিয়া ধর্ম্মোপদেশ শুনিবার অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন।

সে সময়ের নবীন উৎসাহ ও উৎকট ধর্ম্মপিপাসা আমি কখনই ভুলিতে পারিব না। আমরা কয় বন্ধুতে তখন নিয়মিতরূপে আদি ব্রাহ্মসমাজে ধর্ম্মোপদেশ শুনিতে যাইতাম এবং পরে আমাদের কাহারও বাসায় আসিয়া আবার উহার আলোচনা করিতাম। যখন কেশববাবু ব্রাহ্মধর্ম্মকে নূতন আকার দিলেন, তখন আমাদের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইল। বিজয় ও শিবনাথ উপবীত পরিত্যাগ করিয়া কেশব-প্রচারিত নবধর্ম্ম-সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিলেন। অঘোর বৈদ্য, তাঁহার উপবীত ছিল কি না, আমার স্মরণ নাই। যাহা হউক, তিনিও এই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইলেন। আমি উপবীতরক্ষার পক্ষে—সুতরাং আমি বাহিরে রহিলাম। এই উপবীত পরিত্যাগ লইয়া শিবনাথের সঙ্গে আমার প্রায় ছয়মাস কাল তর্ক-বিতর্ক হইয়াছিল। উভয় পক্ষের যুক্তির অবতারণা করার স্থল ইহা নহে বটে, তথাপি এই উপলক্ষে সে সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। শিবনাথের উপবীত-পরিত্যাগ সম্বন্ধে যুক্তি এই যে, যখন একমাত্র ঈশ্বর সকলের পিতা এবং মানবজাতির সকলেই তাঁহার পুত্র বা কন্যা, তখন বৈষম্যসূচক উপবীত ধারণ করা কোন মতে উচিত নহে। ইহার খণ্ডনে আমি বলিয়াছিলাম যে, উপবীত বৈষম্য-সূচক হইলেও ইহার ধারণের সার্থকতা আছে। কারণ, ইহা আমাদিগের বংশের ব্রত স্মরণ করাইয়া দেয়—সুতরাং আপনাকে ব্রাহ্মণ-কুলের যোগ্য করিবার ইচ্ছাও স্বতই স্ফুরিত হয়। যখন আমরা ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতেছি, ব্রাহ্মণ-কুলের উপাধি ধারণ করিতেছি—তখন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম-দ্যোতক উপবীত পরিত্যাগ করিতে যাই কেন? যখন পূর্ণ ব্রহ্ম-জ্ঞান জন্মিবে—প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইব, 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', তখন সমস্ত উপাধি আপনিই চলিয়া যাইবে—ব্রাহ্মণ

জাতিত্ব-বোধক শিখাসূত্রের আর প্রয়োজন হইবে না। যতক্ষণ সে জ্ঞান আমাদের পূর্ণ না হইতেছে, অভিমান ও ব্যক্তিত্বজ্ঞান প্রবল রহিয়াছে, তখন তাড়াতাড়ি 'পইতে পুড়িয়ে ভগবান্' হইতে যাই কেন? এতদুত্তরে শিবনাথ বলিয়াছিলেন যে, "যখন জাতিভেদ আমি মানি না, তখন জাতিভেদ-সূচক চিহ্ন ধারণ করা আমার পক্ষে কপটাচার হইবে। আমি কপটী হইয়া আমার ধর্ম্মবিশ্বাসকে কলঙ্কিত করিতে চাহি না। বিশেষতঃ উপবীত গলে ধারণ করি। উপাসনায় বসিলে আমার উপাসনা হয় না। বোধ হয় যেন, আমার গলদেশে সর্প জড়ান রহিয়াছে।" এই কথা বলিতে বলিতে অনেক সময় তাঁহার নয়নদ্বয় অশ্রুজলে ভাসিয়া যাইত। তাঁহার মনের এই অবস্থা দেখিয়া আমি আর তাঁহাকে উপবীত ধারণ করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে পারিলাম না। তাঁহার জনকজননী আমাকে পুত্রনির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন। শিবনাথ তৎকালে আমার পরম বন্ধু ছিলেন বলিয়া তাঁহারা আমায় শিবনাথের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে বলিয়াছিলেন। শিবনাথের সংসার-বৈরাগ্য দেখিয়া তাঁহাদের মনে বিষম আশঙ্কা হইয়াছিল। শিবনাথের ভবিষ্য জীবনের কার্য্য-কলাপে তাঁহাদের সে আশঙ্কা যে অমূলক নহে, তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছিল।

কেশব-প্রচারিত নবধর্ম্মের আবির্ভাবে হিন্দুসমাজে হুলস্থূল পড়িয়া গেল! এতদিন ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়া কেহ জাতিচ্যুত হন নাই, কারণ, আদি ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুধর্ম্মের ভিত্তিভূমি বর্ণাশ্রমের বিরোধী ছিলেন না। কিন্তু এখন ব্রাহ্মসমাজ বর্ণাশ্রমের বিরোধী হইয়া হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন। ব্রাহ্মসমাজ এই সময় দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িল। আদি ব্রাহ্মসমাজ ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ। আদি ব্রাহ্মসমাজ যদিও বেদবিরোধী ছিলেন না বটে, কিন্তু অতর্কিতভাবে ইহাতে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বেদ-বিরোধিতার ছায়া পড়িল। কেশবের অসাধারণ প্রতিভার আলোক উভয় সমাজের উপরই প্রতিফলিত হইল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কতিপয় প্রবীণ ব্রাহ্ম ব্যতীত উভয় সমাজের অধিকাংশ সভ্যই কেশবের তীব্র আকর্ষণে অল্পবিস্তর পরিমাণে আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। সেই মহাত্মার হৃদয়-প্রমাথিনী বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া অতি অল্প লোকেই অন্ততঃ সেই সময়ের জন্য তাঁহার দিকে আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারিতেন না। আমরা কতিপয় বন্ধু যদিও ব্রাহ্মসমাজের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম না, তথাপি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। বহ্নিমুখবিবিক্ষু পতঙ্গের ন্যায় তখন আমাদের দশা হইয়াছিল! বিজয়, অঘোর, শিবনাথ প্রভৃতি সেই মহাপুরুষের প্রতিভাকৃষ্ট হইয়া একেবারে আত্মহারা হইয়া গেলেন। আমি আমার প্রিয়বন্ধু চন্দ্রমোহন মজুমদার প্রভৃতি কতিপয় যুবক সেই প্রলয়ঙ্কর স্রোতে ভাসিয়া যাইতে যাইতে পিতৃ-পুণ্য-বলে তীর পাইলাম।

হিন্দুসমাজ তখন টলমল করিয়া উঠিতেছিল। যদি ব্রাহ্মসমাজে তখন অন্তর্বিচ্ছেদ না ঘটিত, যদি আদি ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ আপনাদিগের মতবৈষম্যের সামঞ্জস্য করিতে পারিতেন এবং যদি অকালে কেশব বাবুকে ব্রাহ্মসমাজের গদি হইতে না নামান হইত, তাহা হইলে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজের বেগ রোধ করা বোধ হয় অসাধ্য হইত! কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা অনুরূপ হইল বলিয়াই বিপরীত ঘটনা সকল ঘটিল। ব্রাহ্মধর্ম্ম ভারতের জাতীয় ধর্ম্ম হইবে না বলিয়াই বিধাতা ইহাকে অঙ্কুরে বিদলিত করিলেন। ইহার ফল ভাল হইবে কি মন্দ হইবে, তাহা অন্তর্য্যামীই জানেন।

ব্রাহ্মসমাজকে সুদৃঢ় বন্ধনে বদ্ধ করিবার জন্য কেশব বাবু 'ভারত আশ্রম' প্রতিষ্ঠাপিত করেন। আচার্য্য প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের হস্তে ইহার তত্ত্বাবধানের ভার অর্পিত হয়। তিনি সপরিবারে এই আশ্রমবাটিকার অন্দর-মহলে বাস করিতে লাগিলেন। সেই সময় বিজয়ও সেই অন্দর-মহলের এক প্রকোষ্ঠে সপরিবারে বাস করিতেন। অন্যান্য কতিপয় ব্রাহ্মপরিবারও তথায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ব্রাহ্মসমাজের মোহ তখনও আমাদিগকে পরিত্যাগ করে নাই। আমি, প্রিয়বন্ধু চন্দ্রমোহন মজুমদার, ডাক্তার দুর্গাদাস গুপ্ত প্রভৃতি কতিপয় যুবক ঐ আশ্রম-বাটিকার সর্ব্বোচ্চতলে একটি কুঠরী ভাড়া লইয়া স্বতন্ত্র বাসা করিয়াছিলাম। যে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির জন্য যৌবনের প্রারম্ভ হইতে অনেক খাটিয়াছি ও অনেক চিন্তা করিয়াছি, আজ কোন্ প্রাণে তাহাকে দূরে পরিহার করি? এই ভাবিয়া আমরা ইহার নিকটে থাকিয়া ইহার উপস্থিত আন্দোলনের গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম।

কেশব বাবুর সমাজ 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' নামে আখ্যাত হইল। ভারত-আশ্রমে এই নব-প্রতিষ্ঠিত সমাজের লোক নানা স্থান হইতে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মে ব্রাহ্মে ও ব্রাহ্মগণের পরিবারে পরিবারে বিশেষ সম্মিলন হইতে লাগিল। ভারত-আশ্রমে একটি সঙ্গতসভা প্রতিষ্ঠাপিত হইল। তথায় নির্দ্দিষ্ট দিনে ব্রাহ্মগণ ধর্ম্মবিষয়ে তর্কবিতর্ক করিয়া পরস্পরের সন্দেহভঞ্জন করিতেন। পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজে যে কোন ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তির প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার ছিল। এখন হইতে নিয়ম হইল যে, রেজিষ্টরিভুক্ত ব্রাহ্ম ব্যতীত আর কেহ সঙ্গত-সভায় কোন প্রশ্নাদি করিতে পারিবেন না। সুতরাং আমরা কয়জনে বাদ পড়িলাম। আমাদিগকে ব্রাহ্মগণ আর প্রেমের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন না। কেশব বাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র সেনের জামাতা ডাক্তার দুর্গাদাস গুপ্ত তৎকালে মেডিকেল কালেজে পড়িতেন ও আমাদের সঙ্গে থাকিতেন। সেই জন্য তিনি আসিয়া মধ্যে মধ্যে আমাদের তত্ত্ব লইতেন মাত্র। আর কেহ আমাদের বড় সংবাদ লইতেন না। দিল্লী, লাহোর প্রভৃতি স্থান হইতে ব্রাহ্মগণ আসিয়া ব্রাহ্মপরিবারমধ্যে মহা সমাদরে পরিগৃহীত হইতেন—কিন্তু অব্রাহ্ম বলিয়া আমরা চির-পরিচিত ব্রাহ্ম-পরিবারেও অনাদৃত হইতে লাগিলাম! তখন হিন্দুসমাজ হইতে ব্রাহ্মসমাজের আর বিশিষ্টত্ব আমাদের উপলব্ধি হইল না। সেই দলাদলি, সেই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও সেই সম্প্রদায়-বহির্ভূত লোকদিগের উপর ঘৃণা! বিশেষের মধ্যে এই যে, হিন্দু সমাজের দলাদলি, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও বিধর্ম্মীর প্রতি ঘৃণা কালে শিথিলিত হইয়া গিয়াছে—কিন্তু এই নব-প্রতিষ্ঠিত সমাজের সকল ভাবই নূতন ও তীব্র। এই ভাবের নূতনতা ও তীব্রতার জন্য হিন্দুসমাজের সহিত ব্রাহ্মসমাজের অচিরাৎ মহা-সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মেরা হিন্দুদিগকে যেরূপ ঘৃণার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন, এই নূতন সমাজের প্রতি হিন্দুসমাজের ঘৃণাও সেইরূপ বাড়িতে লাগিল। ঘৃণা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নির্যাতনের বেগও বাড়িতে লাগিল।

অগ্রে প্রতি ঘরে ঘরে ব্রাহ্ম হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহারা অবাধে ব্রহ্মমন্দিরে গিয়া উপাসনাদি করিতেন—তাহাতে কেহ আপত্তি করিতেন না। কিন্তু এখন হইতে হিন্দুসমাজ এই গুপ্ত ব্রাহ্মদিগকে পর্য্যন্ত নির্যাতন করিতে আরম্ভ করিলেন। সুতরাং যাঁহাদিগের ব্রাহ্মসমাজের সহিত প্রকাশ্য যোগ দিবার ইচ্ছা ছিল না, তাঁহাদিগকেও অগত্যা গৃহত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মতালিকাভুক্ত হইয়া আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম হইতে হইল। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মগণই বিশেষ গোলে পড়িলেন। কারণ, ব্রাহ্মতালিকাভুক্ত হইতে হইলেই—তাঁহাদিগকে অগ্রে উপবীত পরিত্যাগ করিতে হইত। উপবীত পরিত্যাগ করার পর তাঁহাদিগের হিন্দুসমাজমধ্যে পুনঃ-প্রবিষ্ট হওয়া কঠিন হইত। এইরূপে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মগণও এই ধর্ম্মবিপ্লবে বিশেষরূপে নির্যাতিত হইতে লাগিলেন। এই দলের শীর্ষস্থানীয় আমার শ্রদ্ধাস্পদ বাল্যসখা বিজয়-কৃষ্ণ গোস্বামী ও শিবনাথ শাস্ত্রী। বন্ধুবর সাধু স্বর্গীয় অঘোরনাথ গুপ্তকে এত নির্যাতন সহ্য করিতে হয় নাই। তথাপি তাঁহাকে কিয়ৎপরিমাণে নির্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল।

এই সময়ে কেশবচন্দ্র সেনের গৌরব-রবি মধ্যাহ্ন-গগনে সমুদিত হইয়াছিল। ব্রাহ্ম নরনারী তাঁহাকে ভগবানের অবতার বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। কত কত ব্রাহ্মণ ব্রাহ্ম তাঁহার পদধূলি মস্তকে লইয়া আপনাকে চরিতার্থ মনে করিতে লাগিলেন। বিজয়, শিবনাথ প্রভৃতি ব্রাহ্মগণও তাঁহাকে আদর্শ-মানব বা অবতার বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। ইহার বিপরীতে কিছু বলিলে তাঁহারা তখন চটিয়া উঠিতেন। ব্রাহ্মিকাগণের গুরুভক্তি পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। কেশবচন্দ্র সেনের বাটী লোকে লোকারণ্য। পারিবারিক উপাসনায়, মন্দিরের উপাসনায় সর্ব্বত্র কেশব। ব্রাহ্মসমাজ যেন কেশব-ময় হইয়া উঠিল। বোধ হইল যেন, বৃন্দাবন স্বস্থান পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া প্রতিষ্ঠিত হইল। নগরের কোলাহলে উদ্বেলিত হইয়া কেশব বাবু বিজনবাসের সঙ্কল্প করিলেন। বেলঘোরিয়ার নিকটে একটি রম্য উদ্যান তাঁহার বনবিহারের জন্য স্থিরীকৃত হইল। তিনি তথায় গিয়া নির্জ্জনবাস আরম্ভ করিলেন। কিন্তু অচিরকালমধ্যে এই উদ্যান ব্রাহ্ম নরনারীতে পরিপূর্ণ হইল। এইরূপ কেশবচন্দ্র সেনের বিজনবাস পাণ্ডবদিগের অরণ্য-বাসের তুল্য হইয়া উঠিল।

কেশব বাবুর প্রতি ব্রাহ্মিকাদিগের অনুরাগ

দিন দিন উপচীয়মান হইতে লাগিল। গুরু-ভক্তির আতিশয্যে স্বামী বা অভিভাবকগণ বিশেষ উদ্বিগ্ন ও উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। কেশব বাবুর মনোহর মূর্ত্তি, প্রতিভাবিচ্ছুরিত মুখকান্তি, মধুর ও চিত্ত-প্রমাথী সম্ভাষণ এবং হৃদয়-বিদারী নয়নযুগল—প্রকৃতই ব্রাহ্মিকাগণকে উন্মাদিত করিয়া তুলিয়াছিল। বস্তুতই তিনি কেশবাবতার হইয়া উঠিয়াছিলেন। এ দিকে ব্রাহ্মিকাগণের কেশবানুরাগের বৃদ্ধির পরিমাণানুসারে ব্রাহ্মগণের অন্তরে কেশববিদ্বেষ অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর স্রোতের ন্যায় ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত ও অন্তঃপ্রবাহিত হইতে লাগিল। একদিন ইহার প্রমাণও প্রত্যক্ষ করিলাম। বিজয়ের শাশুড়ী ও স্ত্রী ভারত-আশ্রম হইতে একদিন কেশব-কাননে যাইবার জন্য শকটারোহণ করিয়াছেন—এই সংবাদ পাইয়া বিজয় ভারত-আশ্রমের সম্মুখস্থ শকটের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমার সহিত বিজয়ের পরিবারবর্গের বিশেষ আত্মীয়তা ছিল। বিজয় দ্রুতপদে যাইতেছেন দেখিয়া আমি তাঁহার পশ্চাদগামী হইলাম। বিজয় আরক্তলোচনে পত্নীকে ও ঠাকুরাণীকে শকট হইতে অবতরণ করিতে বলিলেন। বিজয়ের শাশুড়ী বলিলেন যে, 'আমি নামিব না—আমি জামাই ত্যাগ করিতে পারি, তথাপি গুরুকে ত্যাগ করিতে পারিব না।' বিজয়ের স্ত্রী জননীর অনুবর্ত্তনে বলিলেন যে, 'আমি স্বামী পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি, তথাপি গুরুকে ত্যাগ করিতে পারি না।' সেই স্থানে আমি ও বিজয় বই আর কেহ ছিল না। বিজয় বজ্রাহতের ন্যায় হতচেতন হইয়া তথায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। এ দিকে শকট অশ্বারোহিণীদ্বয়ের আদেশে গন্তব্যস্থানে চলিয়া গেল। বিজয়ের মস্তক আঘূর্ণিত হইল। অনেকক্ষণ পরে ধৈর্য্য ধরিয়া তিনি আশ্রমাভ্যন্তরে চলিয়া গেলেন। সেই বীরের হৃদয়ে তখন যে সঙ্কল্প-সঞ্চার হইল—কিছুকাল পরে তাহা কার্য্যে পরিণত হইল। সে সঙ্কল্প তখন তাঁহার অতলস্পর্শ হৃদয়-সাগরে ডুবিয়া রহিল। বাহিরে কেহ কিছু জানিতে পারিল না।

কেশববাবুর লোকপ্রিয়তা চরমসীমায় উঠিয়া ধীরে ধীরে নামিতে লাগিল। আমরা এক বৎসরকাল ভারত-আশ্রমের উর্দ্ধতলে বাস করিয়া ঘটনাস্রোতে স্থানান্তরিত হইলাম। সে ইংরাজী ১৮৭০-৭১ সাল। ব্রাহ্ম-সমাজের সঙ্গে আমাদের সংস্রব সেই সময়েই শেষ হইল। ব্রাহ্ম ও অব্রাহ্মে তখন ঘোরতর শত্রুতা চলিতেছিল। হিন্দুদিগের প্রতি ব্রাহ্ম-ব্রাহ্মিকাগণের ঘৃণা এত বাড়িতে লাগিল যে, যাহা কিছু হিন্দু, সকলই তাঁহাদিগের চক্ষে অপবিত্র বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ব্রাহ্মিকাগণের মধ্যে কাহাকে এরূপ এরূপ বলিতে শুনিয়াছি—'তুমি এখন যে কাজ করিয়াছ, কোন হিন্দুর মেয়েতে এমন কাজ করে না।' কন্যাকে ইহা অপেক্ষা অধিকতর তিরস্কার যেন আর করা যাইতে পারে না! হিন্দুধর্ম্ম অপবিত্র, হিন্দুদেবী অপবিত্র, হিন্দুসমাজ অপবিত্র—হিন্দু নরনারী অপবিত্র—সংক্ষেপতঃ হিন্দুর সকলই অপবিত্র—এইরূপ একটা ভাব ব্রাহ্ম-সমাজমধ্যে তখন প্রবল হইয়া উঠিল।

ব্রাহ্মগণের অন্তর্বিচ্ছেদ না ঘটিলে এই ভাব বোধ হয় ক্রমশ ভীষণ আকার ধারণ করিত—এবং হিন্দু ও ব্রাহ্মে ঘোরতর বিবাদ-বিসংবাদ বাধিয়া উঠিত। ভগবানের তাহা ইচ্ছা নহে বলিয়াই—অল্পদিনের মধ্যে গৃহবিবাদ বাধিয়া উঠিল। কুচবিহারের মহারাজার সঙ্গে কেশব বাবুর কন্যার বিবাহ লইয়া ব্রাহ্মসমাজমধ্যে হুলস্থুল পড়িয়া গেল।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ সেই বিবাদ উপলক্ষে দুই দলে বিভক্ত হইলেন। কেশব সেনের দল ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ নামেই আখ্যাত রহিল—এবং তাঁহার বিরোধিগণ 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' নাম ধারণ করিলেন। এই দুই দলে কি ভীষণ সংগ্রাম হইয়াছিল, তাহা বোধ হয়, অনেকেই বিদিত আছেন। যে ব্রাহ্মসমাজ আদর্শ-ধর্ম্মসমাজ হইবে বলিয়া একদিন আমরা আশা করিয়াছিলাম—আজ সেই ধর্ম্মসমাজ, অর্দ্ধ-শতাব্দীর মধ্যে ছিন্ন-ভিন্ন ও আসুরিক সমাজে পরিণত হইতেছে দেখিয়া আমরা মর্ম্মাহত হইয়াছিলাম।

আদিসমাজ এই সংগ্রামে কোন পক্ষভুক্ত না হইয়া আপনাদের ধার্ম্মিকতা ও মাহাত্ম্যের পরিচয় দিয়াছিলেন। এই সংগ্রামে শিবনাথ শাস্ত্রী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি কতিপয় মহাত্মা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের শীর্ষস্থানীয় হইয়া কেশব বাবুর বিরুদ্ধে বীরের ন্যায় দণ্ডায়মান হন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় মহাত্মা স্বর্গধামে গমন করিয়াছেন। এই সংগ্রামে কোন্ পক্ষে অন্যায় ছিল বা কোন্ পক্ষ জয়লাভ করিয়াছিলেন—তাহা সকলেই

জানেন বলিয়া আমি আর তাঁহার সমালোচনা করিতে ইচ্ছা করি না। আর এ প্রবন্ধের ইহা সমালোচ্যও হইতে পারে না।

কেশব বাবুর জীবনের এই ঘোর পরীক্ষাকালে সাধু অঘোর শিশুর ন্যায় গুরুর কোলে সংলগ্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার গুরুভক্তি একদিনের জন্যও কমে নাই। সেই সরল প্রেমিক শিষ্যের গুরুভক্তি অটল অচলসম ছিল। গুরু যে পথে—তিনিও সেই পথে। অথচ গুরু-দ্রোহিগণের সহিত তাঁহার কোনও বিবাদ-বিসংবাদ ছিল না। এই ভীষণ তরঙ্গের সময়েও তাঁহার হৃদয়-প্রশান্ত-মহাসাগরে কোনও তরঙ্গ উঠে নাই। কোন দলাদলিতে বা মারামারিতে তিনি ছিলেন না। কখন কাহারও প্রাণে তিনি ব্যথা দিয়াছেন, এ কথা কেহ বলিতে পারিবে না। এ পৃথিবীতে এমন পাপী তাপী কেহ ছিল না—যাহাকে কোল দিতে অঘোর কুণ্ঠিত হইতেন। তাঁহার হৃদয়-প্রেম-সাগর যেন ব্রহ্মাণ্ডকে তথায় ডুবাইয়া রাখিতে চাহিত। পাপী-তাপীর প্রাণের জ্বালা—অন্তরের তাপ—জুড়াইয়া দিবার জন্য অঘোরনাথ ছুটিয়া গিয়া তাহাদিগকে কোল দিতেন। পুণ্যবান অপেক্ষা তিনি পাপীদিগকে অধিকতর ভালবাসিতেন।—কারণ, তাহারা ভাল-বাসার কাঙ্গালা—যেহেতু জগৎ তাহাদিগকে ভালবাসে না। তিনি ধনবান্ অপেক্ষা দীনদিগকে অধিকতর আদর করিতেন—কারণ, তাহাদিগকে আদর করিবার লোক জগতে অতি বিরল। তাঁহাকে দেখিলেই দীনের দুঃখ,—পাপীর তাপ,—যেন আপনা হইতে সরিয়া যাইত। সে গালভরা হাসি আমি জীবনে ভুলিব না। তাঁহার প্রাণভরা প্রেমালিঙ্গন আমার স্মৃতিকে যেন এখনও অমৃত-সিঞ্চনে অভিষিঞ্চিত করিতেছে। এরূপ বিশ্বপ্রেমিক মহাপুরুষের অন্তরে এই অন্তর্বিচ্ছেদের জ্বালা কিরূপ অনুভূত হইয়াছিল, তাহা লেখনী বর্ণন করিতে অক্ষম। তিনি নীরবে সমস্ত সহিয়াছিলেন, কোন পক্ষ সমর্থন করেন নাই, এবং কোন প্রকার বাগ্‌বিতণ্ডায় লিপ্ত হন নাই। অথচ তিনি গুরুকেও ত্যাগ করেন নাই। এ বিষম সংগ্রামেও তিনি কাহারও শত্রু হন নাই—এবং কোন ব্রাহ্মও তাঁহার শত্রু হন নাই। সুতরাং রামতনু বাবু ও রাজনারায়ণ বসুর ন্যায় তিনিও অজাত-শত্রু আখ্যা পাইবার যোগ্য। বস্তুতই অঘোর দীর্ঘজীবন লাভ করিলে ইঁহাদের ন্যায় ব্রাহ্মসমাজ-তরুর তৃতীয় পরিপক্ব ফল হইতেন, সন্দেহ নাই। অথবা তিনি বুঝি অমৃত-বৃক্ষের ফল—গুটিকাতেই পরিপক্ব, তাই মা তাঁহাকে গুটিকা অবস্থাতেই হরণ করিয়াছিলেন।

বিজয় যদিও এই সংঘর্ষে কেশব বাবুকে প্রচণ্ড আক্রমণ করিয়াছিলেন—তথাপি ভবিষ্য ঘটনাবলী দ্বারা প্রমাণীকৃত হইয়াছে যে, তিনি নিজের প্রবল বিশ্বাসের অনুবর্ত্তী হইয়া এরূপ করিয়াছিলেন—কোন স্বার্থসাধন তাঁহার লক্ষ্য ছিল না। তাঁহার জীবনের সমস্ত ঘটনা সাক্ষ্য দিতেছে যে, তিনি নিষ্কাম যোগী ছিলেন—সাংসারিকতা বা আত্মোন্নতি তাঁহার কার্য্যকলাপের নিয়ন্ত্রী ছিল না।

বীরসন্ন্যাসী গ্যারিবল্ডী যেরূপ অষ্ট্রীয় শৃঙ্খল হইতে ইতালীকে উন্মুক্ত করিয়া ভিক্টর ইমানুয়েলকে সমবেত ইতালীয় রাজসিংহাসনে বসাইয়া, স্বয়ং নিজের ক্যাপ্রেরা দ্বীপস্থিত কুটীরাবাসে গিয়া অবস্থিতি করেন এবং রাজসম্মান ও রাজপ্রসাদ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া স্বহস্তে হলচালনা দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ ও পরিবার প্রতিপালন করিয়াছিলেন, আজ বিজয়ও সেইরূপ, মিলিত সাধারণতান্ত্রিক ব্রাহ্মসমাজের শূন্য গদিতে প্রিয়সুহৃৎ শিবনাথ শাস্ত্রীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বয়ং সপরিবারে কলিকাতা পরিত্যাগ করিলেন। সমাজবিশেষের ও স্থানবিশেষের গণ্ডীর ভিতর থাকা তাঁহার আর ভাল লাগিল না। ব্রাহ্ম-সমাজের মহাসমরে সাধারণ ব্রাহ্মগণের পক্ষে তিনি সারথি ও শিবনাথ শাস্ত্রী রথী ছিলেন। একজন এই মহাকুরুক্ষেত্র-রণের শ্রীকৃষ্ণ ও অন্যতর অর্জ্জুন ছিলেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের শীর্ষস্থানীয় ও প্রাণভূত বিখ্যাতনামা কেশবচন্দ্র সেন কুরুরাজ দুর্য্যোধনস্থানীয় ছিলেন। সাধু অঘোরনাথ এই কুরুদলের বিদুর ছিলেন বলিলে অসঙ্গতি হইবে না। আর কোন্ কোন্ মহারথী কোন্ কোন্ দলে কোন্ কোন্ চরিত্র অভিনয় করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহারা ও দর্শকমণ্ডলী অবগত আছেন। তবে বিশিষ্ট আর দুই চারিজন অভিনেতার নাম না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ পক্ষে শ্রদ্ধাস্পদ মহাত্মা দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ভীম ও শ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গীয় মহাত্মা দুর্গামোহন দাস যুধিষ্ঠির—এবং ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ পক্ষে ভক্তি-ভাজন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ভীষ্ম। ভীষ্মদেব এক্ষণে

শরশয্যায় শয়ান থাকিয়া দেহত্যাগের জন্য উত্তরায়নের প্রতীক্ষা করিতেছেন—তাহা লিপিবদ্ধ হইয়া শান্তিপর্ব্বে পরিণত হইবে। এই সময়ে যে পাণ্ডবগণের জয়লাভ হইয়াছিল—তাহা মহাভারতের কথা —সুতরাং অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ নাই। তবে যুধিষ্ঠির ও ভীম বিজয়লব্ধ সিংহাসনে অর্জ্জুনকে বসাইয়া আপনারা একে একে সশরীরে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, মহাভারতের কথার সঙ্গে ইহার এইমাত্র পার্থক্য।

সাধু বিজয় ও সাধু অঘোর উভয়েই এই মহারণের পর—প্রকৃত সন্ন্যাসী হইলেন। এই আত্মবিচ্ছেদে তাঁহাদের উভয়েরই মনে প্রগাঢ় বৈরাগ্যভাব উদিত হইল। দুইটি উজ্জ্বল নক্ষত্র দুই দিকে ছুটিয়া বাহির হইলেন—একটি প্রাচ্যে ও একটি প্রতীচ্যে। দরিদ্রের কুটিরে, রোগীর রুগ্ন-শয্যার পার্শ্বে, পাপী ও তাপীর শূন্য ও হতাশ হৃদয়-মন্দিরে ব্রহ্মজ্যোতিরূপে তাঁহারা আবির্ভূত হইয়া দরিদ্রের দারিদ্র্যজনিত দুঃখ, রোগীর রোগের যাতনা, পাপের অনুতাপজনিত তাপ এবং শোকতাপে দগ্ধ ব্যক্তির অন্তর্দাহ বিমোচন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বোধ হইল যেন, জগতের দুঃখভার মোচন করিবার জন্য জগজ্জননী দুইটি জ্যোতির্গোলক ধরাপৃষ্ঠে বিক্ষিপ্ত করিয়াছেন। সে জ্যোতির্ম্ময় গোলক মানবহিতের জন্য মানবরূপ ধারণ করিয়া ভারতের—এই দগ্ধ ভারতের—প্রতিগৃহে গিয়া সন্তাপ হরণ করিয়া বেড়াইতেছেন—আপনাদের তাপহীন বিমল জ্যোতিতে ভারতবাসীর তমসাচ্ছন্ন হৃদয়গগন আলোকিত ও স্নিগ্ধ করিতেছেন।

প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানলাভের পর মনুষ্যত্ব লোপ হইয়া যায়। তখন তিনি ব্রহ্মভূত হইয়া যান। সালোক্য, সারূপ্য, সাযুজ্য ও নির্ব্বাণ—ক্রমে ক্রমে এই চতুর্ব্বিধ মুক্তি লাভ না করিতে পারিলে সোঽহং জ্ঞানের স্ফুরণ হয় না। সমাধিযোগে নিরন্তর থাকিতে থাকিতে ব্রহ্মদর্শন বা ব্রহ্মানুভূতি হয়। এই ব্রহ্মদর্শন বা ব্রহ্মানুভূতির অবস্থায় কিছুকাল থাকিলে, সাধক চিদ্‌ঘন বপুঃ প্রাপ্ত হন। এই চিদ্‌ঘন বপুঃপ্রাপ্তির পর সাধক কিছুকাল হংস-হংসীরূপে পরমসুখের সহিত সাযুজ্যমিলনে থাকিয়া, লয়যোগের পরে বিদেহমুক্তি লাভ করেন। এই সালোক্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য—এই তিন অবস্থাতেই সাধকের ভগবানের সহিত লীলা চলিতে পারে। এই তিন অবস্থাকে সবিকল্প সমাধিযোগ কহে। আর শেষাবস্থাকে নির্ব্বিকল্প সমাধিযোগ কহে। এই চারি অবস্থায় লোককে সাধক ব্যতীত অপরে ধরিতে পারে না। ইঁহাদের ক্রিয়াকলাপ সাধারণ মনুষ্যের মত নহে। ইঁহারা বিধি-নিষেধের গণ্ডীর ভিতর থাকিতে পারেন না। সংসারের নীতি ও রাজশাসন ইঁহাদের ক্রিয়াকলাপের নিয়ামক নহে। সম্প্রদায়বিশেষের অনুষ্ঠানপদ্ধতিও ইঁহাদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না। উন্মুক্ত পক্ষী—অনন্ত গগন পাইয়া প্রাণ ভরিয়া তাহাতে বেড়ায়, আর সুবর্ণপিঞ্জর ও তদভ্যন্তরস্থ ক্ষীর-সর-নবনীতও তাহাকে আকর্ষণ করিতে পারে না। অনন্ত গগনের বিহঙ্গ—অনন্ত গগনব্যাপী বায়ু ভক্ষণ করিয়াই অপার আনন্দে সেই গগনেই বিহার ও বিচরণ করিয়া বেড়ায়। মর্ত্ত্যের লোক তাহার গতির সীমা ও প্রণালী ধারণা করিতে পারে না। কেবল এক-দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া থাকে; কেহ কেহ ক্ষুদ্র বলিয়া তাহাকে উপেক্ষা করে, কেহ কেহ বা তাহার অপূর্ব্ব দেহ ও বিচিত্র গতি দেখিয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত লোচনে তাহার দিকে তাকাইয়া থাকে; তাহাকে দেখিয়া তাহার মনে যেন কি এক অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভূত হয়। কেন হয়, তখন তাহা বুঝিতে পারে না। ক্রমে যেমন তৃতীয় লোচন খুলিতে থাকে, ততই সেই স্বর্গীয় পক্ষীর স্বরূপ উপলব্ধি হইতে থাকে। তখন দর্শকের মনপক্ষী দেহপিঞ্জর ভেদ করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে সেই গগনবিহারী স্বর্গীয় পক্ষীর সমীপবর্ত্তী হয়। এইরূপে জীবন্মুক্তের দল বাড়িতে থাকে।

অঘোর ও বিজয় জীবন্মুক্ত হইয়া ভারতের নানাস্থানে পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ভারতবাসী সকলকেই তাঁহাদের দলে লইবার জন্য তাঁহাদের প্রাণের বলবতী পিপাসা ছিল। দুঃস্থ দেখিয়া তাঁহারা প্রাণে বড় ব্যথা পাইতেন। তাই তাহাদিগের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া তাহাদিগকে মুক্তিপথের পথিক করিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন। কিন্তু সকলই সময়-সাপেক্ষ। জীবের পূর্ণ পরিপাক জন্মজন্মান্তরের সাধনা-সাপেক্ষ। ইচ্ছা করিলেই একজন মুক্ত হইতে পারেন না বা একজনকে মুক্ত করিতে পারা যায় না। "শনৈঃ পন্থা! শনৈঃ পন্থা!" জনসাধারণকে—ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে

হইবে। পিপীলিকাযোগ—দর্দ্দুরযোগ ও মর্কটযোগ —অধিকারিভেদে এই তিন প্রকার যোগের অনুবর্ত্তন করিতে হইবে। যাঁহারা ক্ষীণশক্তি—তাঁহাদিগের পিপীলিকা-শ্রেণীর ন্যায় ধীরে ধীরে মুক্তিমার্গে অগ্রসর হইতে হইবে। যাঁহারা অপেক্ষাকৃত শক্তিমান্, তাঁহারা ভেকের ন্যায় প্লুতগতি অবলম্বন করিতে পারেন। আর যাঁহারা হনুমানের ন্যায় মহাশক্তিসম্পন্ন, তাঁহারা উল্লম্ফে ভবসাগর পার হইয়া যাইতে পারেন।

অঘোর ও বিজয় হনুমানের ন্যায় বীর সাধক ও মহাভক্ত ছিলেন, সুতরাং তাঁহারা মর্কটযোগ অবলম্বন পূর্ব্বক উল্লম্ফে ভবসাগর পার হইয়া গিয়াছেন, ব্রাহ্মসাধারণ পিপীলিকা-শ্রেণীর ন্যায় ধীরে ধীরে মুক্তিমার্গে অগ্রসর হইতেছেন এবং কোন কোন মহাত্মা দর্দ্দুরগতিতে অধিকতর বেগে চলিতেছেন। ব্রাহ্মগণ, ভয় নাই—হতাশ হইবার কারণ নাই—ঐ দেখুন, ভারতগগনে রামমোহন ও কেশব, রামতনু ও রাজনারায়ণ, অঘোর ও বিজয়—দিব্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়া—আপনাদিগকে দ্রুত পশ্চাদ্‌গামী হইবার জন্য অঙ্গুলিসঙ্কেত করিতেছেন। আপনারা দলাদলি ও হিন্দুদ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া—দ্রুতপদে ও প্রফুল্লচিত্তে ঐ জীবন্মুক্তের দলে গিয়া প্রবেশ করুন। এ স্থানে যাইলে আপনি দিব্য দেহ প্রাপ্ত হইবেন এবং দিব্য চক্ষুতে তখন দেখিতে পাইবেন যে, জাগতিক বৈচিত্র্য মায়াবিজৃম্ভিত মাত্র। সেখানে সকলেরই একই রূপ, একই ভাব। সেখানে বিষাক্ত শ্রেণীবিভাগ নাই—ঘৃণিত ধর্ম্মবিদ্বেষ নাই —এবং কলুষিত সাম্প্রদায়িকতা নাই। সেখানে পয়োমুখ বিষকুম্ভ নাই—সমস্ত কুম্ভই অমৃতপূর্ণ। সেখানে প্রেমের বিনিময়ে গরল নাই—অমৃতের সহিত গরল মিশ্রিত নাই। সেখানে যত জীব, তত শিব। দৈত্য-দানবের সেখানে থাকিবার শক্তি ও অধিকার নাই। সেখানে সারূপ্যমিলনে সকলেই ব্রহ্মরূপী—এবং সাযুজ্য মিলনে সকলেই ব্রহ্মের সহিত মিলিত। ঐ স্থানে হিন্দু, ব্রাহ্ম, য়িহুদী, খৃষ্টান, জোরোস্তান্ ও মুসলমান—সকলই সমান—প্রেমে ঢুলু ঢুলু সকলেরই নয়ন! তথায় নাহি জাতিভেদ—নাহি ধর্ম্মবিদ্বেষ—নাহি রাগদ্বেষ।

যাঁহারা সেই স্থানে যাইবার আজও অধিকারী হন নাই, তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণের পার্থিব সমাধিমন্দিরের দ্বারে গিয়া সেই ভূদেবগণের পার্থিবদেহের চরণতলে লুণ্ঠিত-শির হউন—তাঁহাদিগের চিতাভস্ম অঙ্গরাগ করিয়া—আন্তর্বাহ্য বিশোধিত করুন্। ঐ দেখুন, জরাসন্ধের রাজধানীতে ভগবতী জাহ্নবীর তীরে—কষ্টহারিণী ঘাটের অদূরে —অঘোর-মন্দিরে বৈরাগ্যের অবতার অঘোরনাথ আজও বিরাজমান রহিয়াছেন। আর ঐ দেখুন— মহাতীর্থ পুরীতে জগন্নাথদেবের মন্দিরের অদূরে বিজয়-মন্দিরে করধৃত-কমণ্ডলু গলবিলম্বিতাক্ষমাল ও পরিহিত-গৈরিকবসন ভক্তচূড়ামণি বিজয়কৃষ্ণ ঊর্দ্ধনেত্রে মহাযোগে নিমগ্ন! হিন্দু ও ব্রাহ্ম, আপনারা পরস্পর বিদ্বেষ ভুলিয়া, এই মহাযোগিদ্বয়কে প্রাণ ভরিয়া দর্শন করিয়া আপনাদিগের জীবন সার্থক করুন্। ওঁ শান্তি! ওঁ শান্তি! ওঁ শান্তি!

বীরপূজা (২)

চরিত্র-বীর মৃত মহাত্মা প্যারীচরণ সরকার ও প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী

অনন্ত গগনে কত কত তারা বিমল জ্যোতিতে জগৎ আলোকিত করিতেছে, কে তাহার গণনা করিতে পারে? জ্যোতির্ব্বিদ্ ব্যতীত কেই বা তাহাদের তত্ত্ব-নির্ণয়ের জন্য ব্যাকুল হন? প্রতি রজনীতে তাহারা পরিদৃষ্ট হইয়া আবার দিবসের সূর্য্যের আলোকে বিলীন হইয়া যাইতেছে। সেইরূপ মহাপুরুষগণ এ ভাবে নিরন্তর আবির্ভূত ও তিরোভূত হইতেছে। সাধারণ লোকে তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিতেছে না—অথচ তাঁহাদের বিমল চরিত্র-জ্যোতিতে অভিষিক্ত হইতেছে। কোন্ তারা হইতে কিরূপ জ্যোতিঃ নির্গত হইতেছে এবং তাহার বেগ, ও তীব্রতা কিরূপ, জনসাধারণ তাহার কিছুই জানে না। তাহারা সেই জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীর অমৃতময় আলোক-বিকিরণে অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে মাত্র। কিন্তু যিনি জ্যোতির্বিদ্, তিনি গভীর নিশীথে দূরবীক্ষণযোগে বা শুদ্ধ অলৌকিক কল্পনাবলে অথবা যোগচক্ষুতে তাহাদের প্রত্যেকের অবয়ব-পরিমাণ, গতি-পরিমাণ এবং জ্যোতির বেগ ও তীব্রতাদি নিরূপণ করিয়া থাকেন। মহাপুরুষ? ভূর্লোকের জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলী—কেহ রবি, কেহ শশী, কেহ তারা; অপরে অনন্ত ছায়া-পথের

অন্তর্ভুক্ত অগণ্য জ্যোতিঃকণা-নিচয়। কিন্তু সকলেই সেই ব্রহ্মজ্যোতির রেণু মাত্র। মানব তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কারণ, সে অধিকতর স্ফুরিত ও ঘনীভূত। তাহার মধ্যে আবার মহাত্মগণ শ্রেষ্ঠতম। যে হেতু, তাঁহারা অধিকতম স্ফুরিত ও ঘনীভূত। এক একটি মহাপুরুষ এক একটি সৌর-জগতের কেন্দ্রীভূত সূর্য্য—মানবসাধারণ গ্রহ ও উপগ্রহ মাত্র। সুতরাং তাহারা আপন আপন কেন্দ্রের সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়ায়—বা তাহাকে প্রদক্ষিণ করে। প্রত্যেক তারা এক একটি সৌর-জগতের কেন্দ্রীভূত সূর্য্য। ইহারা দূরবর্ত্তী বলিয়া ইহাদিগকে ক্ষুদ্র বলিয়া বোধ হয়। সেইরূপ প্রত্যেক মহাপুরুষই মানব-জগতের এক একটি সূর্য্য। আপন আপন কক্ষের অন্তর্ব্বর্ত্তী গ্রহ-উপগ্রহ-রূপ মানবমণ্ডলীর নিকট প্রত্যেক মহাপুরুষ যেমন সূর্য্যের ন্যায় প্রদীপ্ত জ্যোতিষ্ক, সেইরূপ অতি দূরবর্ত্তী ভিন্ন কক্ষস্থ লোকের নিকট তাঁহারা ক্ষুদ্র তারকাবৎ প্রতীয়মান। কিন্তু মানবচরিত্রবিদ্ ও ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি জানেন যে, মহাপুরুষমাত্রই মানবজগতের এক একটি সূর্য্য, ব্রহ্মের পূর্ণ বা অংশাবতার। তাঁহারা প্রত্যেকেই গুরুপদবাচ্য। তাঁহাদের চরিত্রের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রেখা ও কিরণমালার গতি ও তীব্রতা নির্ণয় করা উপাসকের সর্ব্বপ্রথম কার্য্য। ব্রহ্মজ্ঞানলাভের ইহা প্রথম সোপান।

যিনি আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তিনিই মহাপুরুষ-চরিত্রের বিশ্লেষণে সমর্থ। যিনি আপনাকে চিনিতে পারেন নাই, তিনি আত্ম-প্রতিবিম্ব চিনিবেন কিরূপে? যে কখন আদর্শে আপনার মুখ দেখে নাই, সে আপনার ফটোগ্রাফ বা চিত্র দেখিয়া চিনিবে কিরূপে? অথবা যিনি স্বয়ং স্ফটিক, তাঁহাতেই মহাপুরুষচিত্র পূর্ণ প্রতিফলিত হইতে পারে; যিনি মৃন্ময়, তাঁহাতে ইহা প্রতিফলিত হয় না। এই জন্য প্রকৃত চরিতাখ্যায়কের গভীর সাধনা চাই। তাঁহাতে ব্রহ্মজোতিঃ প্রতিফলিত হওয়াই চাই। তখন ব্রহ্মজ্যোতিতে অন্তর্বিচ্ছুরিত সেই আঁধারের * আলোক যাহাতে পড়িবে, তাহাকে পূর্ণ উপলব্ধি হইবে। সে আলোক সূক্ষ্ম হইতেও অতি প্রখর? ইহার দ্বারা মানব-চরিত্রের স্থূল ও সূক্ষ্ম সমস্ত রেখাই পরিদৃষ্ট হয়। যিনি এই সাধনায় যে পরিমাণে সিদ্ধ, তিনি মহাপুরুষ-চরিত্র-চিত্রণে সেই পরিমাণে সমর্থ। সাধনার পরিমাণানুসারে অন্তর্দৃষ্টিশক্তি জন্মিতে থাকে। পূর্ণ-সিদ্ধের অন্তর্দ্দৃষ্টি অসীম। ইহা আয়তন-বর্দ্ধনকারী কাচের (Magnifying Glass) ন্যায় অতি সূক্ষ্ম চরিত্রকে বৃহৎ করিয়া দেখাইতে পারে। সূক্ষ্মতম ব্রহ্মও ইহার অধিগম্য। এত বড় গুরুতর কার্য্যে আমার মত ক্ষীণমতি ব্যক্তির হস্তক্ষেপ করা বামন হইয়া চাঁদে হাত দিবার উদ্যমের ন্যায় হইলেও, এই মহাপুরুষ-পূজায় মন এখন এত মাতিয়াছে যে, নিজের অযোগ্যতা জানিয়াও বালকের ন্যায় চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছি। সুতরাং সুধীগণ আমার ধৃষ্টতা অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

আজ যে দুই জন মহাত্মার চরিত্র-বর্ণন করিতে উদ্যত হইয়াছি, ইঁহারা বঙ্গের দুইটি উজ্জ্বল রত্ন—অথবা ভারতগগনের দুইটি উজ্জ্বল তারা। দুই জনেই হিন্দুকালেজের উত্তীর্ণ ছাত্রবর্গের শিরোভূষণ। কালেজ হইতে বাহির হইয়া অবধি দুই জনেই জন্মভূমির সেবাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। উভয়েই সেই মরণান্ত জীবনব্রতের উদ্‌যাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন। দেশীয় যুবক-বৃন্দের চরিত্রগঠন দ্বারা স্বদেশকে উন্নীত করিবার জন্য উভয়েই শিক্ষাকার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। শুদ্ধ পুস্তক পাঠনা দ্বারা তাঁহারা যে ছাত্রগণের চরিত্র বিমার্জ্জিত করিতে চেষ্টা করিতেন, এরূপ নহে, তাঁহারা আপনাদিগের চরিত্র গৌরবে ছাত্রবর্গকে অভিভূত করিতেন। উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্তই অধিকতর ফলপ্রদ (Example is better than precept), এই মহাজন-বাক্য তাঁহাদের দ্বারা বিশেষরূপে প্রমাণীকৃত হইয়াছিল।

উভয়েরই চরিত্র স্বচ্ছ ও নির্ম্মল ছিল। সুতরাং উভয়েই সংসারীর আদর্শ ছিলেন। যে সময়ে ইংরাজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য সভ্যতা বঙ্গের যুবক-মণ্ডলীর মস্তিষ্ক আঘূর্ণিত করিয়াছিল—স্বেচ্ছাচারের স্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছিল—আত্মসংযম নৈতিক দুর্ব্বলতা বলিয়া বিবেচিত হইত, সেই ভীষণ বৈপ্লবিক কালে, এই দুই মহাপুরুষ বীরের ন্যায় সেই স্রোতের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়া তাহার

---

* পাহারাওয়ালারা যে লণ্ঠন ব্যবহার করে, তাহাকে আঁধারে বলে। ইহা দ্বারা চোর ধরা যায়।

গতি মন্থর করিয়া দিয়াছিলেন। গোমাংস-ভক্ষণ বা মদ্যপান ব্যতীত কেহ তখন সভ্যপদবাচ্য হইতে পারিতেন না। হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুর আচার-পদ্ধতি সকলই তখন অসভ্যতার পরিচায়ক বলিয়া বিবেচিত হইত। যিনি হিন্দুর দেবদেবীর মস্তকে মলমূত্র ত্যাগ করিতে পারিতেন, আনুষ্ঠানিক হিন্দুকে পদদলিত ও বিবিধ প্রকারে লাঞ্ছিত করিতে সমর্থ হইতেন, অধিক কি, যিনি গুরুজনবর্গকে অপমানিত করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না, তিনিই এই বৈপ্লবিক দলের মধ্যে বীর বলিয়া পূজিত হইতেন। সেই বৈপ্লবিক দলের প্রত্যেকেই এক এক জন কালাপাহাড় হইয়া উঠিয়াছিলেন। সে সময়ে এই মহাপুরুষদ্বয়ের আবির্ভাব একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজে যেরূপ রামতনু লাহিড়ী ও রাজনারায়ণ বসু, হিন্দুসমাজে সেইরূপ প্যারীচরণ সরকার ও প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী। এই চারিজন মহাপুরুষই অল্পবিস্তর পরিমাণে সম উপাদানে গঠিত। চারিজনই আদর্শ শিক্ষক, আদর্শ গুরু ও আদর্শ অভিভাবক। দেশীর উদ্‌ভ্রান্ত যুবকমণ্ডলীর চরিত্র-গঠনের জন্যই যেন তাঁহারা চারিজনে একই সময়ে এই তমসাচ্ছন্ন বঙ্গভূমিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। রামতনু লাহিড়ী ও রাজনারায়ণ বসু ধর্ম্মের প্রভাবে অধিকতর পরিস্ফুটমাত্র।

প্যারীবাবু ও সর্ব্বাধিকারী মহাশয় ধর্ম্মহীন ছিলেন, এ কথা যেন কেহ মনে না করেন। তাঁহারা উভয়েই ধর্ম্মপ্রাণ ছিলেন; সে সময়ের সর্ব্বগ্রাসিনী নাস্তিকতা তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। ইংরাজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য সভ্যতা তখন হিন্দুর ধর্ম্মবিশ্বাস ও শুদ্ধাচার নষ্ট করিয়া যদিও তাহার স্থানে কোন নববিশ্বাস ও নূতন আচার-পদ্ধতি সংস্থাপিত করে নাই; তথাপি ঈদৃশ মহাপুরুষগণের অন্তর হইতে সনাতন ধর্ম্মের বিমল জ্যোতি ও বেদাচারের বিশুদ্ধতা তিরোহিত হয় নাই। তাঁহারা আজন্ম বিশুদ্ধ ও আমরণ ধার্ম্মিক ছিলেন। তবে ধর্ম্মবিশেষের অনুশীলন বা প্রচার তাঁহাদিগের জীবনের ব্রত ছিল না। রামতনু লাহিড়ী ও রাজনারায়ণ বসুর জীবনের মুখ্য ব্রত ধর্ম্মানুশীলন ও ধর্ম্মপ্রচার এবং গৌণব্রত শিক্ষা ও দৃষ্টান্ত দ্বারা যুবকমণ্ডলীর চরিত্র-গঠন। প্যারী বাবু ও সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের জীবনের একমাত্র ব্রত শিক্ষা ও উচ্চ জীবনাদর্শ দ্বারা উদ্‌ভ্রান্ত যুবকমণ্ডলীর চরিত্র-গঠন ও চরিত্রসংশোধন।

প্যারীবাবু মদ্যপাননিবারণী সভাসমিতি করিয়া ও তদ্বিষয়ক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি রচনা করিয়া এক প্রকার প্রচারকার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহা নিষেধাত্মক, বিধ্যাত্মক নহে। মদ্যপানের অনুকূলে ও প্রতিকূলে শাস্ত্রীয় বিধি ও নিষেধ উভয়ই পরিদৃষ্ট হয়। বৈজ্ঞানিকদিগেরও এ সম্বন্ধে মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অমিত মদ্যপানে ও তজ্জনিত প্রমত্ততা সর্ব্বশাস্ত্রে নিষিদ্ধ, সর্ব্বসমাজে নিন্দিত এবং সর্ব্ব-বৈজ্ঞানিকমতে দূষিত। ইহাতে শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অধোগতি অনিবার্য্য। বঙ্গে তৎকালে অমিত মদ্যপান ও তজ্জনিত প্রমত্ততা এতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, অনেক বড় বড় লোক ইহার প্রভাবে অকালে কালকবলে পতিত হইয়া পরিবারবর্গকে গভীর শোকসাগরে নিমগ্ন করিতে লাগিলেন। জন্মভূমির এই দুরবস্থা দেখিয়া প্যারী বাবুর প্রাণে বড় আঘাত লাগিল। তিনি দেখিলেন, দুর্ব্বলহৃদয় বাঙ্গালী মদ্য স্পর্শ করিলে কখনই শাস্ত্রীয় বা বৈজ্ঞানিক গণ্ডীর ভিতর থাকিতে পারিবে না। এই জন্য তিনি একটি মদ্যপাননিবারণী সভা সংস্থাপন করিলেন। এই সভার প্রত্যেক সভ্যকে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতে হইত যে, তিনি আজীবন মদ্যস্পর্শ করিবেন না এবং মদ্যপান সম্বন্ধে স্বতঃ বা পরতঃ কোন প্রকার উৎসাহ দিবে না। এই সভা কিছুকাল সুন্দররূপে কার্য্য করিয়াছিল এবং নানা স্থানে ইহার শাখাপ্রশাখা সংস্থাপিত হইয়া দেশের সর্ব্বত্র মদ্যপানের বিরুদ্ধে জাতীয় বিদ্বেষ উৎপাদন করিয়াছিল। সে সময় যেখানে পাঁচ জন সুশিক্ষিত নব্যযুবক মিলিত হইতেন, সেইখানেই মদ্যপানের স্রোত প্রবাহিত হইত। ইহা সভ্যতার প্রধান লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হইত। যিনি মদ্যপানে অস্বীকৃত হইতেন—অতি অসভ্য বা পশু বলিয়া ঘৃণিত ও উপেক্ষিত হইতেন। এমন স্থানে আমরাও পড়িয়াছি, যেখানে মদ্যপানে অস্বীকৃত হওয়ায় মুখে মদ ঢালিয়া দিবার চেষ্টা হইয়াছে এবং সে চেষ্টা বিফল হওয়ায় অবশেষে আমাদের মাথায় মদ ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছে। সে সকল সমাজে এরূপ কার্য্য অতি পৌরুষের কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। সে সময় পিতাপুত্রে, স্বামি-স্ত্রীতে একত্র মদ্যপানে প্রমত্ত হইতে লজ্জা বোধ হইত না, তান্ত্রিক বীরাচারের লক্ষ্য

ধর্ম্মসাধন ও তজ্জন্য অগ্রে বাহ্য সাহায্য দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা-সাধন। কিন্তু এইরূপ বীভৎসাচারের লক্ষ্য মাদকদ্রব্য সেবন দ্বারা শুদ্ধ কলুষিত ভোগ-স্পৃহা চরিতার্থকরণ। এই ধর্ম্মহীন অনিরুদ্ধ অমিত ভোগসেবায় যে দেশ উৎসন্ন হইবার উপক্রম হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে আর মতদ্বৈধ নাই। মহামতি প্যারী বাবুর নিরন্তর সাধনা ও চেষ্টায় এই বীভৎসাচার দিন দিন প্রদমিত ও প্রশমিত হইতে লাগিল এবং এখন সে ভাব প্রায় তিরোহিত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

এই সংস্কারকার্য্যে প্যারী বাবুর যে কত শ্রম ও অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। তবে তিনি যে ইহাতে প্রাণোৎসর্গ ও ধনোৎসর্গ উভয়ই করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা-বিবাহ-প্রচলন কার্য্যে যেরূপ অমানুষ আত্মত্যাগ দেখাইয়াছিলেন, প্যারী বাবুও এই সংস্কার-কার্য্যে সেইরূপ আত্মত্যাগ দেখাইয়া গিয়াছেন, ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। যাঁহাদের জীবনের নির্দ্দিষ্ট ব্রত আছে—এবং সেই ব্রতের উদ্‌যাপনার জন্য যাঁহারা প্রাণোৎসর্গ ও ধনোৎসর্গ অকাতরে করিয়া থাকেন, তাঁহারাই প্রকৃত মহাপুরুষ। প্যারী বাবুর জীবনের এইরূপ এক ব্রত ছিল বলিয়াই তাঁহাকে আমরা মহাপুরুষ বলিতেছি। তাঁহার জীবনের অন্যান্য নানা ব্রতও অনেক ছিল। তাহার সবিস্তার উল্লেখ করা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের সাধ্য নহে।

ভক্তিভাজন প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের জীবনের নির্দ্দিষ্ট ব্রত তাঁহার ছাত্রবর্গকে মহাপুরুষ করা। বিখ্যাত দার্শনিক হ্যামিলটন সাহেব বলিয়াছেন যে, আমি দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা দিই না—কিন্তু ছাত্রবর্গকে দর্শনশাস্ত্রে গবেষণা করিতে বা তাহাদিগের মনে দার্শনিক চিন্তা-স্রোতের প্রবাহ আনিতে চেষ্টা করি মাত্র। সেইরূপ প্রসন্ন বাবু সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, তিনি ছাত্রবর্গকে শিক্ষা দিতেন না, কিন্তু কিরূপে প্রকৃত শিক্ষা লাভ করা যাইতে পারে, ছাত্রবর্গের অন্তরে তাহার উপায় উদ্ভাবনের শক্তিসঞ্চার করিয়া দিতেন মাত্র। তিনি নিকটে বসিয়া থাকিতেন এবং ছাত্রদিগকে আপন মনে পড়িতে বলিতেন। কি প্রণালীতে পড়িতে হইবে, কোন্ পুস্তকের তাৎপর্য্য কি ভাবে গ্রহণ করিতে হইবে, মধ্যে মধ্যে তিনি কেবল তাহাই বুঝাইয়া দিতেন। ছাত্রগণ তাঁহার সামীপ্য বশতঃ তাঁহার প্রতিভায় অনুপ্রাণিত হইয়া অতি দুরূহ গ্রন্থের দুর্ব্বোধ স্থানের তাৎপর্য্য গ্রহ করিত। যেখানে কোন ছাত্র কোন স্থানের তাৎপর্য্য-গ্রহে অসমর্থ হইত, সেই স্থানেই তিনি সেই অংশের ব্যাখ্যা করিয়া দিতেন। তিনি এরূপ সুন্দর ব্যাখ্যা করিতেন যে, ছাত্রবর্গ মুগ্ধ হইয়া যাইত। আমরা পাঁচ ছয় বৎসরকাল তাঁহার নিকট এইরূপে শিক্ষা লাভ করিয়াছি। এইরূপ শিক্ষা দ্বারা আমাদিগের অন্তর্নিহিত শক্তিসকল স্ফুরিত হইত, আত্মশক্তির উপর বিশ্বাস জন্মিত এবং কল্পনাশক্তি অতিশয় পরিমার্জ্জিত হইত। একখানি পুস্তক এইরূপে পড়িয়া আমরা সেই প্রকৃতির অন্য অসংখ্য গুরুর সাহায্য বিনা পড়িতে ও বুঝিতে পারিতাম। তিনি আমাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য সর্ব্বদাই উৎসুক থাকিতেন, কিন্তু আমরা নিজে নিজে বুঝিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতাম, নিতান্ত অক্ষম হইলে তখন তাঁহার নিকট বুঝাইয়া লইতাম।

হাইকোর্টের বিখ্যাত উকীল বন্ধুবর পণ্ডিত গোপালচন্দ্র শাস্ত্রী, শিবনাথ শাস্ত্রী এবং আমি তাঁহার বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলাম। তাহার মধ্যে আমাকে যেন তিনি কিছু বেশী ভালবাসিতেন বলিয়া আমার ধারণা ছিল। আমারও তাঁহার প্রতি ভক্তি অতি প্রগাঢ় ছিল। আমি অকালে পিতৃহীন হওয়ায়, তিনি আমাকে পুত্র-নির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন। ১৮৬৫ সালের এণ্ট্রান্স পরীক্ষার ছয়মাস পূর্ব্বে আমার পিতৃবিয়োগ হয়। পিতৃদেবকে লইয়া দীর্ঘকাল গঙ্গাতীরে থাকায় এবং বিবিধ প্রকারে কঠোরতা করায় আমি পরীক্ষার পূর্ব্বে ছয়মাস কাল আমাশয় রোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী ছিলাম। আমি তখন দশটাকা করিয়া ছাত্রবৃত্তি পাইতাম। গুরুদেব দয়া করিয়া আমার ছাত্রবৃত্তি দশটাকা মাসে মাসে আমার বাটী পাঠাইয়া দিতেন। পরীক্ষার একমাস থাকিতে তিনি আমার ফী জমা দিবার জন্য বাটী হইতে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। পরীক্ষা না দিলে নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে আমাকে সমস্ত ছাত্রবৃত্তি প্রত্যর্পণ (Refund) করিতে হইবে বলিয়া তিনি আমায় পরীক্ষা দিবার জন্য উপদেশ দিলেন। আমি সেই পীড়িত অবস্থায় ফী জমা দিয়া বাটীতে চলিয়া গেলাম। আবার

যথাসময়ে আসিয়া পরীক্ষা দিলাম। গুরুর আশীর্ব্বাদে ও জগদীশ্বরের কৃপায় আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কুড়ি টাকা বত্তি পাইলাম। এইরূপ প্রতি পরীক্ষার পূর্ব্বেই আমার বিশেষ বিশেষ বিপদ গিয়াছে। আমি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে পারি নাই, টেষ্ট পরীক্ষায় উপস্থিত হইতেও পারি নাই, তথাপি তিনি আমায় পরীক্ষা দিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। ফাষ্ট আর্টস পরীক্ষার পূর্ব্বে আমার স্ত্রীর উৎকট পীড়া নিবন্ধন আমি তিন চারিমাস কাল কলিকাতায় না থাকায় কালেজে উপস্থিত হইতে পারি নাই, টেষ্ট পরীক্ষাও দিতে পারি নাই। আমাদের গণিতাধ্যাপক পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ, বি, এল, মহোদয় মহাশয় আমাকে পরীক্ষা দিতে অনুমতি দিতে অস্বীকৃত হইলেন। গুণময় গুরুদেব সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষ ছিলেন বলিয়া সে যাত্রা নিস্তার পাইলাম। তিনি নিজে আমাকে পরীক্ষায় যাইবার জন্য মনোনীত করিলেন। আমি আবার তাঁহার আশীর্ব্বাদে ও জগদম্বার কৃপায় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫৲ টাকা ও সংস্কৃত কালেজের ১৬৲ টাকা বৃত্তি পাইলাম। দ্বিতীয়বার গুরুর মুখ রক্ষা হইল। আবার বি,এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ফেলোসিপ পাইয়া এক বৎসরকাল সংস্কৃত কালেজে পড়িয়া এম, এ, পরীক্ষা দিবার সময় আমি পণ্ডিতবর পূজ্যপাদ মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের লেক্‌চার শুনি নাই বলিয়া তিনি আমার এম, এ, পরীক্ষা দিতে দিবেন না বলিলেন। গুরুদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, 'যোগেন্দ্র, তুমি পাশ হইতে পারিবে ত?" আমি বলিলাম, গুরুর আশীর্ব্বাদে ও জগদম্বার কৃপায় অবশ্যই পাশ হইব। তবে যদি ন্যায়রত্ন মহাশয় আমায় ফেল করেন, তাহা হইলে আমার কাগজ আর কোন পরীক্ষক দ্বারা পুনঃ পরীক্ষিত করিতে হইবে। গুরুদেব 'তথাস্তু' বলিয়া আমায় পরীক্ষা দিতে উপযুক্ত বলিয়া মনোনীত করিলেন। গুরুর মানরক্ষার জন্য তন্ময় হইয়া পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। পরীক্ষা সমাপ্ত হইলে, পূজ্যপাদ ন্যায়রত্ন মহাশয় আমার কাগজ দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়া আমায় বলিলেন, 'যোগেন্দ্র! তোমার কাগজ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছে। আমি এত উত্তেজনা না করিলে বোধ হয়, তুমি এতদূর প্রস্তুত হইতে না।' আমি তাঁহার এই মিষ্ট বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার চরণ-বন্দন করিলাম। সংস্কৃতে এম, এ, পরীক্ষায় আমি ও শিবনাথ শাস্ত্রী, এই দুই জনে মাত্র সেবার পাশ হইয়াছিলাম। সর্ব্বাধিকারী মহাশয় আমার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে সাগর কালেজের সংস্কৃত শাস্ত্রের অধ্যাপকের শূন্যপদে মনোনীত করেন। আমি যথাসময়ে না যাইতে পারায় পণ্ডিতবর কৈলাসচন্দ্র শাস্ত্রী ঐ পদে নিযুক্ত হন। তাহার পর সংস্কৃত কালেজের তৃতীয় শিক্ষকের পদ খালী হইলে তিনি আমায় ঐ পদে নিযুক্ত করেন।

তাঁহার অধীনে ছাত্ররূপে কিরূপ আদর ও কিরূপ সদ্ব্যবহার পাইয়াছিলাম—তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পূর্ব্বে দিয়াছি। এক্ষণে তাঁহার অধীনস্থ শিক্ষক হইয়া কিরূপ সদ্ব্যবহার পাইয়াছিলাম—তাহার দুই-একটি উদাহরণ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। তিনি শিক্ষকগণকে কখনও কোন আদেশ করিতেন না। যখন যাহা দ্বারা যাহা করাইবার ইচ্ছা হইত, কৌশলে তিনি তাঁহাকে তাহা জানাইতেন। কখন গল্পচ্ছলে, কখন বা উপদেশচ্ছলে তিনি তাহা এরূপ মধুরভাবে বলিতেন যে, তাহা একজনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হইলেও, তিনি তাহা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না ও করিয়াও অনুতপ্ত হইতেন না। ছাত্রবর্গকে তিনি যেমন পুত্রনির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন, অধীনস্থ শিক্ষকমণ্ডলীকে তিনি সেইরূপ ভ্রাতৃনির্ব্বিশেষে ভালবাসিতেন। কেহ কখন তাঁহাকে তুষ্ট বই রুষ্ট দেখিতে পান নাই। তাঁহার সদা সহাস্যবদন দেখিলে যেন অন্তর হইতে শোক-তাপ বিদূরিত হইত। তাঁহার গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া মস্তক যেন আপনা হইতে অবনত হইত। তিনি যখন ক্লাশে ক্লাশে মৃদু-পদবিক্ষেপে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন, তখন কালেজের সর্ব্বত্র যেন শান্তি ও পবিত্রতা বিকারিত হইত। তাঁহাকে দেখিয়া কি ছাত্র কি শিক্ষক—কেহই উদ্বেজিত হইতেন না—অধিকন্তু কোন প্রিয়জন নিকটে আসিলে যেরূপ আনন্দের ভাব অন্তরে স্বতই উদয় হয়, সকলেই সেইরূপ এক অপূর্ব্ব ভাব অনুভব করিতেন।

কোন শিক্ষকের দোষানুসন্ধান করিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করার ইচ্ছা তাঁহার আদৌ ছিল না। তিনি সকলকেই স্নেহের চক্ষে দেখিতেন, সুতরাং সকলেরই ক্রটি তিনি মার্জ্জনা করিতেন। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা আমি ইহা বিশদীকৃত করিতেছি। এক

দিন আমি বিলম্বে কালেজে আসিয়া দেখি যে, তিনি আমার ক্লাশে বসিয়া ছাত্রদিগকে পড়াইতেছেন, আমি লজ্জায় অধোবদন হইয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম। আমি যাইতেই তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া আমার চেয়ার ছাড়িয়া দিলেন। আমাকে লজ্জিত দেখিয়া তিনি প্রসন্নচিত্তে আমায় বলিলেন—'তোমার ছাত্রেরা গোল করিতেছিল বলিয়া আমি তাহাদিগকে পড়াইতেছিলাম।' এই বলিয়া তিনি ক্লাশ হইতে চলিয়া গেলেন।

আমি তাঁহার এই ব্যবহারে বিমুগ্ধ হইয়া রহিলাম। বিলম্বে আসার জন্য কি অন্য কোন কারণে তাঁহাকে কোন শিক্ষককে কখন তিরস্কার করিতে শুনি নাই। তিনি সকলেরই অনুপস্থিতি-কালে স্বয়ং তাঁহাদিগের কার্য্য করিতেন। ইহাতে কালেজের পরিদর্শন-কার্য্য সুচারুরূপে চলিত—অথচ অপরে লাঞ্ছিত হইতেন না! তিনি জানিতেন যে, কর্ত্তব্যপরায়ণ শিক্ষক কখনই কোন ইচ্ছা-কৃত অপরাধে অপরাধী হইবেন না—তাঁহাকে ঠকাইবার জন্য আপনার কর্ত্তব্যে ত্রুটি করিবেন না। এই ধ্রুব বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি সকলের প্রতিই আত্মবৎ ব্যবহার করিতেন।

তাঁহার নিজের পুত্র ছিল না, তাই সংস্কৃত কালেজের ছাত্রগণ দ্বারা তিনি সে অভাব পূরণ করিতেন! তিনি প্রত্যেক ছাত্রের অবস্থা পরিগত হইয়া তাহাদিগের সুখে ও দুঃখে সহানুভূতি করিতেন। তাহারাও তাঁহাকে পিতৃতুল্য জানিয়া আপনাদিগের সকল দুঃখ তাঁহাকে জানাইত। তিনি অযাচিতভাবে তাহাদিগের অনেককেই সাহায্য করিতেন। তিনি এরূপ গোপনে সাহায্য করিতেন যে, তিনি দক্ষিণ-হস্তে যাহা দিতেন—তাঁহার বাম-হস্ত তাহা জানিতে পাইত না। শুদ্ধ যে সংস্কৃত কালেজের ছাত্রেরা তাঁহার নিকট বিবিধ প্রকারে ঋণী, এরূপ নহে। অন্য স্কুল বা কালেজের ছাত্রেরাও অবস্থাবিশেষে তাঁহার নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইয়া কখন বিফলমনোরথ হয় নাই। তিনি যখন সংস্কৃত কালেজের প্রধান ইংরাজী শিক্ষক ছিলেন—তখন তাঁহার বেতন দুই শত টাকা মাত্র ছিল। তিনি তাহার অর্দ্ধেক বিদ্যাদানে ব্যয়িত করিতেন। তাঁহার জন্মভূমি খানাকুল কৃষ্ণনগরের উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয় শুদ্ধ তাঁহার সাহায্যে চলিত। এই সকল গুরুভার বহন করিয়াও তিনি আপনার পরিবারগণের এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণের ভরণ-পোষণ ও উচ্চশিক্ষাবিধানে কখন অবহেলা করেন নাই। বিখ্যাত ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী, সবজজ বাবু আনন্দকুমার সর্ব্বাধিকারী, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সুযোগ্য সেক্রেটারী ও হিন্দু-পেট্রিয়ট পত্রিকার সম্পাদক রায় রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী বাহাদুর এবং আলিপুরের সুযোগ্য উকীল অমৃতকুমার সর্ব্বাধিকারী প্রভৃতি তাঁহার ভ্রাতৃগণ তাঁহার মহানুভাবকতার এক একটি অমৃতময় ফল। তাঁহার ভ্রাতৃবৎসলতা অতুলনীয় ছিল! তাহার ভ্রাতৃগণের মুখে আমি এ কথা শুনিয়াছি।

তিনি নিজে অতি সামান্যভাবে থাকিয়া এই সকল গুরুতর কর্ত্তব্যভার বহন করিতেন—তজ্জন্য কখন দুঃখিত বা অনুতপ্ত হয়েন নাই। সংক্ষেপতঃ তিনি আদর্শ-পুত্র, আদর্শ-পিতা, আদর্শ-স্বামী, আদর্শ-ভ্রাতা, আদর্শ-শিক্ষক ও আদর্শ-পুরুষ ছিলেন। এরূপ একটি সুন্দর চিত্র সুনিপুণ চিত্রকরের হস্তে পড়িলে—তুলিকা-কৌশলে কতই বিচিত্র শোভা ধারণ করিত। কিন্তু আমার ক্ষীণ তুলিকায় এ সুন্দর চিত্র সুফলিত হইল না বলিয়া মনে বড়ই ক্ষোভ রহিল! ভবিষ্যতে কোন প্রতিভাশালী চিত্রকর এই সুন্দর ছবি আঁকিলে আমি আপনাকে কৃতার্থ মনে করিব।

প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিলাম, প্যারীবাবু সম্বন্ধেও ঠিক সেই সেইরূপ বলা যাইতে পারে। প্যারী বাবুর নিকট আমি কখন পড়ি নাই। তবে তিনি যখন বারাসত গবর্ণমেণ্ট স্কুলের হেডমাষ্টার ছিলেন, তখন বারাসত স্কুলের নিম্নতম শ্রেণীতে আমি কয় মাসের জন্য পড়িয়াছিলাম মাত্র। সে সময় বারাসত স্কুলের যেরূপ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল, এরূপ শ্রীবৃদ্ধি তাহার আর কখন হয় নাই। ইহা তৎকালে যেন একটি প্রকাণ্ড কালেজে পরিণত হইয়াছিল। শৈশবস্মৃতি আমার প্রবল রহিয়াছে। আমি আজও প্রত্যক্ষবৎ দেখিতেছি, যেন প্যারী বাবু সেই নন্দন-কাননস্থিত সে রমণীয় পাঠমন্দিরে ছাত্রবর্গ ও শিক্ষকমণ্ডলীকে অমৃতভাষিত দ্বারা বিমুগ্ধ করিতেছেন। সেই উদ্যানের কোন স্থানে সুগন্ধি পুষ্পনিচয় ফুটিয়া সুগন্ধে ও সৌন্দর্য্যে দর্শক

মণ্ডলীর ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও দর্শনেন্দ্রিয়কে পরিতৃপ্ত করিতেছে —কোন স্থানে ছাত্র ও শিক্ষকগণ-কর্ষিত ক্ষেত্রে বিবিধবর্ণের শাক-সব্জী উৎপন্ন হইয়া চিত্ত-বিমোহন করিতেছে—কোন স্থানে বা দিবসে কুমুদিনী শিরে কুমুদ রজনীতে পদ্মিনী-শিরে পদ্মফুল ফুটিয়া সরোবরের শোভা-সংবর্দ্ধন করিতেছে। একদিকে যেমন প্রকৃতির শোভা, অন্যদিকে সেইরূপ মানসিক ও নৈতিক উৎকর্ষ। প্যারী বাবু যেন তথায় রাজর্ষি জনক আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্র-গৌরবে বারাসত যেন তৎকালে তপোবনে পরিণত হইয়াছিল। অথবা তাঁহার অধিষ্ঠানকালে বারাসত স্কুলের উদ্যানবাটিকা যেন ঋষির আশ্রমে পরিণত হইয়াছিল। ইহা প্রত্যক্ষ দেখা, কল্পনা নহে।

প্যারী বাবু বারাসত স্কুল হইতে কলিকাতায় হেয়ার স্কুলের হেড মাষ্টার হইয়া যান এবং তথা হইতে উন্নীত হইয়া কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কালেজের ইতিহাসের সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই উভয় কার্য্যেই তিনি অসাধারণ পারদর্শিতা দেখাইয়াছিলেন।

ছাত্র ও শিক্ষক উভয়ের প্রতিই প্যারী বাবুর অপরিসীম স্নেহ ছিল। তাঁহার অমায়িকতায় ও সরলতায় সকলে মুগ্ধ হইত। তাঁহার পাণ্ডিত্য অতি গভীর ছিল অথচ তাঁহাকে দেখিলে কেহ বুঝিতে পারিত না যে, তাঁহার পেটে এত বিদ্যা আছে। শুনিয়াছি যে, বড় বড় সাহেব অধ্যাপকেরা কোন সংশয় উপস্থিত হইলে মীমাংসার জন্য তাঁহার নিকট আসিতেন এবং তাঁহার উন্মুক্ত জ্ঞানভাণ্ডার দেখিয়া বিস্মিত হইতেন। অথচ তিনি কখন আপনার বিদ্যার স্পর্দ্ধা করিতেন না। প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারীর ন্যায় ইনিও মুক্ত-হস্ত ছিলেন। অনেক দীন-দরিদ্র তাঁহার বদান্যতার ছায়ায় লালিত ও পালিত হইত। তাঁহার আত্মীয়-স্বজন তাঁহার নিকট বিশেষরূপে ঋণী। 'ন দত্ত্বা পরিকীর্ত্তয়েৎ' 'দান করিয়া তাহার পরিকীর্ত্তন করিবে না', প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারীর ন্যায় তিনিও শাস্ত্রের এই উপদেশকে শিরোধার্য্য করিয়া চলিতেন। এই মুক্তহস্ততা রক্ষা করিবার জন্য ইঁহাদের উভয়কেই পুস্তক-রচনা দ্বারা আপনাদিগের আয়বৃদ্ধি করিতে হইয়াছিল। প্রসন্ন বাবুর পাটীগণিত ও প্যারীবাবুর বুক অব রীডিং ছয় ভাগ সর্ব্বত্র সমাদৃত। পুস্তক হইতে ইঁহাদের আয়ও কম ছিল না।

প্যারী বাবু বারাসতের স্কুল কম্পাউণ্ডে একটি ছাত্র-নিবাস সংস্থাপন করিয়া যেমন তথাকার লোকের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিলেন, কলিকাতা লালবাজারে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে একটি প্রকাণ্ড ছাত্রনিবাস সংস্থাপন করিয়া সেইরূপ বঙ্গের অভিভাবক ও ছাত্রমণ্ডলীর আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিলেন। আমরা এই ছাত্র-নিবাসে থাকিয়া কিছুকাল পড়াশুনা করিয়াছিলাম। এই ছাত্রনিবাস হইতে অনেক বড় বড় লোক বাহির হইয়া কত কত উচ্চপদ অলঙ্কৃত করিয়াছেন ও করিতেছেন। ধন্য প্যারীবাবু! ধন্য তোমার কীর্ত্তিকলাপ! প্রাতঃস্মরণীয়চরিত পণ্ডিতবর ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহাত্মা কাওএল সাহেব এবং ভক্তিভাজন মৃত মহাত্মা প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী, এই তিন অধ্যক্ষের সময়েই সংস্কৃত কালেজের গৌরবরবি মধ্য-গগনে সমারূঢ় হইয়াছিল। ইঁহাদেরই সময়ে পূজ্যপাদ মৃত মহাত্মা জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন ন্যায়শাস্ত্রের, ভরতশিরোমণি স্মৃতিশাস্ত্রের, তারানাথ তর্কবাচস্পতি ব্যাকরণ-শাস্ত্রের, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ অলঙ্কার-শাস্ত্রের এবং দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ কাব্যশাস্ত্রের আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। আমি ১৮৫৭ সালে যখন সংস্কৃত কালেজে ভর্ত্তি হইয়াছিলাম, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং ১৮৭২ সালে যখন এম, এ, পরীক্ষা দিয়া সংস্কৃত কালেজ হইতে বাহির হই, তখন প্রসন্ন বাবু ইহার অধ্যক্ষ ছিলেন। ইহা আমার পক্ষে অল্প গৌরবের বিষয় নহে যে, আমি এই দুই মহাপুরুষের অধ্যক্ষতায় অধিনীত হইয়াছিলাম এবং পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ অধ্যাপক-রত্নের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়াছিলাম। কলিকাতা সংস্কৃত কালেজ ইঁহাদের সময়ে যেরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, এরূপ প্রতিষ্ঠা আর লাভ করিল না—আর যে কখন করিবে, তাহারও আশা নাই।

কিরূপে পূর্ব্বোক্ত মহামহোপাধ্যায়গণ একে একে সংস্কৃত কালেজ হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন এবং কিরূপে অবশেষে সর্ব্বাধিকারী মহাশয় স্বয়ং সংস্কৃত কালেজ—নিজের প্রাণভূত সংস্কৃত পাঠমন্দির হইতে তাড়িত হইয়া প্রথমে বহরমপুর কালেজের অধ্যক্ষ এবং অবশেষে প্রেসিডেন্সী কালেজের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হইলেন, সে সকল দারুণ কাহিনী লিখিতে এ দীনের লেখনী অক্ষম! যদি কোন ঐতিহাসিক এ সময়ের ইতিহাস লেখেন, তিনি সে দারুণ ঘটনাবলীর উল্লেখ করিবেন, সন্দেহ নাই। আমার

বীরপূজায় তাহার উল্লেখ সঙ্গত নহে বলিয়া আমি সে বিষয়ে নীরব রহিলাম।

সমাজ সংস্কারকার্য্যে প্যারীবাবু ও সর্ব্বাধিকারী মহাশয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দক্ষিণ ও বামহস্ত ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবাবিবাহের আন্দোলনে ইহাঁরা প্রাণপণে যোগ দিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় যতগুলি বিধবাবিবাহ দিয়াছিলেন, সকলগুলিতেই ইহাঁরা অধ্যক্ষকতা করিয়াছিলেন। আর্থিক সাহায্য, কায়িক পরিশ্রম এবং লোক-প্রবর্ত্তনা দ্বারা ইহাঁরা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিয়ত সাহায্য না করিলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একাকী এ কার্য্যে কৃতকার্য্য হওয়া কঠিন হইত। সে সময়ে অনেক কৃতবিদ্য লোকেই তাঁহার সহিত যুক্ত হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাঁরা দুইজনে তাঁহার সহিত নিত্য-যুক্ত ছিলেন। ইহাঁরা হুজুগে মাতেন নাই, অতি গম্ভীরভাবে এই কার্য্যে যোগ দিয়াছিলেন। প্যারীবাবুর সঙ্গে এ বিষয়ে আমার কখন কোন কথাবার্ত্তা হয় নাই। কিন্তু গুরুদেবের সহিত আমার এ বিষয়ে অনেক কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। তিনি বলিতেন যে, যাহাদিগের বিবাহ কষ্টসাধ্য, তাহাদিগেরই বিধবাবিবাহ করা উচিত। কিন্তু উচ্চবংশীয় যুবকের যখন কুমারী-বিবাহ অনায়াস-সাধ্য, তখন তাহাদিগের শুদ্ধ বিধবা-বিবাহের জন্য এরূপ বিবাহ করা সঙ্গত নহে। তাঁহার মতে বংশজ, শ্রোত্রিয়, বা মৌলিকের পক্ষে বিধবাবিবাহ প্রশস্ত, কুলীন বা উচ্চবংশীয় পাত্রের পক্ষে নহে। তাঁহার মতে যাহার যাহা অভাব, তাহারই পূরণ হওয়া উচিত। কৃত্রিম অভাব সৃষ্ট করিয়া অনৈসর্গিকরূপে তাহার পূরণ করিলে—প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা অধিক। তিনি আরও বলিতেন যে, ভাব-বিপ্লব পূর্ণ না হইতে কার্য্যবিপ্লব আরম্ভ করিলে অভীষ্ট ফললাভের সম্ভাবনা অল্প। কারণ, বাধা-বিপত্তি এত অধিক পরিমাণে আসিবে যে, তাহা অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হওয়া অসম্ভব না হইলেও অতি কঠিন ব্যাপার। সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আমার এইরূপ অনেক কথা হইত। আমি প্রায়ই বিপরীত পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাঁহার সহিত তর্ক-বিতর্ক করিতাম। তিনি তাহাতে বিরক্ত বা ক্রুদ্ধ না হইয়া, অতি ধীরভাবে আমার তর্ক খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিতেন। যদিও তাঁহার মনে বিধবাবিবাহের আন্দোলনের কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে সংশয় ছিল, তথাপি তিনি ইহাকে কৃতকার্য্য করিয়া তুলিবার চেষ্টার কখন ত্রুটি করেন নাই। কারণ, বালবিধবার দুঃখে তিনি নিতান্ত কাতর ছিলেন।

ইহাঁরা দুই জনেই অতি তেজস্বী ছিলেন। উভয়েরই প্রকৃতি অতি কোমল হইলেও কর্ত্তব্যবুদ্ধি অতি প্রবল ছিল। ইহাঁদিগের তেজস্বিতার এক একটিমাত্র উদাহরণ দিব। প্রেসিডেন্সি কালেজের অধ্যক্ষ সাটক্লিফ্ সাহেব প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়কে সংস্কৃত কালেজের লাইব্রেরী নিয়-তলে লইয়া যাওয়ার আদেশ করেন। প্রসন্ন বাবু উত্তর করেন যে, তিনি সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষ, সুতরাং তিনি প্রেসিডেন্সি কালেজের অধ্যক্ষের আদেশ প্রতিপালন করিতে বাধ্য নহেন। ইহাতে সাটক্লিফ সাহেব ক্রোধান্ধ হইয়া তৎকালীন শিক্ষা-বিভাগের ডাইরেক্টর আট্‌কিন্‌সন সাহেবের নিকট তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। আট্‌কিন্‌সন্ সাহেব সাটক্লিফ সাহেবের পক্ষসমর্থন করিয়া তাঁহাকে লিখিয়া পাঠান যে, তাঁহার সাটক্লিফ সাহেবের আদেশ পালন করা উচিত ছিল এবং অতঃপর অবিলম্বে যেন সে আদেশ প্রতিপালন করা হয়। ইহাতে প্রসন্ন বাবু বিস্মিত ও মর্ম্মাহত হইয়া কালবিলম্ব না করিয়া পত্রের প্রত্যুত্তরে কর্ম্ম পরিত্যাগপত্র পাঠাইয়া দিলেন। ডাইরেক্টর, বিষয় এতদূর গুরুতর হইয়া দাঁড়াইবে, ভাবেন নাই, সুতরাং তিনি সেই কর্ম্ম-পরিত্যাগপত্র প্রত্যাহার করিবার জন্য প্রসন্ন বাবুকে লিখিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু প্রসন্ন বাবুর সঙ্কল্প ফিরিল না—তিনি আবার সেই পত্র ফেরত পাঠাইলেন। ডাইরেক্টর অগত্যা তাঁহার ইস্তফা গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার পদে অন্য লোক নিযুক্ত করিলেন।

সে সময়ে প্রসন্ন বাবুর হস্তে কপর্দ্দকমাত্র ছিল না, এ কথা আমরা তাঁহার নিজের মুখে শুনিয়াছি। তিনি অতি কষ্টে ছয় মাস কাল অতিবাহিত করার পর মহামতি উড্রো সাহেব ডাইরেক্টরের পদে অভিষিক্ত হন। উড্রো সাহেব খানাকুল কৃষ্ণনগরে তাঁহার বাটী হইতে প্রসন্ন বাবুকে আনাইয়া অনেক বুঝাইয়া তাঁহাকে আবার পরিত্যক্ত পদে পুনরভিষিক্ত করেন। ইহাতে উড্রো সাহেব ও প্রসন্ন বাবু উভয়েরই মহিমা জগতে উদ্ঘোষিত হয়।

প্যারী বাবুর তেজস্বিতাও সর্ব্বত্র বিদিত। তিনি

প্রথমে বারাসত গবর্ণমেণ্ট স্কুলের হেড মাষ্টারের, পরে হেয়ার স্কুলের হেড মাষ্টারের এবং অবশেষে প্রেসিডেন্সি কালেজের অধ্যাপকের পদে অভিষিক্ত হন। সর্ব্বত্র তিনি দৃঢ়তা, তেজস্বিতা ও সহৃদয়তা প্রদর্শন করিয়া আসিতেছিলেন। সাহেব যাহা বলিলেন, তাহাতেই হুঁ দিয়া আসা তাঁহার অভ্যাস ছিল না। এই জন্য উপরিতন ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন।

এডুকেশন গেজেট গবর্ণমেণ্টের খাস কাগজ. প্যারী বাবু তখন ইহার সম্পাদক ছিলেন। এই কাগজ চালাইবার জন্য তিনি মাসে ৩০০৲ টাকা করিয়া পাইতেন। তাঁহার সম্পাদকতাকালে শ্যামনগরের ভীষণ রেলওয়ে শকট-সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। ইহাতে অসংখ্য লোক হত ও আহত হয়। রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ হত ও আহতের সংখ্যা গোপন করিবার জন্য অসংখ্য হত ও আহত লোককে রজনীযোগে শকটে করিয়া লইয়া গিয়া গোরাই নদীর গর্ভে ফেলিয়া দেন। প্যারীবাবু এডুকেশন গেজেটে এইরূপ সংবাদ লেখায়, গবর্ণমেণ্ট তাঁহার উপর বিশেষ ক্রুদ্ধ হন। তিনি যেরূপ সংবাদ পাইয়াছিলেন, সেইরূপই লিখিয়াছিলেন, কর্ত্তৃপক্ষকে এই মর্ম্মে পত্র লেখেন—এবং এডুকেশন গেজেটের সঙ্গে তাঁহার সংস্রব পরিত্যাগ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। তাঁহার এই সৎসাহস দর্শনে দেশের সমস্ত লোক তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিয়াছিল। বস্তুতঃ এরূপ বীরপুরুষগণের সংখ্যা দিন দিন কমিতেছে। ইংরাজভীতি যেন ভারতবাসীর অস্থিমজ্জাগত হইয়া উঠিতেছে। তখনকার ইংরাজগণও সৎসাহসের বিশেষ প্রশংসা করিতেন এবং তেজস্বী ব্যক্তিগণকে বিশেষ সম্মান করিতেন। মৃত মহাত্মা রামগোপাল ঘোষ, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্যারীচরণ সরকার ও প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী—ইঁহারা প্রত্যেকেই অতি তেজস্বী ছিলেন। তাঁহারা কখন রাজপুরুষগণের তুষ্টিবিধানের জন্য নিজ নিজ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কিছু বলিতেন না—বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কিছু করা ত দূরের কথা। এই স্পষ্টবাদিতা ও তেজস্বিতার জন্য সময়ে সময়ে তাঁহাদিগকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। রাজশক্তির নিকট বেতসীবৃত্তি অবলম্বন করিলে—তাঁহারা নিশ্চয়ই শিক্ষাবিভাগের উর্দ্ধতন সোপানে আরোহণ করিতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহারা তাহা না করিয়া দেশের ও শিক্ষিত-সমাজের গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বা প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের সময়ে পবিত্র সংস্কৃত পাঠমন্দিরে কোন ইংরাজ রাজ-প্রতিনিধির পূজা হইতে পারে নাই। যে মন্দিরে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সাক্ষাৎ দেবী বীণাপাণি, সে মন্দিরে ইংরাজপূজা হওয়ায় তাঁহার দেবভাব নষ্ট হইয়াছে। সেই অবধি ইহার মহিমা ম্লান হইয়া গিয়াছে। হিন্দুর শাস্ত্র যেখানে অধীত হয়, হিন্দুর বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সেইখানে আবির্ভূত হন। কিন্তু যেখানে সেই দেবীর সিংহাসন অন্যে গ্রহণ করেন, বাগ্‌দেবী তথা হইতে অন্তর্ধান করেন। দেবাসুরের বিরোধ চিরপ্রসিদ্ধ। যে মন্দিরে পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাজপুরুষগণ মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপকগণের আশীর্ব্বাদ ও অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে চরিতার্থ জ্ঞান করিতেন, প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের পরবর্ত্তী অধ্যক্ষ বা অধ্যক্ষগণের সময় তাঁহারা সেই মন্দিরে দেবোচিত পূজা প্রাপ্ত হইয়াছেন। শুনিতে পাই যে, ঘটনাবিশেষে যে তুলসী নারায়ণের শিরোভূষণ, তাহাও কোন কোন রাজপুরুষের মস্তকে পূজোপকরণরূপে অর্পিত হইয়াছে। যাঁহারা সংস্কৃত কালেজের মন্দিরকে সাক্ষাৎ বাগ্‌দেবীর মন্দির বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের প্রাণে যে ইহাতে কি ব্যথা লাগিয়াছে, তাহা লেখনীর দ্বারা চিত্রণ সম্ভবপর নহে। হিন্দুর ধর্ম্ম হিন্দুই নষ্ট করিয়াছেন ও করিতেছেন। ইহাতে বৈদেশিক বিধর্ম্মী রাজপুরুষগণের কোনও দোষ নাই। কারণ, তাঁহারা এরূপ পূজা বলপূর্ব্বক গ্রহণ করেন না।

আত্ম-সম্মান ও জাতীয় গৌরব বিসর্জ্জন দিতে পারিলে এবং কর্ত্তব্যজ্ঞানকে আত্মস্বার্থের নিকট বলি দিতে সমর্থ হইলে সর্ব্বাধিকারী মহাশয়কে সাশ্রুলোচনে সংস্কৃত কালেজ, নিজের প্রাণভূত সংস্কৃত কালেজ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থানে স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে হইত না। সংস্কৃত কালেজ পরিত্যাগ করিয়া অবধি তাঁহার মনে আর স্ফূর্ত্তি ছিল না। যেন গভীর বিষাদ-রেখা তাঁহার মুখমণ্ডলে জ্যোৎস্নাময়ী নিশীথে গলিত সুবর্ণরঞ্জিত গগনে কাদম্বিনী-রেখার ন্যায় প্রতিভাত হইত। সেই ঘটনার পর তাঁহার সদা-হাস্যময় মুখে আর মধুর হাসি দেখি নাই।

তাহার পর তাঁহাকে যতবার দেখিয়াছি—দেখিয়া বোধ হইয়াছে যেন, কোন গভীর শোক তাঁহার হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। প্রত্যুত সংস্কৃত কালেজের সহিত বিচ্ছেদ তাঁহার নিকট প্রিয়জন-বিরহের ন্যায় অনুভূত হইয়াছিল।

প্যারী বাবুকে যদিও এরূপ কোন মনস্তাপ পাইতে হয় নাই বটে, কিন্তু ইহা স্থির যে, তাঁহার মত প্রতিভাশালী ব্যক্তির যত দূর উন্নতি হওয়া উচিত ছিল—তাঁহার তেজস্বিতা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতার জন্য তত দূর উন্নতি হইতে পারে নাই। বৈদেশিক রাজত্বে উন্নতিলাভ করিতে হইলে—আত্মসম্মানজ্ঞান ও জাতীয় গৌরবস্মৃতি বিসর্জ্জন দিতে ও কর্ত্তব্যজ্ঞানকে বলি দিতে হইবে। শুদ্ধ এ সকল করিলেও হইবে না—তাহার সঙ্গে সঙ্গে রাজপুরুষগণের চিত্তরঞ্জন ও বিনা বিচারণায় তাঁহাদিগের আদেশ প্রতিপালন করিতে হইবে। যাঁহারা এই সাধনায় সিদ্ধ—এই সকল গুণে বিভূষিত, তাঁহাদিগের অন্য গুণ থাকুক আর নাই থাকুক, রাজপুরুষগণের কৃপায় তাঁহারা উন্নতিশৈলের উচ্চতম শিখরে উঠিতে পারিবেন। এই সকল গুণের অভাবে রামতনু লাহিড়ী, রাজনারায়ণ বসু, প্যারীচরণ সরকার ও প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী প্রভৃতি আদর্শশিক্ষকগণ রাজোপাধি ও শ্রেষ্ঠ রাজপ্রসাদ প্রাপ্ত হন নাই। কিন্তু তাঁহাদের পবিত্র আত্মা নশ্বর দেহের আবরণ ভেদ করিয়া এ পাপময় পৃথিবী পরিত্যাগ পূর্ব্বক দ্যুলোকের উজ্জ্বল তারারূপে নিয়ত বিরাজমান রহিয়াছেন। পতিত ভারত তাঁহাদের মর্য্যাদা বুঝে নাই বটে—কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের মহিমা দ্বিগুণিত বর্দ্ধিত হইয়াছে মাত্র। কারণ, তাঁহারা নিষ্কামভাবে—বিনা প্রতিদানে—যাহাদের জীবনের ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া—স্বর্গের দেবতা—আবার স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন। অকৃতজ্ঞ দেশ তাঁহাদের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত করে নাই বটে, কিন্তু যাঁহারা দীন ভাবুক, স্বদেশ ও স্বজাতির জন্য যাঁহাদিগের প্রাণ নিয়ত কাঁদিতেছে—তাঁহাদের হৃদয়মন্দিরে সেই মহাপুরুষগণের পূর্ণ বিশুদ্ধ দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাপিত রহিয়াছে। সে মন্দির কাল গ্রাস করিতে পারিবে না—সে মন্দিরের দেবতাকে কখন কোন কালাপাহাড় স্পর্শ করিতে পারিবে না। ধন্য সেই মহাপুরুষ—যাঁহার প্রতিমূর্ত্তি এইরূপ অনন্ত কালের জন্য প্রতিষ্ঠাপিত হয়। স্থূল পাষাণময়ী মূর্ত্তি কখন স্থায়ী হয় না—দেখিতে দেখিতে তাহার আদর কমিতে থাকে, কিন্তু যে মহাপুরুষের সূক্ষ্ম দেবী মূর্ত্তি জাতীয় হৃদয়-মন্দিরে প্রতিষ্ঠাপিত—তিনিই প্রকৃত মৃত্যুঞ্জয়। যুগের পর যুগ আসিবে, তথাপি সে মন্দির হইতে সে প্রতিমূর্ত্তি কখন অপসারিত হইবে না। এ মহাপূজার নিকট—অন্য পূজা অতি তুচ্ছ। তুচ্ছ রাজসম্মান ও রাজোপাধি—ইহার নিকট। ওঁ স্বস্তি! ওঁ স্বস্তি!! ওঁ স্বস্তি!!!

বীরপূজা [৩]

মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

যে মহাপুরুষের জীবন লইয়া আজ বঙ্গের সর্ব্বত্র গভীর আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, আজ অনুরুদ্ধ হইয়া সেই মহাপুরুষের জীবন সম্বন্ধে আমি দুই একটি কথা বলিতে উদ্যত হইলাম। বলা বাহুল্য, সেই মহাপুরুষের নাম পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। যাঁহারা কোন মানবকে দোষস্পর্শশূন্য বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা নিতান্ত অন্ধ। তাঁহাদিগের সহিত আমার মতভেদ আছে! যাঁহাদিগের শরীর রক্ত-মাংসে গঠিত, তাঁহারা পূর্ণ অপাপবিদ্ধ হইতে পারেন বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই। সুতরাং কাহারও জীবনী লিখিতে গেলে, তাঁহার দোষগুণ—উভয়েরই উল্লেখ করিতে হয়। কিন্তু দোষের উল্লেখ করা অপেক্ষা গুণের উল্লেখ করায় সুখ অধিক এবং তাহাতে জগতের অধিকতর মঙ্গল সংসাধিত হয়। মহাপুরুষগণের দোষ উল্লেখ করিলে সাধারণ লোকে সহজে সেই দোষেরই অনুকরণ করিয়া ফেলে, গুণের অনুকরণ করা অতি কঠিন বলিয়া তাহার অনুকরণ পরিত্যাগ করিয়া থাকে। এই জন্য আমার মতে মহাপুরুষগণের চরিত্রের উজ্জ্বল অংশটুকুই লোকসাধারণের গোচর করা উচিত। দোষ ভাগের অস্তিত্ব অস্বীকার না করিয়া, শুদ্ধ তাহার পরিহার করাই শ্রেয়ঃ। আমি এখানে সেই পথই অবলম্বন করিলাম।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যশোগান করিতে এত লোক আসরে নামিয়াছেন যে, আমার এ উদ্যম

অনাবশ্যক বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও হইতে পারে। কিন্তু প্রাণের ব্যাকুলতায় ও বিশেষ অনুরোধে পড়িয়া আমায় আজ এই সংকীর্ত্তন-দলের সহিত যোগ দিতে হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত আমার বিশ্বাস ছিল যে, আমাদের জাতি আজও বীরপূজা শিখে নাই। যে দেশে বীরপূজা প্রচলিত নাই, সে দেশে জাতীয় সঞ্জীবনকার্য্য আরব্ধ হয় নাই। ইংলণ্ডে ক্রমওয়েল্, আমেরিকায় ওয়াসিংটন, ফ্রান্সে নেপোলিয়ন ও ইতালীতে গ্যারিবল্ডী প্রভৃতি বীর-বৃন্দ যেরূপ পূজা পাইয়াছেন, আমাদের দেশে আজও সেইরূপ পূজা কেহই পান নাই। এ দেশে রাজ-নৈতিক বীর নাই, সুতরাং সে পূজা রাজনৈতিক বিভাগে সম্ভবপর নাহ। আমরা লর্ড রিপণ ও ব্রাডল প্রভৃতি বৈদেশিক মহাপুরুষগণের পূজা করিয়াছি বটে, কিন্তু সে পূজাব অভ্যন্তরে যেন একটু দাসভাব আছে বলিয়া বোধ হয়। বিজিত জাতি যখন কোন বৈদেশিককে উদ্ধারকর্ত্তা বলিয়া পূজা করে, তখন তাহার হৃদয়ের সাম্যভাব বিনষ্ট হয়। বিজেতৃজাতির সহিত তাহার যে দূরত্ব, তখন যেমন পূর্ণমাত্রায় তাহার উপলব্ধি হয়। কিন্তু আমাদের একজনকে আমরা যদি পূজা করি, তাহাতে আমাদের হৃদয়ের সাম্যভাব নষ্ট হয় না। তাহাতে আমরাই গৌরবা-ন্বিত হই। আমাদের মনে হয় যে, চেষ্টা করিলে আমরাও সেইরূপ হইতে পারি এবং এরূপ বীরপূজার অধিকারী হইতে আমাদের কাহারও বাধা নাই। ইহাতে প্রত্যেক পূজকের চিত্ত সম্পূর্ণরূপে সম্প্রসারিত হয় এবং মনে সাধু প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব সমুদিত হয়। আজ বিদ্যাসাগরের পূজায় এই জন্য সকলেই একবাক্যে যোগ দিতেছেন এবং এই বীরপূজায় আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছেন। পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সকলে সর্ব্বত্র এই বীরপূজার বিরাট আয়োজন করিতেছেন। ইহা দেখিয়া আমার মনে গভীর আশার সঞ্চার হইয়াছে। আমি যেন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, এতদিনে জাতীয় সঞ্জীবন-কার্য্য আরব্ধ হইয়াছে। এতদিন আমরা চৈতন্যহারা হইয়া পড়িয়াছিলাম, তাই পূর্ব্ববর্ত্তী বীরবৃন্দের পূজা করিতে পারি নাই। আজ আমা-দের মৃতদেহে জীবন-লক্ষণ প্রথম দেখা দিয়াছে—তাই আমরা এই বিরাট্ বীরপূজায় যোগ দিয়াছি।

যাহার হৃদয় দেশের জন্য সর্ব্বদা কাঁদিতেছে, সে আজ কোন্ প্রাণে এই জাতীয় কান্নায় যোগ না দিয়া থাকিবে? তাই আজ ব্যক্তিগত মনঃ-ক্ষোভ ভুলিয়া আমি এই জাতীয় শোকোচ্ছ্বাসে যোগ দিলাম। যাঁহার জন্য আজ সকলে কাঁদিতেছে, তিনি যে মহাপুরুষ, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। যিনি এত লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার হৃদয় যে বিশাল, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। সাগর না হইলে কে আর স্রোতস্বিনী সকলকে নিজাভিমুখিনী করিতে পারে? তাঁহার সহিত বঙ্গবাসীর প্রাণের যোগ ছিল বলিয়া তাঁহার বিয়োগে আজ সকলে এত বিয়োগ-বিধুর। তাঁহার করস্পর্শে বঙ্গবাসিমাত্রেরই হৃদয়তন্ত্রী বাজিত বলিয়াই, সে করের চৈতন্যাভাবে বঙ্গবাসীর হৃদয়তন্ত্র আজ নীরব। যেন সকলেই আজ চৈতন্যহারা হইয়া পড়িয়াছেন। পথে, ঘাটে, মাঠে, বিদ্যালয়ে, বিপণিতে, বিচারালয়ে—যেখানে যাইবে—কেবল বিদ্যাসাগরের কথা। তাঁহার মৃত্যু-সংবাদে দোকানদারেরা দোকান বন্ধ করিল, রঙ্গালয়ে অভিনয় বন্ধ হইল এবং বিদ্যালয় সকলে দুই এক দিনের জন্য পাঠনা স্থগিত হইল। শিক্ষক ও ছাত্র শোকচিহ্ন ধারণ করিলেন। যে দিকে তাকাও, দেখিবে, ছাত্র ও শিক্ষকগণ নিরাবৃত-পদে গমন করি-তেছেন, রঙ্গালয়ে বিদ্যাসাগরের বিয়োগে শোকোচ্ছ্বাস-ব্যঞ্জক নাট্যগীতি অভিনীত হইতেছে, চতুর্দ্দিকে সভা-সমিতিতে তাঁহার গুণকীর্ত্তন হইতেছে। সংবাদ-পত্রের স্তম্ভ সকল তাঁহার গুণানুবাদে ভরিত হই-তেছে। প্রতি মুদ্রাযন্ত্রে তাঁহার কীর্ত্তিশ্লোক মুদ্রিত হইতেছে, বঙ্গমহিলা ও বঙ্গীয় ছাত্র সকল তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন স্থাপিত করিবার জন্য চতুর্দ্দিক হইতে চাঁদা তুলিতেছে। সমস্ত বঙ্গ-সমাজ আজ যেন আমূল আলো-ড়িত হইতেছে। বঙ্গে এরূপ বীরপূজা পূর্ব্বে আর কেহ পান নাই, আবার যে কবে কে পাইবেন, তাহাও বলিতে পারি না।

এক্ষণে দেখিতে হইবে, কি গুণে লোকে বিদ্যা-সাগরের প্রতি এত আকৃষ্ট হইয়াছে। যে দেশের লোক নিন্দাপ্রবণ, সহজে কাহারও ভাল দেখিতে পারে না, যে দেশে বীরপূজা বহুদিন হইতে উঠিয়া গিয়াছিল—সে দেশে বীরপূজার এত আড়ম্বর কি কারণে? কোন্ গূঢ় মন্ত্রবলে বিদ্যাসাগর মহাশয় এই পতিত জড়প্রায় জাতিতে এই অভাবনীয় জীবন-সঞ্চার করিলেন? তিনি গোঁড়া হিন্দু, গোঁড়া

খৃষ্টান, গোঁড়া মুসলমান, বা গোঁড়া ব্রাহ্ম—ইহার কিছুই ছিলেন না—অথচ কেন সকল সম্প্রদায়ের লোক একবাক্যে তাঁহার পূজায় যোগ দিতেছেন? এই প্রশ্নের একই উত্তর—তাঁহার দানশীলতা। তিনি দানবীর ছিলেন—সুতরাং সম্প্রদায়নির্বিশেষে মুক্তহস্তে দান করিতেন। তাঁহার নিকট দুঃখ জানাইয়া অতি অল্প-লোকেই বিমুখ হইতেন। জীবনের শেষভাগে তিনি বড় খিটখিটে হইয়াছিলেন, সুতরাং কখন কখন ভিক্ষার্থী দেখিলে তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি হইত বটে, কিন্তু তিনি জীবনের বহুদিন পর্য্যন্ত দানশীলতায় বঙ্গে অদ্বিতীয় ছিলেন।

নব্যসম্প্রদায় যাবনিক শিক্ষায় হিন্দুমাহাত্ম্য ভুলিয়া অতিশয় স্বার্থপর হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই বিশ্বজনীন স্বার্থপরতার মধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয় যে আর্য্যোচিত দানশীলতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার পক্ষে সাধারণ গৌরবের বিষয় নহে। যখন ইংরাজী-শিক্ষিত ব্যক্তিগণের অধিকাংশই আপন আপন পরিবারবর্গের সুখ সংবর্দ্ধন করিতে একান্ত ব্যস্ত, অন্যের মুখের দিকে তাকাইবার তাঁহার ইচ্ছা ও অবসর নাই, তখন পরের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় যে অকাতরে অর্থ বিসর্জ্জন করিয়াছেন—ইহা অল্প মাহাত্ম্যের কথা নহে। পূর্ব্বকালে যখন ইহকালের সুখস্বচ্ছন্দতা লোকে পরকালের জন্য অনায়াসে বিসর্জ্জন করিত, তখন দাতাকর্ণ হরিশ্চন্দ্র বা বলিরাজা সম্ভবপর হইতেন। কিন্তু এই বিশ্বাসবিরহিত নিরীশ্বর সময়ে বিদ্যাসাগরের দানশীলতা যে এক অদ্ভুত ব্যাপার বলিয়া বিবেচিত হইবে—ইহাতে আর বিচিত্রতা কি? যে সময়ে দিগ্বিজয়ী সম্রাটগণ দিগ্বিজয় করিয়া আসিয়া সর্ব্বস্বদক্ষিণ যজ্ঞে সর্ব্বস্ব আহুতি দিতেন, যে সময় ঋষিগণ রাজ্যের প্রকৃত রাজা হইয়াও বিষয়-সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া নির্জ্জন অরণ্যে কেবল ভগবানের উপাসনা করিতেন, যে সময় গৃহস্থগণ স্ত্রী-পুত্রাদি দিয়াও অতিথির তৃপ্তিবিধান করিতেন—সে সময়ে বিদ্যাসাগরের দানশীলতা বোধ হয়, সমুদ্রে শিশিরবিন্দুর ন্যায় অলক্ষ্যে বিলীন হইয়া যাইত, কিন্তু এই ক্ষতিলাভগণনার কালে—এই বণিক্ রাজার রাজত্বে—বিদ্যাসাগর একটি অপূর্ব্ব জীব এবং তাঁহার দানশীলতা অতি বিরল-দৃশ্য। এই জন্যই প্রধানতঃ লোকে তাঁহার জন্য এত কাতর। কাতর হইবারই কথা। তাঁহার বিয়োগে অনেক অনাথা গ্রাসাচ্ছাদনে বঞ্চিত হইয়াছে!—অনেক পরিবার নিরন্ন হইয়াছে! এরূপ মহাপুরুষের বিয়োগে আমরাই বা না কাঁদিব কেন? কোন্ প্রাণে না কাঁদিয়া থাকিব?

বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় কীর্ত্তিস্তম্ভ তাঁহার গ্রন্থনিচয়। যে সময়ে বাঙ্গালাভাষা শৈশব-সুলভ বসনে ভূষিতা ছিল—তখন মদনমোহন তর্কালঙ্কার, বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত—এই তিন মহাত্মা দুঃখিনী দীনা বঙ্গভাষাকে নূতন সাজে সাজাইলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই তিন জনের মধ্যে এই কার্য্যে অধিক দিন খাটিয়াছেন—এবং অধিক ফলপ্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়াই—তাঁহার নামই এত উদ্ঘোষিত। তাঁহার বেতাল পঞ্চবিংশতি, শকুন্তলা, ও সীতার বনবাস তাঁহার বিশুদ্ধ রচনা-শক্তির সবিশেষ পরিচয় দিতেছে। তাঁহার পাঠ্যপুস্তকাবলীও জাতীয় চরিত্র সংগঠিত করিতেছে। বাঙ্গালা দেশে বোধ হয় এমন লোক নাই, যিনি তাঁহার কোনও না কোন পুস্তক কখন পাঠ করেন নাই। লেখকের জীবন সচরাচর দারিদ্র্যজড়িত ও দুঃখপূর্ণ। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় এমনই সৌভাগ্যবান্ পুরুষ যে, তিনি এই দোষে জন্মগ্রহণ করিয়াও পুস্তকের আয় হইতে বৎসর বৎসর প্রায় অর্দ্ধ লক্ষ টাকা লাভ করিতেন। তিনি যদি সাধারণ সংসারী হইতেন, তাহা হইলে তিনি এই অতুল সম্পত্তিতে একজন প্রধান ধনশালী ব্যক্তি হইতে পারিতেন। নিজের সুখে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। অতি সামান্য আহার ও পরিচ্ছদে তিনি সন্তুষ্ট থাকিতেন। নিজের ও পরিবারগণের ভরণপোষণ করিয়া যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিত, তাহা হইতে তিনি কোনও সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান বা দান করিতেন। এরূপ মহাপুরুষ লেখক মাত্রেরই আদর্শ-স্থল। যিনি অতুল ধনের অধিকারী হইয়াও সন্ন্যাসী, তিনি প্রকৃত যোগসন্ন্যাসী। এরূপ মহাপুরুষের নিকট আমরা আজ নতশির হইয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি—যেন আমরা তাঁহার মত আত্মত্যাগ করিতে শিখি।

তাঁহার তৃতীয় কীর্ত্তিস্তম্ভ তাঁহার মেট্রোপলিটান্ বিদ্যালয়াবলী। এই মহাপুরুষ সর্ব্বপ্রথমে দেখাইয়াছেন যে, ইংরাজের শিক্ষা ও ইংরাজের সাহায্য

ব্যতীত এ দেশে উচ্চশিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। অতি অল্পব্যয়ে উচ্চশিক্ষাবিধানের ব্যবস্থাও সর্ব্বপ্রথম তিনি করিয়াছেন। এ পথ তিনি না দেখাইলে উচ্চশিক্ষা বোধ হয়, এতদিন অতি অল্পসংখ্যক লোকে আবদ্ধ থাকিত। তাঁহার মেট্রোপলিটান হইতে বৎসর বৎসর অসংখ্য ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাসমূহে উত্তীর্ণ হইয়া, বঙ্গের চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া তাঁহার মহিমা প্রচার করিতেছেন। প্রেসিডেন্সি কালেজ আমাদের দেশের যত উপকার না করিয়াছে—বিদ্যাসাগরের মেট্রোপলিটান বিদ্যালয় তাহা অপেক্ষাও দেশের অধিকতর উপকারসাধন করিয়াছে। আইস, আমরা এই মহোপকারকের চরণে প্রণিপাত করি।

বিদ্যাসাগরের শেষ ও অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ তাঁহার বিধবাবিবাহ-প্রচার। সকল মহাপুরুষের জীবনের এক একটি লক্ষ্য থাকে, সেই লক্ষ্যসাধনের জন্যই ভগবান তাঁহাদিগকে ধরাধামে প্রেরণ করিয়া থাকেন। বিদ্যাসাগরের ইহলোকে আবির্ভাবের মূল কারণ বিধবা-বিবাহ প্রচার। ভারতের আড়াই কোটি হিন্দু-বিধবার নীরব ক্রন্দনে ভগবানের আসন টলিয়াছিল—তাই তিনি হিন্দু-বিধবাদের দুঃখ মোচন করিবার জন্য বিদ্যাসাগরকে ভারতে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি বিদ্যাসগরকে এই গুরুতর কার্য্যের উপযোগী সমস্ত গুণে বিভূষিত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। অনন্ত দয়া, অবিচলিত অধ্যবসায়, অটল সাহস, নির্ভীক সরলতা এবং সুদৃঢ় দেশসংস্কার কার্য্যের উপযোগী, এ সমস্ত গুণে বিধাতা তাঁহাকে বিভূষিত করিয়াছিলেন। যে দেশে যুবতী কন্যাকে আজীবন ব্রহ্মচর্য্য করিতে উপদেশ দিয়া, পিতামাতা পার্শ্বের ঘরে সুখে রাত্রিযাপন করিতে কুণ্ঠিত হন না—তাহাকে নিরামিষ ভোজন করিতে উপদেশ দিয়া আপনারা চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয়াদি ভোজন করা অসঙ্গত মনে করেন না—তাহাকে নিরাভরণা ও গৈরিকবসনা করিয়া নিজেরা বসন বা ভূষণে ভূষিত হইতে লজ্জা বোধ করেন না—সে দেশে বিদ্যাসাগরের হৃদয় বিধবার দুঃখে কাঁদিল কিরূপে? ভগবদনুপ্রেরণা ব্যতীত ইহার মীমাংসা করিব কিরূপে? নিশ্চয়ই হিন্দু-বিধবার দুঃখ দূর করিবার জন্য এ হৃদয়শূন্য—কপটাচারী—নিরীশ্বর ও নির্জ্জীব ভারতে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহার বিধবা-বিবাহবিষয়ক গ্রন্থ এই ভগবদুদ্বোধনার ফল, সন্দেহ নাই। ইহার প্রতি ছত্রে গভীর শাস্ত্রজ্ঞান, অখণ্ড যুক্তি ও অসীম বিশালহৃদয়তা মাখান রহিয়াছে। তাঁহার কোনও পুস্তক ইহার মত মূল্যবান নহে। যদি সুলেখক ও শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া কোনও পুস্তকের দ্বারা তিনি অধিক পরিচিত হইয়া থাকেন ত সে এই গ্রন্থ। এই গ্রন্থ দ্বারা ভারতে একটি যুগপরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। এই গ্রন্থপাঠে তদানীন্তন ব্যবস্থাপক সভা প্রীত ও চালিত হইয়া বিধবাবিবাহ বিধিবদ্ধ করেন। বিধবা-বিবাহের প্রতিপক্ষগণ ইহা পাঠ করিয়া বিধবা-বিবাহ যে শাস্ত্রসম্মত, তাহা স্বীকার করেন। কিছুদিন বিধবা-বিবাহের স্রোত এরূপভাবে চলিয়া আসিতে লাগিল যে, বোধ হইল যেন, বিধবাগণের দুঃখ চিরদিনের জন্য অন্তর্দ্ধান করিবে।

কিন্তু যাহাদের কপাল পাষাণ-চাপা—বিদ্যাসাগর তাহাদিগের কি করিতে পারেন? তাহাদের ভাগ্যদোষে মহাত্মা ম্যালথসের মত নব্যসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচারিত হইল। লোকসংখ্যাবৃদ্ধিনিবারণের জন্য ম্যালথস্ বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। তাঁহার মতে যাহাতে অধিক সন্তান না হয়, সকলেরই সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া চলা উচিত। নব্য সম্প্রদায় আপনারা সংযত হইতে পারিবেন না দেখিয়া অভাগিনা বিধবাগণের স্কন্ধে সেই মতপ্রচারের ভার অর্পণ করিলেন। বিধবা বিবাহ প্রচার হইলে লোকসংখ্যা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিবে—সুতরাং বিধবা-বিবাহ দেওয়া হইতে পারে না—তাঁহারা এই ধুয়া ধরিয়া উঠিলেন। এই ধুয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিধবাবিবাহের স্রোত রুদ্ধ হইল। সেই অবধি বিধবাগণের ভাগ্যলক্ষ্মী আবার তাহাদিগের প্রতি বিমুখ হইয়াছেন। সুশিক্ষিত দলের এই অনার্য্য আচরণে মর্ম্মাহত হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা-বিবাহ প্রচারে ক্রমেই শিথিলযত্ন হইলেন। যাঁহারা এই সদনুষ্ঠানে তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়াছিলেন, তাঁহারাও দলপতির ভগ্নহৃদয়তায় ব্যথিত হইয়া নীরবে সমস্ত কষ্ট সহিয়া অনুকূল কালের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

আশা না থাকিলে মানুষ বাঁচিতে পারে না। আশাই সর্ব্বফলপ্রসূ। আমি আমার "প্রাণোচ্ছ্বাস" নামক পদ্যগ্রন্থে বিদ্যাসাগর ও বিধবা-বিবাহবিষয়ক

প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম যে, বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর বিদ্যাসাগরের প্রতিমূর্ত্তি প্রতি গৃহে প্রতিষ্ঠাপিত হইবে—এবং তখন লোকে বিদ্যাসাগরের কীর্ত্তি চিরস্থায়িনী করিতে চেষ্টা করিবে। আজ সেই দিন আসিয়াছে। তিন বৎসর পূর্ব্বে আমার হৃদয়গগনে যে আশাসূর্য্যের আভা দেখা গিয়াছিল, আজ সেই আশাসূর্য্যের পূর্ণজ্যোতিঃ আমার হৃদয়গগনকে উদ্ভাসিত করিয়াছে। এই দেশব্যাপিনী বীরপূজার অভ্যন্তরে—এই দেশব্যাপী শোকোচ্ছ্বাসের অভ্যন্তরে আমি যেন দেখিতে পাইতেছি যে, জাতীয় হৃদয় বিধবার দুঃখে আবার গলিত হইয়াছে। প্রচারের প্রতি বিদ্বেষ থাকিলে প্রচারকের প্রতি এত ভক্তিপ্রদর্শন সম্ভবপর নহে। বিধবার দুঃখ নিবারণের ইচ্ছা বলবতী না হইলে—বিধবা-বিবাহ-প্রচারক বিদ্যাসাগরকে বঙ্গবাসী কখনই এত পূজা করিত না। বোধ হইতেছে, নব্যসম্প্রদায় এতদিনে বুঝিতে পারিয়াছেন যে, তাঁহারা বিধবা-বিবাহ কার্য্যে যোগ না দিয়া বিদ্যাসাগরের প্রতি—এ মহদনুষ্ঠানের প্রতি—অতিশয় অবিচার করিয়াছেন! এই জন্যই তাঁহারা গতানুশোচনায় অনুদিগ্ধ। তাই তাঁহারা আজ এই বিরাট বীরপূজার অনুষ্ঠান করিতেছেন। ভারতের ভ্রাতা-ভগিনীগণ! আসুন, আজ আমরা সাম্প্রদায়িকতা ও পরস্পর দ্বেষাদ্বেষ ভুলিয়া—বিদ্যাসাগর-প্রচারিত মহানুষ্ঠানের পুনরনুষ্ঠান করিয়া—বিরাট ভাবে আবার তাহার প্রচার করিয়া—বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি প্রকৃত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি এবং তৎপ্রচারিত মহদনুষ্ঠানের প্রতি সুবিচার করিয়া—আমাদের জীবনের ও সুশিক্ষার সার্থকতা করি। বৃথা আন্দোলন করিয়া বেড়াইলে কিছুই হইবে না। শুদ্ধ বাক্‌পটুতার অনুশীলন করিয়া নিজের স্বার্থের দ্বার উন্মুক্ত করিলে চলিবে না। কপটাচারী হইয়া শূন্যগর্ভ ভক্তি দেখাইলে চলিবে না। আমাদের কপটাচারের জন্য আমরা জগতে ঘৃণিত, সভ্যজগতে বিনিন্দিত, আসুন, আমরা সেই বদ্ধমূল কপটাচারকে উন্মূলিত করিয়া বিদ্যাসাগরের পথে অগ্রসর হই। যে কার্য্যসাধনের জন্য ভগবান্ তাঁহাকে ভারতে পাঠাইয়াছিলেন এবং আমাদের সহকারিতা না পাওয়ায় যে কার্য্য তিনি আরব্ধমাত্র করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, আসুন, আমরা ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া সে কার্য্য সুসম্পন্ন করি। শুদ্ধ অসার বক্তৃতা করিয়া আমরা আর কত কাল কাটাইব? বক্তৃতার কাল অতীত হইয়া গিয়াছে। এখন জীবন্ত দৃষ্টান্ত-প্রদর্শনের সময়! এখন কাপুরুষের ন্যায় ভয়বিহ্বল হইয়া অন্তঃপুরে লুক্কায়িত থাকিলে চলিবে কেন? আমরা ভীত হইলে, রাজনৈতিক সংস্কার-কার্য্যে ব্রতী হইতে পারিব কেন? সমাজ-সংস্কারে আমাদের বল-পরীক্ষা হইলে, আমরা অকুতোভয়ে রাজনৈতিক সংস্কারে ব্রতী হইতে পারিব। আমরা যদি সমাজের কোন অংশের স্বাধীনতা হরণ করি, তাহা হইলে বৈদেশিক জাতির নিকট কোন্ মুখে আমাদের স্বাধীনতা ভিক্ষা করিব? যোগ্যতা না দেখাইলে স্বাধীনতা চাহিলেই বা তাঁহারা দিবেন কেন, আর ভগবানই বা আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইবেন কেন? অতএব আসুন, আমরা আজ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মহতী কীর্ত্তি চিরস্থায়িনী করিবার নিমিত্ত, "কপটাচারী" বলিয়া আমাদের যে দুর্নাম আছে, তাহা ক্ষালিত করিবার জন্য এবং ভবিষ্য জাতীয় সঞ্জীবনের যোগ্য হইবার জন্য, বিদ্যাসাগর-গৃহীত মহাব্রতের উদ্‌যাপনা করি। ইহাতে বিদ্যাসাগরের আত্মা আমাদিগের উপর প্রসন্ন হইবেন—এবং ভগবানও আমাদিগের প্রতি—এই চিরপদদলিত পতিত জাতির প্রতি—কৃপাকটাক্ষপাত করিবেন। আসুন, আর বিলম্ব করিবেন না। শুভকার্য্যে বিলম্ব অশুভজনক। তাই বলিতেছি, ভারতবাসী ভাই-ভগিনীগণ, আসুন, আমরা সকলে একবাক্যে সেই মহদনুষ্ঠানের পুনরনুষ্ঠান করি। আর কালবিলম্বে কাজ নাই—আসুন!

বীরপূজা (৪)

কর্ম্মবীর মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন

ব্রাহ্ম-সৌরজগতের সূর্য্য রাজা রামমোহন রায়, পৃথিবী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং চন্দ্র কেশবচন্দ্র সেন। যেমন সূর্য্য আমাদিগের সৌরজগতের প্রসবিতা, সেইরূপ রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজের স্রষ্টা বা প্রসবিতা। সূর্য্যমণ্ডল হইতে তেজোরাশি বিনির্গত হইয়া যেমন গ্রহ-উপগ্রহাদির সৃষ্টি

করিয়াছে, সেইরূপ সেই মহাপুরুষের আবার তেজের অনুক্রমণে ব্রাহ্মসমাজের উৎপত্তি হইয়াছে। ভারতে এই নব-সূর্য্যের আবির্ভাবে এক নব-যুগের আবির্ভাব হইয়াছে। সে সূর্য্যমণ্ডল এক্ষণে ভূর্লোক ছাড়িয়া দ্যুলোকে অবস্থিত করিতেছেন বলিয়া অযোগী ব্যক্তি স্থূল চক্ষুতে তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছে না বটে, কিন্তু যোগিগণ যোগচক্ষুতে তাঁহার অধিকতর স্ফুরিত দিব্যমূর্ত্তি দর্শন করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিতেছেন। ভূর্লোকের ব্রহ্মলীলা—দ্যুলোকের ব্রহ্মলীলা প্রতিবিম্ব মাত্র—সুতরাং ছায়াবহুল ও ক্ষণস্থায়ী। দ্যুলোকে ব্রহ্মের যেরূপ লীলা হইবে—ভূর্লোকে তাহার প্রতিবিম্ব পড়িবেই পড়িবে। কিন্তু ছায়ালীলায়—বা ছায়াবাজী—ক্ষণকালের জন্য মাত্র লোকলোচনকে মায়ামুগ্ধ করিয়া দ্যুলোকস্থ—কূটস্থ—আধারে বিলীন হইয়া যাইবে। তথায় উজ্জ্বল নক্ষত্ররূপে বহুকাল বিরাজমান থাকিয়া সেই ব্রহ্মজ্যোতি-কলা—অব্যক্ত ব্রহ্মবিন্দুতে লয়প্রাপ্ত হইবে। এ ধরিত্রী যেমন সূর্য্যমণ্ডল হইতে বিক্ষিপ্ত তেজোরাশির সমষ্টিমাত্র—সেইরূপ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাতেজাঃ রাজা রামমোহন রায় বিকীরিত তেজঃপুঞ্জের আধারমাত্র। যদিও ব্রাহ্মসমাজের আদি সূর্য্য দ্যুলোকে গমন করিতেছেন—তথাপি তাঁহার তেজঃপুঞ্জ ঘনীভূত হইয়া মহর্ষিতে বিরাজমান রহিয়াছে। তাহাতেই ব্রাহ্মসমাজ এখনও লয়প্রাপ্ত হয় নাই। মহর্ষি ব্রাহ্মসমাজকে বক্ষে ধারণ করিয়া অন্তর্নিহিত তেজে মৃদু অনুপ্রাণিত করিয়া রাখিয়াছেন।

এই ধরিত্রীর উভয় কেন্দ্রস্থিত দুইটি ধ্রুবতারা—রামতনু লাহিড়ী ও রাজনারায়ণ বসু ভূর্লোক ছাড়িয়া দ্যুলোকে গমন করিয়াছেন। ইহার একমাত্র শশী কেশবচন্দ্র সেন অমৃত-জ্যোতিতে কিছুকাল ভূমণ্ডলকে স্নিগ্ধ ও আলোকিত করিয়া দ্যুলোকে গমন করিয়াছেন। ব্রাহ্ম-সৌরজগতের রবি-শশী অস্তমিত এবং তারাগণও এক একটি করিয়া অস্তমিত হইতেছেন। ধরিত্রীও জরাজীর্ণ। কে বলিতে পারে যে, ধরিত্রীর তিরোধানে ব্রাহ্মসৌরজগৎ প্রকাণ্ড হিন্দু সৌরজগতের অন্তর্লীন হইবে না? ব্রাহ্মগণের বিপ্রকর্ষণী শক্তি সত্ত্বেও প্রকাণ্ড হিন্দুসমাজের সঙ্কর্ষণ শক্তিবলে—ক্ষুদ্র সমাজ মহাসমাজের অন্তর্লীন হইবার অধিকতর সম্ভাবনা। এই দুইটি সমাজ বহুদিন হইতে পরস্পরকে কুক্ষিগত করিবার চেষ্টা করিতেছে। এক্ষণে যে যোগ্যতম, সেই বাঁচিবে—অপরটি নিশ্চয় উহার কুক্ষিগত হইবে।

রাজা রামমোহন রায়ের তিরোভাবের পর কেশবচন্দ্র সেনের ন্যায় প্রতিভাশালী মহাপুরুষ ব্রাহ্মসমাজে আর আবির্ভূত হন নাই। মা ব্রহ্মময়ী তাঁহাকে নেতৃত্বোপযোগী সমস্ত গুণে বিভূষিত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তিনি আশৈশব গম্ভীর, দুরবগাহ, স্থিরধী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও মন্ত্রগুপ্তি-পরায়ণ ছিলেন। আত্মতৃপ্ত, আত্মপর্য্যাপ্ত ও আত্মভাবে মগ্ন—এরূপ দ্বিতীয় ব্যক্তি ব্রাহ্মসমাজে আর জন্মিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। পবপ্রদর্শিত পথে গমন করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য না হউক—বিশেষ কষ্টকর বলিয়া বিবেচিত হইত। শ্রীকৃষ্ণ যেমন ব্রজের রাখালগণের সহিত পূর্ণ বাল্যলীলা করিয়াও তাহাদিগকে কখন ধরা দেন নাই—কখন তাহাদিগকে বুঝিতে দেন নাই যে, তিনি ব্রহ্মের পূর্ণাবতার—সেইরূপ কেশবচন্দ্র সেন তাঁহার বাল্যসহচরগণের সহিত পূর্ণ মিশিয়াও তাহাদিগকে কিছুতেই জানিতে দেন নাই যে, তিনি একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী মহা-পুরুষ। মহাপুরুষগণ প্রায় সকলেই অল্প-বিস্তর পরিমাণে জাতিস্মর—অর্থাৎ তাঁহাদের পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত ও বর্ত্তমান জন্মের ব্রতের স্মৃতি তাঁহাদের মনে সতত জাগরূক থাকে। কোন্ কোন্ জন্মে কি কি করিয়াছিলেন—এবং এই জন্মেই বা কি করিতে আসিয়াছেন—অর্থাৎ সে সকল বিষয়ের স্মৃতি তাঁহাদিগের মনে সদা ভাসমান থাকে। দিগ্‌দর্শনের শলাকার ন্যায় তাঁহাদিগের মনের গতি সেই লক্ষ্যের দিকে—সেই মরণান্ত ব্রতের দিকে সদা স্থির থাকে। প্রথমে কেহ তাহা জানিতে পারে না—জানাইলেও বিশ্বাস করে না—বা বুঝিতে পারে না। ক্ষুদ্র শিলাখণ্ড যে কালে বিশাল গিরিমালায়, কিংবা ক্ষীণা রজতসূত্রপরিমিতা নিঝরিণী যে দিগন্তব্যাপিনী মহানদীতে পরিণত হইবে—তাহা সহজে কেহ ধারণা করিতে পারেন না। গগনের মেঘনিঃসৃত রবিকণা হইতে যে মহাসাগরের উৎপত্তি হইয়াছে—এ কথা বলিলে বক্তাকে কে না বাতুল বলিয়া উপহাস করিবে? অথচ এই সকল কার্য্যকারণভাব বৈজ্ঞানিকের নিকট স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে।

কেশব বাবু যে সমাজের নেতা হইবেন, তাহার আভাস তাঁহার বাল্যজীবনেই পাওয়া গিয়াছিল। তাঁহার সহচর-বৃন্দ তাঁহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিত—অথচ প্রাণ দিয়া তাহারা তাঁহার নিকট তাঁহার প্রাণ পাইত না! তাহারা তাঁহার নিকট তাহাদিগের অন্তরের দ্বার উদ্ঘাটন করিত—কিন্তু তাঁহার অর্গলবদ্ধ হৃদয়-মন্দিরে তাহারা কেহ প্রবেশ করিতে পারিত না। তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা-জ্যোতিতে আকৃষ্ট হইয়া তাহারা তাঁহাকে নেতৃত্ব-পদে বরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার আকর্ষণশক্তি অতিক্রম করিয়া যাওয়া তাহাদিগের পক্ষে অসম্ভব হইত। তাঁহার বয়োবৃদ্ধির সহিত এই আকর্ষণ-শক্তি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া চরমা কাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল।

এই আকর্ষণ বা সঙ্কর্ষণ শক্তির পূর্ণ বিকাশের জন্য ভগবানের একটি নাম "কৃষ্ণ" হইয়াছে। এই জন্যই আমরা প্রবন্ধান্তরে কেশব বাবুকে 'কেশবাবতার" বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম। ইহা অপেক্ষা অধিক প্রশংসা মানুষকে করা যাইতে পারে বলিয়া আমার ধারণা ছিল না। কেশব বাবুর এই সঙ্কর্ষণ শক্তি তাঁহার যৌবনে ও প্রৌঢ় অতিশয় পরিপাক-প্রাপ্ত হইয়াছিল। নরনারী তাঁহাকে দেখিলেই স্বতই তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইত। তাঁহার সুমধুর সারগর্ভ ও হৃদয়ের অন্তস্তলস্পর্শিনী বচন পরম্পরা শুনিলে চিত্ত স্বতই উন্মাদিত হইত। বোধ হইত যেন, তাঁহার মুখমণ্ডল হইতে নিরন্তর অমৃতধারা-ক্ষরিত হইতেছে! যাঁহারা নিকটে থাকিতেন, তাঁহারা মনে করিতেন, যেন অমর-কুণ্ড হইতে সুধা-ধারা বিনির্গত হইয়া তাঁহাদিগকে অভিষিঞ্চিত করিতেছে। সমীপস্থ নরনারী সমভাবে ইহা অনুভব করিতেন—এই জন্য তাঁহারা তাঁহার সঙ্গত্যাগ করিতে চাহিতেন না। অথবা তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাইবার তাঁহাদিগের শক্তি থাকিত না। তাঁহারা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁহার নিকট বসিয়া থাকিতেন বা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতেন। আমরাও এক দিন এই অবস্থায় পড়িয়াছিলাম—এবং তাঁহার প্রভাবে আত্মহারা হইয়া গিয়াছিলাম। মানব-সমাজের উপর এরূপ আধিপত্য করিতে আমি আর কোন বাঙ্গালীকে কখন দেখি নাই।

কেশব বাবুর নিকট আবাহন-বিসর্জ্জন ছিল না। তিনি কাহাকে আহ্বান করিয়াও আনিতেন না, অথচ আসিলেও কাহাকে যাইতে বলিতেন না। অথবা একবার তাঁহার নিকট আসিলে—তাঁহার সহিত কথোপকথন করিলে কেহ আর তাঁহার সঙ্গত্যাগ করিয়া যাইতে পারিতেন না। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত তাঁহার মন্দিরে এরূপ জনতা হইত যে, দেখিলে বোধ হইত যেন, কোন সমারোহ-ব্যাপার উপস্থিত। কিন্তু তাহা নহে—ইহা নিত্য ঘটনা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাঁহার এরূপ অসাধারণ ধৈর্য্য ছিল যে, তিনি সামান্য একটু দুগ্ধ পান করিয়া সমস্ত দিন লোকের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেন—অথচ ক্লান্তি অনুভব করিতেন না। নানা লোকে নানা প্রশ্ন করিত; তিনি কাহারও উপর বিরক্ত না হইয়া সকলেরই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দান করিয়া শ্রোতৃবর্গকে পরিতৃপ্ত করিতেন। যাহার যে বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইত—তিনি তর্ক ও যুক্তি দ্বারা সুমধুর ভাষায় তাহার সেই সন্দেহভঞ্জন করিতেন। সে সময় নাস্তিকতা ও সংশয়বুদ্ধির অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিয়াছিল। কেশব বাবু যেন সেই বিশ্বব্যাপিনী নাস্তিকতা ও সংশয়বুদ্ধি নিরসনের জন্যই প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। যাহারা নাস্তিক বা সংশয়বাদী ছিলেন, তাহারা দলে দলে কেশব বাবুর শিষ্য হইতে লাগিলেন। নরনারী পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করিয়া তাঁহার চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চবংশীয় শিষ্যগণ বর্ণনির্ব্বিশেষে তাঁহার পদধূলি গ্রহণপূর্ব্বক তাহা অঙ্গরাগ করিয়া আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ মনে করিতে লাগিলেন। হিন্দু-সমাজ যেন টলমল করিতে লাগিল। প্রত্যেক হিন্দুপরিবার হইতে দুই একটি তারা খসিয়া ব্রাহ্মসমাজক্ষেত্রে পতিত হইতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে হুলস্থূল পড়িয়া গেল।

কেশব বাবু এই সময় আদিসমাজের উপাচার্য্য ছিলেন। আদিসমাজ বেদ, উপনিষদ্ ও তন্ত্রের ভিত্তির উপর ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরকে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া পরম-ব্রহ্মের উপাসনায় নিমগ্ন ছিলেন। ইহা তখন একটি শ্রেষ্ঠ উপাসক-সম্প্রদায়মাত্র বলিয়া উদ্ঘোষিত ও পরিগৃহীত হইয়াছিল। হিন্দুসমাজের সহিত এত দিন ইহার কঠোর সংঘর্ষ উপস্থিত হয় নাই। সাকার ও নিরাকার উপাসনা লইয়া উভয় সমাজে ঘোরতর বাগ্-বিতণ্ডা উপস্থিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু ব্রাহ্মসাধক

সম্প্রদায় তৎকালে একটি স্বতন্ত্র সমাজে পরিণত হয় নাই। ইহা তখনও হিন্দুসমাজের অঙ্গীভূত ছিল। বর্ণাশ্রমের বিরোধী না হওয়ায়, হিন্দুসমাজ ইহাকে নিষ্কাশিত করে নাই। কিন্তু কেশবচন্দ্র সেন শাস্ত্র ও শাস্ত্রানুমোদিত বর্ণাশ্রমের গণ্ডীর ভিতর অধিক দিন থাকিতে পারিলেন না। তিনি হিন্দু-শাস্ত্র ও হিন্দু-সমাজের অস্থিস্বরূপ বর্ণাশ্রমের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হই-লেই—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত তাঁহার মত-বিরোধ উপস্থিত হইল। আদিসমাজ সনাতনধর্ম্ম ও তদাশ্রিত হিন্দুসমাজের অস্থিমজ্জাভূত বর্ণাশ্রমের বিরোধী ছিলেন না। তাঁহারা কেবল সাকার উপাসনা বা পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইয়াছিলেন মাত্র। সুতরাং বৈপ্লবিক কেশবচন্দ্র আর সে সমাজের উপাচার্য্য থাকিতে পারিলেন না। অগত্যা তাঁহাকে সেই সমাজ পরিত্যাগ করিয়া নূতন ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা-পিত করিতে হইল। এই নব ব্রাহ্মসমাজের নাম 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' হইল। কেশবের স্বাধীন চিত্ত পর-প্রবর্ত্তিত পথে কখনই বিচরণ করিতে পারিত না। 'মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থ'—যে পথে কোন মহাজন গমন করিয়াছেন—সেই পথই প্রশস্ত পথ' কেশব বাবু মহাভারতের এই সুবর্ণময় উপদেশ-বচন লঙ্ঘন করিয়া আপনার কক্ষ আপনি কাটিয়া লইলেন। ব্রাহ্ম-সৌর-জগতের শশী নির্দ্দিষ্ট কক্ষ-ভ্রষ্ট হইয়া নবকক্ষে ভ্রাম্যমাণ হওয়ার পর হইতেই ব্রাহ্ম সৌরজগতের সৌষ্ঠব নষ্ট হইল। ইহার শক্তিসাম্যও বিচলিত হইল।

প্রথমে বোধ হইল যেন, ব্রাহ্ম-সৌর-জগতের চন্দ্র কক্ষভ্রষ্ট হইয়া রবিকক্ষায় অনুক্রমণ করিয়াছে। যেন কেশবচন্দ্র সেন রাজা রামমোহন রায়ের শূন্য আসন অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। পূর্ণচন্দ্রস্বরূপ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ স্বকক্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যেন চিরতিমিরে আচ্ছন্ন হইলেন। যেন আদিসমাজকে চির-অমানিশি আসিয়া আলিঙ্গন করিল। সকলেই বিষাদে মগ্ন। আদিসমাজ যেন যায় যায় হইয়া উঠিল।

এ দিকে এই নব সূর্য্যের অভ্যুদয়ে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ অরুণপ্রভা ধারণ করিল। অসংখ্য নর-নারী এই অরুণপ্রভায় উদ্ভাসিত হইয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত হইতে লাগিলেন। শাস্ত্র ও বর্ণাশ্রমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া দেওয়ায়—একেবারে স্রোত প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। সেই প্রচণ্ড তরঙ্গের আঘাতে আদিব্রাহ্মসমাজ ও হিন্দুসমাজ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইতে লাগিল। যাহা কিছু পুরাতন ও সনাতন —যাহা কিছু হিন্দুদের প্রাণভূত—সমস্তই এই স্রোতের মুখে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। বোধ হইল যেন, মহাপ্রলয় উপস্থিত। যিনি এ প্রচণ্ডবেগের সৃষ্টিকর্ত্তা —তিনি রুদ্ররূপী—তাঁহাকে বার বার নমস্কার করি।

অনন্তরূপী হিন্দুসমাজ আদিব্রাহ্মসমাজকে অনন্ত ফণায় ধারণ করিয়া এতদিন মহানিদ্রায় অভিভূত ছিলেন। এরূপ প্রবাদ আছে যে, অনন্ত দেব যখন ভূমণ্ডলকে এক ফণা হইতে ফণান্তরে স্থাপিত করেন—সেই সময়েই ভূমিকম্প উপস্থিত হয়। কিন্তু এবার তাহার বিপরীত ঘটিল। এবার আদিব্রাহ্ম-সমাজরূপ ভূমণ্ডলের উৎকম্পে বাসুকির নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি অনন্ত ফণাস্থিত অনন্ত লোচন বিস্ফা-রিত করিয়া আদিব্রাহ্মসমাজের দিকে কটাক্ষপাত করিলেন। আদিব্রাহ্মসমাজ ভয়ে কম্পমান হইয়া করযোড়ে অনন্তদেবকে বলিলেন যে—"আমার এই উৎকম্পের কারণ ঐ নবোদিত সূর্য্যের বিরাট আকর্ষণ।" তখন অনন্তদেবের রোষকষায়িত দৃষ্টি সেই নবোদিত সূর্য্যে ও তাহা হইতে উৎক্ষিপ্ত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজরূপ নব সৌরজগতের দিকে পতিত হইল। সেই অবধি কেশব-প্রতিষ্ঠাপিত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ অনন্তরূপী হিন্দুসমাজের বিষদৃষ্টিতে পতিত হইলেন।

অনন্তদেবের অনন্ত ফণার তর্জ্জন গর্জ্জন সত্ত্বেও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ কেশবচন্দ্রের প্রখর প্রভায় ক্রমশঃ পুষ্টাবয়ব হইতে লাগিলেন। ইংরাজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে হিন্দুর শাস্ত্র, হিন্দুর দেবদেবী—হিন্দুর আচার-পদ্ধতি ও রীতি-নীতি—এবং হিন্দুসমাজের অস্থিমজ্জাভূত বর্ণাশ্রমের বিরুদ্ধে যেন সমস্ত শিক্ষিত-সমাজ অভ্যুত্থিত হইয়াছিলেন। ইহার অনুকূলে কেহ কোন কথা বলিলে তাঁহার মাথা রাখা ভার হইত। এই বৈপ্লবিক দল—শিক্ষিত নর-নারী—ক্রমে ক্রমে বৈপ্লবিক নেতা কেশবচন্দ্র সেনের পতাকামূলে আসিয়া দাঁড়াইলেন 'ভাঙ্গ!—ভাঙ্গ!!—চুরমার করিয়া ভাঙ্গ!'—চতুর্দ্দিকে এই বৈপ্লবিক রব শ্রুত হইতে লাগিল। বোধ হইল, যেন মহাপ্রলয় উপস্থিত। শ্রদ্ধাস্পদ অন-রেবল্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কতিপয় স্থিরধী আর্য্য নীরবে নির্জ্জনে হিন্দুর ধর্ম্ম, হিন্দুর

বিশুদ্ধাচার-রক্ষা করিয়াছিলেন! তদ্ভিন্ন অধিকাংশ সুশিক্ষিত নর-নারী এই প্রলয়কার্য্যে যোগ দিয়াছিলেন। একদিকে যেমন সংস্কৃত কালেজে কোন কোন অধ্যাপক প্রকাশ্যরূপে নাস্তিকতা প্রচার আরম্ভ করিয়াছিলেন—সেইরূপ অন্যদিকে ব্রাহ্মগণ হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারকগণ বেদিপীঠে উপবিষ্ট হইয়া পৌত্তলিকতা, বর্ণাশ্রম, বাল্য-বিবাহ, অবরোধ-প্রথা প্রভৃতির বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিয়া অনন্তরূপী হিন্দুসমাজকে উদ্বেলিত করিয়া তুলিলেন। সেই বিরাট সমাজ চিরনালিত তন্দ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক হাই তুলিতে তুলিতে মৃদঙ্গ ও করতাল লইয়া হরিসংকীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। চতুর্দ্দিকে হরি-সভা স্থাপিত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মপ্রচারকগণের আদর্শে হিন্দু-প্রচারকগণ বেদিপীঠে আসীন হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মগণের উপর গালিবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। ঘোরতর ধর্ম্মবিদ্বেষে উভয় সমাজ কলঙ্কিত হইতে লাগিল। উভয় সমাজে বিদ্বেষভাব যেরূপ বদ্ধমূল হইয়াছিল-অন্য দেশ হইলে তাহার পরিণাম অতিশয় শোচনীয় হইত। বাগ্‌যুদ্ধ ক্রমে ঘোরতর সংগ্রামে পরিণত হইত। প্রোটেষ্টাণ্ট-ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবে প্রোটেষ্টাণ্টগণের সহিত ক্যাথলিকগণের যেরূপ সংগ্রাম বাধিয়াছিল—ভীরু ও শান্তিপ্রিয় হিন্দু ও ব্রাহ্মে সেরূপ কোন সংগ্রাম বাধে নাই। তাঁহাদের ধর্ম্ম সংঘর্ষ কেবল বাগ্‌যুদ্ধেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল।

সে সময় অনেক সুশিক্ষিত যুবক পৌত্তলিকতা ও বর্ণাশ্রমের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ কিংবা সুশিক্ষিত স্ত্রী পাইবার আশায় স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিতেন। কেশব-প্রচারিত নব ধর্ম্ম সে অভাব পূরণ করায় আর কেহ খৃষ্টান হইতে যাইতেন না—পরন্তু তাঁহাদিগের দ্বারা নব-প্রতিষ্ঠাপিত ব্রাহ্মসমাজ ক্রমশঃই পুষ্টাবয়ব হইতে লাগিল। ইহাতে খৃষ্টান মিশনরীগণ কেশববাবু ও তদধিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা বক্তৃতা ও পুস্তিকা-প্রচার দ্বারা কেশব বাবু ও তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মকে সবিশেষ আক্রমণ করিতে লাগিলেন। কেশববাবু তাঁহার চিত্তপ্রমাথিনী বক্তৃতা দ্বারা ও সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রচার করিয়া তাঁহাদিগের তর্কজাল খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন। তাঁহার অপ্রতিদ্বন্দ্বিনী প্রতিভা-প্রভাবে সুশিক্ষিত দল খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারকগণের কবল হইতে রক্ষা পাইলেন। এই বীরোচিত কার্য্যের জন্য হিন্দু ও ব্রাহ্ম উভয় সমাজই তাঁহার নিকট সবিশেষ ঋণী আছেন। এ সময় কেশব বাবু কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত না হইলে সুশিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকে হয় ত এত দিনে খৃষ্টান হইয়া যাইতেন।

যখন পঞ্জাবে দলে দলে হিন্দুকে মুসলমান করা হইতেছিল—সেই সময় তথায় ধর্ম্মবীর গুরু নানকের আবির্ভাব হয়। নানক নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক ছিলেন। তাঁহার চরিত্রের বিমল জ্যোতিতে ও তৎপ্রচারিত ধর্ম্মের পবিত্রতায় উজ্জ্বল ও পূত হইয়া পঞ্চনদপ্রদেশস্থ হিন্দুগণ যাবনিক ধর্ম্ম গ্রহণে বিরত হইলেন। এই মহাপুরুষের যথা-সাময়িক আবির্ভাবে পঞ্চনদপ্রদেশ ধর্ম্মবিপ্লব হইতে রক্ষা পাইল। গীতাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন যে, 'যখনই যখনই সনাতন ধর্ম্মের গ্লানি ও ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিগণের উৎপীড়ন আরম্ভ হইবে—তখনই যুগে যুগে আমিই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া সনাতন ধর্ম্মের রক্ষা ও ধার্ম্মিকগণের উদ্ধারসাধন করিব।' এই ভগবদ্‌বাক্য অব্যর্থ। নানক সেই ভগবদ্‌বাক্যের যথার্থ্য প্রতিপাদন করিবার জন্যই যেন ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। গুরু নানকের শিষ্য বীর-সন্ন্যাসী গুরুগোবিন্দ সিংহ ভারতের ভবিষ্য মঙ্গলের জন্য হিন্দু যবন মিশাইয়া একটি অপূর্ব্ব রাজনৈতিক জাতির সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। এই মিলিত জাতি শিখসম্প্রদায় নামে খ্যাত হইয়াছে। গুরুগোবিন্দ-প্রতিষ্ঠাপিত এই জাতি এক সময় ভারতীয় সমস্ত হিন্দু ও যবনকে কুক্ষিগত করিতে উদ্যত হইয়াছিল। গুরুগোবিন্দ স্বয়ং ভগবতী ভবানীর নিকট নরমেধ-যজ্ঞ সমাপন করিয়া বর পাইয়াছিলেন যে, তাঁহার শিষ্যগণ প্রত্যেকে তাঁহার জন্য প্রাণোৎসর্গ করিবে—এবং তাহারা রণে অজেয় হইবে। এই বর পাইয়া তিনি তন্ত্রোক্ত বিধি মতে হিন্দু যবন উভয়কেই মন্ত্রশিষ্য করিতে লাগিলেন। নবধর্ম্মের নবীন উৎসাহে মাতিয়া ও 'ভবানীর বরে তাহারা রণে অজেয়' এই বিশ্বাসে প্রোৎসাহিত হইয়া শিষ্যগণ সমস্ত পঞ্চনদপ্রদেশে গুরুর জয় উদ্ঘোষিত করিয়া বেড়াইতে লাগিল। সে প্রচণ্ড স্রোতস্বিনীর নিকট যবনসেনা তৃণের ন্যায় ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

দিল্লীর সিংহাসন টলমল করিতে লাগিল। এই সময় ঘাতক-হস্তে গুরুগোবিন্দ সিংহের মৃত্যু না হইলে শিখসম্প্রদায় যে মহাশক্তিতে পরিণত হইত, কে বলিতে পারে?

নানক ও গুরুগোবিন্দের ন্যায় বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য, রামমোহন ও কেশব—সকলেই ভারতের জাতীয় একতা-সম্পাদনের চেষ্টায় জীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। জাতীয় একতা ব্যতীত ভারতের গৌরব রক্ষা হইবে না—ইহা তাঁহারা বিভিন্ন বিভিন্ন উপায়ে এই মহালক্ষ্য সাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবকালে এই জাতীয় একতা পূর্ণতালাভ করিয়াছিল। তাহার ফলে অশোকের জয়স্তম্ভ সপ্তদ্বীপে নিখাত হইয়াছিল। পৃথিবীর সমস্ত রাজা তৎকালে অশোকের আদেশ শিরোধার্য্য করিতেন। কিন্তু সম্রাট্ অশোক ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম একবারে তুলিয়া দিতে চেষ্টা করেন নাই। তিনি ব্রাহ্মণগণকে ও বৌদ্ধ শ্রমণগণকে সমদৃষ্টিতে দেখিবার জন্য প্রজাবৃন্দের উপর আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন। হিন্দু ও যবন মিলিত না হইলে ভারতের জাতীয় জীবনের কোনও আশা নাই. এই বিশ্বাস নানকের সময় হইতে ক্রমশঃ দৃঢ়ীভূত হইতেছে। কিরূপে এই অসাধ্যসাধন সম্পন্ন হইতে পারে—এই চিন্তা সমাজ-সংস্কারক ও ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকমাত্রকেই আশ্রয় করিয়া আসিতেছে। যখন বর্ণাশ্রমের সৃষ্টি হয়—তখন ভারতে যবনের আবির্ভাব হয় নাই। তখন এখানে শুদ্ধ জেতা আর্য্যজাতি ও বিজিত শূদ্রজাতি অবস্থান করিতেছিলেন। ধর্ম্মনিষ্ঠ আর্য্যেরা বিজিত অনার্য্য বা শূদ্রজাতিকে আপনাদিগের ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলেন। আর্য্যজাতি গুণকর্ম্ম-বিভাগ বশতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই তিন বর্ণে বিভক্ত হইলেন। যাঁহারা সত্ত্বগুণী ছিলেন ও নিরন্তর অধ্যাত্মবিজ্ঞানের অনুশীলন করিতেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ বর্ণ হইলেন। যাঁহারা রজোগুণী, তাঁহারা যুদ্ধ-বিগ্রহ ও প্রজাপালনাদি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় ক্ষত্রিয়বর্ণ হইলেন। ব্রাহ্মণ শব্দের অর্থ ব্রহ্মজ্ঞ—অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মদর্শন পাইয়াছেন বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন—তিনি ব্রাহ্মণ। আর যিনি স্বদেশীয়গণকে শত্রুর অস্ত্রজনিত ক্ষত হইতে রক্ষা করেন—তিনিই ক্ষত্র বা ক্ষত্রিয় (ক্ষতাৎ ত্রায়তে যঃ সঃ ক্ষত্রঃ)। আর যাঁহারা ব্যবসায়-ব্যাণিজ্য উপলক্ষে সর্ব্বত্র গতিবিধি করিয়া থাকেন—তাঁহারাই বৈশ্যবর্ণ হইলেন। সুতরাং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই তিন বর্ণের যৌগিক অর্থ—(১) ব্রহ্মজ্ঞ, (২) ক্ষত-ত্রায়ক ও (৩) দেশ-ব্যাপক। বিজিত বা শূদ্রজাতি সাধারণতঃ তমোগুণী ও কষ্টসহিষ্ণু ছিল বলিয়া তাহাদিগকে কৃষিকার্য্যে নিয়োজিত করা হইল। এইরূপে হিন্দুজাতি চতুর্ব্বর্ণে বিভক্ত হইল, কিন্তু সমাজের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গুণকর্ম্মের সংমিশ্রণ হইতে লাগিল। চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ প্রচলিত থাকায় ক্রমে অসংখ্য সঙ্কর-বর্ণের উৎপত্তি হইতে লাগিল। এই সকল সঙ্করবর্ণ আপন আপন প্রবৃত্তি ও যোগ্যতা অনুসারে বিভিন্ন বিভিন্ন জীবিকা অবলম্বন করিতে লাগিল। ইহাতে বিজ্ঞান ও শিল্পের ভূয়সী চর্চ্চা আরম্ভ হইল।

ব্রাহ্মণ পিতা ও বৈশ্যা মাতার অনুলোমমিলনে বৈদ্যজাতির উৎপত্তি হইল। বৈদ্যজাতি চিকিৎসা-শাস্ত্রকে আপনাদিগের জাতীয় ব্যবসায়রূপে গ্রহণ করিল। এই বৈদ্যজাতি হইতে চিকিৎসা-বিদ্যা পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল। এই সঙ্করবর্ণ সাধারণতঃ নবশাখায় বিভক্ত হইলেন। এই সকল বর্ণের স্বরূপ ও কার্য্য নির্ণয় করা এ প্রবন্ধের লক্ষ্য ও প্রতিপাদ্য নহে। সুতরাং ইহার উৎপত্তির উল্লেখ-মাত্র করিয়া এখানে ক্ষান্ত হইব।

গুণকর্ম্মের বিভাগ অনুসারে প্রথমে বর্ণ-ভেদ হয়। তাহাতে পূর্ব্বকালে অমৃতময় ফল উৎপন্ন হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে এই বর্ণভেদ এরূপ জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, ইহা আমাদিগের জাতীয় উন্নতির পরিপন্থী হইয়া পড়িয়াছে। যাহা একদিন অমৃতময় ফল প্রসব করিয়া ভারতীয় হিন্দু জাতিকে জগতের আরাধ্য করিয়া তুলিয়াছিল, সেই বর্ণভেদ এক্ষণে ভারতীয় জাতীয় উন্নতির পথে কণ্টকস্বরূপ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। যদিও প্রত্যেক বর্ণ আপন পিতৃ-পৈতামহিক কর্ম্মে রত থাকিয়া তাহাতে অসাধারণ দক্ষতা লাভ করিতে চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে ভারতের এ দুর্দ্দশা ঘটিত না। কিন্তু বৈদেশিক সংমিশ্রণ আরম্ভ হওয়ার পর হইতেই—এই বর্ণভেদের মূল উদ্দেশ্য বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। বৈদেশিক রাজার অধীনে বর্ণগত কর্ম্ম-পার্থক্য ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। মুসলমান-দিগের রাজত্বকালে এই বর্ণগত কর্ম্ম-পার্থক্য কিয়ৎ-

পরিমাণে ছিল—সুতরাং তখন বর্ণভেদ তত ক্লেশকর হইয়া উঠে নাই। কিন্তু ইংরাজ-রাজত্বকালে বর্ণগত কর্ম্ম-পার্থক্য প্রায় বিলুপ্ত হইতে চলিল। বীজ-নিহিত গুণপার্থক্য একেবারে বিলুপ্ত হইবার নহে বলিয়াই এখনও ইহার অস্তিত্ব রহিয়াছে। কিন্তু এইরূপভাবে সমাজবন্ধন ক্রমশঃ শিথিল হইলে—আর দুই এক শতাব্দীর মধ্যে বর্ণভেদ নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইবে। এক্ষণে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের কার্য্য যজন, যাজন ও অধ্যাপনা—ক্ষত্রিয় তাঁহার কার্য্য যুদ্ধবিগ্রহাদি কার্য্যে নিরত থাকিয়া এবং তাঁহাদিগের দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তনে ও রাজার উৎসাহে অন্যান্য বর্ণও আপনাদিগের জাতীয় ব্যবসায়াদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজপ্রসাদভোগের অভিলাষে পরস্পর পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন। উচ্চ-নীচ ও লঘু-গুরু জ্ঞান ক্রমশঃই লোপ হইয়া যাইতেছে। এই বর্ণ-সংঘর্ষে উচ্চবর্ণের বিশেষ ক্লেশ উপস্থিত হইয়াছে, ব্রাহ্মণকে উচ্চ স্থান হইতে নামান যেন সকলেরই লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অন্যান্য বর্ণ রাজার সহিত এ বিষয়ে যোগ দিয়াছেন। ব্রাহ্মণকে না নামাইতে পারিলে বৈদেশিক রাজা হিন্দুদিগের উপর অপ্রতিদ্বন্দ্বিনী প্রভুতা স্থাপন করিতে পারিতেছেন না। সর্ব্ববর্ণ আজও ব্রাহ্মণকে প্রণাম করেন; কিন্তু রাজপুরুষগণকে সেলাম করেন। ইহা তাঁহাদিগের অসহ্য। এই জন্য রাজপুরুষগণ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অন্য বর্ণের অধিকতর আদর আরম্ভ করিয়াছেন। কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতিকে যে পরিমাণ উচ্চপদ দিতেছেন, ব্রাহ্মণকে সে পরিমাণে দিতেছেন না। কিন্তু ব্রাহ্মণরা আজও সমাজপতি ও আধ্যাত্মিক নেতা রহিয়াছেন। এইজন্য ইংরাজ রাজপুরুষগণের সহিত ব্রাহ্মণগণের ভিতরে ভিতরে মনোমালিন্য উপস্থিত হইয়াছে। এই ভাব মহারাষ্ট্রদেশে পরিস্ফুট হইয়াছে। অন্যান্য দেশে ইহা প্রধূমিত হইয়াছে মাত্র। ইংরাজরাজের সন্ন্যাসিগণের উপরও বিষদৃষ্টি পড়িয়াছে। পরস্পর সংঘর্ষ উৎপাদন করিয়া রাজত্ব করা ইংরাজ রাজনীতির একটি প্রধান অঙ্গ। তাহা ভারতে পূর্ণমাত্রায় প্রকটীকৃত হইয়াছে। আমরা অল্পবুদ্ধি; সুতরাং আমরা এই কূট-নীতির মর্ম্মগ্রহ করিতে না পারিয়া এক্ষণে বর্ণসংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইয়াছি। কেশব বাবুর অভিপ্রায় মহান্ হইলেও—তাঁহার প্রচার-কার্য্যের ফল অমৃতময় হয় নাই। বৈদেশিক শাসনের সময় অন্তর্বিচ্ছেদ হওয়া কোন মতেই প্রার্থনীয় নহে। বর্ণাশ্রমের উপকারিতা একবারে নাই, এ কথা কেহ বলিতে পারেন না। এই বর্ণাশ্রম থাকায় কোন বিজেতৃজাতি আর পর্য্যন্ত হিন্দুজাতিকে কুক্ষিগত করিতে পারেন নাই।

এই বর্ণাশ্রমের মহিমায় আমরা সাত শত বৎসরের দাসত্বেও আমাদিগের জাতিগত স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছি। মুসলমানেরা কত ভয়প্রদর্শন ও কত লোভ দেখাইয়াও হিন্দু জাতিকে কুক্ষিগত করিতে পারেন নাই। উচ্চবংশের দুই চারি জন ও নিম্নশ্রেণীর কতকগুলিকে স্বধর্ম্মচ্যুত করিতে পারিয়াছিলেন মাত্র। হিন্দুর যে বর্ণাশ্রম হিন্দুজাতিকে এই সাত শত বৎসরের দাসত্বের সময় পূর্ণধ্বংস হইতে রক্ষা করিয়াছে, সে বর্ণাশ্রমের কোন মহিমা নাই, এ কথা কে বলিতে পারেন? এক দিনের একটি প্রকাণ্ড এবং বজ্র অপেক্ষা কঠিন অট্টালিকাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিতে চেষ্টা করা সমীচীন নহে। এই ঘোর বৈপ্লবিককালে আমাদিগের মস্তিষ্ককে স্নিগ্ধ রাখা অতি কঠিন বটে, কিন্তু মস্তিষ্কের চঞ্চলতার সময় আমাদিগের প্রাচীন সমস্ত আচারব্যবহার, রীতি-নীতি আমূল পরিবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করা কোনমতেই উচিত নহে। ইহার ফল নিশ্চয় বিষময় হইবে।

কেশব বাবু হিন্দু-শাস্ত্র ও বর্ণাশ্রমের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হওয়ার কিছুকাল পরে বিলাতযাত্রা করেন। তথায় তিনি যেরূপ সম্মান পাইয়াছিলেন—রাজা রামমোহন রায় ব্যতীত আর কোন বাঙ্গালী তাদৃশ সম্মান পান নাই। মহারাণী ভিক্টোরিয়া স্বয়ং তাঁহাকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রাসাদে অদ্যাপি কেশবচন্দ্র সেনের প্রতিমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। তাঁহার খাতিরেই সম্রাজ্ঞী কেশবদুহিতা কুচবিহারের মহারাণীকে তাঁহার পার্শ্বের আসনে সমাসীন করিয়াছিলেন। কেশব বাবু যে শুদ্ধ রাজ-সম্মান পাইয়াছিলেন—এরূপ নহে; তিনি প্রায় সর্ব্বত্র সমান আদর পাইয়াছিলেন। বিশেষতঃ ইউনিটেরিয়ান খৃষ্টানেরা তাঁহাকে আপনাদের দলের অন্যতম নেতা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অগ্নিবর্ষী বক্তৃতায় বিলাতের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

বিলাতে খৃষ্টধর্ম্মের মহিমা স্বচক্ষে দেখিয়া কেশব

বাবুর চিত্ত খৃষ্টধর্ম্মের দিকে স্বতই আকৃষ্ট হইয়াছিল। এই বিলাতে অবস্থিতিকালেই তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মকে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের আদর্শে গঠিত করার সঙ্কল্প মনে মনে পোষণ করেন। তাই বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়াই তিনি প্রচার করেন যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম নহে। ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ইউনিটেরিয়ান খৃষ্টিয়ান্ এক, এ কথা তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন নাই বটে—কিন্তু তাঁহার যীশুখৃষ্ট (Jesus Christ) নামক বক্তৃতায় তিনি খৃষ্টকে প্রকারান্তরে গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বিলাত হইতে ফিরিয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মমন্দিরের বেদপীঠে বসিয়া যে সকল হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা দিয়াছিলেন—আমরা সে সকল বক্তৃতা স্বকর্ণে শুনিয়াছিলাম। সে সকল বক্তৃতায় ঈশ্বরের স্বরূপ যেরূপে বর্ণিত হইয়াছিল—তাহাতে ঈশ্বরকে রূপ ও গুণের আধার করা হইয়াছিল। তিনি স্বর্গের রাজা, স্বর্গের সিংহাসনে বসিয়া মানুষের পাপ-পুণ্যের বিচার করিয়া—তাহার পাপের দণ্ডবিধান করিতে থাকেন বা গুণের পুরস্কার দিয়া থাকেন—এ সকল ভাব তাঁহার তাৎকালিক বক্তৃতায় পরিব্যক্ত হইয়াছিল। উপনিষৎ ও বেদান্তপ্রচারিত অদ্বৈতবাদ হইতে কেশবপ্রচারিত দ্বৈতবাদ সুদূরপ্রক্ষিপ্ত। নিরাকার ব্রহ্ম—নিষ্ক্রিয় নির্গুণ নামরূপবিহীন—অব্যক্ত—অনন্ত, আর তাঁহার ঈশ্বর ক্রিয়ান্বিত—গুণযুক্ত—নামরূপবান্—ব্যক্ত ও সসীম।

পৌরাণিক ও তান্ত্রিক কালে হিন্দুধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকগণ সাধকগণের হিতের নিমিত্ত ব্রহ্মের যে রূপকল্পনা * করিয়াছিলেন, সেই স্বরূপ ব্রহ্মের উপাসনাকেই ব্রাহ্মেরা পৌত্তলিকতা বলিয়া নিন্দা করিয়া, নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ, নামরূপবিহীন পরমব্রহ্মের উপাসনা পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। রামমোহন রায় কোন নবধর্ম্মের প্রবর্ত্তনা করেন নাই। তিনি হরিহর-বিধিবেদ্য ঋষিগণের ধ্যানগম্য জন্ম-মরণ-ভীতিভ্রংশী নিখিল ভুবনবীজ সৎচিৎআনন্দস্বরূপ ব্রহ্মচৈতন্যের পূজাপদ্ধতির পুনরাবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন মাত্র; জনসাধারণ এই সূক্ষ্ম পূজার অনধিকারী বলিয়া ঋষিগণ তাহাদিগের জন্য স্থূল বাহ্যপূজার অবতারণা করিয়াছিলেন। যাহারা পৃথিবী কখনও ভ্রমণ করে নাই—এবং করিতে পারিবেও না—তাহাদিগের নিকট শিক্ষকগণ যেমন গোলক (Globe) বা মানচিত্র (map) ধারণ করিয়া তাহাদিগকে পৃথিবীর স্থূল অবয়ব ও পৃথিবীস্থ দেশ, রাজ্য, নগর, নদ, নদী, গিরি, গুহা প্রভৃতি বুঝাইয়া দেন, সেইরূপ ঋষিগণ স্থূল উপাসকমণ্ডলীর সুবিধার জন্য ব্রহ্মের রূপকল্পনা করিয়া তাঁহার সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়রূপ ক্রিয়াশক্তি প্রভৃতি বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। ইহা পুত্তলী-পূজা (Idol-worship) নহে, অব্যক্ত ব্রহ্মের ব্যক্ত রূপের সাঙ্কেতিক (symbolic) পূজা মাত্র। ঋষিরা জানিতেন, ব্রহ্মের লিঙ্গ নাই—সুতরাং তাঁহারা ব্রহ্মশব্দকে ক্লীবলিঙ্গ করিয়াছেন। অথচ তাঁহারা তাঁহাকে কখন জগদম্বা, কখন জগৎপিতা বলিয়া স্তব করিয়াছেন। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে শিব মহাকালীকে স্তব করিতে গিয়া তাঁহাকে জায়া ও জননী, দুই-ই বলিয়াছেন। নিত্যযুক্ত সাধক তাঁহাকে কখন্ কি বলিয়া না ডাকিয়া থাকেন। মহম্মদও ঈশ্বরকে 'আল্লা' বলিয়া ডাকিয়াছিলেন। 'আল্লা' সংস্কৃত শব্দ—ইহার প্রয়োগ বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। 'আল্লা' শব্দের অর্থ 'অম্বা'—জগদম্বা ইহার যোগরূঢ়ি অর্থ। তন্ত্রই মাতৃভাবে সাধনা প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন। বেদেও মাতৃভাবে সাধনা অলক্ষিতভাবে প্রচারিত হইয়াছে। কারণ, সূর্য্য হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া সূর্য্যকে 'প্রসবিতা'—'সবিতা'—'প্রসবিত্রী' শব্দে স্তব করা হইয়াছে। কিন্তু তন্ত্রই স্পষ্টাক্ষরে সূর্য্যকে স্ত্রী ও চন্দ্রকে পুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহা তন্ত্রের গুহ্য সাধনের অভ্যন্তরে বিশদরূপে বর্ণিত আছে।

পরমব্রহ্মের উপাসনা লোকসাধারণের মধ্যে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্যই রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার করেন। এই পরমব্রহ্মকে নির্গুণ ব্রহ্ম কহে—আর দেবদেবীগণকে সগুণ ব্রহ্ম কহে। যাঁহারা নির্গুণ ব্রহ্মের ধ্যান-ধারণায় অধিকারী রামমোহন রায় তাঁহাদিগকে লইয়া ব্রহ্মোপাসনা করিতে আরম্ভ করেন। এই আদি ব্রাহ্মগণ উপাসক সম্প্রদায়মাত্র ছিলেন। কিন্তু কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্মসমাজ একটি সামাজিক দলে পরিণত হইল। যাঁহারা নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীন হইয়া এই সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিতেন, তাঁহাদিগকেই এই সম্প্রদায়ভুক্ত করিয়া লওয়া হইত। যে যে কারণে সুশিক্ষিত

---

* সাধনাকাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।

হিন্দুগণ পূর্ব্বে খৃষ্টান হইতেন, সেই সেই কারণেই তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজে প্রবিষ্ট হইতে লাগিলেন। ইহা মুক্তকণ্ঠে বলিতে হইবে, কেশব বাবু এই স্রোতের গতি ফিরাইয়া ব্রাহ্ম ও হিন্দু—উভয়েরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। কারণ, কেশব বাবু ব্রাহ্মধর্ম্মকে খ্রীষ্টধর্ম্মের আদর্শে গঠিত করিতে চেষ্টা করিলেও—ইহা বৈষ্ণবধর্ম্মের ন্যায় হিন্দুধর্ম্ম তরুর একটি শাখা মাত্র। সুতরাং ব্রাহ্মগণ আপনাদিগকে হিন্দু না বলিলেও হিন্দুসমাজ ইঁহাদিগকে অন্তরঙ্গ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। আপনার বস্তু কখন পর হয় না, আর পর কখন আপনার হয় না। খ্রীষ্টিয় ধর্ম্ম বৈদেশিক ধর্ম্ম—ইহার অবলম্বনে দেশীয় খ্রীষ্টিয়ানগণ আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি ও ক্রিয়াকলাপে হিন্দুসমাজ হইতে সুদূরবিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন। সুতরাং ইঁহারা হিন্দুদিগের সহিত কখনই মিশিতে পারিবেন না; কিন্তু ব্রাহ্মগণ সহজেই পারিবেন—যেহেতু ইঁহাদিগের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি ও ক্রিয়াকলাপ এখনও হিন্দুসমাজের অনুগামী আছে। পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত হিন্দু-পরিবারের সহিত ব্রাহ্ম-পরিবারের আভ্যন্তরীণ অবস্থাগত পূর্ণ পার্থক্য এখনও অনুভূত হয় না। সুতরাং অগ্রগত হিন্দু-পরিবারের সহিত ব্রাহ্মসমাজের ক্রমশঃ মিল হইয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। এখনই স্পষ্ট দেখা যায়, উভয়ে উভয়কে আকর্ষণ করিয়াছেন। এক ভাই ব্রাহ্ম ও এক ভাই হিন্দু—একত্র অবস্থিতি করিতেছেন—অথচ হিন্দুসমাজ হিন্দুভ্রাতাকে জাতিচ্যুত করিতেছে না। যেখানে পিতা ব্রাহ্ম—পুত্র হিন্দু—সে স্থলেও হিন্দুসমাজের এইরূপ উদারতা উপলক্ষিত হইতেছে। কেবল বিবাহাদি কার্য্যের সময় ব্রাহ্ম পিতা পুত্র ভ্রাতাকে—হিন্দুপুত্র—পিতা—বা ভ্রাতার গৃহ পরিত্যাগ করিতে হয় মাত্র। এ সামান্য শাসন কালে অন্তর্হিত হইবে—তখন ব্রাহ্মগণ বৈষ্ণবগণের ন্যায় হিন্দুসমাজ মধ্যে পরিগৃহীত হইবেন। কেশব বাবু সেই বৈপ্লবিক কালে বীরের ন্যায় খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মস্রোতের সম্মুখে দণ্ডায়মান না হইলে আজ হিন্দুসমাজের বিশেষ দুর্গতি হইত, সন্দেহ নাই।

শিখ-সম্প্রদায়ের আদিগুরু নানক যেমন নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা প্রবর্ত্তিত করিয়া পঞ্চনদ-প্রদেশে যাবনিক ধর্ম্মের গতিরোধ করিয়াছিলেন, রাজা রামমোহন রায় সেইরূপ বেদ, উপনিষদ ও তন্ত্রোক্ত নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা প্রবর্ত্তিত করিয়া বঙ্গে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের গতিরোধ করিয়াছিলেন। গুরু-গোবিন্দ সিংহ যেমন হিন্দু ও যবন মিশাইয়া তাঁহার সম্প্রদায়কে একটি মহাশক্তিতে পরিণত করিয়াছিলেন—কেশব বাবুও সেইরূপ সর্ব্বজাতি মিশাইয়া বঙ্গের ব্রাহ্মসমাজকে সেইরূপ একটি মহাশক্তিতে পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। যদি কুচবিহারের বিবাহ-বিভ্রাটে ব্রাহ্মসমাজের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ উপস্থিত না হইত, তাহা হইলে তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু জগদম্বার ইচ্ছা অন্যরূপ হওয়ায় তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল না। তাঁহার মনোরথ অঙ্কুরে বিদলিত হইয়া গেল। ব্রাহ্মসমাজকে মহাশক্তিতে পরিণত করিবার জন্য তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন—ঘটনা-স্রোতে পড়িয়া তিনিই সেই সমাজকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তিনিই আদিসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ব্রাহ্মসমাজকে দ্বিধা-বিভক্ত করেন। আবার তিনিই স্ব-প্রতিষ্ঠাপিত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজকে দ্বিধা-বিভক্ত হইতে দিলেন। ইহাতে তাঁহার দোষ অধিক কি বিদ্রোহী-দলের দোষ অধিক—ইহার বিচার করা এ প্রবন্ধের লক্ষ্য নহে। তবে ইহা না বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে যে, তিনি ব্রাহ্মসমাজের সম্রাট্ হইয়া রামের ন্যায় প্রজারঞ্জন-ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারেন নাই। রামচন্দ্র সীতাকে পরম সতী জানিয়াও প্রজারঞ্জনানুরোধে পূর্ণ-গর্ভাবস্থায় নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন। কোন দেশের কোন রাজা প্রজারঞ্জনের এরূপ দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারেন নাই। সেই দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া, কেশব বাবুর ন্যায় মহামতি ধর্ম্মাচার্য্য কন্যার বিবাহে শিষ্যানুরঞ্জনার্থ আত্মত্যাগ দেখাইতে পারিলেন না—ইহা মহা ক্ষোভের বিষয় সন্দেহ নাই। তিনি ব্রাহ্মগণের বিবাহের জন্য যে তিন আইন (Act III of 1872) জারী করাইলেন—নিজের কন্যার বিবাহে তাহার অন্যথা করিলেন বলিয়া তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে বেদিচ্যুত করিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ-মন্দির হইতে বিদূরিত করিলে—তাঁহারা 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' আখ্যা ধারণ করিলেন। তিনি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য রহিলেন। অবশেষে তিনি সমাজের নাম 'নববিধান' প্রদান

করিয়া ইহার আচার্য্যপদে ব্রতী হইলে—ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকপদে প্রতিষ্ঠাপিত হইলেন। এইরূপে অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ স্রোতস্বিনী হিন্দুসমাজ-মন্দাকিনী হইতে উৎপন্ন হইয়া গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী ও গোদাবরী—এই চতুঃস্রোতে বিভক্ত হইয়া পড়িল। আদিসমাজ পূত-তোয়া গঙ্গা—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সাধনক্ষেত্র। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ কালিন্দী যমুনা নববৃন্দাবনকে পবিত্র করিয়া গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ অন্তঃসলিলা সরস্বতী। ইহার বাহ্য আড়ম্বর নাই বটে, কিন্তু ইহা ধীরে ধীরে একটি রাজনৈতিক ধর্ম্মসমাজের আকার ধারণ করিতেছে। সরস্বতীর বরপুত্রগণ প্রধানতঃ ইহার পৃষ্ঠপোষক। 'নববিধান' পুণ্যসলিলা গোদাবরী—ইহার বিস্তৃতি বিশাল ও লক্ষ্য মহৎ। কিন্তু ইহার স্থিতকাল সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ আছে।

নববিধান—স্বতন্ত্র ধর্ম্ম নহে—সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয় মাত্র। যে দিনে পৃথিবীতে সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় হইবে, সেই দিনেই পৃথিবীর সুখসমৃদ্ধি চরমসীমায় উপনীত হইবে। যুদ্ধ-বিগ্রহ—বিবাদ-বিসংবাদ—তখন থাকিবে না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহাকে বাইবেলে মিলেনিয়ম (Millennium) বলিয়াছে। খ্রীষ্টানেরা বিশ্বাস করেন যে, যীশু পুনর্ব্বার অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীর রাজা হইবেন—এবং সমস্ত পৃথিবীতে খৃষ্টধর্ম্ম প্রতিষ্ঠাপিত করিবেন। আর্য্যেরা সনাতন ধর্ম্ম প্রচার করিয়াও কখন ভাবেন নাই যে, তাঁহাদিগের সনাতন ধর্ম্ম সমস্ত পৃথিবীতে প্রচারিত হইবে। এই জন্য এই স্বধর্ম্ম ও পরধর্ম্মের উল্লেখ গীতাতে দেখিতে পাওয়া যায়—'স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ'—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ দিয়াছিলেন যে, স্বধর্ম্মে থাকিয়া বরং জীবন উৎসর্গ করিবে, সেও ভাল—তথাপি পরধর্ম্ম গ্রহণ করিবে না—কারণ, পর-ধর্ম্ম ভয়াবহ। কিন্তু কেশব বাবু সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় করিয়া যীশু ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেও উদারতায় পরাস্ত করিয়াছেন। কারণ, তাঁহার নিকট পরধর্ম্ম নাই—সকলই স্বধর্ম্ম। তৎপ্রচারিত 'নববিধান' সর্ব্বধর্ম্মকে কুক্ষিগত করিয়া বিশ্বরূপ ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছে। এই ভাব এত মহান্ ও সূক্ষ্ম যে, ইহাকে ধারণা করা সাধারণ লোকের কার্য্য নহে। যে কক্ষা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করে—তাহার পরিমাপ করে, কাহার সাধ্য? কত কত ছায়াপথ, গ্রহনক্ষত্রাদি, কত কত ধূমকেতু আপন আপন কক্ষায় ইহার অভ্যন্তরে যে ভ্রাম্যমাণ হইতেছে—তাহা চিন্তারও অগম্য। ব্রহ্মবিন্দুর তত্ত্ব যাঁহারা জানিতে পারিয়াছেন—তাঁহারা সমাধিযোগে এই মহাকক্ষার কিছু সন্ধান পাইলেও পাইতে পারেন। কিন্তু বিজ্ঞান ইহাকে কোন কালেই আয়ত্ত করিতে পারিবে না। অযোগী ব্যক্তিও কখন ইহার সন্ধান পাইবে না। সেইরূপ একটি ধর্ম্মের গূঢ়-তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে যখন একটি জীবনে কুলায় না, তখন সর্ব্বধর্ম্মতত্ত্বকে আয়ত্ত করিয়া তাহার মীমাংসা করা যে যে-সে ব্যক্তি-বিশেষের সাধ্যায়ত্ত, তাহা আমাদের ধারণা হয় না। তবে কেশব বাবুর ন্যায় যোগারূঢ় ও অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তির পক্ষে ইহা অসাধ্য, এ কথা আমরা বলিতে পারি না। তাঁহার সাধ্য হইলেও তাঁহার সম্প্রদায়স্থ সমস্ত ব্যক্তির ইহা সাধ্যায়ত্ত, এ কথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। যদি তাহা না হয়—তাহা হইলে এরূপ বিশ্বরূপ ধর্ম্মপ্রচার দ্বারা জগতের বিশেষ কি শুভ সম্পাদিত হইবে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। তবে কেশব বাবুর কল্পনায় এরূপ একটি প্রকাণ্ড ব্যাপার আসিয়াছিল বলিয়া তাঁহার প্রতি আমাদের ভক্তি গাঢ়তর হইয়াছে মাত্র। তিনি যে জীবন্মুক্ত, ইহা তাঁহার বিশেষ পরিচায়ক। তিনি শিষ্যগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া নিঃসঙ্গ যোগতাপস না হইলে তাঁহার কল্পনায় এরূপ সূক্ষ্ম অথচ মহান্ বিশ্বরূপ ধর্ম্মের আবির্ভাব হইতে পারিত না। ব্রহ্ম বিশ্বব্যাপী, সুতরাং অতীন্দ্রিয়। যাহা বিশ্বব্যাপী, তাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতে পারে না। কারণ, তাহা মহান্ হইতেও সূক্ষ্মতম। সেইরূপ যে ধর্ম্ম বিশ্বরূপ, তাহার স্বতন্ত্র স্বরূপ কেহ দেখিতে পাইবে না। সুতরাং সে ধর্ম্ম সাধন-ভজন ও ক্রিয়াকলাপের উপযোগী হইতে পারে না।

কেশব বাবু স্বরূপতঃ তান্ত্রিক যোগী ছিলেন। কারণ, তিনি ভোগ ও যোগ উভয়কেই আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। জনকাদির ন্যায় তিনি সম্ভোগের মধ্যে থাকিয়াও পরম যোগী ও ব্রহ্মজ্ঞ ছিলেন। বৈদিক সন্ন্যাসে কামিনী-কাঞ্চন বর্জ্জিত হইয়াছে,

কিন্তু তান্ত্রিক সন্ন্যাসে কামিনী-কাঞ্চন সাধনার উপকরণ-সামগ্রী বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। "বিকারের কারণ থাকিতে যাঁহাদিগের চিত্ত বিকৃত না হয়, তাঁহারাই প্রকৃত বীর।" * এই উপদেশের মর্ম্ম গ্রহণ করিলে উপলব্ধি হইবে যে, বর্জ্জনে পূর্ণ পরীক্ষা দেওয়া হইতে পারে না। যাহারা ভোগ করিয়াও ভোগে আসক্ত হন না—তাঁহারাই সিদ্ধপুরুষ। কালিদাস রঘুবংশে লিখিয়াছেন যে, রঘুবংশীয় রাজারা 'অসক্তঃ সুখমন্বভূৎ'—অনাসক্ত হইয়া সুখভোগ করিতেন। ইহা মহাভোগের অবস্থা। কিন্তু সে ভোগ বৈধ হওয়া চাই। কেশব বাবু ভোগী হইলেও—অবৈধ ভোগশীল ছিলেন, এ কথা কেহ কখনও বলে নাই—বলিতেও পারে না। কেশব বাবুর ন্যায় জটিল চরিত্র কেবল যোগিজনেরাই ধারণা করিতে পারেন। অযোগী জনে কখন তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই—পারিবেও না। এই মহাপুরুষকে আমি বার বার নমস্কার করি।

সাংসারিক ভোগী যে দ্রব্য একবার ভোগ করেন, তাহার আস্বাদ ভুলিতে না পারায় সেই দ্রব্য পুনঃ পুনঃ ভোগ করিবার ইচ্ছা করিয়া থাকেন। ইহাতে অনন্ত বাসনার সৃষ্টি হয়। জন্ম বাসনামূলক। এ জন্মে যদি সমস্ত বাসনা পূর্ণ না হয়, তাহা হইলে অতৃপ্ত বাসনা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য তাহার পুনরাবৃত্তি বা পুনঃ পুনঃ জন্ম হইবে। কিন্তু যিনি আস্বাদিত বিষয়ে অনাসক্ত ও অনাস্বাদিত বিষয়ে বাসনাহীন, এরূপ ব্যক্তি সংসারে অতি দুর্লভ। † প্রথম শ্রেণীর লোককে বুভুক্ষু কহে এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর লোককে মুমুক্ষু কহে। সংসারমধ্যে বুভুক্ষুর ন্যায় মুমুক্ষু ব্যক্তির সংখ্যাও অল্প নহে। কিন্তু যাঁহারা ভোগ-মোক্ষ-বাসনা-শূন্য, এরূপ মহানুভব ব্যক্তির সংখ্যা সংসারে আরও বিরল। ‡ এরূপ ব্যক্তির বন্ধমোক্ষ থাকিতে পারে না। কিন্তু এই শেষ অবস্থায় আসিবার ক্রম আছে। ভোগ ব্যতীত ভোগের বাসনার লয় হয় হয় না। এই বিষয় লইয়া বেদে ও তন্ত্রে মতভেদ আছে। বেদ বলেন, 'ন তেন কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে।' কাম্য বস্তুর উপভোগের দ্বারা কামনা নিবৃত্ত হয় না। ঘৃতাহুতি দিলে অগ্নি যেমন অধিকতর প্রজ্বলিত হয়, সেইরূপ জ্ঞানাঙ্কুশ দ্বারা কামনা দমন না করিয়া কাম্য বস্তুর ভোগ করিলে, কামনা দিন দিন বাড়িতে থাকে। তন্ত্রের মত "কণ্টকেনৈব কণ্টকম্।" কণ্টক দ্বারাই কণ্টক উত্তোলিত করিতে হইবে, 'বিষস্য বিষমৌষধম্'—বিষের ঔষধ বিষই। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের সঙ্গে তান্ত্রিক সাধনার অনেক সাদৃশ্য আছে। কিন্তু এলোপ্যাথিক ও কবিরাজী ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। কোন্ চিকিৎসা-প্রণালী বা কোন্ সাধন প্রণালী শ্রেষ্ঠ, তাহার সমালোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। তবে এইমাত্র বক্তব্য যে, কেশব বাবু প্রকৃতিতঃ তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। তিনি প্রথম বুভুক্ষু, পরে বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু, তৎপরে মুমুক্ষু—এবং সর্ব্বশেষে ভোগমোক্ষ-নিরাকাঙ্ক্ষা হইয়াছিলেন। এই শেষ অবস্থায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। পরমহংস দেব তাঁহাকে বাগানে দেখিয়া প্রথম বলিয়াছিলেন যে, 'এরই ল্যাজ খসেছে।' এই কথা শুনিয়া সভা-শুদ্ধ লোক হাসিয়া উঠিয়াছিলেন—কিন্তু কেশব বাবু তাঁহাদিগকে স্থির হইতে বলিয়া পরমহংস দেবকে ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করায়, তিনি তদুত্তরে বলিয়াছিলেন—'যতদিন বেঙাচির ল্যাজ না খসে, ততদিন সে কেবল জলে থাকে, পাড়ে উঠে ডেঙ্গায় বেড়াইতে পারে না। কিন্তু যেই তার ল্যাজ খসে, অমনি সে লাফ দিয়া ডাঙ্গায় পড়ে। তখন সে জলেও থাকে, আবার ডাঙ্গাতেও থাকে। তেমনই মানুষ যত দিন অবিদ্যার ল্যাজ না খসে, তত দিন সংসার-জলে প'ড়ে থাকে! অবিদ্যার ল্যাজ খস্‌লে, জ্ঞান হ'লে, তবে মুক্ত হয়ে বেড়াতে পারে। আবার ইচ্ছা হ'লে সংসারেও থাকতে পারে।' ইহাই প্রকৃত জীবন্মুক্ত অবস্থা। ভগবান্ রামকৃষ্ণ অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহাকে বিশদীকৃত করিয়াছেন। বেঙাচির লেজ যেমন তাহার তীরে উঠিবার অন্তরায়, সেইরূপ মানুষের বাসনা তাহার ঊর্দ্ধগতির রোধক। ল্যাজ খসিলে বেঙাচি যেমন ইচ্ছামত জলেও থাকিতে পারে, স্থলেও উঠিতে পারে—সেইরূপ বাসনা নিবৃত্ত হইলে মানুষও ইচ্ছামত সংসারে থাকিয়াও সংসারাতীত

* বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ।—কুমারসম্ভবম্।

† বস্তুভোগেষু ভুক্তেষু ন ভবত্যধিবাসিতঃ।
অভুক্তেষু নিরাকাঙ্ক্ষী তাদৃশো ভবদুর্লভঃ॥

‡ বুভুক্ষুরিব সংসারে মুমুক্ষুরপি দৃশ্যতে।
ভোগমোক্ষনিরাকাঙ্ক্ষী বিরলো হি মহাশয়ঃ॥
—অষ্টাবক্র-সংহিতা। সপ্তদশ প্রকরণম্। ৪।৫

হইতে পারেন। পদ্মপত্রস্থিত জলের ন্যায় তখন তাঁহারা সংসারে লিপ্ত থাকিয়াও সংসারে লিপ্ত নন।

এরূপ মহাপুরুষের সংখ্যা জগতে অতি বিরল। এ অবস্থায় ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—জীবন, মরণ—কিছুরই উপর হেয়োপাদেয়তা জ্ঞান থাকে না। সংসার বিনষ্ট হউক, ইহাও তাঁহার ইচ্ছা নহে, আবার সংসারের স্থিতিবিষয়েও তিনি উদাসীন। জীবিকানির্ব্বাহার্থ যৎকিঞ্চিৎ যাহা প্রাপ্ত হন, তিনি তাহাতেই সুখে কালযাপন করিয়া থাকেন।* এই প্রভাব ব্যক্তিই ধন্য। মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন এই দশায় উপনীত হইয়াছিলেন বলিয়াই তিনি ধন্য ও জগন্মান্য। তাঁহাকে আমরা বার বার নমস্কার করি। তিনি অনুরাগিণী স্ত্রী ও মৃত্যুকে সমচক্ষুতে দেখিতেন বলিয়া তাঁহাকে আমরা মুক্তপুরুষজ্ঞানে বার বার নমস্কার করিতেছি। হে দেব! তুমি আমার পূজা গ্রহণ কর। ওঁ শান্তি!

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু জীবিতে মরণে তথা।
কস্যাপ্যুদারচেতস্য হেয়োপাদেয়তা ন হি॥

বাঞ্ছা ন বিশ্ববিলয়ে ন দ্বেষস্তস্য ন স্থিতৌ।
যথা জীবিকয়া তস্মাদ্ধন্য আস্তে যথাসুখম্॥

* সানুরাগাং স্ত্রিয়ং দৃষ্ট্বা মৃত্যুং বা সমুপস্থিতম্।
অবিহ্বলমনাঃ স্বস্থো মুক্ত এব মহাশয়ঃ॥

—অষ্টাবক্রসংহিতা—সপ্তদশপ্রকরণম্।৬-৭।১৪।

সমাপ্ত

চিন্তা তরঙ্গিণী

যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

মুখবন্ধ

আর্য্যদর্শনে সম্পাদকীয় যে সকল রাজনৈতিক, সমাজ-নৈতিক ও ধর্ম্মনৈতিক অথবা ঐ তিন প্রকার ভাবমিশ্রিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহারই কতকগুলি দ্বারা "চিন্তাতরঙ্গিণী"র সৃষ্টি হইল।

পাঠক-পাঠিকা দেখিবেন, প্রাগুক্ত সম্যগালোচিত প্রবন্ধরাজির কোন স্থলে সহৃদয় লেখক সমাজের বর্ত্তমান দুরবস্থায় আন্তরিক ব্যথিত হইতেছেন, কোথাও বা উহার পূর্ব্বতন সুশৃঙ্খলার বিনয় সুন্দর বিবৃত করিতেছেন, অথবা প্রাচীন অবস্থা স্মরণ করাইয়া সমাজসংস্কারকগণের দৃষ্টিহীনতা আরোগ্যের ব্যবস্থা করিতেছেন, কুত্রাপি বা হৃদয়ের নেপথ্য হইতে রাজনীতির গূঢ় ভাব পরিব্যক্ত করিতেছেন, কোথাও স্বদেশের গভীর অধঃপতনের জন্য অনুশোচনা করিতেছেন, জন্মভূমির গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য প্রাণে প্রাণে সম্মিলিত হইতে সকলকে অন্য কোন প্রকারে অনুরোধ না করিয়া সহোদর-প্রতিম স্বদেশবাসিগণের হস্ত ধারণ করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন, অন্যত্র বা ধর্ম্মনীতির মূলসূত্র ব্যাখ্যা করিতেছেন।

এক্ষণে ওজস্বিতা, প্রাঞ্জলতা, ভাবের বিশালতা ও গাম্ভীর্য্য, বর্ণনার সমীচীনতা এবং আলোচনার দূরদর্শিতা দ্বারা এই তরঙ্গিণীর কলেবর পরিপুষ্ট হইয়াছে কি না, তাহা উদার-হৃদয় ও নিরপেক্ষ পাঠকপাঠিকাগণই বিবেচনা করিবেন।

পরিশেষে বক্তব্য, এই চিন্তাতরঙ্গিণীর প্রবল স্রোতে আবর্জ্জনা-রাশি ভাসিয়া গিয়া যদি কোন হৃদয়-ক্ষেত্র উর্ব্বরত্ব প্রাপ্ত হইয়া বীজধারণে সমর্থ হয়, তবেই সাক্ষাৎসম্বন্ধে সঙ্কলয়িতার এবং পরোক্ষে লেখকের তাবৎ শ্রম সার্থক বিবেচিত হইবে।

কলিকাতা।

চৈত্র, সন ১২৯৬ সাল।

সঙ্কলয়িতা ও প্রকাশক
শ্রীননীগোপাল মুখোপাধ্যায়।

চিন্তা তরঙ্গিণী

আহ্বান

আর যে পারি না। এ দুর্ব্বহ যন্ত্রণাময় জীবন আর যে বহিতে পারি না! যে চাকরীতে আমাদের দেশ মাতিয়া রহিয়াছে, সে চাকরীর মদে আমার মন মত্ত হইতেছে না কেন? আমার মন সর্ব্বদা হু হু করে কেন? আমার প্রাণ সর্ব্বদা কাঁদে কেন? অন্তরে সর্ব্বদা রাবণের চিতা জ্বলিতেছে কেন? খুনী আসামীর অন্তরের যে নিরন্তর অন্তর্দ্দাহী যাতনা, তাহা আমি ভোগ করি কেন? উচ্চপদের পোষাক পরিয়া সকলেই অহঙ্কারে টলমল হইয়া হাসিয়া খুসিয়া আমোদ-আহ্লাদে নিতান্ত বিভোর হইয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু সে পোষাক আমার শেল বোধ হইতেছে কেন? শ্বেতচরণে অঞ্জলি দিতে কত পোষাক-ধারী নবীন উৎসাহে মাতিয়া বেড়াইতেছে; কিন্তু সে দৃশ্যে আমার হৃদয়-গ্রন্থি ছিন্ন হয় কেন? মধুর সঙ্গীত শুনিয়া আর সকলের মন আহ্লাদে নাচিয়া উঠে, কিন্তু আমার মন কাঁদিয়া উঠে কেন? সকলের মুখে গাল ভরা হাসি, কিন্তু আমার চক্ষে ফল্গুর অন্তর্বাহিনী ধারা কেন? অন্তঃস্থিত বজ্রের স্ফুরণে সকলকেই চমকিত করিতে—তাহার প্রহারে নিরুপায় স্বদেশীয়ের মস্তক চূর্ণীকৃত করিতে, আমাদের দলের বড় আমোদ, কিন্তু তাহাতে আমার হৃদয় কাতর হয় কেন? দলে দলে বসিয়া বৃথা জল্পনায়, পরের নিন্দায় সকলেই মনের স্ফূর্ত্তিতে জীবন কাটাইতেছে, কিন্তু আমার হৃদয় বিষাদে পূর্ণ কেন? বিলাতী পরিচ্ছদে দাস-দেহ বিভূষিত করিয়া বিলাতী চর্ব্ব্য-চোষ্যে লেলিহমান রসনাকে পরিতৃপ্ত করিয়া ও বিলাতী পেয়ে দুর্ব্বল মস্তিষ্ককে বিঘূর্ণিত করিয়া, বঙ্গীয় যুবক আনন্দে কেমন জ্ঞানশূন্য! কিন্তু কি পাপে এ দৃশ্যে তুষানলে আমার হৃদয় দগ্ধ হয়? এ বিশ্বব্যাপী আনন্দে—এ সর্ব্বগ্রাসী আমোদ আহ্লাদে আমি যোগ দিতে পারি না কেন? চতুর্দ্দিকে শ্বেতাননের পূজার ঘোর ঘটা। ভ্রাতৃবৃন্দ ভক্তিতে গদ্‌গদচিত্ত;—পঞ্চ আননে শ্বেতাননের স্তব করিতেছেন, বাছিয়া বাছিয়া পুষ্প চয়ন করিয়া চরণে অঞ্জলি দিতেছেন, ধূপ-ধুনা-গুগ্‌গুলের গন্ধে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত। লম্বোদর উপাসকগণ শঙ্খ-ঘণ্টা বাদন করিতেছেন; অণ্ড হইতে ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় জীব বলি পড়িতেছে, বেতনের পরিমাণের বা আশার অনুরূপ নৈবেদ্যের আয়োজন হইতেছে! দেবদেবীর প্রসাদ ভক্তেরা ভক্তিভাবে কিঞ্চিৎ ভক্ষণ করিতেছেন। আনন্দের সীমা নাই; যেন ভারতে কি সৌভাগ্যের দিন উপস্থিত হইয়াছে। যেন আট শত বৎসরের পর ভারতের অদৃষ্ট-গগনে আবার সৌভাগ্য-সূর্য্য সমুদিত হইয়াছে! এমন উৎসবের সময় আমার প্রাণ কাঁদে কেন? কাঁদে কেন, কাহাকে বলিব? যাঁহাদের জন্য কাঁদিতেছে, তাঁহারাই যে উৎসবে উন্মত্ত। তাঁহারাই যে দেবযাত্রায় সঙ সাজিতে বিশেষ মজবুৎ। শ্বেত-দেবতার সন্তোষার্থ তাঁহারা বহুরূপী হইয়া পড়িয়াছেন। কখন রাজা, কখন রায় বাহাদুর, কখন ডেপুটী, কখন চাপরাসী, নানা রূপ ধারণ করিতেছেন। পরকে ভুলাইবার জন্য সঙ সাজুন, তাহাতে আপত্তি নাই; কিন্তু সঙ সাজিতে সাজিতে ক্রমে আসল সঙ হইয়া দাঁড়াইতেছেন, ইহাই যে সর্ব্বনাশের মূল। তাঁহাদের জীবনের কোন লক্ষ্য নাই—অথবা লক্ষ্য নাই বা কেমন করিয়া বলি? নিজের বেতন বৃদ্ধি, নিজের বেশ-ভূষা, নিজের আসবাব, নিজের ভোজন-পারিপাট্য প্রভৃতিই তাঁহার জীবনের সর্ব্বগ্রাসী লক্ষ্য। তাঁহার স্বজাতি নাই, স্বদেশ নাই,

আত্মীয়-স্বজন নাই; জ্ঞাতি নাই, কুটুম্ব নাই—আত্মাই তাঁহার সর্ব্বস্ব। 'স্বদেশ রসাতলে যাউক, স্বজাতি ধ্বংস হউক, আত্মীয়-স্বজন, জ্ঞাতি-কুটুম্ব অনাহারে মরুক—সে সকল ভাবনা ভাবিয়া মাথা ঘুরাইতে পারি না। যাহারা পাগল, তাহারা ও সকল ভাবনা ভাবুক'—তাঁহার স্বার্থসর্ব্বস্ব মন এই বলিয়া কথঞ্চিৎ আত্ম-গ্লানির হস্ত এড়াইয়া থাকে। 'ড্যাম খুড়া, জেঠা, মামা, খুড়ী, জেঠী, মাসী, তাঁহারা বসিয়া থাকিবেন, আর আমরা কপালের ঘাম পায় ফেলিয়া নিজের সুখে জলাঞ্জলি দিয়া তাঁহাদিগকে খাওয়াইব—আলস্যের ভরা পূর্ণ করিব—এ'ত পারি না' এই বলিয়া তিনি নিজের স্বার্থ-অন্ধ চরিত্রের সমর্থন করিয়া থাকেন। যখন তিনি অসংখ্য ডিস্-শোভিত টেবিলের পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার চামচ-কণ্টকীর সঞ্চালনে ব্যতিব্যস্ত হয়েন, তখন স্বর্গ যেন তাঁহার করতলস্থ হয়। সে সুখ ছাড়িয়া কে স্বজাতি-গৌরব ও স্বদেশানুরাগ লইয়া বৃথা সময় কাটাইবে? 'যে সকল উন্মত্ত যুবকের খাইয়া দাইয়া আর কাজ নাই, তাহারা ঐ সকল পাগ্‌লামী লইয়া থাকুক'—বিলাতী লোহিত জলে যখন মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হয়, মহম্মদী ডিমের সর্ব্বসঞ্চারি-রস যখন রসনা গলিয়া যায়, তখন বঙ্গীয় যুবকের মুখে এই সব মর্ম্মভেদী কথা শুনিতে পাওয়া যায়। যে সকল যুবক বিদ্যামন্দিরের উচ্চতম সোপানে উঠিয়াও আজকাল কর্ম্মাভাবে অন্ন বিনা মারা যাইতেছেন, আমরা তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া এ কথা বলিতেছি না। তাঁহাদিগের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। তাঁহাদিগের শুষ্ক রসনায় এরূপ তেজের কথা বাহির হইতে পারে না। যাহারা বিদ্যার জোরে বা মুরুব্বীবলে হাকিমী পাইয়াছেন, বা ওকালতীতে সাইন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মুখেই এইরূপ কথা শুনিতে পাই। অদৃষ্টের কথা কি বলিব? যাঁহারা জনক-জননীর চক্ষু অন্ধ করিয়া, প্রিয়তমাকে পাগলিনী করিয়া, সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া বিদ্যাশিক্ষার জন্য বিলাতে গমন করেন, সকলেই আশা করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা বিলাতী তেজ, বিলাতী স্বাধীনতা-স্পৃহা লইয়া আসিয়া নিস্তেজ ভারতের শিরায় শিরায় সেই সকল সংক্রামিত করিবেন—পাশ্চাত্য বিজ্ঞানালোকে আঁধার ভারতের লুপ্ত-গৌরব পুনরুদ্ধার করিবেন; কিন্তু হায়! কি পাপে আমরা তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে দেখিতে পাই? তাহারা দেশকে ভুলিবেন কি? বিলাত হইতে দেশে পদার্পণ করিয়াই তাঁহাদিগের মনে যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। হোম্ (Home) ছাড়িয়া আসিয়াছেন বলিয়া, তাঁহাদিগের মন হু হু করিতে থাকে। বাঙ্গালীর অর্দ্ধাচ্ছাদিত দেহ দেখিয়া তাঁহারা লজ্জায় অধোবদন হয়েন! ভাই-বন্ধুর গায় জামা নাই, পায় মোজা নাই, পেণ্টুলেন-কোট পরা নাই দেখিয়া তাঁহারা তাঁহাদিগের সহিত একত্র বাস করিতে, তাঁহাদিগের সহিত মিশামিশি করিতে, অধিক কি, ভাই-বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিতেও লজ্জা বোধ করেন। 'আমি জজ, আমি ম্যাজিষ্ট্রেট্, আমি সিবিল্ সার্জ্জন, আমি ব্যারিষ্টার—আমার বাপ, আমার ভাই, আমার বন্ধু অর্দ্ধাবৃত-দেহে বাড়ীতে থাকে, আসনে বসিয়া আঙ্গুল চাটিয়া অসভ্যের মত ভাত খায়, অসজ্জিত ঘরে সামান্য শয্যায় শয়ন করে, এ ত প্রাণে সহে না—কেমন করিয়া ইহাদিগের বাপ, ভাই, বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিব? কেমন করিয়া এ লজ্জার কথা সাহেবের কাছে বলিব? সাহেব ইহা টের পাইলে যে আর দলে মিশিতে দিবে না!' এই সকল চিন্তায় বিলাত-ফেরত বাঙ্গালী আকুল। তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়া অনন্যোপায় হইয়া শেষে তফাৎ থাকাই শ্রেয়ঃ মনে করেন।

এ দিকে জমীদার-শ্রেণী বিলাসিতার ক্রোড়ে চিরলালিত। পরের দুঃখে তাঁহার প্রাণ কাঁদে না। কেন না, অভাব কি পদার্থ, তিনি জানেন না। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত তিনি তোষামোদকারিগণেই পরিবেষ্টিত। তাহাদিগের মুখ-নিঃসৃত যশঃ-সৌরভে তাঁহার চিত্ত সতত আমোদিত! তাহাদিগের মুখে তিনি ধর্ম্মে যুধিষ্ঠির, বিক্রমে ভীম, দানশৌণ্ডে দাতাকর্ণ, বুদ্ধিতে বৃহস্পতি, বিদ্যায় তর্কপঞ্চানন! তিনি সর্ব্বগুণের আধার। তাঁহার এমন বন্ধু নাই যে, তাঁহার দোষ দেখাইয়া দেয়, অথবা বন্ধু থাকিলেও, তাঁহার সাহস হয় না যে, তাঁহাকে তাঁহার দোষ দেখাইতে পারেন। কারণ, তাহা হইলে বন্ধু তৎক্ষণাৎ তাঁহার দরবার হইতে নিষ্কাশিত হইবেন। তিনি হাই তুলিলেন,

সকলে একসঙ্গে তুড়ি দিতে লাগিল। মাথা ধরিলে সকলে একবাক্যে আহা করিয়া উঠিল। এইরূপে তিনি ক্রমে ক্রমে একটি জড়পিণ্ডবৎ হইয়া উঠেন। তাঁহার নিজের ভাবনা ভাবিতে হয় না। কারণ, তাঁহার পর্য্যাপ্ত ধন আছে। পরের জন্য কিরূপে ভাবিতে হয়, সে শিক্ষাও তিনি পান না। তিনি ক্রমে স্বার্থ-পরার্থ-বিহীন এক মুক্তপুরুষ হইয়া উঠেন, কিন্তু পূর্ণ মুক্তি তাঁহার অদৃষ্টে নাই। তিনি সকল বিষয়ে নিস্পৃহ হইয়াও এক বিষয়ে স্পৃহাবান্। তিনি উপাধি-ভিখারী—এই জন্য তিনি শ্বেতাননের উপাসক। তাঁহার যথা-সর্ব্বস্ব দিয়াও যদি একটি উপাধি কিনিতে পারেন, তিনি তাহাতেও কুণ্ঠিত নহেন। পরের দুঃখে তাঁহার হৃদয় কাঁদে না, আপনা হইতে সুতরাং পরের দুঃখমোচনের তিনি এক পয়সা দিতে প্রস্তুত নহেন। তবে শ্বেতাননের ইঙ্গিতে তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা দিতে প্রস্তুত। কি বিষয়ে অর্থব্যয় হইবে, তাহা তিনি জানিতে চান না, শ্বেত-দেবতার তুষ্টি-বিধানই তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য সিদ্ধ হইলেই তিনি চরিতার্থ। কালেজ কর, দুর্ভিক্ষে ব্যয় কর, খাল কাটাও, রাস্তা কর, অথবা আপনারা খাও—কিছুতেই তাঁহার আপত্তি নাই। তাঁহার পক্ষে সবই সমান। শ্বেতানন! তবে তিনি কেবল তোমার নিকট এক বিষয়ের ভিখারী। তিনি তোমার নেক-নজর-প্রার্থী। তুমি কৃপা করিয়া তাঁহাকে একটি উপাধি দেও। পতনোন্মুখ রোম-সাম্রাজ্যের ন্যায় তুমিও উপাধিদান-বিষয়ে মুক্তহস্ত। তোমার কটাক্ষপাতে যখন দীন-দুঃখীও রাজা হইতেছে, তখন যাহাদের কিঞ্চিৎ আছে, তাহারা কেন বঞ্চিত হইবে?

এইরূপ অন্তসার-শূন্য, নির্লক্ষ্য, আপাতঃ-ভোগ-তুষ্ট, ভাবিদর্শন-বিরহিত, স্বার্থমোক্ষ জড়পিণ্ডসকল লইয়া তাহাদের সমাজ গঠিত। তাহার জন্যই বৈদেশিকেরা আমাদিগকে ক্রীড়াপুত্তলীর ন্যায় যে দিকে ইচ্ছা ও যে প্রকারে ইচ্ছা সঞ্চালিত করিয়া থাকেন। এই জন্য আমাদের জাতীয় জীবন নাই, জাতীয় গৌরব নাই, জাতীয় মমতা নাই। বৈদেশিকেরা আমাদিগকে কুক্কুরের ন্যায় ঘৃণা করিয়া থাকেন। তাঁহারা জানেন—আজ জুতা-লাথি খাইলেও, কাল আসিয়া হাজির হইবে; যাহারা স্বার্থপর, তাহারা স্বার্থের জন্য সমস্ত সহিতে পারে। তাহাদিগের মান-অপমান-বোধ নাই, স্বজাতিপ্রেম ও স্বদেশানুরাগ নাই, লজ্জা নাই, ঘৃণা নাই, আত্মগ্লানি নাই। তাহারা কিঞ্চিৎ বেতনবৃদ্ধির জন্য—একটি উপাধি পাইবার জন্য, কখন কখন শুদ্ধ ভবিষ্য স্বার্থসিদ্ধির আশায়—বৈদেশিকের চরণে জাতীয় স্বার্থ ব'ল দিতে পারে। তাহাদিগের উপযাচক হইয়া স্বদেশীয় ভ্রাতার ভুল ধরিয়া, কার্য্যের ত্রুটি দেখাইয়া, তাহার নিন্দা করিয়া বৈদেশিকের প্রীতিভাজন হইতে লজ্জা বোধ হয় না। তাহাদিগের প্রভুর ফটোগ্রাফ মাথায় করিয়া দাসীকে (পত্নীকে) দেখাইবার জন্য গৃহে লইয়া যাইবার অনুমতি ভিক্ষা করিতে ঘৃণা বোধ হয় না। তাহাদিগের—আমি তোমার গোলামের গোলাম, আমার চৌদ্দপুরুষ তোমার গোলাম—ইত্যাদি লজ্জাকর স্তুতি-বাক্যে প্রভুর মনস্তুষ্টিবিধানে আত্মগ্লানি উপস্থিত হয় না।

আর কত বলিব? এ মর্ম্মভেদী কাহিনী যে আর গায়িতে পারি না। এ আত্মগ্লানিকর জাতীয় দুর্গতির কথা লেখনীতে আর যে লিখিতে পারি না! এই সকল জাতীয় অগৌরবের ইতিহাস আর যে প্রচার করিতে পারি না! বুক যে ফাটিয়া যাইতেছে! চক্ষু দিয়া যে রক্ত বাহির হইতেছে! কাহার নিন্দা করিতেছি? যাহার নিন্দা করিতেছি, সে যে আমার প্রাণ! আমি যে পৃথিবীতে আর কিছু জানি না! ভারতবাসিন্! তুমিই যে আমার জীবন-সর্ব্বস্ব! আমার ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—সবই যে তুমি। তবে কেন নিন্দা করিতেছি? ভাই! প্রাণাধিক! তোমার নিন্দা সহিতে পারি না বলিয়াই তোমার দোষ দেখাইয়া দিতেছি। ক্ষমা কর। আমার তিরস্কারের উদ্দেশ্য বুঝিয়া আত্ম-সংশোধন কর। তুমি যে চিরদিন বৈদেশিকের চরণে দলিত হইবে, ইহা আমি দেখিতে পারিব না, এই জন্য ক্ষত-স্থান দেখাইয়া দিতেছি। ক্ষত-স্থান বাড়িতে দিও না। সঞ্জীবনী ঔষধ প্রয়োগ কর। আবার জাতীয় জীবন পাইবে! এখন আমাদের সময় নয়। উন্মত্তের ন্যায় নির্লক্ষ্য হাসি হাসিয়া দিন কাটাইও না। জাতীয় তরী ডুবুডুবু হইয়াছে, এখন নৃত্য রাখ। একার কাজ নয়।

আইস—আমরা বিংশতি কোটি মিলে জল ছেঁচিতে আরম্ভ করি। যে জল ঢুকিয়াছে, কত দিনে তাহা ছেঁচিয়া উঠিতে পারিব, বলিতে পারি না, তবে 'কালস্য কুটিলা গতিঃ।' কে বলিতে পারে যে, আমরা একদিন ছেঁচিয়া উঠিতে পারিব না? ঐ দেখ, প্রাচ্যে নগণ্য জাপান ঠেলিয়া উঠিতেছে! ঐ দেখ, প্রতীচ্যে পতিত ইতালী আবার উঠিয়াছে! তবে কেন ভয়? মিলে সব ভাই একমনে একপ্রাণে স্বদেশের সাধি কাজ! ভাই ভাই গানে এস মাতাই ভারত!

হিন্দুসমাজ-সংস্কার

প্রথম প্রস্তাব

'হিন্দু-সমাজ'—এই শব্দ শুনিলে মনে নানা প্রকার ভাবের আবির্ভাব হয়। আত্মাভিমান, আনন্দ, শোক, দুঃখ ও বিষাদ যুগপৎ উপস্থিত হইয়া মনকে বিক্ষোভিত করে। যখন 'কি ছিলাম' এই ভাব মনে উদিত হয়, তখন আত্মাভিমান ও উচ্ছ্বসিত আনন্দোচ্ছ্বাসে মন আপ্লুত হয়। কিন্তু পরক্ষণেই 'কি হইয়াছি' যখন এই ভাব মনে উদিত হয়, তখনই প্রতিক্রিয়াবলে শোক, দুঃখ ও বিষাদ আসিয়া মনতটিনীর সে উচ্ছ্বাস শুষ্ক করিয়া ফেলে। কেন ভাবি, কেন কাঁদি, জানি না। কারণ, যাহার জন্য ভাবি—সে ত তার জন্য ভাবে না। তবে কেন নির্জ্জনে বসিয়া এ অশ্রুপাত? তবে কেন রজনীর অন্ধকারে শয্যা ছাড়িয়া করতলে কপোল রাখিয়া শুষ্ক ভাবনায় দেহ-মন জর্জ্জরিত করি? আমি কে? এই প্রকাণ্ড হিন্দুসমাজের একটি পরমাণু মাত্র। আমি ভাবিয়া কি করিতে পারি? নগণ্য আমি—আমার কথাই বা অগণ্য হিন্দুসন্তান কেন শুনিবে? সব বুঝি, কিন্তু অবোধ মন, বুঝিয়াও বুঝিতে চাহে না—তাই আজ ভ্রাতৃবৃন্দসকাশে হৃদয়ের ক্রন্দন লিপিবদ্ধ করিয়া জানাইতে উদ্যত হইলাম।

কেন আমরা আজ এমন হইলাম? কেন আজ এই অসংখ্য কোটি মানব কতিপয়মাত্র শ্বেত পুরুষের ক্রীড়নকস্বরূপ হইয়া রহিয়াছি? যে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ একদিন অসংখ্য মানবকে সুশীতল ছায়াদানে স্নিগ্ধ করিত, আজ কেন সে গলিতপত্র ও শুষ্কদেহ? যে মহীরুহ দিগন্তপ্রসারী শাখাবাহু দ্বারা একদিন সমস্ত জগৎকে আলিঙ্গন করিত আজ সেই মহীরুহ এরূপ বিশাখ ও শুষ্ক কেন? সে জগদ্ব্যাপী প্রেমভাব আজ আকুঞ্চিত কেন? কবে ইহার এ দশা ঘটিল? কে করিল? কোন্ পাপে ঘটিল?

অথবা জন্ম, পরিপাক ও মৃত্যু—জড় অজড় সকলেরই ধর্ম্ম। জন্মের পর পরিপাক, পরিপাকের পর মৃত্যু—আবার মৃত্যুর পর পুনর্জ্জন্ম, আবার পরিপাক, আবার মৃত্যু—জগতের চরম পরিস্ফুটনের জন্য এরূপ পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তন একান্ত প্রয়োজনীয়। হিন্দুসমাজের জন্ম, পরিপাক ও মৃত্যু হইয়া গিয়াছে—আবার সেই চিতাভস্মের মধ্য হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সকল দেখা যাইতেছে।

এ সময় স্থির থাকা যায় না। স্থির থাকাও উচিত নহে। আবার আমাদিগকে উঠিতে হইবে। আবার আমাদিগকে একটি প্রকাণ্ড জাতিরূপে পরিণত হইতে হইবে। আমরা কি ছিলাম, কি উপায়ে আমরা তত বড় হইয়াছিলাম, কি কি কারণেই বা আমাদের পতন হইয়াছিল, সেইগুলি তন্ন তন্ন করিয়া ভাবিয়া, আবার কি উপায়ে আমরা উঠিতে পারি, তাহার চেষ্টা দেখিতে হইবে। এস ভাই! আমরা প্রত্যেকেই ভাবি—প্রত্যেকে ভাবিয়া পরস্পরের চিন্তা পরস্পরকে জানাই এবং পরস্পর-বিদ্বেষশূন্য হইয়া পরস্পরের নিকট হইতে সাহায্য লই। আমি ক্ষুদ্র হইতে পারি, কিন্তু তাই বলিয়া আমার কথা শুনিবে না কেন? সত্য বলিবার অধিকার সকলেরই আছে। আমার কথায় সত্য না থাকে, পরিত্যাগ করিও। কিন্তু পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে একবার শুন। আমরা রাজনৈতিক অধীনতার জন্য দুঃখ করিয়া থাকি এবং অপহৃত-স্বাধীনতা অপহারকের নিকট ভিক্ষা করিয়া চাহিয়া লইতে সর্ব্বদা উন্মুখ। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ভিক্ষালব্ধ ধনে কে কবে ধনী হইয়াছে? আর অপহৃত-সর্ব্বস্ব ব্যক্তির ক্রন্দনে অপহারকের হৃদয় কবে বিগলিত হইয়াছে? যাহারা আত্মাবলম্বন জানে না, স্বাধীনতা পাইলেই বা তাহারা অমূল্য ধন রাখিবে কিরূপে? একজন অপহারক ছাড়িয়া দিলে যে আর একজন আসিয়া ধরিবে না, কে বলিতে পারে? আমরা বৈদেশিকের নিকট এখানে ভিক্ষা চাহিয়া

ক্ষান্ত নহি, আগ্রহ ভিক্ষা করিবার জন্য জাতীয় ভিক্ষার ঝুলি প্রস্তুত করিয়া বৈদেশিকের নিজ দেশে গিয়াও দ্বারে দ্বারে অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতে লজ্জিত নহি। কিন্তু ভিক্ষুকের আদর কুত্রাপি নাই। স্বদেশে বিদেশে ভিক্ষুক সর্ব্বত্র ঘৃণার পাত্র। God helps them who help themselves, যাঁহারা আত্মাবলম্বী, ঈশ্বর কেবল তাঁহাদিগকেই সাহায্য করিয়া থাকেন। যিনি পরসাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া আপনার যত্নে আপনি বড় হইতে চেষ্টা করেন, তিনিই প্রকৃত প্রস্তাবে বড় হইতে পারেন। Papa, I am bigger than you—বাবা, আমি তোমা অপেক্ষা মাথায় উঁচু—পিতৃস্কন্ধে চড়িয়া বালক এই কথা বলিলেই যে সে বড় হইল, তাহা নহে। ইংরাজ যদি আদর করিয়া আমায় রাজ-সিংহাসনে বসান, আমি কখনই রাজ-সিংহাসনের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিব না। যে বিনা শ্রমে, বিনা বুদ্ধিবলে অতুল সম্পত্তির অধীশ্বর হয়, সে কখনও সে সম্পত্তি বহুদিন রাখিতে পারে না। আমরা বহু যত্নে অর্জ্জিত ভারত সাম্রাজ্য রাখিতে পারিলাম না—কারণ, আমরা বিনা পরিশ্রমে ইহা হাতে পাইয়াছিলাম। যে অনন্ত সংঘর্ষের বলে পূর্ব্বপুরুষগণ এই দেবদুর্লভ সাম্রাজ্য অধিগত করিয়াছিলেন, সে সংঘর্ষকাল অতীত হইলে আমরা নিদ্রালু হইয়া উঠিলাম। কতিপয় মাত্র ক্ষত্রিয়ের হস্তে এই প্রকাণ্ড সাম্রাজ্য-রক্ষার ভার অর্পণ করিয়া আমরা জাতিসাধারণ নিদ্রা যাইতে লাগিলাম। শ্রম-বিভাগের জন্য যে জাতিভেদের সৃষ্টি হইল—ক্রমে তাহাই আমাদের পতনের কারণ হইয়া দাঁড়াইল। এত বড় সাম্রাজ্য-রক্ষা অঙ্গুলিমাত্রে গণনীয় কতিপয় মাত্র ক্ষত্রিয়ে কয়দিন করিয়া উঠিতে পারে? জার্ম্মাণীরও এই কারণে অধঃপতন হইয়াছিল। জার্ম্মাণী সে ভ্রম বুঝিতে পারিয়া এক্ষণে জাতিসাধারণ সাম্রাজ্যরক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। তাই সে দিন ফ্র্যাঙ্কোপ্রুসীয় সমরে বীরভূমি ফ্রান্সকেও পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পাণিপথ-সমরের পূর্ব্বে যদি আমরা সে ভ্রম বুঝিতে পারিতাম, অথবা সেদিন পলাশী যুদ্ধের পূর্ব্বেও যদি জাতিসাধারণ নিজ নিজ দায়িত্ব বুঝিতে পারিতাম, তাহা হইলে আজ আমাদের দুর্দ্দশা ঘটিত না। 'গতস্য শোচনা নাস্তি'—যাহা অতীত হইয়াছে, তাহার জন্য আর দুঃখ করা বৃথা। এক্ষণে কিরূপে আমাদের ভবিষ্য সঞ্জীবনকার্য্য সিদ্ধ হইতে পারিবে, আমরা সেই সম্বন্ধে কেবল দুই চারিটি কথা বলিব।

পরাধীন জাতির রাজনৈতিক অস্তিত্ব নাই। আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলন—অরণ্যে রোদনমাত্র। তাহার জন্য সমস্ত জাতীয় শক্তি বিনষ্ট করা উচিত নহে। রোদনের ফল একেবারেই নাই—এ কথা আমরা বলি না। তবে যাহারা কেবল রোদনের উপর জাতীয় উন্নতি রাখিতে চাহে—তাহাদিগকে বাতুল বলি। রোদন জাতিসাধারণ-সংক্রামক হইলে বিশ্বজনীন সহানুভূতি হয় সত্য, কিন্তু, নিরন্তর ক্রন্দনে জাতীয় শক্তির ক্ষয় হয়। কুকুরকে আমরা ঘৃণা করি কেন? কুকুর সকল বিষয়েই প্রভুর অনুগ্রহ-ভিখারী বলিয়া আমরাও জগতের ঘৃণার পাত্র। তবে কেন আর আমরা আবেদন করিয়া মরি? ইলবার্ট বিলে দেখা গিয়াছে যে, আমাদের কপাল-গুণে সকলই সমান। লঙ্কায় যে আসে, সেই রাক্ষস। বাস্তবিকই শ্বেতপুরুষগণের সহিত আমাদের খাদ্যখাদকের সম্বন্ধ। তাঁহারা যে আত্মস্বার্থ নষ্ট করিয়া আমাদের উন্নতিসাধন করিবেন—সে আশা বৃথা। বৃথা আশা করিয়া আশাভঙ্গজনিত মনস্তাপ আর কেন সহ্য করি? আমাদের কপাল যখন ভাঙ্গিয়াছে—তখন আবেদন করা, চীৎকার করা কিছুদিন বন্ধ করিলেই ভাল হয়।

আমরা যাহাতে ভবিষ্যতে রাজনৈতিক আসনে স্বাধীনভাবে বসিবার যোগ্য হই, আইস, আমরা এক্ষণে তাহার চেষ্টা করি। সামাজিক অধঃপতনের ফল—রাজনৈতিক অধঃপতন। কারণ বর্ত্তমান থাকিতে কার্য্যের নাশ হইবে কিরূপে? সামাজিক অধঃপতন পুরামাত্রায় থাকিতে রাজনৈতিক অভ্যুদয় হইবে কিরূপে? অতএব আইস—আমরা সামাজিক সংস্কারে প্রবৃত্ত হই। সামাজিক উন্নতি হইলে রাজনৈতিক উন্নতি আপনিই আসিবে। হিন্দুসমাজ একদিন প্রচণ্ড স্রোতস্বিনী ছিল। উন্নতির স্রোত ইহাতে প্রচণ্ডবেগে বহিয়াছিল। কিন্তু ভাগ্যদোষে সে স্রোত এখন একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আবার স্রোত বহাইতে হইবে। মরা নদীর পঙ্কোদ্ধার করিয়া আবার তাহাকে প্রবল স্রোতস্বিনীতে পরিণত করিতে হইবে। স্রোত বন্ধ হওয়ায় যে সকল শৈবালদাম জন্মিয়াছে, তাহা উঠাইয়া ফেলিতে হইবে। শৈবালদাম ও পঙ্করাশি উঠাইয়া ফেলিলেই নদী আবার সাগরাভিমুখিনী হইবে—আবার

তটবর্ত্তী প্রদেশ সকল জীবন ও সমৃদ্ধি বিস্তার করিবে। ইহা সম্পূর্ণরূপে নিজায়ত্ত। যাহা নিজায়ত্ত, তাহা ফেলিয়া, যাহা পরায়ত্ত, তাহার জন্য চীৎকার করিয়া মরি কেন?

রাজনৈতিক উন্নতির ভিত্তিভূমি সমাজ-সংস্কার। ভারতে অধঃপতনের মূল সামাজিক বৈষম্য ও স্ত্রীজাতির অবনতি। সামাজিক বৈষম্যে পঞ্চবিংশ কোটি মানব পরস্পর-মমতাশূন্য। কি উপায়ে এই পরস্পর-বিচ্ছিন্ন মমতাশূন্য দূর-বিক্ষিপ্ত মানবপরমাণু-পুঞ্জ আবার ঘনীভূত হইতে পারে, কিরূপে আবার স্ত্রীজাতি অন্দরের অন্ধতমসাচ্ছন্ন প্রদেশ হইতে বাহির হইয়া প্রকৃতির শোভা সন্দর্শন করিয়া শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষসাধন করিতে পারে— কিরূপে আবার তাহারা অপহৃত স্বত্বসকল পুনরধিকার করিতে পারে—কিরূপে ভারতের নারীজাতি ও জনসাধারণের মধ্যে বিদ্যাজ্যোতিঃ বিকীর্ণিত হইতে পারে—কিরূপে দৃঢ়বদ্ধ প্রাদেশিক ভাবসকল জাতীয়ভাবে পরিণত হইতে পারে—আমাদের এক্ষণে সেই আন্দোলনেই সমস্ত জাতীয় শক্তি ব্যয়িত করা কর্ত্তব্য। হিন্দুসমাজ এই আভ্যন্তরীণ উন্নতিসাধনে নিতান্ত উদাসীন। শিক্ষিত-সমাজ যাহাতে আত্মোৎসর্গ আছে, এরূপ কার্য্যে সহসা হস্তক্ষেপ করিতে প্রস্তুত নহেন। বক্তৃতা করিতে বা আবেদন করিতে বিশেষ 'আত্মোৎসর্গ' নাই বলিয়া তাহারা সেই বিষয়েই মনোনিবেশ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে কি হইবে? এক্ষণে কার্য্য চাই। যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ করিব, তাহা কার্য্যে পরিণত করা চাই। শুদ্ধ কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ করিয়া ক্ষান্ত থাকিলে জাতীয় উন্নতি হইবে না। আমাদিগকে অনেক সংস্কারসাধন করিতে হইবে। একটি একটি করিয়া ধরিলে কতদিনে সম্পন্ন হইবে, জানি না। তথাপি একটি একটি করিয়া সাধন করিয়া উঠিতে পারিলেও ভবিষ্যতে সর্ব্বাঙ্গীন সংস্কার হইবে বলিয়া আশা হয়। আমরা ভারতের জাতীয় অবনতির মূলীভূত যাবতীয় সমাজদূষণের ক্রমে উল্লেখ করিব। অদ্য কেবল বিধবা-বিবাহের উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইব। মহাত্মা বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুদিন হইল, এই অত্যাবশ্যকীয় সংস্কারের সূচনা করিয়াছেন। সূচনা হওয়ার পর দুই একটি করিয়া মধ্যে মধ্যে বিধবা-বিবাহ হইতেছে বটে, কিন্তু হিন্দুসমাজ মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রবেশ করিয়াছে, এ কথা বলিতে পারি না। কারণ, যাঁহারা বিধবা-বিবাহ করিতেছেন, হিন্দুসমাজ তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতেছেন। তাঁহাদিগের কষ্টের সীমা নাই। তাঁহারা আত্মোৎসর্গের জলন্ত দৃষ্টান্ত। উৎপীড়িত ও অবহেলিত হইয়াও তাঁহারা কর্ত্তব্যের অনুরোধে অম্লানবদনে সমস্ত সহিতেছেন। যাঁহারা সুশিক্ষিত বলিয়া আত্মপরিচয় দেন—তাঁহারাও প্রকাশ্যরূপে ইঁহাদিগের সহিত সামাজিক ব্যবহারে মিশেন না। বিধবাবিবাহের রজনীতে ভোজনমন্দিরে মধুলোলুপ ভ্রমরবৃন্দের ন্যায় সন্দেশলোলুপ অসংখ্য যুবাপুরুষকে দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু পরদিন আর কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না। আজ ২৫।২৬ বৎসর এইরূপেই চলিতেছে—ইহার কোন পরিবর্ত্তন হইল না। হিন্দুসমাজ লুকাচুরিতে দক্ষ, লুকাচুরিতে হিন্দুসমাজের কোন আপত্তি নাই, লুকাচুরি করিয়া তুমি যাহা কর, হিন্দুসমাজের তাহাতে কোন আপত্তি নাই, কিন্তু প্রকাশ্যে করিলে হিন্দুসমাজ তোমাকে পরিত্যাগ করিবে। তুমি মদ খাও, গরু খাও, উইলসনের হোটেলের খানা খাও, লুকাইয়া যাহা ইচ্ছা কর,—তোমার জাতি যাইবে না, কিন্তু তুমি কর্ত্তব্যের অনুরোধে প্রকাশ্যরূপে কোন অপ্রচলিত শাস্ত্রসম্মত কার্য্য কর—তুমি জাতিচ্যুত হইবে।

হিন্দুসমাজের ইহা অপেক্ষা অধিকতর কলঙ্কের কথা আর কি হইতে পারে? বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসম্মত, ইহা এক্ষণে সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। ইহা যে যুক্তিসঙ্গত, সে বিষয়েও কাহাকে কোন আপত্তি তুলিতে দেখি না। ইহার বিরুদ্ধে একমাত্র আপত্তি এই যে, ইহা ব্যবহার-বিরুদ্ধ। হিন্দুসমাজে ব্যবহার-বিরুদ্ধ কত কাজ চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু বিধবাবিবাহ অদ্যাপি হিন্দুসমাজে চলিত হইতেছে না। ইহার কারণ কি? ইহার দুইটি গূঢ় কারণ আছে। একটি কারণ এই যে, হিন্দুসমাজ স্ত্রীজাতিকে খাদ্যসামগ্রীস্বরূপ মনে করেন। অন্যের পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্ট খাদ্য যেমন ঘৃণ্য, ইঁহারা বিধবাগণকে সেই ভাবে দেখেন। কিন্তু ইহা বিজ্ঞানসম্মত নহে। সবিশেষ খুলিয়া বলা নিষ্প্রয়োজন। বিশেষতঃ বাল-বিধবা সম্বন্ধে এ কথার উল্লেখই হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ তাঁহাদিগের মনে দৃঢ় বিশ্বাস যে, বিধবাবিবাহ প্রচলিত

হইলে স্ত্রীলোকে পতিপরায়ণা হইবে না। সকলেই বর্ত্তমান পতির মৃত্যুর পর পত্যন্তর-প্রাপ্তির আশায় তাঁহার প্রতি উদাসীন হইবে এবং কখন কখন তাঁহার প্রাণবিনাশেরও চেষ্টা করিবে। ইহা অপেক্ষা ভ্রান্ত সংস্কার আর নাই। লোকে উপস্থিত অবহেলা করিয়া কখন অনুপস্থিতের আশায় দিনযাপন করে না। ইহা প্রকৃতিবিরুদ্ধ। প্রকৃতিবিরুদ্ধ কার্য্যও ঘটে বটে—কিন্তু তাহা নিয়ম নহে, ব্যভিচার। এই ভ্রান্ত সংস্কার যে শুদ্ধ অশিক্ষিত সমাজে বদ্ধমূল আছে, এরূপ নহে—সুশিক্ষিত-মণ্ডলীর মধ্যেও কোন কোন স্থলে এরূপ সংস্কার দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহাদের কিছুতে এ সংস্কার অপনীত হইবে না—আমাদিগের তাঁহাদিগের সহিত বিতণ্ডা করিয়া সময় নষ্ট করার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে যাঁহারা বিধবাবিবাহকে শাস্ত্রসম্মত ও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিশ্বাস করেন—আমরা তাঁহাদিগকে লইয়া একটি সমিতি সংগঠিত করিতে চাহি। এই সমিতিকে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। বিধবা-বিবাহ প্রচারের জন্য স্বতঃ পরতঃ অবিরাম চেষ্টা করিতে হইবে। যাঁহারা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী থাকিতে চান—তাঁহাদিগের মন ফিরাইবার চেষ্টা করা সমিতির লক্ষ্য হইবে না। সমিতি কেবল বিবাহার্থিনী বিধবাগণের বিবাহ দিয়া দিবেন; এবং যাঁহারা বিধবা-বিবাহ করিবেন, তাঁহাদিগের সহিত সামাজিক সংস্রব পরিত্যাগ করিবেন না, এরূপ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইবেন। যাঁহারা সমিতির সভ্য হইতে চাহেন, তাঁহারা আপনাদিগের নাম-ধাম লিখিয়া-আর্য্যদর্শন-সম্পাদকের নিকট * * * পত্র লিখিবেন। সভ্য-সংখ্যা অধিক হইলে সভার নিয়মাবলী প্রচারিত হইবে। সভ্যসংখ্যা পূর্ণ হইলে পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এই সভার সভাপতি করিতে অনুরোধ করা হইবে। যিনি বিধবাবিবাহ প্রচারের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন—তিনি জীবিত থাকিতে সভাপতির আসন আর কেহ গ্রহণ করিতে পারেন না। সহযোগী সম্পাদক-মণ্ডলীকে এ বিষয়ে আন্দোলন করিবার জন্য আমরা অনুরোধ করি এবং তাঁহাদিগের মতামত জানিবার জন্য আমরা ইচ্ছা করি। এ বিষয়ে আরও বক্তব্য রহিল, আমরা পরে বলিব। এই সমিতি যে শুদ্ধ বিধবাবিবাহ লইয়াই থাকিবেন, তাহা নহে। একে একে সমস্ত সামাজিক সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিবেন। ইহার লক্ষ্য পরে বিবৃত করা যাইবে। আমরা আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, নলডাঙ্গাধিপতি রাজা প্রমথভূষণ দেব রায় বিধবা-বিবাহ প্রচারের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। তিনি যে শুদ্ধ অর্থ দিয়া সাহায্য করিতেছেন, এরূপ নহে। স্বয়ং বিধবা-বিবাহকারিগণের সহিত সমসামাজিকতা করিতেছেন। * সম্ভ্রান্তশ্রেণী তাঁহার উদার দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তন করিলে বিধবা-বিবাহ প্রচার করিতে কয়দিন লাগিবে? ৺রাজা রাধাকান্ত দেব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতিকূলতা না করিলে এতদিন বিধবা-বিবাহ কলিকাতার সমস্ত সম্ভ্রান্ত গৃহে প্রচলিত হইয়া যাইত। যে রাজা রাধাকান্ত দেব বিধবাবিবাহ প্রচলিত না হওয়ার জন্য এত চেষ্টা করিয়াছিলেন—কালের অদ্ভুত গতিতে সেই গৃহেই বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হইল। কালের স্রোত রোধ করা মনুষ্যের অসাধ্য। সম্ভ্রান্তবংশীয় কার্য্যে যোগ না দিলে ইহা প্রচলিত হইতে অনেক বিলম্ব হইবে। সেই জন্য আমরা সানুনয়ে তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা রাজা প্রমথভূষণের ন্যায় এই কার্য্যে যোগ দিয়া আপনাদের পদের গৌরব বর্দ্ধন করুন। আমরা তাঁহাদিগের সহকারিতা-বিরহিত হইয়া সহজে সিদ্ধকাম হইতে পারি না। কারণ সামাজিক শক্তি অনেক পরিমাণে তাঁহাদিগের হস্তে রহিয়াছে। অর্থবলে অনেক কার্য্য সম্পন্ন হয়। আমাদের টোলের পণ্ডিতমণ্ডলীও অনেক পরিমাণে সম্ভ্রান্তশ্রেণীর মুখাপেক্ষী। সম্ভ্রান্তশ্রেণী ইহাতে যোগ দিলে—পণ্ডিতমণ্ডলী আর প্রতিকূলতা করিবেন না। অনেক বিখ্যাতনামা পণ্ডিতের সঙ্গে এ বিষয়ে আমাদের কথা হইয়াছে—তাঁহারা কেবল বিদায় বন্ধ হওয়ার ভয়ে ইহাতে যোগ দিতে সাহস করেন নাই। সম্ভ্রান্তশ্রেণী যোগ দিলে তাঁহাদের আর সে আপত্তি থাকিবে না। লক্ষ্মী ও সরস্বতী মিলিত হইলে কোন্

* আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে, তিনি ইহাদিগের সহিত সামাজিক মিশ্রণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে তাঁহার রাজা উপাধি ফেরত দেওয়া উচিত। কারণ, তিনি বিধবা-বিবাহের প্রচারক বলিয়া এই উপাধি পাইয়াছেন। আশা করি, এ সংবাদ অমূলক।

কাজ অসিদ্ধ থাকে? ভারতের ভাগ্যে তাহা কি ঘটিবে না? কে বলিতে পারে ঘটিবে না?

দ্বিতীয় প্রস্তাব

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, হিন্দুসমাজের সর্ব্বাগ্র-কর্ত্তব্য সংস্কার বিধবাবিবাহের পুনঃপ্রচলন। পুনঃপ্রচলন বলিলাম, তাহার কারণ এই যে, শাস্ত্রের ব্যবস্থায় ও রামায়ণ-মহাভারতাদি ঐতিহাসিক মহাকাব্যে বিধবাবিবাহ সর্ব্বপ্রচলিত থাকার সুস্পষ্ট লক্ষণ দেদীপ্যমান আছে। যাহা পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল ও শাস্ত্রানুমোদিত, তাহার পুনঃপ্রচলন দুরূহ কার্য্য নহে। আমাদের দুরূহ বোধ হয়, তাহার কারণ আমাদের কার্য্যকরী শক্তি আজও উৎপন্ন হয় নাই। ইহার প্রচলন আরও দুরূহ নহে এই জন্য যে, বৈষ্ণব-সমাজে ও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে ইহার বহুল প্রচার আছে। আমরা এতদিন নিদ্রিত ছিলাম, নিদ্রাভঙ্গের পর উঠিয়া কেবল ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছি মাত্র। এখনও আমাদের হস্তপদাদি শিথিল হইয়া রহিয়াছে। কার্য্যের নাম শুনিলে এখনও আমাদের ভয় হয়। লিখিয়া বা বক্তৃতা করিয়া যদি অব্যাহতি পাই, তাহা হইলে আমরা সহজে কার্য্যে হাত দিতে চাই না। আমাদের ইচ্ছা যে, যত দিন সন্তরণ ভাল করিয়া না শিখিব, তত দিন আর কার্য্য সাগরে নামিব না। কিন্তু অবোধ লোক! তোমার এ দুরাকাঙ্ক্ষা কেন? জলে না নামিয়াই সাঁতার শিখিবার দুরাশা কেন? তুমি জাতীয়তা লইয়া মুখে আকাশ-পাতাল আন্দোলন করিয়া বেড়াইতেছ, কিন্তু এখনও কার্য্যসাগরে পা দিতে সাহস করিতেছ না কেন? শুদ্ধ মৌখিক আন্দোলনে কোন্ দেশ কবে বড় হইয়াছে? যদি জাতীয় স্নায়ু দৃঢ় করিতে চাও, তবে কার্য্য করিতে হইবে। রাজনীতিক্ষেত্রে আমাদের কার্য্য করিবার অধিকার নাই—কেবল চীৎকার বা রোদন করিবার অধিকার আছে। কিন্তু নিষ্ফল আরণ্য রোদনে আর অমূল্য জাতীয় জীবন নষ্ট করা সঙ্গত হইতেছে না। কাঁদিয়া কাঁদিয়া অনুগ্রহ ভিক্ষা করিয়া জাতীয় শক্তি ধ্বংস করা কিছুতেই উচিত বোধ হইতেছে না। যখন আমরা পঞ্চবিংশতি কোটি লোক একমনে একপ্রাণে কার্য্যক্ষেত্রে নামিতে শিখিব, তখন যাহা আজ আমরা অনুগ্রহ বলিয়া চাহিতেছি, তাহা না চাহিলেও অধিকার-স্বরূপ পাইব।

রাজনৈতিক মঞ্চে উঠিবার পূর্ব্বে আমাদিগকে সমাজের জীর্ণসংস্কার করিয়া লইতে হইবে। হিন্দু-সমাজ-সৌধ বহুদিন সংস্কারাভাবে জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। সেই জীর্ণসংস্কার করিয়া লইলে, আবার ইহা কতকাল চলিবে। যদি জীর্ণসংস্কার করিতে অসম্মত হই, তাহা হইলে ইহার পতন অনিবার্য্য। সমাজ সংস্কার না করিলেই সমাজবিপ্লব উপস্থিত হয়। প্রবল স্রোতস্বিনীও কালে পঙ্করাশিতে ও দামদলে জড়িত হইয়া পড়ে। দামদল পরিষ্কার ও পঙ্কোদ্ধার করিয়া দিলে, সেই নদী আবার পূর্ব্বাবস্থা ধারণ করে। যদি তাহা না কর, সেই প্রবল স্রোতস্বিনী কালে মরা নদীতে পরিণত হইবে। প্রকাণ্ড সৌধ-রাজির মধ্যে মধ্যে জীর্ণসংস্কার করিলে তাহা অনন্ত-কালস্থায়িনী হইতে পারে। কিন্তু জীর্ণসংস্কার না করিলে তাহা অধিকদিন থাকিতে পারে না। হিন্দু-সমাজেরও ঠিক সেই অবস্থা।

কোন বিজ্ঞ সম্পাদক লিখিয়াছেন যে, সমাজের অধিকাংশ লোকের অভিমত না লইয়া কোন সমাজ-সংস্কার হইতে পারে না। ভারতের পঞ্চ-বিংশতি কোটি অধিবাসীর মধ্যে অন্ততঃ ত্রয়োদশ কোটির অভিমত না হইলে তুমি যদি সমাজসংস্কার-কার্য্যে প্রবৃত্ত না হও, তাহা হইলে তুমি অসামাজিক লোক, সমাজ তোমার মত লোককে অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছে। তিনি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, অধিকাংশ সভ্যের মত না হইলে কোন বিধি তথায় ব্যবস্থাপিত হয় না। তিনি দেখাইয়াছেন যে, মৃতা পত্নীর ভগিনীকে বিবাহ করার পদ্ধতি অবতারিত করিবার জন্য অনেক বিজ্ঞ সভ্য চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদিগের সংখ্যা বিপক্ষগণের সংখ্যা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূন থাকায় তাঁহাদের চেষ্টা সফল হইতেছে না। এ তুলনা সঙ্গত হয় নাই। কারণ, পার্লামেন্টের সভ্যসংখ্যা ছয় সাত শতের অধিক নহে। সেই ছয় সাত শত লোক সমস্ত ব্রিটনবাসীর প্রতিনিধি হইলেও, সেই ছয় সাত শত লোকের মতের সহিত যে ব্রিটনের অধিবাসী সাধারণের

মতসাম্য আছে, তাহা কথনই নহে। প্রতি লক্ষে দুই এক জন করিয়া প্রতিনিধি। সেই দুই এক জন লোক যে এক লক্ষ লোকের মনের মত কথা বলিতে পারিবে, তাহা কথনই সম্ভব নহে। সেই এক লক্ষ লোকের মনস্তুষ্টিবিধান করিয়া কথা বলা দেবতারও অসাধ্য। তাহার মধ্যে কত বিভিন্ন-মতাবলম্বী লোক আছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। এই জন্য বলিতেছি যে, জনসাধারণের মত লইয়া ইংলণ্ডেরও কার্য্য চলিতে পারে না। জনসাধারণ যাঁহাদিগকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করে, তাঁহাদিগের মতামতেই সমাজ চলিয়া থাকে। জনসাধারণ তাঁহাদিগের মত শিরোধার্য্য করিয়া লয় বলিয়াই সমাজ চলিতেছে—নতুবা এত দিনে রসাতলে যাইত।

আমাদের দেশে কোন কালেই দেশব্যাপী প্রতিনিধিপ্রণালী প্রচলিত ছিল না। তবে যে সকল ঋষি নিজ গুণগরিমায় দেশের মুখ উজ্জ্বল করিতেন, লোকে তাঁহাদিগের মত শিরোধার্য্য করিত। সমাজ তাঁহাদিগের মতামতেই চলিত। সেই জন্যই শাস্ত্রের এত আদর। শাস্ত্র, জ্ঞানী জনের উক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। হিন্দুসমাজ আজও কিয়ৎপরিমাণে সেই শাস্ত্র দ্বারা পরিচালিত।

এই শাস্ত্র আমাদের দেশে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিধিস্বরূপ পরিগৃহীত হইত। তখন জ্ঞানিগণ জনসাধারণ দ্বারা পরিচালিত হইতেন না জনসাধারণ জ্ঞানিগণ দ্বারা পরিচালিত হইত। বর্ত্তমান সময়ে পণ্ডিতমণ্ডলী বিদায়ের জন্য সাধারণের বা ব্যক্তিবিশেষের তুষ্টিকর শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু সে ব্যাখ্যায় শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা হয় না। প্রাচীন শাস্ত্রকর্ত্তারা পরমুখনিরপেক্ষ নিষ্কাম যোগী ছিলেন। তাঁহারা কাহারও মুখের দিকে তাকাইয়া শাস্ত্র লিখিতেন না। যাহা প্রকৃত লোকহিতকর, তাহাই ব্যবস্থা করিতেন।

সুবিজ্ঞ সম্পাদক মহাশয় যে সংখ্যা-বাহুল্যের আধিপত্য সংস্থাপন করিতে চান, তাহাতে শাস্ত্রের মস্তকে পদাঘাত করা হইবে। তাহাতে জ্ঞানের অবমাননা ও অজ্ঞানের পূজা আরম্ভ হইবে। জনসাধারণের রীতিনীতি বা অভিমত যে সমাজের আদর্শ হয়, সে সমাজের অধঃপতন অনিবার্য্য। দেশাচার শাস্ত্রের মস্তকে পদাঘাত করিলে যে বিষময় ফল হয়, তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে বর্ত্তমান। দেশাচারের মূল, নিরক্ষর জনসাধারণের খামখেয়ালী; শাস্ত্রের মূল,যুক্তি, বিজ্ঞান ও ভূয়োদর্শন। সুতরাং আমরা দেশাচারকে আদর্শ করিয়া আর চলিতে চাহি না। পতিত জাতির তাহা আদর্শ হইতে পারে; কিন্তু উত্থানশীল নব্য ভারতের তাহা আদর্শ হইতে পারে না। উত্থানশীল হিন্দুসমাজ যুক্তিমূলক শাস্ত্রকে আদর্শ করিয়া উঠিবে। যে শাস্ত্র সদ্‌যুক্তির উপর সংন্যস্ত, তাহাই আমরা গ্রহণ করিব। অনক্ষর জনসাধারণ যে দিকে যাইতে বলে, আমরা সে দিকে যাইব না। কিন্তু মহাজন যে মার্গানুসরণ করিয়াছিলেন, সেই মার্গানুসারী হইব। কারণ, "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা"—মহাজন যে পথ অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই সুপথ, অন্য পথ কুপথ। সে পথে যাইলে নিশ্চয় বিপদ্ ঘটিবে।

মানসিক দুর্ব্বলতার সময় যখন পতিত জাতি বিপথগামিনী হইতে চায়, তখন যাঁহারা তাহাতে উৎসাহ দেন, তাঁহারা জাতীয় শত্রু। যাঁহারা বন্ধুভাবে সুপথ দেখাইয়া দেন ও বিপথে যাইতে নিষেধ করেন—তাঁহারাই প্রকৃত বন্ধু। ঔষধ যেরূপ তিক্ত, অনেক সময় বন্ধুর উপদেশও সেইরূপ তিক্ত লাগে বটে, কিন্তু ঔষধের ন্যায় ইহা পরিণাম-হিতকর। অধিক কি, অনেক সময় শত্রুর নিন্দাবাদও বন্ধুর স্তোত্রবাদ অপেক্ষা অধিকতর হিতকারী হইয়া দাঁড়ায়। কোন ব্রাহ্ম সংবাদপত্র হিন্দুসমাজের দোষোদেঘাষণ করায় কয়জন সংবদপত্রের সম্পাদক তাঁহার উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়াছেন, কিন্তু দোষ দেখাইয়া দিলে যে চটিয়া উঠে, তাহার দোষ কখন সংশোধন হয় না।

হিন্দুসমাজের স্কন্ধে ব্রাহ্ম-পত্রিকা যে দোষারোপ করিয়াছেন, তাহা অমূলক নহে। হিন্দুসমাজ যখন তেজস্বী ছিলেন, যখন সত্যকে দেবতাভাবে পূজা করিতেন, যখন সত্যের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতেন, তখন ইহার ঔজ্জ্বল্যে জগৎ ঝলসিত হইয়াছিল, কিন্তু আজ হিন্দুসমাজ পতিত, আজ হিন্দুসমাজে সে সত্যপ্রিয়তা নাই, সত্যের জন্য সে আত্মোৎসর্গ নাই,—তাই হিন্দুসমাজে এত কপটাচার প্রবেশ করিয়াছে! সত্য গিয়াছে, সত্যের অবতরণ পড়িয়া আছে মাত্র। আত্মা গিয়াছে, দেহ পড়িয়া আছে মাত্র।

হিন্দুসমাজ এখন স্পষ্ট বলিয়া দেয় যে, তুমি যাহা কর না কেন, গোপনে করিও, তাহা হইলে আর তোমার কোন ভয় নাই। যদি তুমি সত্য বল, তোমায় জাতিচ্যুত করিব। আজ বিলাতফেরতগণ এই জন্যই হিন্দুসমাজ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছেন। বিলাতযাত্রিগণ যে অপরাধে অপরাধী, আজকাল সুশিক্ষিত-সম্প্রদায়ের অধিকাংশই প্রায় সেই অপরাধে অপরাধী। তবে একদলকে রাখিয়া আর একদলকে কেন পরিত্যাগ কর? সত্যের এত অনাদর কেন? উইলসনের হোটেলে খাইলে যদি সমাজচ্যুত না কর, তবে বিলাতের হোটেলে খাইলে জাতিচ্যুত কর কেন? একজন গোপনে করে, আর একজন গোপনে করিতে চায় না বলিয়া? একজনের অপরাধ যে, সে জ্ঞানার্জ্জনের জন্য বিদেশে গিয়া গত্যন্তর নাই বলিয়া বৈদেশিকের অন্ন গ্রহণ করে, আর একজন গৃহের অন্ন থাকিতেও শুদ্ধ রুচিপরিবর্ত্তনের জন্য যবনান্ন গ্রহণ করে। যদি যবনান্ন গ্রহণ করা বাস্তবিকই দোষ হয়, তাহা হইলে কার দোষ গুরুতর? এক জনের লঘুপাপে গুরুদণ্ড হইল, আর এক জনের গুরুপাপে লঘুদণ্ড, এই দণ্ডের তারতম্য কেন? একজনের অপরাধ ইচ্ছাকৃত, অপরের অপরাধ কার্য্যবশতঃ। তবে লঘুপাপীর উপর অধিকতর নির্যাতন কেন? পূর্ব্বোল্লিখিত সম্পাদক লিখিয়াছেন যে, বিলাতফেরতগণ সংখ্যায় অতি অল্প, সুতরাং হিন্দুসমাজ তাঁহাদিগকে অনায়াসেই পরিত্যাগ করিতে পারেন। এ যুক্তি 'তেজীয়ান্ ন দোষায়' Might is rightএর যুক্তি। দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের নির্যাতন চিরপ্রসিদ্ধ। আমি প্রবল, তুমি হীনবল—তোমায় আমি প্রহার করিব, তাহাতে আবার যুক্তি কি? পাঁচজনের বাটী, চারিজনের ইচ্ছা হইল, পঞ্চমজনকে তাড়াইব, চারিজনে জোট বাঁধিয়া পঞ্চমজনকে তাড়াইলাম, তাহাতে আবার যুক্তির প্রয়োজন কি? এ কথা বলিলে নাচার। যাঁহারা যুক্তি-পথ ছাড়িলেন, তাঁহাদিগকে আটিবে কাহার সাধ্য? কিন্তু আপাততঃ 'জোর যার মুল্লুক তার' হইতে পারে—কিন্তু কালে যুক্তিই প্রবল থাকিবে। পাশববলকে একদিন যুক্তির অধীন হইতে হইবে। সুতরাং আমরা যাহা যুক্তিসিদ্ধ, তাহাই বলিয়া যাইব। আজ তাহাতে জনসাধারণ কর্ণপাত করিতে না পারে, কাল কিংবা পরশ্ব করিতেই হইবে।

মহাজন বলিয়া গিয়াছেন—Union is strength—একতাই প্রকৃত সামাজিক শক্তি। হিন্দু-সমাজে একতা নাই বলিয়াই ইহা সামাজিক-শক্তি-শূন্য। হিন্দুসমাজ বলিলে ইহাতে ঘনীভূত এক-লক্ষ্য-সঞ্চালিত কোন শক্তিকেন্দ্র বুঝায় না। ইহা দ্বারা পরস্পর মমতা-শূন্য, দূর-বিক্ষিপ্ত, নির্লক্ষ্য বা বিভিন্ন-লক্ষ্য অসংখ্য সম্প্রদায়ের সমষ্টিমাত্র বুঝায়। যত দিন না আমরা হিন্দুসমাজকে একটি ঘনীভূত, এক-লক্ষ্য শক্তিকেন্দ্র করিয়া তুলিতে পারিতেছি, তত দিন আমাদিগের একটি রাজনৈতিক জাতিরূপে পরিণত হইবার সম্ভাবনা নাই।

হিন্দুসমাজ যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিতে বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে, এক্ষণে কিরূপে সেইগুলির ক্রমিক সমন্বয় হইতে পারে, আমাদিগকে তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে। ইহাই অতি কঠোর সাধনা। ইহার উপর যদি আমরা হিন্দুসমাজকে আরও অবান্তরভাগে বিভক্ত করিতে থাকি, তাহা হইলে হিন্দু-সমাজের আভ্যন্তরীণ ক্ষত আর কখন শুকাইবে না। সামাজিক একতার সহিত রাজনৈতিক একতার এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে, একের অভাবে আর একটি কখন পরিপুষ্ট হইতে পারে না। যদি তোমার সহিত আমার সামাজিক সহানুভূতি না রহিল, তবে তোমার রাজনৈতিক উন্নতিতে আমার আনন্দ পূর্ণমাত্রায় হইবে কেন? যদি নিম্নজাতিসাধারণ উচ্চজাতির সহিত সহানুভূতি করিত, তাহা হইলে যবনেরা কখন ভারতে লব্ধপ্রবেশ হইতে পারিত না। উচ্চজাতি নিম্নজাতির প্রতি যেরূপ সামাজিক ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহাতে উচ্চজাতির প্রতি নিম্নজাতির মমতা থাকিতে পারে না। এই জন্য তাহারা কোন প্রকার রাজনৈতিক আবর্ত্তনে কোন প্রকার ইচ্ছা প্রকাশ করে না। তাহারা জানে, রাজা যিনিই হউন না কেন, রাজপরিবর্ত্তনে তাহাদিগের অবস্থা-পরিবর্ত্তনের কোনও আশা নাই। সুতরাং রাজপরিবর্ত্তনে তাহাদিগের কোনও স্বার্থ নাই। এ দিকে উচ্চজাতি সংখ্যায় অতি হীনবল। নিম্নজাতি-নিরপেক্ষ হইয়া তাঁহারা বহিশ্চর ও অন্তশ্চর শত্রু-নিবারণে অক্ষম হইয়া পড়েন।

এরূপ স্থলে রাজনৈতিক উন্নতির প্রধান অন্তরায়

জাতিবৈষম্য যাহাতে আর পরিবর্দ্ধিত না হয়, বরং ক্রমে ক্রমে কমিতে থাকে, আমাদিগকে প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। সামান্য সামান্য কারণে ব্যক্তিপুঞ্জকে সমাজচ্যুত করিয়া খণ্ডশঃ বিভক্ত হিন্দু-সমাজকে আরও বিভক্ত করা আত্মঘাত ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব আমরা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্র-কেই অনুরোধ করি, তাঁহারা আর সামান্য সামান্য কারণে লোককে জাতিচ্যুত করিয়া হিন্দুসমাজকে আরও হীনবল না করেন। যখন দেখিতেছি, ইউ-রোপ ও আমেরিকা—পার্থিব সভ্যতাবিষয়ে আমা-দিগের অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে, তখন স্বদেশের উন্নতিসাধনের জন্য ইউরোপ ও আমে-রিকায় যাত্রা করা একান্ত আবশ্যক। কারণ, তুলনায় সমালোচনা দ্বারা আত্মদোষ-পরিবর্জ্জন ও পরোৎকর্ষের অনুকরণ ব্যতীত কখন দ্রুত উন্নতিসাধন হয় না। যদি কোন দেশ জাতীয় কুসংস্কার পরিত্যাগ-পূর্ব্বক জগতের উৎকর্ষাবধান করিতে পারে, তাহা হইলে সে দেশ অচিরকাল-মধ্যে স্বর্গরাজ্যে পরিণত হইতে পারে। মনুষ্যজাতি আজ পর্য্যন্ত যত কিছু উন্নতি-সাধন করিয়াছে, আমরা বিনা পরিশ্রমে বা অল্প পরি-শ্রমে স্বদেশে আনয়ন করিতে পারি। মধুকর যেমন নানা পুষ্প হইতে মধু আহরণ করিয়া মধুচক্র প্রস্তুত করে, আমরাও ইচ্ছা করিলে নানা দেশের রত্নরাজি আহরণ করিয়া স্বদেশের মুখ উজ্জ্বল করিতে পারি। জাপানের দ্রুত উন্নতির মূল, এই পরোৎকর্ষের অনু-করণ। উন্নতিশীল জাপান দেখিতে দেখিতে ব্রিট-নের সমকক্ষ হইয়া উঠিল। এ দিকে প্রাচীন ভারত, প্রাচীন চীন—স্থিতিশীলতা-দোষে প্রায় পূর্ব্বাবস্থায় রহিয়া গেল। এখনও সময় আছে—এখনও আমরা স্থিতিশীলতা-দোষ পরিহার করিলে দেশের অনেক মঙ্গলসাধন করিতে পারি। জাপান যেমন প্রতি বৎসর দলে দলে যুবকবৃন্দকে ইউরোপ ও আমেরিকায় পাঠাইতেছে—আমরাও যদি প্রতি বৎসর সেইরূপ শিল্প, বাণিজ্য ও বিজ্ঞান শিখিবার জন্য দলে দলে ভারতীয় যুবকমণ্ডলীকে ইউরোপ ও আমেরিকায় পাঠাইতে পারি, তাহা হইলে অল্পদিনের মধ্যে ভারতের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে। যে যে গুণে ইউরোপ ও আমেরিকা জগৎকে পরাজিত করিয়াছে, উক্ত যুবকমণ্ডলী দ্বারা আমাদিগের দেশে সেই সকল গুণরাশি আনীত হইবে। উভয় দেশের উৎকর্ষ-তারতম্য এইরূপে ক্রমেই কমিতে থাকিবে। যখন এই জাতীয় সংমিশ্রণে এত মঙ্গল সাধিত হইবার সম্ভাবনা, তখন ইহার পথে কণ্টকারোপণ করা স্বদেশা-নুরাগী ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। ইউরোপ-প্রত্যাগত যুবকমণ্ডলীকে সমাজচ্যুত করিয়া ভবিষ্য বিলাতগমনের পথে বাধা দেওয়া উচিত নহে। যে কার্য্য ভাল বলিয়া জানি, যে তাহা করিবে, তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সমাজে পুনঃপ্রবেশ করিতে বলা উচিত নহে। মূর্খ লোকের ভয়ে যুক্তি ও শাস্ত্রের মস্তকে পদাঘাত করা উচিত নহে। শাস্ত্রে জ্ঞানশিক্ষার জন্য দেশান্তরে গমন করা নিষিদ্ধ হয় নাই। বাণিজ্যব্যপদেশে অর্ণবযানে দেশদেশান্তরে গমনের প্রথাও পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল। তবে কেন আমরা স্থিতিশীলতার দাস হইয়া সমাজের শীর্ষভূত যুবকমণ্ডলীকে প্রত্যাখ্যাত করিয়া সমাজকে হীনবল করি? সময় আসিয়াছে —এখন উন্নতিশীল হিন্দুসমাজ ইচ্ছা করিলে দলবদ্ধ হইতে পারেন। আধিপত্য, ধন-সম্পত্তিতে তাঁহারা স্থিতিশীল হিন্দুসমাজ অপেক্ষা ন্যূন নহেন। তাঁহারা বদ্ধপরিকর হইলে স্থিতিশীল হিন্দুসমাজ অধিক দিন তাঁহাদিগকে চাপিয়া রাখিতে পারিবেন না। তাঁহারা দলবদ্ধ হইলে হিন্দুসমাজে সংস্কার ভিন্ন বিপ্লব উপস্থিত হইবে না। তাঁহারা দলবদ্ধ হইলে, তাঁহা-দিগের দ্বারা সমাজের বিশেষ উপকার সাধিত হইবে। যে শীর্ষভূত নব্যসম্প্রদায় প্রত্যাখ্যাত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া উন্নতিশীল দলকে হীনবল করিয়া তুলিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আবার সমাজভূত করিয়া হিন্দুসমাজ নিজ বল বৃদ্ধি ও ভারতের ভবিষ্য রাজ-নৈতিক একতার সূত্রপাত করিতে পারেন।

তৃতীয় প্রস্তাব

'ভিন্নরুচির্হি লোকঃ'—যখন প্রায় সমস্ত শিক্ষিত-সমাজ বিধবা-বিবাহের অনুকূলে ঘোরতর আন্দোলন তুলিয়াছেন, তখন কাহাকেও তাহার প্রতিকূলে আন্দোলন তুলিতে দেখিলে আমাদের মনে কালি-দাসের এই উক্তি স্বতই উদিত হয়। বিধাতা যখন সকলকেই ভিন্নরুচিসম্পন্ন করিয়াছেন, তখন যে সকলেরই রুচি সমান হইবে, এরূপ আশা করা যায়

না। সহযোগিনী সাধারণী প্রাপ্তিস্তম্ভে বিধবা-বিবাহকে স্পষ্ট মন্দ না বলিয়া তাহার বিরুদ্ধে এই কয়েকটি আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। (১) বিধবা-বিবাহ যখন অনেক দিন হইতে অপ্রচলিত রহিয়াছে, তখন সহসা এই প্রথার উচ্ছেদ হওয়ার সম্ভাবনা অল্প। (২) পুরাকালে এই প্রথা ভারতীয় আর্য্যগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল কি না, তাহা নিরূপণ করা দুরূহ। (৩) শাস্ত্রে যেরূপ লিখিত আছে, তাহাতে ইহাকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ বলিয়া বোধ হয় না। (৪) দুই একটি মাত্র ঋষি এ বিষয় সম্মতি, যুক্তি ও বিধান দিয়া গিয়াছেন মাত্র। (৫) বৈধব্য পুরুষের দোষেই ঘটিয়া থাকে, সুতরাং বিধবা-বিবাহ দেওয়া অপেক্ষা পুরুষের দোষ সংশোধন করাই বৈধব্য-নিরাকরণের প্রধান উপায়। (৬) ঈশ্বর আরাধনা ব্যতীত দেবত্ব-প্রাপ্তি হয় না। সেই ঈশ্বর আরাধনার প্রধান সহায় বৈরাগ্য। সেই জন্যই শাস্ত্রকারেরা বিধবার পক্ষে বৈরাগ্য-মূলক ব্রহ্মচর্য্যের অতি কঠোর ব্রতমালা বিহিত করিয়া গিয়াছেন এবং সেই কারণেই আত্ম-সংযমকে বিধবাগণের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (৭) বিধবার বয়সের নির্ব্বাচন না করিয়া বিধবামাত্রকেই বিধাতার রাজ্যে স্বেচ্ছাচারে বাস করিতে সম্মতি দিলে পরিণামে ধর্ম্ম ও আচার-ব্যবহারের বিলক্ষণ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। (৮) পরিণতবয়স্ক বিধবাগণের বিবাহ দিলে ধর্ম্ম-বিভাগের কার্য্য চলিতে পারে না। (৯) আর ধান-চালের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে লোকসংখ্যার আরও বৃদ্ধি করা যুক্তিসঙ্গত নহে।

আমরা এক একটি করিয়া এই পূর্ব্বপক্ষ কয়েকটির মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইব। (১) যাহা বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহা সহসা পরিবর্ত্তিত হয় না—এ সিদ্ধান্তের ব্যভিচার আমরা গত অর্দ্ধ-শতাব্দীর মধ্যে অসংখ্য দেখিয়াছি। আজ অর্দ্ধ-শতাব্দী মাত্র হইল, ভারতবর্ষে ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। ইহারই মধ্যে হিন্দুসমাজে ঘোরতর বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। সমস্ত হিন্দুসমাজ একেবারে ওতপ্রোত হইয়া গিয়াছে। পিতামহের আমলের সামাজিক অবস্থা হইতে বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থা অনেক পরিমাণে বিভিন্ন। কোন্ পরিবর্ত্তটি ভাল হইয়াছে, তাহার বিচার এখানে করিব না। শুদ্ধ এইমাত্র দেখাইব যে, সে হিন্দুসমাজ আর নাই। প্রত্যূষে উঠিয়া রজনীতে নিদ্রা যাওয়া পর্য্যন্ত একজন হিন্দু পূর্ব্বে যাহা করিতেন, তাহার এক-তৃতীয়াংশ করেন কি না সন্দেহ। যে সকল স্থিতিশীল নব্যসম্প্রদায়ের লোক এক্ষণে বিপরীত আন্দোলনের রোল তুলিয়াছেন, তাঁহারাও হিন্দুসমাজকে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে লইয়া যাইতে চাহেন না। যে সকল পরিবর্ত্তন তাঁহাদিগের নিজের সুবিধা-জনক, সেই পরিবর্ত্তনের স্রোতও তাঁহারা রোধ করিতে চাহেন না। কেবল যাহাতে স্বার্থের সংঘর্ষ আছে, এরূপ পরিবর্ত্তনের গতিরোধ করিতে চাহেন। দুই একটি উদাহরণ দিলেই আমাদের উক্ত স্পষ্ট হইবে। নব্য-সম্প্রদায় এতদিন জাতিভেদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত আন্দোলন করিয়া আসিতেছেন। এই আন্দোলনের ফলে উচ্চশ্রেণীস্থ শূদ্রের সহিত ব্রাহ্মণ-শ্রেণীর সামাজিক দূরত্ব কিছু কিছু কমিতেছে। অগ্রে যে কায়স্থাদি ব্রাহ্মণের বিছানায় বসিতে পাইতেন না, তাঁহারা নির্জ্জনে ভোজনে ব্রাহ্মণগণের সহিত এক পংক্তিতেও ভোজন করিয়া থাকেন। যাঁহারা এই অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা নিম্নতম শ্রেণীকে সে অধিকার দিতে প্রস্তুত নহেন। কায়স্থ ব্রাহ্মণকে নামাইবার জন্য জাতিভেদের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন, এখন নিম্নশ্রেণী যখন তাঁহাদিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হইয়াছেন, তখন তাঁহারা গোঁড়ামিবাদী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। পিতৃপৈতামহিক দেবদেবীকে পদদলিত করিব, গুরু-ব্রাহ্মণকে অপমানিত করিব, সামাজিক কর্তৃত্ব চির-নেতা ব্রাহ্মণের হস্ত হইতে নিজের হস্তে লইব, বাবুর্চ্চির হস্তে পচিত খানা খাইব, সাহেবী চালে চলিব—এ সমস্ত সময়ে আমি পরিবর্ত্তনশীল। আর যখন আমাকে কোন স্বার্থ পরিত্যাগ করিতে হইবে, তখনই আমি স্থিতিশীল। বিধবার বিবাহ সম্বন্ধেও এই কারণে উক্ত সম্প্রদায় স্থিতিশীল হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। বিধবা ভগিনী বা কন্যার বিবাহ দিতে গেলে আপাততঃ তাঁহাদিগকে বিবিধ প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। বিধবা কন্যা বা ভগিনী তাঁহার গৃহে অবৈতনিক পরিচারিকার কার্য্য করিয়া থাকেন, বৈতনিক পরিচারিকার দ্বারা যে সকল কার্য্য সম্পন্ন হইবার নহে, তাঁহাদিগের দ্বারা সে সকল কার্য্যও সম্পন্ন হইয়া থাকে। তাঁহাদিগের সেবা হইতে বঞ্চিত হওয়া ভিন্ন তাঁহাদিগের আর একটি গুরুতর অনিষ্ট এই হয় যে, সমাজ তাঁহাদিগকে আপাততঃ পরিত্যাগ করিবে। আবার বিধবা-বিবাহ

যুক্তি ও শাস্ত্রসম্মত বলিয়া স্বীকার করিয়া কার্য্যতঃ তাহার অনুষ্ঠান না করিলেও লোকে কপটী বলিয়া ঘৃণা করিবে, সুতরাং ইহার প্রতিপক্ষ অবলম্বন করাই তাঁহাদিগের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক। এই সকল কারণেই এই বিপরীত আন্দোলনের চেষ্টা! এই জন্যই এখন এ কথা উঠিতেছে যে, যাহা বহুদিন হইতে অপ্রচলিত রহিয়াছে, তাহাকে সহসা প্রচলিত করা যায় না। যাঁহাদিগের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, মতামত বিশ ত্রিশ বৎসরের মধ্যে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, তাঁহারাই এক্ষণে অপ্রচলিত বিধবা-বিবাহ সহসা প্রচলিত করা অসাধ্যসাধন বলিয়া খ্যাপন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। যদি বিধবা-বিবাহ যুক্তি ও শাস্ত্রের অনুমোদিত বলিয়া স্থিরীকৃত হয়, আর যদি আমরা কপটী না হই এবং একাগ্রচিত্তে এই প্রথার পুনঃপ্রবর্ত্তনে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে ইহা পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিতে কয় দিন লাগে? ইহা প্রচলিত করিতে বিশেষ কোন আড়ম্বরের প্রয়োজন নাই। যেমন কুমারী কন্যা বা ভগিনী যোগ্যা হইলে পিতা বা ভ্রাতা তাহার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হন, সেইরূপ ব্যস্ততা যদি তাঁহারা অপরিণতবয়স্কা বিধবার বিবাহের জন্য দেখান ও সৎপাত্র পাইলেই যদি তাহাদিগের বিবাহ দেন, তাহা হইলেই অতর্কিতভাবে ইহা সমাজমধ্যে চলিয়া যাইবে। যদি সুশিক্ষিত সমাজ, যে বিধবাবিবাহ দিল বা করিল, তাহার সহিত পূর্ব্ববৎ সমসামাজিকতা রাখেন, তাহা হইলে বিধবাবিবাহ দিতে বা করিতে লোকের অপ্রতুল হইবে না। সুতরাং যাহা আপাততঃ প্রচলিত করা সুকঠিন বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহা বিনা কষ্টে প্রচলিত হইয়া যাইবে।

২য়। পূর্ব্বপক্ষের মীমাংসায় আমরা অধিক বলিবার আবশ্যকতা দেখি না। যাঁহারা রামায়ণ-মহাভারত আনুপূর্ব্বিক পড়িয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, বিধবা-বিবাহ তৎকালে প্রচলিত না থাকিলে বড় বড় লোকে বিধবাবিবাহ করিতেন না বা বিবাহ করিবার উদ্যোগ করিতেন না। একটি আধটি দৃষ্টান্ত দিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে। বালীর মৃত্যুর পর সুগ্রীব বালীর বিধবা পত্নীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন বিধবা-বিবাহ করিয়াছিলেন। বিধবাবিবাহ প্রচলিত না থাকিলে দময়ন্তীর দ্বিতীয় স্বয়ংবরে সমস্ত নৃপতি ও দেবমণ্ডলী উপস্থিত হইতেন না। নলের অদর্শনে ব্যাকুলা হইয়া দময়ন্তী নলের সন্ধান পাইবার আশায় ঘোষণা করিলেন যে, নল রাজার মৃত্যু হওয়ায় তিনি আবার বিবাহ করিবেন। সেই স্বয়ংবর-সভায় দেব, নর, যক্ষ, কিন্নর সকলেই দময়ন্তীর পাণিগ্রহণ আশায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। যদি বিধবাবিবাহ সর্ব্ববাদি-সম্মত ও সর্ব্বত্র প্রচলিত না থাকিত, তাহা হইলে দময়ন্তীকে বিধবা জানিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য এত বড় বড় লোকের সমাগম হইত না। তদ্ভিন্ন বিধবাবিবাহের সার্ব্বজনিকতার জাজ্বল্যমান প্রমাণ—শাস্ত্রের ব্যবস্থা। যদি বিধবাবিবাহ সর্ব্ববাদি-সম্মত না হইত, তাহা হইলে মনু, পরাশর প্রভৃতি প্রধান প্রধান শাস্ত্রকারেরা কখন বিধবা-বিবাহের ব্যবস্থা দিতেন না। যাঁহারা বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তায় সন্দিহান, তাঁহারা যেন বিধবাবিবাহ-বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করিয়া দেখেন।

৩য়। শাস্ত্রে যেরূপ লিখিত আছে, তাহাতে ইহাকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ বলিয়া বোধ হয় না।—এই পূর্ব্বপক্ষের মীমাংসায় এইমাত্র বক্তব্য যে, কোন্ শাস্ত্রে বিধবাবিবাহকে সদোষ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার নির্দ্দেশ করা হয় নাই। তবে প্রতিপক্ষের অভিপ্রায় যদি এই হয় যে, শাস্ত্রে সহমরণকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিকল্প বলিয়া তদক্ষম পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য ও তদক্ষম পক্ষে বিবাহ, এই পর পর ক্রম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,—তাহা হইলে প্রত্যুত্তরে এইমাত্র বক্তব্য যে, সহমরণের নিরাকরণে বিধবার পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য ও বিবাহ, এই দুই বিকল্প মাত্র অধুনা বর্ত্তমান আছে। এই দুই বিকল্পের মধ্যে সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন যে প্রকৃত সন্ন্যাসিনী, তাহার পক্ষে ব্রহ্মচর্য্যই শ্রেয়ঃকল্প। যিনি স্বামীকে এতদূর ভালবাসিতেন যে, স্বামীর মৃত্যুতেও জগৎ স্বামিময় দেখিয়া থাকেন, ধ্যানে, জ্ঞানে, শয়নে স্বপনে যিনি মৃত স্বামী ভিন্ন আর কিছু দেখিতে পান না, সেই পতিদেবতা বিধবা জগতে আরাধ্যা। কোন্ প্রাণে কে তাঁহাকে আবার বিবাহ করিতে বলিবে? বিধবা-বিবাহ প্রবর্ত্তকগণের হৃদয় এ দেবীগণের জন্য কাঁদে না। কারণ, ইহাঁরা দুঃখিনী নহেন—মর্ত্ত্যে থাকিয়াও স্বর্গসুখের অধিকারিণী। কিন্তু কয়জনের অদৃষ্টে এই পতি-আরাধনা ঘটিয়া থাকে? কয়জন বিধবা মৃত পতিকে জগন্ময় দেখেন? কয়জন তাঁহাকে দেবতাভাবে পূজা করেন? আমরা

সর্ব্বপ্রকার ভাণ বা কপটাচারের বিদ্বেষী, সুতরাং আমরা সতীত্বের ভাণ বা কপটাচার চাহি না। তাই বলিতেছি, কয়জন এই আদর্শ-সতী হইতে পারেন? লোকের নিকট প্রতিপত্তি পাইবার জন্য বা বাহাদুরী দেখাইবার জন্য অনেক বিধবা পতিসহ সহমরণ গিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু কয়জন বিধবা সেই পরলোকগত স্বামীকে ভাবিতে ভাবিতে মৃত্যুভয় তুচ্ছ করিয়া চিতানলে দেহ ভস্মসাৎ করিয়াছিলেন? বরং ইতিহাসে রুধিরাক্ষরে লিখিত আছে যে, অধিকাংশ সতীকে বলপূর্ব্বক অগ্নিতে প্রক্ষেপ করা বা চাপিয়া ধরা হইত। সে নৃশংস কাণ্ড রাজশাসনে উঠিয়া গিয়াছে, এক্ষণে যাহা বর্ত্তমান আছে, তাহা তদপেক্ষা আরও ভয়ঙ্কর। অষ্টমবর্ষীয়া বালিকার বিবাহ দেওয়া হইল। বৎসর না যাইতে সে বিধবা হইল। হিন্দুসমাজ সেই দুগ্ধপোষ্যা বালিকাকে ব্রহ্মচারিণী সাজাইবেন। তাহাকে আজীবন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণী থাকিতে বলিবেন। হিন্দুসমাজ নীলোৎপলপত্র দ্বারা শাল্মলীবৃক্ষ ছেদন করিতে চেষ্টা করিবেন। অসম্ভবকে সম্ভব করিতে চেষ্টা করিবেন। যে চির-কঠোর চির-কৌমারব্রত ভীষ্মাদির পক্ষেও কষ্টসাধ্য, অজ্ঞানা বালিকা দ্বারা সেই কঠোর ব্রতের সাধনা করাইয়া লইবার চেষ্টা করিবেন। কিন্তু অসম্ভবকে সম্ভব করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত, সুতরাং এ চেষ্টার পরিণাম বিষময়। নরহত্যার স্রোতে ভারত ভাসিয়া যাইতেছে, অন্ধ হিন্দুসমাজ দেখিয়াও দেখিতেছে না! বর্ত্তমান সেন্‌সস্ দেখিলে কোন্ সহৃদয় ব্যক্তির হৃদয় না বিগলিত হয়? এই সেন্‌সসে জানা গিয়াছে যে, আজকাল ভারতবর্ষে ২ কোটি ৯ লক্ষ ৩৮ হাজার ৬ শত ২৬জন হিন্দু বিধবা রমণী আছে। ইহাদিগের মধ্যে ৭৮ হাজার বালবিধবার বয়স নয় বৎসরের মধ্যে; দুই লক্ষ সাত হাজার বালবিধবার বয়স নয় ও চৌদ্দের মধ্যে এবং তিন লক্ষ ৮২ হাজার বালবিধবার বয়স চৌদ্দ ও উনিশের মধ্যে। ইহাতে দেখা যায়, প্রায় ছয় লক্ষ বালবিধবার বয়স উনিশের কম। কোন্ পাষাণহৃদয় না বলিবেন যে, এই ছয় লক্ষ বালবিধবার বিবাহ দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য? কোন্ চিন্তাশীল ব্যক্তি না বলিবেন যে, ইহাদিগকে চিরবৈধব্য-যন্ত্রণায় দগ্ধ করা অপেক্ষা পতিসহ ভস্মসাৎ করা সহস্রগুণে অধিক দয়ার কার্য্য? এরূপ বিধবার বিবাহ দেওয়াকে যে সদোষ বলে, তাহার মত কঠিনহৃদয় ব্যক্তি আর দেখা যায় না। শাস্ত্রকারেরা যে অক্ষতযোনি বিধবার বিবাহকে প্রশস্ত ব'লয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সে এই বালবিধবাগণকে লক্ষ্য করিয়াই। কিন্তু আমরা পাষণ্ড, তাই শাস্ত্রের মস্তকে পদাঘাত করিয়া, দয়াবৃত্তিকে উন্মূলিত করিয়া, ন্যায়পরতার উচ্ছেদসাধন করিয়া এরূপ সুকুমারমতি বালিকাগণকে অতি কঠোর ব্রহ্মচর্য্যে নিয়োগ করিয়া থাকি। যাহা নিজে পারি না, তাহা এই বালিকাগণ দ্বারা সম্পন্ন করিয়া লইতে চাই।

৪র্থ। পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে এইমাত্র বক্তব্য যে, মনু ও পরাশর যে ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন, যদি অন্যান্য ঋষিরা তাহা শিরোধার্য্য করিয়া না লইতেন, তাহা হইলে তাঁহারা যুক্তি দ্বারা তাঁহাদিগের মতখণ্ডন করিয়া যাইতেন। কিন্তু কোন ঋষি তাহা করেন নাই, সুতরাং ইহা অনুমান করিয়া লইতে হইবে যে, বিধবা-বিবাহ তৎকালে সর্ব্ববাদিসম্মত ছিল, সেই জন্য ঋষিশ্রেষ্ঠ পরাশর ও মনু ইহার ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন এবং অন্যান্য ঋষিরা বিনা প্রতিবাদে তাঁহাদিগের মত শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াছেন। বিশেষতঃ "কলৌ পরাশরঃ স্মৃতঃ"—কলিতে পরাশরের মতই প্রবল।

"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে।"

সুতরাং পরাশর যখন এই শ্লোক দ্বারা বিধবার বিবাহ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তখন হিন্দু মাত্রেরই অপ্রতিবাদে সেই মত শিরোধার্য্য করিয়া লওয়া উচিত।

৫ম। পূর্ব্বপক্ষের অর্থ সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায় না। বৈধব্য পুরুষের দোষে ঘটিয়া থাকে, সুতরাং পুরুষের দোষ সংশোধন করিলেই বৈধব্য নিবারিত হইতে পারে। বিধবা-বিবাহ অপেক্ষা বৈধব্য মোচনের ইহাই প্রধান উপায়। পুরুষের কোন্ দোষে বৈধব্য ঘটে, তাহা আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম না। শারীরিক নিয়ম-লঙ্ঘনের ফলে পুরুষের অকাল-মৃত্যু ঘটে; পুরুষের অকাল-মৃত্যুই স্ত্রীজাতির বৈধব্যের মূল, সুতরাং পুরুষ যদি শারীরিক নিয়ম সকল প্রতিপালন করেন, তাহা

হইলে বৈধব্য মূলতঃ বিদূরিত হইতে পারে;—পূর্ব্বপক্ষকারের যদি এই অর্থ হয়, তদুত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, বিজ্ঞানের অসম্পূর্ণতা দারিদ্র্য ও অন্যান্য কারণে অকাল-মৃত্যু পৃথিবী হইতে কখনই একেবারে তিরোহিত হইবে না। অকাল-মৃত্যু শুদ্ধ যে পুরুষজাতিতে আবদ্ধ, এরূপ নহে, নারীজাতিতেও অকালমৃত্যু বিরাজমান। তবে শ্রমের অযথা বিভাগের জন্য চিরদিনই অকাল-মৃত্যু পুরুষজাতিতে প্রবলতর থাকিবে। পুরুষকে প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অর্থোপার্জ্জনে ঘুরিতে হয়, সুতরাং পুরুষের দীর্ঘায়ু হওয়া দুরূহ। যতদিন শ্রমবিভাগের এই অসম বিতরণ নিবারিত না হইবে, ততদিন পুরুষজাতির এই অকাল-মৃত্যুর প্রবলতা নিবারিত হইবার কোন আশা নাই। সুতরাং বিধবার সংখ্যা মোটামুটি এইরূপই থাকিবে। যদি কখন বিজ্ঞানের ভূয়সী আলোচনায় ও অন্যান্য কারণে অকাল-মৃত্যু নিবারিত হয়, তখন বিধবাই থাকিবে না, সুতরাং বিধবা-বিবাহ দিবার জন্যও কোন সহৃদয় ব্যক্তির হৃদয় বিগলিত হইবে না। কিন্তু এক্ষণে যে দুই কোটি দশ লক্ষ হিন্দু-বিধবার অশ্রুজলে ভারতবক্ষ প্লাবিত হইতেছে, তাহাদিগের উপায় কি হইবে? এই দুই কোটি দশ লক্ষের মধ্যে প্রায় সাত লক্ষ বাল-বিধবা আছে। কোন্ প্রাণে আমরা তাহাদিগের দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা উপেক্ষা করিয়া আত্মসুখে নিমগ্ন থাকিব? স্বার্থপরতার বশীভূত হইয়া কত দিন আর আমরা ইহাদিগকে চির-বৈধব্যানলে দগ্ধ করিব? পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে বালবিধবা ভগিনী বা কন্যা কণ্টকশয্যায় ছটফট্ করিতেছে আর তৎপার্শ্ববর্ত্তী গৃহে ভ্রাতা বা পিতা পত্নী লইয়া রঙ্গরস করিতেছে—এ মর্ম্মঘাতী পাপদৃশ্য আর আমাদিগকে কতদিন দেখিতে হইবে?

৬ষ্ঠ। পূর্ব্বপক্ষের উত্তর অতি সহজ। বৈরাগ্য ঈশ্বর-আরাধনার প্রধান উপায়। এই জন্যই শাস্ত্রকারেরা বিধবার পক্ষে বৈরাগ্য-মূলক ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, প্রকৃত নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণীকে আমরা পূজা করিয়া থাকি। সমর্থ পক্ষে শাস্ত্রকারেরা ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, কেহই তাহা অস্বীকার করিবে না। তবে সেই শাস্ত্রকরেরা অক্ষম পক্ষে বিধবার বিবাহেরও ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। যাহারা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যপালনে অক্ষম ও অনিচ্ছুক, তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক তাহাতে নিয়োগ করিবার তোমার কি অধিকার আছে? যে ভারবাহক, সে ভারবহনে অপারগ; তাহার মস্তকে সেই ভার অর্পণ করিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলার তোমার কি অধিকার আছে? ইহার বিষময় ফল তুমি কি প্রতিগৃহে প্রত্যক্ষ করিতেছ না? প্রতিগৃহ যে ভ্রূণহত্যামহাপাপে দগ্ধ হইতেছে, তাহা কি তুমি দেখিয়াও দেখিবে না? প্রকারান্তরে সেই মহাপাপের সহায়তা করিয়া তুমি কি সেই মহাপাপের অংশভাগী হইতেছ না? তোমার স্ত্রী-বিয়োগ হইলে, তুমি শতবার বিবাহ করিবে, আর তোমার বালিকা কন্যা বা ভগিনীর কপাল একবার ফাটিলে আর তাহা জুড়িয়া দিবে না—এ নীতিশাস্ত্র তোমরা কোথায় পাইলে? শাস্ত্রকারেরা যে ব্রহ্মচর্য্য ব্যবস্থা করিয়াছেন? তাহা একশ্রেণীনিষ্ঠ বা বলপ্রযুক্ত নহে। স্ত্রী বা পুরুষ যেই সমর্থ হইবে, তাহারই পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য শ্রেষ্ঠকল্প বলিয়া ঋষিরা উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারা স্বয়ং আদর্শ-ব্রহ্মচারী হইয়া এই উপদেশ দিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদিগকে দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তনে অনেকেই ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিত। অধিকাংশ বিধবা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিত বলিয়াই, বিধবাবিবাহ ক্রমে অগৌরবের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। যখন সহমরণ-প্রথা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, তখন যে বিধবা সহমরণে না যাইত, তাহাকে সকলেই অসতী বলিয়া ঘৃণা করিত। এই জন্য ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক, কিছুকাল বিধবামাত্রই সহমরণে যাইত। চিতায় আরোহণ করিলে পর যখন অগ্নি প্রজ্জলিত হইত, তখন অর্দ্ধদগ্ধ অনেক বিধবা প্রাণভয়ে অভিভূতা হইয়া লাফাইয়া পলায়ন করিবার চেষ্টা করিত। কিন্তু কঠোরহৃদয় আত্মীয়-স্বজন ধরিয়া আনিয়া আবার তাহাদিগকে চিতায় আরোপিত করিয়া যতক্ষণ না পুড়িয়া ভস্মসাৎ হইত, ততক্ষণ বাঁশ দিয়া চাপিয়া রাখিত। সে নৃশংস প্রথা মহাত্মা রামমোহন রায়ের যত্নে বিদূরিত হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে যে প্রথা রহিয়াছে, তাহা সহমরণ অপেক্ষাও অধিকতর নৃশংস। যে পুড়িয়া মরিতে অনিচ্ছুক, তাহাকে বলপূর্ব্বক পুড়াইয়া মারিয়া তাহার অনন্ত যাতনার অবসান করা যাইত। কিন্তু এই নৃশংস প্রথা বালবিধবাগণকে প্রতিদিন দগ্ধ

করিতেছে। বিন্দু বিন্দু করিয়া তাহাদিগের শোণিতপাত করিয়া ক্রমে তাহাদিগের জীবন অবসান করিতেছে। সহ্য করিতে পারিতেছে না, তথাপি তাহাদিগের চিরবৈধব্যানলে দগ্ধ করা হইতেছে। শাস্ত্রের মস্তকে পদাঘাত করিয়া আমরা জঘন্য দেশাচারের দাস হইয়া প্রতিদিন প্রতিগৃহে এই নৃশংস দৃশ্যের অবতারণা করিতেছি। ধিক্ আমাদের শিক্ষায়! শত ধিক্ আমাদের জীবনে! আমরা ধর্ম্মের ভাণ করিয়া ঘোরতর অধর্ম্মের প্রশ্রয় দিতেছি। শাস্ত্রকর্ত্তাগণের দোহাই দিয়া তাঁহাদিগের ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীতাচরণ করিতেছি। অসংখ্য প্রাণিবধের নিমিত্ত-কারণ হইয়া ঘোরতর নারকী হইতেছি। প্রকৃতি আমাদের এরূপ কলুষিত হইয়া গিয়াছে যে, আমরা এই পাপদৃশ্যে ব্যথিত হই না। আমাদের হৃদয়ের দয়াবৃত্তি একেবারে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। আমরা এরূপ নিষ্ঠুর হইয়া গিয়াছি যে, এই শোচনীয় দৃশ্যে শুদ্ধ যে আপনারা ব্যথিত হইব না, এরূপ নহে, যদি আর কেহ ব্যথিত হন, তাঁহার উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিব। আপনারা তাহাদিগের উদ্ধারের কোন পন্থা করিব না—তাহাতেই সন্তুষ্ট নহি—আর যদি কেহ সে পন্থা করিয়া দেয়, তাহাকে খাইয়া ফেলিতে উদ্যত হইব। এই নিষ্ঠুরতায় পিতা-মাতা ভ্রাতা-ভগিনী সকলেই পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন। মহীয়ান্ সনাতন হিন্দুধর্ম্ম কি আমাদিগকে এই শিক্ষা দিয়াছে? দেবোপম ঋষিবৃন্দ কি আমাদিগকে এই ঘাতকবৃত্তি অবলম্বন করিতে বলিয়াছেন? কখনই নহে! শাস্ত্রের দোষ নাই, শাস্ত্রকর্ত্তৃগণের দোষ নাই, আমাদের অদৃষ্টের দোষ। তাই আজ আমরা সেই দেবগণের বংশধর হইয়া শৌনিকবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি।

সপ্তম ও অষ্টম পূর্ব্বপক্ষের উত্তর একই। যদি পুরুষের সন্তানাদি থাকিতে বিবাহ প্রতিষিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে স্ত্রীজাতির সন্তানাদি থাকিতে দ্বিতীয়বার বিবাহের নিষেধ সাম্যনীতি ও ন্যায়পরতার বিরোধী। এরূপ স্থলে বিবাহ না করিলে ভাল হয়, তাহা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। কিন্তু যেখানে অনিবার্য্য কারণে বিবাহ আবশ্যক হইয়া উঠে, সেখানে নিষেধ করার ফল প্রায় বিষময় হইয়া উঠে। এমন অনেক স্থলে ঘটে যে, কোন বিধবা রমণী দুই একটি শিশু সন্তান লইয়া বিধবা হইয়াছেন—অভিভাবক কেহই নাই, ধনসম্পত্তিও নাই, সুতরাং অনেক সময়ে গত্যন্তর না থাকায় তাঁহার হয় ত কাহারও নিকট আত্ম-বিক্রয় করিতে হইল। এরূপ স্থলে বিবাহ কি শ্রেয়ঃ নহে? যিনি বিবাহ করিবেন, তিনি যদি অনুগ্রহ করিয়া শিশুসন্তানগুলির ভার গ্রহণ করেন, তাহা হইলে জগতের কি অধিক মঙ্গল হইল না? কাহারও নিকট দাসবৃত্তি করিয়া উদর-পূরণ করা অপেক্ষা ইহা কি সহস্রগুণে অধিকতর গৌরবের বিষয় নহে? যুবতী পরিচারিকা বা পাচিকার পরগৃহে সচরাচর যেরূপ দুর্গতি ঘটিয়া থাকে, তাহা কাহার অবিদিত আছে? যে বিধবার যৌবনকাল উত্তীর্ণ হইয়াছে বা যিনি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যে জীবন উৎসর্গ করিতে কৃতসঙ্কল্পা হইয়াছেন, তাঁহাদের বিবাহের জন্য কেহই চেষ্টা করিতেছে না। যে অসংখ্য বাল-বিধবার অশ্রুজলে ভারতবক্ষ প্লাবিত হইতেছে, হৃদয়বান লোক তাহাদিগের দুঃখমোচনের চেষ্টা করিতেছেন মাত্র! কিন্তু এরূপ বিশাল কার্য্যক্ষেত্রে অতি অল্প লোকই নামিয়াছেন। তাঁহাদিগের চেষ্টায় এরূপ সুবৃহৎ কার্য্য সুসম্পন্ন হইবার নহে। এই জন্য সহৃদয়মাত্রকেই আমরা অনুরোধ করি, তাঁহারা দীর্ঘসূত্রিতার বশীভূত হইয়া যেন কার্য্যক্ষেত্রে নামিতে আর কালবিলম্ব না করেন।

নবম পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে অল্পই বক্তব্য আছে। ভারতবর্ষের লোকসংখ্যার পরিমাণ ইউরোপ অপেক্ষা অধিক হইয়াছে, সেনসস্ দ্বারা এরূপ প্রমাণীকৃত হয় নাই। প্রত্যক্ষ আমরা যাহা দেখিতে পাই, তাহাতে স্পষ্টই প্রতীতি জন্মে যে, আমরা অধিকতর জ্ঞানবান্ ও অধিকতর শ্রমশীল হইলে বিবিধ প্রকারে জাতীয় ধনবৃদ্ধি করিতে পারি। আহারের অভাব হইলেই লোকের অধিকতর শ্রম করিতে ও অধিকতর বুদ্ধির উদ্ভাবনা করিতে হইবে। সেন্‌সস্-দ্বয়ের তুলনায় সমালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, হিন্দুজাতি অপেক্ষা মুসলমান সংখ্যায় অধিকতর বৃদ্ধি পাইতেছে। মুসলমানের যেরূপ সংখ্যা-বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে ভারতবর্ষ অচিরকালমধ্যে মুসলমানে পূরিয়া যাইবে। একদিকে হিন্দুজাতি নিরন্তর আত্মধ্বংস করিতেছেন, লোকসংখ্যা বৃদ্ধির অন্তরায়-স্বরূপ বিবিধ সামাজিক নীতি পোষণ করিতেছেন, অন্যদিকে দূরদর্শী মহম্মদের ব্যবস্থাবলে মুসলমানেরা পঙ্গপালের ন্যায় ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিতেছে। এরূপ চলিতে

দিলে অল্প-কাল-মধ্যে হিন্দুস্থান মুসলমানস্থানে পরিণত হইবে। যাঁহারা হিন্দুজাতির ধ্বংসকামী নহেন, তাঁহারা বিধবা-বিবাহের গতিরোধ করিতে চেষ্টা করিবেন না। বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হইলে, হিন্দু-জাতি হিন্দুস্থানে আপনার আধিপত্য রাখিতে সমর্থ হইবে। আড়াই কোটি হিন্দু-বিধবার সন্তান হইলে হিন্দুজাতির কতদূর সংখ্যাবল বাড়িতে পারে, যাঁহারা একবার ইহা ভাবিবেন, তাঁহারা হিন্দু-বিধবা-বিবাহের কখন প্রতিপক্ষ হইবেন না। ম্যাল্‌থসের মত চালাইবার সময় আমাদের এখনও আসে নাই। যাঁহারা একান্তই সে মতের পক্ষপাতী, তাঁহারা যেন আপনারা লোক-বৃদ্ধিকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হন। আপনাদিগের মত, অনাথিনী বিধবাগণের উপর দিয়া চালাইবার চেষ্টা করা নৃশংসতা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

জাতীয় চরিত্র

কোন সমাজ-সংস্কার করিতে গেলে আমাদের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য জাতীয় চরিত্রসংগঠন। চরিত্রই সর্ব্বসংস্কারের ভিত্তিভূমি। আমাদের অধঃপতনের মূল কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আমাদের জাতীয় চরিত্র সংগঠিত না হইলে আমাদের অভ্যুত্থানের আর কোন আশা নাই। যে কারণে আমাদের অধঃপতন হইয়াছে, সে কারণ থাকিতে আমাদের উঠিবার আশা কোথায়? আত্মোৎসর্গ, সৎসাহস, অধ্যবসায়, সত্যপ্রিয়তা, বিশ্বাসানুবর্ত্তিতা, পরস্পর মমতা ও পরস্পর বিশ্বাস —জাতীয় চরিত্রের এই কয়েকটিই প্রধান উপকরণ-সামগ্রী। আমি যখন আত্ম ভুলিয়া স্বজাতির জন্য ও স্বদেশের জন্য প্রাণোৎসর্গ করিতে শিখিব, তখনই আমার জাতি—আমার দেশ—জগতের শ্রদ্ধাভাজন হইবে। তখনই আমার জাতি ও আমার দেশ পৃথিবীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা-সমরে অবতীর্ণ হইতে পারিবে। যখন নিরন্তর বাধা বিপত্তিতেও আমার অধ্যবসায় বিচলিত হইবে না, তখনই আমি মহীয়ান্ হইব এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আমি—সমষ্টি-জড়িত আমার জাতি ও আমার দেশও মহীয়ান্ হইয়া উঠিবে। যখন আমি যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বিশ্বাস করিব, প্রাণাত্যয়েও তাহা হইতে বিচলিত হইব না, তখনই আমার এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে দেশের প্রকৃত উন্নতি আরম্ভ হইবে। যদি আমি নির্যাতন-ভয়ে আমার কর্ত্তব্যজ্ঞান হইতে বিচলিত হই, তাহা হইলে আমার নৈতিক বল চলিয়া যাইবে। আমি ক্রমশঃ ভীরু ও কাপুরুষ হইয়া যাইব। আর আমি তুমি সকলেই যদি ভীরু ও কাপুরুষ হইয়া যাই, তাহা হইলে আমি তুমি সংগঠিত সমাজও সেই সঙ্গে সঙ্গে ভীরু ও কাপুরুষ হইতে থাকিবে। যে জাতির অধিকাংশ লোক ভীরু ও কাপুরুষ, সে জাতি কখন দাসত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারে না। সামান্য নির্যাতন-ভয়ে কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান ও বিশ্বাসের অনুবর্ত্তন হইতে বিমুখ হয়, সে যে গুরুতর নির্যাতন সহ্য করিতে পারিবে, তাহার আশা কোথায়? স্বাধীনতা রক্ষা করিতে বা অপহৃত স্বাধীনতা পুনঃপ্রাপ্ত হইতে যে পরিমাণ আত্মোৎসর্গের প্রয়োজন, যাহারা ক্ষুদ্র সামাজিক নির্যাতনে ভীত হয়, সেই কাপুরুষগণের পক্ষে সে আত্মোৎসর্গ আকাশকুসুমবৎ প্রতীত হইবে। যাহারা প্রতিবেশীর অরুণ নয়ন একবার দেখিলে ভয়ে অভিভূত হয়, তাহারা যে স্বদেশের জন্য—স্বজাতির জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হইবে, তাহা দুরাশা মাত্র। এই জন্য বলিতেছি, যদি জাতীয় গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে চাও, তাহা হইলে তোমাকে অগ্রে চরিত্রগঠন করিতে হইবে।

জাতীয় উন্নতির প্রধান কারণ যদি চরিত্রসংগঠন হয়, তাহা হইলে দেখিতে হইবে, আমাদের জাতীয় চরিত্রে কি কি অভাব আছে। যাঁহারা বলেন যে, আমাদের জাতীয় চরিত্রে কোন অভাব নাই, তাঁহারা চরিত্র-বিশ্লেষণে নিতান্ত অসমর্থ। লক্ষ্যের অবিচলিতা ও একতা, দুর্দ্দমনীয় সাহস, অবিচলিত অধ্যবসায় ও আত্মত্যাগ—জাতীয় চরিত্রের এই কয়টি প্রধান উপাদান আমাদের চরিত্রে অতি অল্পমাত্রায় বিদ্যমান আছে। বৎসর বৎসর বিদ্যালয় হইতে অনেক উপাধিধারী সংসার-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেছেন, কিন্তু তাহার মধ্যে কয়জনের চরিত্রে এই সকল উপাদান-সামগ্রী দেখিতে পাওয়া যায়? অনেককেই দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহাদিগের জীবনের কোনই লক্ষ্য নাই—অথবা যদি লক্ষ্য থাকে, তাহা সতত পরিবর্ত্তনশীল। তাঁহারা

বায়ুতাড়িত তুলার ন্যায় এক লক্ষ্য হইতে আর এক লক্ষ্যে সতত বিক্ষিপ্যমাণ, তাঁহারা লক্ষ্যের অনুসরণ করেন না, লক্ষ্য তাঁহাদিগের অনুসরণ করে। তাঁহারা সর্ব্বথা চলৎলক্ষ্য, এ কথা বলিতে পারি না। তাঁহাদিগের একটি লক্ষ্যের স্থিরতা আছে যে, কোন রকমে অর্থসংগ্রহ করা। নিজের হৃদয়কে শুষ্ক করিয়া, দুঃস্থ আত্মীয়-স্বজনের দুঃখে কর্ণপাত না করিয়া কেবল অর্থসংগ্রহ করা—এ লক্ষ্যের অবিচলিতত্তা অনেক স্থলেই পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু ইহাতে জাতীয় উন্নতি কিরূপে হইবে? নিজের স্বার্থসাধনেও জাতীয় উন্নতি প্রকারান্তরে হয় বটে, কিন্তু তাহাতে মানসিক তেজ জন্মে না। ব্যক্তিগত মানসিক তেজের সমবায়ই সামাজিক বা জাতীয় তেজ। সেই ব্যক্তিগত তেজের অভাবই আমাদের জাতীয় নিব্বীর্য্যতার কারণ।

এক্ষণে কিরূপে সেই ব্যক্তিগত তেজের উৎপত্তি হইতে পারে, আমরা তাহার আলোচনা করিব। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, (১) লক্ষ্যের অবিচলিতত্তা ও একতা, (২) দুর্দ্দমনীয় সাহস, (৩) অবিচলিত অধ্যবসায় ও (৪) আত্মত্যাগ, মহৎ-চরিত্রের এই কয়টি প্রধান লক্ষণ। যদি আমরা একটি লক্ষ্য ধরিয়া আজীবন অবিচলিতভাবে একপথে চলিতে পারি, তাহা হইলে প্রতিপদে আমাদের মনের তেজোবৃদ্ধি হইতে থাকিবে যেমন মাধ্যাকর্ষণশক্তিবলে ক্ষুদ্রতর জড়ের বৃহত্তর জড়াভিমুখে গতির পরিমাণ ক্রমেই বাড়িতে থাকে, সেইরূপে অনবরত এক লক্ষ্যাভিমুখে ধাবিত হইলে আমাদের মনের তেজ ক্রমশঃই বাড়িতে থাকিবে। প্রতি মন এক-লক্ষ্য নিষ্ঠ হইলে জাতীয় শক্তি ক্রমশঃই উপচীয়মান হইতে থাকিবে। যাহা জাতীয় মঙ্গলের নিদান, তৎসাধনে যদি আমরা অবিচলিত অধ্যবসায়, দুর্দ্দমনীয় সাহস ও আত্মত্যাগ করিতে শিখি, তাহা হইলে ব্যক্তিগত মানসিক বলোপচয়ের সহিত জাতীয় বলোপচয় আপনিই ঘটিতে থাকিবে।

কিন্তু আমরা তাহার কি করিতেছি? যাহাতে সেই ব্যক্তিগত তেজ উৎপন্ন হয়, তাহার জন্য কি উপায় অবলম্বন করিতেছি? অভ্যাস ব্যতীত কোন গুণ স্বতই উৎপন্ন বা পরিপুষ্ট হয় না। আমরা সেই ব্যক্তিগত গুণের উৎপত্তি বা পরিপুষ্টসাধনের জন্য কি অভ্যাস বা সাধনা আরম্ভ করিয়াছি? আমরা শুদ্ধ কলিকাতার আন্দোলন দেখিয়া মুগ্ধ হইব না। কলিকাতায় এক্ষণে অনেক বিষয়ের আন্দোলন হইতেছে বটে, কিন্তু আজও কোন বিষয়ে প্রকৃত প্রস্তাবে কার্য্য আরম্ভ হয় নাই। কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে মৌলিক ও লিখিত আন্দোলন একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু যাহারা চিরদিনই আন্দোলন করিয়া বেড়ায়, কখন কার্য্যক্ষেত্রে নামিতে সাহস করে না, তাহাদের চরিত্র কখন স্ফূর্ত্তি পায় না। নিরন্তর অপরকে যে কার্য্য করিতে উপদেশ দিতেছি, যদি নিজে কখন সে কার্য্য না করি, তাহা হইলে আমার উপদেশ লোকে শুনিবে কেন? সুতরাং লোককে যে কার্য্যে উত্তেজিত করিতে হইবে, অগ্রে স্বয়ং দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা দেখাইতে হইবে। ৺কেশবচন্দ্র সেনের মাহাত্ম্য বোধ হয় অতি অল্পলোকেই অস্বীকার করেন। যাঁহারা তাঁহার মাহাত্ম্য স্বীকার করেন, তাঁহারাও যে তাঁহার কন্যার বিবাহে চটিয়াছিলেন, তাহার কারণ —তাঁহারা কেশব বাবুকে কপটী বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। উক্তির সঙ্গে কার্য্যের সামঞ্জস্য না দেখিলে লোকের মনে শ্রদ্ধার উদয় হয় না। পূজনীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুত্রের বিধবাবিবাহ হওয়ার পূর্ব্বে লোকে তাঁহাকে কপটী বলিয়া সন্দেহ করিত। এমন কি, আমার সম্মুখে কোন বড় লোক বলিয়াছিলেন যে, তিনি আপনার ঘর ঠিক রাখিয়া পরের ঘর মজাইতেছেন। কিন্তু এখন আর তাঁহাকে সে কথা কেহ বলে না—বলিতেও পারে না।

কিন্তু আমাদের নব্য-সম্প্রদায়ে আমরা কি দেখিতে পাই? অধিকাংশই কেবল মুখ-সর্ব্বস্ব—আজ্ঞাদানে উদ্যত, আজ্ঞাপালনে পরাঙ্মুখ। বাক্য ও কার্য্যের সামঞ্জস্য অতি অল্পস্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়। কি সমাজ-সংস্কার, কি রাজনৈতিক আন্দোলন —সকল বিষয়েই যতদূর সম্ভব, তাহাতে কেহই পশ্চাৎপদ নহেন। কিন্তু কার্য্য উপস্থিত হইলেই বিষম বিপদ্। যাঁহারা সভাস্থলে দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতায় সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন, গৃহে আসিলে তাঁহাদিগের আর সে মূর্ত্তি দেখিতে পাই না। তখন এক এক জন দলপতি। সভায় যাঁহারা সংস্কারের একান্ত আবশ্যকতা ও সবিশেষ উপযোগিতা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারাই কার্য্যক্ষেত্রে

আসিয়া বলিতে আরম্ভ করেন যে, "সময় আসিলে আপনিই হইবে,"—"রোম এক দিনে নির্ম্মিত হয় নাই (Rome was not built in a day)," "বলপূর্ব্বক সংস্কার করিতে গেলে উন্নতির স্রোত প্রতিহত হইবে।" সত্য, রোম এক দিনে নির্ম্মিত হয় নাই, কিন্তু প্রতিদিনই রোমের কার্য্য না চলিলে, কালের গতিতে রোম কিছু একদিনেই একেবারে অনন্তশৌর্য্যশালিনী হইত না। যাহারা ভাবে যে, রোমের অল্প অল্প কার্য্য আরম্ভ না হইয়াই রোম এক দিনে গগনস্পর্শিনী সৌধমালায় সুশোভিত হইয়াছিল, তাহারা মূর্খ, তাহাদিগের সহিত আমাদের কোন কথা নাই। রোমের ন্যায় সমাজসৌধও প্রতিদিনের একটু একটু কার্য্যে নির্ম্মিত হইয়াছে। আবার প্রতিদিনের একটু একটু কার্য্যে সেই সমাজসৌধের জীর্ণসংস্কার হইয়া থাকে। যে অলস ব্যক্তিরা জীর্ণ সংস্কার করিতে না চায়, তাহাদিগের অট্টালিকা অচিরকালমধ্যে নিশ্চয় ভূমিসাৎ হইবে।

যেখানকার লোকে এতদূর স্থিতিশীল যে, যাহা আছে, তাহাতেই পরিতৃপ্ত, কোন প্রকার জীর্ণসংস্কার করিতে চাহে না, সেখানে বিপ্লব অনিবার্য্য। হিন্দুসমাজের ঠিক সেই অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। এক দিন যখন ব্রাহ্মণেরা অতিশয় স্থিতিশীল হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তখন বৌদ্ধবিপ্লব উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মকে ভাসাইয়া লইয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছিল। কিন্তু উদারমতি শঙ্করাচার্য্যের বুদ্ধিবলে ও অদ্বৈতবাদের মোহিনী শক্তিতে সে প্রকাণ্ড বিপ্লবও প্রতিহত হইল। গুরুগোবিন্দ ও চৈতন্য আর দুইবার এই অচল সাগরে তরঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছিলেন, কিন্তু সে তরঙ্গ দীর্ঘকালস্থায়ী হয় নাই।

এক্ষণে প্রকৃতের অনুসরণ করি। সমাজসংস্কার বা সমাজবিপ্লব এই দুইয়েরই ভিত্তিভূমি চরিত্র। জাতীয় চরিত্র সুদৃঢ় না হইলে সংস্কারে বা বিপ্লবে প্রবৃত্তিই জন্মিতে পারে না। শুদ্ধ নেতার মনে সে প্রবৃত্ত জন্মিলে সংস্কার বা বিপ্লব সাধিত হইতে পারে না। জাতীয় মন সংস্কার বা বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত না হইলে, শুদ্ধ নেতা একাকী কি করিতে পারেন? সমস্ত জাতি যখন গমনোদ্যত হইবে, নেতা তখন পথিপ্রদর্শক হইয়া তাহাদিগকে লইয়া যাইতে পারেন। সেই জাতীয় প্রবৃত্তি—জাতীয় চরিত্রের ফলমাত্র।

যখন জাতিসাধারণ সৎ ও অসৎ বুঝিতে শিখিবে, এবং বুঝিয়া সত্যের অনুসরণ করিতে শিখিবে, তখনই প্রকৃত জাতীয় উন্নতি আরম্ভ হইবে। যে ব্যক্তি জগতে আসিয়া কিছুই করিতে চাহে না—পশুদিগের ন্যায় ক্ষুৎ-পিপাসার নিবৃত্তি করিয়াই পরিতৃপ্ত, তাহার ভাল-মন্দ বিচারে শক্তি থাকুক বা না থাকুক, তাহাতে জগতের ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। যাহার সৎকার্য্যে প্রবৃত্তি নাই, তাহার কোন্‌টি সৎ কার্য্য জানিয়া বিশেষ লাভ কি? সেইরূপ যে জাতি বা যে সমাজ জড়বৎ থাকিতে চাহে, সে সমাজের বা জাতির সদসৎজ্ঞানে বিশেষ ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। যে অবিরাম চক্ষু বুজিয়া থাকিতে চাহে, তাহার চক্ষুষ্মত্তা বিড়ম্বনা মাত্র। সেইরূপ যে সমাজ বা জাতি চক্ষু থাকিতেও দেখিতে চাহে না, তাহার চক্ষু বিড়ম্বনা মাত্র।

হিন্দুসমাজের অবস্থা ঠিক এইরূপ। হিন্দুসমাজ চক্ষু থাকিতে অন্ধ। সদসৎবিবেকবিহীন না হইয়াও সতের অনুকরণে প্রবৃত্তি-বিহীন। যে সকল সুশিক্ষিত লোক সংস্কারের একান্ত আবশ্যকতা স্বীকার করেন, তাঁহারা সেই সংস্কারকার্য্যে শুদ্ধ যে প্রবৃত্তিবিহীন, এরূপ নহে, কেহ প্রবৃত্তিমান্ হইলে তাহাকে সবিশেষ নির্য্যাতন করিয়া থাকেন। আপনারা যে সকল কার্য্য করিতে ইচ্ছুক, কিন্তু অক্ষম, অন্যে যদি তাহা করে, তাহাকে সমাজবহিষ্কৃত করিয়া দিবেন, তাহাকে কুক্কুরের ন্যায় ঘৃণা করিবেন। আমরা এক একটি করিয়া দৃষ্টান্ত দিয়া পাঠকগণকে বুঝাইয়া দিব। প্রথমতঃ সুশিক্ষিত যুবকমাত্রই স্বীকার করেন যে, সাহেবেরা যে সকল অধিকার একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছেন, যদি বিলাতী পরীক্ষা দিতে উত্তীর্ণ হইয়া ভারতযুবক সেই সকল অধিকার সাহেবদিগের মুখ হইতে ক্রমে ক্রমে কাড়িয়া লইতে পারেন, তাহা হইলে দেশের প্রকৃত মঙ্গল-সাধন করা হইবে। এ বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। কিন্তু যে হিন্দু যুবক এই অসাধ্যসাধন করিয়া দেশে প্রত্যাগত হইবেন, শিক্ষিতমন্য নব্যসম্প্রদায় তাঁহাকে সমাজগণ্ডীবহিষ্কৃত করিয়া দিবেন। তাঁহারা একজন সাহেবকেও যে ভাবে গ্রহণ করিবেন একজন বিলাত-প্রত্যাগত যুবককেও প্রায় সেই ভাবে গ্রহণ করিবেন। ইহার পরিণাম—অন্তর্ব্বিপ্লব ও অন্তর্জ্জাতীয় বিদ্বেষ। তুমি যখন একজনকে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলে, তখন তোমার সমাজের উপর তাঁহার পূর্ণ মমতা হওয়ার

সম্ভাবনা কি? তোমার সহিত আহার-ব্যবহার ও আদান-প্রদান করার যখন তাঁহার অধিকার রহিল না, তখন তাঁহার পক্ষে সামাজিক সম্বন্ধে তুমিও যাহা, একজন বৈদেশিকও তাহা। তুমি বলিয়া থাক যে, হিন্দুসমাজ দুই দশ হাজার লোককে সমাজ-বহিষ্কৃত করিতে ভীত হয় না। কারণ, অনন্ত সাগর হইতে কতিপয়-পরিমিত জল লইলে যেমন সাগরের কোন ক্ষতি হয় না, সেইরূপ পঞ্চদশকোটি হিন্দুসমাজ হইতে দুই দশ হাজার হিন্দুকে সমাজবহিষ্কৃত করিলে হিন্দু-সমাজের কোন ক্ষতি হইবে না। এরূপ ভ্রমাত্মক কথা—অনেক সুশিক্ষিত লোকের মুখেই শুনিয়াছি। কিন্তু তাঁহাদিগের বিবেচনা করা উচিত যে, যাহা সসীম, সীমা কমিলেই তাহা সঙ্কীর্ণতর ও দুর্ব্বলতর হইবে। বিশেষতঃ বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, মান ও পদে যাঁহারা শীর্ষস্থানীয়, তাঁহাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দিলে—হিন্দুসমাজ মস্তকহীন হইয়া পড়িবে।

দ্বিতীয়তঃ, বহুদিন হইতে শিক্ষিতমণ্ডলী মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া আসিতেছেন যে, বিধবাবিবাহ শাস্ত্র ও যুক্তির অনুমোদিত। এ বিষয়ে বক্তৃতা বা রচনা করিতেও তাঁহারা ত্রুটি করেন নাই এবং করিতেছেনও না। কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে কয়জন তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে উদ্যত আছেন? কার্য্যে পরিণত করা দূরে থাকুক, যাঁহারা ইহার ঐকান্তিক আবশ্যকতা স্বীকার করেন, যিনি ইহা কার্য্যে পরিণত করিবেন—তাঁহারা তাঁহাকে অর্দ্ধ-চন্দ্র প্রদানপূর্ব্বক সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবেন। তাঁহারা বিধবা ভগিনী বা বিধবা কন্যার ভ্রূণহত্যাবিষয়ে সহায়তা করিবেন, তথাপি তাঁহাদিগের বিবাহ দিবেন না। বেশী চাপিয়া ধরিলে উত্তর দিবেন—'সময় আসিলে আপনিই হইবে, চেষ্টা করিয়া সময় আনা যায় না ইত্যাদি।' অলস বা কপটীর ইহা অপেক্ষা সুখকর ও সুবিধাজনক উত্তর আর নাই।

তৃতীয়তঃ, সাম্যবাদীরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন যে, অকারণ বিষাক্ত শ্রেণীবিভাগ জগতের সমূহ ক্ষতিকারক। এক সময়ে ব্রাহ্মণেরা আধ্যাত্মিক উৎকর্ষে ভারতের অন্যান্য জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। সেইরূপ রণবিষয়িণী প্রতিভায় ক্ষত্রিয়েরা, বাণিজ্যবিষয়িণী প্রতিভায় বৈশ্যগণ শ্রেষ্ঠ ছিলেন। সুতরাং নিম্নতর শ্রেণী হইতে উচ্চতর শ্রেণীর প্রাধান্য বিনা আপত্তিতে স্বীকৃত হইত। কিন্তু এক্ষণে কাল-বশে সকলেই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রেণীগত উৎকর্ষ বিলুপ্তপ্রায়, অথচ শ্রেণীবিভাগ পূর্ব্বের ন্যায়ই কঠোর রহিয়াছে। সুশিক্ষিত-সম্প্রদায় ইহা বুঝিতে পারিয়াছেন এবং বুঝিতে পারিয়া এ শ্রেণীবৈষম্যের বিরুদ্ধে বক্তৃতাদি করিতেছেন। অনেকেই বলিয়া থাকেন, যতদিন ভিন্ন শ্রেণীর উপযুক্তগণের মধ্যে অন্তর্জাতীয় বিবাহাদি প্রচলিত না হইবে, ততদিন ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতির আশা নাই। অনেক সুশিক্ষিত ব্যক্তি গুপ্তভাবে বিভিন্ন বর্ণের সঙ্গে একত্র আহারাদি করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে কয়জন প্রকাশ্যরূপে তাহা করিতে প্রস্তুত আছেন? অধিক কি, কয়জন এক-বর্ণের ভিতর সমভাবে ব্যবহার করিতে শিখিয়াছেন? যিনি কুলীন-বংশ-জাত, তিনি নব-গুণযুক্ত বংশজকে কন্যাদানে কিছুতেই সম্মত হইবেন না। রাঢ়ী, বারেন্দ্র ও বৈদিক প্রভৃতি যেন এক একটি স্বতন্ত্র বর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কোন পার্থক্য নাই—কোন উৎকর্ষভেদ নাই, অথচ যেন পরস্পর পরস্পরের অস্পৃশ্য। পরস্পর পরস্পর হইতে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর দ্বারা পৃথক্-কৃত। আমরা চতুর্দ্দিকে রাজ-নৈতিক আন্দোলনের ধ্বজা উড়াইতেছি; বৈদেশিক শাসনকর্ত্তৃগণের যশোগানে গগন প্রতিধ্বনিত করিতেছি; কিন্তু ভারতের একতার মূলীভূত অন্তরায়-নিচয়ের দিকে একবারও তাকাইতেছি না। বক্তৃতার সময় বলিতেছি, ভারতের একতা চাই, কিন্তু কার্য্যের সময় ঘোরতর বৈষম্যবাদী।

এইরূপ প্রতি বিষয়েই আমরা কপটাচারী। বাক্যের সহিত আমাদের কার্য্যের কোন সামঞ্জস্য রাখিবার আমরা চেষ্টাও করি না। যাহা ভাল বলিয়া স্বীকার করি ও মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করি, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার সৎসাহস আমাদের নাই। সামান্য নির্যাতন-ভয়ে আমরা গুরুতর কর্ত্তব্য হইতে স্খলিত হই। আমরা যাহা পারি না, অপরে যদি তাহা করিতে সাহস করে, আমরা তাহাকে নির্যাতন করিতেও লজ্জা বোধ করি না। কপটাচার, যে চরিত্রে ঘোর কলঙ্ক, তাহা জানিয়াও আমরা তাহাকে সযত্নে পোষণ করি। যে, যে পরিমাণে কপটাচারী, সমাজে সে, সেই পরিমাণে আদৃত। যে সত্যের অনুরোধে, কর্ত্তব্যের অনুরোধে স্বীকৃত মত কার্য্যে পরিণত করিবে, সমাজ তাহাকে

প্রত্যাখ্যান করিবে। যে সমাজে সত্যের এরূপ অনাদর—চরিত্রের উচ্চ আদর্শের এরূপ অবমাননা—সে সমাজের প্রকৃত উন্নতি অনেক দূরে রহিয়াছে। যাঁহারা স্বার্থসাধনোদ্দেশে সমাজের কেবল তোষামোদ করিয়া থাকেন, তাঁহারা সমাজের প্রকৃত বন্ধু নহেন। যাঁহারা সমাজের ক্ষতস্থান দেখাইয়া দেন এবং সেই ক্ষতের শোষক ঔষধি বলিয়া দেন, তাঁহারাই সমাজের প্রকৃত বন্ধু। ঔষধের ন্যায় তাঁহাদিগের বাক্য আপাততঃ তিক্ত লাগিতে পারে বটে, কিন্তু তাহা পরিণামে নিশ্চয়ই মিষ্ট লাগিবে; এই জন্য বলিতেছি যে, যদি জাতীয় উন্নতি চাহ, তাহা হইলে অগ্রে জাতীয় চরিত্র উন্নত করিতে চেষ্টা কর। চরিত্রগত কপটতা ও নীচতা থাকিতে জাতীয় উন্নতি হইবে না। অন্তঃসারশূন্য বাহ্য আড়ম্বরে কখন কোন জাতির উন্নতি হয় নাই—হইবেও না।

স্বায়ত্তশাসন-প্রণালী

—*—

"স্বায়ত্ত-শাসন" এই কথা শুনিলে, বোধ হয়, অনেকের মনেই এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ উদিত হইবে। আজ একশত বৎসরের কিঞ্চিদধিক হইল, আমরা ইংরাজজাতির অধীনে আসিয়া সম্পূর্ণরূপে আত্মশাসনে বঞ্চিত হইয়াছি। অনেকের সংস্কার আছে যে, আমরা মুসলমান-রাজত্বের কাল হইতে আত্মশাসনাধিকার-চ্যুত হইয়াছি; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। মুসলমানের রাজত্ব ভারতের শিরায় শিরায় সঞ্চারিত হয় নাই। দিল্লীতে মুসলমান সম্রাট নিযুক্ত ছিলেন সত্য, নানা প্রদেশে তাঁহার প্রতিনিধি নিযুক্ত ছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদিগের তাদৃশী কেন্দ্রীকরণী শক্তি বা কেন্দ্রীকরণের তাদৃশ ইচ্ছাই ছিল না। যাহাকে ইংরাজীতে সেনট্রালিজেশন বলে, তাহাকেই আমরা বাঙ্গালায় কেন্দ্রীকরণ বলিলাম। যাহাতে সমস্ত শাসন-রজ্জু মধ্যস্থ এক পুরুষের হস্তে রক্ষিত হয়, তাহাকেই আমরা কেন্দ্রীকরণী শাসনপ্রণালী বলি। ভারতের এখনকার এই মধ্যস্থপুরুষ ষ্টেট্ সেক্রেটারী। ইনি বিলাতে থাকিয়াও এই বিশাল ভারতসাম্রাজ্যের শাসন-রজ্জু সকল স্বকরে সংযমিত করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন না বটে, কিন্তু প্রণালীগত পরিবর্ত্তন ও যুদ্ধবিগ্রহাদি সমস্তই তাঁহার অনুমতি-সাপেক্ষ। ভারতের গবর্ণর জেনেরেল ভারতের মঙ্গলের জন্য কোন কর স্থাপন করিতে গেলেন, তাহাতে ম্যানচেষ্টারের ক্ষতি হয় দেখিয়া ষ্টেট্-সেক্রেটারী অমনি তাহাকে ভিটো দিয়া বসিলেন। যেখানেই ইংলণ্ডের স্বার্থের সহিত ভারতের স্বার্থসংঘর্ষ উপস্থিত হয়, সেইখানেই তিনি হস্তক্ষেপ করিয়া ইংলিশ স্বার্থরক্ষা করেন। ভারতের আভ্যন্তরীণ সকল বিষয়ের প্রভুশক্তির কেন্দ্র ভারতের গবর্ণর জেনেরেল। তিনি একা সব কাজ করিয়া উঠিতে পারেন না বলিয়া গবর্ণর, লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর, কমিশনর, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি দ্বারা সেই সমস্ত কাজ করাইয়া লন। কিন্তু সেই সকল কার্য্যের দোষ-গুণাদি বিচার ও প্রণালীগত পরিবর্ত্তনাদিরূপ প্রকৃত শাসন-সূত্র নিজের হস্তে রাখেন। এই কেন্দ্রীকরণী শক্তি ইংরাজদিগের হস্তে যেরূপ পরিপুষ্ট হইয়াছে, আর কোন জাতির হস্তে সেরূপ হয় নাই।

মুসলমানদিগের সময়ে প্রত্যেক জমীদার এক একটি ক্ষুদ্র করদ রাজা ছিলেন। তাঁহার দেয় কর দিয়া অন্যান্য আভ্যন্তরীণ সমস্ত বিষয়েই পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিতেন। নিজ প্রজাগণের উপরে তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা ছিল। তিনি তাহাদিগের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা ছিলেন। প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত দিবার তাঁহার অধিকার ছিল। ইংরাজদিগের রাজত্বকালের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত বর্দ্ধমান, কৃষ্ণনগর, নাটোর, পুঁটিয়া, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি স্থানের জমীদারগণের এই অধিকার ছিল। এক এক জনের অধীনে দুই একটি করিয়া জেলা ছিল। সেই সমস্ত প্রদেশের দেওয়ানী, ফৌজদারী ও রাজস্বসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে তাঁহাদিগের পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। নবাব এই সকল কর আদায় করিয়া দিল্লীর দরবারে পাঠাইতেন মাত্র। জমীদারেরা শুদ্ধ কর দিতেন, এরূপ নহে; প্রয়োজন হইলে, নবাব ও সম্রাটকে সৈন্য দিয়াও সাহায্য করিতেন। এই প্রণালীর সহিত ইউরোপীয় অতীত সামন্ত-তান্ত্রিক প্রণালীর (Feudal system) অনেক সাদৃশ্য আছে। সামন্ত-তন্ত্র যেমন সামন্তেরা (Barons) দুর্গ নির্ম্মাণ ও স্থায়ী সেনা রাখিতে পারিতেন, জমীদারগণও সেইরূপ পারিতেন। প্রাচীন জমীদারগণের পরিখা

প্রাকার-পরিবেষ্টিত পুরী সকল আজও কিয়ৎ-পরিমাণে তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

এই সময়ে শুদ্ধ যে জমীদারগণই আভ্যন্তরীণ সকল বিষয়ে স্বাধীন ছিলেন, এরূপ নহে। প্রজারাও আপন আপন গ্রামে আভ্যন্তরীণ সকল বিষয়ে স্বাধীনতা ভোগ করিতেন। পঞ্চায়তপ্রণালী তাহার নিদর্শন। গ্রামের পঞ্চায়তগণ গ্রামের দেওয়ানী ও ফৌজদারী সমস্ত মোকদ্দমাই নিষ্পত্তি করিয়া দিতেন, কেবল যে সকল সাঙিন্ ফৌজদারী মোকদ্দমায় তাঁহাদিগের অধিকার নাই, তাহাই রাজদরবারে যাইত, গ্রামের চৌকিদার পুলিশের কাজ করিত এবং সতত পঞ্চায়তের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া থাকিত। চৌকীদারের বেতন রাজাকে চৌকীদারী আইন জারী করিয়া প্রজাগণের নিকট হইতে আদায় করিয়া দিতে হইত না। প্রজারা পঞ্চায়তের হুকুমে আপন হইতে তাহা প্রদান করিত। রাজাকে গ্রামের রাস্তাঘাট প্রস্তুত ও বিদ্যালয়াদির জন্য পথকর ও শিক্ষাকর প্রভৃতি নির্দ্ধারিত করিয়া রাস্তাঘাট প্রস্তুত ও বিদ্যালয় সংস্থাপন করিতে হইত না। গ্রামের লোকেই আপনা হইতে আপন আপন অবস্থানুসারে এই সকল কার্য্যের জন্য কিছু কিছু করিয়া চাঁদা দিতেন। তাহাতেই এই সকল বিষয় সুচারুরূপে সম্পন্ন হইত। প্রকৃত প্রস্তাবে এক একটি পল্লীসমাজ এক একটি ক্ষুদ্র সাধারণতন্ত্রস্বরূপ ছিল। এক্ষণে লর্ড রিপণ যে যে বিষয় স্থানীয় বোর্ডের হস্তে সমর্পণ করিতেছেন, পল্লীসমাজ তাহা অপেক্ষাও অনেক বিষয় আপনাদিগের আয়ত্ত রাখিয়াছিলেন। সকলে শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে, সমস্ত মুসলমান সাম্রাজ্যকালে অতি অল্পসংখ্যক দায়াধিকার-বিষয়ক মোকদ্দমাই মুসলমান দেওয়ানী আদালতে রুজু হইয়াছিল। তাহার একমাত্র কারণ—এই পল্লীসমাজ।

এই পল্লীসমাজ বিকেন্দ্রীকরণ-প্রণালীর চরম নিদর্শন। যাহাকে ইংরাজীতে ডিসেন্ট্রালিজেশন্ বলে, তাহাকেই আমরা বিকেন্দ্রীকরণ-প্রণালী বলিলাম। রাজ্যের অংশ সকলকে কেন্দ্রস্থ প্রভুশক্তির অধীনতা হইতে বিচ্যুত করাকে বিকেন্দ্রীকরণ-প্রণালী কহে। ভারতের প্রতি পল্লী কেন্দ্রচ্যুত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাধারণ-তন্ত্রে পরিণত হইয়াছিল।

ভারতীয় পল্লী-সমাজের সহিত রুশীয় নাগরিক সমাজের উৎকৃষ্ট তুলনা হইতে পারে। রুসিয়ার প্রত্যেক মিউনিসিপালিটীকে এক একটি নাগরিক সমাজ বলিয়া উল্লেখ করিলাম। প্রত্যেক রুসীয় মিউনিসিপালিটী আভ্যন্তরীণ সকল বিষয়েই সম্রাট্ হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন। সম্রাট্ দুর্দ্দান্ত হউন, সাধু হউন, মিউনিসিপালিটীর তাহাতে কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। মিউনিসিপালিটীর সঙ্গে সম্রাটের কোন সাক্ষাৎসম্বন্ধ নাই তাঁহারা আপন আপন কর ধার্য্য ও আপন আপন আইন প্রস্তুত করিয়া আপন আপন রাজত্ব চালাইয়া থাকেন। এই জন্যই রুসীয় সম্রাট্গণের দুর্ব্বিষহ অত্যাচার সত্বেও রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটে না। এই জন্যই ভারতের মুসলমান-সাম্রাজ্যকালে দুর্ব্বিষহ অত্যাচার সত্বেও প্রজাবিপ্লব ঘটে নাই। অধীনতার মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণা সহ্য করে নাই বলিয়াই প্রজারা প্রশান্তভাবে ছিল। কিন্তু এক্ষণে সে পল্লীস্বাতন্ত্র্য কোথায়? প্রচণ্ড ইংরাজ-কেন্দ্রীকরণ-শক্তির নিকটে সে বাঁধির বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এক্ষণে সে পঞ্চায়ত নাই, সে পল্লীসমাজ নাই। মুসলমান-রাজত্বের ছয় সাত শতাব্দীতে যাহা অটুট ছিল, ইংরাজ-রাজত্বের এক শত বৎসরে তাহার চিহ্নমাত্র নাই। এখন নূতন পঞ্চায়ত গঠিত হইতেছে বটে, কিন্তু সে বিড়ম্বনা মাত্র। ভাঙ্গা যত সহজ, গড়া তত সহজ নহে। যে প্রাচীন সুন্দর স্বায়ত্তশাসনপ্রণালীসৌধ ভাঙ্গিয়া ইংরাজ চুরমার করিয়াছেন, আজ তিনি তাহা গড়িতে বসিয়াছেন। মনুর সময়ের পূর্ব্ব হইতেও যে ভারতে স্বায়ত্তশাসন-প্রণালী প্রচলিত ছিল, আজ কোন কোন ইংরাজ সেই ভারতের অধিবাসিবৃন্দকে স্বায়ত্তশাসন-প্রণালীর সম্পূর্ণ অযোগ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেও কুণ্ঠিত নহেন। ইহার কারণ, তাঁহাদিগের ভারতের পুরাবৃত্তে পূর্ণ অনভিজ্ঞতা। ইংরাজ রাজত্বের পূর্ব্বে কোন প্রভুশক্তি ভারতে সর্ব্বাঙ্গীন আধিপত্য স্থাপন করিতে পারে নাই। হিন্দু-রাজত্বকালেও কোন হিন্দু সম্রাট্ ভারতের সর্ব্বত্র চিরস্থায়িনী প্রভুতা সংস্থাপন করিতে পারেন নাই। তাঁহার লক্ষ্যও তাহা ছিল না। তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল—যশ। বলবীর্য্যে ভারতে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী নাই, সকল ক্ষুদ্র রাজার মুখ দিয়া এই কথা বাহির করিয়া লইবার জন্যই তিনি দিগ্বিজয়ে প্রবৃত্ত হইতেন; পরাজিত রাজ্য সকলে চিরস্থায়িনী প্রভুতা সংস্থাপন করিবার জন্য নহে। যে যে ক্ষুদ্র রাজা বৈতসী বৃত্তি অবলম্বন করিতেন, দিগ্বিজয়ী সম্রাট সেই সেই রাজাকে স্ব স্ব

স্থানে অবিচলিত রাখিতেন। যাঁহারা প্রতিকূলাচরণ করিতেন, তাঁহাদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাঁহাদিগের সিংহাসনে অপর লোককে বসাইতেন। সে রাজ্য অটুট থাকিত, রাজা পরিবর্ত্তিত হইতেন মাত্র। অনেক সময় সম্রাট্ অশ্বমেধীয় ঘোটক পাঠাইয়াই নিজের প্রতাপ পরীক্ষা করিতেন। সেই ঘোটকের কপালে জয়-পতাকা বাঁধা থাকিত। যদি কেহ সেই ঘোটক ধরিত, তাহা হইলেই তাহার সহিত যুদ্ধ হইত। ঘোটকের ললাটে এই স্পর্দ্ধার কথা লেখা থাকিত যে, অমুক সম্রাট এই দিগ্বিজয়ী ঘোটক ছাড়িয়া দিয়াছেন। যদি পৃথিবীর কেহ সংগ্রামে তাঁহার সমকক্ষ থাকেন ত এই অশ্ব ধরুন। যদি কেহ সাহস করিয়া সেই ঘোটক না ধরিত, তাহা হইলেই তিনি সম্রাট্ বলিয়া স্বীকৃত হইতেন। যদি কেহ ধরিতেন, সংগ্রামে তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারিলেই তিনি সম্রাট্ বলিয়া অভিহিত হইতেন। এইরূপে কত শত সম্রাট ভারতে আধিপত্য-স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, সেই সঙ্গে কত কত রাজ্যের রাজা পরিবর্ত্তিত হইয়াছেন, তথাপি পল্লীসমাজের স্বাতন্ত্র্যের কোন ব্যাঘাত সংঘটিত হয় নাই। সে সকল ক্ষুদ্র সাধারণতন্ত্রগুলি নিবিষ্টচিত্তে আপন আপন আভ্যন্তরীণ উন্নতিসাধনে নিমগ্ন থাকিত। মাথার উপর দিয়া কত মেঘ চলিয়া গিয়াছে, অথচ সেগুলির গাত্রস্পর্শ করে নাই। যে পল্লীসমাজরূপ স্তম্ভশ্রেণীর উপরে ভারত-সাম্রাজ্যের ছাদ সংন্যস্ত ছিল, হিন্দু মুসলমান উভয়-রাজত্বকালেই সে স্তম্ভশ্রেণীর উপরে হাত পড়ে নাই। সে পাকা গাঁথনা ভাঙ্গিবার কাহারও সাধও হয় নাই। এই জন্য এতবার ছাদ পরিবর্ত্তিত হওয়াতেও ভারত-সাম্রাজ্য-সৌধের দৃঢ়তা বা সৌন্দর্য্য বিনষ্ট হয় নাই। পরিবর্ত্তনে প্রজাবৃন্দের আভ্যন্তরীণ অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। সূর্য্যবংশ, চন্দ্রবংশ, পালবংশ, পাঠানবংশ, মোগলবংশ প্রভৃতি কত রাজবংশ অভ্যুদিত হইয়া কালে অস্তমিত হইয়াছে। এইরূপে ভারত-সাম্রাজ্য-সৌধের কতবার ছাদ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু সে সৌধের পল্লীসমাজ-রূপ স্তম্ভশ্রেণী বরাবর একই ভাব চলিয়া আসিতেছিল; এমন সময়ে প্রকাণ্ড সৌধ ইংরাজের হাতে পড়িল। প্রতাপান্বিত ইংরাজের চক্ষে পল্লীসমাজ শূলস্বরূপ হইয়া উঠিল। তিনি সে সুন্দর ও সুদৃঢ় স্তম্ভরাজি একটি একটি করিয়া সমস্ত ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন এবং পাছে সে প্রকাণ্ড ছাদ ভাঙ্গিয়া পড়ে, এই ভয়ে চাড়া দিয়া তাহা রক্ষা করিতে লাগিলেন। আজ এক শত বৎসরের কিঞ্চিদধিক ভারত-সাম্রাজ্য-সৌধের প্রকাণ্ড ছাদ এই চাড়ার উপরে রহিয়াছে। বলা বাহুল্য যে, ইংরাজ সাভিল্ই সেই চাড়া। এক শত বৎসরের পর, আজ বিজ্ঞ রিপণ বুঝিয়াছেন—এরূপ ক্ষীণ চাড়ার উপরে এরূপ প্রকাণ্ড ছাদ বেশী দিন থাকিতে পারে না। তাই আজ তিনি ভারতবাসীদিগকে স্বায়ত্ত-শাসনপ্রণালী দিতে উদ্যত হইয়াছেন। যে আভ্যন্তরীণ পূর্ণ স্বাধীনতা ইংরাজজাতি ভারতবাসীর হস্ত হইতে কাড়িয়া লইয়াছিলেন, আজ মহামতি লর্ড রিপণ তাহার কিয়দংশ তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। তাই আজ তিনি প্রতি জেলায় এক একটি প্রাদেশিক সমিতি নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। কিন্তু এই নগরসমাজগুলিকে পল্লীসমাজের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর করা আপাততঃ লর্ড রিপণের অভিপ্রায় নয়। পল্লীসমাজের যেমন সকল বিষয়েই স্বাতন্ত্র্য ছিল, এই নগর-সমাজগুলির সেরূপ স্বাতন্ত্র্য থাকিবে না। আপাততঃ এই নগর-সমাজের হস্তে অতি সামান্য ভারই অর্পিত হইতেছে। রথ্যাকর, পূর্ত্তকর লইয়া ইঁহারা রাস্তা ঘাট ও অট্টালিকাদি নির্ম্মাণ করাইতে পারিবেন এবং ডিস্‌পেন্‌সারী, হাঁসপাতাল ও বিদ্যালয়াদির পরিদর্শন ও আয় ব্যয়াদির সংযমন করিতে পারিবেন। পল্লীসমাজ যে সকল অধিকার ভোগ করিয়াছিল, তাহার সহিত তুলনায় ইহা যৎসামান্য মাত্র। তথাপি অনেক ইংরাজ বলিতেছেন, দেশীয়েরা অধিকারের সদ্ব্যবহার করিতে পারিবে না। ইহার অর্থ আমরা বুঝিতে পারি না। যাহা হউক, যখন লর্ড রিপণ সে সমস্ত আপত্তি খণ্ডন করিয়া প্রাদেশিক সমাজ সকল সংস্থাপন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, তখন কি উপায়ে তাঁহার সঙ্কল্প সিদ্ধ হয়, তদ্বিষয়ে আমাদিগের সম্পূর্ণ চেষ্টা করিতে হইবে।

এই সঙ্কল্পসিদ্ধির প্রধান উপায়—উপযুক্ত সভ্যনির্ব্বাচন। ইহা অতি দুরূহ ব্যাপার। পল্লীসমাজ যখন পূর্ণাবয়ব ছিল, তখন সভ্য নির্ব্বাচন করা তত দুরূহ ব্যাপার ছিল না। তখন প্রতি গ্রামে গ্রামে আত্ম-ভার-বহন-ক্ষম অনেক লোক

পাওয়া যাইত। তখন নিজের খাওয়া দাওয়া ও পরিবার প্রতিপালন করা ভিন্ন মানুষের জীবনের মহত্তর লক্ষ্য আছে, ইহা ভাবিবার লোক প্রতি গ্রামেই পাওয়া যাইত। তখন গ্রামের মণ্ডলেরা নিজ নিজ পারিবারিক ও বৈষয়িক কার্য্য সম্পাদন করিয়া, দিবসের কিয়দংশ গ্রাম্য-বিষয়ে অতিবাহিত করা কর্ত্তব্য মনে করিতেন। তখন পরহিত-ব্রতে উৎসর্গীকৃত-প্রাণ লোক খুঁজিলে প্রতি গ্রামেই দুই একটি করিয়া পাওয়া যাইত। তখন নিজ স্বার্থ পর-স্বার্থের জন্য বলি দিতে পারেন, এরূপ লোক ভারতে অলীক ঘটনা বলিয়া বিবেচিত হইত না। কিন্তু সে সৌভাগ্যের দিন এখন চলিয়া গিয়াছে। ভারতের সুখসূর্য্যের সঙ্গে সে সকল শুভকমল নিমীলিত হইয়াছে। যাহা গিয়াছে, তাহার আন্দোলন ভাল; কিন্তু তাহার অনুশোচনা বৃথা। সুতরাং যাহা গিয়াছে, সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করিয়া কি হইতে পারে, আমরা তাহার মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইলাম।

ইংরাজেরা আপনাদের ভুল বুঝিতে পারিয়া পূর্ব্ব হইতেই স্বায়ত্ত-শাসন-প্রণালীর সূত্রপাত করিয়াছিলেন। মিউনিসিপালিটী বা নাগরিক সমাজ ও আধুনিক গ্রাম্য পঞ্চায়ত তাহার নিদর্শন; কিন্তু এই দুইটিই পুরা-প্রচলিত স্বায়ত্ত-শাসন-প্রণালীর ছায়ামাত্র। নাগরিক বিষয় ভিন্ন প্রাদেশিক-বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার মিউনিসিপালিটীর নাই। তাহার উপরে আবার অতি অল্পস্থানেই ইহা প্রচলিত হইয়াছে। সুতরাং ইহা দ্বারা জাতিগত অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে না। আবার প্রাচীন পঞ্চায়তস্থলে অধুনা যে নব পঞ্চায়ত প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে, তাহা দ্বারাও এ অভাব পূরণ হইতে পারে না। প্রতি গ্রামে যে পঞ্চায়ত নব প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে, তাহা গ্রামের মঙ্গল বহুল নহে। যাঁহাদিগকে গ্রামের সকলেই প্রধান বলিয়া জানে, তাঁহাদের হাতে নির্ব্বাচন না থাকায়, সে সকল লোক ইহাতে বড় প্রবেশ লাভ করিতে পারেন না। পুলিশ সর্ব্বে-সর্ব্বা। পঞ্চায়ত-নির্ব্বাচনকার্য্য প্রায় পুলিশ দ্বারাই হইয়া থাকে। সুতরাং যে সকল অভিসন্ধি-বিশিষ্ট লোক স্বার্থধসানের জন্য পুলিশের সঙ্গে হৃদ্যতা রাখে, তাহারাই প্রায় নির্ব্বাচিত হয়। সুতরাং বর্ত্তমান পঞ্চায়ত—প্রধানত্বের পরিচায়ক নহে। কোন কোন স্থানে এরূপও ঘটে যে, সম্ভ্রান্ত লোকের উপরে এই কাজের ভার দিতে চাহিলেও তাঁহারা লইতে চান না। ইহার দুইটি কারণ আছে। প্রথম কারণ এই যে, ইহাঁদিগের উপরে যে কার্য্যভার ন্যস্ত হয়, তাহা অতি সামান্য লোকের সাধ্য; সুতরাং এ কার্য্যে অর্থের আশাও নাই, মান-সম্ভ্রমেরও আশা নাই। সুতরাং সম্ভ্রান্ত লোক কিসের আশায় পঞ্চায়তের কার্য্যভার গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইবেন? তদ্ভিন্ন আর একটি প্রধান অসুবিধা এই যে, চৌকীদারেরা কথায় কথায় তাঁহাদিগকে আদালতে হাজির করিয়া থাকে। ইহা মানী লোকে অতিশয় অপমান মনে করিয়া থাকেন। এই জন্য ইহাঁরা নিজে ইহাতে কিছুতেই প্রবিষ্ট হইতে চাহেন না। ঘটনাক্রমে যদি দুই একজন প্রবিষ্ট হন, তাঁহারা বাহির হইবার জন্য আকুলিত হন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বর্ত্তমান পঞ্চায়তগুলিকে আমরা অধুনা-প্রস্তাবিত স্বায়ত্ত-শাসন-প্রণালীর ভিত্তিস্বরূপ করিয়া লইতে পারি না। এক্ষণে আমাদিগের মতামত নিম্নে ব্যক্ত করা যাইতেছে।

সেন্‌সস্ সেডিউল্ বা লোক গণনার তালিকা দেখিলে জানা যাইবে, কোন্ গ্রামে কত লোকের বসতি। লোক-সংখ্যা অনুসারে প্রতি গ্রামের নির্ব্বাচকের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবে। গ্রামের প্রত্যেক প্রাপ্ত-বয়স্ক লিখন-পঠন-সমর্থ অধিবাসীকেই এই নির্ব্বাচক মনোনীত করার অধিকার প্রদান করিতে হইবে। প্রতি গ্রামে এক একটি ফুটো বাক্স চাবী দিয়া চৌকীদার-হস্তে প্রেরণ করিতে হইবে। চৌকীদার ঢোল পিটাইয়া ঘোষণা করিবে যে, অমুক অমুক দিনের মধ্যে গ্রামের প্রত্যেক প্রাপ্ত-বয়স্ক ও লিখন পঠন-সমর্থ অধিবাসীকে তাঁহার নাম ও তাঁহার মনোনীত প্রতিনিধি-নির্ব্বাচকের নাম লিখিয়া সেই বাক্সে ফেলিয়া দিতে হইবে। সেই সময়ের মধ্যে যাঁহারা নাম লিখিয়া না দিবেন, তাঁহারা সেবারকার মত নির্ব্বাচক মনোনীতকরণের অধিকার হইতে বিচ্যুত হইবেন। এইরূপ সংগৃহীত টিকিটের অধিকাংশে যাঁহার নাম পরিদৃষ্ট হইবে, তিনিই সেই গ্রামের নির্ব্বাচক বলিয়া গৃহীত হইবেন। যে গ্রামে অধিক লোকের বসতি, সে গ্রামের চৌকীদারের সংখ্যানুসারে নির্ব্বাচকের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করিলেও চলিবে। ভোটের সংখ্যানুসারে পর পর ধরিয়া অতিরিক্ত

নির্ব্বাচক মনোনীত করিলেই ঠিক হইবে। অথবা যদি পল্লী-বিভাগ স্পষ্ট নির্দ্দিষ্ট থাকে, তাহা হইলে প্রতি পল্লীর লোকসংখ্যানুসারে এক এক বা ততোধিক ব্যক্তি নির্ব্বাচক মনোনীত হইতে পারেন। নির্ব্বাচক-মনোনীত-করণে একমাত্র সম্পত্তির প্রভুতা থাকা উচিত নহে। তাহা হইলে যোগ্যতার অবমাননা করা হয়। কারণ, গ্রামে এমন লোক থাকিতে পারেন, যিনি সম্পত্তিশালী নহেন, অথচ গ্রামের সকলেই তাঁহাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করেন, এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যোগ্য বলিয়া মনে করেন। এরূপ লোক বাদ পড়িলে, ইষ্ট-নাশের বিশেষ সম্ভাবনা।

আপাততঃ প্রতি জেলার রাজধানীতে একটি করিয়া সাময়িক শাসন-সমিতি নিযুক্ত করিতে হইবে। এই সাময়িক শাসন-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচনের ভার মাজিষ্ট্রেট বা মিউনিসিপাল কমিশনরগণের হস্তে দিলে চলিবে। এই সাময়িক সমিতি স্থির করিবেন, কোন্ কোন্ থানা হইতে স্থানীয় শাসন-সমিতিতে কতগুলি করিয়া সভ্য লওয়া যাইবে। প্রত্যেক গ্রামে কয় জন করিয়া নির্ব্বাচক মনোনীত হইবে, এই সমিতি ইহাও স্থির করিয়া দিবেন।

প্রতি থানার এলাকায় গ্রাম্য-নির্ব্বাচকগণের নামের একটি করিয়া তালিকা সেই সেই থানায় থাকিবে। থানার সব-ইন্‌স্পেক্টর পত্র দ্বারা সেই নির্ব্বাচকগণকে জানাইবেন যে, তাঁহারা কোন নির্দ্দিষ্ট দিনের মধ্যে স্ব স্ব নাম ও তাঁহারা যাঁহাদিগকে জেলার শাসন-সমিতির সভ্য মনোনীত করিতে চাহেন, তাঁহাদিগের নাম লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠাইয়া দেন। এইরূপে সংগৃহীত কাগজে যাঁহাদিগের অনুকূলে অধিক ভোট উঠিবে, তাঁহারাই জেলার শাসন-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হইবেন। নাগরিক-নির্ব্বাচন-প্রণালীটিও গ্রাম্য নির্ব্বাচনপ্রণালীর ন্যায় অনুষ্ঠিত হইবে। সমস্ত নগরবাসী যে সকল নাগরিককে নির্ব্বাচক নিযুক্ত করিবেন, তাঁহারাই আবার জেলার শাসন-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচন করিবেন। হাকিম, উকীল, মোক্তার, শিক্ষক, মিউনিসিপাল কমিশনর ও অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি সকলকেই মনোনীত করার অধিকার নাগরিক নির্ব্বাচকদিগের হস্তে অনিয়ন্ত্রিতভাবে থাকিবে। এতদ্ভিন্ন গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে সমস্ত সভ্য সংখ্যার এক-চতুর্থাংশ মাত্র সভ্য জেলার শাসন-সমিতির সভ্য হইতে পারিবেন। গবর্ণমেণ্ট দেশীয় কর্ম্মচারিগণের মধ্য হইতে সেই সকল প্রতিনিধি সভ্য মনোনীত করিবেন। এইরূপে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি সভ্যগণ মিলিত হইয়া জেলার শাসনসমিতির কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিবেন। সভাপতি, সহকারী সভাপতি, সম্পাদক প্রভৃতি সমস্তই তাঁহারা নির্ব্বাচিত করিবেন। তাঁহারা সাধারণতঃ আপনাদিগের মধ্য হইতেই সভাপতি প্রভৃতি মনোনীত করিবেন; কিন্তু ইচ্ছা হইলে, বাহির হইতেও উচ্চদরের লোক বাছিয়া লইতে পারিবেন। যখন ক্ষমতার অপব্যবহার করিলে ক্ষমতা কাড়িয়া লইবার শক্তি সভ্যগণের হস্তে রহিল, তখন * * * উচ্চমনা দুই এক জন জেলার মাজিষ্ট্রেটকে সভাপতির পদে অভিষিক্ত করায়, কোনও বিপদের সম্ভাবনা নাই, বরং বলোপচয়ের সম্ভাবনা। —দেশের লোকের সহিত ইহাঁদিগের যেরূপ সহানুভূতি, তাহাতে যে ইহাঁরা প্রাণপণে ও একাগ্রচিত্তে দেশের মঙ্গলসাধন করিতে চেষ্টা করিবেন, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। ইহাঁরা তাঁহাদিগের ক্ষমতার অপব্যবহার করিবেন, তাঁহাদিগের আনুপূর্ব্বিক চরিত্র দেখিয়া এরূপ অনুমান হয় না। ইহারা এক এক জেলায় এইরূপে স্থানীয় শাসনসমিতি সংগঠিত করিয়া, তাহার কার্য্য সুচারুরূপে আরব্ধ করিয়া দিয়া আবার অন্য জেলায় গিয়া সেই কাজ আরম্ভ করিতে পারেন। ২৪ পরগণা, হুগলী, বর্দ্ধমান, নদীয়া, রাজসাহী, মুরশিদাবাদ, ঢাকা—এই সাতটি অগ্র-গত জেলায় এইরূপ বৈদেশিক সভাপতি মনোনীত করার আবশ্যকতা না থাকিতে পারে, কিন্তু অন্যান্য পশ্চাদ্‌বর্ত্তী জেলা সকলে লোকপ্রিয় ও লোকহিতৈষী ইউরোপীয় সভাপতি মনোনীত হইলে ইহাঁরা অগ্রগত জেলাগুলির সহিত শীঘ্রই সমকক্ষতা লাভ করিতে পারিবেন। ইহাঁদিগের হস্তাবলম্বে স্থানীয় শাসনসমিতি সকল আচিরকালমধ্যে কার্য্যকরী প্রকৃতি প্রাপ্ত হইবে। পশ্চাদ্বর্ত্তী জেলা সকলে আজও জাতিগত ভাব তত পরিপুষ্ট হয় নাই। আজ সেই সকল স্থানের অধিবাসীরা যাহা অতি কষ্টে ও নিতান্ত অনিচ্ছায় করিবে, ক্রমে অভ্যাসবশতঃ দুই এক বৎসরের মধ্যে তাহা তাহারা আপনা হইতে ও মনের স্ফূর্ত্তিতে করিতে শিখিবে। সেই অভ্যাসটি বদ্ধমূল হওয়া পর্য্যন্ত একজন মজবুৎ চালক চাই। ইংরাজের মত মজবুৎ চালক অতি অল্পই দেখিতে

পাওয়া যায়। দেশীয় চালক হইলে কাজ হইবে না, এ কথা আমরা বলি না। তবে দেশীয় চালক হইলে ফল কিঞ্চিৎ বিলম্বিত হইবে মাত্র। কারণ, আমাদের দেশ এখনও সর্ব্বত্র দেশীয় শাসনকর্ত্তাকে সম্পূর্ণ মানিতে শিখে নাই। আমরা দুঃখের সহিত প্রত্যক্ষ জীবনে ইহা পদে পদে দেখিতেছি। যে পদে ইংরাজ অভিষিক্ত হইলে আমরা যেরূপ সম্মান করি, সেই পদে একজন দেশীয় লোক অভিষিক্ত হইলে, আমরা আজও সেরূপ সম্মান দিতে শিখি নাই। বৈদেশিক শাসনকর্ত্তার হুকুম তামিল করিতে আমরা যেরূপ অগ্রসর হই, দেশীয় শাসনকর্ত্তার হুকুম তামিল করিতে সেই পরিমাণ লজ্জা বোধ করি। এই ভাব পতিত জাতির প্রকৃতিসিদ্ধ লক্ষণ। যত আমাদের অধীনতায় ঘৃণা জন্মিবে, ততই এই ভাব সারিতে থাকিবে; এবং দিন দিন যে এ ভাব কিছু কিছু সারিতেছে, তাহাও প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে। কিন্তু পশ্চাদ্বর্ত্তী এমন অনেক জেলা আছে, যেখানে এ ঘৃণা এখনও অঙ্কুরিত হয় নাই। সেই সেই জেলায় আপাততঃ বৈদেশিক হস্তাবলম্ব ব্যতীত লোকে শীঘ্র উঠিতে পারিবে না। কিন্তু এরূপ সাহায্য যে বেশী দিন প্রয়োজন হইবে না, তাহা অখণ্ডনীয় সত্য। কিন্তু আপাততঃ বৈদেশিক নেতার আবশ্যকতা আছে বলিয়া আমরা সেরূপ নেতা চাহি না—যিনি প্রভুশক্তি পাইয়া তাহার অযথা ব্যবহার করিবেন; যিনি নিজের ইচ্ছাই বিধি বলিয়া প্রচার করিবেন; যিনি প্রতিবাদ সহিতে নিতান্ত অক্ষম; অথবা যিনি প্রতিবাদ করিলে, প্রতিবাদীর সর্ব্বনাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প।—না! আমরা মরিব, সেও ভাল, তথাপি এরূপ নেতার অধীনে থাকিতে চাহি না;—যিনি অহর্নিশ মাথায় অঙ্কুশ মারিবেন, আমরা এমন মাহুত—চাহি না;—যিনি লোকের হৃদয়ে কেবল পদাঘাত করিবেন, আমরা এমন কর্ত্তা চাহি না;—দেশীয়গণের প্রতি যাঁহারা নিরন্তর পাশব ব্যবহার করিবেন, তাঁহাদিগকে আমরা চাহি না;—দেশীয় রক্তে পরিপোষিত হইয়াও যাঁহারা দেশীয় কল্যাণ ভাবিবেন না, আমরা এমন শাসনকর্ত্তা চাহি না; যাহাদিগের শোণিতে পরিবর্দ্ধিত, যাঁহারা তাহাদিগের দুঃখে অশ্রুপাত করিতে জানেন না, আমরা তাঁহাদিগকে চাহি না;—যাহাদিগকে শাসন করিতে আসিয়াছেন, যাঁহারা তাহাদিগের সহিত মিশিতে বা তাহাদিগের সুখ-দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে সমর্থ নহেন, আমরা তাঁহাদিগকে চাহি না;—যাঁহারা বিলাসিতার ক্রোড়ে লালিত হইয়া প্রজার প্রতি রাজার কর্ত্তব্য ভুলিয়া যান, আমরা তাঁহাদিগকে চাহি না;—যাঁহারা দেশীয়গণকে অসভ্য, নিগ্রো বা সেবাদাস বলিয়া ঘৃণা করেন, আমরা তাঁহাদিগকে চাহি না;—আমরা সহস্র যুগ পড়িয়া থাকিবে, বুকে হামাগুড়ি দিয়া সহস্র বৎসরে উঠিব, তবু এরূপ শাসনকর্ত্তা চাহি না! কিন্তু যাঁহারা আমাদিগের হিতের জন্য স্বজাতিকে চটাইতেও ভীত নহেন, ও স্বজাতি-স্বার্থ বলি দিতেও পরাঙ্মুখ নহেন, যদি আমরা সেই বিশ্বপ্রেমিকগণের নিকটে মস্তক অবনত না করি, তাহা হইলে আমরা পামর ও কৃতঘ্ন। ইংলণ্ড রাজনীতি বিষয়ে জগতের শিক্ষক। ইংলণ্ডের নিকটে প্রজাতন্ত্র-শাসন-প্রণালী সমস্ত ইউরোপ অবনত-মস্তকে শিখিতেছেন। ইংলণ্ড রাজনীতিবিষয়ে এক দিন অগ্রগামিনী আমেরিকারও দীক্ষাগুরু ছিলেন। সেই জগদ্গুরু ইংলণ্ডের নিকটে রাজনীতি বিষয়ে শিক্ষা লইব, তাহাতে আমাদের লজ্জা কি? * আমরা যে স্বায়ত্ত-শাসন-প্রণালীর আজ আন্দোলন করিতেছি—ইংলণ্ডীয় সাহিত্যই আমাদিগকে তদ্বিষয়ে শিক্ষা দিয়াছে। যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা আমাদের হৃদয়ে দিন দিন অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হইতেছে, সে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাও ইংরাজী ইতিহাস আমাদের উদ্দীপিত করিয়া দিয়াছে। সমস্ত ভারতের সমীকরণের ভাবও আমরা ইংরাজী সাহিত্য ও ইংরাজী শাসন-প্রণালী হইতে শিখিয়াছি। ভারত বহুদিনের নেতৃত্বশ্রমে ক্লান্ত হইয়া গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইংরাজ আসিয়া সেই ভারতকে জাগাইয়াছেন, জাগাইয়া সেই নিদ্রাভিভূতিকালে জগৎ যে যে বিষয়ে অগ্রসর হইয়াছে, তাহা ভারতকে শিখাইতেছেন। নিদ্রার গভীরতায় ভারত পূর্ব্বার্জ্জিত জ্ঞানরাশি ভুলিয়া গিয়াছিলেন, তাহার স্মৃতিমাত্র অপরিস্ফুটভাবে তাঁহার অন্তরে জাগরূক ছিল। ইংরাজ তাঁহাকে সে অপরিমিত জ্ঞানরাশির কথাও

---

* ভারতীয় মহাসমিতি (congress) মহামতি হিউম, বাড্‌ল ও ওয়েডারবরণ প্রভৃতি ইংরাজগণকে ইহার নেতৃত্ব প্রদান করিয়া আমার এই উপদেশের সার্থকতা করিয়াছিলেন।

স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন এবং যে সঞ্জীবন ঔষধে ইংরাজ নিজে এত বড় হইয়াছেন, সেই সঞ্জীবন ঔষধ আমাদিগের প্রতিও প্রযুক্ত করিয়া, আমাদের অন্তরে আজ প্রকাণ্ড জাতীয়-জীবনের ভাব অঙ্কুরিত করিয়াছেন। নিদ্রিত ভারত আজ একটি প্রকাণ্ড জাতিরূপে পরিণত হইতে চলিল। রিপণ-প্রবর্ত্তিত স্বায়ত্ত-শাসন-প্রণালী সেই ভবিষ্য জাতীয় সৌধের ভিত্তিমাত্র। যে ইংরাজের কাছে এত শিখিয়াছি, এত উপকার পাইয়াছি, সে ইংরাজের কাছে আরও কিছু উপকার লইতে ও যাহা কিছু বাকী আছে, তাহা শিখিতে কেন লজ্জাবোধ করিব?

দ্বিতীয় প্রবন্ধ

প্রথম প্রবন্ধ লেখার পর, ভূতপূর্ব্ব লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণরের স্বায়ত্ত-শাসন-প্রণালী সম্বন্ধে মন্তব্য আমাদের হাতে পড়িয়াছিল। সেই মন্তব্যসম্বন্ধে মতামত প্রকাশ না করিয়া এই প্রস্তাবের উপসংহার করা অনুচিত বিবেচনায় তাহার সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

মাননীয় রিভার্স টমসন্ নির্ব্বাচক ও সভ্য-নির্ব্বাচন-বিষয়ে সম্পত্তিকেই একমাত্র নিয়ামক করিয়াছেন। আমরা যেমন প্রাপ্ত-বয়স্ক ও লিখন-ক্ষম ব্যক্তিমাত্রকেই নির্ব্বাচক মনোনীত করিবার অধিকার দিতে চাই, তিনি সেরূপ না করিয়া যাঁহারা ১০৲ টাকা বা ততোধিক রোড্‌সেস্ অথবা ১০৲ টাকা বা ততোধিক লাইসেন্স ট্যাক্স দেন, অথবা যাঁহাদিগের আয় ৫০০৲ টাকার ন্যূন নহে, তাঁহাদিগকেই নির্ব্বাচক বলিয়া ধরিয়া লইতে চাহিয়াছেন। নির্ব্বাচক মনোনীতকরণে জাতি-সাধারণের অধিকার স্বীকার করেন নাই। ইহাতে তিনি যে জাতি সাধারণের হৃদয়ে আঘাত করিয়াছেন ও সম্পত্তির আদর করিয়া বিদ্যার ও বংশমর্য্যাদার অবমাননা করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। তদ্ভিন্ন কার্য্যতঃ তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইবে না। কারণ, সহরে যাহা হউক্, পল্লীগ্রামে অতি অল্পলোকেরই ৫০০৲ টাকা বা ততোধিক আয় আছে। এমন অনেক গ্রাম আছে, যেখানে ৫০০৲ টাকা বা ততোধিক আয়ের লোকের পূর্ণ অভাব বিদ্যমান। সুতরাং স্থানীয় সমিতির সভ্য মনোনীত-করণে সে সকল গ্রামের মোটেই ভোট থাকিবে না। এইরূপে নির্ব্বাচকের সংখ্যা এত কম হইবে যে, তাঁহাদিগের দ্বারা সভ্য-নির্ব্বাচন-কার্য্য সমীচীনরূপে সম্পন্ন হইবে না। দ্বিতীয়তঃ তিনি স্থানীয় সভ্য মনোনীত হওয়ার যে নিয়ম করিয়াছেন, তাহাতে সভ্য পাওয়াই কঠিন হইবে। তাঁহার মতে যিনি ২৫৲ টাকা বা ততোধিক রোড্‌সেস্ অথবা ২০৲ টাকা ট্যাক্স দেন, অথবা যাঁহার আয় ১০০৲ টাকার ন্যূন নহে, তিনিই স্থানীয় বোর্ডের সভ্য হইবার উপযুক্ত। আমরা পল্লীগ্রামবাসী; সুতরাং আমরা ভূয়োদর্শনবলে মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, অনেক পল্লীগ্রামে ১০০৲ টাকা বা ততোধিক আয়ের লোক নাই। গণ্ডগ্রামে এরূপ আয়ের লোক দুই চারি জন পাওয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু গণ্ড-গ্রামের সংখ্যা অত অল্প। সুতরাং স্থানীয় সমিতিতে অধিকাংশ গ্রামেরই ভোট থাকিবে না। লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর লোকের অভাব হইবে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এই জন্যই বলিয়াছেন যে, সম্পত্তির পরিমাণানুসারে এক এক ব্যক্তিকে ছয়গুণ পর্য্যন্ত ভোট দেওয়া যাইবে, সুতরাং স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, ইহা সাধারণ লোকের নির্ব্বাচিত সমিতি নহে, নির্দ্দিষ্ট আয়ের ধনিগণের বা জমীদারগণের সমিতিমাত্র। বলা বাহুল্য যে, এরূপ নির্ব্বাচন-প্রণালী ও এইরূপে নির্ব্বাচিত সভ্যগণ কখন জাতি-সাধারণের সহানুভূতি পাইবে না। সুতরাং লর্ড রিপণের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বিফল হইবে। জাতি-সাধারণকে আত্মশাসন শিখানই লর্ড রিপণের উদ্দেশ্য। দশ জন জমীদার বা মহাজন তাহা শিখিলে কি হইবে? ইহা অখণ্ডনীয় সত্য যে, সম্পত্তি নির্ব্বাচন-নিয়ামক হইলে অনেক বিদ্বান্, উপযুক্ত ও দেশ-হিতৈষী লোক বাদ পড়িয়া যাইবেন। কারণ, পল্লীগ্রামস্থ অনেক গৃহস্থের আয় ৫০০৲ টাকার ন্যূন হইবে, অথচ তাঁহাদিগের মধ্যে অনেক যোগ্য লোক আছেন। এক জন জমীদার বা এক জন দোকানদারের আয় হয় ত বেশী হইতে পারে, কিন্তু অনেক সময়ে তাহাদিগকে বিদ্যা-বুদ্ধিশূন্য দেখিতে পাওয়া যায়। আপন আপন কার্য্য-নির্ব্বাহোপযোগিনী বুদ্ধি তাঁহাদিগের নাই,

এ কথা বলি না। কিন্তু রাজনীতি, অর্থনীতি ও শাসন-প্রণালী প্রভৃতির জটিল প্রশ্ন সকলের মীমাংসা করিতে যে সূক্ষ্ম বুদ্ধির প্রয়োজন, তাহা তাঁহাদের সাধারণতঃ নাই, ইহাই আমাদের বক্তব্য। মধ্য-বিত্ত ব্রাহ্মণ-কায়স্থের আয় হয় ত ৫০০৲ টাকার কম হইতে পারে, কিন্তু তাঁহাদিগের বুদ্ধি সাধারণতঃ অতি সূক্ষ্ম। ইহাঁদের মধ্য হইতেই সাধারণতঃ জমীদারদের ও ব্যবসাদারগণের গোমস্তা, মুহুরী, নায়েব, দাওয়ান প্রভৃতি মনোনীত হইয়া থাকেন। ইহাঁদের হয় ত সম্পত্তি নাই, এবং বেতন হয় ত ১০০০৲ বা ৫০০৲ টাকার ন্যূন, কিন্তু বুদ্ধিবিদ্যায় ইঁহারা মনিবদের প্রভু। মনিবগণ ইহাঁদিগের হস্তে কাষ্ঠ-পুত্তলীর ন্যায় নৃত্য করেন মাত্র। বর্ত্তমান নির্ব্বাচন-প্রণালীতে এ সকল লোকের অধিকাংশই বাদ পড়িবে। এতদ্ভিন্ন পল্লীগ্রামে এমন উচ্চবংশোদ্ভব বৃত্তিভোগী যজনোপজীবী বা দীক্ষাগুরু ব্রাহ্মণ সকল আছেন, যাঁহারা আজও কাহারও দাস্য স্বীকার করেন না এবং তাঁহাদিগের আয়ও বেশী নহে অথচ সমাজে তাঁহাদিগের অসীম প্রতিপত্তি। তাঁহাদিগের এক কথায় যে কাজ হইবে, লক্ষপতি তেলী, তাম্বলী প্রভৃতির লক্ষ কথাতে সে কাজ হইবে না। বণিক্ রাজা এ কথার যাথার্থ্য হয় ত বুঝিতে পারিবেন না। তাঁহাদের দেশে অর্থের গৌরব অধিক। এ দেশে তাঁহাদিগের অনুকরণে অর্থের গৌরব বাড়িতেছে বটে, কিন্তু এখনও বিদ্যা-বুদ্ধির ও বংশমর্য্যাদার গৌরব লোপ হইতে অনেক দিন লাগিবে।

এখনও সামাজিক শাসনদণ্ড ব্রাহ্মণ-কায়স্থের হস্তে রহিয়াছে, সুতরাং তাঁহাদিগকে দরিদ্র বলিয়া বাদ দিলে, লর্ড রিপণের উদ্দেশ্য বিফল হইবে। প্রস্তাবিত প্রণালীতে নির্ব্বাচিত স্থানীয় সমিতি জমীদার ও বণিক্‌বহুল হইবে, সুতরাং সেখানে প্রজাসাধারণের স্বার্থ সমর্থিত হইবার কোন আশা থাকিবে না। সুতরাং এরূপ আংশিক স্বায়ত্ত-শাসন-প্রণালীতে দেশের অনিষ্ট বই ইষ্টের সম্ভাবনা নাই।

অনেক গ্রামে দেখা যায়, গ্রামের বিদ্যালয়ের পণ্ডিত বা মাষ্টার বুদ্ধিবিদ্যায় গ্রামের মধ্যে প্রধান। অনেক বিষয়েই লোকে তাঁহার সহিত পরামর্শ করে এবং তাঁহার পরামর্শানুসারে কাজ করে। কিন্তু তাঁহাদিগের সাধারণতঃ যেরূপ আয়, তাহাতে তাঁহারা যে কখনও নির্ব্বাচক-শ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবেন, তাহার কোন আশাই নাই। মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ বা গ্রাম্য পণ্ডিত ও মাষ্টারকে বাদ দিলে, গ্রামে মানুষের মধ্যে থাকে কে? সুতরাং আমাদের মতে সম্পত্তি নির্ব্বাচন-নিয়ামক হওয়া কোনমতেই উচিত নহে। যদি নিতান্তই গবর্ণমেণ্টের তাহা ভাল লাগে, তাহা হইলে সম্পত্তির পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক। নির্ব্বাচকের পক্ষে ১০০৲ টাকা ও সভ্যের পক্ষে ৫০০৲ টাকা আয় হইলেই যথেষ্ট হইতে পারে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যার গৌরবও করা চাই। মাইনর ও ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিগণকে নির্ব্বাচক এবং গ্রাজুয়েট, আণ্ডার গ্রাজুয়েট ও সংস্কৃত উপাধি-পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তিগণকে সভ্য মনোনীত হওয়ার অধিকার দিলেই বিদ্যার গৌরব করা হইবে।

ভূতপূর্ব্ব লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর প্রতি সবডিভিসন উপবিভাগকে এক একটি শাসনকেন্দ্র করিতে চাহিয়াছেন এবং লোকবহুল স্থানে থানাকে শাসন-কেন্দ্র করিতে প্রস্তুত আছেন। এই প্রণালী প্রাচীন পল্লীসমাজের কাছাকাছি যাইতেছে। কিন্তু এরূপ বিকেন্দ্রীকরণ-প্রথা ভারতের সমীকরণের প্রতিকূল। ইহা প্রাদেশিক বিদ্বেষভাব উদ্দীপিত করার একটি প্রধান উপকরণ হইবে। ইহা বিশ্বজনীন সহানুভূতির উৎপত্তির প্রধান অন্তরায় হইবে। যদি রেল, টেলিগ্রাফ ও ভাল রাস্তা-ঘাট না থাকিত, তাহা হইলে জেলাকে এরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপবিভাগে বিভক্ত করার আবশ্যকতা হইত। কিন্তু এখন তাহার আবশ্যকতা দেখিতেছি না। এক সময়ে যখন এক গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাওয়ার পথ অতি দুর্গম ও বিপৎসঙ্কুল ছিল, তখন পল্লীসমাজেরও আবশ্যকতা ছিল। কিন্তু এখন চতুর্দ্দিকে রেল ও চতুর্দ্দিকে পথ। এখন কিঞ্চিৎ পাথেয় পাইলে সভ্যমাত্রেই অনায়াসে নগরে আসিয়া সভার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারেন। শাসনবৃত্ত যতই সঙ্কীর্ণ হইবে, ততই লোকের মন সঙ্কীর্ণ, প্রাদেশিক বিদ্বেষ-ভাব অধিকতর পরিপুষ্ট ও বিশ্ব-জনীন সহানুভূতির ভাব অধিকতর সঙ্কুচিত হইবে। এই জন্য আমরা জেলার নগরকে শাসনকেন্দ্র করিতে চাহি। যেমন গ্রহমণ্ডলী আপন আপন মেরুদণ্ডের উপরে দিন-রাত্রিতে একবার করিয়া পরিভ্রমণ করিয়া বৎসরে আপন বৃত্তে সূর্য্যমণ্ডলকে একবার প্রদক্ষিণ করে,

সেইরূপ এই নগররূপ গ্রহমণ্ডলী আপন আপন প্রদেশে প্রতিদিন ঘুরিয়া, বৎসরে একবার ভারতের রাজধানীকে প্রদক্ষিণ করিবে। এমন দিন নিশ্চয়ই আসিবে —এবং সে দিন বহুদূরবর্ত্তী নয়—যখন এই স্থানীয় সমিতি সকল হইতে দুই জন করিয়া প্রতিনিধি যাইয়া অন্ততঃ বৎসরে একবার করিয়া প্রতিবিভাগীয় রাজধানীতে অধিবেশন করিবে। একজন সরস্বতীর ও অন্যতর লক্ষ্মীর প্রতিনিধি। এই সামঞ্জস্যরক্ষাতেই রাজ্যের স্থায়িত্ব। এই স্থানীয় সমিতি সেই ভবিষ্য মহতী জাতীয় সমিতির ভিত্তিভূমি ও অগ্রদূতী। (*) এই জন্যই বলিতেছিলাম, আমরা জেলার নগরকেই শাসনকেন্দ্র করিতে চাহি। শাসনবৃত্ত ইহা অপেক্ষা আরও সঙ্কীর্ণ করিতে চাহি না। ইহাতে কাহারও কিছু ক্ষতি হইবে না, অথচ জাতীয় শক্তি ক্রমেই ঘনীভূত হইবে। (†) কারণ, যখন প্রতি থানা হইতে প্রতিনিধি সভ্য প্রেরিত হইবে, তখন প্রত্যেক থানায় নির্ব্বাচকগণ আপন আপন গ্রামের স্বার্থ সেই সকল প্রতিনিধি সভ্য দ্বারা অনায়াসেই জেলার শাসন-সমিতিতে ব্যক্ত করিতে পারিবেন। সুতরাং থানা শাসনকেন্দ্র হইলে যে ফল, তাহা তাঁহারা পাইতেছেন, অথচ জেলার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খণ্ড খণ্ড করিয়া সহানুভূতির বেগ কমাইতে হইতেছে না। সুতরাং এ বিষয় আমরা লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের প্রস্তাবের অনুমোদন করিতে পারিলাম না।

সভাপতি-নির্ব্বাচনের ভার আমাদিগের মতে সর্ব্বত্রই সভ্যগণের হাতে থাকা উচিত। শাসন-সমিতির গঠনকার্য্য সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের নির্ব্বাচিত সভাপতি কার্য্য করিতে পারেন, কিন্তু গঠন-কার্য্য সমাপ্ত হইবামাত্র তাঁহাকে অপসৃত হইতে হইবে। হয় ত তিনিই সভ্যগণ কর্ত্তৃক সভাপতি নির্ব্বাচিত হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে সভ্যগণের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তিনি ইংরাজ হউন, তাহাতেও আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু তাঁহাকে মনোনীত করার ভার সভ্যগণের হস্তে এবং পরে তিনি প্রতিকুলাচরণ বা শক্তির অপব্যবহার করিলে তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করার অধিকার সভার হস্তে থাকা চাই।

গবর্ণমেণ্ট বোর্ড অব কন্‌ট্রোল নামক একটি স্বতন্ত্র শাসন-কেন্দ্র করিতে চাহিতেছেন। কিন্তু ইহা যে সভার কার্য্যকারিতা নষ্ট করিবে না, কে বলিল? মাজিষ্ট্রেট সভাপতি হইলে যে পরিমাণ অনিষ্টের

---

* ইহা দ্বারা পাঠকগণ দেখিবেন যে, বর্ত্তমান জাতীয় মহাসমিতির (Congress) উৎপত্তির বহুদিন পূর্ব্বে ইহার চিত্র আমার হৃদয়ফলকে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল। কারণ, এ প্রবন্ধটি ১২৮৮ সালের মাঘমাসের আর্য্যদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল।

† এমন দিন হয় ত এক সময় আসিবে, যখন এই জাতীয় ভাবও অতি সঙ্কীর্ণ বলিয়া বোধ হইবে। এখন যেমন প্রাদেশিক ভাব জাতীয় ভাবে বিলীন হইতেছে, তখন আবার জাতীয় ভাব বিশ্বভাবে বিলীন হইবে। তখন সমস্ত পৃথিবী এক প্রকাণ্ড সাধারণতন্ত্রে পরিণত হইবে। তখন প্রত্যেক রাজ্য বা সাম্রাজ্য সেই সেই সৌর-জগতের এক একটি গ্রহস্বরূপ হইয়া ইহার মাধ্যমিক কেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে ঘুরিবে। তখন নদীয়া, যশোহর প্রভৃতি জেলা বিলুপ্ত হইয়া বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম প্রভৃতি জেলায় পরিণত হইবে। তখন বৈদ্যুতিক, লৌহবর্ত্ম ও ব্যোমযান প্রভৃতির পর্য্যাপ্ত ব্যবহারে ও বেগবৃদ্ধিতে প্রাদেশিক দূরত্ব একেবারে কমিয়া যাইবে। শাসনবৃত্তকে এইরূপে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইতে অতি প্রকাণ্ডে পরিণত করাই সভ্যতার চরম ফল। ইউরোপে এক্ষণে যে বড় বড় রাজ্যের প্রতিনিধি লইয়া মধ্যে মধ্যে এক একটি কংগ্রেস বসে, ইহা সেই প্রকাণ্ড বিশ্ব-সম্মিলনের সূত্রপাত মাত্র। বিশ্ব-সম্মিলনের আবশ্যকতা এখন সভ্যজাতিমাত্রেই ক্রমে অনুভব করিতেছেন। সুতরাং ইহা যে এক দিন ঘটিবে, তদ্বিষয়ে আর সংশয় নাই। তখন জাতিগত বিদ্বেষ বিলুপ্ত হইয়া বিশ্বপ্রেমের রাজ্য আবির্ভূত হইবে। তখন আর যুদ্ধ-বিগ্রহাদি দ্বারা মানুষে মানুষের রক্ত-মাংস খাইবে না। তখন বীর বলিলে নরহন্তা বুঝাইবে না। তখন দয়াবীর, ভক্তিবীর, প্রেমবীরে জগৎ প্লাবিত হইবে। সকলেই ভাই ভাই, সকলেই ভাই বোন্। কাহাকে দেখিলে, কাহারই হৃদয় বিদ্বেষ কিংবা প্রতিহিংসানলে উদ্দীপিত হইবে না। সকলেই পরস্পর প্রেমে বিভোর। জগৎ তখন অনন্ত আনন্দে পরিপূর্ণ হইবে। ইহাই বৈকুণ্ঠ, ইহাই স্বর্গ। মা বিশ্বজননি! বলিয়া দেও, যে দিন কবে আসিবে?

সম্ভাবনা ছিল, বোর্ডের অবিরাম হস্তক্ষেপে তাহা অপেক্ষাও যে অধিক অনিষ্টের সম্ভাবনা রহিল না, কে বলিল ? পলিটিকেল এজেন্টগণ যেরূপ স্বাধীনরাজগণের বিশেষ যন্ত্রণার কারণ হইয়াছেন, বোর্ড যে স্থানীয় শাসন-সমিতির সেইরূপ যন্ত্রণার কারণ হইবেন না, কে বলিল ? ম্যাজিষ্ট্রেটের নানা কাজ; সুতরাং তাঁহার হয় ত খোঁচাখুঁচি করার অবসর হইত না। বিশেষতঃ তিনি সভাপতি হইয়া সভার বিরুদ্ধে বাহিরে কিছু বলিতে পারিতেন না, ভিতরে সভ্যগণের সঙ্গে যে কিছু সংঘর্ষ উপস্থিত হউক না কেন, সভ্যগণের বা সভার বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্টে কিছু লিখিতে পারিতেন না। কারণ, প্রকারান্তরে তাহাতে তাঁহার নিজেরই অপটুতা প্রকাশ হইত। * কিন্তু বোর্ড অব কণ্ট্রোলের আর কিছু কাজ থাকিবে না; সুতরাং সভার ছিদ্রান্বেষণ করাই তাঁহার একমাত্র ব্যবসায় হইয়া দাঁড়াইবে। এইরূপে দুই বোর্ডের সংঘর্ষ অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে। যে সকল ভদ্রলোক দেশের হিতের জন্য 'ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়াইতে' আসিবেন, তাঁহারা গতিক দেখিয়া ক্রমেই সরিয়া পড়িবেন। সুতরাং গবর্ণমেণ্ট যদি দেশীয় লোককে স্বায়ত্ত-শাসন-প্রণালীর সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, তাহা হইলে স্বাতন্ত্র্য না দিতে পারেন; কিন্তু যদি কথঞ্চিৎ উপযুক্ত বোধ করিয়া থাকেন ত উৎপত্তির সময়েই যেন এরূপ মৃত্যুর পথ করিয়া না রাখেন। যেন অগ্রসর হইতে দিয়া পশ্চাদিক্ হইতে এরূপ চুল ধরিয়া টানিবার ব্যবস্থা না করিয়া রাখেন। প্রথম অবস্থায় একটু আধটুকু বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পারে, গবর্ণমেণ্টের পূর্ব্ব হইতেই এরূপ ধরিয়া রাখা উচিত। কোন গুরুতর বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে জানিতে পারিলে, ম্যাজিষ্ট্রেট সে বিষয়ে গবর্ণমেণ্টে লিখিতে পারিবেন এবং সেই রিপোর্ট অনুসারে কমিশনর আসিয়া সে বিষয় তদন্ত করিতে পারিবেন। ইহার জন্য স্বতন্ত্র বোর্ড অব কণ্ট্রোল রাখিবার আবশ্যকতা দেখি না।

সভাপতির বেতন ও সভ্যগণের পাথেয় এই দুইটিই প্রার্থনীয় বিষয়, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণরূপে সভার আয়ের উপরে নির্ভর করিতেছে। যাঁহারা প্রকৃত দেশ-হিতৈষী, তাঁহারা সভার ক্ষমতানুসারে যে যৎকিঞ্চিৎ লইয়াই সন্তুষ্ট হইবেন, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে একটি সাধারণ নিয়ম করিবার প্রয়োজন নাই।

মিউনিসিপ্যাল আইনের ১৬ ধারার নির্ব্বাচন-প্রণালী-সম্বন্ধে যে নিয়ম আছে যে, করদাতৃগণের অন্ততঃ এক-তৃতীয়াংশ আবেদন না করিলে, গবর্ণমেণ্ট নির্ব্বাচন প্রণালী মঞ্জুর করিবেন না, ইহা বোধ হয়, পল্লীগ্রামস্থ অনেকেই অবগত নহেন। গবর্ণমেণ্ট ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটকে এই বিষয় সকলকে বিদিত করাইবার জন্য চেষ্টা করিতে বলিয়াছেন। আমাদের সকলেরই এ বিষয়ে প্রাণপণে ম্যাজিষ্ট্রেটের সহায়তা করা উচিত। যাহাতে সকলেই এই স্বায়ত্ত-শাসন ভাল করিয়া বুঝিতে পারে ও বুঝিয়া তদনুষ্ঠানে প্রাণপণ চেষ্টা করে, তদ্বিষয়ে ঐকান্তিকতার সহিত আমাদের কার্য্য করা উচিত। ভ্রাতৃগণ ! আমাদের নিশ্চেষ্ট থাকিবার সময় নয়। মহামতি লর্ড রিপণ ভারতের অধীনতা-শৃঙ্খল কিয়ৎপরিমাণে শিথিলিত করিবার নিমিত্ত ভারতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আসুন, আমরা আজ প্রাণপণ করিয়া তাঁহার সহায়তা করি। তিনি বিশ্বপ্রেমিক ও ভারতবন্ধু। আকবরের পর আর এরূপ নরপতি ভারত-সিংহাসন অধিকার করেন নাই। তাই আজ ভারতের সর্ব্বোচ্চ বিচারালয়ের সর্ব্বোচ্চ আসনে দেশীয় প্রাড্বিবেক্ * সমাসীন।

---

* ১২৮৮ সালের মাঘ মাসের আর্য্যদর্শনে আমি যাহা লিখিয়াছিলাম, ভগবানের কৃপায় ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের গঠন প্রায় তদনুরূপই হইয়াছে। তবে ইহাকে আমি জেলার ভিতর একমাত্র শাসনকেন্দ্র করিতে বলিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা না হইয়া ইহার অধীনে লোকাল বোর্ড বা স্থানীয় বোর্ড নামক ক্ষুদ্রতর শাসনকেন্দ্র সকল সংস্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু এই সকল ক্ষুদ্রতর শাসনকেন্দ্র ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের অধীন হওয়ায় তাহাদিগের অনিষ্টকারিতা কমিয়া গিয়াছে। বোর্ড অব্ কণ্ট্রোল্ বা মাধ্যমিক বোর্ড আজও স্থাপিত হয় নাই। পরে কি হয়, বলা যায় না। আমাদিগের বিবেচনায় ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড হইতে প্রতিনিধি গ্রহণ করিয়া এক একটি বিভাগীয় বোর্ড (Provincial Board) স্থাপিত হওয়া উচিত।

* সার্ রমেশচন্দ্র মিত্র মহোদয় লর্ড রিপণের যত্নে কিছু দিনের জন্য হাইকোর্টের চিফজষ্টিসের পদে অভিষিক্ত হন।

আজ যদি ইহাঁর পূর্ণ-স্বাধীনতা থাকিত, তাহা হইলে বোধ হয়, আজ আবার টোডরমল্ল, মানসিংহ বীরবল প্রভৃতিকে দেখিতে পাইতাম। আকবর যেমন নিজ-জাতিসাধারণ হইতে ধর্ম্ম-সম্বন্ধে ভিন্নমতাবলম্বী হওয়ায় স্বজাতি-পক্ষপাতিত্ব সম্পূর্ণরূপে ভুলিতে পারিয়াছিলেন,—ইনিও সেরূপ নিজজাতিসাধারণ হইতে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী হওয়ায়, জাতিগত পক্ষপাতিত্বের শৃঙ্খল ভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। *

আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, রিপণ যেন দীর্ঘকাল ভারতসিংহাসন অধিকার করিয়া থাকেন। তিনি অন্ততঃ দশ বৎসরকাল ভারতে থাকিলেও, ভারতে স্বায়ত্ত-শাসন-প্রণালী বদ্ধমূল হইবে ;— ইংরাজ বিধিগ্রন্থ হইতে ইংরাজ-শাসনের কলঙ্ক-স্বরূপ অস্ত্রবিধি প্রক্ষালিত হইবে ; এবং ফৌজদারী কার্য্যবিধির সপ্তম অধ্যায়ে শ্বেত-কৃষ্ণের বিচারপার্থক্য করায় ইংরাজের নির্ম্মল আইনে যে কালিমা পতিত হইয়াছে, তাহাও বিধৌত হইবে। তিনি যাহাতে অল্পকালস্থায়ী রাজত্বেই অনেক কাজ করিয়া উঠিতে পারেন, আসুন, আমরা সমস্ত ভারতবাসী মিলিয়া আজ তাহাই করি। আসুন, আমরা সকলে একবাক্যে তাঁহার প্রতি ও তাঁহার কার্য্যের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করি। আসুন, আমরা আজ সমস্বরে তাঁহার যশোগান করি। হিমালয় হইতে কুমারিকা ও সিন্ধু হইতে সুদূর ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনি তুলিয়া গাই—জয় রিপণের জয়! জয় ভারতের জয়! মিলি সবে গাই ভারতের জয়! রিপণের জয়! শুনুক্ জগৎ, স্তব্ধ হ'ক চরাচর!

নবজীবন ও প্রচার এবং নব হিন্দুধর্ম্ম

আজকাল হিন্দুধর্ম্ম লইয়া যে গুরুতর আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে একবারে স্থির থাকা অসম্ভব। 'নবজীবন' পাইয়া সমস্ত বঙ্গদেশ যেন নিদ্রোত্থিত হইয়াছে এবং 'প্রচারের' উদ্দীপনায় মৃত হিন্দুসমাজের অস্থিরাশিতে যেন নবজীবন সঞ্চারিত হইয়াছে। সকলেরই মুখে এখন 'নবজীবন' ও 'প্রচার' বই আর কিছুই শুনিতে পাওয়া যাইতেছে না। সকলে ঘটীবাটী বেচিয়াও যেন 'নবজীবন' ও 'প্রচারের' মূল্যপ্রাপ্তির স্তম্ভ পূরণ করিতে সমুদ্যত হইয়াছেন। এ নবজীবনের নূতন উৎসাহে বঙ্গসমাজ আজ উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। হারাণ ধন পুনঃপ্রাপ্ত হইলে কাঙ্গালের মন যেরূপ আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, লুপ্তপ্রায় ও পদদলিত হিন্দুধর্ম্মের পুনঃপ্রচারে হিন্দুসমাজের আজ সেই আনন্দোচ্ছ্বাস!

'নবজীবন' ও 'প্রচার' সত্য সত্যই যে কোন নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিতেছে বা হিন্দুধর্ম্মের কোন নূতন ব্যাখ্যা দিতেছে, তাহা নহে। থিয়োসফি বা তত্ত্ববিদ্যা লুপ্তপ্রায় হিন্দু-ধর্ম্মের যে জীবন-সঞ্চার কার্য্যে ব্রতী হইয়াছে, 'নবজীবন' ও 'প্রচার' তাহার সহায়তা করিতেছে মাত্র। হিন্দুধর্ম্মের অভ্যন্তরে—রূপকজালের ভিতরে—যে রত্নরাজি নিহিত আছে, সেই সকল তুলিয়া 'নবজীবন' ও 'প্রচার' হিন্দুসমাজকে উপহার দিতেছে। এই জন্য উক্ত পত্রিকাদ্বয় সমস্ত হিন্দু-সমাজের কৃতজ্ঞতাপাত্র সন্দেহ নাই।

ইংরাজগণের রাজত্বকালের প্রারম্ভ হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মের আবির্ভাবকাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে কেবল খৃষ্টানধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছিল। হিন্দু-ধর্ম্মের স্বাপক্ষে বলিবার তখন কেহ ছিল না। এই জন্য খৃষ্টীয় মিশনরীগণ অবাধে হিন্দুধর্ম্মের দোষোদেঘাষণ করিয়া বেড়াইতেন। তরলমতি হিন্দু-যুবকগণ সেই কুহকে পড়িয়া দলে দলে খৃষ্টান হইতে লাগিলেন। সেই স্বধর্ম্মভ্রষ্ট যুবকদলের জননীর ক্রন্দনে ও জায়ার আর্ত্তনাদে কিছুকাল ভারতগগন প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

এই সময় মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় প্রাদুর্ভূত হইলেন। তিনি দেখিলেন যে, বাহ্যপূজামূলক সাকার হিন্দুধর্ম্ম দ্বারা খৃষ্টীয় ধর্ম্মের উচ্ছেদসাধন অসম্ভব। এই জন্য তিনি হিন্দুধর্ম্মের নিরাকারবাদ প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। খৃষ্টীয় ধর্ম্মে একটি অবতার—হিন্দুধর্ম্মে তেত্রিশ কোটি অবতার। সুতরাং খৃষ্টীয় মিশনরীগণ খৃষ্টান ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই জন্যই অনেক যুবক খৃষ্টান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। রামমোহন রায় নিরাকার একেশ্বর-বাদ প্রচার করিয়া এই স্রোত রোধ করিলেন, 'ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্' এই অদ্বৈতবাদের নূতন ব্যাখ্যা করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে খৃষ্টান্ ইউনিটেরিয়ান্ ধর্ম্মের সমান

---

* লর্ড রিপণ প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক রোমান্ ক্যাথলিক ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

করিলেন। 'ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্'—ইহার অদ্বৈত-বাদীয় অর্থ এই যে, এই জগতে একমাত্র সত্তা আছে—সেই সত্তা ঈশ্বর। কিন্তু রামমোহন রায় ব্যাখ্যা করিলেন যে, ঈশ্বর এক বই দ্বিতীয় নাই। রামমোহন রায়ের এই ব্যাখ্যায় মোহিত হইয়া হিন্দুযুবকগণ দলে দলে ব্রাহ্ম হইতে লাগিলেন।

তৎকালে ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া বিবেচিত হইত না। ব্রাহ্মধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্মের সারসংগ্রহ বলিয়া সকলেই বিবেচনা করিতেন। ব্রাহ্মেরাও তৎকালে 'আমরা হিন্দু নহি' এই জয়পতাকা মাথায় বাঁধেন নাই। সুতরাং প্রবীণ হিন্দুরাও ব্রাহ্মসমাজে গিয়া ব্রাহ্মোপাসনায় যোগ দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। রামমোহন রায়-প্রতিষ্ঠাপিত ব্রাহ্মসমাজ এখন আদি-ব্রাহ্মসমাজ নামে খ্যাত। এই আদি-ব্রাহ্মসমাজের সহিত হিন্দু সমাজের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। কারণ, আদিব্রাহ্মসমাজ বেদাদি হিন্দুধর্ম্মগ্রন্থকে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল ভিত্তি বলিয়া স্বীকার করায় হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেন না। প্রতিষ্ঠাতা রামমোহন রায় হিন্দু অদ্বৈতবাদের নূতন ব্যাখ্যা করিয়া ব্রাহ্মসমাজকে নূতন আকার দিলেন বটে, কিন্তু উভয় সমাজকে সূক্ষ্মসূত্রে আবদ্ধ রাখিলেন। দিন দিন ব্রাহ্মসমাজের সহিত হিন্দু-সমাজের ঘনিষ্ঠ হইতে ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ স্থাপিত হইতেছিল—এমন সময় সেই মহাপুরুষের অকালে মৃত্যু হইল। ভারতগগনে সহসা যেন অকাল-মেঘ উদিত হইল। কিছুদিন সকলে স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন।

এমন সময়ে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন বঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। হিন্দুসমাজকে তুলিব, হিন্দুধর্ম্ম-শাস্ত্রের নব নব ব্যাখ্যা করিয়া ইহাকে সময়োপযোগী বেশভূষায় বিভূষিত করিব, কেশব বাবুর মনে তখন এ ইচ্ছা হইল না। তিনি সমস্ত ভারতবর্ষকে এবং শেষ সমস্ত পৃথিবীকে একধর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ করিবেন সঙ্কল্প করিলেন। তিনি সংস্কৃত তত জানিতেন না বলিয়া সংস্কৃত-শাস্ত্রের মূল বুঝিতেন না। সুতরাং আর্য্যধর্ম্মশাস্ত্র অপেক্ষা বাইবেল তখন তাঁহার অধিকতর চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল। তিনি ইউনিটেরিয়ান্ খৃষ্টানধর্ম্মকে কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত করিয়া ভারতে চালাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। খৃষ্টীয় আচার-ব্যবহার এবং বিবাহ ও উপাসনা-পদ্ধতি পর্য্যন্ত তিনি ব্রাহ্মসমাজে চালাইবার চেষ্টা করিলেন এবং তদ্বিষয়ে অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। এইরূপে ব্রাহ্মসমাজ ক্রমে ক্রমে অতর্কিতভাবে হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে লাগিল। অবশেষে তিন আইন (১) এই দুই সমাজকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ করিয়া ফেলিল। কেশব বাবু সমস্ত ভারতবর্ষকে একধর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ করিতে গিয়া হিন্দুসমাজ হইতে মৌলিকদলকে (২) পৃথক্ করিয়া ফেলিলেন। ইহাতে ব্রাহ্মসমাজ ও হিন্দুসমাজ উভয়েরই সমূহ ক্ষতি হইল। স্থিতিশীল-জনবহুল হিন্দুসমাজকে যাঁহারা সর্ব্বদা সংস্কারের জন্য উত্তেজিত করিতেন, তাঁহারা বাহিরে গিয়া পড়ায় হিন্দুসমাজ আবার নিমীলিতনেত্র হইলেন। যে কিছু আবশ্যকীয় সংস্কার তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের স্কন্ধে চাপাইয়া নিদ্রা যাইতে লাগিলেন। অলসের যে সান্ত্বনা, তাঁহাদিগেরও সেই সান্ত্বনা। অলসেরা যেমন পাছে নড়িতে হয় বলিয়া যে অবস্থায় থাকে, সেই অবস্থাতেই সন্তুষ্ট হয়, সেইরূপ স্থিতিশীল হিন্দুসমাজ কাজ করিবার ভয়ে যাহা আছে, তাহাই ভাল বলিয়া মনকে প্রবোধ দিয়া সুখে নিদ্রা যাইতে লাগিলেন।

এ দিকে ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অনিয়ন্ত্রিত-গতিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যাহা পরিত্যাগ করা যায়, তাহার সৌন্দর্য্য দেখায় মানুষের আর প্রবৃত্তি হয় না। ভাল জিনিস ছাড়িয়া আসিয়াছি ভাবিতেও মনে কষ্ট হয় বলিয়া, লোকে অবশেষে পরিত্যক্ত দ্রব্যের কেবল দোষাংশ ভাবিয়া মনকে প্রবোধ দিতে আরম্ভ করে। ব্রাহ্মসমাজও তাহাই করিতে আরম্ভ করিলেন। পরিত্যক্ত হিন্দুসমাজের ও হিন্দুধর্ম্মের কেবল দোষাংশ দেখাই তাঁহাদিগের প্রধান কর্ম্ম হইয়া উঠিল। যে সকল সমাজসংস্কার তাঁহাদিগের হৃদয়ে অতি প্রিয় বস্তু, হিন্দুমতে সে সকল সংস্কার-কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে, তাঁহারা যোগ দিতে অসম্মত হইতে লাগিলেন। আমার একটি প্রিয় ব্রাহ্মবন্ধু, যে মতে হউক, বিধবা-বিবাহ প্রচলিত করিবার জন্য এক সময়

(১) Act III or Indian Civil Marriage Act ইহাতে আমরা হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি নহি বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিতে হয়।

(২) Radical Party—যাঁহারা সমাজ ও ধর্ম্মের আমূল সংস্কারের আবশ্যকতা স্বীকার করেন।

প্রাণোৎসর্গ করিয়াছিলেন, কিন্তু হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার পর তাঁহার আর সে মতি গতি রহিল না। একবার হিন্দুমতে অনুষ্ঠানীয় একটি বিধবা-বিবাহে আহূত হইয়া তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন যে, বিবাহস্থলে শালগ্রাম উপস্থিত থাকিলে তিনি তথায় যাইতে পারিবেন না। হিন্দুধর্ম্মে ও হিন্দুসমাজে তাঁহারা আর কিছুই ভাল দেখিতে পাইলেন না। হিন্দু-নাম তাঁহাদিগের নিকট অপবিত্র বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল। তাঁহারা সেই জন্য ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্ম্মকে খৃষ্টীয় সমাজ ও খৃষ্টীয় আদর্শে গঠিত কবিয়া লইলেন। সুতরাং ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুসমাজ ও হিন্দুধর্ম্ম হইতে ক্রমশঃ অধিকতর দুরবর্ত্তী হইয়া পড়িল। ইহা উভয় সমাজের পক্ষেই একটি শোচনীয় রাজনৈতিক দুর্ঘটনা। কোথায় শতধাবিচ্ছিন্ন হিন্দুসমাজ ক্রমশঃ আভ্যন্তরীণ বিদ্বেষভাব ভুলিয়া পরস্পরের সহিত অধিকতর ঘনীভূত হইবে—না ক্রমশঃ আরও বিচ্ছিন্ন হইতে চলিল। কেশব বাবু শেষকালে এই ভ্রম বুঝিতে পারিয়া সংশোধন আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু ভারতের দুর্ভাগ্যবশতঃ কালবশে অকালে প্রাণ হারাইলেন। সুতরাং তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধ হইল না। উন্নতিশীল ব্রাহ্মসমাজ স্থিতিশীল হিন্দুসমাজের ভিতরে থাকিলে পরস্পর সংঘর্ষে পরস্পরই উপকৃত ও উন্নীত হইতে পারিতেন। কিন্তু এক্ষণে তাহার বিপরীত হইতে চলিল। উভয় সমাজের ভিতর অতর্কিতভাবে কি যেন এক শত্রুতা-ভাব দাঁড়াইয়া উঠিতেছে। পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষবিশিষ্ট—পরস্পর পরস্পরের প্রতি মমতাশূন্য। যাহা কিছু হিন্দু, ব্রাহ্মের চক্ষে তাহাই যেন অপবিত্র বলিয়া প্রতীত হয়। আজকাল দেখিতেছি, হিন্দুসমাজের ভিতরও ব্রাহ্মগণের বিরুদ্ধে সেইরূপ কি যেন এক ভাব উঠিতেছে। এই ভাবতরঙ্গে যে শুদ্ধ প্রাচীন সম্প্রদায়ে আবদ্ধ, তাহা নহে, নব্য সম্প্রদায়ের ভিতরও প্রবল উচ্ছ্বাস দেখা যাইতেছে। এই ভাব বহুদিন ধরিয়া ধুমায়মান হইতেছিল, এক্ষণে তাহার স্ফুলিঙ্গ 'নবজীবন' ও 'প্রচার'-রূপে আবির্ভূত হইয়াছে। উক্ত পত্রিকাদ্বয় আর্য্যধর্ম্মের মহিমা-কীর্ত্তন উপলক্ষে ব্রাহ্ম-বিদ্বেষও প্রচার করিতেছে।

এ আন্দোলনের আগমনী থিয়োসফি পূর্ব্বেই গাহিয়াছে। থিয়োসফিষ্ট সম্প্রদায় বা তত্ত্ববিদ্যাসমাজ পূর্ব্বেই ধুয়া ধরিয়াছেন যে, ভারতবর্ষীয় আর্য্যজাতির গ্রন্থনিচয়ে যে সমুদায় অমূল্য রত্ন নিহিত আছে, পাশ্চাত্য রত্নরাজি তাহার সহিত তুলনায় কিছুই নহে। থিয়োসফি স্পষ্টাক্ষরে ও মুক্তকণ্ঠে জগতে উদ্ঘোষিত করিয়াছে যে, পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণে ভারত কখনই উঠিবে না, কখনই বড় হইবে না; আর্য্য পূর্ব্বপুরুষগণ যে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিয়াছেন, তাহার সহিত তুলনায় পাশ্চাত্য আধ্যাত্মিক উন্নতি অতি সামান্য। উক্ত সমাজ শুদ্ধ এই কথা বলিয়া ক্ষান্ত হন নাই—'থিয়োসফি' মাসিকপত্রে প্রতিনিয়ত উহার প্রমাণ দিতেছেন। আর্য্যশাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিয়া তাহা হইতে রত্নরাজি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছেন যে, সে সমস্ত ঔজ্জ্বল্যে ও প্রতিভায় পাশ্চাত্য রত্নরাজি অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট।

তত্ত্ববোধিনী, বঙ্গদর্শন, আর্য্যদর্শন, বান্ধব ও ভারতী প্রভৃতি সাময়িক-পত্রিকাও সেই কার্য্যের অনেক সহায়তা করিয়াছে। কিন্তু 'নবজীবন' ও 'প্রচার' প্রধানতঃ এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছে। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, 'নবজীবন' ও 'প্রচার' হিন্দুধর্ম্মের বিশ্বজনীন ভাব গ্রহণ না করিয়া পৌত্তলিকতার উপরই বিশেষ ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। হিন্দুধর্ম্মে আস্তিক ও নাস্তিক, অদ্বৈতবাদী ও দ্বৈতবাদী, সাকারবাদী ও নিরাকারবাদী, শাক্ত ও বৈষ্ণব, ব্রাহ্ম ও অব্রাহ্ম—সকলেই অপরিত্যজ্য, সকলেই আদরণীয়। হিন্দুধর্ম্মে বলে না যে, সকলকেই ঈশ্বরের রূপ কল্পনা করিয়া পূজা করিতে হইবে। আবার রূপকল্পনা করিলেই যে উপাসনা অসিদ্ধ হইবে, এ কথাও শাস্ত্রও বলে না। সাধকের বিকাশভেদে উপাসনাভেদ—হিন্দুধর্ম্মের চরম উৎকর্ষের লক্ষণ। হিন্দুধর্ম্ম ব্যক্তিভেদে জড়োপাসনা হইতে অনন্তের উপাসনা ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছে। ইহা ব্যক্তিভেদে ইষ্টদেবতা স্বতন্ত্র করিয়া গিয়াছে। যে শালগ্রামশিলার উপাসক—সেও হিন্দু; এবং যে অনন্ত অজ্ঞাত অজ্ঞেয় ও অবাঙ্মানসগোচর ব্রহ্মের উপাসক, সেও হিন্দু। যে ভক্তিবাদী, সেও হিন্দু, যে জ্ঞানংব্রহ্মবাদী, সেও হিন্দু। যে ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ববাদী, সেও হিন্দু, যে ঈশ্বরের বিশ্বরূপত্ববাদী, সেও হিন্দু। যে হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিয়াছে, তাহার নিকট কোন প্রকার ভেদবুদ্ধি থাকিতে পারে না।

প্রকৃত অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য্য হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত মহিমা বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই চণ্ডালের শিষ্যত্ব স্বীকার করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। প্রকৃত অদ্বৈতবাদীর নিকট সকলই বিশ্বরূপ ভগবানের প্রতিকৃতি বলিয়া প্রতীতি জন্মিবে। সুতরাং জাতিগত, ধর্ম্মগত, বর্ণভেদ তাঁহার নিকট হইতে একেবারেই চলিয়া যাইবে। জাত্যভিমান, বংশমর্য্যাদার অভিমান বা কোন প্রকার অভিমান তাঁহার থাকিতে পারে না। তাঁহার নিকট হিন্দু ও যবন, ব্রাহ্ম ও অব্রাহ্ম, শ্বেত ও কৃষ্ণ-ভেদে কিছুই রহিতে পারে না। এই প্রকাণ্ড বিশ্বজনীনভাবে শঙ্করাচার্য্য বিশাল ও উদার বৌদ্ধধর্ম্মকেও হিন্দুধর্ম্মের কুক্ষিগত করিতে পারিয়াছিলেন। যে যেখানে হিন্দু হইতে চাহিয়াছিল, তাহাকেই তিনি হিন্দু করিয়া লইয়াছিলেন। ভারতে আবার হিন্দুধর্ম্মের সেই বিশাল ও উদার ভাবের আবির্ভাবের প্রয়োজন হইয়াছে। সঙ্কীর্ণভাবে ভারতের আর মঙ্গল নাই।

যে ধর্ম্ম সমস্ত ভারতকে, অন্ততঃ ভারতের অধিকাংশ অধিবাসীকে এক ধর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ করিতে পারে, সেই ধর্ম্মই আমাদের আরাধ্য। ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে এক সময়ে আমরা এই আশা করিয়াছিলাম। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ ভাব ধারণ করায় সে আশা গিয়াছে। এক্ষণে হিন্দুধর্ম্মের বিশ্বজনীন ভাবে যে মহাপুরুষ আবার ভারতকে অনুপ্রাণিত ও ঘনীভূত করিতে পারিবেন, তিনিই আমাদের পূজার পাত্র সন্দেহ নাই। যিনি হিন্দুধর্ম্মের বিশ্বজনীন ভাবে ও বিশাল প্রেমোচ্ছ্বাসে—ব্রাহ্মসমাজ এবং দেশীয় খৃষ্টীয় ও মুসলমান-সমাজকে হিন্দুসমাজের কুক্ষিগত করিতে পারিবেন—তিনি ভারতবাসীমাত্রেরই উপাস্য দেবতা। সে মহাপুরুষের চরণে আমরা উদ্দেশে নমস্কার করি। কিন্তু যিনি তাহা না করিয়া ধর্ম্মের নামে—ঈশ্বরের নামে—শতধা বিদীর্ণ ভারতবক্ষের আর একটিও ক্ষত বাড়াইবেন, তিনি ভারতের প্রকৃত শত্রু। যে ধর্ম্ম ভারতে আরও দলাদলি বাড়াইতে চাহে, যে ধর্ম্মধ্বজিগণ দগ্ধপ্রায় ভারতে আরও ধর্ম্মবিদ্বেষানল প্রজ্বলিত করিতে চাহেন, আমরা তাদৃশ ধর্ম্ম বা ধর্ম্মপ্রচারককে দূর হইতে নমস্কার করি। যে ভাবে বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য্য, গুরুগোবিন্দ, চৈতন্য ও রামমোহন রায় প্রভৃতি ধর্ম্মসংস্কারকগণ ভারতের একীকরণ-কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেই ভাবে আবার ভারতের একীকরণ আরম্ভ করিতে হইবে। ইহা সম্প্রদায় বা ব্যক্তিবিশেষের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ দ্বারা হইবে না। সর্ব্বগ্রাসী প্রেম ব্যতীত—পূর্ণ অভেদজ্ঞান ব্যতীত—গভীর আত্মবিস্মৃতি ব্যতীত—এ সাধনায় কেহ সিদ্ধ হইতে পারিবেন না। যেমন সাধ্য, তেমনই সাধনা চাই। যেমন সাধনা, তেমনই সাধকের প্রয়োজন।

বর্ণভেদ

—*—

মনরো সাহেব যে বর্ণভেদ লইয়া এত আন্দোলন করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, যাহাদের মধ্যে বর্ণ-বৈষম্য আছে, তাহাদিগের জেতৃজাতির সহিত রাজনৈতিক সাম্য চাহিবার অধিকার নাই,—ভারতীয় সেই বর্ণভেদের উৎপত্তি, পরিণতি, উপকারিতা ও অপকারিতা প্রভৃতি গুণাগুণ তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

প্রথমতঃ আমরা ইহার উৎপত্তিবিষয়ে আলোচনা করিব। এই বর্ণভেদের উৎপত্তিকাল নির্ণয় করা দুরূহ। যখন ভারতীয় আর্য্যেরা সারস্বত প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হন, তখন ইউরোপ কি অবস্থায় ছিল, তাহার কোন প্রবাদ বা ইতিহাস নাই। অনুমানতঃ তাহা খৃষ্টীয় শকের প্রায় দুই তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে হইবে। তখন সমস্ত পৃথিবী ঘোরতর অজ্ঞানতিমিরে আচ্ছন্ন ছিল। তাহার বহুকাল পরে গ্রীস ও রোমের জ্ঞানালোক ক্রমে ক্রমে ইউরোপ হইতে অজ্ঞান-তিমির বিদূরিত করে। আমরা যে সময়ের কথা আরম্ভ করিলাম, সে সময় আমাদের জেতা ইংরাজ কালকুক্ষিগত ছিলেন। তাহার বহুকাল পরে তাঁহাদিগের জাতীয় উৎপত্তি হয়।

সেই সুদূর অনৈতিহাসিক কালে আর্য্যেরা ভারতে আসিয়া দেশীয়গণ অপেক্ষা আপনাদিগের বর্ণগত উৎকর্ষ দেখিয়া সর্ব্বপ্রথমে 'শ্বেত কৃষ্ণ' দ্বারা শ্রেণীবিভাগ আরম্ভ করেন। তাঁহারা আপনাদিগকে আর্য্যবর্ণ ও দেশীয়দিগকে অনার্য্য বর্ণ বলিয়া অভিহিত করেন। শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ হইতে ক্রমে আর্য্য ও অনার্য্য শ্রেণী-বিভাগ হয়। এইরূপে

গাত্রবর্ণ হইতে ক্রমে জেতা ও জিতরূপ রাজনৈতিক শ্রেণীবিভাগের উৎপত্তি হয়। বিজয়ী আর্য্যগণের মধ্যে তখন একমাত্র বর্ণ ছিল। সকল আর্য্যই সমান ছিলেন। সেই সত্যযুগে আর্য্যরা আপনাদিগের মধ্যে সাম্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। আর্য্য ঔপনিবেশিকগণের মধ্যে ধনী, দীন, জ্ঞানী, অজ্ঞান, বীর ও অবীর সবই সমান ছিলেন। সকলেই পরস্পরকে ভাই ভাই বলিয়া মনে করিতেন। স্ত্রীজাতির প্রতি অবিশ্বাস ছিল না, সুতরাং অবরোধপ্রথা ছিল না। স্ত্রী পুরুষ সকলেই স্বাধীন—অথচ সকলেই পরস্পরে মমতাপূর্ণ। উভয়ের প্রতি একই বিধি ব্যবস্থাপিত ছিল। মিথ্যা প্রবঞ্চনা কাহাকে বলে, তাহা তাঁহারা জানিতেন না। তাঁহারা সরলতার ও সত্যপ্রিয়তার এক একটি জীবন্ত ছবি ছিলেন।

কিন্তু তাঁহাদিগের সেই পবিত্র হৃদয়াকাশে একখানি কাল-মেঘ উদিত হইয়াছিল। ক্রমে সাম্যময় আর্য্য উপনিবেশে অনার্য্য-সংস্রবে বৈষম্যের রেখা পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। আদিম-নিবাসিগণ নিরন্তর উৎপীড়ন করায় তাঁহাদিগের অন্তরে অনার্য্য-বিদ্বেষ অতি গাঢ়তর ভাব ধারণ করিয়াছিল। ঋগ্বেদের সমস্ত স্তোত্রগুলিতেই এই ভাব দেদীপ্যমান। যখন তাঁহারা তামসী নিশির কোলে গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত থাকিতেন, তখন অনার্য্যেরা আসিয়া তাঁহাদিগের অতি আদরের গোধন সকল লুঠপাট করিয়া লইয়া যাইত এবং তাঁহাদিগের স্ত্রী প্রভৃতি কাড়িয়া লইয়া গিয়া তাহাদিগের মাংস ভক্ষণ করিত। এই জন্য তাঁহারা ঋগবেদে অনার্য্যদিগকে দস্যু, নরভুক্, রাক্ষসাদি নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। এই দস্যুগণের উপদ্রব হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য তাঁহারা রজনীতে গড়খাই-করা শিবির সকলে একত্র বাস করিতেন। তাঁহারা সংখ্যায় এত কম ছিলেন যে, দৈববল দ্বারা আত্মবল উপচিত করা একান্ত আবশ্যক মনে করিয়াছিলেন। দৈনন্দিন কার্য্য সমাপ্ত করিয়া যখন রজনীতে সকলে একত্র হইতেন, তখন তাঁহারা দেবগণের স্তোত্র আরম্ভ করিতেন। এক এক জন আপন আপন হৃদয়ের ভাব কবিতাকারে প্রকাশ করিয়া সমবেত স্ত্রীপুরুষমণ্ডলীর হৃদয় আকৃষ্ট করিতেন। এক এক জন আপন আপন হৃদয়ের ভাব কবিতাকারে গাঁথিয়া, তানলয়যোগে গাহিয়া সেই ক্ষুদ্র আর্য্যজগৎকে মাতাইতেন; নির্ব্বাণোন্মুখ বীর্য্যবহ্নিতে প্রতিদিন ইন্ধন সংযোগ করিতেন। এই সকল স্তোত্রে আদিকবিগণের স্বভাবজ কবিত্ব, সরলতা ও জীবন্ত ধর্ম্মবিশ্বাস পরিব্যক্ত। ইহাতে তাঁহারা দেবগণকে পরিচিত বন্ধুভাবে আহ্বান করিয়াছেন—তাঁহাদিগের পার্শ্বে বসিয়া তাঁহাদিগের ভয়বিহ্বল হৃদয়কে সান্ত্বনা দিতে আহ্বান করিয়াছেন;—এরূপ ভাবে আহ্বান করিয়াছেন, যেন তাঁহারা সর্ব্বদা দেবগণের সাক্ষাৎকার লাভ পাইতেন, যেন পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিপদে তাঁহারা আসিয়া সাহায্য করিয়াছেন। এই কবিত্বপূর্ণ স্তোত্রনিচয় বহুকাল হইতে শিষ্যপরম্পরায় অভিগীত হইয়া আসিতেছিল। অবশেষে ব্রহ্মর্ষি বেদব্যাস সংহিতাকারে সেগুলি প্রকাশ করেন। ঋগবেদ—বেদব্যাস-সংগৃহীত এই স্তোত্র পরম্পরা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই ঋগবেদের কোন স্থানেই আধুনিক বর্ণ-বৈষম্যের উল্লেখ নাই। সামবেদে এই ঋক্গুলি গীতাকারে পরিণত হইয়াছে মাত্র; সুতরাং তাহাতেও বর্ণ-বৈষম্যের উল্লেখ থাকিতে পারে না। যজুর্ব্বেদও ঋগবেদের সার-সংগ্রহ মাত্র—অধিকন্তু তাহাতে কতকগুলি মন্ত্র সংযোজিত হইয়াছে মাত্র। ইহাতেও আধুনিক বর্ণবৈষম্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। অথর্ব্ববেদ অনেক আধুনিক, ইহা ঋষিপ্রবর বশিষ্ঠ-প্রণীত। ইহাতেও আধুনিক বর্ণবৈষম্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চতুর্ব্বর্ণের উল্লেখ সর্ব্বপ্রথমে কেবল 'ব্রাহ্মণে' দেখিতে পাওয়া যায়। এই ব্রাহ্মণগুলিতে পরিপুষ্ট সমাজের ছবি প্রতিফলিত। ইহা যে বৈদিক কালের অনেক পরে লিখিত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কারণ, বেদে যাযাবর জাতির ছবি চিত্রিত। আর্য্যেরা তখন ভারতে নূতন আসিয়াছেন। সুতরাং বেদে গ্রাম-নগরীর ছবি নাই, শিল্পবিজ্ঞানের কথা নাই, রাজপ্রাসাদ ও রাজপরিচ্ছদাদির উল্লেখ নাই। যাযাবর জাতির যাহা যাহা প্রয়োজন, কেবল সেই সকলের উল্লেখ আছে মাত্র। ক্রমে ক্রমে সমাজবন্ধন আরম্ভ হইল। আর্য্যেরা নিরন্তর পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে ক্রমে কষ্ট বোধ করিলেন। তাঁহাদের গোধনও ক্রমে কমিয়া আসিতে লাগিল। কারণ, গোমাংস এই সময়ে

আর্য্যদিগের প্রধান খাদ্য ছিল। গোমেধ-যজ্ঞের এ সময়ে বিশেষ আধিক্য ছিল। অতিথি আসিলেই তাহার জন্য একটি গরু মারা হইত, এই জন্য তাহাদিগকে 'গোঘ্ন' বলিত। 'গোঘ্ন' অর্থাৎ যাহার জন্য গোবধ হয়। ক্রমে আর্য্যগণের বংশবৃদ্ধি হইতে লাগিল। তখন আর গোমাংস ও গোদুগ্ধে কুলাইয়া উঠিল না। সুতরাং কৃষির আবশ্যকতা হইয়া উঠিল। কৃষির আবশ্যকতা হওয়ায় তাঁহাদিগকে পল্লীবদ্ধ হইতে হইল। যাযাবর অবস্থায় তাঁহাদিগের সকলকেই প্রয়োজনানুসারে সকল কার্য্যই করিতে হইত। সুতরাং তখন কার্য্যভেদের উৎপত্তি হয় নাই। এত দিনে কার্য্যসৌকর্য্যার্থে তাঁহাদিগের শ্রমবিভাগ করা আবশ্যক বলিয়া বোধ হইল। তাঁহারা দেখিলেন, সকলেই যুদ্ধ করিতে গেলে সংসারধর্ম্ম চলে না—এবং সকলে কৃষিকার্য্যে লিপ্ত থাকিলেও আত্মরক্ষা হয় না। বিশেষতঃ সকলে সকল কাজে কিছু পটু হইতে পারে না। এই জন্য যে যে কার্য্যের উপযোগী, তাহার উপর সেই কার্য্যের ভার অর্পণ করা হইল। যাহারা কৃষিকার্য্যের উপযোগী, তাহাদিগের উপর কৃষিকার্য্যের ভার অর্পণ করা হইল। ইহারা বৈশ্য বা বিশ নামে অভিহিত হইলেন। যাঁহারা যুদ্ধবিদ্যায় সুনিপুণ ও শারীরিক বলে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাঁহারা রাজ্যরক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। ইহাঁরা বৈশ্যদিগের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেন বলিয়া ইহাঁদিগকে 'বিশপতি' বলিত। ইহাঁদিগের অপর নাম ক্ষত্রিয়। আর্য্যদিগের ধর্ম্মবিশ্বাস অতিশয় প্রবল ছিল—জীবন্ত ও জলন্ত। তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন যে, প্রাণ ভরিয়া ডাকিতে পারিলেই দেবতারা আসিয়া তাঁহাদিগের সমস্ত অভাব মোচন করিবেন; তাঁহাদিগকে সমস্ত বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিবেন। যখন তাঁহারা শত্রুগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতেন, তখন উচ্চৈঃস্বরে এইরূপে ডাকিতেন :—

'ইন্দ্র ও সোম! আমাদিগের শত্রুগণকে বিনষ্ট কর, তাহাদিগকে নরকে নিক্ষিপ্ত কর! ঐ উন্মত্তদিগকে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড কর! শ্বাসরোধ করিয়া তাহাদিগকে মারিয়া ফেল! ঐ নরভুক্‌দিগকে কাটিয়া তাহাদিগের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দূরে নিক্ষিপ্ত কর।'

'ইন্দ্র ও সোম! ঐ পিশাচদিগের বিরুদ্ধে খড়্গ ধারণ কর! অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলে যেমন তাহা জলিয়া উঠে, সেইরূপ উহাদিগের দেহে অগ্নি-প্রজ্বালিত কর! ঐ আমমাংসভুক্—ঐ ব্রাহ্মণদ্বেষীদিগকে চিরদিন ঘৃণা করিও!'

'ইন্দ্র ও সোম! ঐ অনিষ্টকারিগণকে নরকের গভীরতম অন্ধকূপে নিক্ষিপ্ত কর। দেখিও, যেন এক জনও সেই অন্ধকূপ হইতে উঠিতে না পারে!' শত্রুপরিবেষ্টিত আর্য্যের হৃদয় হইতে স্বতই এইরূপ প্রার্থনা বাহির হইত। যাহাদিগের হৃদয়ে এরূপ ধর্ম্মবিশ্বাস—এরূপ জীবন্ত ধর্ম্মভাব, তাহাদিগের মধ্যে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ-সম্পন্ন ব্যক্তির আদর যে অধিক হইবে, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। সুতরাং যাঁহাদিগের অধিকতর ধর্ম্মভাব ও উজ্জ্বলতর কবিত্বশক্তি ছিল, তাঁহাদিগের প্রতি অধিকাংশেরই মন ভক্তিভাবে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। আর্য্য সাধারণ তাঁহাদিগকে অন্য কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইয়া দেবারাধনায় নিযুক্ত করিলেন। ইহাঁরাই ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মোপাসক) নামে অভিহিত হইলেন। সে সময় বৈশ্যেরা কৃষক ও সৈনিকের কার্য্য করিতেন। ক্ষত্রিয়েরা সেনাপতি ও রাজার কার্য্য করিতেন; এবং ব্রাহ্মণেরা ধর্ম্মযাজক বা আচার্য্যের কার্য্য করিতেন। আর্য্যসেনা যখন শত্রুসেনার বিরুদ্ধে অভিযানোদ্যত হইত, তখন আচার্য্যগণ বিদারিয়া দেবতাদিগকে ডাকিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিতেন। আচার্য্য দেবতাগণকে আহ্বান করিয়াছেন, সুতরাং অবশ্য তাঁহারা সমরে তাহাদিগের সাহায্য করিবেন—এই বিশ্বাসে আর্য্য সেনা বিশ্বস্ত-হৃদয়ে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন। সে বিশ্বাস-প্রদীপ্ত হৃদয়ের গতিরোধ করে, কাহার সাধ্য? অনার্য্যজাতি এই প্রচণ্ড আর্য্য-স্রোতস্বিনীর সহিত অবিরত সংঘর্ষে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া ক্রমে ইহাতে বিলীন হইয়া গেল। যাহারা মিশিল না—তাহারা পর্ব্বতের অধিত্যকা-প্রদেশে গিয়া স্বাধীনতা রক্ষা করিল। সাঁওতাল, ভীল, প্রভৃতি পার্ব্বতীয় জাতি—সেই অদমিত ও অনমনীয় অনার্য্য জাতি। তাহারা সমস্ত ছাড়িল, তথাপি স্বাধীনতা বিক্রয় করিল না। এই পার্ব্বত্য জাতি সকলের অভ্যন্তরে আজও সেই দুর্দ্দমনীয় স্বাধীনতা-স্পৃহা বর্ত্তমান। আজও তাহারা সুযোগ পাইলেই স্বাধীনতাপতাকা উড্ডীন করিয়া থাকে। সাঁওতাল-বিদ্রোহ ও রম্পা-বিদ্রোহ প্রভৃতি তাহার প্রমাণ। যে সকল অনার্য্য যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া অধীনতা স্বীকার করিল, আর্য্যেরা তাহাদিগকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন ও চতুর্থ বর্ণরূপে গ্রহণ করিলেন। বলা বাহুল্য যে, এই চতুর্থ বর্ণের

নাম শূদ্রবর্ণ। এইরূপে চতুর্ব্বর্ণের উৎপত্তি হইল। এতদিনে ভারতে শান্তি বিরাজিত হইল। আর্য্য অনার্য্যে যে নিরন্তর সংঘর্ষ চলিতেছিল, তাহা মিটিয়া গিয়া আভ্যন্তরীণ উন্নতির সূত্রপাত হইল। আবার নূতন করিয়া কার্য্যবিভাগ হইল। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের কার্য্য পূর্ব্বের ন্যায়ই রহিল। কিন্তু বৈশ্য ও শূদ্রের কার্য্যের পরিবর্ত্তন হইল। এতদিন বৈশ্যগণকে যুদ্ধের সময় সৈন্যের কার্য্য ও কমিসেরিয়েটের কার্য্য এবং শান্তির সময় কৃষিকার্য্য করিতে হইত; কিন্তু এক্ষণে তাঁহাদিগের স্কন্ধে সে ভার রাখার আর আবশ্যকতা রহিল না। অসংখ্য শূদ্র হিন্দু-সমাজভুক্ত হওয়ায়, তাহাদিগের উপর এই ভার ন্যস্ত করিয়া বৈশ্যরা এক্ষণে বাণিজ্য-ব্যবসায়ে প্রস্তুত হইলেন। আর্য্য-অনার্য্য-মিলনের পূর্ব্বে কমিসেরিয়েট বিভাগও বৈশ্যগণের হস্তে ছিল। সেই সময় হইতেই তাঁহারা ক্রয়-বিক্রয়ে পারদর্শী হইয়াছিলেন। কমিসেরিয়েট ও সৈনিক বিভাগ হাতে থাকিলে লোকে যেরূপ সহজে ধনশালী হয়, তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন। বৈশ্যেরা এক্ষণে সেই সঞ্চিত ধন বাণিজ্যে প্রয়োগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ক্রমে তাঁহারা বহির্বাণিজ্যে অসাধারণ পারদর্শিতা লাভ করিলেন। একদিন এমন গিয়াছে যে, বৈশ্যগণের বহির্বাণিজ্যপোত—রোম, ভিনিশ, মিশর, সিংহল, জাবা, চীন ও জাপান প্রভৃতির বন্দরে গমনাগমন করিত। এ দিকে শূদ্রজাতি কৃষিকার্য্যের উন্নতি ও পরিপুষ্টিতে রত রহিলেন। এই শান্তির সময়েই ব্রাহ্মণেরা আপনাদিগের অধিকার সমস্ত অনাক্রান্ত রাখিবার জন্য বেদের শাখা প্রশাখা করিতে লাগিলেন। বিবাদ মিটিয়া গেলে ব্রাহ্মণের আধিপত্য স্বতই কমিয়া আসিল। যখন সকলেই প্রাণভয়ে আকুলিত ছিলেন, যখন সৈন্যগণ বিশ্বাস করিতেন যে, ঋষিবৃন্দের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া দেবগণ রণস্থলে তাহাদিগের শরীরে আবির্ভূত হইতেন এবং সেই বিশ্বাসে উদ্দীপ্ত হইয়া তাহারা রণে অজেয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, সেই জীবনমৃত্যু-সংশয়কালে ঋক্-প্রণেতা ব্রহ্মর্ষিগণের বড় আদর ছিল। শুদ্ধ সৈন্যগণের কেন, আর্য্যজাতি-সাধারণের বিশ্বাস ছিল যে, দেবতারা সহায় না হইলে, যুদ্ধে জয়লাভ হয় না; এবং ব্রহ্মর্ষিগণের স্তোত্র ভিন্ন আর কিছুতেই দেবগণ সন্তুষ্ট হন না; সুতরাং যতদিন যুদ্ধ ছিল, ততদিন ব্রাহ্মণের আদরের আর সীমা ছিল না। এ বিশ্বাস ব্রাহ্মণেরা আপনারাও করিতেন। ব্রাহ্মণেরাও বিশ্বাস করিতেন যে, তাহাদিগের আরাধনায় দেবতারা তুষ্ট হইয়া অভীষ্ট সিদ্ধ করেন, তাহা তাঁহাদিগের স্তোত্রের একাগ্রতার দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণীকৃত হয়। এই একাগ্রতা ঋগ্‌বেদের অনেক স্তোত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়। দুই একটির ছবি আমরা দিতেছি:—

'হে বরুণ! তোমার সাহায্য বিনা আমি নয়নের পল্লব ফেলিতেও অক্ষম। আমি যদিও প্রতিদিন তোমার আদেশের বিপরীতাচরণ করিতেছি, তথাপি দেখিও, যেন আমায় মৃত্যুর হস্তে সমর্পণ করিও না। দেব! মৎপ্রদত্ত হবি গ্রহণ কর। আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর। এস, একবার দেখা দাও, এস, আবার অনেক দিনের বন্ধুর ন্যায় পরস্পর কথাবার্ত্তা কহি।'

আর একজন কবি স্তব করিলেন—

'হে বরুণ! আমার স্তব শ্রবণ কর, আমি তোমার সাহায্য ভিখারী হইয়া ডাকিতেছি, আমায় সাহায্য দেও: আমায় আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমি সুখী হই।'

'হে বরুণ! হে রাজরাজেশ্বর! হে স্বর্গ-মর্ত্ত্যের অধীশ্বর! দয়া করিয়া আমার প্রার্থনা শ্রবণ কর।' —ঋগ্‌বেদ ১।২৫।১৯।

একাগ্রতা ও দৃঢ়বিশ্বাসের ইহা অপেক্ষা অধিক পরিচয় আর কি দিব? কিন্তু ব্রাহ্মণগণের এ আধিপত্য চিরদিন অক্ষুণ্ণ রহিল না। যখন শত্রু দমিত হওয়ায় আর্য্যবর্ত্তে শান্তি বিরাজিত হইল, তখন ব্রাহ্মণগণের আধিপত্য ক্ষত্রিয়গণের অসহ্য হইয়া উঠিল। এ দিকে ব্রাহ্মণেরাও অত্যন্ত আদরে বঞ্চিত হইয়া ক্রোধানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের এই সময়কার স্তোত্র রাগদ্বেষাদিতে পরিপূর্ণ। দুই একটি স্তোত্রের ছবি দেখিলেই তাহা প্রতীত হইবে:—

'হে মরুদ্গণ! যাহারা আমাদিগকে উপহাস করে, যাহারা ব্রাহ্মণের দ্বেষ করে—তাহাদিগকে পুড়াইয়া মার।'

'হে সোমদেব! ব্রাহ্মণেরা এত দিন তোমাকে কি তাহাদিগের রক্ষক বলিয়া স্বীকার করে নাই? তাহারা কি বলে নাই যে, তুমি তাহাদিগকে শাপ হইতে রক্ষা করিয়াছ? তবে ব্রাহ্মণেরা যখন উপহসিত হইতেছে, তখন কেমন করিয়া তুমি উদাসীন রহিয়াছ? তোমার জ্বলন্ত বর্শা ব্রাহ্মণদ্বেষ্টার প্রতি নিক্ষেপ কর।'

'আগামিনী উষা আমাদিগকে রক্ষা করুক! সুদৃঢ় পর্ব্বত সকল আমাদিগকে রক্ষা করুক! সুদৃঢ়

পর্ব্বত সকল আমাদিগকে রক্ষা করুক ইত্যাদি।' ঋগবেদ ৬।৫২।

এই ব্রহ্মদ্বিট্ যে ক্ষত্রিয়—তাহার আর সন্দেহ নাই। কারণ, এই সময় বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্ম-বিষয়ে একাধিপত্যের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইয়াছেন। তিনি ঘোরতর তপস্যা দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহার ও তদ্বংশীয়গণের অনেকগুলি স্তোত্র ঋগবেদ-সংহিতায় সংগৃহীত হইয়াছে। ব্রাহ্মণেরা তাঁহার আধ্যাত্মিক উৎকর্ষে পরাস্ত হইয়া অগত্যা তাঁহাকে স্বদলভুক্ত করিয়া লইলেন। স্বদলে লইলেন বটে, কিন্তু পুরা লইলেন না। তাঁহাকে মহর্ষি উপাধি দিয়া ভুলাইলেন। স্পষ্ট ব্রাহ্মণ বলিলেন না। ব্রাহ্মণেরা আর একজন ক্ষত্রিয়ের আধ্যাত্মিক উন্নতিতে ভীত হইয়া তাঁহাকে রাজর্ষি উপাধি দিয়া ভুলাইলেন। এরূপ কথিত আছে যে, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যও বিদেহরাজ সুপ্রসিদ্ধ জনকের নিকট শাস্ত্রজ্ঞানে পরাস্ত হইয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণেরা জনকের নিকট পরাস্ত হইয়াও তাঁহাকে রাজর্ষিমাত্র উপাধি দিয়াছিলেন। আধ্যাত্মিক উন্নতিতে ক্ষত্রিয়েরা যে ব্রাহ্মণগণের সমকক্ষতা লাভ করিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মণেরা তাহার বাধা সম্পাদিত করিয়াছিলেন, তাহার অনেক প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে।

যাহাতে ক্ষত্রিয়গণের ব্রাহ্মণগণের প্রতি ভক্তির ভাব প্রবল হয়, যাহাতে তাঁহারা ব্রাহ্মণ-পূজাকে দেবাদিষ্ট বলিয়া বিশ্বাস করেন, সেই জন্য ব্রাহ্মণেরা ঋগবেদের স্তোত্রের মধ্যেও সেরূপ নীতি শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। বেদ আর্য্যজাতির সকলেই অপৌরুষেয় বাক্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, "সুতরাং বেদের আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করিলে নরকে যাইতে হইবে." এই ভয়ে ক্ষত্রিয়েরা ইহার বিরুদ্ধাচরণ হইতে নিবৃত্ত থাকিবেন—এই উদ্দেশ্যেই বোধ হয়, এরূপ স্তোত্রগুলি রচিত হয়। ঋগ্‌বেদের ৪।৫০।৮ স্তোত্র পাঠ করিলেই আমাদের কথা বুঝিতে পারিবেন। তাহার মর্ম্ম এই—

'যে রাজা পুরোহিতকে পুরোবর্ত্তী করিয়া চলেন, তিনিই স্বরাজ্যে ও স্বগৃহে সুপ্রতিষ্ঠাপিত থাকেন, তাঁহার রাজ্যে মেদিনী শস্যশালিনী হন, তাঁহার প্রজারা তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করে। যে রাজা শরণাগত ব্রাহ্মণকে ধনসম্পত্তি দিয়া রক্ষা করেন, তিনি অবাধে শত্রুমিত্রের ধনভাণ্ডার হস্তগত করিতে পারেন, ঈশ্বর তাঁহাকে সকল বিপদ্ হইতে রক্ষা করেন।'

ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়গণকে এইরূপে শুদ্ধ ভুলাইয়া ক্ষান্ত রহিলেন, এরূপ নহে, তাঁহাদিগের উন্নতিপথে অনেকগুলি কণ্টক রোপণ করিয়া রাখিলেন। বেদের স্তোত্রগুলির উচ্চারণের নিয়ম এরূপ সূক্ষ্ম করিলেন যে, যাঁহারা আশৈশব তাহার উচ্চারণ করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা ব্যতীত আর কেহ সহজে উচ্চারণ করিয়া উঠিতে পারে না। এ দিকে তাঁহারা লোকের মনে এরূপ সংস্কার জন্মাইয়া দিতে লাগিলেন যে, বেদের শব্দের বা বর্ণের উচ্চারণের ঈষৎ তারতম্য হইলেও দেবতারা রুষ্ট হন। সুতরাং কার্য্যতঃ আশৈশব বেদপাঠী ব্রাহ্মণ ব্যতীত উচ্চারণে আর কাহারও অধিকার থাকিল না। সুতরাং অগত্যা জনসাধারণের দেবতুষ্টি-বিধানের নিমিত্ত ব্রাহ্মণবর্ণের শরণাপন্ন হইতে হইত। লোকশিক্ষায়, রাজনকার্য্যে ও রাজোপদেশে ব্রাহ্মণের একাধিপত্য রহিয়া গেল। যুদ্ধ-যাত্রার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ-স্তব না করিলে, ইন্দ্রাদি দেবতা প্রসন্ন হন না, ইন্দ্রাদি দেবতা প্রসন্ন না হইলেও সৈন্যের মনে বিজয়াশা জন্মে না, সৈন্য আশা-প্রদীপ্ত না হইলেও বিজয়লক্ষ্মী রাজার অঙ্কশায়িনী হন না—সুতরাং রাজাকে ব্রাহ্মণ-চরণে লুণ্ঠিতশির ও ব্রাহ্মণের অনুগ্রহার্থী দেখিয়া প্রজারাও রাজগুরু ব্রাহ্মণের শরণাপন্ন হইত। রাজা প্রজা সকলেই ব্রহ্মশাপের ভয়ে অস্থির। ব্রাহ্মণকে যে কোন প্রকারে প্রসন্ন করিতে পারিলেই দেবতারা প্রসন্ন হইবেন—সকলেরই এই বিশ্বাস।

এ দিকে ব্রাহ্মণেরাও এই বিশ্বজনীন বিশ্বাসের সুবিধা লইতেও ত্রুটি করেন নাই। তিনি আপনাকে দেবোপাসক হইতে ক্রমে উচ্চতর পদ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে তিনি আপনাকে 'মনুষ্য-দেব' বলিয়া পরিচয় দিতে আরম্ভ করিলেন। বৈদিক যুগে শ্রাদ্ধ তত দূর গড়ায় নাই। 'ব্রাহ্মণ' যুগেই দেব-পূজক ব্রাহ্মণ স্বয়ং দেবমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়াছেন। শতপথব্রাহ্মণে (২য় অ।২।৬) লিখিত আছে যে, দুই শ্রেণীর দেবতা আছেন। প্রথমতঃ স্বর্গীয় দেবগণ, দ্বিতীয়তঃ মনুষ্য-দেবগণ। যাঁহারা সমগ্র বেদ পাঠ করিয়াছেন ও বেদের প্রকৃত উচ্চারণে সমর্থ, তাঁহারাই মনুষ্যরূপী দেবতা। এই দুই দেবতারই পূজা ব্যতীত মানবের মুক্তি নাই। ও দিকে ব্রাহ্মণেরা প্রথমে যে মাহাত্ম্য, নৈতিক উৎকর্ষ ও জ্বলন্ত বিশ্বাসে আর সকলকে মুগ্ধ করিয়া আপনাদিগের আধিপত্য স্থাপন

করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের ক্রমশঃ যে মাহাত্ম্য, নৈতিক উৎকর্ষ ও জলন্ত বিশ্বাসের অভাব ঘটিতে লাগিল, সুতরাং আপনাদিগের আধিপত্য-রক্ষার জন্য ব্রাহ্মণগণকে আধিদৈবিক উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছিল।

তাঁহাদিগের প্রাথমিক স্তোত্র-পরম্পরায় স্বার্থের প্রতিবিম্ব পতিত হয় নাই। তখন তাহারা একমাত্র বর্ণ বই আর কিছু জানিতেন না। তখন নিঃস্বার্থ স্বজাতিপ্রেম তাঁহাদিগের কার্য্যের একমাত্র নিয়ামক ছিল। সে সত্যযুগের কথা এখন ব্রাহ্মণ ভুলিয়া গিয়াছেন। ভাগবত পুরাণে স্পষ্ট উল্লিখিত আছে যে, 'সত্যযুগে একমাত্র বেদ, একমাত্র দেবতা, একমাত্র অগ্নি ও একমাত্র বর্ণ ছিল। ত্রেতাযুগে পুরারবার সময়েই তিন বেদ ও তিন বর্ণ হয়।' বৃহদারণ্যক উপনিষদেও এই বর্ণগত ভেদের উৎপত্তির বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ লিখিত আছে যে, সর্ব্বপ্রথমে একমাত্র 'ব্রহ্ম' ছিলেন। তাঁহা হইতেই দেবমানবের সৃষ্টি হইয়াছে। মানব-সৃষ্টির প্রথম সৃষ্টি ব্রাহ্মণ, দ্বিতীয় সৃষ্টি ক্ষত্রিয়, তৃতীয় সৃষ্টি বৈশ্য, চতুর্থ সৃষ্টি শূদ্র। (শূদ্রকে পৃথিবী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে; অর্থাৎ ধরিত্রী যেমন সর্ব্বভূতের ভর্ত্রী, সেইরূপ শূদ্র জাতি সকল বর্ণেরই আহারদাত্রী)। ব্রাহ্মণ সকল বর্ণের গুরু। যে পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণকে ঘৃণা করিবে, তাহাকে গুরুবধের পাতকী হইতে হইবে।"—এই সকল উক্তি দ্বারা স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, ব্রাহ্মণেরা এইকালে শাস্ত্রের ভয়-প্রদর্শন দ্বারা ভক্তি চিরস্থায়িনী করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। যদি গুণ থাকে ত ভক্তি আপনিই আসিবে—এ বিশ্বাসের উপর তাঁহারা নির্ভর করিয়া থাকিতে সাহস করেন নাই, ইংরাজেরা এখন ভুল করিতেছেন—বেয়নেটের ভয় দেখাইয়া ভক্তি আদায় করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহারাও সেই ভুল করিয়াছিলেন। প্রভেদ এই যে, ইংরাজেরা বেয়নেটের ভয় দেখাইতেছেন, ব্রাহ্মণেরা পরলোকের ভয় দেখাইয়াছিলেন। যখন পরলোকের ভয় দেখাইয়াও কুলাইল না, তখন চাপের ও শাপের ভয় দেখাইতেও পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। 'শাপেন চাপেন বা' শাপে হয় ভাল, নতুবা শত্রু-দমনের জন্য তাঁহারা চাপ গ্রহণ করিতেও কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। এই স্বধর্ম্মচ্যুতিরূপ পাপের প্রায়শ্চিত্ত তাঁহারা হাতে হাতে পাইয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণগণের এই একাধিপত্য-প্রিয়তার জন্য ক্ষত্রিয়গণের সহিত ঘোরতর শত্রুতা বাধিয়া উঠিল। ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণের এরূপ একাধিপত্য অস্বীকার করিলেন। অনেক রক্তারক্তির কথা ব্রাহ্মণ ও পুরাণাদিতে লিখিত আছে। আমরা এখানে দুই একটি মাত্রের উল্লেখ করিব।

ক্ষত্রিয়েরাই প্রথমে এই সংঘর্ষ উপস্থাপিত করেন। ভৃগুবংশীয়েরা কার্ত্তবীর্য্যের পুরোহিত ছিলেন। কার্ত্তবীর্য্য তাঁহাদিগকে অনেক অর্থ দিয়া যান। তাঁহাদিগের অধিকাংশই দানাদি দ্বারা সেই অর্থের সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন—কেহ কেহ তাহা বিল-মধ্যে লুক্কায়িত করিয়া রাখিয়াছিলেন। কার্ত্তবীর্য্যের মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ দুঃস্থ হইয়া পড়েন। তাঁহারা জানিতেন যে, ভৃগুবংশীয়গণের নিকট কার্ত্তবীর্য্য প্রদত্ত ধন আরও মজুত আছে। তাঁহারা ভৃগুবংশীয়গণের নিকট এই ধন চাহিলেন। না পাইয়া শেষে তাঁহাদিগের বাটীর মাটী খুঁড়িতে লাগিলেন। খুঁড়িতে খুঁড়িতে সেই গুপ্ত ধন বাহির হইয়া পড়িল। তখন তাঁহারা ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া ভৃগুবংশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা—অধিক কি, গর্ভস্থ শিশু-সন্তান পর্য্যন্ত মারিয়া ফেলিয়াছিলেন। কেবল দৈববলে দুই একটি রক্ষা পাইয়াছিল। পরশুরাম তাহার অন্যতম। পরশুরাম ভৃগুকুল-তিলক জমদগ্নির পুত্র। সেই বীরের হৃদয়ে আশৈশব দুর্দ্দমনীয় প্রতিহিংসাবৃত্তি উদ্দীপিত ছিল। যথাকালে তিনি পিতৃকুলের উচ্ছেদের প্রতিশোধ লইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহার ন্যায় বীর তৎকালে জন্মে নাই। তাঁহার প্রচণ্ড কুঠারের আঘাতে ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল হইতে লাগিল। শুনিলে হৃদয় শুষ্ক হইয়া যায় যে, তিনি একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া সামন্তপঞ্চকে পাঁচটি রৌধির হ্রদ প্রস্তুত করিয়া, সেই শত্রু-শোণিতে পিতৃলোকের তর্পণ করিয়াছিলেন।* পরশুরাম নিজে পরম যোগী ছিলেন। এ নরহত্যায়—স্বজাতিধ্বংসে—তাঁহার প্রতিহিংসাসাধন ভিন্ন অন্য কোন স্বার্থসাধনের ইচ্ছা ছিল না। তিনি এইরূপে ভারতভূমিকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া ও তাহাতে ব্রাহ্মণের আধিপত্য পুনঃস্থাপিত করিয়া কাশ্যপ মুনির হস্তে সমস্ত ভারতের সাম্রাজ্য অর্পণ পূর্ব্বক মহেন্দ্র-পর্ব্বতের উপত্যকাভূমিতে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

* মহাভারত বনপর্ব্ব ১১৬-১১৭ অধ্যায়, মহাবীর-চরিত ও রঘুবংশ প্রভৃতি দেখ।

জমদগ্নির মাতা সত্যবতী কান্যকুব্জাধিরাজ কুশিক-বংশোদ্ভব গাধির কন্যা। এই গাধির পুত্রেরই নাম প্রখ্যাতকীর্ত্তি বিশ্বামিত্র। সুতরাং পরশুরাম বিশ্বামিত্রের ভাগিনেয়-পুত্র। পরস্পর এত নিকটসম্বন্ধী হইয়াও দুই জন দুই প্রতিকূল দিকে ধাবিত হইয়াছিলেন। পরশুরাম ক্ষত্রিয়ের ধ্বংসে কৃতসঙ্কল্প বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণের একাধিপত্য-নাশে গৃহীতব্রত। ইক্ষ্বাকু-বংশীয় রাজা সুদেশের পৌরোহিত্য লইয়া বশিষ্ঠের সঙ্গে বিশ্বামিত্রের যে ঘোরতর সংগ্রাম হয়, তাহাতে অনেক কিংবদন্তী পুরাণাদিতে ব্যক্ত আছে। এখানে তাহার সবিস্তার বর্ণন অনাবশ্যক। এই সংঘর্ষের ফলে বিশ্বামিত্র মহর্ষি হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু ব্রহ্মর্ষিত্ব বা রাজ-পৌরোহিত্য প্রাপ্ত হয়েন নাই। সেইরূপ এই সংঘর্ষকালে কাশীশ্বর অজাতশত্রু যাঁহাকে কৌষীতকী ব্রাহ্মণে মহর্ষি গার্গ্য অপেক্ষাও অধিকতর বেদজ্ঞ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে ;—এবং বিদেহরাজ জনক—যাঁহাকে যাজ্ঞবল্ক্য শতপথব্রাহ্মণে আপনা অপেক্ষা অধিকতর পণ্ডিত বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন—রাজর্ষি উপাধিমাত্র পাইলেন, কিন্তু ব্রহ্মর্ষি উপাধি পাইলেন না। সুতরাং ব্রাহ্মণগণের সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা এক প্রকার অক্ষুণ্ণ রহিয়া গেল। বরং এই বিজয়ে সেই প্রভুত্ব অধিকতর সুদৃঢ় হইল।

এই সংঘর্ষের পূর্ব্বে বর্ণসংমিশ্রণের প্রতিকূলে কোন কঠোর নিয়ম বিধিবদ্ধ হয় নাই। কিন্তু এখন হইতে ব্রাহ্মণেরা শুদ্ধ স্বধর্ম্মাতিরেকের বিরুদ্ধে নিয়ম করিয়া ক্ষান্ত রহিলেন না ; চতুর্ব্বর্ণের পরস্পরের মধ্যে আদান ও অন্নগ্রহণাদি নিষিদ্ধ করিলেন এবং কঠোর সামাজিক দণ্ড দ্বারা এই পার্থক্য ভাব চিরস্থায়ী করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ক্ষত্রিয় সকল পরশুরামের কুঠারাঘাতে প্রায় নির্ম্মূল হইয়াছিল। সুতরাং ভারতের শক্তিসামঞ্জস্য নষ্ট হইয়াছিল। ব্রাহ্মণের দুর্দ্দমনীয় প্রভুশক্তিকে সংযমিত করিতে ক্ষত্রিয়কুল সম্পূর্ণরূপে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছিলেন।

কিন্তু এইরূপ অবস্থা বহুকাল থাকিতে পারে না। ব্রাহ্মণের অত্যাচার যখন একান্ত দুর্ব্বিষহ হইয়া উঠিল, তখনই কপিলবাস্তু নগরের অধীশ্বর শুদ্ধোদনের পুত্র ক্ষত্রিয়কুলতিলক শাক্যসিংহ বর্ণত্রয়ের কষ্টনিবারণার্থ কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন।

ব্রাহ্মণগণের একাধিপত্যপ্রিয়তাই ভারতে শাক্যসিংহপ্রচারিত বৌদ্ধধর্ম্মের আশুকৃতকার্য্যতার প্রধান কারণ। 'বুদ্ধ' শব্দের অর্থ জ্ঞানী ; অভেদবুদ্ধির ভাব সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার অন্তরে উদিত হইয়াছিল বলিয়া তিনি আদি বুদ্ধ বলিয়া প্রথিত। তিনি প্রচার করিতে লাগিলেন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সব সমান। চতুর্ব্বর্ণের নিকট তিনি এই সাম্যগান গাহিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বিশেষতঃ দীন-দুঃখী অবহেলিত ও পদদলিত শূদ্রজাতির নিকটই তিনি এই নব-ধর্ম্মের সবিশেষ প্রচার আরম্ভ করিলেন। এই গানের এমনই মোহিনী শক্তি যে, এ গান যখন যে দেশে যিনিই গাহিয়াছেন, তিনিই জগৎকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছেন। খৃষ্ট, চৈতন্য, গুরুগোবিন্দ, শাক্যসিংহ, মহম্মদ, শঙ্কর ও শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি সকলেই এই সাম্যধর্ম্মের প্রচারক। প্রত্যেকেই এই নূতন গানে জগৎকে মাতাইয়া গিয়াছেন। প্রত্যেকেরই ছবি আজও জগতের কোন কোন স্থানে প্রতিবিম্বিত রহিয়াছে। বৈষম্য-দগ্ধ জগতের আজও তাহা একমাত্র আশাস্থল।

ব্রাহ্মণ ও বেদের বিরুদ্ধেই শাক্যসিংহের অভ্যুত্থান। বৈষম্যের আকর ব্রাহ্মণজাতি, এবং বেদ তাঁহাদিগের আধিপত্য-সংরক্ষণের প্রধান দুর্গস্বরূপ ; সুতরাং এ দুই উড়াইয়া দিতে তিনি কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি এই সুমহৎ ব্রত উদ্‌যাপনার্থ জন্য রাজ-সিংহাসন, প্রাণময়ী ভার্য্যা, প্রাণাধিক পুত্র, স্নেহময় জনক-জননী সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া অতি কঠোর সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিলেন। নিজে আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া তিনি জগৎকে আত্মত্যাগ শিখাইলেন। বৈষম্যপূর্ণ ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম প্রত্যেককে যে কঠোর সামাজিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, এই নব ধর্ম্ম তাহা খুলিয়া দিল। নবীন উৎসাহে ভারত মাতিয়া উঠিল। সম্রাট্ হইতে কুটীরী পর্য্যন্ত সকলেই এই নব-ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল। বুদ্ধ শুদ্ধ পুরুষজাতির পায়ের বন্ধন খুলিয়া দিয়া পরিতৃপ্ত হন নাই। তিনি স্ত্রীজাতিকেও সকল বিষয়ে পুরুষের সমান অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের জয়পতাকা লইয়া বৌদ্ধ-প্রচারকগণ ভারত আলোড়িত করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের প্রচারকার্য্য ভারতের সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ রহিল না। দেশ-দেশান্তরে ও দ্বীপ-দ্বীপান্তরে তাহা প্রসৃত হইয়া পড়িতে লাগিল। আজ দুই একটি 'মুক্তিফৌজ দেখিয়া ভারতবাসী অবাক্ হইতেছে, কিন্তু কত বৌদ্ধ মুক্তি-

ফৌজ যে জগৎকে বিমুগ্ধ করিয়া বেড়াইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। সেই মোহমন্ত্র আজও মানব-জাতির তৃতীয়াংশকে বিমোহিত করিয়া রাখিয়াছে। আজও যেখানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল, সেইখানেই জাতীয় ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বর্ত্তমান। চীন, জাপান প্রভৃতি তাহার নিদর্শন। ভারতে যে ছয় সাত শত বৎসর এই ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, সেই ছয় সাত শত বৎসরই ভারতীয় ইতিহাসের উজ্জ্বলতম কাল। ভারতের বাণিজ্য-পোত, ভারতের রণতরী, ভারতের মুক্তিফৌজ এই সময়ই জগৎ আলোড়িত করিয়া বেড়াইয়াছিল। এই সময়েই শিল্পের চরমা কাষ্ঠা হইয়াছিল। এই সময়েই বিদ্যার বিমল জ্যোতি সর্ব্বশ্রেণীতে এবং স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতিতে সমভাবে বিকীরিত হইয়া পড়িয়াছিল। অনেক বৌদ্ধ গ্রন্থকার গ্রন্থকর্ত্রী শূদ্রজাতি হইতে উৎপন্ন। বৌদ্ধ প্রভাবে ভারতের এরূপ অভ্যুদয় হইয়াছিল যে, গ্রীক নরপতিগণ ভারতীয় নরপতিগণের নিকট সন্ধিপ্রার্থী হইয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবকালেই ভারত সিংহল জয় করিয়াছিল এবং অজেয় সেকেন্দর সাহার গতিরোধ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু এই সৌভাগ্য ভারতের দুরদৃষ্টবশতঃ চিরস্থায়ী হইল না।

এই সাম্যতন্ত্ররূপ প্রকাণ্ড বিপ্লব ছয় সাত শত বৎসরমাত্র ভারতে রাজত্ব করিয়া ব্রাহ্মণের বুদ্ধির নিকটই পরাজয় স্বীকার করিল। সকলেই বোধ হয় জানেন যে, প্রসিদ্ধনামা শঙ্করাচার্য্যই অলৌকিক প্রতিভাবলে আর্য্য সাম্য-বায়ব্যাস্ত্রে সাম্য-বৌদ্ধধর্ম্ম-বরুণাস্ত্র উড়াইয়া দিলেন। "বিষস্য বিষমৌষধম্" বিষ দ্বারায় বিষ নষ্ট করার ন্যায় এক প্রকার সাম্যপ্রচার দ্বারা অন্য প্রকার সাম্য বিলুপ্ত করিলেন। বুদ্ধ গাইয়াছিলেন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সকলেই সমান। শঙ্করাচার্য্য গাইলেন—"ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্" এক ব্রহ্মই সত্তা; অপর সমস্তই সত্তাভাস, প্রকৃত সত্তা নহে; জড়, অজড়, সমস্তই এক ব্রহ্মময়। এই যে প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎ দেখিতেছ—এ সেই ব্রহ্ম বই আর কিছুই নয়। প্রকৃতি ভ্রমমাত্র, পুরুষই একমাত্র সত্তা;—অর্থাৎ যাহাকে তোমরা প্রকৃতি বলিতেছ, তাহা প্রকৃতি নহে—পুরুষ বা ব্রহ্ম—প্রকৃতি-পুরুষ-ভেদস্থান অজ্ঞানের কার্য্য। এই মহা অস্ত্রের নিকট বৌদ্ধ অস্ত্র পরাস্ত হইল। যখন সবই এক—তখন জড়, অজড়, সবই ব্রহ্ম বই আর কিছুই নহে—তখন ব্রাহ্মণ ও শূদ্রে, সভ্য ও অসভ্যে, দীন ও দরিদ্রে, স্ত্রী ও পুরুষে কেন ভেদ থাকিবে? হঠাৎ যেন ভারতের মোহনিদ্রাভঙ্গ হইল! ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম যেন আপনার ভুল বুঝিতে পারিয়া চিরলালিত বৈষম্য ভুলিয়া গেল। এই অদ্বৈতবাদগহ্বরে বৌদ্ধ সাম্যবাদ বিলীন হইয়া গেল। বৈষম্যজনিত বিবাদ যেন কোথায় চলিয়া গেল। শূদ্র, যবন, পার্ব্বত্য, বৌদ্ধ সমস্ত সাম্প্রদায়িক নদ-নদী যেন এক প্রকাণ্ড অদ্বৈতবাদ-মহাসাগরে আসিয়া মিশিয়া গেল। সবই এক—সুতরাং সবই সমান—এই মহামন্ত্র ভারতের সর্ব্বত্র উদ্ঘোষিত হইতে লাগিল। যে ভারতভূমি এতদিন হিন্দু-বৌদ্ধ-সংঘর্ষে রুধির-কর্দ্দমিত হইতেছিল, আজ তাহাতে যেন শান্তিবারি পতিত হইল!

ধন্য শঙ্করাচার্য্য! ধন্য তোমার বিশ্বপ্রেম! ধন্য তোমার বুদ্ধিবল! তুমি আশৈশব ভারতের মঙ্গল-কামনায় দীক্ষিত ছিলে বলিয়া এরূপ অসাধ্যসাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলে। তুমি চণ্ডালের মন্ত্রশিষ্য হইতে কুণ্ঠিত হও নাই বলিয়াই ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল এক করিতে পারিয়াছিলে। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম এরূপ মাহাত্ম্য আর কখন দেখাইতে পারে নাই। এ মাহাত্ম্যের এক কণা-মাত্র আজ ব্রাহ্মণগণে থাকিলে, ভারতের সৌভাগ্যরবি আবার উদিত হইত। এই আত্মধ্বংসকারী আর্য্য-ভূমিতে তোমার মত নেতার আবার প্রয়োজন। দেব! তুমি যে অসাধ্যসাধন করিয়া গিয়াছিলে, তোমার মত লোক ভিন্ন সে অসাধ্যসাধন আবার করে কে? দেব! আসিয়া দেখ যে, ভারতে তোমার কীর্ত্তি লুপ্তপ্রায়। আবার ভারতবক্ষ ধর্ম্ম-সাম্প্রদায়িকতায় ছিন্ন-ভিন্ন। হিন্দুধর্ম্ম আবার ত্বদঙ্কিত সেই বিশাল বৃত্ত হইতে সঙ্কুচিত হইয়া সঙ্কীর্ণতর বৃত্তান্তরে আসিয়া পড়িয়াছে। তুমি এক দিন হিন্দুধর্ম্মে যে ঔদার্য্য সংক্রামিত করিয়াছিলে, যে ঔদার্য্যগুণে একদিন হিন্দুধর্ম্ম সমস্ত ভারত-বাসীকে অন্তর্লীন করিয়া মানবমণ্ডলীকে কুক্ষিগত করিতে সমুদ্যত হইয়াছিল—আসিয়া দেখ দেব! সে হিন্দুধর্ম্ম এখন কি অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে! কতিপয় সঙ্কীর্ণমনা ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের অনৌদার্য্যে ইহা ক্রমে সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতর সীমায় আবদ্ধ হইতেছে! তুমি ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মকে যে পরিমাণে তুলিয়াছিলে, প্রতিক্রিয়ার বেগে ইহা সেই পরিমাণে নামিয়া পড়িয়াছে! সেই বর্ণভেদ, সেই জাতিভেদ, সেই স্ত্রী-পুরুষ-বৈষম্য আবার পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান। যায়—সব যায়—সোনার ভারত অন্তর্বিচ্ছেদে ছারখার হয়! দেব! একবার

আবির্ভূত হইয়া এই বিষম বিপত্তিকালে তোমার হৃদয়ের ধন ভারতকে উদ্ধার কর। আবার নতজানু হইয়া চণ্ডালের নিকট মন্ত্র গ্রহণ কর। আবার ভারতে বিশ্বব্যাপী সাম্যের - বিশ্বজনীন একত্বের ভেরী বাজাও। খ্রীষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, য়িহুদী, ব্রাহ্ম, পারসীক—ভারতীয় ধর্ম্ম-সম্প্রদায়কে আবার বিশ্বপ্রেমবলে হিন্দুধর্ম্মের কুক্ষিগত কর! দেব! তাহা না হইলে—আবার বলি—সব রসাতলে যায়!

ব্রাহ্মণ! তুমিই ভারতকে অষ্টপৃষ্ঠে লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়াছিলে, তুমিই আবার শঙ্করাচার্য্যরূপে সেই শৃঙ্খল খুলিয়া দিয়াছিলে, আবার শৃঙ্খল পরাইয়াছ,—আবার শঙ্করমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া সেই শৃঙ্খল খোল! তাহা হইলেই তোমার গুরুতর পাপের গুরুতর প্রায়শ্চিত্ত হইবে! শঙ্করাচার্য্য অসংখ্য ভাঙ্গা দল যোড়া দিয়াছিলেন—ছিন্ন-ভিন্ন বিশীর্ণ ভারতকে এক করিয়াছিলেন; সকলকে পায় ধরিয়া ডাকিয়া এক ধর্ম্ম-মন্দিরের ভিতরে আনিয়াছিলেন। সে সময় শঙ্করাচার্য্য ভারতক্ষেত্রে প্রাদুর্ভূত না হইলে, বোধ হয়, এত দিন জগতে হিন্দুধর্ম্মের নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইত। সেই ধর্ম্মবীরের মাহাত্ম্যেই হিন্দুধর্ম্ম নবীন তেজে উঠিয়া কিছুকাল ভারতে সমস্ত সাম্প্রদায়িকতা বিলুপ্ত করে, ভারতের স্তরে স্তরে আবার হিন্দুধর্ম্মের বীজ নিহিত হয়। কিছুকাল ধরিয়া হিন্দুধর্ম্ম শঙ্কর-মাহাত্ম্যে ভারতে অপ্রতিদ্বন্দ্বিনী প্রভুতা ভোগ করিয়াছিল। অদ্বৈতবাদময় সাম্যের ভেরী বহুদিন ধরিয়া ভারতের পর্ব্বতে পর্ব্বতে, গুহায় গুহায়, ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে উদ্ঘোষিত হইয়াছিল। কিন্তু কি পাপে জানি না—ইতিহাস আমাদিগের সে বিষয়ে সহায়তা করে না—আবার বৈষম্যের ভাব সমস্ত ভারতকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। ব্রাহ্মণ নিজের আধিপত্য-রক্ষার জন্য আবার বর্ণ-বৈষম্যরূপ লূতাতন্তুজালে ভারতকে আচ্ছন্ন করিয়াছেন! কৌলীন্যরূপ উপসর্গ আসিয়া আবার বর্ণ-বৈষম্যরূপ রোগের সহিত যোগ দিয়াছে।

ব্রাহ্মণেতর বর্ণকে ও স্ত্রীজাতিকে জ্ঞানভাণ্ডারে প্রবেশ করিতে না দেওয়ার ফল হিন্দুধর্ম্মে সাধারণের এই সহানুভূতি-বিরহ। বলা বাহুল্য যে, হিন্দুধর্ম্মে ও হিন্দু রাজত্বে সাধারণের এই সহানুভূতি-বিরহই ভারতের জাতীয় পতনের মূল। পাণিপথ-সমরক্ষেত্রে যে অগণিত হিন্দুসেনা সমবেত হইয়াছিল, যদি ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের প্রতি ও ব্রাহ্মণ্য-রাজত্বের প্রতি তাহাদিগের অবিচলিত ভক্তি থাকিত, তাহা হইলে সে অজেয় সেনাকে পরাস্ত করিতে কাহার সাধ্য হইত? জনসাধারণ যদি না জানিত যে, "রামে মারিলেও মারিবে, রাবণে মারিলেও মারিবে!"—তাহা হইলে আজ বহু কোটি লোক মন্ত্রৌষধি-রুদ্ধ-বীর্য্য সর্পের ন্যায় পড়িয়া থাকিত না। বহু কোটি হিন্দু থাকিতে ভারত কখন অনন্তকাল ঘুমাইয়া থাকিত না।

যতদিন না ভারত আবার এক জাতীয় ধর্ম্মের মূলে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে, যতদিন না আবার ভারতে সাম্যভেরী বাজিতেছে, ততদিন ভারতে জাতীয় জীবনের আশা নাই। সে একীকরণ অদ্বৈতবাদে কি দ্বৈতবাদে, হিন্দুধর্ম্মে কি ব্রাহ্মধর্ম্মে হইবে, জানি না। তবে বুদ্ধজেতা শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় নেতার যে প্রয়োজন হইয়াছে, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। সেই বিশাল হৃদয়, সেই বিশ্বপ্রেম ব্যতীত যে ভারতে ধর্ম্ম-সমীকরণ অসাধ্য, তদ্বিষয়ে আর মতদ্বৈধ নাই। অতি-বিশাল ও গভীর বৌদ্ধধর্ম্মকেও যে উদার হিন্দুধর্ম্ম একদিন কুক্ষিগত করিতে পারিয়াছিল, সে উদার হিন্দুধর্ম্ম যে ভারতের বিবিধ ধর্ম্মসম্প্রদায়কে আবার অন্তর্লীন করিতে পারিবে না—কেমনে বলিব? উপকরণসামগ্রী সমস্তই হিন্দুধর্ম্মের অভ্যন্তরে নিহিত রহিয়াছে। তাহার মধ্য হইতে কালের উপযোগী দ্রব্য সকল বাছিয়া লইয়া একাগ্রচিত্তে শবসাধনা করিলেই সাধক সিদ্ধি লাভ করিবেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম যদি খৃষ্টানধর্ম্মের দিকে বেশী না গড়াইত, তাহা হইলে ব্রাহ্মধর্ম্ম-সম্প্রদায় এই সাধনায় সিদ্ধ হইতেন। কিন্তু তাঁহারা এক্ষণে দিন দিন হিন্দু-জাতির সহিত সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ হইয়া পড়িতেছেন। এই জন্য হিন্দুজাতির উপর আর কর্ত্তৃত্ব করিতে পারিবেন কি না সন্দেহস্থলে দাঁড়াইয়াছে।

ব্রাহ্মণ! তুমি এই সাধনায় প্রবৃত্ত শঙ্করাচার্য্যের উদার নীতির অনুবর্ত্তী হইয়া আর্য্য নামের গৌরব পুনরুদ্ধার কর। বৈষম্যময় ধর্ম্ম প্রচার করিয়া ভারতের যে অনিষ্ট করিয়াছ, আবার সাম্য-সুধাময় গান গাইয়া সেই গুরুতর পাপের গুরুতর প্রায়শ্চিত্ত কর! আবার ভারতে নব-জীবন সঞ্চারিত হউক! ! মিলিত ভারত—ঘনীভূত ভারত—আবার জগতের আরাধ্য হউক! কে বলিতে পারে, সে দিন আর আসিবে না?

—

ভারতের জাতীয় ভাষা

আমরা অনেকবার লিখিয়াছি ও এখনও স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছি যে, জাতীয় শিক্ষা ব্যতিরেকে জাতীয় উন্নতি হইতে পারে না। জাতীয় শিক্ষা দ্বারা আমরা এই ভাব ব্যক্ত করিয়াছি। ইতিহাস আজ পর্য্যন্ত এমন দৃষ্টান্ত দেখায় নাই, যেখানে বৈদেশিক ভাষা দ্বারা একটি জাতি সংগঠিত হইয়াছে। বৈদেশিক ভাষায় বুৎপত্তি লাভ করিয়া দুই চারিজন পণ্ডিত হইতে পারেন, কিন্তু একটি সমগ্র জাতি কখন বৈদেশিক ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া পাণ্ডিত্য লাভ করিতে পারে না। সমস্ত ইউরোপ গ্রীক ও লাটিন ভাষা হইতে অনন্ত উন্নতিলাভ করিয়াছেন, কিন্তু ইউরোপের জনসাধারণ কখনই রোমীয় বা গ্রীসীয় ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করে নাই। ইউরোপের প্রত্যেক দেশের উন্নতি নিজ নিজ মাতৃভাষার আলোচনায় হইয়াছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলী নিজ নিজ মাতৃভাষাকে রোমীয় ও গ্রীসীয় ভাষা-ভাণ্ডার হইতে রত্নরাজি লইয়া অলঙ্কারে ভূষিত করিয়াছেন; কিন্তু কখন রোমীয় বা গ্রীসীয় ভাষাকে জাতীয় ভাষারূপে পরিণত করিতে চেষ্টা করেন নাই। অথচ রোমীয় ও গ্রীসীয় ভাষার সহিত সমস্ত ইউরোপীয় ভাষার মূলগত ঐক্য আছে। সংস্কৃতের সহিত ভারতীয় ভাষানিচয়ের যে সম্বন্ধ, রোমীয় ও গ্রীসীয় ভাষার সঙ্গেও ইউরোপীয় ভাষাসমূহের সেই সম্বন্ধ। আমরা যেমন সংস্কৃতকে ভারতের চলিত ভাষা করিতে চেষ্টা করি না, সেইরূপ ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলীও রোমীয় ও গ্রীসীয় ভাষাকে ইউরোপের চলিত ভাষা করিতে চেষ্টা করেন নাই। যে ভাষার সঙ্গে মৌলিক একতা আছে, সে ভাষা যখন আমরা আমাদের চলিত ভাষা করিতে চেষ্টা করি না, তখন মূলগত-সাদৃশ্য-বিরহিত ভাষাকে জাতীয় চলিত ভাষা করিতে চেষ্টা করা অপেক্ষা অধিকতর বিড়ম্বনা আর নাই। যাঁহারা এরূপ করেন, তাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে জাতীয় উন্নতির প্রধান অন্তরায়। আমরা দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, আমাদের সুশিক্ষিত সম্প্রদায় বৈদেশিক ভাষায় স্বপ্ন পর্য্যন্ত দেখিয়া থাকেন। তাঁহারা কথোপকথনে, পত্রলেখনে ও বক্তৃতায় ভুলিয়াও মাতৃভাষা ব্যবহার করেন না। তাঁহারা বলেন, বঙ্গভাষা অপুষ্ট, সুতরাং তাহাতে সমস্ত ভাব ব্যক্ত করা যায় না, বিশেষতঃ ভারতবাসী সকলে বাঙ্গালা ভাষা বুঝে না, সুতরাং অগত্যা ইংরাজী ব্যবহার করিতে হয়। বাঙ্গালা ভাষা অপুষ্ট, ইহা স্বীকার্য্য, কিন্তু তাই বলিয়া ইহাতে ভাবব্যঞ্জনে বিরত থাকিলে কোন কালেই ইহার পরিপুষ্টি হইবে না। কারণ, অভাবের মোচন না হইলে, চিরকালই সে অভাব থাকিয়া যাইবে। কোন স্থানে ভাষার অভাব আছে— সে ভাষায় কথোপকথন, সে ভাষায় চিঠি-পত্র লিখন ও সে ভাষায় হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটন না করিলে তাহা কখনই উপলব্ধি হইবে না। প্রকৃতির স্রোত বন্ধ না করিলে, জাতীয় উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় ভাষা আপনিই উন্নত হইতে থাকিবে। অন্তরে ভাবাতুবাদি রহিলে সেই ভাবোচ্ছ্বাসের অনুরূপ ভাষা আপনা হইতেই বাহির হইবে। নিষাদকে ক্রৌঞ্চমিথুনের অন্যতরকে বধ করিতে দেখিয়া বাল্মীকির হৃদয়ে কারুণ্য রসের আবির্ভাব হয়।

> "মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
> যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্ ॥"

এই শ্লোক তাহার প্রতিবিম্ব মাত্র। এই উচ্ছ্বাসময় ছন্দোবন্ধন সংস্কৃত ভাষার প্রথম শ্লোক। হৃদগতভাবের প্রতিবিম্ব ভাষারূপ দর্পণে প্রতিফলিত হইবেই হইবে। মুখ ও দর্পণের মধ্যে কোন ব্যবধান থাকিলে যেমন দর্পণে মুখের ছবি প্রতিবিম্বিত হয় না, সেইরূপ হৃদগতভাব ও জাতীয় ভাষার মধ্যে কোন প্রতিবিম্বিত হয় না। ইংরাজী ভাষা আমাদের দেশে সেই ব্যবধানের কার্য্য করিতেছে। এই মৃন্ময় দেউলে আমাদের হৃদগতভাবে পতিত হইয়া প্রতিহত হয়, তাহাতে প্রতিবিম্বিত হয় না।

> "প্রভবতি শুচির্বিম্বোদ্গ্রাহে মণির্ন মৃদাং চয়ঃ"

দর্পণই বিম্বোদ্গ্রহে সমর্থ মৃৎপিণ্ডবিম্বগ্রহণে সমর্থ নহে। রূপক পরিত্যাগ করিয়া সহজ কথায় বলি। ভাবস্ফূর্ত্তির সহিত ভাষাস্ফূর্ত্তি আপনিই হইয়া থাকে। ভাষা ভাবব্যক্তির সঙ্কেতমাত্র। ভাবের আবির্ভাব হইলে সঙ্কেতের অভাব হয় না। নূতন ভাব হৃদয়ে আবির্ভূত হইলে, উদ্বোধক নূতন সঙ্কেতের অবতারণায় কোন বাধা নাই। যদি সেই সঙ্কেত জাতিসাধারণ গ্রহণ করিলেন, তাহা হইলে তাহা জাতীয়

ভাষার অঙ্গীভূত হইল। যদি কেহ সেই সঙ্কেতের পরিবর্ত্তে আরও ভাল সঙ্কেত ব্যবহার করেন, তাহা হইলে প্রথমটি পরিত্যক্ত হইয়া তৎপরিবর্ত্তে দ্বিতীয়টি ব্যবহৃত হইবে। যদি দুইটিই ভাল সঙ্কেত হয়, তাহা হইলে হয় ত দুইটিই পরস্পরের প্রতিবাক্যরূপে ব্যবহৃত হইবে। দুই কিংবা ততোধিক সঙ্কেতও পরস্পরের প্রতিবাক্য হইতে পারে। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাই। একটি অশ্বাকৃতিবিশিষ্ট জন্তুকে দেখিয়া আমি বলিলাম, এই অশ্ব। আর একজন অন্য সময় বলিল, এই ঘোটক। তৃতীয় ব্যক্তি আর এক সময় বলিল, এই হয়। তিন ব্যক্তির শব্দই জাতি গ্রহণ করিল। সেই অবধি অশ্ব, ঘোটক, হয়, পরস্পরের প্রতিবাক্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। সংস্কৃত ভাষায় যে অসংখ্য প্রতিরূপ শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার এইরূপে সৃষ্টি হইয়াছে। সাঙ্কেতিক শব্দে যেরূপ দেখাইলাম, যৌগিক শব্দেও সেইরূপ। যিনি যে ভাব বা পদার্থ বুঝাইবার জন্য যে সঙ্কেত ব্যবহার করিয়াছেন, ভারতীয় আর্য্যেরা যত্নপূর্ব্বক তাহাকে ভাষায় স্থান দিয়াছেন, এই জন্যই সংস্কৃত ভাষা এত পরিপুষ্ট, এত সুমধুর ও এত বৈচিত্র্যপূর্ণ। এরূপ অল্পভাব আছে ও এরূপ অল্প পদার্থ আছে, যাহা সংস্কৃত ভাষার আশ্রয় লইয়া ব্যক্ত করা যায় না। বঙ্গভাষা সেই সংস্কৃত ভাষারূপ অপূর্ব্ব অলঙ্কারের মধ্যমণি। ইংরাজী ভাষায় এমন অল্পভাব প্রতিবিম্বিত আছে, যাহা সংস্কৃতের আশ্রয়ে বাঙ্গালা ভাষায় প্রতিবিম্বিত করা যাইতে না পারে। হয় ত আজ সেই নব শব্দের অনুরূপ ভাব জাতিসাধারণের মনে উদ্ভূত হইবে না। কিন্তু যখন সে ভাবোদয় হইবে, তখন সে ভাবের অনুরূপ সঙ্কেত ভাষায় রহিয়াছে দেখিয়া জাতীয় হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে থাকিবে। যাহারা সময়ের কিঞ্চিৎ অগ্রে আসিয়াছেন, তাঁহাদিগের জীবদ্দশায় হয় ত তাঁহারা প্রত্যাখ্যাত হইবেন। কিন্তু কাল আসিবেই, যখন তাঁহাদিগের হৃদয়-ভাব-দ্যোতক ভাষা জাতিসাধারণ আদর করিয়া লইবে।

কিন্তু তুমি যদি সে পরিশ্রম স্বীকার না করিয়া তোমার হৃদয়ের ভাব পরপ্রাপ্ত বৈদেশিক সঙ্কেত দ্বারা ব্যক্ত করিয়া চাললে, তাহা হইলে তোমার হৃদয়ের ছবি তোমার জাতিতে রাখিয়া গেলে না। বৈদেশিকেরা তোমার হৃদয়ের চিত্র কখন সাদরে বক্ষে ধারণ করিবে না। সুতরাং সে ছবি অচিরে কাল-সাগরে বিলীন হইবে। কিন্তু তুমি যদি একটি নূতন ভাব নূতন সঙ্কেত দ্বারা তোমার জাতীয় ভাষায় ব্যক্ত করিয়া যাও, তোমার জাতি মৃত বন্ধুর স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ তাহা অনন্তকাল বক্ষে ধারণ করিবে।

তবে কেন ভাই এ বিড়ম্বনা? কেন দুই জনে একত্র হইলে জাতীয় সঙ্কেতে উভয়ের মনের দ্বার উভয়ের নিকট উদ্ঘাটন কর না? কেন ভাবব্যক্তির অপটুতা লুকাইবার জন্য বৈদেশিক ভাষায় কথা কহিয়া বা লিখিয়া পরস্পর পরস্পরকে ঠকাইবার চেষ্টা কর? কেন কাকাতুয়ার মত পরের বুলি মুখস্থ করিয়া আওড়াইয়া পরস্পরকে ঠকাইবার চেষ্টা কর?

এ জীবন-মরণ সংগ্রামের সময়। পরস্পরকে ঠকাইবার সময় নহে, এ দুর্দ্দিনে পরস্পরের অভাব পরস্পরকে জানাইয়া পরস্পরের সাহায্যে সে অভাব মোচন করিয়া লইতে হইবে। জাতীয় দুর্গের যেখানে যে ভাঙ্গা আছে, পরস্পর পড়িয়া তাহা সারিয়া লইতে হইবে। পত্রাবরণে সে ভগ্ন স্থান লুকাইলে চলিবে না। ভাষার অভাব থাকে, পূরণ করিয়া লও। ভাবের অভাব থাকে ত ভাবিতে আরম্ভ কর। বলের অভাব থাকে ত বলোপচয় কর। পরের বলে, পরের ভাব ও পরের ভাষায় মুগ্ধ হইয়া আপনার জাতীয় ভবিষ্যৎ নষ্ট করিও না।

আর যাঁহারা সুনিপুণভাবে বাঙ্গালা ভাষার গতি নিরীক্ষণ করিবেন, তাঁহারা স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন যে, বাঙ্গালা ভাষার ভবিষ্যৎ অতি উজ্জ্বল। ভারতবর্ষের এমন স্থান নাই, যেখানে বাঙ্গালীর সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা ভাষাও তথায় যায় নাই। যেন ভাবষ্য ভারতীয় ভাষার যোগ্য হইবার জন্য বাঙ্গালা ভাষা ধীরে ধীরে স্ফীতাবয়ব হইতেছে। সংস্কৃতের পর প্রাকৃত, প্রাকৃতের পর পালী, পালীর পর মাগধী, মাগধীর পর মৈথিলী, মৈথিলীর পর বাঙ্গালা; সংস্কৃত ভাষা ক্রমিক আবর্ত্তনে এই বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। হিমালয় হইতে যেন গঙ্গা বাহির হইয়া নানা তীর্থ পর্য্যটন পূর্ব্বক সাগরে আসিয়া মিলিত হইয়াছেন, এক দিকে অত্যুঙ্গ গগনস্পর্শী হিমাচল—অন্য দিকে অনন্ত ও অসীম সাগর। সেইরূপ এক দিকে উত্তুঙ্গ সংস্কৃত—অন্য দিকে অনন্ত উন্নতিসহ বাঙ্গালা। কারণের অনুরূপ কার্য্য।

সেই অনন্ত উন্নতিসহ জাতীয় ভাষাকে পদদলিত ও অবহেলিত করিয়া যাহারা পরভাষাকে মস্তকে লইয়া আপনাদের পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেয়, তাহাদিগকে আমি

'জাত দাস' ভিন্ন অন্য লঘুতর বাক্যে অভিহিত করিতে পারি না।

আমরা ইতিহাস হইতে দুই একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া দেখাইব যে, ভাষাবৈষম্য বিদূরিত হওয়া পর্য্যন্ত সেই সেই দেশে জাতীয় একতা সম্পন্ন হয় নাই। ব্রিটনে প্রথমে অনেকগুলি ভাষা ছিল। সে সময় বিভিন্ন ভাষা-কথন-শীল জাতি-নিচয়ের মধ্যে ঘোর বৈরভাব ছিল। ব্রিটনের প্রধান অঙ্গ ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড, ওয়েলস ও আয়রলণ্ডে ত চারিটি স্বতন্ত্র ভাষা ছিলই, তদ্ভিন্নও ভাষাগত অনেক অবান্তরভেদ ছিল। বৈদেশিকের পদার্পণের পূর্ব্বে ব্রিটন্ জাতির একটি ভাষা ছিল। তাহার পর রোমানেরা আসিয়া সমস্ত আদালতে লাটিন্ ভাষা প্রচলিত করিলেন। রোমানদিগের পর সাক্‌সনেরা আসিয়া সাক্‌সন ভাষা আদালত ও বিদ্যালয়সমূহে প্রচলিত করিলেন। তাহার পর নর্ম্মানেরা আসিলেন—আসিয়া তাঁহারাও সমস্ত আদালতে ও বিদ্যালয়ে নর্ম্মান্ ভাষা প্রচলিত করিলেন। যতদিন এই ভাষাগত পার্থক্য ছিল, ততদিন এই সকল ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে গাঢ়তর বিদ্বেষভাব বর্ত্তমান ছিল। তখন ব্রিটনকে কে চিনিত? পরস্পরের বল পরস্পরের উপর ক্ষয়িত করিয়া ব্রিটন জাতি তখন জাতিগণনায় নগণ্য ছিলেন। ক্রমে তাঁহারা নিজ নিজ ভুল বুঝিয়া এই সর্ব্বনাশের মূলীভূত কারণ ভাষাবৈষম্য পরিহার করিতে লাগিলেন। টিউডার রাজবংশের সময় ভাষাবৈষম্য অপনীত হইতে আরম্ভ হয়—তাই অষ্টম হেনরী ও এলিজাবেথের সময় এত বড় বড় গ্রন্থকারের আবির্ভাব হইয়াছিল। মিলনে বলের মধুময় ফল সেক্সপীয়র, বেকন প্রভৃতি প্রতিভাশালী গ্রন্থকারগণ। প্রথম জেমসের সময় স্কটলণ্ড ও ইংলণ্ড মিলিত হয়। সেই মিলনের অমৃতময় ফল অতুলনীয় মিল্‌টন ও আধুনিক যাবতীয় কবি, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, পুরাবিৎ ও বৈজ্ঞানিকগণ। সেই ভাষাগত মিলনের অপূর্ব্ব পরিণাম ব্রিটনের বর্ত্তমান সৌভাগ্য। ব্রিটন এখন অদ্যাপি পরিজ্ঞাত জগতের সর্ব্বত্র আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন। পৃথিবীর অন্যূন এক-চতুর্থাংশে এখন ইংরাজী ভাষা কিছু না কিছু পরিমাণে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। আজ যদি ইংলণ্ডে সেই ভাষাগত বৈষম্য থাকিত, তাহা হইলে ইংলণ্ডের কখন এরূপ সৌভাগ্য হইত না।

এবার চল, প্রাচীন রোমের সৌভাগ্যের মূলতত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া দেখি। লাটিন ভাষা প্রথমে ইতালীর একটি ক্ষুদ্র প্রদেশে কথিত হইত। তখন ইতালী অন্তর্ব্বিচ্ছিন্ন ও প্রাদেশিক বিদ্বেষানলে জ্বলিত। সে সময়ে ইতালীর নাম আল্পসের বাহিরে যায় নাই, ভূমধ্যসাগর পার হইয়া দেশদেশান্তরেও প্রতিধ্বনিত হয় নাই, কিন্তু যখন লাটিন-ভাষা-কথনশীল রোমীয় জাতির বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ইতালীতে লাটিন ভাষা প্রচলিত হইল, তখন রোম ভুবনেশ্বরী হইয়া উঠিল। লাটিন ভাষা তখন জগতে আদৃত হইল। তখন অসংখ্য পদ্য ও গদ্য-লেখক—অসংখ্য ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ এবং অসংখ্য বৈজ্ঞানিক ও বাগ্মিক ইতালীক্ষেত্রে আবির্ভূত হইলেন। তাঁহাদিগের প্রতিভাবলে নূতন ইউরোপ সৃষ্ট হইল। ইউরোপের বর্ত্তমান উন্নতির একটি প্রধান কারণ লাটিনভাষা। ইউরোপীয় অধিকাংশ দেশেই লাটিন গ্রন্থসকল অনূদিত বা অনুকৃত হইয়াছে। বর্ত্তমান ইউরোপীয় জাতিনিচয়ে লাটিন ভাষারূপ ফটোগ্রাফ যন্ত্রে সেই প্রাচীন রোমীয় জাতির ছবি পূর্ণ প্রতিবিম্বিত হইয়াছে—তাই আজ ইউরোপের এত প্রতাপ।

একবার ভারতের পূর্ব্বাবস্থা আলোচনা করি। যখন আর্য্যেরা প্রথমে ভারতে আসিয়াছিলেন, তখন সংস্কৃত তাঁহাদিগের কথিত ভাষা ছিল। আর্য্যঋষিগণের জ্বলন্ত হৃদয়ভাব ঋগ্‌বেদে প্রতিবিম্বিত। ঋষিরা বেদিতে বসিয়া সেই জ্বালাময়ী ভাষায় হৃদয়ের ভাবোচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিয়া সম্মিলিত উপনিবেশিকগণের মনে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বা বীরবৃত্তি উত্তেজিত করিয়া দিতেন। তাঁহাদিগের সেই উন্মাদিনী ভাষায় উত্তেজিত হইয়া কতিপয়মাত্র আর্য্য ঔপনিবেশিক অমানুষ অবদানপরম্পরা সম্পাদন করিয়াছিলেন। ভাষাগত সাম্য সেই আর্য্যজাতিকে অচিরকালমধ্যে অদ্বিতীয় শক্তিশালী করিয়া তুলে। যতদিন তাঁহারা সারস্বত প্রদেশে বাস করিয়াছিলেন, ততদিন তাঁহারা এই ভাষাসাম্যে নিবিড়রূপে ঘনীভূত ছিলেন। তখন তাঁহাদিগের উন্নতির সীমা ছিল না—সৌভাগ্যেরও সীমা ছিল না। ক্রমে বিজয়মার্গে অগ্রসর হইয়া তাঁহারা পরস্পর হইতে বহুদূরে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িলেন। আদিম জাতির সহিত সংমিশ্রণে তাঁহাদিগের পবিত্র দেবভাষা ক্রমে অসংখ্য প্রাকৃত ভাষায় (Dialects) পরিণত হইল। গৌড়ী, সৌরসেনী, মাগধী, মৈথিলী, পালী প্রভৃতি অসংখ্য প্রাকৃত ভাষা

আর্য্যজাতির বিস্তৃতি ও আদিম জাতিনিচয়ের সহিত সম্মিশ্রণের ফল। অসংখ্য প্রাদেশিক ভাষার সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে আর্য্যজাতির অন্তর্ব্বিচ্ছেদ আরম্ভ হয়। ভাষাবৈধর্ম্মোর বিষময় ফল প্রাদেশিক বিদ্বেষ। সেই প্রাদেশিক বিদ্বেষ হইতেই ভারতের জাতীয় পতন সংঘটিত হইয়াছে। পরস্পর ঘনীভূত একভাষাকথনশীল আর্য্যজাতি ক্রমে পরস্পর মমতাশূন্য বিভিন্ন-ভাষা-কথনশীল অসংখ্যজাতিতে পরিণত হইয়া পরস্পরের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিল। বর্গী আসিয়া বঙ্গদেশ ছারখার করিল। জয়চন্দ্র দিল্লীর সিংহাসন যবনকে বিক্রয় করিল—অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অন্তর্জ্জাতীয় উপদ্রব ত গণনা করিয়া উঠা দায়। এখনও ভাষাগত বৈষম্যে ভারতের অস্থিমজ্জা জর্জ্জরিত। ভাষাবৈষম্যে ভারতের পতন হইয়াছে—ভাষাজনিত সাম্য ব্যতীত ভারত সঞ্জীবিত হইতে পারে না।

ভাষাসাম্য যে জাতীয় একতার অপরিহার্য্য উপাদান, তদ্বিষয়ে মতদ্বৈধ নহি। তবে কোন্ ভাষা ভারতের জাতীয় ভাষা হইবে, তদ্বিষয়ে ঘোরতর মতভেদ বর্ত্তমান। কেহ সংস্কৃত, কেহ হিন্দী, কেহ উর্দ্দু, কেহ বা ইংরাজীকে ভারতের ভবিষ্য জাতীয় ভাষা বলিয়া প্রখ্যাত করিয়াছেন। কিন্তু আমার ক্রমে বিশ্বাস জন্মিতেছে যে, বাঙ্গালা ভাষাই ভবিষ্যতে ভারতের জাতীয় ভাষা হইবে। এ বিশ্বাস অমূলক নহে। যাঁহারা নিপুণ-চিত্তে ভারতীয় ভাষা-নিচয়ের সহিত আধুনিক বাঙ্গালা ভাষার তুলনা করিয়াছেন, তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, লিখিত বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন অন্যান্য সমস্ত ভারতীয় ভাষা অপেক্ষা সংস্কৃতের অধিক নিকটবর্ত্তী। সুতরাং অধিকতর পরিমার্জ্জিত ও ভাবব্যঞ্জক। সংস্কৃত অপেক্ষা অধিকতর পূর্ণ ভাষা আজও পৃথিবীতে জন্মে নাই। যে ভাষা সেই ভাষার অধিকতর অনুগামী, তাহা জগতের বর্ত্তমান ভাষামাত্রেরই উপরে যে অচিরাৎ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিবে, তদ্বিষয়ে সংশয় অল্প। সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন অন্যান্য ভাষার শুদ্ধ যে ধাতু বিকৃত হইয়াছে, এরূপ নহে, অনেক শব্দও বিকৃত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালায় শব্দের বিকার হয় নাই। যিনি সংস্কৃত জানেন, তাঁহার পক্ষে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করা অতি সহজ। যিনি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন যে কোন ভাষা পড়িয়াছেন, তাঁহার পক্ষেও বাঙ্গালা সহজবোধ্য। কারণ, উভয় ভাষার শব্দগত অনেক সাদৃশ্য আছে। দুরধিগম্য সংস্কৃত ভাষা ভারতের জাতীয় ভাষা হইতে পারে না। উর্দ্দুতে অনেক পারস্য ও আরবী কথা থাকায় তাহা হিন্দুবহুল ভারতের জাতীয় ভাষা হইতে পারে না। বৈদেশিক ভাষা জাতীয় হৃদয়ের অন্তস্তল কখন স্পর্শ করিতে পারে না, সুতরাং ইংরাজীরও কখন ভারতের জাতীয় ভাষা হইবার সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে রহিল বাঙ্গালা ও হিন্দী—ভারতের ইংরাজী ও ফরাসী। আমরা একবার বলিয়াছি, এতদুভয়ের মধ্যে বাঙ্গালা অধিকতর পরিমার্জ্জিত, অধিকতর পরিপুষ্ট, সুতরাং অধিকতর ভাবব্যঞ্জক; আবার সেই বাক্য পুনরুক্ত করিলাম। অধিকতর পরিপুষ্ট ও অধিকতর ভাবব্যঞ্জক বলিয়াই বাঙ্গালা ভাষা ত্বরিতগতিতে অগ্রসর হইতেছে। কি গদ্য, কি পদ্য, কি ইতিহাস, কি পুরাবৃত্ত, কি দর্শন, কি বিজ্ঞান, কি সমাজনীতি, কি রাজনীতি সকল বিষয়েই বঙ্গভাষায় ভূরি ভূরি পুস্তক লিখিত হইতেছে। বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের সময় হইতে আধুনিক বাঙ্গালার সূত্রপাত। তখনও ইহা শৈথিল্যগন্ধবিশিষ্ট ছিল। চৈতন্যের ধর্ম্মপ্রচারের সময় ইহা অধিকতর পরিপুষ্ট হয়। চৈতন্যের সময় হইতে ভারতচন্দ্রের সময় পর্য্যন্ত ইহার কিঞ্চিৎ গতিমান্দ্য উপলক্ষিত হয়। ভারতচন্দ্রের সময় হইতেই ইহা বেগবতী হইতে আরম্ভ হয়। রামমোহন রায়ের সময় এই বেগ খরতর হইয়া উঠে। সেই অবধিই বাঙ্গালা ভাষা প্রচণ্ড স্রোতস্বিনীর ন্যায় উন্নতি সাগরাভিমুখে প্রবলবেগে ধাবিত হইয়াছে। সে আজ অর্দ্ধ-শতাব্দীমাত্র হইবে—ইহার মধ্যে অসংখ্য প্রতিভাশালী লেখক বাঙ্গালা ভাষাকে বিবিধ ভূষণে ভূষিত করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর, মদনমোহন, অক্ষয়কুমার, দীনবন্ধু, বঙ্কিম, মধুসূদন, হেমচন্দ্র প্রভৃতি প্রতিভাশালী লেখকমণ্ডলীর আবির্ভাব এই অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যেই। যেরূপ ত্বরিতগতিতে বাঙ্গালা অগ্রসর হইতেছে, ইহাতে আর কোন ভারতীয় ভাষার বাঙ্গালার সমকক্ষ হইবার সম্ভাবনা নাই। যদি উৎসাহ পায়, যদি গৃহমধ্য হইতেই বাধা না পায়, তাহা হইলে বাঙ্গালা অচিরকালমধ্যে অন্যান্য ভারতীয় ভাষাকে কুক্ষিগত করিয়া লইতে পারে—জাতীয় সম্মিলনের প্রধান অন্তরায় ভাষাবৈষম্যকে বিদূরিত করিয়া অপূর্ব্ব ভারতীয় জাতীয় ভাষার সৃষ্টি করিতে পারে। বাঙ্গালা বহিশ্চর ও আভ্যন্তরীণ অনেক বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও ক্রমিক অগ্রসর হইতেছে।

বহিশ্চর বাধার উপর আমাদের কর্তৃত্ব নাই, কিন্তু আভ্যন্তরীণ বাধা আমরা ইচ্ছা করিলেই অপনীত করিতে পারি। উপরে যে বৈদেশিক ভাষার উল্লেখ করিলাম, তাহা বৈদেশিক-শাসন-জনিত। বৈদেশিক রাজার স্বার্থ জাতীয় ভাষার ধ্বংসে বৈদেশিক ভাষার বহুলপ্রচার। বৈদেশিক রাজার স্বার্থ ভাষা-বৈষম্য চিরস্থায়ী করা। কারণ, বিভিন্ন ভাষা সত্ত্বে ঘনীভূত মিলনের কোন সম্ভাবনা নাই। এই জন্য গবর্ণমেণ্ট ভারতের অপরিপুষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাদেশিক ভাষাগুলিকে অতি যত্নে পরিরক্ষিত করিতেছেন। আসামী ও উড়িয়া ভাষার সহিত বাঙ্গালা ভাষার অনেক সৌসাদৃশ্য। গবর্ণমেণ্টের বিপরীত চেষ্টা সত্ত্বেও আসামী ক্রমে বাঙ্গালার কুক্ষিগত হইতেছে। উড়িয়াও এত দিন কুক্ষিগত হইত, কিন্তু বর্ণমালার আকারগত বৈষম্য নিবন্ধন তাহার কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইতেছে মাত্র। বাঙ্গালার অতি সরল ও সুন্দর বর্ণমালা দ্বারা একদিন নিশ্চয়ই জটিল ও কদাকার উড়িয়া বর্ণমালাকে পর্য্যুদস্ত করিবে। দেবনাগর বর্ণমালা অপেক্ষাও বাঙ্গালা বর্ণমালা অধিকতর সরল, অথচ সমানই সুন্দর। সুতরাং হিন্দীর দেবনাগর বর্ণমালাও (Survival of the fittest) মতানুসারে কালে বিলীন হইয়া যাইবে। যেমন ওল্ড ইংলিস বর্ণমালা অধিকতর (ornamental) বলিয়া রোমান বর্ণমালা দ্বারা পর্য্যুদস্ত হইয়াছে, সেইরূপ অধিকতর অলঙ্কৃত দেবনাগর বর্ণমালা সরলতর বাঙ্গালা বর্ণমালা দ্বারা একদিন নিশ্চয়ই বিতাড়িত হইবে। বৈদেশিক রাজার কৌশলে এ শুভদিন আসিতে বিলম্ব হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু এরূপ দিন যে আসিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বাঙ্গালার জাতীয় ভাষা হওয়ার অনুকূলে আর একটি যুক্তি এই যে, বাঙ্গালা ভারতের রাজধানীর ভাষা। রাজধানীর ভাষাই সকল কালে সকল দেশেই জাতীয় ভাষারূপে পরিণত হইয়াছে। বৌদ্ধ বিপ্লবের সময় পালী ভাষা রাজধানীর ভাষা ছিল, সুতরাং পালী তৎকালে সর্ব্বতঃপ্রসারী হইয়া উঠিয়া ছিল। সেইরূপ মাগধী, মৈথিলী ও গৌড় প্রভৃতি ভাষাও যখন যখন রাজধানীর ভাষা হইয়াছিল, তখনই সেই সেই রাজধানীর অন্তর্গত প্রদেশসমূহের ভাষারূপে পরিণত হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট বৈকেন্দ্রিক নীতি (Decentralization policy) অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালার বিস্তৃতি দূর-বিলম্বিত করিতে পারেন বটে, কিন্তু এ গতি একেবারে রোধ করিতে কখনই সমর্থ হইবেন না। ভারতের রাজধানীর ভাষা বাঙ্গালা একদিন ভারতের জাতীয় ভাষা হইবেই হইবে। ইংরাজী ভাষা ও ইতালীয় ভাষা এ বিষয়ে আমাদের পূর্ব্ব-নিদর্শন। আইস ভাই, আমরা আভ্যন্তরীণ অন্তরায়গুলি বিদূরিত করিয়া বাঙ্গালা ভাষার সেই সৌভাগ্যের দিন শীঘ্র আনয়ন করি। আইস ভাই! আমরা মাতৃভাষাকে পূজা করিতে শিখাই। ভারতীয় আর্য্যেরা সংস্কৃত ভাষাকে দেব ভাষা বলিয়া ভক্তি করিতেন, তাই সংস্কৃত আজও ভাষাজগতের শীর্ষস্থানীয় রহিয়াছে। সেই সংস্কৃতের খাতিরে আজও আমরা সভ্য-জগতের গৌরবভাজন। সেই সংস্কৃতের খাতিরে আজও আমরা বিজেত্রী জাতির আদর ভাজন। সংস্কৃত ভাষার পুণ্যবল না থাকিলে এতদিন হয় ত আমরা আমেরিকার আদিম অধিবাসিগণের দশা প্রাপ্ত হইতাম। আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ আমাদিগকে আর কিছুই দিয়া যান নাই, কেবল অনন্ত-রত্ন-প্রসবিনী ভারতভূমি ও অনন্ত রত্ন-গর্ভা সংস্কৃতভাষা রাখিয়া গিয়াছেন। এই দুইয়ের কর্ষণ ও মন্থনে আমাদের সমস্ত জাতীয় অভাব বিদূরিত হইবে। আইস, আমরা সেই অনন্ত রত্নাকর হইতে রত্নরাজি আহরণ করিয়া মাতৃভাষার অঙ্গ ভূষিত করি। কত কত গভীর চিন্তা সংস্কৃত ভাষার অভ্যন্তরে বিলীন হইয়াছে, আমরা আজও তাহার সহস্রাংশও মাতৃভাষায় প্রতিফলিত করিতে পারি নাই। পারি নাই তাহার কারণ—মাতৃভাষার অনাদর। যিনি সে কার্য্যে ব্রতী হইবেন, তিনিই অনাহারে মরিবেন। কারণ, বাঙ্গালা আজও বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক ভিন্ন অন্য পুস্তক কিনিতে শিখে নাই। শুদ্ধ যে আমরা উচ্চ সাহিত্যের লেখকগণকে অনাহারে মারি, তাহা নহে, আমরা অনেক সময় তাঁহাদিগের প্রতি ঔদাসীন্য দেখাইয়া থাকি। যিনি বাঙ্গালানবিশ, বঙ্গসমাজে তাঁহার বড় অনাদর। বাঙ্গালানবিশ বঙ্গসমাজে অবজ্ঞাসূচক উপাধি। যিনি ইংরাজীতে বক্তৃতা করেন ও ইংরাজীতে লিখেন, তাঁহার সমাজে অধিকতর সম্মান। যেন ভাবের কোন মাহাত্ম্য নাই, ভাষারই মাহাত্ম্য। যেন কোন মহান্ ভাব জাতীয় ভাষায় ব্যক্ত করিলে তাহার মাহাত্ম্য কমিয়া যায়! যেন কোন ভাব অধিক লোকে বুঝিলে ভাবপ্রকাশকের গৌরব

কমিয়া যায়। যেন মনে মনে শঙ্কা, পাছে দাস-জাতির ভাষা ব্যবহার করিতে দেখিলে বৈদেশিকেরা আমাদিগকে দাস বলিয়া ঘৃণা করিবে। কিন্তু দাস! কতকাল এরূপ ময়ূরপুচ্ছে নিজ কাকত্ব লুকাইবে? কতকাল পরের পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া আপনাকে সুন্দর দেখাইতে চেষ্টা করিবে? যাহা তোমার নয়, কখন তোমার হইবে না ও হইতেও পারে না, তাহার গর্ব্বে অভিভূত হইয়া নিজের কাপুরুষত্ব আর কতকাল দেখাইবে? তাই বলিতেছি, আইস ভাই! আমরা আপন জিনিসকে আদর করিতে শিখি। যে মাতৃভাষাকে আমরা অনাদর করিলে জগৎ অনাদর করিবে, সে মাতৃভাষার গৌরব বর্দ্ধন করিতে শিখি। যে মাতৃভাষাকে আমরা সুশোভিত না করিলে আর কেহ সুশোভিত করিবে না, নানা দেশ হইতে রত্নরাজি আহরণ করিয়া তাহাকে সাজাই। নানা ভাষার মুকুটমণি আনিয়া সেই অনাদৃত মাতৃভাষার শিরোভূষণ করি। যে চিত্রকর তাহাকে ভাল বর্ণে ফলিত করিতে পারিবেন, যে শিল্পকর তাহাকে বিচিত্র অলঙ্কারে বিভূষিত করিতে পারিবেন ও যে উপাসক সেই উজ্জ্বল-বিচিত্রালঙ্কার-ভূষিত প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবেন, আইস ভাই! আমরা তাঁহাদিগের পূজা করিতে শিখি। যদি সেই প্রতিমাকে জগন্মনোমোহিনী ও উদ্দীপনাময়ী করিতে চাও, তবে সেই প্রতিমার নির্ম্মাতৃগণকে পর্য্যাপ্ত আহার প্রদান কর। যাহাতে তাঁহারা অনন্যমনে সেই প্রাণপ্রতিষ্ঠাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে পারেন, তাহার উপায় বলিয়া দেও। অনাহারে যাহার নিজের প্রাণ শুষ্ক হইয়া যাইতেছে, সে কখন অপরের প্রাণসঞ্চার করিতে পারে না। দিবারাত্রি যাহার অন্নচিন্তায় অতিবাহিত হয়, সে কিরূপে এ কঠোর শবসাধনায় সিদ্ধ হইবে? অন্নকার্য্যে যাহার জীবনী শক্তি ক্ষয়িত হইতেছে, তাহার ক্ষীণস্বরে বহুদিনের পতিত জাতি কি উঠিতে পারে? যাহার মস্তিষ্ক লেখনীশলাকায় অবিরাম বিদ্যুৎ উদ্গিরণ করে, ভারতে এরূপ লোকের এক্ষণে বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। সে তাড়িতপ্রবাহ অন্যদিকে ব্যয়িত হইলে ভারতের সুখের দিন আসিবার অনেক বিলম্ব পড়িয়া যাইবে। তাই বলিতেছি, আইস ভাই! আমরা এখন জাতীয় ভাষার উন্নতি-সাধনে আত্মোৎসর্গ করিতে শিক্ষা করি। ওহাবীরা ধর্ম্মার্থে প্রতি গৃহস্থ প্রতিদিন এক মুষ্টি করিয়া চাউল রাখিয়া দেয়। সেইরূপ আইস, আমরা এখন হইতে জাতীয় ভাষার উন্নতিসাধনার্থ প্রত্যেকে মুষ্টিপরিমিত চাউল সঞ্চিত করি। আইস, আমরা এইরূপে সঞ্চিত চাউল বিক্রয় করিয়া প্রতিগৃহে একটি করিয়া পুস্তকালয় সংস্থাপিত করি। কেহ টের পাইবে না, অচিরকালমধ্যে প্রতিগৃহ অচিরাৎ পুস্তকরাশিতে পরিপূরিত হইবে। চতুর্দ্দিক্ হইতে তখন উৎকৃষ্ট গ্রন্থের পুষ্পবৃষ্টি হইতে থাকিবে। অন্তর্নিগূহিত জাতীয় প্রতিভা তখন দ্বাদশরুদ্রের উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হইবে। সেই তাড়িত যন্ত্রের (Battery) অবিরাম প্রয়োগে অচেতন ভারত পুনর্জীবিত হইবে। বিধাতঃ! ভারতের ভাগ্যে তুমি কি এ সৌভাগ্য লেখ নাই? না, তা ভাবিতে পারি না। যে বিধাতা ভারতকে একদিন জগতের অধীশ্বরী করিয়াছিলেন, যে বিধাতা ভারতের পূর্ব্বভাষাকে দেবভাষায় পরিণত করিয়াছেন, যে বিধাতা আধ্যাত্মিক উৎকর্ষে আজও ভারতকে জগতের শীর্ষস্থানীয় করিয়া রাখিয়াছেন, সে বিধাতা যে ভারতকে আর উঠিতে দিবেন না—তাহা কখন বোধ হয় না—কখনই নহে। ভারত আবার উঠিবে—আবার জাতি গণনায় অগ্রণী হইবে, আবার সভ্যতালোকে জগৎ ঝলসিত করিবে—আবার তাহার জাতীয় ভাষা যুগপৎ অমৃতবর্ষণ ও বিদ্যুদ্দীপন করিবে! সে জাতীয় ভাষা বাঙ্গালা হইবে কি না, তাহা সম্পূর্ণরূপে বঙ্গবাসীর করায়ত্ত!

অভিযান ও সারস্বত উৎসব *

সন্তানগণ! আজ আমরা যে অভিযানিক যোগ-সাধনায় প্রবৃত্ত হইলাম, ইহা সামান্য অভিযান নহে। বিজয়োন্মত্ত সেনা বিজয়-পিপাসায় প্রমত্ত হইয়া শত্রু-বিরুদ্ধে যে অভিযান বা মার্চ্চ (march) করে, ইহা সে অভিযান নহে। আমরা আজ যে অর্থে এই অভিযান শব্দ প্রযুক্ত করিলাম, এ অর্থে অভিযান শব্দ

* এই প্রবন্ধটি ময়মনসিংহ সারস্বত সমিতির উদ্বোধন-উপলক্ষে পঠিত হয়

পূর্ব্বে কখন প্রযুক্ত হয় নাই। সুতরাং অভিধান খুঁজিয় অভিযানের এ অর্থ পাইবে না। হৃদয়ের উৎস হইতে। অভিযানের যে অর্থ উদ্ভূত হইয়াছিল, অনেক দিনের সাধনাবলে আজ অভিযান শব্দ সেই অর্থে কার্য্যতঃ প্রযুক্ত হইয়াছে দেখিয়া জীবন সার্থক বোধ করিলাম।

আমরা যে অর্থে অভিযান শব্দ অদ্য কার্য্যতঃ প্রযুক্ত করিলাম, তাহার অর্থ ব্যাখ্যা করিতেছি। অভি পূর্ব্বক 'যা' ধাতুর উত্তর শানচ্ প্রত্যয় করিয়া অভিযান শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং ইহার যৌগিক অর্থ কাহারও অভিমুখে গমন করা। ইহার রূঢ় অর্থ, এক দল সৈন্যের শত্রু অভিমুখে গমন। আজ আমরা এই রূঢ় শব্দের পরিবর্ত্তন করিয়া এই অর্থে ইহাকে ব্যবহার করিলাম—এক হৃদয়-দলের অন্য হৃদয় দলের অভিমুখ গমন। আমরা অপগণ্ড ভারত-সন্তান এতদিন নিদ্রায় অভিভূত ছিলাম। আজ আমাদের কোন দৈবী শক্তি-বলে নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। কে যেন আমাদের অঙ্গে সম্মোহন অস্ত্র প্রযুক্ত করিয়াছিল – তাই আমরা এত-দিন চেতনাহারা হইয়া পড়িয়াছিলাম—আমাদের অঙ্গের বেশভূষা রত্নাভরণ সেই অবসরে কে লুঠিয়া লইয়া গিয়াছে। এতদিন আমরা মৃতপ্রায় পড়িয়াছিলাম—সংজ্ঞা ছিল না – সুতরাং কিছুই জানিতে পারি নাই – এবং প্রতিবিধানও করিতে পারি নাই। সহসা নিদ্রাভঙ্গে দেখি—আমরা নগ্নকায়, নগ্নপদ এবং রাজরাজেশ্বরীর সন্তান হইয়াও নিরাভরণ পড়িয়া আছি! তখন দরবিগলিত অশ্রুধারায় আমা-দের বক্ষ ভাসিয়া গেল। ক্রন্দনে আমাদের এত দিন অতীত হইয়াছে। আজ আমরা বুঝিয়াছি যে, বসিয়া শুদ্ধ কাঁদিলে চলিবে না। আমাদের ভাই-ভগিনীগণের সকলেরই ত এই দশা ঘটিয়াছে। সুতরাং এস ভাই! আমরা, কে কোথায় পড়িয়া আছে—কে কোথায় পড়িয়া কাঁদিতেছে—দেখিয়া আসি। যে উঠিতে পারিতেছে না, চল—আমরা গিয়া তাহাদিগকে ধরিয়া তুলি; যে কাঁদিতেছে, তাহার অশ্রুজল মুছিয়া দিই; আশ্বাসবাক্যে তাহার শুষ্কপ্রায় হৃদয়কে সজীবিত করি! চল ভাই! আমরা যে দল উঠিয়াছে—সেই দলের সঙ্গে অন্য দলের যোগসাধনা করি। ভারতের সমস্ত হৃদয়-স্রোতস্বিনী একত্র মিলাইয়া এক নূতন মহাসাগর উৎপন্ন করি। এক হৃদয়-স্রোতস্বিনীর অন্য হৃদয়-স্রোতস্বিনীর অভিমুখে যে গমন—তাহাই আমাদের আজকার অভিযানের প্রতিপাদ্য। ইহা রাজসিক বা তামসিক নহে। ইহা পূর্ণ সাত্ত্বিক! ইহার সহিত সামরিক ভাবের বা বীর-রসের কোন সংস্রব নাই। করুণ-রসই এ অভিযানের জীবন—সুতরাং নিরস্ত্র বলিয়া আমাদের দুঃখিত হইবার কারণ নাই। যোগসিদ্ধ না হইলে অস্ত্র, গ্রহণ নিষিদ্ধ। যত দিন আমরা যোগসিদ্ধ না হইব —তত দিন আমরা বালক—কৃপার পাত্র। পঞ্চ-বিংশতি কোটি হৃদয় পরস্পর সংযুক্ত হইলে, আমা-দের কিসের অভাব? সুতরাং আমাদের প্রথম কার্য্য এই যোগসাধনা। এতদিন আমরা শুদ্ধ ভাব-ময় জীবনে সময় অতীত করিয়াছি,—আজ আমা-দের কার্য্যময় জীবন আরম্ভ হইল। তাই আজ আমরা দ্বারে দ্বারে অভিযান করিয়া দূরবিক্ষিপ্ত-হৃদয় কলিকাগুলি কুড়াইয়া লইয়া আজ ভগবতী সর-স্বতী দেবীর মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। যে সরস্বতী দেবীর বরে আজ ইউরোপ ও আমে-রিকা—এসিয়ায় ও আফ্রিকায় কর্ত্তৃত্ব করিতেছে,—যে ভগবতী সরস্বতীর কৃপায় প্রাচীন আচার্য্যেরা জগতে অজেয় ছিলেন, আজ সেই ভগবতী সরস্বতীর মন্দিরে আসিয়া তাঁহার নিকট জ্ঞানভিক্ষা করি-তেছি। বিনা জ্ঞানে কোন জাতি উঠিতে পারে না। জ্ঞানহীন হইয়া পড়িয়াছি বলিয়াই আজ আমাদের এই দুর্দ্দশা। সুতরাং এস ভাই! আজ সমস্ত ভারত মিলিয়া এই শুভদিনে ভগবতী সর-স্বতী দেবীর আরাধনা করি। তিনি যেন ভারতের প্রতি আবার কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। যেন আবার ভারতকে জ্ঞানালোকে সমুজ্জলিত করেন। যখন এ পূজায় আমাদের অধিকার ছিল, তখন সারস্বত উৎসবে সমস্ত ভারত মাতিয়া উঠিত। কিন্তু অজ্ঞানে সারস্বত উৎসবের মহিমা বুঝিবে কিরূপে? তাই অজ্ঞান আমরা এত দিন সারস্বত উৎসবে বিরত ছিলাম। এখন জ্ঞানের পুনরুন্মেষের সহিত আমরা সারস্বত-মহিমা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছি – তাই আজ আবার এই সারস্বত উৎসবের অবতারণা। ময়মন-সিংহ পুণ্যভূমি—যেহেতু, সারস্বত উৎসবের পুনরারম্ভ ময়মনসিংহে। আশা করি, অচিরাৎ সমস্ত ভারত সারস্বত উৎসবে ময়মনসিংহের অনুবর্ত্তন করিবেন। তখন একস্থানের অভিযান অন্য স্থানের অভিযানের সহিত মিলিত হইয়া ভারতে অপূর্ব্ব সৌভাগ্য-রবি

সমুদিত করিবে। বৎসরের দুই চারি দিন অন্ততঃ আমরা জাতিধর্ম্ম—ধর্ম্মান্ধতা ও সাম্প্রদায়িকতা ভুলিয়া যদি ভগবতী সরস্বতীর মন্দিরে আসিয়া পরস্পর শোক-বিহ্বলভাবে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতে শিখি, যদি দুই চারি জন নিজ স্বার্থকে জাতীয় স্বার্থে বলি দিয়া আত্মবিস্মৃত হইতে পারি, তাহা হইলেও কালে আমরা একটি সমগ্র জাতিতে পরিণত হইতে পারি। হিন্দু, মুসলমান, য়িহুদী, খৃষ্টান, শিখ, ব্রাহ্ম—সকলেই এই অভিযানে ও এই সারস্বত উৎসবে যোগ দিতে পারেন। কাহারও ইহাতে কোনও আপত্তি নাই—আপত্তি থাকিবার কারণও নাই। ইহা অপেক্ষা সুখের দিন শতধাবিভিন্ন ভারতের ভাগ্যে আর কি হইতে পারে?

সন্তানগণ! সন্তান শব্দের সহিত জননী শব্দের যে নিত্য সম্বন্ধ। একটি শব্দ উচ্চারণ করিলে যে আর একটি শব্দ স্বতঃই মুখ হইতে নিঃসৃত হয়। তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি—আমাদের জননী কোথায়? ঐ যে কঙ্কালময়ী বিবশা নিরাভরণা রুক্ষালকা আলুলায়িতকেশী রমণীমূর্ত্তি দেখিতেছি, উনিই আমাদের মা—ভারত জননী। ঐ দেখ, উনি মৃতপ্রায়া ধরাশায়িনী পড়িয়া আছেন!! ঐ যে চতুর্দ্দিকে করালমূর্ত্তি করধৃতদণ্ড পুরুষগণ দাঁড়াইয়া আছে, উহারা কে? সত্যবানকে যমালয়ে লইয়া যাইবার জন্য যে সকল যমদূতেরা আসিয়াছিল, বোধ হয়, আমাদের জননীকে গতাসু মনে করিয়া তাহারাই উঁহাকে যমালয়ে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছে। আজ আমরা সাবিত্রীর অনুবর্ত্তন করিব। সাবিত্রী যেমন শমনসদন হইতে সত্যবানকে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন, আমরাও সন্তানগণ—সেইরূপ জননীকে কালের করাল পুরী হইতেই ফিরাইয়া আনিব। আনিয়া জননীর মৃতপ্রায় দেহে সঞ্জীবনৌষধ প্রয়োগ করিব। যত দিন না মা আবার বলশালিনী হন, ততদিন আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার শুশ্রূষায় নিমগ্ন থাকিব। ততদিন আমোদ-আহ্লাদে, সুখবিলাসে জলাঞ্জলি দিয়া ব্রতধারী রহিব। মা মরণোন্মুখী থাকিতে সন্তানের আমোদে অধিকার কি?

সন্তানগণ! তোমরা আজ একটি নব-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলে। তোমাদের রক্ত-বসন তোমাদের ঐ নব-ধর্ম্মে দীক্ষার পরিচায়ক। কোন উৎসব বা আমোদের জন্য তোমরা আজ এই রঞ্জিত-বসনে আবৃত হও নাই। তোমরা একটি গভীর ব্রত উদ্যাপনার জন্য আপন ইচ্ছায় এই বসনকে অঙ্গের আভরণ করিয়াছ। আশা করি, যত দিন ব্রতের উদ্যাপনা না হইবে, ততদিন এই বসন পরিত্যাগ করিবে না। রামচন্দ্র পিতৃসত্যপালনার্থ চতুর্দ্দশ বৎসর সন্ন্যাসীর বেশে বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। শাক্যসিংহ সাম্যধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া আজীবন সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন আরও অনেক সন্ন্যাসীর জীবনে ভারত-ক্ষেত্র সমুজ্জ্বলিত হইয়াছিল। তখন প্রতি গৃহী অর্দ্ধ-সন্ন্যাসী ছিলেন। সন্ন্যাসধর্ম্মের মহিমায় ভারত তৎকালে হিমালয় সমান উচ্চ হইয়া উঠিয়াছিল। আবার ভারতে সন্ন্যাসধর্ম্মের প্রয়োজন হইয়াছে। পতিত জাতিকে তুলিবার এরূপ মহামন্ত্র আর নাই। গৃহে থাকিলে সন্ন্যাসী হওয়া যায় না, এরূপ সংস্কার অমূলক। সন্ন্যাসধর্ম্ম অন্তরে অবস্থিত। যে অন্তরে সন্ন্যাসী, তাহার গৃহও অরণ্য সমান। গৃহে থাকিয়া সন্ন্যাসী হইলে বরং সন্ন্যাসধর্ম্মের অধিকতর স্ফূর্ত্তি হয়—কার্য্যের প্রসর অধিকতর বিস্তৃত হয়। সুতরাং সন্তানগণ! তোমরা গৃহে থাকিয়াই সন্ন্যাসধর্ম্মের অনুশীলন করিবে, গৃহে থাকিয়াই জননীর চরণে আত্মবলি দিতে অভ্যাস করিবে, পরিবারের মধ্যে থাকিয়াই পারিবারিক জীবনকে জাতীয় জীবনে আহুতি দিতে শিক্ষা করিবে।

আজ হইতেই আত্ম ভুলিয়া স্বদেশ ও স্বজাতির চরণে আত্ম-আহুতি দিতে আরম্ভ করিবে। এ বড় কঠোর সাধনা। আমি অনেক দিন হইতে এ সাধনায় নিমগ্ন আছি—কিন্তু আজও সিদ্ধকাম হইতে পারিলাম না। চতুর্দ্দিকের ঘটনাবলী আসিয়া মধ্যে মধ্যে ব্রতভঙ্গ করিয়া দেয়। পারিবারিক জীবন সময়ে সময়ে জাতীয় জীবনের অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। সেই স্রোতে পড়িয়া সময়ে সময়ে—স্বদেশ ও স্বজাতি—হৃদয়ের আরাধ্য দেবতাদ্বয়কে—ভুলিয়া যাই। কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে ব্রতস্মৃতি প্রবলবেগে হৃদয়ে সমুদ্ভূত হয়। তখন আবার লজ্জায় অভিভূত হই,—ক্ষণিক আত্মবিস্মৃতির জন্য গভীর অনুশোচনায় দগ্ধ হইতে থাকি, এইরূপে এই দগ্ধ জীবন চলিতেছে। অন্তর্দাহে হৃদয় দগ্ধীভূত হইতেছে। মধ্যে মধ্যে

ব্রতস্খলন হইলেও—মধ্যে মধ্যে আত্মস্মৃতির অধীন হইলেও— গৃহীত ব্রত কখন পরিত্যাগ করি নাই। ব্রত পরিত্যাগ করি নাই বলিয়াই আজ তোমাদের সম্মুখে দাঁড়াইতে সাহস করিয়াছি। কিন্তু আমা হইতে আশা অল্প। এই দেখ, আমার শ্মশ্রুকেশ পলিত বেশ ধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কত দিন আর বাঁচিব? আমি জননীর কিছুই করিতে পারিলাম না। এই দুঃখে দিন দিন আরও অকাল-বৃদ্ধ হইতেছি। জীবন দিন দিন দুর্ভর বোধ হইতেছে। কিন্তু তোমাদের মুখের দিকে যখন তাকাই, তখন আবার মনে সাহস হয়, আশা-উষা নবীন রশ্মিতে আবির্ভূত হয়। সন্তানগণ! তোমরা এখন ভারতের একমাত্র আশা! আমাদের জীবনের শিক্ষা তোমাদের মূলধন। এই মূলধন লইয়া এই জাতীয় ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলে শীঘ্রই তোমরা কৃতকার্য্য হইবে। আমরা যখন কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম, তখন কোন মূলধন পাই নাই। তবে আর্য্যগৌরবের স্মৃতিমাত্র উপলক্ষ করিয়া এতদূর হইয়াছে। আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা এই মূলধনকে পাথেয় করিয়া দিন দিন অধিকতর অগ্রসর হও এবং অনতিকালে গন্তব্য স্থানে উপনীত হও।

সন্তানগণ! অভিযানের আর একটি গূঢ় উদ্দেশ্য তোমাদিগকে না বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতে পারিতেছি না। আমাদের দেশের পতনের প্রধান কারণ স্বাতন্ত্র্য। স্বাতন্ত্র্য উন্নতির চরম অবস্থা ও অপব্যবহারে পতনের প্রধান সোপান। স্বানুবন্ধন না করিলে মানুষ কখন উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইতে পারে না। প্রতিপদে সমাজ যদি ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করেন, তাহা হইলে ব্যক্তিগত উন্নতি পদে পদে প্রতিহত হইবে। পরস্পর-সংঘর্ষে জাতীয় শক্তি বিনষ্ট হইবে! সমাজ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রতিকূলে দাঁড়াইলে যেমন সমাজের পতন অনিবার্য্য, সেইরূপ ব্যক্তিসমষ্টিরূপ সমাজের প্রত্যেক উপাদান যদি সামাজিক শাসনের প্রতিকূলে দাঁড়ায়, তাহা হইলে সমাজ-ধ্বংস বা সমাজ-বিপ্লব উপস্থিত হয়। সুতরাং উভয়েরই উভয়কে রক্ষা করিয়া চলা. ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন—এতদুভয়েরই পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। সমাজ যদি ব্যক্তিগত অস্তিত্বের প্রতিকূলে দাঁড়ান, তাহা হইলে তিনি আত্মধ্বংসকারী হইবেন। সেইরূপ ব্যক্তিগণ যদি স্বাতন্ত্রী হইয়া সামাজিক অস্তিত্বের প্রতিকূলে দাঁড়ান—তাহা হইলে বন্যজন্তুর অবস্থায় পরিণত হইবেন। আমরা সমাজের ধ্বংসকারী নহি, সুতরাং সমাজদ্রোহী হইব না। সমাজকে বজায় রাখিয়া ব্যক্তিগত উন্নতিসাধন করিব। আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষাফলে আমরা সকলেই স্বাতন্ত্রী হইতেছি। ইহা জাতীয় জীবন-গঠনের সম্পূর্ণ প্রতিকূল। সকলেই স্বাতন্ত্রী হইলে আমরা কোন সাধনাতেই কাহারও দ্বারা অভিনীত হইব না। সকলেই নেতা; নীত হইবার কেহ থাকিবে না। ভারতে এখন আদেশ-কর্ত্তার সংখ্যা এত বাড়িয়া উঠিয়াছে যে, কে আদেশ প্রতিপালন করিবে, খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সকলেই স্ব-স্ব-প্রধান। কেহই কাহারও কথা শুনে না, কেহই কাহাকে নেতা বলিয়া স্বীকার করে না, নেতা বলিয়া কাহাকে নির্ব্বাচন করিয়া লইতেও চাহে না। এরূপ অবস্থায় আমাদের কোন সমবেত কার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই। এ অবস্থায় থাকিলে আমাদের জাতীয় দুর্গতির দিনের অবসান হইবে না। আমাদের সম্মুখে ইংরাজ জাতির যে দৃষ্টান্ত বিদ্যমান রহিয়াছে—তাহা হইতে আমরা কি শিক্ষা পাইতে পারি? ইংরাজ জাতির প্রধান গুণ এই অধিনীতি ধর্ম্ম। তাঁহারা যেরূপ অধিনীত হইতে জানেন, বোধ হয়, আর কোন জাতি এরূপ অধিনীত হইতে জানেন না। ইউনাইটেড্ ষ্টেটসের অধিবাসিগণকেও আমরা এই শ্রেণীভুক্ত করিলাম। ব্রিটন্ ও ইউনাইটেড ষ্টেটসের উন্নতির মূল এই অধিনীতি। যাঁহাকে নেতা বলিয়া নির্ব্বাচন বা স্বীকার করিয়া লইলাম, তিনি যাহা বলিবেন, অবিতর্কে তাহা সম্পাদন করাই অধিনীতি ধর্ম্মের প্রধান প্রতিপাদ্য। গুরু বা নেতা যাহা বলিবেন, বিনা বিচারণায় তাহার অনুবর্ত্তন না করিলে কোন মহৎ কার্য্যসাধন হইতে পারে না। কারণে ক্ষিপ্রকার্য্য করণসময়ে অধিনীত ব্যক্তিমাত্রকে কার্য্যের দোষ গুণ বিচারণা দ্বারা বুঝাইয়া একমতে আনা অসম্ভব। সুতরাং তাহা করিলে সকল কর্ম্ম পণ্ড হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। ঐ যে রণে অজেয় শিখজাতি আজ মিসর, ব্রহ্ম, আফগান, সুদন জয় করিয়া বেড়াইতেছে, উহা এই অধিনীতি ধর্ম্মের জ্বলন্ত কীর্ত্তিস্তম্ভ। শিখগুরু মহামতি গুরুগোবিন্দ সিংহ উহাদিগকে এই অধিনীতি মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া গিয়াছিলেন বলিয়াই তাহারা

আজ রণে অজেয়—বীরত্বে অতুলনীয়। ইতালীর উদ্ধারকর্ত্তা ম্যাট্‌সিনি ও গ্যারিবল্‌ডী তাঁহাদিগের মন্ত্রশিষ্যগণকে এই অধিনীতিমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন বলিয়াই এত অল্প দিনে তাঁহারা সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহাদিগের মন্ত্রশিষ্যগণকে যথায় যাইতে বলিতেন, যমালয় হইলেও তাঁহারা বিনা বিচারণায় তথায় যাইতেন। তাঁহারা যাহা করিতে বলিতেন, মনুষ্যের অসাধ্য হইলেও তাহা তাঁহারা করিতে চেষ্টা করিতেন। এরূপ অধিনীতের সংখ্যা ভারতে যতই বাড়িবে, ততই ভারতের মঙ্গল। সন্তানগণ! তোমরা আজ সেই অধিনীতি ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলে। আজ হইতে তোমরা মনে মনে প্রতিজ্ঞা কর যে, তোমাদের নিজ নির্ব্বাচিত বা মহাজন নির্ব্বাচিত গুরুর বচন তোমরা কখন উল্লঙ্ঘন করিবে না। প্রতিজ্ঞা কর যে, গুরু তোমাদিগকে যমালয়ে লইয়া যাইতে চাহিলেও—তোমরা তথায় যাইতে পশ্চাৎপদ হইবে না। প্রতিজ্ঞা কর যে, তোমাদের গুরু তোমাদিগকে যাহা করিতে বলিবেন—প্রাণোৎসর্গেও তাহা তোমরা সাধন করিবে। এ প্রাণ যদি স্বদেশের ও স্বজাতির কার্য্যে ব্যয়িত না হইল, তাহা হইলে এ প্রাণে প্রয়োজন কি? এ জীবনের সার্থকতা কি? তোমাদিগের কঙ্কালময়ী জননী-মূর্ত্তি তোমাদিগকে সতত এই ব্রত স্মরণ করাইয়া দিবে। জননীর কঙ্কালময়ী প্রতিমূর্ত্তি তোমাদিগের নয়নসমক্ষে রহিয়াছে। যে অন্ধ, সেই কেবল তাহা দেখিতে পায় না। যত দিন জননীর এই মূর্ত্তি থাকিবে, তত দিন তোমাদিগকে এ ব্রত পালন করিতে হইবে। কিন্তু একটি কথা যেন তোমাদের মনে সর্ব্বদা থাকে। তোমাদের ব্রত শুদ্ধ সত্ত্বগুণ-মূলক। রজঃ ও তমোগুণের সহিত ইহার সম্বন্ধ নাই। ঔদ্ধত্য ও অবিনয় রজঃ ও তমোগুণের ধর্ম্ম। সুতরাং ঔদ্ধত্য ও অবিনয়কে তোমরা সর্ব্বথা পরিহার করিবে। গুরুর বচন হৃদয়ে ধারণ করিয়া—জননী ও ঈশ্বরকে মস্তকে রাখিয়া তোমরা—সন্তানদল—অকুতোভয়ে সংসারপথে অগ্রসর হও—এই আমাদের এই দীন-হীন সন্তানের একমাত্র বাসনা। যাহা আমি করিতে পারি নাই—তোমরা তাহা সাধন কর—এইমাত্র কামনা। স্বস্তি! স্বস্তি! স্বস্তি!

জাতীয় বিদ্বেষ

—+—

দেখিতে দেখিতে শ্বেতকৃষ্ণ বর্ণভেদ গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়া আসিল। ইলবার্টের বিলের পরিণাম আর কিছু হউক বা না হউক, ইহা নিশ্চয় যে, শ্বেত-কৃষ্ণে মিলন আর সম্ভব নহে। কলিকাতা হইতে আরম্ভ করিয়া তুমি যেখানে যাইবে, দেখিতে পাইবে যে, দেশীয় ও বৈদেশিকে বিদ্বেষভাব বর্ত্তমান। এক দিকে জেতা ইংরাজ নবীভূত জয়গর্ব্বে উদ্দীপিত হইয়া শৃগাল-কুকুরের ন্যায় দেশীয়দিগকে ঘৃণার সহিত দূরে নিক্ষেপ করিতেছেন; অন্য দিকে অসহায় দেশীয়গণ দলিত অভিমান-ভরে ভারতীয় ইংরাজদিগের প্রতি শাপাদি প্রয়োগ করিতেছেন। গর্ব্বিত ভারতীয় ইংরাজের ইচ্ছা, চিরদিন তাঁহাদিগকে দলিত করিয়া রাখেন, অপমানিত ও অবহেলিত দেশীয়গণের ইচ্ছা, তাঁহাদিগের অপহৃত স্বত্ব সকল পুনরধিকৃত করেন। দেশীয়গণ যত বিদ্যা-বুদ্ধি ও যোগ্যতায় উন্নত হইতেছেন, ততই ভারতীয় শ্বেতপুরুষেরা তাঁহাদিগের প্রতি দাসোচিত ব্যবহার করিতেছেন। যাহা হওয়া উচিত, ঠিক তাহার বিপরীত হইতেছে। যদি নিজের মান নিজে চাও, তবে পরের মান অগ্রে রক্ষা কর, দেশীয়গণকে সম্মান কর, দেখিবে, তাঁহারাও তোমার পূজা করিবেন। তাঁহাদিগের পদে পদে অপমানিত ও পদদলিত করিবে ত তাঁহারাও তোমায় অপমানিত ও পদদলিত করিবার জন্য সুবিধা খুঁজিয়া বেড়াইবেন। সুবিধা আজ না আসিতে পারে, কালও না আসিতে পারে; কিন্তু পরশ্ব যে আসিবে না, কে বলিতে পারে? 'চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ।'—সুখদুঃখ নিরন্তর চক্রের ন্যায় পরিবর্ত্তিত হইতেছে। আজ তোমার সুখ ও আমার দুঃখ দেখিতেছি, কিন্তু কাল হয় ত তোমার সুখের অবসানে আমার সুখের উদয় হইবে। নদীর এক দিক্ ভাঙ্গে, আর এক দিকে চড়া পড়ে। যে পাড় ভাঙ্গিতেছে, সেই পাড়ের লোকের দুঃখ দেখিয়া হাসিবার প্রয়োজন নাই। কারণ, আবার ওপার ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইবে। এক দিন ভারতীয় আর্য্যেরা উন্নত শৈলের উচ্চতম

শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন,—তখন ইংরাজ-সিংহ গর্ত্তে বাস করিতেন। কালচক্রের আবর্ত্তনে সেই আমরা নামিয়া পড়িয়াছিলাম। কিন্তু আবার আমরা উঠিতেছি তোমরা নামিতে আরম্ভ করিয়াছ। দিন আসিবে, যখন তোমরা নিম্নে নামিবে, আমরা উচ্চে উঠিব। যদি সে সময় হাসির জ্বালা সহিতে প্রস্তুত না থাক ত আমাদের অবস্থা দেখিয়া হাসিও না। কারণ, হাসিলে দ্বিগুণিত হাসির জ্বালা সহিতে হইবে। ঘৃণার মর্ম্মন্তুদ আঘাত সহিতে যদি প্রস্তুত না থাক ত ঘৃণা করিও না। জন্ম হইলেই মৃত্যু আছে, অভ্যুদয় হইলেই পতন আছে। সেইরূপ বিপরীত হইতে বিপরীত নিশ্চয় আসিবে! গ্রীস পড়িয়াছিল, আবার উঠিয়াছে। ইতালী দুইবার পড়িয়া দুইবার উঠিয়াছে। ভারত পড়িয়া আর কত দিন রবে? তুমিই বা উঠিয়া কতদিন থাকিবে? যে চক্রের উপরে তুমি রহিয়াছ, সেই চক্রের নিম্নে ভারত রহিয়াছে। সুতরাং ভারত উঠিলে তুমি নামিবে। তুমি নামিলে ভারত উঠিবে। উচ্চতম শিখরে তুমি উঠিয়াছ, নিম্নতম তলে ভারত রহিয়াছে। তোমার উন্নতির চরম হইয়াছে, ভারতের অধোগতির শেষ হইয়াছে। এখন দশা-পরিবর্ত্তনের সময় অবিরাম ভ্রাম্যমাণ চক্রের গতিরোধ করে, কাহার সাধ্য?

পতন যে আরম্ভ হইয়াছে, ইলবার্ট বিলের আন্দোলনে তাহা স্পষ্ট ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। "অতিদর্পে হতা লঙ্কা, অভিমানে চ কৌরবাঃ"—অতিদর্পে সোনার লঙ্কা ছারখার হইয়াছিল; অতি অভিমানে কুরুকুল ধ্বংস হইয়াছিল। আদর্শ-মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত দুই প্রকাণ্ড ঘটনা দ্বারা জগৎকে এই মহানীতি শিক্ষা দিয়াছে যে, অতি অভিমান ও অতিদর্প মৃত্যুর অপরিহার্য্য কারণ। অত্যাচারী দশানন বিজয়দর্পে অন্ধিতমতি হইয়া জগৎকে উদ্বেজিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। যখন পাপের ভরা পূর্ণ হইল, তখন দর্পহারী রামচন্দ্রের শাণিত শরে তাঁহার দশ মুণ্ড ধরাশায়ী হইল। মূর্ত্তিমান্ অভিমান কুরু-কুল-কলঙ্ক দুর্য্যোধন অভিমানে অন্ধ হইয়া ধর্ম্মের পদে পদাঘাত করিলেন, অমনি দর্পহারী নারায়ণের ষড়্‌যন্ত্রে কুরুকুল ধ্বংস হইল ভারতীয় শ্বেতপুরুষগণের দর্প ও অভিমান দুই-ই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, তাই অনুমান হয় পতন অদূরবর্ত্তী।

ইলবার্ট বিলের বাধাপ্রদান এই দর্প ও অভিমানের একটি বাহুবিস্ফুরণমাত্র। ১৮৩৩ সালের চার্টার বিধিতে ব্রিটিশ পার্লেমেণ্ট ভারতশাসননীতি পরিস্ফুটরূপে পরিব্যক্ত করিয়াছেন। তাহাতে লিখিত আছে, ভারতবাসী যোগ্যতা অনুসারে ভারতীয় সমস্ত উচ্চপদে অভিষিক্ত হইতে পারিবে। অধিক কি, গবর্ণর-জেনেরেল ও প্রধান সেনাপতির পদ পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের সম্মুখে উন্মুক্ত থাকিবে। ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টের এই উদারনীতি খ্যাপিত হইল মাত্র, কিন্তু একদিনও কার্য্যে পরিণত হইল না। কত কত বৎসর অতীত হইল, তথাপি তাহা কার্য্যে পরিণত হইবার কোনও চিহ্ন উপলক্ষিত হইল না। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একমাত্র লক্ষ্য, অর্থ-সংগ্রহ, তাঁহারা কেবল দুই হাতে সেই অর্থ-সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। ইংরাজজাতিসাধারণ তৎকালে ভারতবিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। এই জন্য শ্বেতবণিক্‌সম্প্রদায় ভারতে কি করিতেছেন না করিতেছেন, তদ্বিষয়ে কোন অনুসন্ধানও করিতেন না। ১৮৫৭।৫৮ সালের সিপাহী-বিদ্রোহ তাঁহাদিগের নিদ্রাভঙ্গ করিল। পদদলিত ফণীর ভীষণ গর্জ্জনে ব্রিটিশসিংহের হৃদয়ও ভয়ে বিকম্পিত হইল। ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ-শাসন-সৌধ নিমেষমধ্যে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আধিপত্য একেবারে বিদূরিত হইল। ইংরাজ তখন দেখিলেন, প্রজার হৃদয়ে পদাঘাত করিয়া রাজত্ব করা অসম্ভব। যিনি প্রজার মনোরঞ্জন করিতে পারেন, তিনিই রাজা। "রাজা প্রকৃতিরঞ্জনাৎ"—প্রকৃতি রঞ্জন-গুণবিশিষ্ট ব্যক্তিই রাজপদবাচ্য। যিনি প্রজারঞ্জনে অক্ষম, তাঁহার রাজসিংহাসনে আরোহণ বিড়ম্বনা মাত্র। তাঁহাকে জীবন-রক্ষার জন্য সর্ব্বদা রক্ষিপরিবেষ্টিত হইয়া থাকিতে হয়। আর্য্যরাজবৃন্দ প্রজার হৃদয় দ্বারা পরিরক্ষিত হইতেন। দেহরক্ষক সৈন্য (Body-guard) তাঁহাদিগের প্রয়োজন হইত না। রাজা দিলীপ যৎকালে সপত্নীক বশিষ্ঠাশ্রমে গমন করেন, তখন সারথি-মাত্র সঙ্গে করিয়া গমন করিয়াছিলেন। প্রজারা পথে ক্ষীর-সর-নবনীত লইয়া সারি গাঁথিয়া তাঁহার রথের গমনপথের দুই ধারে দাঁড়াইয়া থাকিত। এ দৃশ্যের নিকট রুসীয় সম্রাটের গমনপথের দৃশ্য তুলনা কর। দুই দিকে ক্রমাগত সৈন্যশ্রেণী বন্দুকে গুলী পুরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার

ভিতর দিয়া সম্রাট্ যাইতেছেন, তথাপি দেহ-রক্ষক সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া যাইতে হইতেছে। তাহাতেও নিস্তার নাই। মধ্যে মধ্যে পাতাল ভেদ করিয়া আগ্নেয় অস্ত্রের উদ্গীরণ হইতেছে। আহার নাই, নিদ্রা নাই, শান্তি নাই। এরূপ সম্রাটের জীবন অপেক্ষা দাসের জীবনও অধিকতর সুখময়। ভারতে ইংরাজগণের প্রায় তদ্রূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল। সিপাহী-বিদ্রোহের পূর্ব্বে এই অবস্থার চরমা কাষ্ঠা উপস্থিত হইয়াছিল। দুর্দ্দান্ত ড্যালহাউসী ভারতীয় সন্তানগণের বক্ষে পদাঘাত করিয়া ও প্রজাসাধারণের ক্রন্দন উপেক্ষা করিয়া বলে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। সামন্তবর্গের ও প্রজাগণের অন্তরে অসন্তোষ-বহ্নি প্রধূমিত হইতে লাগিল। ১৮৫৭-৫৮ খৃষ্টাব্দে সেই বহ্নি টোটারূপ সামান্য বায়ুর সংযোগে জ্বলজ্জাল হইয়া অসংখ্য শ্বেত-দেহকে ভস্মীভূত করিল। দয়াময়ী মহারাণী আপনার প্রজাগণের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া ভারতের রাজ্য-ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লেমেণ্ট যে উদারনীতি উদ্ঘাটিত করেন, তিনি বিশদরূপে সেই নীতি আবার উদ্ঘাটিত করিলেন। সেই ঘোষণাপত্রই ভারতের ম্যাগ নাচার্টা। সেই ঘোষণাপত্রে মহারাণী স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন যে, জাতি, বর্ণ ও ধর্ম্মভেদ ভুলিয়া কেবল যোগ্যতানুসারে ভারতের যাবতীয় উচ্চ-পদ পরিপূরিত করিবেন এবং জাতি, বর্ণ ও ধর্ম্মভেদে পদের ক্ষমতার তারতম্য করিবেন না। আজ মহামতি লর্ড রিপণ মহারাণীর বাক্যের যাথার্থ্য সম্পাদন করিবার নিমিত্ত ইলবার্ট বিল অবতারিত করিয়াছেন। ইলবার্ট বিল পাশ হইলে আপাততঃ অল্প-সংখ্যকমাত্র দেশীয় জজ ও মাজিষ্ট্রেট্ ইউরোপীয়গণের উপর বিচারাধিকার পাইবেন। ভারতীয় ইংরাজগণের তাহাও অসহনীয়। প্রায় সমস্ত কর্ম্মচারী ও অ-কর্ম্মচারী ইংরাজ একবাক্যে এই বিলের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইয়াছেন। দেশীয়গণকে তাঁহাদিগের প্রাকৃতিক স্বত্ব হইতে চিরদিন বঞ্চিত রাখিবার জন্য ভারতীয় ইংরাজেরা দলবদ্ধ হইয়াছেন। চতুর্দ্দিক্ হইতে চাঁদা সংগ্রহ হইতেছে। তাঁহারা এই ধনভাণ্ডারের নাম 'আত্মরক্ষক ধনভাণ্ডার' রাখিয়াছেন। অর্থাৎ এদেশে তাঁহাদিগের আধিপত্য চিরদিন রাখিবার জন্য যত কিছু ব্যয় সম্ভব, তাঁহারা এই ধনভাণ্ডার হইতে তাহার সর-বরাহ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। তাঁহারা পার্লেমেণ্টের,মহারাণীর ও ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের উদার নীতি বিফল করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ইহাঁরা মুক্তকণ্ঠে বলিতেছেন, 'আমরা বলে ভারত জয় করিয়াছি, বলেই চিরদিনই ভারতের রাজত্ব করিব—পরাজিত দাস-জাতিকে কখন সমান অধিকার দিব না। কখন তাহাদিগের বিচারাধীনে আসিব না।' এই যুদ্ধখ্যাপনে ভারতের অধিবাসিবৃন্দের হৃদয় বিকম্পিত হইয়াছে। তাঁহাদিগের হৃদয়ে চিরলালিত আশালতা অঙ্কুরে বিদলিত হইয়াছে। ইলবার্ট বিল তাঁহাদিগের অদৃষ্ট-পরীক্ষার নিকষ-স্বরূপ। যদি ইলবার্ট বিল পাশ হয়, তাহা হইলে তাঁহারা বুঝিবেন যে, তাঁহাদিগের সুখের দিন অদূরবর্ত্তী। যদি পাশ না হয় তাহা হইলে তাঁহারা বুঝিবেন যে, তাঁহাদিগের অদৃষ্টে এখনও অনেক দুঃখ আছে; বুঝিবেন, মহারাণীর ঘোষণায় ও পার্লেমেণ্টের বিধির কোনও মূল্য নাই;—বুঝিবেন, ভারত-গবর্ণ-মেণ্ট এক্ষণে বিষশূন্য ফণী; বুঝিবেন, ভারতের প্রকৃত রাজা এক্ষণে ভারতীয় কর্ম্মচারী ও অ-কর্ম্মচারী ইংরাজ; বুঝিবেন, ইংলণ্ডের উদারনীতিক মন্ত্রিগণের এক্ষণে কোনও ক্ষমতা নাই; বুঝিবেন, নিরস্ত্র ভারতের অধিবাসিবৃন্দকে এখন হইতে সশস্ত্র ভারতীয় ইংরাজগণ কর্ত্তৃক পদদলিত ও অপমানিত হইয়া অতি কষ্টে দুর্ভর জীবন অতিবাহিত করিতে হইবে; বুঝিবেন, সমবেত চেষ্টার বিরুদ্ধে সমবেত চেষ্টা ভিন্ন তাঁহাদিগের আর গত্যন্তর নাই। * * * *

যদি প্রজাবৎসলতা জাতীয় বিদ্বেষশূন্য স্নেহময়ী ভারতেশ্বরীর উপর ভারতীয় অধিবাসিবৃন্দের প্রগাঢ় রাজভক্তি না থাকিত, যদি পার্লেমেণ্টের উচ্চ মহৎ আশয়ের উপর ভারতীয় প্রজার অবিচলিত বিশ্বাস না রহিত, যদি মন্ত্রিপ্রবর মহামতি গ্লাডষ্টোন্ ও তদীয় উদারনীতিক সহচরবৃন্দের উপর ভারতবাসীর অচলা শ্রদ্ধা না থাকিত, ইংরাজ জাতিসাধারণের ন্যায়পরতার উপর ভারতবাসীর অটল বিশ্বাস না থাকিত এবং শেষতঃ যদি ভারতবন্ধু ধার্ম্মিকপ্রবর লর্ড রিপণের ও কিম্বারলেনের কর্ত্তব্যপরায়ণতার উপর ভারতবাসীর অচলা আস্থা না থাকিত, তাহা হইলে ইলবার্ট বিলের আন্দোলনজনিত অত্যাচারে এতদিন ভারত অগ্নিময় হইয়া উঠিত। ভারতবাসী অসহ্য গালি সহ্য করিতে-ছেন, অপমানের মর্ম্মবেদনায় দগ্ধ হইতেছেন, তথাপি হৃদয়ে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া

আছেন। তাঁহাদিগের দৃঢ়বিশ্বাস যে, ন্যায় হইবেই হইবে। মানুষের হাতে না হয়, ভগবানের হাতে হইবে। তাঁহাদিগের আরও বিশ্বাস, অধর্ম্মের জয় চিরদিন হইতে পারে না। সংক্ষেপতঃ তাঁহাদিগের বিশ্বাস—"যতে ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ"—যে দিকে ধর্ম্ম, সেই দিকেরই পরিণামে জয় হইবে। দুর্ব্বল ভারতবাসীর মনকে প্রবোধ দিবার এতদ্ভিন্ন আর কি আছে? *

জার্ম্মান্ বালিকাজীবন ও জার্ম্মান্ গৃহ

সমস্ত ইউরোপীয় জাতির মধ্যে জার্ম্মান্দিগের সহিতই আমাদিগের ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ। সুতরাং জার্ম্মান্দিগের রীতি-নীতি ও সামাজিক পদ্ধতি জানিতে আমাদিগের স্বভাবতঃ ঔৎসুক্য জন্মিয়া থাকে। সেই ঔৎসুক্য অংশতঃ চরিতার্থ করিবার জন্য অদ্য জার্ম্মান্ বালিকাজীবন ও জার্ম্মান্ গৃহ বিষয়ে আমরা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

বালিকা বিধাতার সৃষ্টির একটি অপূর্ব্ব দৃশ্য। ইহার সরল স্বচ্ছমুখকান্তিতে যেন স্বর্গীয় ভাব প্রতিবিম্বিত দেখা যায়। ইহাকে দেখিলে যেন স্বর্গের পরী বলিয়া বোধ হয়। ইহাকে দেখিলে দুর্ব্বৃত্তেরও মনে ধর্ম্মভাবের উদয় হয়। পিতার শ্রান্তিহারিণী, মাতার আনন্দদায়িনী, সমাজের বন্ধনস্বরূপিণী বালিকা যে দেশেরই হউক, সকলেরই স্নেহের সামগ্রী। ভারতীয় বালিকার অন্তর্জীবনের এখন ঘোর প্রলয়কাল উপস্থিত! এই সময়ে বৈদেশিক বালিকাগণের অন্তর্জীবনের চিত্র প্রচুরপরিমাণে আলোচনা করা ভারতীয় বালিকাগণের ও অভিভাবকগণের বিশেষ কর্ত্তব্য।

জার্ম্মানীতে প্রথম হইতেই বালিকাগণের চরিত্র গঠিত করিতে চেষ্টা করা হয়। তিন চারি বৎসর বয়সের তনয় সকালে বিকালে বালিকারা "শিশু-বিদ্যালয়ে" প্রেরিত হয় বটে. কিন্তু সে সকল বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য শুদ্ধ পুস্তক পাঠ করিতে শিখান নয়। এই সকল বিদ্যালয়ে এক এক জন শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত থাকেন। গ্রামের বা পল্লীর কোন সম্ভ্রান্তা প্রবীণা রমণী পতিবিয়োগে উপায়হীনা হইলে শিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করার অপমান হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকেই এই পদ প্রদত্ত হইয়া থাকে। এই প্রবীণা রমণী সর্ব্বপ্রথমে নানাপ্রকারে বালিকাদিগের চিত্ত আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করেন। তিনি তজ্জন্য বালিকাদিগের মনোরঞ্জনার্থ নানাবিধ খেলনা ও ক্রীড়া-পুত্তলী লইয়া তাহাদিগের সহিত খেলা করেন ও তাহারা নির্ব্বিবাদে যাহাতে পরস্পরের সহিত খেলা করে, কোমল শাসনে তাহার বন্দোবস্ত করেন। এইরূপে বালিকারা অল্পদিনের মধ্যেই বিদ্যালয়ের অবস্থাকে অতি সুখপ্রদ বলিয়া মনে করিতে থাকে। বাটী হইতে বিদ্যালয়ে গমন ও তথা হইতে বাটীতে প্রত্যাগমনও তাহাদিগের স্বাস্থ্যের পরিবর্দ্ধক। সুতরাং যাতায়াতেও তাহারা ক্রমে সুখানুভব করিতে থাকে। ক্রমে তাহাদিগের মন সম্পূর্ণ নিবিষ্ট হইলে ও স্মৃতিধারণক্ষম হইলে তাহাদিগকে বর্ণমালা পড়িতে ও ঈশ্বরস্তোত্র মুখস্থ করিতে শিখান হয়। ক্রমে তাহারা যেমন বড় হইতে থাকে, তাহারা পড়িতে, গান করিতে ও ছোট ছোট কবিতা আওড়াইতে ও তাহাদিগের ক্রীড়া-পুত্তলীদিগকে পরিচ্ছদ পরাইতে শিখে।

আমরা যে বালিকাগণের জীবনচরিত্র প্রদান করিতেছি, তাহারা মধ্যবিত্ত লোকের কন্যা। ব্যবহারাজীব, চিকিৎসক, সৈনিক, বণিক্ ও রাজকর্ম্মচারী—ইহারাই মধ্যশ্রেণী। বিশেষতঃ জার্ম্মানীতে। রাজকর্ম্মচারিগণের বেতন অতি অল্প। সেই আয়ে তাহাদিগের সুখস্বচ্ছন্দতা কথঞ্চিৎ চলে বটে, কিন্তু তাহাতে কোন প্রকার জাঁকজমক চলিতে পারে না। কন্যারা জাঁকজমক-প্রিয় হইলে, তাহাদিগের স্বামিগণ অসুখী হইবে বলিয়া তাহাদিগকে আশৈশব পরিমিতাচার শিক্ষা দেওয়া হয়। সুতরাং কন্যারা যতই কেন বিদ্যাবতী ও কলাবতী হউক না, সামান্য গৃহকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করা অপমানবোধ করে না। জননীর দৃষ্টান্ত তাহাদিগের প্রধান শিক্ষাস্থল। জননীকে তাহারা প্রথম প্রথম নানাপ্রকার বেশভূষায় চাক্‌চিক্যশালিনী ও বিবিধ কলায় অলঙ্কৃতা দেখিয়াছিল, কিন্তু

---

* এই প্রবন্ধটিতে তাৎকালিক আন্দোলনের ছবি প্রতিবিম্বিত আছে বলিয়া অসাময়িক হইলেও পরিগৃহীত হইল।

কালে তাঁহাকে পুরন্ধ্রী হইয়া—সকলের পরিচ্ছদ সীবন, রন্ধন ও পরিচ্ছদ-পাদুকাদির যথাস্থানে সন্নিবেশন প্রভৃতি গৃহকার্য্যই করিতে হইয়াছে, তাহাও তাহারা দেখিতে পায়। সুতরাং তাহারা সেই বালিকাবয়স হইতেই আপনাদিগের কর্ত্তব্যের জন্য প্রস্তত হইয়া থাকে।

জার্ম্মান্ জননীরা পরিচ্ছদ-গর্ব্বকে এত ঘৃণা করেন যে, পাছে কন্যাগণের অন্তরে সেই অশুভ ভাব বদ্ধমূল হয়, এই ভয়ে তাঁহারা তাহাদিগকে যথোচিত পরিচ্ছদে ভূষিত করেন না। ব্রিটন বালিকার তরঙ্গায়িত কেশপাশ স্ফীত কারুকর্ম্ম-সমুচ্ছ্বসিত পরিচ্ছদ জার্ম্মানীতে দেখিতে পাওয়া যায় না। জার্ম্মান্ বালিকাদিগের পরিচ্ছদ সাদাসিদা, কেশ পেটী করা এবং একটি রঞ্জিত ফিতায় আবদ্ধ দুইটি বেণী পৃষ্ঠদেশে লম্বমান। ছোট ছোট বালিকাগণের পরিচ্ছদ আগুলফলম্বিত, শীতকালে তাহাদিগের পাদদ্বয় কৃষ্ণবস্ত্রের পাজামায় আবৃত। জার্ম্মান জননীরা বালিকাগণের মুখকান্তি পরিপুষ্ট করিবার জন্য কোনও চেষ্টা করেন না; কেবল সূর্য্যালোকে যাহাতে সেই মুখ-কুমুদিনী ম্লান না হয়, এই জন্য ইহাকে মুখাবরণ দ্বারা আবৃত করিয়া রাখেন। কেশের প্রতি তাঁহাদিগের বিশেষ যত্ন। সবিশেষ পরিমার্জ্জনায় কেশ এরূপ চাকচিক্যশালী হয় যে, সময়ে সময়ে ইহাকে রেশম বলিয়া ভ্রম জন্মে এবং এরূপ পরিপুষ্ট হয় যে, অনেক স্থলে ইহাকে আগুলফাবলম্বী দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রাথমিক জ্ঞানোপার্জ্জন ও ধর্ম্মোপদেশ সমাপ্ত হইলে দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইহাকে "নাসচুল" বা সীবন-শিক্ষা মন্দিরে প্রেরণ করা হয়। তথায় সে বিবিধ সূচিকার্য্য, মোজাবুনন, কার্পেট বুনন প্রভৃতি কার্য্য সমাপ্ত করিয়া "হোহীরার টচ্টারস্কুল" অর্থাৎ শিক্ষা সমাপ্তকারী বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে। এখানে সে ফরাসীভাষা, উদ্ভিজ্জবিদ্যা এবং নৃত্য-গীত, চিত্রকর্ম্ম প্রভৃতি বিবিধ শিক্ষা করে।

জার্ম্মানীর ন্যায় আর কোন দেশেই যান্ত্রিক সঙ্গীতের এত চর্চ্চা দেখা যায় না। কি যুবা, কি বৃদ্ধ, কি ধনী, কি নির্ধন—সঙ্গীতের চর্চ্চা সকলেরই দুর্দ্দমনীয় ব্যসন ও বৃত্তি। ইহা ধনীর আমোদ-প্রমোদের মূল এবং দারিদ্রের জীবিকা; কারণ, সঙ্গীত-ব্যবসায়ীর জার্ম্মানীতে বিশেষ আদর। ইংলণ্ডে প্রত্যেক শুভকার্য্যে ভোজোৎসব, জার্ম্মানীতে প্রত্যেক শুভ কার্য্যে সঙ্গীতোৎসব। জার্ম্মানীতে রাজনীতির আলোচনা অপেক্ষা সঙ্গীতের চর্চ্চাই অধিকতর বলবতী। জার্ম্মানীতে স্বজাতি-প্রেম ও স্বদেশহিতৈষণা বক্তৃতায় বা তর্ক বিতর্কে পরিণত না হইয়া সঙ্গীতের সাহায্যে অভিগীত হইয়া লোকের চিত্ত হরণ করে।

জার্ম্মান্ মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকে শীকার করা, পাখী মারা বা মাছ ধরা ভালবাসেন না। তাঁহারা মছ ধরাকে অতিশয় নীচ কর্ম্ম বলিয়া মনে করেন।

বিবাহ বা খৃষ্টোৎসব ব্যতীত অন্য সময়ে স্ত্রী-পুরুষ সংমিশ্রণ প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সকল উৎসবকালে ভদ্রলোকে ও ভদ্র-মহিলারা একত্র মিশ্রিত হন বটে, কিন্তু সেও বিশেষ সংযমের সহিত। পুরুষেরা এক দিক বসিয়া পরস্পর কথোপকথন করেন এবং স্ত্রীলোকেরা দল বাঁধিয়া অন্যদিকে পরস্পর আলাপ করেন। বলের (Ball) সময় স্ত্রী-পুরুষে একত্র নৃত্য করেন বটে, কিন্তু বল সমাপ্ত হইলেই যুবতী নৃত্য-সহচরের নিকট বিদায় লইয়া জননীর নিকট গমন করেন। নৃত্য-ভঙ্গের পর নৃত্যসহচরের যুবতীর হস্তধারণে কোন অধিকার নাই। সেরূপ করিলে তাঁহাদিগের বিশেষ নিন্দা হইবে। নৃত্য-ভঙ্গের পর যুবতীর অঙ্গুলির অগ্রভাগ মাত্র স্পর্শকরণে পুরুষের অধিকার আছে। ইহাও অতিরিক্ত করিলে তাঁহাদিগের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইবে। নৃত্য-সহচর নৃত্য-ভঙ্গের পর এতদূর উদাসীনভাব ধারণ করিলে কিন্তু ইংলণ্ডীয় রমণী আপনাকে বিশেষ অপমানিতা মনে করেন।

জার্ম্মানীর লোকেরা অতি সামান্যভাবে বাস করে। তাহাদিগের অধিকাংশেরই স্বতন্ত্র গৃহ নাই। একটি বাটীর চারি পাঁচ তল। প্রত্যেক তলে এক একটি পরিবার বাস করে। বাটীগুলি প্রকাণ্ড এবং বাহির হইতে দেখিলে অতি সুন্দর; কিন্তু অভ্যন্তরভাগ অতি সামান্য। কার্পেটের প্রচুর ব্যবহার নাই, এই জন্য মেজে প্রায় বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত। গৃহাভ্যন্তরে ইংলণ্ডের ন্যায় অতিরঞ্জিত ও স্থূল মশারি এখানে দেখা যায় না। এখানকার মশারি অতি পাতলা ও তরল বর্ণের। জার্ম্মান্ গৃহসামগ্রীর মধ্যে মেহগ্নী কাষ্ঠের চেয়ার, টেবিল, খাট প্রভৃতিই বিশেষ দ্রষ্টব্য। জার্ম্মানেরা কোন

প্রকারে টেবিল সাজায় না। ইংরাজ-গৃহের আয়না একটি প্রধান ভূষণ, কিন্তু জার্ম্মান-গৃহে আয়না এত উচ্চে টাঙ্গান থাকে যে, পদাগ্রে দাঁড়াইয়াও তাহাতে মুখ দেখা যায় না। আইভীলতা ও পিয়ানো এই দুইটিই জার্ম্মানদিগের গৃহদেবতা। এই দুইয়ের নিকটেই সমস্ত জার্ম্মান্-পরিবার নতশির। অতি-শৈত্যনিবন্ধন আইভীলতা অতি কষ্টে জার্ম্মানীতে পরিবর্দ্ধিত হয়। এত দুষ্প্রাপ্য বলিয়াই ইহার এত আদর। যদি জানালায় টবে করিয়া একটি আইভী-লতা রাখিতে পারিলেন, তবেই একজন জার্ম্মান্ গর্ব্বে স্ফীত হইলেন।

অনেক সময় এরূপ ঘটে যে, অনেকগুলি সঙ্গীত-চর্চ্চাশীল পরিবার একত্র এক বাটীতে বাস করেন এবং তাঁহারা প্রত্যহ মিলিত হইয়া ঐকতানিক বাদ্যে নিমগ্ন হন। ইহার পরিণাম এই হয় যে, করলালিত শিশুরাও সঙ্গীতে আনন্দানুভব করিতে শিখে। অতি শৈশবেই তাহাদিগের কণ্ঠ সঙ্গীতানুকুল হইয়া উঠে; তাহারা সঙ্গীতের মুলসূত্র শিখিবার জন্য আপনারাই আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে।

বালিকার বয়স যখন পঞ্চদশ বা ষোড়শ, তখন তাহারা বিদ্যালয়ে পাঠ সমাপ্ত হয়। তখন তাহাকে ধর্ম্মোপদেশ সকল যত্নপূর্ব্বক শিখিতে হইবে, ধর্ম্মগ্রন্থ সকল পাঠ করিতে হইবে এবং সেই সকল স্বহস্তে নকল করিতে হইবে। এই সমস্ত বাধা-বিঘ্নের মধ্যেও তাহাকে এখন হইতে সমস্ত পরিবারের জন্য রন্ধনাদি করিতে হইবে। এ সকল সত্ত্বে তাহাকে নিয়ত সঙ্গীত-শাস্ত্রের আলোচনা করিতে হইবে।

জার্ম্মান্ বালিকারা রন্ধনবিদ্যায় বিশেষ পার-দর্শিনা। তাহারা উদ্ভিদ ও মৎস্য-মাংসের নানাবিধ পাক ও বিবিধ মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতে পারে। গ্রীষ্ম-কাল অতীত হইলে তাহারা উদ্ভিদ হইতে নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া রাখে। কারণ, শীতকালে জার্ম্মানীতে প্রায় কোন প্রকার উদ্ভিদ্ পাওয়া যায় না।

জার্ম্মান্-গৃহিণী স্বামী ও পুত্রকন্যাদিগের জন্য আহার প্রস্তুত করিতে সবিশেষ ব্যগ্র। এতদ্ভিন্ন পরিচ্ছদাদির তত্ত্বাবধারণ করা ও বাহিরে কন্যাগণের সঙ্গে গমন করা তাঁহার আর দুই প্রধান কার্য্য। কারণ, জার্ম্মানেরা অবিবাহিতা কন্যাকে একাকী কোন স্থানে যাইতে দেন না। শরৎকালে যখন শীত কালের জন্য খাদ্যদ্রব্য সকল সংগ্রহ করিয়া রাখা হয়, সে সময়ে কাজের এত ভিড় হয় যে, কোন কুল-কামিনী একাকী তাহা নির্ব্বাহ করিয়া উঠিতে পারেন না, সুতরাং তাঁহাকে প্রতিবেশিনীদিগের সাহায্য লইতে হয়। এইরূপ প্রত্যেক বাড়ীতে সকলে মিলিয়া কাজ করায় তাদৃশ সঙ্কটসময়েও লোকাভাব হয় না।

প্রতি বাড়ী বাড়ী যখন সকল প্রতিবেশিনীগণের সমাবেশ হয়, তখন কাফী দিয়া সকলের সম্মান বর্দ্ধন করা হয়। কাফী খাইতে খাইতে প্রতিবেশিনী-গণের পরের কথা লইয়া অনেক আন্দোলন হয়। "অমুকের স্বামী এত অল্প বেতন পায়, তথাপি তাহার স্ত্রীর পরিচ্ছদের ছটা দেখ. শুনিতে পাই, তাহার স্বামী নাকি ইংরাজের নিকট ঘুস খাইয়া তাহাদিগের নিকট আমাদিগের গৃহছিদ্র প্রকাশ করে। ইংলণ্ড হইতে মধ্যে মধ্যে প্রায়ই রেজেষ্টারী চিঠি তাহার নিকট আসে। তাহার মেয়েটি আবার অমুক সৈনিকপুরুষের দিকে কটাক্ষপাত করে। তাহার মাতাও শুনিতে পাই, সে বিষয়ে সাহায্য করে। এ বড় লজ্জার কথা! কিন্তু তাকে কে বিবাহ করবে, কারণ, সে রন্ধন-কার্য্য কিছুই জানে না! কেবল পিয়ানো বাজাতে পারে; সহজ সহজ গান করতে পারে এবং কদাকার প্রতিমূর্ত্তি আঁকতে পারে।" পুরন্ধ্রীগণ সমবেত হইলে এই সকল কথায় সময় কাটাইয়া থাকেন।

ষোড়শবর্ষীয়া বালিকা বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া সঙ্গীত-শাস্ত্রের অনুশীলনে এতদূর তন্ময় হইয়া যায় যে, তাহার বেশভূষা বা অঙ্গসংস্কারে কোন প্রকার আস্থা থাকে না। জার্ম্মান্ বালিকারা অপরিচিত সমাজের সহিত তত মিশামিশি করে না, এই জন্য অঙ্গের অসং-স্কারে বা বেশভূষার অভাবে তাহাদিগের বিশেষ ক্ষতি হয় না। কিন্তু তাহাদিগের জননী তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া মধ্যে মধ্যে অপরিচিত সমাজেও লইয়া যান। সেই সময় জননীই তাহাদিগের অঙ্গসংস্কার ও বেশভূষা করিয়া দেন। কিন্তু ইংলণ্ডের ন্যায় অবিবাহিতা কন্যাকে তরাইবার এখানে নানা প্রকার উপায় উদ্ভা-বিত হয় না।

জার্ম্মানীতে পাণিগ্রহণার্থী ব্যক্তির প্রথমেই কন্যাকে সম্বোধন করিবার অধিকার নাই। তাঁহাকে সর্ব্বপ্রথমে কন্যার পিতার নিকটে অনুমতি লইতে

হইবে। এই অনুমতি না পাইলে তাঁহার কন্যার গৃহে প্রবেশ করিবার অধিকার নাই। অভদ্রলোকে সময়ে সময়ে গুপ্তভাবে অভিভাবকের বিনা অনুমতিতে কন্যা-গৃহে প্রবেশ করিয়া কন্যার হৃদয় হরণ করিতে চেষ্টা করে বটে, কিন্তু তাহা সাধারণ নিয়ম নহে, সাধারণ নিয়মের ব্যভিচার মাত্র। কন্যাপ্রার্থী কন্যার পিতার নিকট অনুমতি পান বটে, কিন্তু তিনি নির্জ্জনে তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে পান না। অভিভাবকের নয়ন-সমক্ষে তাঁহাকে কন্যার সহিত কথোপকথন করিতে হইবে। কন্যা—পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নীগণের সহিত কিরূপ ব্যবহার করেন, তাহাও বসিয়া দেখিতে পারেন। পারিবারিক ব্যবহারে কন্যার স্বভাব-চরিত্র যতদূর জানা যাইতে পারে, তাহা জানিবার তাঁহার অধিকার আছে। জার্ম্মান্ বরেরা কন্যার বাহ্য-আকৃতিতে সম্পূর্ণ মুগ্ধ হন না। তাঁহারা কন্যার স্বভাব-চরিত্র সবিশেষ বিদিত না হইয়া কখনই বৈবাহিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ হন না। যদি জার্ম্মান্ বর তাঁহার প্রণয়পাত্রীকে অভীষ্ট গুণে বিভূষিতা দেখেন, তবেই তাঁহাকে বিবাহ করিতে প্রতিশ্রুত হন। তখন তাঁহারা পরস্পর অঙ্গুরীয়ক বিনিময় করেন এবং তাঁহারা যে পরস্পর প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হইয়াছেন, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদিগের বিদিতার্থ তাহা সংবাদপত্রে প্রচার করেন। যদি বর এই বিজ্ঞাপনের পরও সূক্ষ্ম অনুসন্ধানে কন্যাকে দুর্ব্বিনীতা বা বৃথা-গর্ব্বিতা বলিয়া জানিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি ভদ্রতার নিয়ম ভঙ্গ বা রাজবিধি উল্লঙ্ঘন না করিয়াও এই বিবাহ হইতে অপসৃত হইতে পারেন। কিন্তু বিজ্ঞাপন দেওয়ার পর বিবাহভঙ্গ অল্পই ঘটিয়া থাকে।

একবার বৈবাহিক জীবনে আবদ্ধ হইলে জার্ম্মান্ দম্পতী আমরণ অবিচ্ছিন্ন থাকেন। ইহার প্রধান কারণ—জার্ম্মানীতে জীবিকানির্ব্বাহের কঠোরতা। অনেককেই অতি সামান্য অবস্থা হইতে ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে উন্নতির উচ্চতম সোপানে উঠিতে হয়। অনেকে প্রথম অবস্থায় বেতনস্বরূপ এক কপর্দ্দকও প্রাপ্ত হন না। আবার যখন যুবক কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পাইতে আরম্ভ করেন, তখন যুবতীর পিতমাতা হয় ত সে সময় আর কন্যাকে কিছুই সাহায্য করিয়া উঠিতে পারেন না। জার্ম্মানীতে বিবাহের পর কন্যা যখন প্রথম স্বামিগৃহে গমন করেন, তখন পিতামাতা তাঁহাকে যে শুদ্ধ তাঁহার প্রয়োজনীয় পরিচ্ছদ প্রদান করিয়াই নিষ্কৃতি পান, এরূপ নহে, তাঁহাদিগকে কন্যার সংসার-করণোপযোগী যাবতীয় দ্রব্য-সামগ্রী প্রদান করিতে হয়; এতদ্ভিন্ন যতদিন জামাতা কিছু আনিতে না পারেন, ততদিন তাঁহাদিগকে জামাতা ও কন্যার ভরণ-পোষণের জন্য নিয়মিতরূপে কিছু কিছু অর্থসাহায্য করিতে হয়। এইরূপে কন্যার সহিত বরের আর একটি গুরুতর বন্ধন বাঁধিয়া যায়। এই সকল গুরুতর দায়িত্বের জন্যই জার্ম্মান্ জননীরা কন্যার বিবাহ দিবার নিমিত্ত নিতান্ত ব্যস্ত হন না। এই জন্যই তাঁহারা ইংরাজ জননীগণের ন্যায় কন্যাগণকে বিবাহ-যোগ্য বসন-ভূষণে সাজাইয়া প্রকাশ্য জনসমাজে অবতারিত করিতে চাহেন না। কারণ, অবস্থা ভাল না হইলে কন্যার বিবাহে পিতামাতাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইবে। যতদিন কন্যার বিবাহ না হয়, ততদিন পিতা যে অল্প বেতন পান, তাহাতেও তাঁহার খরচপত্র এক প্রকার চলিয়া যায়। কিন্তু কন্যার বিবাহ হইলে তাহাকে সসজ্জ করিয়া পতিগৃহে পাঠাইতে তাঁহার পূর্ব্বসঞ্চিত সমস্ত অর্থই বিনষ্ট হইয়া যায়।

জার্ম্মান্ যুবতীরাও বিবাহ করিতে নিতান্ত ব্যগ্র নহেন, কারণ, বৈবাহিক জীবনে তাঁহাদিগের সুখের বিশেষ আশা নাই। পিতার জীবদ্দশায় তাঁহারা পিতৃগৃহে যতদূর সুখিনী, পতিগৃহে পুত্রকন্যাবতী হইয়া অল্প আয়ে জীবন কাটাইতে তাঁহারা ততদূর সুখানুভব করেন না। পিতার মৃত্যু হইলেও জার্ম্মান্ বালিকারা আমাদের দেশের বালিকাগণের ন্যায় নিতান্ত নিরবলম্ব ও হতাশ হইয়া পড়েন না। তাঁহারা যেরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হন, তাহাতে পিতা ও স্বামীর বিরহেও কথঞ্চিৎ স্বাধীনভাবে জীবন কাটাইতে পারেন।

কন্যা—বিবাহরাত্রি উৎসবে কাটাইবার জন্য বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন সকলকেই নিমন্ত্রিত করেন। কন্যালয়ে বিবাহরাত্রিতে নৃত্য, গীত, বাদ্য ও অন্যান্য নানাবিধ আমোদ-প্রমোদ হইয়া থাকে। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিমাত্রই সেই সময়ের উপযোগী বিবিধ যৌতুক লইয়া কন্যালয়ে আসেন ও কন্যাকে উপহার প্রদান করেন। পরদিন "কোড নেপোলিয়ান্" অনুসারে নির্দ্দিষ্ট রাজ-কর্ম্মচারী দ্বারা বরকন্যা বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়েন, তাহার পর তাঁহারা আপন ইচ্ছানুসারে গীর্জ্জায় গিয়া ধর্ম্মযাজকের সম্মুখে শপথ গ্রহণ পূর্ব্বক বিবাহের শেষ অঙ্গ পূর্ণ করেন। বিবাহের পর দম্পতী কিছু দিনের জন্য দেশভ্রমণে নির্গত হন; কিন্তু অর্থাভাবে

সকলের অদৃষ্টে এ সুখ ঘটিয়া উঠে না। যাঁহারা দেশভ্রমণে নির্গত হইতে পারেন, তাঁহারা বিবাহের পরই একবরে "ঘরকন্না" আরম্ভ করেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জার্ম্মানীতে সকলেরই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বাটী নাই। সুতরাং নবদম্পতী বিবাহের পর কোন বাটীর দুই একটি কুঠারী ভাড়া লইয়া তাঁহাদিগের নূতন জীবন আরম্ভ করেন। ইহাতে তাঁহাদিগের কোন নিন্দা নাই, কারণ, ইহা তথাকার প্রথা। এই জন্যই জার্ম্মান্ যুবকেরা অল্প আয়ে কথঞ্চিৎ জীবনযাপন করিতে পারেন। নবোঢ়া ইংরাজ-যুবতীর ন্যায় জার্ম্মান্ যুবতীরা ততদূর ফুলবধূ নয়, এই জন্যও তাঁহাদিগের স্বামিগণের বৈবাহিক জীবন তত ক্লেশকর বোধ হয় না। ইংরাজরমণীরা বিবাহের পর বিলাস-দ্রব্যের জন্য স্বামীকে নানামতে জ্বালাতন করিয়া থাকেন। এই জন্য ইংলণ্ডে অনেকেই বৈবাহিক জীবন অপেক্ষা অনূঢ়াবস্থাকে অধিক আদর করিয়া থাকেন। কিন্তু জার্ম্মান্ যুবতীরা বৃথাগর্ব্বজনিত সেই সকল বিলাসিতা হইতে সম্পূর্ণ নির্ম্মুক্ত। এই জন্যই জার্ম্মানীতে অল্পবেতনের লোক বিবাহ করিতে ততদূর ভীত হয়েন না। এই জন্যই জার্ম্মানীতে ইংলণ্ডের ন্যায় অনূঢ় যুবকদের সংখ্যা অধিক নহে।

এই প্রস্তাবে জার্ম্মান্ জীবনের যে চিত্র প্রদান করা হইল, তাহা জার্ম্মান নগরসমূহের মধ্যশ্রেণীর লোকের। উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীতে স্থানে স্থানে এই চিত্রের বিপর্য্যয় দৃষ্ট হইতে পারে বটে, কিন্তু সাধারণতঃ ইহা জাতি-সাধারণেরই প্রতিবিম্ব। জার্ম্মান্দিগের সামাজিক অবস্থার সহিত প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যগণের সামাজিক অবস্থার অনেক সৌসাদৃশ্য আছে—এই প্রস্তাব পড়িলে সহজেই উপলব্ধি হইবে। জার্ম্মানেরা যে দেবসেনা-পতি স্কন্দ কর্ত্তৃক তাড়িত দৈত্যগণ—এই সমাজ সাম্য তাহার একটি আভ্যন্তরীণ প্রমাণ।

সম্পূর্ণ।

জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবন-বৃত্ত

প্রথম অধ্যায়

শৈশব ও তাৎকালিক শিক্ষা

—*—

জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল্ ১৮০৬ খৃষ্টাব্দের ২০য়ে মে লণ্ডন-নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ভারতবর্ষের অপূর্ব্ব ইতিহাস-লেখক জেম্‌স্ মিলের জ্যেষ্ঠ পুত্র। জেম্‌স্ মিল অ্যাঙ্গস্-কাউণ্টিস্থ নর্থওয়াটারব্রিজ গ্রামের কোন দরিদ্র কৃষিপণ্যোপজীবী ব্যক্তির পুত্র ছিলেন। জেম্‌স্ পিতৃদারিদ্র্য সত্ত্বেও কোন সম্ভ্রান্ত-মহিলার সাহায্যে বাল্যবয়সেই এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। তথায় কিছুদিন অধ্যয়নের পর তিনি ধর্ম্ম-প্রচারক হইবার অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহার মতের ঐক্য না হওয়ায় তিনি কখনই এ ব্যবসায়ের অনুবর্ত্তন করেন নাই। সুতরাং কিছুকাল তাঁহাকে স্কট্‌লণ্ডের নানা পরিবারে গৃহ-শিক্ষকের কার্য্য অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইয়াছিল। অবশেষে তিনি লণ্ডনে সংস্থিত হইয়া অবিশ্রান্ত গ্রন্থ-রচনায় নিমগ্ন হইলেন। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহার আর অন্য কোন প্রকার জীবনোপায় ছিল না। এই বৎসর তিনি ইণ্ডিয়া হাউসের সরকারী পরীক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। সুতরাং এই বৎসরেই তাঁহার দুর্ভাগ্যগ্রহ অস্তমিত হয় বলিতে হইবে।

১৮১৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে জেম্‌স্ মিলের জীবনে দুইটি প্রবল ঘটনা উপলক্ষিত হয়;—তাঁহার বিবাহ ও তাঁহার দারিদ্র্য। এরূপ দুরবস্থায় বিবাহ করা তাঁহার মতের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ছিল। তথাপি তিনি যে এরূপ অবস্থায় কেন পরিণয়-সূত্রে সংবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারা যায় না। যাহাই হউক, এরূপ দুরবস্থায় পরিণয়-সূত্রে সংবদ্ধ হওয়ায় তাঁহাকে যে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

স্ত্রীপুত্রাদির ভরণপোষণের জন্য তাঁহাকে নানা প্রকার ঋণে জড়ীভূত হইতে হইয়াছিল। পুস্তক লিখিয়া যাহা উপার্জ্জন করিতেন, তাহাতে তাঁহার কোন মতে চলিত না। তিনি যেরূপ স্বাধীন লেখক ছিলেন, তাহাতে লোকানুরঞ্জন জন্য নিজ মতের বিরুদ্ধে লেখা তাঁহার পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব হইত। নূতন নূতন মত প্রকাশ করাতে বরং তিনি লোকের অপ্রিয় হইয়া উঠিতেন। সুতরাং তদ্রচিত গ্রন্থ সকল লোকপ্রিয় না হওয়ায় তাঁহার আয়েরও অতিশয় সঙ্কীর্ণতা জন্মিল। কিন্তু তিনি ইহাতেও একদিনের জন্য পরিশ্রমবিমুখ বা হতাশ হন নাই। তিনি হতশ্রদ্ধ হইয়া কখন কোন কার্য্য করিতেন না; কখন আরব্ধ কার্য্য অসম্পূর্ণ রাখিতেন না। যে কার্য্যে যে পরিমাণ সময় ও মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক, তিনি কখন তদ্বিষয়ে ঔদাসীন্য করিতেন না। এইরূপ অসাধারণ অধ্যবসায়বলেই তিনি এতাদৃশী বিঘ্নপরম্পরা অতিক্রম করিয়া দশ বৎসরে তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ "ভারতবর্ষের ইতিহাস" নামক গ্রন্থের কল্পনা, আরম্ভ ও সমাপনে কৃতকার্য্য হইলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এরূপ অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি নিজ সন্তানসন্ততিগণকে স্বয়ং শিক্ষা দিতেন। প্রত্যেক দিবসের অধিক সময় তাঁহার এই কার্য্যে পর্য্যবসিত হইত। বিশেষতঃ যেরূপ পরিশ্রম, যত্ন ও অধ্যবসায়ের সহিত তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের উচ্চশিক্ষাবিধান করিয়াছিলেন, এরূপ পরিশ্রম, যত্ন, ও অধ্যবসায়

কোন ব্যক্তির শিক্ষার জন্য কখন ব্যয়িত হইয়াছে কি না সন্দেহ।

জেম্‌স বৃথা সময় নষ্ট করা অধর্ম্ম বলিয়া জানিতেন। তিনি যে কেবল স্বয়ং সেই ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন, এরূপ নহে,—জ্যেষ্ঠ পুত্র জনকেও তিনি সেই ধর্ম্মে ও তদনুষ্ঠানে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তিনি তিন বৎসর বয়সে জনকে গ্রীক্ ভাষা শিখাইতে আরম্ভ করেন। সহজে কণ্ঠস্থ হইবে বলিয়া তিনি স্বহস্তে পুত্রের জন্য ইংরাজী প্রতিশব্দের সহিত প্রচলিত গ্রীক শব্দগুলির একটি তালিকা লিখিয়া দিয়াছিলেন। তিনি পুত্রকে গ্রীক্ ব্যাকরণের শব্দ ও ধাতুর রূপ করিতে শিখাইয়াই একবারে গ্রীক্ ভাষার অনুবাদে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। পুত্র পিতৃযত্নে তৃতীয় বৎসর বয়সে ইসফ্‌লিখিত কথামালা আরম্ভ করিয়া অষ্টম বৎসর বয়সে হিরোডোটস্, আইসোক্রোটিস্, প্লেটো প্রভৃতি বিখ্যাতনামা গ্রীক্ গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করিয়া তাহাতে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। এই অষ্টম বৎসর বয়সে তিনি প্রথম লাটিন পড়িতে আরম্ভ করেন। জেম্‌স্ মিল্ যে পাঠ বিশেষ যত্নে পুত্রের অধিগম্য হইতে পারিত, পুত্রকে কেবল সেই পাঠ দিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন, এরূপ নহে, কিন্তু তিনি পুত্রের প্রতিভা উদ্দীপ্ত করিবার জন্য তাঁহাকে সচরাচর এমন পাঠও দিতেন, যাহা বিশেষ যত্নেও তাঁহার অধিগম্য হইবার নহে। জেম্‌স্ মিল্ পুত্রের শিক্ষার জন্য কত দূর ব্যস্ত ছিলেন, তাহা এই বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, তিনি পুত্রকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও নয়নের অন্তরাল করিতেন না। যে গৃহে ও যে টেবিলে তিনি স্বয়ং লিখিতেন, সেই গৃহে ও সেই টেবিলের একপার্শ্বে পুত্রও বসিয়া পাঠ অভ্যাস করিতেন। জেম্‌স্ যখন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন, তখনও তিনি পুত্রকৃত প্রশ্ন সকলের উত্তরদানে বিরক্ত হইতেন না। মনঃসংযোগের এরূপ অবিচ্ছিন্ন বিঘ্ন সত্ত্বেও জেম্‌স্ তাঁহার ভারতবর্ষের ইতিহাসের কয় খণ্ডের এবং অন্যান্য অনেক গ্রন্থের রচনা সমাপ্ত করিয়াছিলেন।

মিল্ গ্রীক ভাষার সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিদিন সায়ংকালে পিতার নিকট গণিতশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। গণিতে তাঁহার স্বভাবতই বিরক্তি ছিল। তিনি গ্রীক্ ভাষা ও গণিতশাস্ত্র ব্যতীতও প্রতিদিন ভ্রমণকালে পিতার নিকট মুখে মুখে অনেক বিষয় শিক্ষা করিতেন। জেম্‌স্ মিলের শরীর নিতান্ত অসুস্থ ছিল। এই জন্য তিনি প্রাতরাশের * পূর্ব্বে প্রতিদিন নিয়মিতরূপে ভ্রমণে বহির্গত হইতেন। পুত্রও পিতার অনুবর্ত্তন করিতেন এবং পূর্ব্বদিন স্বয়ং যে পুস্তক পাঠ করিতেন, পরদিন প্রাতঃকালে ভ্রমণের সময় সেই সকল পুস্তকের সারাংশ পিতার নিকট বর্ণন করিতেন। এইরূপে তিনি এই অত্যল্প সময়ের মধ্যেই রবার্টসন, হিউম, গিবন, ওয়াটসন, হুক, রোলিন, প্লাটার্ক, বর্ণেট্ প্রভৃতি বিখ্যাতনামা ঐতিহাসিক গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থ সকল পাঠ করিয়া ফেলিলেন। মিল্ এইরূপে যৎকালে পিতার নিকট মুখে মুখে স্বপঠিত গ্রন্থ সকলের বর্ণন করিতেন, সেই সময় পিতৃদেব তাঁহাকে রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, মনোবিজ্ঞান ও সভ্যতা প্রভৃতি নানা বিষয়ে উপদেশ দিতেন; এবং প্রতিদিন যাহা উপদেশ দিতেন, পরদিন পুত্রকে নিজের ভাষায় সেইগুলি বলিতে বলিতেন। যে সকল পুস্তক † স্বয়ং পাঠ করিলে পুত্রের বিরক্তিকর হইবার সম্ভাবনা, পিতা ভ্রমণকালে পুত্রের নিকট সেই সকল পুস্তকের বিষয় এরূপ হৃদয়গ্রাহী করিয়া বর্ণন করিতেন যে, পুত্র তাহার পর সেই সকল পুস্তক স্বয়ং পাঠ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেন না। যাঁহারা বিপদে পড়িয়াও অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও অবিচলিত অধ্যবসায় প্রদর্শন করিয়াছেন,—যাঁহারা বিপদে পড়িয়া তাহাতে অভিভূত না হইয়া তদতিক্রমপূর্ব্বক উন্নতিমার্গে অগ্রসর হইয়াছেন,—যে সকল পুস্তকে ‡ এরূপ পরমারাধ্য ব্যক্তিদিগের

---

* Break-fast.

† Millar's Historical View of the English Government;

Mosheim's Ecclesiastical History;

Mc Crie's Life of John Knox;

Sewell and Rutty's Histories of the Quakers.

† Beaver's African Memoranda; Collin's Account of the First Settlement of the New South Wales;

‡ Anson"s Voyages;

বিষয় বর্ণিত আছে, জেমস্ পুত্রের হস্তে এরূপ পুস্তক সমর্পণ করিতে বড় ভালবাসিতেন। আমোদকর পুস্তক সকল বাল্য-শিক্ষা হইতে সম্পূর্ণরূপে দূরীকৃত করা তাঁহর অভিপ্রেত ছিল না। কিন্তু এরূপ পুস্তক সর্ব্বদা পড়িলে, পাছে মনোবৃত্তি নিস্তেজ হইয়া কল্পনা-শক্তির অনৈসর্গিক পরিপুষ্টি হয়, এই জন্য তিনি পুত্রকে সে সকল পুস্তক সর্ব্বদা পড়িতে দিতেন না। সেই আমোদকর পুস্তকগুলির * মধ্যে রবিনসন ক্রুসোই মিলের অতিশয় আদরের জিনিস ছিল। ইহা বাল্য-সহচরের ন্যায় শৈশবে সতত তাঁহার অনুবর্ত্তন করিত।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, মিল্ অষ্টম বৎসর বয়সে লাটিন প'ড়তে আরম্ভ করেন। তিনি পিতার নিকট প্রতিদিন যতটুকু লাটিন শিখিতেন, কনিষ্ঠ ভ্রাতা-ভগিনীদিগকে প্রতিদিন ততটুকু লাটিন শিখাইতেন। এইরূপ শিক্ষকতার কার্য্যে তাঁহার অমূল্য সময়ের অধিকাংশ বৃথা নষ্ট হইত। এই জন্যই এরূপ কার্য্যভার কখনই তাঁহার প্রীতিকর হয় নাই। বিশেষতঃ তাঁহার শিশু ছাত্র ও ছাত্রীদিগকে তিনি যে সকল বিষয় শিক্ষা দিতেন, তাহাদিগকে আবার পিতৃসমীপে সেই সকল বিষয়ের পরীক্ষা দিতে হইত। তাহাদিগের পরীক্ষার শুভাশুভ ফলের জন্য তাঁহা.কই পিতার নিকট দায়ী থাকিতে হইত। সুতরাং এ গুরুক.র্য্যভার তাঁহার আরও বিরক্তির কারণ হইয়া উঠিল। কিন্তু ইহাতে তাঁহার একটি মহৎ উপকার হইয়াছিল। অন্যকে বুঝাইতে গিয়া তাঁহার মনের ভাব সকল যাহা অস্পষ্ট ছিল, তাহা স্পষ্ট হইয়া আসিল; এবং যে যে বিষয়ে তিনি শিক্ষা দিতেন, সেই সেই বিষয় তাঁহার মনে চির-অঙ্কিত হইয়া রহিল।

মিল্ যে বৎসরে লাটিন পড়িতে আরম্ভ করেন, সেই বৎসরেই গ্রীক্ কবিদিগের কাব্যকাননে প্রথম প্রবিষ্ট হন। মহাকবি হোমর-প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ "ইলিয়ড" গ্রন্থই সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার চিত্তাকর্ষণ করে। তিনি মূল "ইলিয়ড" পড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন, এমন সময়ে পিতা তাঁহার হস্তে পোপ-কৃত "ইলিয়ডের" অনুবাদ প্রদান করেন। মিল্ পোপকৃত ইলিয়ডের অনুবাদে এতদূর অনুরক্ত হইয়াছিলেন যে, উপর্য্যুপরি অন্যূন ত্রিশবার ইহার আদ্যন্ত পাঠ করেন। ইহার অব্যবহিত পরেই তিনি পিতার নিকট প্রথমে বিখ্যাত ইউক্লীড-প্রণীত ক্ষেত্রতত্ত্ব ও পরে বীজ গণিত পড়িতে আরম্ভ করেন। অষ্টম বৎসর বয়সে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ বৎসর বয়সের মধ্যে মিল্ লাটিন্ ও গ্রীক্ ভাষায় যে গ্রন্থরাশি *

Hawkesworth's Voyages round the World

Robinson Crusoe ;
Arabian Nights ;
Crzotte's Arabian Tales ;
Don Quixote ;
Miss Edgeworth's popular tales
Brook's fool of duality.

---

* IN LATIN—

1 Virgil's Bucolics and the first six books of his Æuiad ;
2 All Horace, except the Epodes ;
3 The Fables of Phaedius ;
4 The first five books of Livy ;
5 All Sallust ;
6 A considerable part of Ovid's Metamorphoses ;
7 Some plays of Terence ;
8 Two or three books of Lucritius ;
9 Several of the Orations of Cicero, and of his writings on oratory, also his letters to Atticus ;

IN GREEK ;—

1 The whole of Illiad and Odyssey ;
2 One or two plays of Sophocles, Euripides and Aristophanes ;
3 All Thucydides ;
4 The Hellenics of Xenophon ;
5 A great part of Demosthenes; Æschines, and Lysias ;
6 Theocritus ;
7 Anacreon ;
8 A little of Dionysius ;
9 Several books of Polybius ; and
10 Aristotel's Rhetoric.

পাঠ করিয়াছিলেন, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল। এই তালিকা দর্শন করিলে আপাততঃ বোধ হইবে, যেন মিল্ দৈবশক্তি সম্পন্ন ছিলেন। কিন্তু তাহা নহে—তিনি স্বয়ং বলিয়াছিলেন যে, অসাধারণ অধ্যবসায় ও এরূপ অনুকূল ঘটনাবলীর বলে যে কোন ব্যক্তিই এতাদৃশী কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারেন।

এই সময়ের মধ্যেই মিল্ ক্ষেত্রতত্ত্ব ও বীজগণিত সমাপ্ত করেন। ডিফারেন্সল্ ক্যালকুলস্ ও তৎসদৃশ উচ্চ অঙ্কশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ অধিকার জন্মে নাই। জেমস্ স্বয়ং বাল্যাভ্যস্ত এই দুরূহ বিষয় সকল বিস্মৃত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার এরূপ অবকাশও ছিল না যে, সেই সকল বিষয়ের পুনরালোচনা করেন। সুতরাং এই দুরূহ বিষয় সকলে পুত্রকে শিক্ষা দেন, তাঁহার এরূপ সামর্থ্য ছিল না। এই দুরূহ বিষয়ে পুস্তক বই মিলের অন্য অবলম্বন ছিল না। সুতরাং তিনি এ সকল বিষয়ে পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়া পিতাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিতেন না। ইতিহাস-সাধারণের, বিশেষতঃ পুরাবৃত্তের দিকে মিলের বলবতী প্রবণতা ছিল। মিট্‌ফোর্ডের গ্রীস এবং হুক্ ও ফর্গুসনের রোম,—সতত তাঁহার চিত্তবিনোদন করিত। তিনি পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাস পড়িতে এত ভালবাসিতেন ও তাহা এত পড়িতেন যে, সকল দেশেরই পুরাবৃত্ত তাঁহার এক প্রকার কণ্ঠস্থ ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি নব্য ইতিহাস বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন না। নব্য-ইতিহাস সম্বন্ধে ডিনেমারদিগের স্বাধীনতাযুদ্ধ প্রভৃতি বিশ্লিষ্ট বিষয় ভিন্ন আর কিছুই পড়িতেন না। তিনি বাল্যকাল হইতেই ইতিহাস লিখিতে বড় ভালবাসিতেন। তিনি সেই নবীন বয়সে "রোমের ইতিহাস," "পৃথিবীর সংক্ষিপ্ত পুরাবৃত্ত" ও "হলণ্ডের ইতিহাস" নামক গ্রন্থত্রয় রচনা করেন এবং একাদশ বা দ্বাদশ বৎসর বয়সের সময় হুক্, লিবি, ডাওনিসিয়স প্রভৃতি পুরাবিদ্‌দিগের গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া "রোমের শাসনপ্রণালী" নামে একখানি উচ্চ অঙ্গের ইতিহাস গ্রন্থ-প্রণয়ন করেন। ইহাতে তিনি রোমের পেট্রিসায় ও প্লীবীয়দিগের পরস্পর বিবাদ-বর্ণনোপলক্ষে রোমীয় সাধারণতন্ত্রের পক্ষসমর্থন করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই সকল বাল্য-রচনার প্রতি তাঁহার সবিশেষ শ্রদ্ধা না থাকায় তিনি কিছুদিন পরে এ সমস্তই নষ্ট করিয়া ফেলেন।

এই কিশোরবয়সে ঐতিহাসিক গ্রন্থের ন্যায় কবিতামালাও তাঁহার লেখনী হইতে প্রসূত হইত তবে এই দুয়ের প্রভেদ এই যে, প্রথমটি স্বাভিলষিত বিষয়, আর শেষোক্তটি আদিষ্ট বিষয়। ইতিহাস-রচনায় পিতা তাঁহাকে কখনই উত্তেজিত করিতেন না। কারণ, তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, ইতিহাস লিখিয়া কেহ কখন সাধারণের প্রীতিভাজন হইতে পারেন না। কিন্তু পুত্র সাধারণের প্রীতিভাজন হন, ইহা তাঁহার সম্পূর্ণ ইচ্ছা ছিল।—কোন্ পিতাই না ইহা ইচ্ছা করেন? —তিনি জানিতেন, পুত্র সুকবি হইলে তাঁহার সেই ইচ্ছা ফলবতী হইবে। এই জন্য তিনি পুত্রকে সততই কবিতারচনায় প্রবর্ত্তিত করিতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ পুত্র স্বাভাবিক কবিত্বশক্তিসম্পন্ন ছিলেন না। এই জন্য পিতার উত্তেজনা তাঁহার পক্ষে কেবল ক্লেশ-কর হইয়া উঠিত, এবং তদ্রচিত কষ্টকল্পিত কবিতা কেবল ছন্দোময়ী রচনায় পরিণত হইত মাত্র। পিতার উত্তেজনার আর একটি কারণ এই, তিনি জানিতেন, অনেক বিষয় গদ্য অপেক্ষা পদ্যে লিখিলে অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হয়। লেখকের মত সর্ব্বপ্রচারী করিতে হইলে পদ্যই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। কিন্তু পিতার সেই সমস্ত আশাই বিফল হইল—পুত্র কিছুতেই সুকবি হইতে পারিলেন না। পিতা পুত্রের হস্তে হোমর, হোরেস, সেক্সপিয়র, মিল্টন, টমসন্, পোপ, গোল্ড-স্মিথ, বরন্, গ্রে, কাউপার, বিয়েটি, স্পেন্সার, স্কট, ড্রাইডেন্ প্রভৃতি বিখ্যাতনামা কবিদিগের গ্রন্থ সকল প্রদান করিলেন। পুত্র সকলগুলিই পড়িলেন, কোন কোন খানির রসগ্রহণও করিলেন, কোন কোন খানির অনুকরণে কবিতা লিখিতেও চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাঁহার ছন্দোময়ী রচনা কিছুতেই কবিতা হইল না। হইবেই বা কেন? অনুকরণে কবি হইলে এতদিন জগৎ কবিময় হইয়া উঠিত।

শৈশবের এই সময়ে পরীক্ষাবিষয়ক বিজ্ঞান * তাঁহার আর একটি প্রমোদস্থল ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ তিনি এরূপ দুরূহ বিজ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনা পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে করিতে পারেন নাই। তিনি কেবল পুস্তকে সেই সকল বিষয় পাঠ করিতেন মাত্র। কিন্তু কখন পরীক্ষা দ্বারা সেই সকল প্রতিপন্ন করিয়া লন নাই। জয়েস্‌লিখিত "বৈজ্ঞানিক আলোচনা" এবং পিতৃবন্ধু ডাক্তার টমসন্-লিখিত "রাসায়নিক

---

* Experimental Science,

গ্রন্থ" এই দুইখানিই বিশেষরূপে তাঁহার হৃদয়াকর্ষণ করিয়াছিল।

এই স্থানেই তাঁহার শৈশব-শিক্ষা সমাপ্ত হইল। তিনি দ্বাদশবর্ষ অতিক্রম করিয়া এক্ষণে শৈশব হইতে বাল্যে পদার্পণ করিলেন এবং বয়সের আধিক্যের সহিত পাঠনার বিষয় সকলও উচ্চতর হইতে লাগিল। চিন্তাশক্তির সাহায্য ও বিনিয়োজন, এক্ষণে আর পাঠ্য বিষয় সকলের উদ্দেশ্য না হইয়া চিন্তা সকলই উহাদের উদ্দেশ্য হইল। তিনি এক্ষণে ন্যায়শাস্ত্রের * আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ন্যায়সম্বন্ধীয় তাঁহার প্রথম পাঠ্য পুস্তক অর্গেনন। † পিতৃদেব পুত্রকে অর্গেননের সঙ্গে সঙ্গে লাটিন নৈয়ায়িকদিগের সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করিতে আদেশ করেন। মিল সেইগুলি পড়িয়া তাহাদিগের স্থূল স্থূল বৃত্তান্ত ভ্রমণকালে পিতার নিকট বলিতেন। অনন্তর তিনি বিখ্যাত দার্শনিক হবস-লিখিত একখানি উচ্চ অঙ্গের ন্যায়গ্রন্থ ‡ পড়িতে আরম্ভ করেন। মিলের পিতা পুত্রকে যাহা কিছু পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেন, তাহার উপযোগিতা যতদূর সম্ভব বুঝাইতে ও অনুভব করাইতে চেষ্টা করিতেন, এবং যাহাতে মিল স্বতই বুঝিতে পারেন, তজ্জন্য তাঁহাকে সর্ব্বপ্রথমে চেষ্টা করিতে বলিতেন। ন্যায়শাস্ত্রের উপযোগিতা বিষয়ে মিল্ বলিয়াছেন যে, তিনি যাহা পড়িয়াছিলেন, কিছুতেই ইহার ন্যায় চিন্তাশক্তির উত্তেজনা হয় নাই। তিনি প্রথমতঃ যুক্তি ও মীমাংসা বিশ্লেষণ করিতে শিখিলেন, পরে প্রদত্ত যুক্তি হইতেই সেই মীমাংসায় উপনীত হওয়া যাইতে পারে কি না, তাহার বিচার করিতে শিখিলেন। এইরূপ আলোচনায় তাঁহার মন যে অভ্যাস প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা হইতেই ভবিষ্যতে তাঁহার চিন্তাশক্তির এত দূর প্রখরতা ও ন্যায়ানুসারিতা জন্মে। মিল্ বলেন যে, অঙ্কশাস্ত্রের আলোচনা-সম্ভূত নির্ব্বিকল্প ভাবও ইহার নিকট পরাস্ত হয়। তিনি আরও বলেন, যে কেহ দার্শনিক হইতে ইচ্ছা করেন, বাল্যকালেই অগম-ন্যায়শাস্ত্রের ¶ আলোচনায় অভ্যস্ত হওয়া তাঁহার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। অনেকে বলিতে পারেন, বহুদর্শন ভিন্ন ন্যায়ের আলোচনা সম্ভবপর নয়, সুতরাং এরূপ গুরুতর বিষয় বাল্যকালের উপযোগী হইতে পারে না। কিন্তু সেটি ভ্রম। বহুদর্শন আনুমানিক ন্যায়শাস্ত্রের পক্ষেই প্রয়োজনীয়, পূর্ব্বোক্ত ন্যায়শাস্ত্রে ইহার আবশ্যকতা দৃষ্ট হয় না। অঙ্কশাস্ত্রের ন্যায় উহা অন্যের সাহায্যনিরপেক্ষ! জটিল ও পরস্পরবিরোধী ভাব সকল বিশ্লিষ্ট করিয়া উহাদের দোষ সকল বুঝিতে ও বুঝাইতে পারাই ইহার বিষয়। বাল্য হইতে এরূপ আলোচনায় মন যত অভ্যস্ত হইবে, ততই চিন্তাশক্তি ন্যায়মার্গানুসারিণী হইবে। এই আলোচনার অভাবে অনেক বিচক্ষণ লোকেও সময়ে সময়ে বিষম ভ্রমে পতিত হন। তাঁহারা কোন মতখণ্ডন করিতে হইলেই যতদূর সাধ্য করায়ত্ত যুক্তি দ্বারা বিপরীত মত সমর্থন করিতে যান, কিন্তু সেই মতের সমর্থক যুক্তি সকল হইতেই যে সেই মতের খণ্ডন হইতে পারে, সে বিষয় ভ্রমেও ভাবেন না। ইহাতে দুইটি দোষ ঘটে। প্রথম—সহজ উপায় পরিত্যাগ করিয়া দুরূহ উপায় অবলম্বন। দ্বিতীয়—বিপরীত মতসমর্থনে সফল হইলেও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল হয় না, অর্থাৎ তাহা দ্বারা পূর্ব্বোক্ত মতের অযৌক্তিকতা সপ্রমাণ হয় না।

মিল্ স্বভাবতই চিন্তাপ্রবণ ছিলেন, এই জন্য ন্যায়শাস্ত্র তাঁহার অতিশয় ভাল লাগিত। ন্যায়শাস্ত্রের অনুশীলনে তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি অতিশয় পরিমার্জ্জিত হইয়া উঠিল। ন্যায়ের সাহায্যে তাঁহার স্বাভাবিকী চিন্তা-প্রবণতা অধিকতর পরিবর্দ্ধিত হইল। তিনি এক্ষণে গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থ পাঠ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন না। তাঁহাদিগের যুক্তির উৎকর্ষাপকর্ষের বিচার করিতেন এবং প্রয়োজন হইলে তাঁহাদিগের মতখণ্ডন করিয়া তত্তৎস্থলে স্বমত সংস্থাপন করিতেন।

এই সময়েই তিনি সুবিখ্যাত গ্রীকবক্তা ডিমস্থিনিসের "ফিলিপিকস্" নামে বিখ্যাত বক্তৃতাগুলি পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। ডিমস্থিনিসের বক্তৃতা পাঠ করিয়া মিল্ এথিনীয় রীতি-নীতি, সমাজপদ্ধতি ও রাজনীতির বিষয় সবিশেষ অবগত হন। এই সময়েই তিনি টাসিটস্, জুভিন্যাল্ এবং কুইন্‌টিলিয়ান্ প্রভৃতি লাটিন্ গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থ সকল পাঠ করেন। এই সময়েই তিনি প্লেটো-লিখিত "জর্জিজয়াস্" "প্রোটাগোরাস" এবং "সাধারণতন্ত্র" পড়িতে আরম্ভ করেন। জেম্‌স্ মিল্ আত্ম-শিক্ষার

---

* Logic, † Organon
‡ Deductive Logic
¶ Inductive Logic,

জন্য সর্ব্বাপেক্ষা প্লেটোর নিকটই বিশেষ ঋণী ছিলেন। তাঁহার মতে প্লেটোলিখিত ডায়েলগ্ গুলি * না পড়িলে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। এই জন্য তিনি তরুণবয়স্ক ছাত্রমাত্রকেই সেই সুবিখ্যাত গ্রন্থকারের গ্রন্থাবলী পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেন; এবং এই জন্যই তিনি পুত্রকেও সেই সকল গ্রন্থে বিশেষরূপে দীক্ষিত করেন। পুত্রও পিতার ন্যায় সেই সকল গ্রন্থে বিশেষ অনুরক্ত হইয়া উঠিলেন।

এই সময়ে মিল্ এক বিষম বিপদে পড়িয়াছিলেন। যৎকালে তিনি প্লেটো ও ডিমস্থিনিস্ অধ্যয়ন করেন, সেই সময় তাঁহার ধীশক্তি অধিকতর পরিণত হওয়ায় পিতা তাঁহাকে আর পূর্ব্বের মত প্রত্যেক বাক্যের অর্থ বুঝাইয়া দিতে বাধ্য করিতেন না। বুঝিবার ভার পুত্রের নিজের উপর নির্ভর করিয়া, এক্ষণে তিনি উচ্চারণ লইয়া বিশেষ পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন। তিনি পুস্তকে সকল পুস্তক স্পষ্টরূপে ও উচ্চৈঃস্বরে পড়িতে বলিতেন, মিল্ চেষ্টা করিতেন, কিন্তু কিছুতেই ইচ্ছামত পড়িতে পারিতেন না। পিতা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইতেন। এই ঘটনা মিলের অতিশয় ক্লেশের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল।

মিল স্বয়ং বলিয়াছেন যে, পিতৃদেবলিখিত ভারতবর্ষের ইতিহাস তাঁহার সুশিক্ষার প্রধান উপকরণ হইয়াছিল। এই গ্রন্থ ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। হিন্দুদিগের আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতি, সভ্যতা ও সমাজপদ্ধতি এবং ইংরাজদিগের ভারতবর্ষীয় শাসন-প্রণালী বিষয়ে এই গ্রন্থের উৎকৃষ্ট সমালোচনা মিলের চিন্তাশক্তিকে অনেক পরিমাণে উত্তেজিত করিয়াছিল। বাল্যকালেই ভারতবর্ষ-বিষয়ে দীক্ষিত হওয়া মিল্ পরিণত বয়সে ভারতবাসীদিগের পরমহিতৈষী বান্ধব হইয়া উঠিয়াছিলেন। জেমস্ মিল্ এই গ্রন্থে ডাইরেক্টরদিগের শাসনপ্রণালীর উপর ভীষণ আক্রমণ করেন। সুতরাং তাঁহাদিগের নিকট কখন কোন উপকার প্রত্যাশা করেন নাই। তথাপি ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষীয় করেস্পন্ডেন্স বিভাগের সহকারী পরীক্ষকের পদ শূন্য হইলে—তিনি তৎপ্রার্থী হইয়া আবেদন করেন। ডিরেক্টরেরাও তাঁহার এই আবেদন গ্রাহ্য করিয়া এবং অচিরকালমধ্যেই তাঁহাকে পরীক্ষকের পদে উন্নতি করিয়া আপনাদিগের উদারতা-গুণের পরিচয় প্রদান করেন। এই দুই কার্য্যেই তিনি অসাধারণ মন্ত্রণা-পটুতা ও রচনা-চাতুরী দেখাইয়া কর্তৃবর্গের অতিশয় প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন।

জেম্স মিল্ তাঁহার সময়ের নূতন বিনিযোজনায়ও পুত্রের শিক্ষাবিষয়ে বিন্দুমাত্র অমনোযোগী হন নাই। যে বৎসরে সহকারী পরীক্ষকের পদে নিযুক্ত হন, সেই বৎসরেই তিনি পুত্রকে সমগ্র অর্থনীতি ও অর্থ-ব্যবহার শাস্ত্রে দীক্ষিত করেন। ইহার কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে তাঁহার প্রিয়তম বন্ধু রিকার্ডো অর্থনীতি ও অর্থব্যবহার বিষয়ে যে অপূর্ব্ব সুদীর্ঘ গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকটন করেন, সেই গ্রন্থের স্থল স্থল বৃত্তান্ত লইয়া পিতা প্রতিদিন ভ্রমণকালে পুত্রকে ঐ বিষয়ে উপদেশ দিতেন। পুত্র এইরূপে সমগ্রে অর্থনীতি ও অর্থব্যবহারশাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ অবগত হইয়া রিকার্ডের গ্রন্থে অবতরণ করেন; রিকার্ডোর পুস্তক সমাপ্ত হইলে পিতৃদেব মিলকে অ্যাডাম স্মিথ-লিখিত অর্থনীতি ও অর্থব্যবহার পাঠ করিতে আদেশ করেন। এই গ্রন্থ অধ্যয়নকালে জেম্স পুত্রকে রিকার্ডোর উৎকৃষ্টতর যুক্তির আলোক দ্বারা স্মিথের যুক্তি সকলের ভ্রমপ্রমাদ অবলোকন করিতে বলেন। পুত্র পিতার আদেশানুসারে সেই আলোক দ্বারা স্মিথের ভ্রমপ্রমাদ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তা-শক্তি অতিশয় পরিমার্জ্জিত হইয়া উঠিল। শুদ্ধ পরের গ্রন্থ পাঠ কর, ইহাকে স্বায়ত্ত কর, ইহার দোষগুণ পর্য্যালোচনা কর, অন্য গ্রন্থের সহিত ইহার তুলনা কর এবং সেই সমস্ত মতের উপর নিজের সিদ্ধান্ত সংস্থাপন কর—তবেই দেখিবে, তোমার চিন্তাশক্তি দিন দিন উপচীয়মান হইতেছে—তোমার বুদ্ধিবৃত্তি অধিকতর পরিমার্জ্জিত হইতেছে। কিন্তু এরূপ শিক্ষাবিধান করা এবং এরূপ শিক্ষা ধারণা করা অতি অল্প লোকের সাধ্য। জেম্স মিলের ন্যায় গুরু অতি অল্প ছাত্রের অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে; এবং জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের ন্যায় ছাত্রও অতি অল্প গুরুর ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। জেম্স পুত্রকে কখনও কোন বিষয় অগ্রে বুঝাইয়া দিতেন না। অগ্রে তিনি পুত্রকেই সেই বিষয় বুঝিতে বলিতেন। পুত্র যখন কিছুতেই তাহা স্বয়ং বুঝিতে সমর্থ না হইতেন, তখনই তিনি পুত্রের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইতেন।

* Dilogues.

এইরূপে মিল্ শৈশবেই চিন্তা-বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন হইয়া উঠিলেন। এই বয়সেই পিতার সহিত তাঁহার মতান্তর উপস্থিত হইতে লাগিল। ঈষৎ-পরিপক্ক বয়সে এই মতান্তর অনেক সময় পিতার পরাভবেই পরিণত হইত।

এইরূপে মিল্ চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে উপনীত হইলেন। এই সময়েই তাঁহার পিতার নিকট শিক্ষা সমাপ্ত হইল। এখন হইতে তিনি আর পিতার ছাত্র নহেন। এখন হইতে আপনিই আপনার গুরু হইয়া উঠিলেন। পাঠ সমাপ্ত হইল—এক্ষণে তিনি দেশ-ভ্রমণে নির্গত হইলেন। মিল্ পিতার অবিশ্রান্ত যত্নে ও নিজের অসাধারণ অধ্যবসায়বলে চতুর্দ্দশ বৎসরের মধ্যে গ্রীক, লাটিন্ ও ইংরাজী বিদ্যায় বিশদ ব্যুৎপন্ন হইলেন। তিনি কখন বিদ্যালয়ে যান নাই—অথচ তিনি সেই বাল্যাবস্থাতেই ইংলণ্ডের অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত হইলেন। এই নবীন বয়সেই তিনি শিক্ষা-তরুর উচ্চ শাখায় আরোহণ করিলেন। এ বয়সে বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ সাধারণ্যে শিক্ষা-তরুর নিম্ন-শাখায় বিচরণ করে। ইহার কারণ কি? বিদ্যালয়ে কি জেম্স্ মিলের ন্যায় সুপণ্ডিত শিক্ষক প্রবিষ্ট হন নাই? তাহা নহে। জেম্স্ মিল অপেক্ষা অধিকতর সুপণ্ডিত ব্যক্তিকেও বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার ভার লইতে দেখা গিয়াছে। তবে কি জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের ন্যায় ধীশক্তি-সম্পন্ন ছাত্র আর জগতে জন্মে নাই? তাহাও নহে। কারণ, নিউটন্ প্রভৃতি অসাধারণ প্রতিভা-সম্পন্ন ছাত্রও বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। তবে পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের কে মীমাংসা করিবে? আমরা এ বিষয়ে যাহা মীমাংসা করিয়াছি, তাহা নিম্নে প্রকটিত হইল:—

বিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষা হয়—অর্থাৎ ছাত্রগণের সাধারণ্যে যেরূপ বুদ্ধি ও ধারণাশক্তি, যেরূপ যত্ন ও অধ্যবসায়—শিক্ষক তাহারই অনুরূপ শিক্ষাবিধান করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের শিক্ষা ছাত্রবিশেষের উদ্দীপ্ত প্রতিভা ও অসাধারণ অধ্যবসায়ের উপযোগিনী নহে। এই জন্য বিদ্যালয়ের উৎকৃষ্ট ছাত্রকেও অধম ছাত্রের জন্য অপেক্ষা করিয়া অনেক সময় বৃথা অতিবাহিত করিতে হয়। সুতরাং সময়ে উত্তম ও অধম সকল ছাত্রই সাকল্যে প্রায় একসমান হইয়া যায়। এই জন্যই বিদ্যালয়োত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে বিশেষ বৈষম্য উপলব্ধ হয় না। প্রদীপ্ত প্রতিভাও যথোচিত সংমার্জ্জনা অভাবে ম্লান হয় এবং সংরুদ্ধ প্রতিভাও ঈষৎ বিস্ফুরিত হয়। এইরূপে বিদ্যালয়ের সাধারণশিক্ষায় অধম ছাত্রগণের বিশেষ উপকার ও উত্তম ছাত্রগণের বিশেষ অপকার হইয়া থাকে। এইরূপ সাধারণ শিক্ষা দ্বারা যদিও সাধারণ্যে জগতের মঙ্গল সাধিত হয়, প্রদীপ্তপ্রতিভ-ছাত্রগণের যে ইহা দ্বারা বিশেষ অনিষ্ট সংঘটিত হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করার আর একটি মহৎ অনিষ্ট এই যে, এখানে চিন্তাশক্তির উদ্দীপনা অতি অল্পই হইয়া থাকে। ছাত্রেরা অল্পসময়ে অধিক শিখিলে শিক্ষকদিগের মুখ উজ্জ্বল হইবে বলিয়া শিক্ষকেরা অনেক বিষয় বলপূর্ব্বক ছাত্রদিগের গলাধঃ করিয়া দেন। পরের মত এবং পর-বর্ণিত ঘটনাবলীর সমষ্টি—ছাত্রদিগের চিন্তা ও স্মরণ-শক্তিকে উদ্দীপিত করিয়া বরং নিষ্পেষিত করে। তাহারা নিজে কোন বিষয় ভাবিতে শিখে না। পরের মস্তিষ্ক-নিসৃষ্ট চিন্তা দ্বারাই আপনাদিগের বিদ্যা-বুদ্ধির পরিচয় দেয়। বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর এই মহান্ দোষ অনেকেই উপলব্ধি করিয়াছেন, কিন্তু অদ্যাপি কেহই তাহার প্রতিবিধানৌষধ নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হন নাই। উৎকৃষ্ট শিক্ষকের নিকট গৃহে অধ্যয়ন করিলে এই দোষের অনেক নিরাকরণ হয় বটে; কিন্তু সেরূপ সুবিধা অতি অল্প লোকের অদৃষ্টে ঘটে। যাহা হউক, আমাদের বর্ত্তমান প্রস্তাবের অধিনায়ক মিলের অদৃষ্টে সেই সুবিধা ঘটিয়াছিল এবং সেই জন্যই তিনি এত অল্পবয়সেই এত অদ্ভুত পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিতে পারিয়াছিলেন। মিল্ বাল্যবয়সে পিতার নিকট নিজ শিক্ষাসম্বন্ধে স্বয়ং যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে যথাযথ প্রকটিত করিয়া আমরা তাঁহার জীবনের "বাল্যকাণ্ড" সমাপ্ত করিব।

"পিতা শৈশবেই আমার অন্তরে যে জ্ঞান-রাশি নিহিত করয়াছিলেন,তাদৃশ জ্ঞান রাশি পরিণত বয়সেও অতি অল্প লোকে লাভ করিয়া থাকেন। এই ঘটনা এই সিদ্ধান্ত সপ্রমাণ করিতেছে যে, আমার মত সুবিধা পাইলে অন্যেও অনায়াসে আমার ন্যায় ফললাভ করিতে পারেন। যদি আমার ধীশক্তি স্বভাবতঃ অতিশয় প্রখরা হইত, যদি আমার মেধা স্বভাবতঃ অতিশয় সূক্ষ্ম ও ধারণক্ষম হইত এবং আমার প্রকৃতি স্বভাবতঃ কার্য্যদক্ষ ও উদ্যোগশীল হইত, তাহা হইলে এরূপ সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত ও অযৌক্তিক বলিয়া মনে করিতাম।

কিন্তু এই সকল প্রকৃতি-সিদ্ধ গুণে আমি জনসাধারণের নিম্নতলে বই কখন উচ্চতলে অবস্থিত ছিলাম না। সুতরাং যে বালক বা বালিকার ধারণাশক্তি সাধারণ এবং শরীর সুস্থ, সেই যে—আমি যাহা করিয়াছি—তাহা করিতে পারিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যদি আমার দ্বারা কোন অদ্ভুত বা অসামান্য কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে—তাহা আমার গুণে নহে—পিতৃদেবেরই গুণে। আমি যে আমার সমকালীন পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত তুলনায় জীবনপথের পঞ্চাধিক বিংশতি সোপানে অধিকতর অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছি, সে কেবল—পিতা যে অশেষ যত্ন পরিশ্রমের সহিত আমার শিক্ষাবিধান করিয়াছিলেন—তাহারই ফল।

"শৈশবেই আমার অসাধারণ উৎকর্ষলাভের আর একটি মহৎ কারণ নিম্নে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। এই নবীন বয়সে বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ বালক-বালিকার অন্তরে স্তূপাকারে জ্ঞান সন্নিবেশিত করা হইয়া থাকে। তদ্দ্বারা তাহাদিগের ধারণাশক্তি তেজস্বিনী না হইয়া বরং ম্লানভাব ধারণ করে। নিজের মত ও নিজের চিন্তার পরিবর্ত্তে—পরের মত ও পরের চিন্তা তাহাদিগের মনে বিরাজ করে। নিজের স্বাধীন মত সংস্থাপিত না করিয়া পরের মত লইয়াই তাহারা আত্ম-বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় দেয়। সৌভাগ্যক্রমে আমার বিষয়ে এরূপ শোচনীয় ঘটনা ঘটে নাই। যাহাতে শুষ্ক স্মরণশক্তির সংবর্দ্ধন হয়, পিতা আমাকে কখনই এমন বিষয় শিখিতে দেন নাই। তিনি সকল বিষয়ই অগ্রে বুঝিতে বলিতেন, যখন আমি স্বয়ং বুঝিতে একান্ত অক্ষম হইতাম, তখনই কেবল তিনি বুঝাইয়া দিতেন। যদিও আমি অধিকাংশ সময়ই অকৃতকার্য্য হইতাম, তথাপি সবিশেষ চেষ্টা করায় আমার চিন্তাশক্তি অচিরকালমধ্যেই অতিশয় উদ্বোধিত হইয়া উঠিল।

"আত্ম গরিমা বাল-পাণ্ডিত্যের দুর্নিবার্য্য সহচর, ইহার সাহচর্য্যে অনেকের ভাবী উন্নতির আশা একেবারে সমূলে বিনষ্ট হইয়া থাকে। পিতা আমাকে এই ভীষণ সহচরের হস্ত হইতে সতত রক্ষা করিতেন। অন্যের সহিত আমার উৎকর্ষ-সূচক তুলনা বা প্রশংসাবাদ যাহাতে আমার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট না হয়, পিতা তদ্বিষয়ে সতত চেষ্টা করিতেন। তাঁহার সহিত আমার যে কথোপকথন হইত, তাহা হইতে নিজের উপর কোন উচ্চ ভাব আমার মনে আসিতে পারিত না; বরং আপনাকে অতি নীচ বলিয়াই বোধ হইত। তিনি আমার সম্মুখে যে উৎকর্ষের আদর্শ ধারণ করিতেন তাহা সাধারণ লোকের উৎকর্ষের আদর্শ নহে। যতদূর উৎকর্ষলাভ মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত ও যতদূর উৎকর্ষলাভ মনুষ্যের অবশ্যকর্ত্তব্য, ইহা সেই উৎকর্ষেরই আদর্শ। সুতরাং আমি কখন জানিতে পারি নাই যে, আমার বিদ্যা ও জ্ঞান বড় সাধারণ নহে। তিনি প্রায় আমাকে কোন বালকের সহিত মিশিতে দিতেন না। যদি ঘটনাক্রমে কোন বালকের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইত এবং কথোপকথন দ্বারা তাহার বিদ্যাবুদ্ধি আমার অপেক্ষা অনেক ন্যূন বলিয়া প্রতীতি জন্মিত, তাহা হইলেও কখন আমার মনে হইত না যে, আমার জ্ঞান ও বিদ্যা অসাধারণ। কেবল এইমাত্র বোধ হইত যে, কোন বিশেষ প্রতিবন্ধক বশতঃই সেই বালক কেবল রীতিমত শিক্ষা পায় নাই। আমার মনের অবস্থা কখন বিনীত ছিল না বটে, কিন্তু কখন উদ্ধতও ছিল না। আমি কখনও চিন্তাতেও আপন মনে বলি নাই যে, আমি এত বড় লোক বা আমি এত মহৎকার্য্য সংসাধন করিতে পারি। আমি আপনাকে কখন উচ্চ বলিয়া ভাবি নাই, কখন নীচ বলিয়াও ভাবি নাই—অধিক কি, আমি আপনার বিষয় কিছুই ভাবি নাই বলিলেও হয়। আমি যদি কখন আপনার বিষয় কিছু ভাবিয়া থাকি, সে এইমাত্র যে, আমি পাঠনা দ্বারা কখন পিতার সন্তোষ জন্মাইতে সমর্থ হইলাম না—সুতরাং আমি পড়া শুনায় আপনাকে উৎকৃষ্ট বলিতে পারি না। আমার মনের ভাব আমি অবিকল ব্যক্ত করিলাম; কিন্তু যাঁহারা আমায় শৈশবে দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের আমার প্রতি বিশ্বাস অন্যরূপ। আমার প্রতি তাঁহাদিগের এই বিশ্বাস যে, আমার আত্মগরিমা অতিশয় ও অসহ্য। বোধ হয়, আমি শৈশব হইতেই অত্যন্ত তার্কিক ছিলাম, এবং আমার নিকট অযৌক্তিক কথা বলিলেই তাহার প্রতিবাদ করিতাম—এই জন্যই আমার প্রতি তাঁহাদিগের এরূপ ভ্রান্ত বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। পিতা ও তাঁহার সমবয়স্ক ব্যক্তিগণ আমার শৈশবেও অনেক গুরুতর বিষয়ে আমার সহিত তর্ক-বিতর্ক করিতেন। এই জন্যই আমার এরূপ কু-অভ্যাস জন্মিয়াছিল; এবং এই জন্যই আমি বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদিগের সহিত সম্মান রাখিয়া কথোপকথন করিতে শিখি নাই। দুঃখের বিষয়, পিতা আমার এই কু-অভ্যাস ও

দুর্বিনীততার সংশোধন করিতে চেষ্টা করেন নাই। বোধ হয়, তিনি ইহা অবগত ছিলেন না। কারণ, আমি তাঁহাকে অতিশয় ভয় করিতাম, এই জন্য তাঁহার সম্মুখে অতিশয় শান্ত ও বিনীতভাব ধারণ করিতাম। সুতরাং তিনি আমার অনধিকারচর্চ্চা ও দুর্বিনীততার বিষয় কিছুই জানিতে পারিতেন না। যাহা হউক, যদিও আমি বয়োজ্যেষ্ঠদিগের সহিত অবাধাই বাগবিতণ্ডায় প্রশ্রয়ান্বিত হইয়াছিলাম, তথাপি আমার শুভাদৃষ্ট-বশতঃ আত্মোৎকর্ষ-বিষয়ক জ্ঞান কখনই আমার মনকে অধিকার করিতে পারে নাই। চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে, দেশভ্রমণার্থ দীর্ঘকালের জন্য পিতৃ-গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যাইবার পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে হাইড্ পার্ক উদ্যানে ভ্রমণ করিতে করিতে পিতা আমায় যে কয়েকটি কথা বলিয়াছিলেন, তাহা আমার হৃদয়ে অদ্যাপি গ্রথিত রহিয়াছে। তিনি বলিলেন—'তুমি দেশভ্রমণে বহির্গত হইয়া অনেক নূতন দেশ ও অনেক নূতন জাতি অবলোকন করিবে। দেখিবে, সেই সেই দেশের ও সেই সেই জাতির, তোমার সমবয়স্ক যুবকেরা জ্ঞান ও শিক্ষা বিষয়ে তোমা অপেক্ষা অনেক হীন। সুতরাং অনেকেই তোমার এই অসাধারণ উৎকর্ষের বিষয় তোমার কর্ণগোচর করিবে এবং তোমার অতিশয় প্রশংসাবাদ করিবে। সাবধান, যেন সেই সকল কথায় ও প্রশংসাবাদে তোমার হৃদয় আত্মাভিমানে পরিপূর্ণ না হয়। সেই সেই সময়ে তোমার যেন মনে হয়—তুমি যে তোমার সমবয়স্ক যুবকবৃন্দ অপেক্ষা বিদ্যা ও জ্ঞানে অধিকতর সমুজ্জ্বল হইয়াছ, তাহা তোমার গুণে নহে—যে অসাধারণ অনুকূল ঘটনাবলী সৌভাগ্যলক্ষ্মীর ন্যায় সতত তোমার অনুবর্ত্তন করিয়াছে, তাহারাই গুণে। তুমি যে সৌভাগ্যবলে স্বয়ং তোমার শিক্ষাবিধানে সমর্থ এবং তজ্জন্য যথোচিত পরিশ্রম ও সময়-ব্যয়ে সমুৎসুক—এরূপ পিতা প্রাপ্ত হওয়াও সেই সৌভাগ্যেরই ফল। এরূপ অনুকূল ঘটনাবলীর সাহায্যে তুমি যে এতাদৃশী কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছ, ইহাতে তোমার বিশেষ গৌরব নাই। কিন্তু অকৃতকার্য্য হইলে, বিশেষ লজ্জার বিষয় হইত বটে।' এই বাক্যগুলি আমার কর্ণে অদ্যাপি যেন প্রতিধ্বনিত হইতেছে। পিতার এই উপদেশপূর্ণ বাক্যই আমায় সর্ব্বপ্রথমে প্রতীত করে যে, আমার সমবয়স্ক যে সকল ছাত্র অতিশয় সুশিক্ষিত বলিয়া খ্যাত, আমার বিদ্যা ও জ্ঞান তাঁহাদিগের বিদ্যা ও জ্ঞান অপেক্ষা অনেক অধিক। কিন্তু এই বোধ আমার অন্তরে কোন প্রকার আত্মাভিমান জন্মাইয়া দেয় নাই। যতবারই এই বিষয় আমার মনে উদিত হইত, ততবারই আমার অন্তরে পিতার সেই বাক্যগুলি প্রতিধ্বনিত হইত এবং অমনি যেন পিতৃদেব বলিয়া উঠিতেন—'তুমি তোমার সমবয়স্ক যুবকবৃন্দ অপেক্ষা বিদ্যা ও জ্ঞানে অধিকতর সমুজ্জ্বল হইয়াছ, তাহা তোমার গুণে নহে, যে অসাধারণ অনুকূল ঘটনাবলী সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর ন্যায় সতত তোমার অনুবর্ত্তন করিয়াছে, তাহারই গুণে। তুমি যে সৌভাগ্যবলে —স্বয়ং তোমার শিক্ষা-বিধানে সমর্থ এবং তজ্জন্য যথোচিত পরিশ্রম ও সময়ব্যয়ে সমুৎসুক—এরূপ পিতা প্রাপ্ত হওয়াও সেই সৌভাগ্যেরই ফল। এরূপ অনুকূল ঘটনাবলীর সাহায্যে তুমি যে এতাদৃশী কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছ, ইহাতে তোমার বিশেষ গৌরব নাই। কিন্তু অকৃতকার্য্য হইলে বিশেষ লজ্জার বিষয় হইত বটে।'

"পিতা আমার অত্যুৎকৃষ্ট শিক্ষাবিধান করিবেন বলিয়া যে মনোরথ করিয়াছিলেন, অন্য বালকবৃন্দের সংসর্গ হইতে আমায় সতত বিচ্ছিন্ন না রাখিলে তাঁহার সেই মনোরথ কখনই পূর্ণ হইত না। বিদ্যালয়ের বালকেরা পরস্পরের বাহ্য-চরিত্রের উপর যে বিষময় প্রভাব প্রকাশ করে, তিনি যে আমায় শুদ্ধ সেই প্রভাব হইতেই অন্তর রাখিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন, এরূপ নহে; তাহাদিগের ইতর চিন্তা ও জঘন্য হৃদয়-ভাবের সংক্রামণে যাহাতে আমার আভ্যন্তরীণ চরিত্র কলুষিত না হয়, তজ্জন্যও তিনি সতত চেষ্টিত থাকিতেন। অধিক কি, এই ভয়ে তিনি আমায়—অন্যান্য বালকেরা সাধারণতঃ যে সকল বিষয়ে উৎকর্ষলাভ করে—সে সকল বিষয়েও উৎকর্ষ লাভ করিতে দিতেন না। আমার শিক্ষার প্রধান অভাব এই যে—আমি অনেক বিষয়ে বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের ন্যায় আত্মনির্ভরপর হইতে পারিতাম না। পরিমিতাচরণ ও প্রতিদিন ভ্রমণ দ্বারা আমি সুস্থশরীর ও কষ্টসহ হইয়া উঠিলাম বটে—কিন্তু কখনই আমার শরীরে সামর্থ্য পরিণতি হইল না। সুতরাং আমি বলবীর্য্য-সূচক বীরত্ব প্রদর্শন করিতে কখনই সমর্থ হই নাই। অধিক কি, আমি সামান্য সামান্য ব্যায়াম বিষয়েও সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলাম। পিতা আমায় প্রতিদিন

ক্রীড়া করিতে অবকাশ দিতেন বটে—কিন্তু পাছে আলস্য অভ্যাসগত হইয়া আমাকে পরিশ্রমবিমুখ করিয়া ফেলে, এই জন্য তিনি আমাকে পূর্ণ অবকাশ দিতেন না। যাহা হউক, আমি যে যে পরিমাণ অবকাশ পাইতাম, তাহাতেই ব্যায়াম ও ক্রীড়া দ্বারা শরীরের দৃঢ়তা সম্পাদন করিতে পারিতাম, কিন্তু আমার একজনও বাল্যসহচর না থাকায় এবং শারীরিক পরিশ্রমের স্পৃহা দৈনন্দিন ভ্রমণ দ্বারা পরিতৃপ্ত হওয়ায়, সে সকল করিতে আমার ইচ্ছা হইত না। কিন্তু আমি যে কোন প্রকারই আমোদ-প্রমোদ, কোন প্রকারই ক্রীড়াতে লিপ্ত হইতাম না, এরূপ নহে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমার সকল প্রকার আমোদ-প্রমোদ ও সকল প্রকার ক্রীড়াই অতি শান্ত ও নিভৃত ছিল। এই জন্যই আমি স্বভাবতঃ শারীরিক পরিশ্রম-সাধ্য কার্য্যে একান্ত অপটু হইয়া পড়িলাম। যে সকল অবশ্য-কর্ত্তব্য গৃহ-কার্য্যসংসাধনে হস্তপদাদি শারীরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি সঞ্চালনের আবশ্যকতা, সে সকল গৃহকার্য্যে আমি অতি বিকলের ন্যায় হইয়া পড়িতাম। এই জন্যই আমি অনবধান, অদূরদর্শী এবং গৃহকার্য্যে শিথিল-যত্ন বলিয়া পিতার নিকট সতত তিরস্কৃত হইতাম। তিনি এই সকল বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিলেন। সকল সময়েই তাঁহার শরীর ও মন সমবেত হইয়া কার্য্য করিত। দৃঢ়তা এবং তেজস্বিতা তাঁহার সকল কার্য্যেই প্রতিভাত হইত। যিনি তাঁহার সহিত একবার কথোপকথন করিতেন, যিনি তাঁহার তেজঃপূর্ণ ও প্রতিভাসম্পন্ন মুখশ্রী একবার অবলোকন করিতেন, তিনি তাঁহাকে কখনই ভুলিতে পারিতেন না। কিন্তু বীর্য্যবান্ ও তেজস্বী লোক-দিগের সন্ততি যে নিবীর্য্য ও নিস্তেজ হয়, তাহার কারণ এই যে—তাঁহাদিগের সন্ততিগণ সকল বিষয়েই তাঁহাদিগের উপর নির্ভর করে এবং তাঁহারাও স্ব স্ব বীর্য্যবত্তাকে তাঁহাদিগের আত্মপরিপোষণে পর্য্যবসিত করেন। পিতা আমায় যে শিক্ষা প্রদান করেন—তাহার উদ্দেশ্য শুদ্ধ জ্ঞান—কর্ম্ম নহে। তিনি যে আমার শিক্ষার এই অঙ্গহীনতার বিষয় কিছুই অবগত ছিলেন না, এরূপ নহে। কারণ, তিনি এই অঙ্গহীনতার জন্য সতত আমায় তিরস্কার করিতেন। তিনি যে এরূপ অঙ্গহীনতার অনুমোদন করিতেন, তাহাও নহে, কারণ, এজন্য তিনি সর্ব্বদা অনুশোচনা করিতেন॥ কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি এই অঙ্গহীনতার বিষয় সম্পূর্ণ অবগত হইয়াও ইহার নিরাকরণের জন্য কোন উপায় অবলম্বন করেন নাই। তিনি আমার বিদ্যালয়-জীবনের দুর্নীতিকর পরিণাম হইতে মুক্ত করিয়া আমার ভাবী উন্নতির মূল রোপিত করেন বটে, কিন্তু যাহাতে কার্য্যদক্ষ ও কর্ম্মের নায়ক হই, তাহার জন্য কোন উপায়ই অবলম্বন করেন নাই। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষেরা এই বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষা দেন। পিতা আশা করিয়াছিলেন যে, বিনা শিক্ষায় আপনা হইতেই আমার এই সকল বিষয়ে পটুতা জন্মিবে। কিন্তু তাঁহার এরূপ আশা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও অমূলক। সুতরাং ইহা কখনই ফলবতী হয় নাই। এই বিষয়ে এবং আমার শিক্ষা-সম্বন্ধে আর কয়েক বিষয়ে পিতৃদেব কারণের অভাবেও কার্য্যের প্রত্যাশা করিয়াছিলেন। এই জন্যই তিনি ভগ্নাশ হইয়া পরিশেষে অকারণ মনস্তাপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।'

দ্বিতীয় অধ্যায়

মিলের ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা এবং তদীয় পিতার চরিত্র ও ধর্ম্মনীতিবিষয়ক মত।

মিল আশৈশব কোন ধর্ম্ম-প্রণালীতেই দীক্ষিত হন নাই। তাঁহার পিতা বাল্যে স্কচ প্রেস্‌বিটেরিয়ান্ মতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি চিন্তা ও শিক্ষা-বলে অচিরকালমধ্যেই শুদ্ধ প্রত্যাদেশ * মতের কেন, যাহাকে সাধারণতঃ প্রাকৃতিক ধর্ম্ম † বলে, তাহার শৃঙ্খল হইতে আপনাকে মুক্ত করেন। তিনি স্বয়ং বলিতেন যে, বট্‌লার-লিখিত অ্যানালজি § নামক গ্রন্থ পাঠেই তাঁহার এই আকস্মিক মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। যাঁহারা এক সর্ব্বশক্তিমান্, অনন্ত দয়ার নিধান ও সর্ব্বদর্শী বা ত্রিকালজ্ঞ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, অথচ খৃষ্টধর্ম্মে বিশ্বাস করিতে চাহেন

---

* Revelation.

† Naturl religion.

§ Analogy.

না, বটলারের যুক্তিসকল তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ সবল সন্দেহ নাই; কিন্তু যাঁহাদিগের নিকট ঈশ্বরের অস্তিত্বই সপ্রমাণ করিতে হইবে, তাঁহাদিগের নিকট বটলারের যুক্তি সকলের কোন মূল্যই নাই। বটলারের পুস্তকপাঠেই জেমস মিলের মনে এই চিন্তা প্রথম উদিত হয় যে, অদ্যাবধি খৃষ্টধর্ম্ম বিষয়ে যে সকল পুস্তক লিখিত হইয়াছে, সে সমুদায়েই ঈশ্বরের অস্তিত্ব মূলভিত্তিস্বরূপ পরিগৃহীত হইয়াছে। ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে অদ্যাবধি কোন বিতর্ক উপস্থিত হয় নাই; ইহা এতাবৎকাল স্বতঃসিদ্ধ বলিয়াই স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। জেম্সের মন ইহাতে পরিতৃপ্ত হইল না। তাঁহার নিকট ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণসাপেক্ষ বলিয়া প্রতীত হইল। এ বিষয়ে অসন্দিগ্ধ প্রমাণ তিনি কুত্রাপি পাইলেন না। তিনি কিছুকাল সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান রহিলেন। অবশেষে অনেক চিন্তার পর তিনি এই মত অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলেন যে, এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগতের আদি কারণ-বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং কখনও যে এ বিষয়ে অভিজ্ঞ হইব, তাহারও কোন আশা দেখা যায় না। এইটুকুই তাঁহার বিশ্বাসের সার। যাঁহারা তাঁহাকে নাস্তিক বলিয়া নিন্দা করেন, তাঁহারা নাস্তিকতা ও পূর্ব্বোক্ত মতগত বৈলক্ষণ্য উপলব্ধি করিতে পারেন না। কারণ, 'এই অনন্ত জগতের আদি কারণ নাই,' এবং 'এই অনন্ত জগতের আদি কারণ অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়' এই দুই মত পরস্পর সম্পূর্ণ বিভিন্ন। প্রথম মতটিকেই প্রকৃতপক্ষে নাস্তিবাদ বলা যাইতে পারে। জগতে এই মতের পরিপোষক ব্যক্তির সংখ্যা অতি অল্প। জেমস্ মিল্ এ মতের পরিপোষক ছিলেন না; অধিক কি, তিনি এ মতকে সম্পূর্ণ অসঙ্গত বলিয়া মনে করিতেন। দ্বিতীয় মতটি বর্ত্তমান প্রত্যক্ষবাদের সার। জেম্‌স মিল্ এই মতেরই পক্ষপাতী ছিলেন। যাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহারা তাঁহাকে কতকগুলি পরস্পর বিসংবাদী গুণের আধার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের মতে ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান, * সর্ব্বদর্শী বা ত্রিকালজ্ঞ † এবং অনন্ত দয়ার আধার, ‡ জেম্‌স মিল্ জগৎকার্য্য পর্য্যালোচনা দ্বারা একাধারে এরূপ পরস্পরবিসংবাদী গুণত্রয়ের সমাবেশ সম্ভবপর মনে করিতে পারিলেন না। অনন্ত শক্তি, অনন্ত দয়া এবং অনন্ত জ্ঞান এই তিনের পরস্পর স্বভাবসিদ্ধ কোন বিসংবাদ আছে বলিয়া তাঁহার বোধ ছিল না। তিনি কেবল কার্য্যতঃ এই তিনের বিসংবাদ দেখিতে পাইতেন। যে ঈশ্বর জগতে রোগ, শোক প্রভৃতি অনর্থের মূল সৃষ্টি করিয়াছেন—তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ হইতে পারেন, কিন্তু তিনি যে কিরূপে অনন্ত দয়ার আধার, তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেন না। যিনি সর্ব্বশক্তিমান্, তিনি অনন্ত দয়াবান্ হইলে জগতে রোগ, শোক কিছুই থাকিত না। যিনি অনন্ত দয়ার আধার, তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ ও ত্রিকালজ্ঞ হইলে জগতে দুঃখের মূলেই কুঠারপাত হইত সন্দেহ নাই। যে সকল কূটযুক্তি দ্বারা ধর্ম্মব্যবসায়ীরা এই বিসংবাদের সামঞ্জস্যবিধান করিতে চেষ্টা করিতেন, জেম্‌স মিলের সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি সেই সকলের অসারতা সহজেই উপলব্ধ করিতে পারিল। লোকে সাধারণতঃ যাহাকে ধর্ম্ম বলে—জেমস মিল্ এইরূপে সেই ধর্ম্মের বিদ্বেষ্টা হইয়া উঠিলেন। তিনি এই লোকপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মকে বিশুদ্ধ নীতির উন্মূলক বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। বাহ্য আড়ম্বর যে ধর্ম্মের জীবনসর্ব্বস্ব—মানব-প্রেম যে ধর্ম্মের প্রধান লক্ষ্য নহে—সেই ধর্ম্মকে তিনি ধর্ম্ম বলিয়াই কোনমতে স্বীকার করিতে পারিলেন না। যে ধর্ম্মের দেবতা ভীষণ নরকের সৃষ্টিকর্ত্তা, যে ধর্ম্মের উপাস্য দেবতা জ্ঞানপূর্ব্বক, সুতরাং ইচ্ছাপূর্ব্বক মনুষ্যজাতির অধিকাংশকে সেই নরকের ভয়ানক চিরস্থায়ী যন্ত্রণা ভোগ করাইবার মানসে তাহাদিগকে দুর্দ্দমনীয় পাপ-প্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, সে ধর্ম্মকে তিনি ঘৃণার সহিত না দেখিয়া থাকিতে পারিলেন না। এরূপ ভীষণ-প্রকৃতিক ঈশ্বরকে লোকে কিরূপে যুগপৎ সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুণনিচয়ের আধার বলিয়া নির্দ্দেশ করে, তাহা তিনি অনুভব করিতে পারিতেন না। তিনি "সৎ ও অসৎ প্রবৃত্তি উভয়ে পরস্পরকে দমন করিয়া বিশ্বরাজ্য শাসন করিতে চেষ্টা করিতেছেন" জোরোয়াস্তার প্রবর্ত্তিত এই মত ইহা অপেক্ষা ভাল বলিতেন। এরূপ ধর্ম্মে নীতির অবনতি নাই। পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম—নীতির ভাবকে অতিশয় অবনত করে; এবং সর্ব্বোচ্চ উৎকর্ষের কল্পনায় যত চেষ্টা করা যায়, ইহা তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। বুদ্ধির চালনায় যে

---

* Almighty.

† Omniscient.

‡ All-merciful.

সকল চিন্তা হইতে সেই উচ্চোৎকর্ষের পরিষ্কার ভাব মনে উদিত হয়, অন্ধবিশ্বাসিগণ সে সকল চিন্তা মন হইতে দূরীকৃত করিয়া দেয়। কারণ, তাহারা যদিও স্পষ্ট দেখিতে পায় না, তথাপি বুঝিতে পারে যে, সে সকল চিন্তা তদুদ্ভাবিত অনাদি কারণের কার্য্য সকলের এবং তদবলম্বিত ধর্ম্মমতের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করে। নীতিও এইরূপে পৌরাণিক প্রথায় চলিয়া আইসে এবং কোন যুক্তির অনুসরণ করা দূরে থাকুক, কোন সঙ্গত আবেগের অনুবর্ত্তন করে না।

জেমস মিল্ আপনার ধর্ম্মবিষয়ক এই সকল মতের বিরুদ্ধে পুত্রের ধর্ম্মশিক্ষাবিধান করিতে ইচ্ছা করেন নাই। এই জন্য তিনি প্রথম হইতেই পুত্রের মনে এই সংস্কার দৃঢ় অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিলেন যে, এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টিপ্রকরণ বিষয়ে আমরা কিছুই জানিতে পারি না। 'কে আমার স্রষ্টা?' এ প্রশ্নেরও কোন প্রকৃত উত্তর দেওয়া যাইতে পারে না। কারণ, এ বিষয়ে আমরা কোন বিশেষ প্রমাণ পাই না। যদি বলি, এই প্রশ্নের উত্তর 'ঈশ্বর', তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ আমাদিগের মনে আর একটি প্রশ্ন উদিত হয়—'ঈশ্বরের সৃষ্টি-কর্ত্তা কে?' সুতরাং এরূপ অনবস্থাপাতে অনাদি কারণের কোন স্থিরতাই হয় না। যদিও তিনি পুত্রের অন্তরে নিজধর্ম্মবিষয়ক সংস্কার বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছিলেন, তথাপি মনুষ্যজাতি এই দুর্ভেদ্য তত্ত্ব-বিষয়ে কি কি মত প্রচার করিয়াছেন, পুত্রকে তত্ত্ব-দ্বিষয়ে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ করিতে বিশেষ চেষ্টা করিতেন। এই জন্য তিনি তাঁহাকে শৈশবেই খৃষ্টধর্ম্মবিষয়ক পুস্তক সকল পাঠ করিতে বলেন।

এইরূপে মিল্ কোন প্রকার ধর্ম্মবিশ্বাসে দীক্ষিত না হওয়ায়, ধর্ম্মবিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া উঠিলেন। সুতরাং ধর্ম্মবিষয়ের উপর তাঁহার বিশেষ আস্থা বা ঘৃণা জন্মিল না। সকল ধর্ম্মই তিনি সমভাবে দেখিতে লাগিলেন। খৃষ্টান, মুসলমান ও হিন্দু তাঁহার নিকট একই প্রতীত হইতে লাগিল। ইতিহাসে তিনি মনুষ্যজাতির পরস্পর মতভেদের অনেক দৃষ্টান্ত পাইয়াছিলেন। সুতরাং মত-ভেদ জন্য কাহারও উপর তাঁহার বিদ্বেষভাব জন্মিত না। কিন্তু মিলের নীতিশিক্ষার একটি অঙ্গহীনতা অতিশয় শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। জেম্স্ মিল্ জানিতেন যে, তাঁহার মত সকল প্রায় অধিকাংশ লোকের মতের বিরোধী ছিল। তিনি জানিতেন যে, এ সকল মত প্রকাশ্যরূপে প্রচার করিলে অনেক অত্যাচার সহ্য করিতে হইবে। এই জন্য তিনি পুত্রকে সেই সকল মতে দীক্ষিত করিবার সময় এই সকল মত প্রকাশ্যে স্বীকার করার বিষয়ে সাবধান হইতে বলেন। মিল্ যেরূপ নিভৃতভাবে গৃহে শিক্ষা পাইয়াছিলেন, তাহাতে শৈশবে বহুলোকের সহিত তাঁহার মিশ্রণের সম্ভাবনা ছিল না; এই জন্য যদিও তাঁহাকে—প্রকাশ বা গোপন—এই সন্ধিস্থলে সর্ব্বদা দণ্ডায়মান হইতে হইত না, তথাপি এই গোপন রাখিবার উপদেশ যে তাঁহার নৈতিক উন্নতির অনেক ব্যাঘাত সম্পাদন করিয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

মিলের শৈশবকালীন ইংলণ্ডের নীতির অবস্থা অপেক্ষা তাঁহার বার্দ্ধক্যকালীন ইংলণ্ডের নীতির অবস্থা অনেক পরিমাণে উন্নত হইয়া উঠিয়াছিল। মিল্ বলিয়াছেন, স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন তর্ক এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় ইংলণ্ডে পাপ বলিয়া পরিগণিত হইত না। জেম্স্ মিল এ সময় জীবিত থাকিলে তাঁহার ধর্ম্মবিষয়ক মত ব্যক্ত করিতে সঙ্কুচিত হইতেন না। যদিও এখনও স্বাধীনভাবে মনের ভাব ব্যক্ত করার অপরাধে সময়ে সময়ে কেহ কেহ জীবিকানাশ, পদচ্যুতি, গৌরবহানি ও জাতিভ্রংশ প্রভৃতি গুরুতর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া থাকেন তথাপি সাধারণতঃ এক্ষণে এ সকল বিষয়ে যে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর স্বাধীনতা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। যাঁহারা জ্ঞানমার্গে অতিশয় অগ্রসর—পদ ও গৌরবের অনুরোধে যাঁহাদিগের মত অবহেলা করা অনেকের পক্ষে কঠিন—অথচ ধর্ম্ম-বিষয়ক মত সকল যাঁহাদিগের নিকট ভ্রমসঙ্কুল ও মানবজাতির অহিতকর বলিয়া প্রতীত হয়—তাঁহাদিগের নির্ভয়ে আত্মমত প্রকাশ করিবার সময় এক্ষণে উপস্থিত হইয়াছে। আর তাঁহাদিগের গুপ্তভাবে থাকা ভাল দেখায় না। অনেকের সংস্কার এই যে—যাঁহার ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই, তাঁহার অন্তর ও মন কখনই পবিত্র হইতে পারে না। জেম্স্ মিল্ প্রভৃতি মহোদয়েরা নির্ভয়ে আত্মমত প্রকাশ করিলে এই সংস্কার অচিরাৎ লোকের মন হইতে দূরীভূত হইত সন্দেহ নাই। যে সকল মহাত্মা জগতের অলঙ্কার বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছেন,—যাঁহাদিগের জ্ঞান ও ধর্ম্ম সর্ব্বত্র প্রখ্যাত রহিয়াছে,—বিশেষ অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে, তাঁহাদিগের

অধিকাংশই ঈশ্বরের অস্তিত্ব-বিষয়ে প্রায় নিশ্চিত বিশ্বাস-বিরহিত ছিলেন। তাঁহাদিগের সংস্কার ছিল যে, তাঁহাদিগের এই মত ব্যক্ত করিলে লোকের মনে ধর্ম্মবন্ধন শিথিলিত হইয়া জগতের অমঙ্গল সংঘটিত হইবে। এই জন্যই তাঁহারা আপনাদিগের ধর্ম্ম-বিষয়ক মত সকল এত গোপন করিতেন। কিন্তু বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে তাঁহাদিগের এ সংস্কার সম্পূর্ণ অমূলক বলিয়া প্রতীত হইবে।

জেম্‌স্ মিলের ধর্ম্ম ও নীতি-বিষয়ক মত সকল গ্রীক্ দার্শনিকদিগের ন্যায় ছিল। এই জন্য তিনি পুত্রকে শৈশবেই গ্রীক দার্শনিকদিগের গ্রন্থ সকলে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। ঝিনোফন-লিখিত মেমোরাবিলিয়া (Memorabilia of Xenophon) নামক পুস্তক পাঠে মিলের মনে সক্রেটিসের উপর অতি গভীর ভক্তি জন্মে। এই সময় হইতেই মিল্ সক্রেটিস্‌কে উৎকর্ষের অতি উচ্চ আদর্শ বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। ইহার পর তিনি প্লেটোর পুস্তক সকল পাঠ করিয়া নীতিমার্গে আরও অগ্রসর হইলেন। ন্যায়পরতা, পরিমিতাচারিতা, সত্যপ্রিয়তা, অধ্যবসায়শীলতা, দুঃখ ও পরিশ্রমসহিষ্ণুতা, সাধারণের হিতচিন্তা, ব্যক্তি ও দ্রব্যের গুণগ্রাহিতা এবং আলস্য ও বৃথা আমোদ-প্রমোদে ঘৃণা— এই গুণগুলিকেই সক্রেটিস্ প্রকৃত ধর্ম্মপদের বাচ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জেম্‌স্ মিল্ এই সকল সক্রেটিক ধর্ম্মেই (Socratic Viri) পুত্রকে আশৈশব দীক্ষিত করেন। মিল্ বিশেষ যত্নের সহিত আজীবন সেই ধর্ম্মগুলি প্রতিপালন করিয়াছিলেন। জেম্‌স্ মিল্ পুত্রকে এই সকল ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন, এরূপ নহে; তিনি স্বয়ং সেই ধর্ম্মগুলি প্রতিপালন করিয়া পুত্রকে জীবন-আদর্শ প্রদান করিতেন। মিল্ স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন যে, পিতার দৃষ্টান্তে তাঁহার অধিকতর উপকার দর্শিয়াছিল।

জেম্‌স মিলের চরিত্রে ষ্টোয়িক, এপিকিউরীয় ও সিনীক এই তিন লক্ষণই উপলক্ষিত হইত। তিনি কার্য্যের সুখ-দুঃখোৎপাদন-প্রবণতা হইতে ইহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতা স্থির করিতেন, সুতরাং তিনি এপিকিউরিয়ান্ (Epicurian) ছিলেন। জগতে সুখ আছে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল না, সুতরাং তিনি সিনীক (Cynic) পদের বাচ্য। কিন্তু তিনি কার্য্যতঃ সম্পূর্ণ ষ্টোয়িক (Stoic) ছিলেন। তিনি সুখের আস্বাদ-গ্রহণে অসমর্থ ছিলেন, এরূপ নহে, কিন্তু তিনি উচ্চমূল্যে ইহা ক্রয় করিতে ভালবাসিতেন না। তাঁহার মতে জগতের অধিকাংশ দুঃখই—সুখের উচ্চ মূল্য-নির্দ্ধারণের ফল। যৌবনের নবীনতা অতীত হইলে এবং জ্ঞানপিপাসা শান্ত হইলে জীবন তাঁহার নিকট অতীব শোচ্য পদার্থ বলিয়া প্রতীত হইত, কিন্তু তিনি কখনই যুবা ব্যক্তির সম্মুখে জীবনের ভীষণ-চিত্র প্রদর্শন করিতেন না। তিনি বলিতেন যে, যদি কখন কোন জীবন সুশিক্ষা ও সুশাসন দ্বারা সংঘটিত হয়, সে জীবন সার্থক হইবে সন্দেহ নাই; কিন্তু এরূপ ঘটনার সম্ভাবনা বিষয়ে তাঁহার বিশেষ আশার সঞ্চার হইত না। তিনি বিদ্যালোচনায় সুখব্যতিরিক্তও কতকগুলি অবশ্যম্ভাবী উৎকৃষ্ট ফলের উপলব্ধি করিতে পারিতেন; কিন্তু সেই সকল ফল গণনা না করিলেও বিদ্যালোচনার্জিত সুখকে অন্যান্য কারণোৎপন্ন সুখ অপেক্ষা উচ্চতর পদবী প্রদান করিতেন। হিতৈষাবৃত্তিজনিত সুখকেই তিনি সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদান করিতেন এবং বলিতেন যে, যে যুবজনের সুখের সহানুভাবক হইতে পারে, সেই কেবল বার্দ্ধক্যে সুখী হইতে পারে। তিনি সর্ব্বপ্রকার অত্যাসক্তিকেই অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন এবং একপ্রকার উন্মত্ততা বলিয়া মনে করিতেন। প্রাচীন সময়ের সহিত তুলনা করিলে, বর্ত্তমান যুগে অনুভূতি (Feelings) সকলকে যে উচ্চ আসন প্রদান করা হইয়াছে, ইহাকেই তিনি বর্ত্তমান যুগের নীতিভ্রংশের মূল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

তাঁহার মতে শুদ্ধ মনের ভাবের জন্য কেহ নিন্দা বা সুখ্যাতির ভাজন হইতে পারেন না। ন্যায় ও অন্যায় এবং ভাল ও মন্দ কার্য্যের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে। কর্ত্তব্যের অকরণকেই ন্যায় ও ভাল এবং তাহার বিপর্য্যয়কেই অন্যায় ও মন্দ কার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। কর্ত্তব্যের করণ ও অকর্ত্তব্যের অকরণ বা তদ্বিপরীত ইচ্ছা জন্য কেহ সুখ্যাতি বা নিন্দার ভাজন হইতে পারেন না। কারণ, অনেক সাধু ইচ্ছা হইতে অসাধু কার্য্যের এবং অসাধু হইতে সাধু কার্য্যের উৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্য তিনি সাধু বা অসাধু ইচ্ছার জন্য কর্ত্তাকে সুখ্যাতি বা নিন্দা করিতেন না। তিনি কার্য্যের সাধুত্ব বা অসাধুত্ব দেখিয়াই কর্ত্তার সুখ্যাতি বা নিন্দা করিতেন। তাঁহার মতে সাধুকার্য্যের প্রবর্ত্তন ও অসাধু কার্য্যের নিরাকরণই সুখ্যাতি বা নিন্দার প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। যে অসাধু কার্য্য

সাধু অভি প্রায়ে অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং যে অসাধু কার্য্য অসাধু-অভিপ্রায়ে অনুষ্ঠিত হইয়াছে, সেই অসাধু কার্য্য দ্বয়ের তিনি কোনও প্রভেদ করিতেন না। কার্য্যের তিনি গুণাগুণবিচারে অভিপ্রায়ের সাধুত্বাসাধুত্ব গণনা করিতেন না বটে; কিন্তু কর্ত্তার চরিত্র-নির্ণয়ে ইহার বিশেষ আবশ্যকতা সতত স্বীকার করিতেন। অতি অল্প লোককেই তাঁহার ন্যায় কর্ত্তব্যবুদ্ধির ও অভিপ্রায়ের সাধুত্বের গৌরব করিতে দেখা যাইত এবং এ দুই জানিতে না পারিয়া লোকের চরিত্রবিষয়ে কোন মত প্রচার করিতে অল্পলোকেই তাঁহার ন্যায় সঙ্কুচিত হইতেন। তিনি জানিতেন যে, কাহারও কর্ত্তব্যবুদ্ধি অচিরপ্রসূত শিশুসন্তানের জলনিক্ষেপ প্রোৎসাহিত করে,—কাহারও কর্ত্তব্যবুদ্ধি দীনা অনাথা বালবিধবার বৈধব্যদশা চিরস্থায়িনী করিতে চাহে,—কাহারও কর্ত্তব্যবুদ্ধি লোক-লজ্জাভয়ে নিরীহ কুক্ষিস্থ জীবের প্রাণনাশ করিতে উল্লসিত হয়,কিন্তু তিনি তাঁহাদিগকে ঘৃণা—অন্তরের সহিত ঘৃণা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। যাহারা জানিয়া শুনিয়া কোন স্বার্থ-প্রণোদিত হইয়া এই সকল পাপাচার অনুষ্ঠান করে, তিনি তাহাদিগের অপেক্ষাও পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মান্ধদিগের অধিক ঘৃণা করিতেন। কারণ, উক্ত ধর্ম্মান্ধগণ হইতে সজ্ঞান পাপীদিগের অপেক্ষাও সমাজের অধিক অনিষ্ট আশঙ্কা করিতেন।

এরূপ পিতা পুত্রের মনে যে প্রবল নীতির ভাব অঙ্কিত করিয়াছিলেন, সে বিষয় আর বলা বাহুল্য। কিন্তু জেম্‌স মিলের সন্তানগণের সহিত নৈতিক সম্বন্ধের একটি অঙ্গহীনতা মিল্ স্বয়ং নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি সন্তানগণের উপর কখনই স্নেহপ্রকাশ করিতেন না। তিনি যে অন্তরে তাহাদিগকে ভালবাসিতেন না—এরূপ নহে, কিন্তু তিনি ইংরাজদিগের জাতীয় স্বভাবধর্ম্মে তাহা ব্যক্ত করিতে লজ্জিত হইতেন। এরূপে তাঁহার অন্তরের স্নেহ পরিব্যক্তি-বিরহে ক্রমে অন্তরেই শুষ্ক হইয়া গেল। বিশেষতঃ জেমস স্বভাবতঃ কোপনস্বভাব ছিলেন, এই জন্য তাঁহার সন্তানেরা তাঁহাকে অতিশয় ভয় করিতেন। একে তাঁহারা পিতার মুখমণ্ডলে কখন স্নেহের ভাব উপলব্ধি করিতে পারিতেন না, তাহাতে আবার তাঁহাদিগকে সেই মুখমণ্ডলে মধ্যে মধ্যে ক্রোধের জ্বালা দেখিতে হইত; সুতরাং কালে তাঁহাদিগেরও অন্তরে নবোদিত স্নেহের অঙ্কুর পরিপুষ্টি অভাবে বিশুষ্ক হইয়া গেল। জেমস মিলের জীবনের শেষভাগে হৃদয়ের এই অস্বাভাবিক ভাবের অনেক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছিল। এই জন্য তাঁহার শেষাবস্থার সন্তানগণ তাঁহাকে অধিকতর ভালবাসিতেন। মিল্ জননীর নিকট প্রায় থাকিতেন না; বাহ্য-জগতের সহিতও তাঁহার বিশেষ সংস্রব ছিল না। তিনি পিতার সহিত আহার-বিহার করিতেন। তিনি পিতা বই আর কিছুই জানিতেন না। কিন্তু সেই পিতা স্নেহ কাহাকে বলে, পুত্রকে তাহা দেখান নাই। সুতরাং পুত্রও পিতাকে কিরূপে ভালবাসিতে হয়, তাহা জানিতেন না বটে, কিন্তু পিতাকে কিরূপে ভক্তি ও ভয় করিতে হয়, তাহা তিনি বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। অধিক কি, তিনি পিতাকে প্রভুস্বরূপ মনে করিতেন। এরূপ কঠিন শাসনে মিল্ উপকৃত বা অপকৃত হইয়াছিলেন, তাহা তিনি স্বয়ংই বুঝিতে পারেন নাই; সুতরাং সে বিষয়ে আমরা কোন মত প্রকাশ করিতে চাহি না। তবে সাধারণ শিক্ষা-সম্বন্ধে তাঁহার মত এই যে, শাসন ও ভয়প্রদর্শন বালকদিগের শিক্ষার একটি অঙ্গ হওয়া উচিত। কারণ, দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক সময় শুদ্ধ মিষ্ট অনুনয়-ব্যঞ্জক বাক্যে তাহাদিগকে অপ্রীতিকর পাঠে নিয়োজিত করিতে পারা যায় না। বর্ত্তমান সময়ে বালকদিগের পাঠনার বিষয় সকল তাহাদিগের সুখবোধ্য ও হৃদয়গ্রাহী করিবার যে প্রথা প্রচলিত হইয়াছে, তাহা প্রশংসনীয় বটে, কিন্তু তিনি ইহার অতিবৃদ্ধির কোনমতে অনুমোদন করিতেন না। যাহা সুখবোধ্য হৃদয়গ্রাহী, তাহা বই আর কিছুই পড়িব না, বালকদিগের এরূপ মত দাঁড়াইলে শিক্ষা-প্রণালীর অবনতি বই উন্নতি হইবে না, এ বিষয়ে তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল। তিনি শারীরিক দণ্ড-বিধানের অতিশয় বিপক্ষ ছিলেন; এবং ভয়প্রদর্শন যদিও বাল্যশিক্ষার একটি অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিতেন, তথাপি ইহা দ্বারা শিক্ষকের প্রতি ছাত্রের স্নেহ ও বিশ্বাসের ভাব তিরোহিত হইলে বালকদিগের অন্তরে সরলতার উৎস সংরুদ্ধ করিয়া জগতের ভয়ঙ্কর অনিষ্ট সংঘটিত করিবে, তদ্বিষয়ে তাঁহার কোন সন্দেহ ছিল না।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে যে, মিল শৈশবে ও বাল্যে বাহ্য-জগৎ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিলেন। পিতা বই তাঁহার শৈশব সঙ্গী বা বাল্য-সহচর আর-কেহই ছিলেন না। কোন সমবয়স্ক বালকের সহিত

তাঁহার সাক্ষাৎ হইত না। এরূপ অবস্থায় তাঁহার শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তাঁহার পিতৃবন্ধুদিগের দ্বারা এই অভাব কিঞ্চিৎ-পরিমাণে দূরীকৃত হওয়ায় তাঁহার শিক্ষার পরিপূর্ণতা-বিষয়ে বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। বেন্থাম, হিউম ও রিকার্ডো প্রভৃতি ইংলণ্ডের মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর্গ জেমস্ মিলের বন্ধুশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইঁহারা জেমস্ মিলের গৃহে সর্ব্বদা আগমন ও ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, দর্শন ও বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক করিতেন। তাঁহারা মিলকে পুত্রনির্ব্বিশেষে ভালবাসিতেন এবং তাঁহাদিগের সহিত গুরুতর বিষয়ে কথোপকথন ও তর্ক-বিতর্ক করিতে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিতেন। রিকার্ডো অর্থ-নীতি ও অর্থব্যবহার (Political Economy) শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। মিল এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলে রিকার্ডো প্রায় তাঁহাকে নিজ গৃহে লইয়া যাইতেন এবং তাঁহার সহিত নানা প্রকার কথোপকথন করিতেন। হিউম স্কটলণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন, সুতরাং জেমস মিলের স্বদেশী। ইঁহারা দুই জনে বাল্যকালে এক পাঠশালায় ও এক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। পরে কিছুদিন পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া আবার পুনর্ম্মিলিত হন। এই সময়ে মিল হিউমের অতিশয় অনুগত হইয়া উঠেন এবং প্রায়ই তাঁহার বাটীতে গমনাগমন করিতেন। কিন্তু বেন্থামেরই সহিত তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর আনুগত্য হইয়া উঠে। বেন্থাম তাঁহার পিতার প্রিয়তম বন্ধু ছিলেন। এই গভীর বন্ধুত্বের মূলে সহানুভূতি অবস্থিত ছিল। কারণ, ইংলণ্ডের প্রধান লোকদিগের মধ্যে জেমস্ মিলই সর্ব্বপ্রথমে বেন্থামের ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি ও ব্যবহারশাস্ত্রাদি বিষয়ক মত সকলের সারবত্তা উপলব্ধি করেন এবং তাহাদিগকে কার্য্যেও পরিণত করেন। যে সময়ে বেন্থাম অতি নিভৃতভাবে থাকিতেন—যে সময়ে তিনি অতি অল্প দর্শকেরই স্বগৃহে আগমন অনুমোদন করিতেন—সে সময়েও এই মহানুভাবক জেমস্ মিলকে তাঁহার নিত্য সহচর করিয়া তুলিয়াছিলেন। জেমস মিল্ পুত্রের সহিত প্রায় মধ্যে মধ্যে প্রিয়বন্ধু বেন্থামের বাটীতে যাইতেন। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে মিল—পিতা ও পিতৃবন্ধু বেন্থামের সহিত অক্সফোর্ড, বাথ, ব্রিষ্টল, একজিটর, প্লিমাউথ, এবং পোর্টস্মাউথ প্রভৃতি নগরী পর্য্যটন করিয়া নানা বিষয় উপদেশ প্রাপ্ত হন। প্রাকৃতিক দৃশ্যের মোহিনী মূর্ত্তি এই সময়েই সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট করে। ১৮১৪ হইতে ১৮১৭ খৃঃ পর্য্যন্ত বেন্থাম প্রতি বৎসর ছয় মাস করিয়া সমরসেট্সায়ের প্রদেশের "ফোর্ড আবে" নামক স্থানে বাস করিতেন। সেই সেই সময় মিলও তাঁহার সহিত তথায় অবস্থিতি করিতেন। এই প্রদেশের প্রশস্ত, উত্তুঙ্গ ও বায়ুসঞ্চালিত অট্টালিকা, নির্ম্মক্ষিক ছায়াবহুল প্রশান্ত উপবন, এবং জলপ্রপাত ও নির্ঝরিণী সকলে ঝর্ঝর শব্দ মিলের অন্তরে স্বাধীন উদারতা ও কবিতার উদ্দীপনা করিয়া দিয়াছিল।

এই ফোর্ড আবেতে অবস্থিতিকালে বেন্থামের ভ্রাতা জেনেরাল সার সামুয়েল বেন্থাম ও তদীয় পরিবারবর্গের সহিত মিলের পরিচয় ও আত্মীয়তা হয়। এই সাক্ষাৎকারের কিছুদিন পরে জেনেরাল বেন্থাম ও তদীয় পরিবারবর্গ কার্য্যোপলক্ষে দক্ষিণ-ফ্রান্সে গমন ও কিছুদিনের জন্য অবস্থিতি করেন। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা মিলকে তাঁহাদিগের সহিত অন্ততঃ ছয় মাসের জন্য অবস্থিতি করিতে আহ্বান করেন এবং মিলও তাঁহাদিগের আহ্বানের অনুবর্ত্তন করিয়া ১৮২০ খৃষ্টাব্দের মে মাসে পিরিনিস-উপত্যকাস্থ রমণীয় প্রাসাদে তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইলেন। এই পার্ব্বত্য-প্রদেশের রমণীয় দৃশ্য মিলের হৃদয়ে গভীরতম ভাব অঙ্কিত এবং তাঁহার রুচিকে চির-জীবনের মত উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত করিয়াছিল। মিল চতুর্দ্দিকে মনোহর পর্ব্বতদৃশ্যে পরিবেষ্টিত হইয়া একদিকে ফরাসী জড়জগতের অসীম সৌন্দর্য্য অবলোকন করিতে লাগিলেন; অন্যদিকে ফরাসী ভাষা অধ্যয়ন পূর্ব্বক ফরাসী সাহিত্য ও বিজ্ঞান-সাগরে অবতরণ করিলেন। তিনি মণ্টপিলিয়ার নগরে "ফ্যাকলটি ডেস্ সায়েন্সেস্" কালেজে মসো আংগ্লেডার রসায়ন-বিদ্যাবিষয়ক, মসো প্রভেন্কালের ভূতত্ত্ব-বিদ্যাবিষয়ক ও মসো জারগোনের ন্যায়দর্শন বিষয়ক বক্তৃতা সকল শ্রবণ করিয়া জ্ঞানমার্গে অধিকতর অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং এ দিকে "লিসি" কালেজের অধ্যাপক মসো লেন্থেরিকের নিকট অঙ্কশাস্ত্রের উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছিলেন। এইরূপে মিলের এক বৎসরেরও অধিককাল ফ্রান্সে

অতিবাহিত হইয়া গেল। ফরাসীজাতির সকল সামাজিক অমায়িক ভাব মিলের হৃদয়ে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ হইয়াছিল। ফরাসীজাতির একটি বিশেষ গুণ মিলের হৃদয় আকৃষ্ট করে। এই আকর্ষণের বিশেষ কারণ এই যে, ইংলণ্ডে এই গুণ অতি বিরল-প্রসর। ফরাসীজাতি শত্রুতার কারণ না থাকিলে সকলকেই বন্ধুভাবে দেখেন এবং সকলের নিকটেই বন্ধুজনোচিত ব্যবহারের প্রত্যাশা করেন, কিন্তু ইংরাজজাতি সাধারণতঃ সকলকেই প্রথমে শত্রুভাবে দেখেন এবং কাহারও নিকট কোন বিষয়ে প্রত্যাশা করেন না। এই বৈষম্য জন্য ফরাসীরা জাতীয় তুলনায় মিলের নিকট ইংরাজদিগের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বলিয়া প্রতীত হইয়াছিলেন।

মিল্ এইরূপে এক বৎসরেরও অধিককাল ফ্রান্সে অবস্থিতি করিয়া অবশেষে ১৮২০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করেন। পারিস নগর দিয়া যাইবার সময় বিখ্যাত অর্থতত্ত্ববিৎ মসো সে এবং বিখ্যাত দার্শনিক সেণ্ট সাইমনের সহিত তাঁহার পরিচয় ও আত্মীয়তা জন্মে। ফ্রান্সে অবস্থিতি ও এই মহাত্মাদিগের সহিত কথোপকথন দ্বারা স্বাধীন চিন্তার ভাব মিলের মনে অধিকতর উদ্দীপিত হইয়া উঠে। এই উদ্দীপিত স্বাধীন-চিন্তার ভাব তাঁহাকে চিরজীবন অশ্রান্তভাবে উন্নতির পথে অগ্রসর করে।

তৃতীয় অধ্যায়

আত্মশিক্ষা।

মিল্ ফ্রান্স হইতে গৃহে প্রত্যাগমনের পর দুই এক বৎসর প্রধানতঃ পুরাতন পাঠ সকলের আলোচনা করিতে লাগিলেন। নূতন পুস্তকের মধ্যে পিতৃদেব-রচিত অর্থনীতি ও অর্থব্যবহারবিষয়ক নব-প্রকাশিত পুস্তক এবং কণ্ডিলাক্-লিখিত "ট্রেট ডেস্ সেন্‌সেসন্স" ও "কোর্স ডেটিউডস" নামক ন্যায় ও দর্শনশাস্ত্রবিষয়ক পুস্তকদ্বয় সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার হস্তে পতিত হয়। ইহার পর ফরাসীবিপ্লব বিষয়ক ইতিহাস পাঠ করিয়া তিনি বিস্ময় ও আনন্দ-রসে আপ্লুত হন। এই প্রলয়সদৃশ ঘটনার বিষয় তিনি পূর্ব্বে সবিশেষ অবগত ছিলেন না। তিনি কেবল এইমাত্র জানিতেন যে, চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ লুইয়ের যথেচ্ছাচারিতায় জর্জ্জরীভূত ফরাসীজাতি ফরাসীরাজ ষোড়শ লুই ও তদীয় সহধর্ম্মিণী রাজ্ঞী মেরিয় আ্যাণ্টয়নেটির প্রাণবিনাশ পূর্ব্বক যথেচ্ছাচারিতার শৃঙ্খল হইতে আপনাদিগকে উন্মুক্ত করেন এবং অসংখ্য স্বজাতির রুধিরে হস্ত কলুষিত করিয়া অবশেষে নেপোলিয়ানের করে আত্ম-সমর্পণ করেন। পূর্ব্বে তিনি ফরাসীবিপ্লবের এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ মাত্র অবগত ছিলেন। এক্ষণে সবিশেষ জানিতে পারিয়া, ফরাসী জিরণ্ডিষ্টেরা যে স্বাধীনতা ও যে সাধারণতন্ত্রের জন্য ধন প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন,—তিনি সেই স্বাধীনতা ও সেই সাধারণতন্ত্রের পিপাসু হইয়া উঠিলেন। তাঁহার সজীব কল্পনা তাঁহার মনে এই চিত্র অঙ্কিত করিল—যেন ফরাসীবিপ্লবের ন্যায় একটি ঘটনা অচিরকালমধ্যেই ইংলণ্ডে সংঘটিত হইবে এবং তিনি ইংলণ্ডীয় মহাসভায় ফরাসী জিরণ্ডিষ্টের আসন গ্রহণ করিবেন।

ইংরাজব্যবহারশাস্ত্রের উপর যেমন মিলের বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না। তথাপি তিনি পুত্রকে সর্ব্বাপেক্ষা ব্যবহারবিভাগেরই যোগ্য মনে করিয়া নূতন বন্ধু অষ্টিনের নিকট রোমীয় ব্যবহারশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে বলেন। তদনুসারে মিল ১৮২১-২২ খৃষ্টাব্দে অষ্টিনের নিকট ব্যবহারশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। ডিউমণ্ট—"টেট্‌ডি লেজিসলেসন" নামক যে পুস্তকে বেন্‌থামের বিধি-বিষয়ক মত সকল ব্যক্ত করিয়াছেন, এই সময়ে সেই পুস্তক মিলের হস্তে পতিত হয়। এই পুস্তক মিলের মনোজগতে একটি নূতন যুগের অবতারণা করে। মিল্ আশৈশব বেন-থামিক প্রণালীতেই দীক্ষিত ছিলেন। "যে কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে অধিক লোকের সুখের উৎপাদক, তাহাই ধর্ম্ম ও লোকের করণীয়"—মিল সকল কার্য্যেই বেন্‌থামের এই মত প্রয়োগ করিতেন। সাধারণ লোকে যখন নীতি ও ব্যবহারবিষয়ক কোন প্রিয় মত যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে অক্ষম হয়, তখন ইহা 'প্রকৃতির নিয়ম', 'অভ্রান্ত যুক্তি' ও 'কর্ত্তব্য বুদ্ধি' প্রভৃতির অনুমোদিত বলিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীর চক্ষে ধূলিমুষ্টি

নিক্ষেপ করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু কার্য্য বা মতের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতা যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন না করিয়া, আমরা যাহা ভাল বুঝিতেছি বা যাহা পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে, তাহাই 'কর্ত্তব্যবুদ্ধির' প্রকৃতির নিয়মের' ও 'অভ্রান্ত যুক্তির' অনুমোদিত, শুদ্ধ ইহাই বলিলেই এক্ষণে আর পর্য্যাপ্ত হয় না। বেন্থাম এরূপ অসার বেদবাক্য সকলের মূলে সর্ব্বপ্রথমে কুঠারাঘাত করেন। তিনি নৈতিক রাজ্যে এক নূতন যুগের আবির্ভাব করেন। 'যাহা জগতের অত্যন্ত হিতকর ও অপরিসীম সুখের উৎপাদক' তাঁহার মতে তাহাই 'কর্ত্তব্য-বুদ্ধির', 'প্রকৃতির নিয়মের' ও 'অভ্রান্ত যুক্তির' অনুমোদিত। কারণ, প্রকৃতি বা ঈশ্বর যাঁহাকেই আমরা জগতের মূল কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করি না কেন, জগতের হিত ও সুখ যে তাঁহার জগৎকার্য্যের মুখ্য উদ্দেশ্য, তদ্বিষয়ে আর মতান্তর নাই। সুতরাং 'যাহাই জগতের হিত ও সুখের উৎপাদক', তাহাই 'কর্ত্তব্যবুদ্ধির', 'প্রকৃতি বা ঈশ্বরের নিয়মের' ও 'অভ্রান্ত যুক্তির' অনুমোদিত, এ বিষয়েও আর মতভেদ হইবার সম্ভাবনা নাই। তবে কোন্ কার্য্য জগতের হিত ও সুখের উৎপাদক, কেবল ইহার নির্ণয় যুক্তি ও প্রমাণসাপেক্ষ। সুতরাং কোন কার্য্য উচিত কি না, ইহার মীমাংসাস্থলে সেই 'কার্য্যের কর্ত্তব্যবুদ্ধি' প্রভৃতির অনুমোদনীয়তা ব্যক্ত না করিয়া, তাহা জগতের হিত ও সুখকর কি না, যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা কেবল তাহাই প্রতিপন্ন করা উচিত। যুক্তি ও প্রমাণের পরিবর্ত্তে 'কর্ত্তব্যবুদ্ধি', 'প্রকৃতি বা ঈশ্বরের নিয়ম' ও 'অভ্রান্ত যুক্তির অনুমোদনায়', শুদ্ধ এই কথাগুলি নির্দ্দেশ করিলেই চলিবে না। মিল্ বেন্থামের নিকট নীতিবিষয়ক পূর্ব্বোক্ত দুইটি মতের—হিতবাদ (Principle of utility) এবং সুখবাদ (Doctrine of happiness) শিক্ষা করেন। এই দুইটি মত তাঁহার হৃদয়ে ও মনে গ্রথিত হইয়া যায়, ইহাই তাঁহার নীতির এবং ইহাই তাহার বিজ্ঞানের মূল ভিত্তিস্বরূপ হইয়া উঠে। তিনি জীবনে যে কার্য্য করিতে যাইতেন, তাহাতেই হিতবাদ ও সুখবাদ তাঁহার কর্ত্তব্যবুদ্ধির নোদক হইয়া উঠিত। তাঁহার অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে, তিনি এই মতদ্বয়ের কার্য্যে প্রয়োগ দ্বারা জগতের অসীম মঙ্গল সংসাধিত করিতে পারিবেন। তাঁহার মনোজগতের পরিসর ইহা দ্বারা অতি পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠে। অধিক কি, ইহা তাঁহার শরীরে নূতন জীবন সঞ্চারিত করে।

মিল্ বেন্থামের বিধি, নীতি ও ন্যায়বিষয়ক গ্রন্থের পাঠ সমাপ্ত করিয়া ক্রমে লক্, হেলভেসিয়স, হার্টলে, কণ্ডিলাক, বার্কেলে, হিউম, রীড, ডিউগাল্ড, ষ্টুয়ার্ট, ব্রাউন্ প্রভৃতি বিখ্যাতনামা দার্শনিকদিগের গ্রন্থসাগরের পারদর্শী হইলেন। এই স্থানেই তাঁহার পাঠ সমাপ্ত হইল।

এতদিন মিল কেবল নির্জ্জনে বিদ্যানুশীলন করিতেন মাত্র। লোকের সহিত কিরূপে মিশিতে হয়, লোকের সহিত কিরূপে কথোপকথন করিতে হয়, তাহা তিনি এক রকম জানিতেন না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু পিতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পিতৃবন্ধুর সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল এবং তাঁহাদিগের সহিত কথোপকথনে মিলেরও তর্ক ও বাক্শক্তি ক্রমেই স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল। প্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা গ্রোট্ এবং প্রসিদ্ধ ব্যবহারবিৎ অষ্টিন্, জেম্সের নিকট নবপরিচিত হইলেন। তাঁহাদিগের সহিত পরিচয় অচিরকালমধ্যেই বন্ধুত্বে পরিণত হইল। গ্রোট্ বয়সে জেম্সের অনেক কনীয়ান্, সুতরাং মিল অপেক্ষা বয়সে অধিক বড় ছিলেন না। এই জন্য মিলের সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মিল। মিল ইহাঁর সহিত নৈতিক, রাজনৈতিক, ও দার্শনিক প্রভৃতি নানা বিষয়ে কথোপকথন করিয়া বিশেষ প্রীত হইতেন এবং প্রায় সকল বিষয়েই ইহাঁর সহানুভূতি প্রাপ্ত হইতেন।

অষ্টিন্ গ্রোট্ অপেক্ষা প্রায় ৫।৬ বৎসরের অধিকবয়স্ক ছিলেন। ইনি সফোক্ নগরের একজন সমৃদ্ধিশালী বণিকের জ্যেষ্ঠ পুত্র হইয়াও সৈনিকবৃত্তি অবলম্বন করেন এবং সিসীলীয় সমরে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিকের অধীনে সৈনিকপদে অভিষিক্ত হন। সমর সমাপ্ত হইলে তিনি সৈনিকবৃত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্যবহারাজীবের ব্যবসায় অবলম্বন করেন। গ্রোট্ অনেক বিষয়ে জেমস মিলের শিষ্য ছিলেন, কিন্তু তিনি স্বাধীন মত সংস্থাপিত করেন, সুতরাং প্রায় কোন বিষয়েই জেম্সের শিষ্য ছিলেন না। ইনি অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন ছিলেন এবং তাঁহার অসাধারণ ধীশক্তি কথোপকথনের সময়েই বিশেষ স্ফূর্ত্তি পাইত। তিনি পৃথিবী ও সমাজের বর্ত্তমান দীন হীন অবস্থায় পরিতৃপ্ত ছিলেন না। এই জন্য

তাঁহার মুখমণ্ডলে সতত বিষাদচিহ্ন উপলক্ষিত হইত। মানবজাতির উন্নতিসাধনে বলবতী ইচ্ছা, বলবৎ কর্ত্তব্যজ্ঞান, অসাধারণ ধীশক্তি এবং অক্ষয় জ্ঞানরাশি সত্ত্বেও এই মহাপুরুষ শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা বশতঃ জগতে মহতী কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পারে নাই। যাহা হউক, এই অসাধারণ ব্যক্তির বুদ্ধি ও নীতি মিলের মন ও হৃদয়কে অধিক পরিমাণে উত্তোলিত করিয়াছিল সন্দেহ নাই। তিনি মিলকে অতিশয় ভালবাসিতেন এবং তাঁহার উন্নতিসাধনে সতত সচেষ্ট থাকিতেন।

এই সময়ে অষ্টিনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা চার্লস অষ্টিনের সহিত মিলের আলাপ হয়। চার্লস অষ্টিন কেমব্রিজ বিশ্বালয়ের একজন অদ্বিতীয় ছাত্র ছিলেন, উক্ত স্থানে ইউনিয়ন ডিবেটিং ক্লাব নামে একটি সভা ছিল। চার্লস সেই সভার অধিনায়ক ছিলেন। মেকলে হাইড, চার্লস ভিলিয়ার্স্ ষ্ট্রট, রোমিলী প্রভৃতি অদ্বিতীয় পণ্ডিতগণ এই সভার সভ্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হন। চার্লস অষ্টিনের প্ররোচনায় মিলও এই সভার সভ্য মনোনীত হইলেন। অষ্টিনের স্বাধীন বক্তৃতা সকল ইংলণ্ডের ইতিহাসে একটি নবযুগের আবির্ভাব করে। বেন্থামের গভীর মত ও যুক্তি সকল ইহাঁরই বক্তৃতা-বলে সর্ব্বত্র বিধুনিত হয়। চার্লস অষ্টিনের সহিত সখ্য, মিলের জীবনে একটি নূতন কাণ্ডের অবতারণা করে। মিল এত দিন পর্য্যন্ত যত লোকের সহিত মিশ্রিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই বয়োবিশ্বায় তাঁহার জ্যেষ্ঠ। তাঁহাদিগের সহিত মিলের গুরুশিষ্য-ভাব ছিল। এরূপ লোকদিগের সহিত সাহচর্য্যে স্বাধীন চিন্তা বিস্ফুরিত হয় না। মিল চার্লস অষ্টিনের সহিতই সর্ব্বপ্রথমে সমতল ভূমিতে অবতরণ করেন। ইহাঁরই সাহচর্য্যে মিলের চিন্তা ও তর্কশক্তি অধিকতর পরিমার্জ্জিত ও পরিস্ফুরিত হয়।

১৮২২ খৃষ্টাব্দে মিল একটি ক্ষুদ্র সভা সংস্থাপিত করেন। যাঁহারা সমাজ ও রাজ্যশাসন বিষয়ে হিতবাদ মতের অনুবর্ত্তন করেন, তাঁহারাই কেবল এই সভার সভ্য হইলেন। প্রতি পক্ষে এই সভার একবার করিয়া অধিবেশন হইত এবং ইহাতে হিতবাদ মত সম্বন্ধে প্রস্তাবাদি গঠিত হইত। সর্ব্বপ্রথমে ইহার তিনজন মাত্র সভ্য ছিল। ইহার সভ্যশ্রেণীর সংখ্যা কখনই দশ জনের অধিক হয় নাই। পরিশেষে ইহা সার্দ্ধ তিন বৎসর কাল পরিমিত জীবনের পর ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে বিচ্ছিন্ন হয়। এই সভা সংস্থাপনে মিলের দুইটি মহৎ উপকার সংঘটিত হয়। প্রথমতঃ তাঁহার বক্তৃতাশক্তি বিস্ফুরিত ও পরিমার্জ্জিত হয়। দ্বিতীয়তঃ সমবয়স্ক ও সমমতাবলম্বী যুবকবৃন্দের উপর তাঁহার অধিনায়কত্ব সংস্থাপিত হয়।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের যে মাসে মিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারতবর্ষীয় করেস্পনডেণ্ট ডিপার্ট-মেণ্টের অন্যতম কেরাণীর পদে অভিষিক্ত হইলেন। ভারতবর্ষীয় স্বাধীন ও করদ রাজ্য সকলের সহিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যে সকল পত্রাদি (ডেস্‌পাচ) লিখিতে হইত, প্রথম হইতে মিল্‌কে সেই সকলের খস্‌ড়া (ড্রাফট) প্রস্তুত করিতে হইত। মিল্ অচির-কালমধ্যেই এই কার্য্যে অসাধারণ পারদর্শিতা লাভ করিলেন এবং ইহার পুরস্কারস্বরূপ শীঘ্রই পরীক্ষক (Examiner) পদে অভিষিক্ত হইলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহার ঐ পদে অভি-ষিক্ত হওয়ার দুই বৎসরের মধ্যেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জীবিতকাল পর্য্যবসিত হয়। এই ঘটনায় মিল্ ইতি-কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। তাঁহার অবস্থা এত ভাল ছিল না যে, তিনি কোন কার্য্যে নিযুক্ত না হইয়াও সহজে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন। দিন রাত্রির ১৪ ঘণ্টার কিয়দংশ তাঁহাকে অগত্যা জীবিকানির্ব্বাহের জন্য ব্যয়িত করিতেই হইবে। কিন্তু কোন্ কার্য্যে ইহা ব্যয়িত করিবেন, স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি কোন ব্যবসায়েই দীক্ষিত হন নাই, সুতরাং ব্যবসায় দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করা তাঁহার পক্ষে সুকঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। এমন কোন পৃষ্ঠবলও ছিল না, যাঁহার সাহায্যে কোন উপযুক্ত পদে অভিসিক্ত হন। সংবাদ-পত্রের স্তম্ভ পূরণ বা পুস্তক লিখন বই তাঁহার জীবিকানির্ব্বাহের উপায়ান্তর ছিল না। কিন্তু যে ব্যক্তি স্বাধীন চিন্তা ও সাহিত্যের উচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করেন এবং যাঁহার বিবেক-শক্তি এত বলবতী যে, তিনি অর্থের জন্য নিজের মতের বিরুদ্ধে লিখিতে অসমর্থ, তাঁহার পক্ষে সংবাদ-পত্রের আশ্রয় গ্রহণ করা বিড়ম্বনা মাত্র। বিশ্বালয়ের ছাত্রদিগের জন্য যে সকল পুস্তক সংরচিত হয়, তাহাতে কথঞ্চিৎ জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে বটে, কিন্তু সে সকল রচনা কখন চিরস্থায়িনী হইতে পারে না। যে সকল পুস্তক ভাবী চিন্তা শীলব্যক্তিদিগের

মূলভিত্তিস্বরূপ হইবে, সে সকল পুস্তক লিখিতে অনেক সময় ও চিন্তার প্রয়োজন এবং সাধারণতঃ তাহাদিগের জনসমাজে পরিচিত ও খ্যাত হইতে অনেক বিলম্ব ঘটিয়া থাকে; সুতরাং তাহাদিগের উপর জীবিকা নির্ভর করা যাইতে পারে না। সাধারণ লোকের প্রীতিবিধানের নিমিত্ত পুস্তক লিখিলেও কিয়ৎপরিমাণে অর্থোপার্জ্জন হয় বটে, কিন্তু প্রবৃত্তি ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে এরূপ করা অতিশয় ক্লেশকর। এই সকল কারণে লিখনোপজীবী ব্যক্তিদিগের জীবন সকল অবস্থাতেই কারুণ্যোদ্দীপক। তথাপি মিল এই অনিশ্চিত জীবনই অবলম্বন করিলেন। পিতা তাঁহাকে ব্যবহারাজীবের ব্যবসায়ে দীক্ষিত করিবেন ইচ্ছা করিয়াছিলেন এবং তদনুযায়ী শিক্ষাও বিধান করিয়াছিলেন। কিন্তু পুত্র অর্থজনিত গৌরবের আকাঙ্ক্ষী ছিলেন না, সুতরাং তিনি পিতার ইচ্ছা পূরণ করিতে পারিলেন না।

মিল্ নাগরিক-জীবন-প্রিয় ছিলেন না। তিনি প্রতি রবিবার প্রাতঃকালে পদব্রজে লণ্ডনের নিকটবর্ত্তী গ্রামসকল পরিভ্রমণ করিয়া আসিতেন। ফ্রান্সে ভ্রমণ করার পর হইতে তাঁহার ভ্রমণস্পৃহা দিন দিন উপচীয়মান হইতে থাকে। এই জন্য তিনি বৎসরে বৎসরে যে এক মাস করিয়া অবকাশ পাইতেন, তাহা প্রায়ই ভ্রমণে পর্য্যবসিত করিতেন। প্রায়ই তাঁহার বাৎসরিক ফ্রান্স, বেলজিয়ম এবং রিণিসজর্ম্মণী পরিভ্রমণের স্থানভূত হইত এবং অবশেষে তিনি পীড়াব্যপদেশে একবার তিন মাস ও একবার ছয় মাস সুইজর্লণ্ড, টাইরল এবং ইটালী পরিভ্রমণ করিয়া আইসেন। এই সকল ভ্রমণের মোহন ভাব মিলের অন্তরে এত গভীররূপে অঙ্কিত হয় যে, তিনি জীবনে ইহা কখনও ভুলিতে পারেন নাই।

মিল্ বিষয়কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও বিদ্যাচর্চ্চায় কখন শিথিল-প্রযত্ন হন নাই। বরং তিনি যৎকালে ইণ্ডিয়া হাউসে নিযুক্ত ছিলেন, তখন তাঁহার বিদ্যানুশীলনের যত্ন অধিকতর পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। এই সময়ে ট্রাভেলার এবং মর্ণিং ক্রনিক্লর নামক দুইখানি সংবাদপত্রে তাঁহার কয়েকখানি অত্যুৎকৃষ্ট পত্র প্রকাশিত হয়। ঐ সকল পত্রে অর্থনীতি, রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি বিষয়ে স্বাধীন মত সকল লিখিত হয়। পেরী মর্ণিং ক্রনিক্লরের সম্পাদক ছিলেন। পেরীর মৃত্যুর পর জন ব্লাক্ ইহার সম্পাদকত্ব গ্রহণ করেন। ব্লাক্ অসাধারণ-বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন ও বেন্থামের মত সকলে বিশেষ দীক্ষিত ছিলেন। ব্লাকের সময়ে ক্রনিক্লর হিতবাদী র‍্যাডিকালদিগের মুখযন্ত্র স্বরূপ হইয়া উঠে। ইংলণ্ডের আইন, ইংলণ্ডের জজ ও অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের কার্য্যপ্রণালী অভ্রান্ত বলিয়া ইংরাজমাত্রের ভ্রান্ত সংস্কার ছিল। ক্রনিক্লর প্রমাণ দ্বারা সেই অন্যায় সংস্কারের নিরাস করিয়া ইংলণ্ডের বিচার ও শাসনবিষয়ক সংস্কারের আরম্ভ করে। ব্লাকের সহিত জেমস মিলের বিশেষ হৃদ্যতা জন্মে। এই হৃদ্যতাজন্য ক্রনিক্লর জেমস মিলেরও মুখযন্ত্র-স্বরূপ হইয়া উঠিল। জেমস মিল স্বয়ং ব্লাক্ দ্বারা নিজের স্বাধীন নূতন মত সকল এই পত্রিকায় প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিছুকাল যায়, এমন সময়ে ওয়েষ্টমিনিষ্টর রিভিউয়ের প্রস্তাব আরম্ভ হয়। এই সময়ে এডিনবরা ও কোয়াটরলির যশঃসৌরভে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত করিয়াছিল। এই দুইখানি পত্রিকাই কন্জারভেটিবদিগের প্রবল যন্ত্র ছিল। এই দুইখানির প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে, এমন একখানি মাসিক পত্রের অভাব র‍্যাডিকালদিগের শিরোমণি বেন্থামই সর্ব্বপ্রথমে অনুভব করেন। এই অভাবদূরীকরণ মানসে বেন্থাম ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে নিজ ব্যয়ে এই পত্রিকা বাহির করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। তিনি জেম্স্ মিলকে ইহার সম্পাদকের ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু জেম্স ইণ্ডিয়া হাউসের কর্ম্মচারী ছিলেন বলিয়া এই ভার-গ্রহণে অস্বীকৃত হইলেন। জেম্স অস্বীকৃত হইলে লণ্ডনের একজন প্রসিদ্ধ বণিক্ সার জন্ বাউরিঙের হস্তে এই ভার সমর্পিত হইল। বাউরিং প্রায় দুই তিন বৎসর হইতে ক্রমাগত বেন্থামের নিকট যাতায়াত করিয়া বেন্থাম ও বেন্থামের মতসকলের উপাসক হইয়া উঠেন। বেন্থামও তাঁহার কতকগুলি সদ্গুণে তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হইয়া উঠেন। এতদ্ভিন্ন প্রায় সকল র‍্যাডিক্যালদিগের সহিত বাউরিঙের আলাপ ও পত্রাদির বিনিময় ছিল। সুতরাং বাউরিংই বেন্থামের মত সকল জগতে ঘোষণা করিতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সমর্থ। এই সকল কারণেই এই নবপ্রস্তাবিত পত্রিকার সম্পাদকের ভার তাঁহারই

উপর অর্পিত হইল। এইরূপে জগন্মান্য ওয়েষ্টমিনিষ্টার জগতে প্রাদুর্ভূত হয়। বাউরিঙের সহিত জেম্‌স মিলের বিশেষ আত্মীয়তা ছিল না। কিন্তু জেম্‌স বাউরিঙের বিষয় যতদূর জানিতেন, তাহাতে তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, তিনি এরূপ সামাজিক, রাজনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক পত্রিকার সম্পাদকীয় ভার গ্রহণের অযোগ্য। সুতরাং তাঁহার হস্তে এই পত্রিকার ভার অর্পিত থাকিলে বেন্‌থামের যশ ও ধনের অপচয় হইবে। তথাপি তিনি বেন্‌থামকে পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না এবং তাঁহার অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া প্রথম সংখ্যাতে এক সুদীর্ঘ প্রস্তাব রচনা করেন। এডিন্‌বরা রিভিউএর প্রথমাবধি সকল সংখ্যার সমালোচনই এই প্রস্তাবের বিষয়ীভূত। জেম্‌স্ পুত্রকে সেই সমস্ত সংখ্যার স্থূল মর্ম্ম লিখিতে আদেশ করেন এবং পুত্রলিখিত সেই স্থূল মর্ম্ম অবলম্বন করিয়াই সমস্ত সংখ্যার সমালোচনা করেন। ওয়েষ্টমিনিষ্টার রিভিউয়ের আবির্ভাবে ইংলণ্ডে যে আন্দোলন উপস্থিত হয়, তাহার প্রধান কারণ এই সমালোচন। এই সমালোচনের যে পরিশিষ্ট প্রকাশিত হয়, তাহা দ্বিতীয় সংখ্যায় ও অতি চমৎকার! ইহা পুত্র কর্ত্তৃক সংরচিত হয়।

অচিরকালমধ্যে এই পত্রিকার উদ্দেশ্য আরও বিস্তৃত হইয়া উঠে। সাহিত্য-বিষয়ক বিভাগ ইহার সহিত সংযোজিত হয়। হেন্‌রী সদরন্ নামে একজন সাহিত্যোপজীবী ব্যক্তি এই বিভাগের সম্পাদকত্বভার গ্রহণ করেন। অবশেষে অনেক বিঘ্ন-পরম্পরা অতিক্রম করিয়া ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে, এই পরিবর্দ্ধিত পত্রিকা জনসমাজে প্রকাশিত হয়। ইহার কৃতকার্য্যতা আশাতীত হওয়ায় র‍্যাডিক্যালমাত্রেরই অন্তরে অভূতপূর্ব্ব আনন্দের আবির্ভাব হইল। এখন হইতে সকলেই ইহার উন্নতিসাধনে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

জেম্‌স্ মিল্ ইহার একজন নিয়মিত লেখকের মধ্যে ছিলেন। তিনি ইহাতে অনেকগুলি প্রস্তাব লিখেন। তন্মধ্যে চারিটি অতি প্রসিদ্ধ। প্রথমটির বিষয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহা এডিনবরার সমালোচন; দ্বিতীয়টি কোয়ার্টার্লীর সমালোচনা; তৃতীয়টি পঞ্চম সংখ্যায় সদের "বুক অব দি চর্চ্চ" নামক পুস্তকের উপর আক্রমণ; এবং চতুর্থটি দ্বাদশ সংখ্যায় রাজনীতি-বিষয়ক। অষ্টিন্ ইহাতে একটিমাত্র প্রস্তাব লিখেন। ইহা এডিনবরায় প্রকাশিত মক্‌কলক্ লিখিত জ্যেষ্ঠাধিকার-বিষয়ক প্রস্তাবের প্রতিবাদ। মক্‌কলক্ জ্যেষ্ঠাধিকার প্রণালীর সমর্থন করেন এবং অষ্টিন্ প্রবলতর যুক্তি দ্বারা তাঁহার যুক্তি সকলের খণ্ডন করেন। গ্রোটও একবার বই ইহাতে লিখিতে পারেন নাই। তাঁহার সমস্ত সময়ই তাঁহার সুবিখ্যাত গ্রীক ইতিহাসে পর্য্যবসিত হইত। তাঁহার এই প্রস্তাব তাঁহার প্রিয়-ইতিহাসবিষয়কই। বিগনাল চার্লস্ অষ্টিন এবং ফন ব্লঙ্ক প্রভৃতিও ইহার অনিয়মিত লেখকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মিলের বিশেষক বন্ধুদিগের মধ্যে ইলি, ইটন, টুক্, গ্রেহাম, এবং রীবেক প্রভৃতিও ইহার লেখকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হন। মিল সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতম নিয়মিত ছিলেন। দ্বিতীয় সংখ্যা হইতে অষ্টাদশসংখ্যা পর্য্যন্ত কয়েক খণ্ডে মিলের লেখনী হইতে সর্ব্বশুদ্ধ ত্রয়োদশটি প্রস্তাব বহির্গত হয়। সেগুলি প্রায় অধিকাংশই ইতিহাস ও অর্থনীতিবিষয় পুস্তক সকলের সমালোচন অথবা রাজনীতি ও ব্যবহার-শাস্ত্র-বিষয়ক প্রস্তাব। জেমস্ মিলের অন্যান্য বন্ধুদিগের নিকট হইতেও মধ্যে মধ্যে অতি উৎকৃষ্ট প্রস্তাব সকল আসিতে লাগিল। বাউরিঙের হস্ত হইতেও কয়েকটা অতি উৎকৃষ্ট প্রস্তাব বহির্গত হইল। তথাপি জেমস্ মিল এবং গ্রোট ও অষ্টিন্ প্রভৃতি তাঁহার বন্ধুবর্গের মনস্তুষ্টি হইল না। তাঁহারা সর্ব্বদাই এই পত্রিকা বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং মিল ও তাঁহার সহচরবৃন্দও গুরুজনদিগের অনুবর্ত্তন করিলেন। এইরূপে তাঁহারা সম্পাদকদ্বয়ের জীবন যন্ত্রণাময় করিয়া তুলিলেন। মিল পরিণত বয়সে স্বীকার করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদিগের এরূপ ব্যবহার করা কতক পরিমাণে অন্যায় হইয়াছিল। তাঁহারা এই পত্রিকার যতদূর অনাদর করিয়াছিলেন, ইহা ততদূর অনাদরের যোগ্য হয় নাই।

ইত্যবসরে এই পত্রিকার যশঃসৌরভ পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হইল এবং ইহার গৌরববৃদ্ধির সহিত বেন্‌থামিক্ র‍্যাডিক্যালিজম্ মতেরও গৌরব বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এই পত্রিকার প্রাদুর্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডে স্বাধীন চিন্তার স্রোতঃ প্রবলবেগে প্রবাহিত হইল এবং সমাজ ও রাজ্যসংস্কারের অভাব সর্ব্বত্র অনুভূত হইল। এতদিন পরে যেন ইংলণ্ডের নিদ্রাভঙ্গ হইল। উন্নতির স্রোতঃ ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র

প্রবাহিত হইল। বেন্থামের নাম সর্ব্বত্র প্রতিধ্বনিত হইল। অসংখ্য যুবকবৃন্দ এই নূতন মতের উপাসক হইয়া উঠিলেন। অনেকের বিশ্বাস ছিল যে, বেন্থামের শিষ্যবর্গেরা তাঁহার মুখ হইতে তাঁহার মত সকল শ্রবণ করিত। এরূপ বিশ্বাস যে অমূলক, তাহা জেম্‌স মিল তাঁহার "ফ্রাগমেণ্ট অব্ ম্যাকিণ্টস্" নামক পুস্তকে প্রতিপাদন করিয়াছেন। বেন্থামের মত সকল তাঁহার রচনাতেই পরিব্যক্ত হয়। সে সকল তাঁহার কথোপকথনে প্রায় প্রকাশ পাইত না। তাঁহার মত সকল তাঁহার প্রিয়বন্ধু জেম্‌সের কথোপকথন দ্বারা ইংলণ্ডের যতদূর প্রচারিত হয়, তাঁহার রচনা দ্বারা ততদূর হয় নাই। জেম্‌স মিলের অসাধারণ দেশহিতৈষিতা, অসামান্য মানবপ্রেম, অতি উচ্চ নৈতিক ভাব, সহাস্যবদন এবং স্বভাবের অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যে—শ্রোতৃমাত্র তাঁহার মতের অনুবর্ত্তী না হইয়া থাকিতে পারিতেন না। সকলেই কোন কার্য্যে তাঁহার অনুমোদনে প্রফুল্ল ও তাঁহার অননুমোদনে বিষণ্ণ হইতেন। ভগ্নহৃদয় ব্যক্তি তাঁহার আশ্বাসবাক্যে নবজীবন প্রাপ্ত হইতেন। বলিতে কি, জেম্‌স্ মিলের সাহায্য ব্যতীত বেন্থামিক মত সকল কখনই জগতে এত শীঘ্র প্রচারিত হইত না।

বেন্থামের মত সকল জেম্‌স্ মিল দ্বারা তিন প্রধান স্রোতে প্রবাহিত হয়। প্রথম স্রোত জন মিল। দ্বিতীয় স্রোত কেম্ব্রিজের অলঙ্কারস্বরূপ চার্লস অষ্টিন্ এবং লর্ড বেলপার, লর্ড রোমিলী প্রভৃতি তাঁহার সহাধ্যায়িবর্গ। তৃতীয় স্রোত কেম্ব্রিজের অণ্ডার গ্রাজুয়েট ইটন্ টুক্ এবং চার্লস বুলার প্রভৃতি তাঁহার সহাধ্যায়িবৃন্দ। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য অসংখ্য ক্ষুদ্র স্রোতে এই সকল মত প্রবাহিত হয়। তন্মধ্যে ব্লাক ও ফন্ ব্লাঙ্ক প্রধান। কিন্তু ফন্ ব্লাঙ্কের সহিত মিলের অনেক মতভেদ হইত। তন্মধ্যে রাজ্যের শাসনকার্য্যে স্ত্রীজাতির পরিবর্জ্জন সর্ব্বপ্রধান। মিল এবং তাঁহার সহচরবৃন্দ স্ত্রীজাতি পরিবর্জ্জনের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। আহ্লাদের বিষয় এই যে, বেন্থাম্ও তাঁহাদিগের মতের পরিপোষক ছিলেন।

মিল ও তাঁহার সহচরবৃন্দ এক্ষণে যে মতের উপাসক হইয়া উঠিলেন, তাহা শুদ্ধ বেন্থামের নহে; কিন্তু বেন্থাম হার্টলে, ম্যালথস এবং জেম্‌স্ মিল প্রভৃতির মতের সারভাগ মাত্র।

রাজনীতি বিষয়ে জেম্‌স্ মিলের যে দুই বিষয়ের উপযোগিতা সম্বন্ধে প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল, তাহা এই—প্রতিনিধি শাসনপ্রণালী এবং তর্ক-বিতর্কের পূর্ণ স্বাধীনতা। তিনি বলিতেন যে, যদি সকল প্রজাই লেখা-পড়া শিখে, যদি সকল প্রস্তাবই উভয় পক্ষের যুক্তি, লিখন ও বর্ণনা দ্বারা তাহাদিগের হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায় এবং যদি তাহারা পার্লিয়ামেণ্টে আপনাদিগের ইচ্ছানুরূপ সভ্য মনোনীত করিতে পারে, তাহা হইলে শাসনের অতি উৎকৃষ্ট উদ্দেশ্য সংসাধিত হইতে পারে। পার্লিয়ামেণ্টের সভ্যগণ সাধারণ প্রজাপুঞ্জ দ্বারা মনোনীত হইলে, তাঁহারা কোন শ্রেণীবিশেষের উদ্দেশ্যসাধনে করিতে কখনই চেষ্টা করিবেন না। সাধারণ প্রজাপুঞ্জের মঙ্গলই তাঁহাদিগের কার্য্য প্রণালীর নিয়ামক হইবে। সুতরাং তাঁহাদিগের কার্য্য-প্রণালীর উপর কাহারও অসন্তুষ্ট হইবার কারণ থাকিবে না। সকল প্রকার শ্রেষ্ঠতন্ত্র শাসন-প্রণালীরই উপর জেম্‌স্ মিলের বিদ্বেষ ছিল। তিনি সে সমস্তকেই জগতের সুশাসনের প্রধান অন্তরায় মনে করিতেন। এই জন্য তল্লিখিত সমস্ত রাজনৈতিক প্রস্তাবেই তিনি রাজ্যের প্রত্যেক ব্যক্তিরই মহাসভার সভ্য মনোনীত করণের আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। মনুষ্য মাত্রেরই আপন নিয়ম ও শাসনকর্ত্তা মনোনীত করিবার অধিকার আছে বলিয়াই যে তিনি এরূপ বলিতেন, তাহা নহে; রাজ্যের নিয়ম ও শাসনবিষয়ে ব্যক্তিমাত্রেরই হস্ত না থাকিলে কখনই রাজ্যে সুনিয়ম ও সুশাসন সংস্থাপিত হইতে পারে না, এই জন্যই তিনি এরূপ বলিতেন। তিনি বেন্থামের ন্যায় এরূপ বিশ্বাস করিতেন না যে, রাজা থাকিলে রাজ্যে সুনিয়ম ও সুশাসন সংস্থাপিত হইতে পারে না। সুনিয়ম ও সুশাসন সংস্থাপনে রাজার ভাব আর অভাব দুই সমান। রাজ্যের সকল শ্রেণীর উপর রাজ্যের শাসন ও নিয়ম সংস্থাপনের ভার থাকিলে রাজার ভাল বা মন্দ হওয়ায় কিছু বিশেষ আসে যায় না। তিনি বলিতেন যে, শুদ্ধ সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর হস্তে রাজ্যভার অর্পিত থাকিলে রাজ্যের যেরূপ অনিষ্ট সম্ভাবনা, সেইরূপ গবর্ণমেণ্ট-সাহায্যকৃত যাজকমণ্ডলী দ্বারা ধর্ম্মনীতির উচ্ছেদ-সম্ভাবনা। মানবমনের নৈতিক উন্নতির স্রোত রোধ করা তাঁহাদিগের স্বার্থ। কারণ,

মানবজাতি নীতিমার্গে অতিশয় অগ্রসর হইলে তাঁহাদিগের অস্তিত্ব অনাবশ্যক হইয়া উঠে। এই জন্য তিনি যাজকসম্প্রদায়কে অতিশয় ঘৃণা করিতেন। যাজকমণ্ডলীর ব্যক্তিবিশেষের উপর তাঁহার কোন বিদ্বেষ ছিল না। বরং অনেকের সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। কেবল তিনি প্রজাদিগের রুধির দ্বারা এরূপ সম্প্রদায়ের পরিপোষণ প্রণালীর উপর বিশেষ বিরক্ত ছিলেন। নীতিবিষয়ে জেমস্ মিলের মত সম্বন্ধে শুদ্ধ এই বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, যাহা কিছু জগতের অধিকাংশ প্রাণীর হিতসাধক, তাহাই নীতিমার্গানুমোদিত। এতদ্ভিন্ন আর যাহা কিছু সকলই ভ্রান্তি বিজৃম্ভিত। তিনি স্ত্রী ও পুরুষজাতির পরস্পর অসঙ্কোচিত মিশ্রণের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। এরূপ মিশ্রণে সমষ্টিতঃ জগতের মঙ্গল বই অমঙ্গল হইবার সম্ভাবনা নাই। সতত সন্দর্শনাভাবে স্ত্রী ও পুরুষ উভয় জাতির কল্পনা অতি দূষিত হইয়া থাকে। পরস্পরের সহিত সম্মিলনেচ্ছা অতি বলবতী হইয়া উঠে। সেই সম্মিলনেচ্ছা প্রতিরোধ অধিকতর বলবতী হইয়া অনেক সময় লজ্জা ভয় অতিক্রম করে। অসঙ্কোচিত মিশ্রণ দ্বারা এই অনিষ্ট নিবারিত হইবার সম্ভাবনা। মিল ও তাঁহার সহচরবৃন্দ এই সকল সমাজধর্ম্ম ও রাজনীতি-সম্বন্ধীয় মত সকলের বিশেষ উপাসক হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা নিজে এই মতের উপাসক হইয়া ক্ষান্ত রহিলেন না। বিশেষ উৎসাহের সহিত এই মত সর্ব্বত্র প্রচার করিতে লাগিলেন। জেমস্ মিলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহাদিগের এই উৎসাহ কিয়ৎকালের জন্য সাম্প্রদায়িকতায় পরিণত হইল।

আমরা এতাবৎকাল পর্য্যন্ত মিল এবং তাঁহার গুরুজন ও সহচরবৃন্দের বাহ্য জীবন অর্থাৎ মানসিক উন্নতিরূপ জীবনচিত্রের একাংশমাত্র চিত্রিত করিতেছিলাম। আমরা এখনও অন্তর্জীবনের কোন চিত্রই প্রদর্শন করি নাই। এখন আমরা ক্ষণকালের জন্য সেই চিত্র অঙ্কিত করিতে বসিলাম।

অনেকেরই বিশ্বাস ছিল যে, এক জন প্রকৃত বেনথামিক একটি তর্ক-যন্ত্রস্বরূপ। ইহাকে অধিক্ষিপ্ত কর, অমনি ইহা হইতে তর্করাশি অনিবার্য্যবেগে বহির্গত হইতে থাকিবে। ইহার হৃদয় শূন্য ও পাষাণবৎ। বেনথামিকের এই চিত্র যদি কাহারও বিষয়ে কখন সত্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই নূতন মতে দীক্ষিত হওনের পর দুই তিন বৎসর পর্য্যন্ত মিলের জীবনে হইয়াছিল। তাঁহার তর্কশক্তি তাঁহার হৃদয়ভাবের বিনাশে অস্বাভাবিক পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। এরূপ অস্বাভাবিক অবস্থার কারণ পিতা কর্তৃক তাঁহার অস্বাভাবিক শিক্ষা। জেমস্ মিল পুত্রের হৃদয়ের কোমলতর বৃত্তি সকল উদ্দীপিত না করিয়া বরং নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা করিতেন। তিনি কঠিনহৃদয় বা কোমলতর-বৃত্তি সকলের অগোচর ছিলেন এরূপ নহে। বরং তাঁহাতে ইহার বৈপরীত্যই উপলক্ষিত হইত। কিন্তু তিনি জানিতেন যে, হৃদয়ের কোমলতর-বৃত্তি স্বভাবতঃ এত তেজস্বিনী যে, ইহা কোন উত্তেজিতের অপেক্ষা করে না। স্বতই ইহা আপনার আধিপত্য সংস্থাপন করিয়া থাকে। ইহা উত্তেজিত হইলে অনেক সময় অনিষ্ট ফল প্রসব করে। তাঁহার এই বিশ্বাসবশতঃ তিনি কখন পুত্রের অন্তরের কোমলতর বৃত্তি সকলের পরিপোষণ করেন নাই। এই জন্য মিলের কোমলতর-বৃত্তি সকল ক্রমেই নিস্তেজ হইয়া উঠিয়াছিল। এই কোমলতর বৃত্তিনিচয়ের নিয়ন্ত্রণ জন্য কবিতা ও অন্যান্য কল্পনা-বিজৃম্ভিত কাব্য-সমূহের উপর মিলের বিশেষ অনুরাগ জন্মে নাই। তিনি স্বয়ং কল্পনাবিস্ফুরিত কাব্য পাঠ করিতেন বটে, কিন্তু কোমলতর বৃত্তিনিচয়ের পরিপোষণ ও পরিমার্জ্জনের জন্য কাব্যপাঠের উপযোগিতা বুঝিতে পারিতেন না। কিন্তু আহ্লাদের বিষয় এই যে, মিলের অন্তরের এইরূপ অস্বাভাবিক ভাব চিরস্থায়ী হয় নাই। প্লুটার্কলিখিত জীবনাবলী এবং কণ্ডর্সেট-লিখিত টর্গটের জীবনচরিত মিলের মনে প্রলয় উত্থাপিত করিল। মানবজাতির প্রকৃত উপকারক মহাত্মাদিগের জীবনচরিত পাঠ করিয়া তাঁহার হৃদয় এতদূর উদ্বেল হইয়া উঠিল যে, এখন হইতে তিনি কাব্যরসামৃতপানে আত্মাকে বঞ্চিত করা পাপ মনে করিতে লাগিলেন।

১৮২৪ খৃষ্টাব্দের শেষে অথবা ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে মিল বেনথামের "জুডিসিয়াল এভিডেন্স" নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থের সম্পাদনে নিযুক্ত হন। এই কার্য্যে তাঁহার একটি বৎসর পর্য্যবসিত হয়; এবং ইহাতে তিনি অসাধারণ পরিশ্রম ও পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন। তিনি অপরিণতবয়স্ক হইলেও এই

গ্রন্থের সম্পাদনে তাঁহার নাম বিদ্বন্মণ্ডলীতে অতিশয় খ্যাত হইয়া উঠিল। এই কার্য্যে লিপ্ত হওয়ায় মিলের ভূয়সী উন্নতি সংঘটিত হয়। বেনথাম এই গ্রন্থে তাঁহার অলৌকিক চিন্তা-শক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। এই গ্রন্থে তিনি ইংরাজী ব্যবস্থাশাস্ত্রের যাবতীয় অভাব ও দূষণ স্পষ্টাক্ষরে বুঝাইয়া দিয়াছেন। মিল্ এই গ্রন্থের আদ্যন্ত অতি গভীররূপে আলোড়ন করিয়াছিলেন এবং ইহার যে যে স্থল অসম্পূর্ণ ছিল, তাহার পূরণ করিয়া দিয়াছিলেন। পুস্তকপাঠাপেক্ষা ইহাতে তাঁহার অধিকতর ফল দর্শিয়াছিল। এখন হইতে তাঁহার রচনা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক গাঢ় ও উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। মিলের প্রথম রচনা অস্পষ্টতা-দোষে দূষিত ও শব্দাড়ম্বরে পরিপূর্ণ ছিল। এই গ্রন্থের সম্পাদনে এবং গোল্ডস্মিথ, ফীল্ডিং প্যাস্কাল, ভল্টেয়ার ও কোরীয়ার প্রভৃতি গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থপাঠে তাঁহার রচনা ক্রমশঃই প্রাঞ্জল ও ভাবোদ্দীপক হইয়া উঠিল। মিলের রচনার এই নবজাত উৎকর্ষ অচিরকালমধ্যেই পরীক্ষিত হইল। এই সময়ে বিগনাম্ বেনথামের "বুক্ অব ফ্যালাসীস্" নামক অতি প্রসিদ্ধ পুস্তকের সম্পাদন করেন। এই গ্রন্থ ও ইহার সম্পাদন অবলোকন করিয়া পার্লিয়ামেন্টের অন্যতম সভ্য ও সংস্কারক অতি ধনাঢ্য লাডসনিবাসী মিষ্টার মার্সাল, গ্রন্থকার ও সম্পাদকের উপর বিশেষ প্রীত হইলেন এবং বিগনাম দ্বারা পার্লিয়ামেন্টের তর্ক-বিতর্ক সকল বেন্থামের প্রণালী অবলম্বন করিয়া শ্রেণী-বিভক্ত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। বিগনাম্, চার্লস অষ্টিনের সাহায্যে এই গুরুতর কার্য্যের সম্পাদকত্ব নিষ্পাদন করিতে লাগিলেন। এই গ্রন্থের নাম "পার্লিয়ামেন্টের ইতিহাস ও সমালোচন" রাখা হইল। পার্লিয়ামেন্টের অনেক সভ্য ইহাতে লিখিতে আরম্ভ করিলেন। ষ্ট্রট, রোমিলী এবং অষ্টিন প্রভৃতি সুবিখ্যাত ব্যবহারাজীবেরাও ইহাতে রচনা প্রেরণ করিতে লাগিলেন। জেমস মিল, কুলসন এবং মিল্‌ও লেখকশ্রেণী অন্তর্ভুক্ত হইলেন। ইহার যশ ওয়েষ্টমিনিষ্টার রিভিউয়ের অপেক্ষা অধিকতর হইয়া উঠিল। মিল্ উপর্য্যুপরি ইহার কয়েক খণ্ডে কয়েকটি অতি উৎকৃষ্ট রচনা প্রদান করেন। এই প্রস্তাবগুলিতে মিল্ অন্যের মতসকল উদ্ঘাটিত না করিয়া নিজের স্বাধীন মত সকল ব্যক্ত করেন। এই সময় হইতেই মিল গুরুজনক্ষুণ্ণ পথের অনুবর্ত্তন না করিয়া স্বক্ষুণ্ণ স্বাধীন পথে বিচরণ আরম্ভ করেন।

মিল এইরূপে যৎকালে সাধারণের জন্য লেখনী-বিচালনে নিযুক্ত ছিলেন, তখনও আত্মশিক্ষা-বিধানে শিথিল-প্রযত্ন হন নাই। এই সময় তিনি ও তাঁহার সহচরবৃন্দ হ্যামিল্টনের প্রণালী অবলম্বন করিয়া একত্র জার্ম্মান ভাষা পড়িতে আরম্ভ করেন। এইরূপ সহাধ্যয়নে তাঁহাদিগের বিশেষ উপকার দর্শিয়াছিল, ক্রমে সহাধ্যায়িবর্গের সংখ্যা দ্বাদশ হইয়া উঠিল। তাঁহারা বিজ্ঞানের যে যে শাখায় অশেষ পারদর্শিতা লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, ক্রমে সেই সকলের সহাধ্যয়নে ও সহবিচারণায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদিগের এই কার্য্যসাধনের জন্য গ্রোট নিজগৃহে তাঁহাদিগকে একটি ঘর প্রদান করেন। এই সময় হিতবাদসভার অন্যতম সভ্য প্রেসকটও তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হন। সপ্তাহে দুই দিন প্রাতঃকালে ৮॥০ হইতে ১০টা পর্য্যন্ত এই অজ্ঞাত সভার অধিবেশন হইত, তাঁহারা সর্ব্বপ্রথম অর্থব্যবহার শাস্ত্রের আলোচনা আরম্ভ করিলেন। জেমস মিল-লিখিত "এলিমেন্টস্" নামক পুস্তক তাঁহাদিগের প্রথম পাঠ্য পুস্তক হয়। তাঁহাদিগের মধ্যে একজন এই পুস্তকের কিয়দংশ উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিতেন। পাঠ সমাপ্ত হইলে সেই অংশের উপর তর্ক-বিতর্ক উপস্থিত হইত। যাঁহার যে কোন বক্তব্য বা আপত্তি থাকিত, অতি সামান্য হইলেও তিনি তাহা উত্থাপন করিতেন। যতক্ষণ বা যতদিন সেই আপত্তির মীমাংসা না হইত, ততক্ষণ বা ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহারা এতদ্বিষয় তর্ক-বিতর্ক হইতে বিরত হইতেন না। এইরূপে তাঁহারা জেমসের পুস্তক সমাপন করিয়া রিকার্ডো, বেলী প্রভৃতির পুস্তক পাঠ আরম্ভ করিলেন। এই সকল পুস্তকবিষয়ক তর্ক বিতর্ক উপলক্ষে অর্থনীতি ও অর্থব্যবহার শাস্ত্র সম্বন্ধে অনেক স্বাধীন ও নূতন মত সকল তাঁহাদিগের মুখ হইতে বিনির্গত হইতে লাগিল। অবশেষে মিল তাঁহার স্বাধীন ও নূতন মত সকল "অর্থনীতিশাস্ত্রসম্বন্ধীয় অমীমাংসিত প্রশ্নাবলীর মীমাংসা" নামক পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিলেন।

অর্থনীতিশাস্ত্র সমাপন করিয়া তাঁহারা ন্যায়-দর্শনের অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। এইবার গ্রোট

তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইলেন। তাঁহারা প্রথমে অ্যালড্রিচের পুস্তক পড়িতে আরম্ভ করেন। কিন্তু ইহার উপর বিরক্ত হইয়া অচিরকালমধ্যে যেসুইট ডিউ ট্রিউ লিখিত ন্যায়দর্শন অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। ইহা সমাপ্ত করিয়া প্রথমে হোয়েট্‌লির ন্যায়দর্শন এবং অবশেষে হবসলিখিত "কম্পিউটেসিও সিব লজিক" নামক পুস্তক পাঠ করিয়া এই বিভাগ সমাপ্ত করিলেন। এবারেও পূর্ব্বের ন্যায় অনেক পূর্ব্বপক্ষ উদ্ভাবিত ও তাহাদিগের মীমাংসা নিষ্পাদিত হইল। মিল পরিণতবয়সে ন্যায়দর্শন-বিষয়ে যে পুস্তক রচনা করেন, তাহা অনেক পরিমাণে এই সকল তর্ক-বিতর্কের ফল।

মিল ও তাঁহার সহাধ্যায়িবর্গ ন্যায়দর্শন সমাপ্ত করিয়া মনোবিজ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। হার্টলের পুস্তকাবলী তাঁহাদিগের প্রথম পাঠ্য পুস্তক হইল। হার্টলের পুস্তক সকল সমাপ্ত হইলে তাঁহাদিগের সভা কিছু কালের জন্য বন্ধ হয়। অবশেষে জেমস মিলের "অ্যানালিসিস্ অব্ দি মাইণ্ড" নামক পুস্তক প্রকাশিত হইলে ইহার অধ্যয়নের নিমিত্ত তাঁহারা পুনঃসমবেত হন। এইবার তাঁহাদিগের সহাধ্যয়ন সমাপ্ত হয়। এই সহাধ্যয়ন-তর্ক-বিতর্ক হইতেই মিলের স্বাধীন ও নূতন মতসকল উদ্ভাবিত হয়। এতদিন তাঁহারা অতি নিভৃতভাবে বক্তৃতা অভ্যাস করিতেছিলেন। এক্ষণ ১৮২৫ হইতে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহারা প্রকাশ্য স্থলে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। রীবেক, চার্লস অষ্টিন্, উইলিয়ম টমসন্, লর্ড ক্লারেণ্ডন্, গেল জোনস, পিরল ওয়াল্, মেকলে, মকুলক্, উইলবারফোর্স, হাইড, রোমলী, লর্ড সিডনহাম, বুলওয়ার, ফন ব্লাঙ্ক, হেওয়ার্ড, সী, কক্‌বরন, মরিস, ষ্টর্লিং প্রভৃতি অসংখ্য পণ্ডিতমণ্ডলী এই সকল প্রকাশ্য বক্তৃতায় অংশ লইতে লাগিলেন। উন্নতিশীল ও স্থিতিশীল দুই দলের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। প্রত্যেক দলকেই স্বমতের পরিপোষক গভীর ও দুর্ভেদ্য যুক্তি সকল প্রদর্শন করিতে হইল। প্রত্যেক দলেরই প্রতিপক্ষ দলের যুক্তি সকল খণ্ডন ও তাঁহাদিগের মত সকলের ভ্রমসঙ্কুলতা প্রদর্শন করিতে হইত। তর্ক-বিতর্কে সকলেরই, বিশেষ মিলের অতিশয় উপকার দর্শিয়াছিল। কিন্তু ইহাতেও মিলের বাগ্মিতাশক্তি জন্মে নাই। তিনি কখনই অনর্গল বক্তৃতা করিতে পারিতেন না। তাঁহাকে বক্তৃতা সকল লিখিয়া আনিতে হইত। তথাপি তাঁহার বক্তৃতা সকল সারগর্ভ হওয়ায় প্রায়ই শ্রোতৃবর্গের হৃদয়গ্রাহিণী হইত।

এইরূপ প্রকাশ্য বক্তৃতা সকল প্রস্তুত করিতে তাঁহার অনেক সময় ব্যয়িত হইত। এই জন্য তিনি ১৮২৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ওয়েষ্টমিনিষ্টার রিভিউ লিখিতে বিরত হইলেন। এই রিভিউ এক্ষণে অতি দুরবস্থায় পতিত হইয়াছিল। যদিও ইহার প্রথম সংখ্যার বিক্রয় যথেষ্ট হইয়াছিল, তথাপি ইহার নিয়মিত আয় ইহার ব্যয়নির্ব্বাহে কখনই পর্য্যাপ্ত হয় নাই। এই জন্য ইহার ব্যয়সংক্ষেপ করা হইল। সম্পাদকদ্বয়ের অন্যতর সদরন তাঁহার পদ পরিত্যাগ করিলেন। জেমস মিল, মিল এবং অন্যান্য যাঁহারা অর্থ লইয়া ইহাতে লিখিতেন, এক্ষণে ইহাতে নিঃস্বার্থভাবে লিখিতে আরম্ভ করিলেন। তথাপি ইহার আয় ব্যয়নির্ব্বাহে সমর্থ হইল না। সুতরাং নূতন বন্দোবস্তের প্রয়োজন হইল। জেমস মিলের এ বিষয়ে বাউরিঙের সহিত অনেক কথোপকথন হইয়াছিল। বাউরিঙও বেতনভোগী ছিলেন। জেমস মিল ও মিলের ইচ্ছা ছিল যে, বাউরিঙ তাঁহার কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন এবং একজন অবৈতনিক সম্পাদক তাঁহার পদে অভিষিক্ত হন। বাউরিঙ তাঁহাদিগের নিকটে এ বিষয়ে সম্মত হইলেন। কিন্তু তিনি ভিতরে ভিতরে অপরের সহিত নূতন বন্দোবস্ত করিলেন। ইহাতে জেমস্ মিল ও মিল উভয়েই অতিশয় বিরক্ত হইলেন এবং উক্ত রিভিউয়ের সহিত তাঁহাদিগের সংস্রব পরিত্যাগ করিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

মিলের মানসিক সঙ্কট

ওয়েষ্টমিনিষ্টার রিভিউয়ের সহিত সংস্রব পরিত্যাগের পর মিলের লেখনী কিছুদিনের জন্য বিশ্রান্ত হইল। এই বিশ্রামে তাঁহার চিন্তাসকল অতিশয় পরিপক্ক ও পরিণত হইয়া উঠে। এই

বিশ্রাম না পাইলে তাঁহার মানসিক বৃত্তিসকল এতদূর তেজস্বিনী হইত কি না সন্দেহ। এই অবসর-কালে চিন্তাসকল বাহ্য-জগৎ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া স্বকীয় অন্তর্জগতের গূঢ় গণনায় নিমগ্ন হইল। ১৮২১ খৃষ্টাব্দের শীতকালে যখন মিল বেনথামের গ্রন্থসকল পাঠ করিতে আরম্ভ করেন, বিশেষতঃ যৎকালে ওয়েষ্টমিনিষ্টার রিভিউ প্রাদুর্ভূত হয়, সেই সময় হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে মিলের জীবন লক্ষ্যবিশিষ্ট হয়। এত দিন ইহা সম্পূর্ণরূপে লক্ষ্য-শূন্য ছিল। এখন হইতে জগতে মঙ্গলসাধন করা, জগতের কুসংস্কার অপনীত করা—তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠে। তাঁহার সুখ, তাঁহার সন্তোষ—এই লক্ষ্যের সহিত গ্রথিত হইয়া গেল। যাঁহারা এই ব্রতে ব্রতী, এই ব্রতের অনুষ্ঠান-বিষয়ে তিনি তাঁহাদিগেরই সহানুভূতির প্রার্থী হইলেন। তিনি এখন হইতেই এই ব্রতের অনুষ্ঠানোপযোগী উপকরণ সকল সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। একদিন অকস্মাৎ তাঁহার হৃদয়াকাশে একখানি চিন্তা-মেঘ সমুদিত হইয়া তাঁহার সুখসূর্য্য আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল। তাঁহার মনে সহসা এই প্রশ্ন উত্থিত হইল, "মনে কর, তোমার জীবনের সমস্ত উদ্দেশ্য সংসাধিত হইল; তুমি যে সকল সামাজিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনের জন্য এতদূর যত্ন করিতেছ, সে সমস্ত এই মুহূর্ত্তেই সংসাধিত হইল; ইহাতেই কি তোমার অপরিসীম আনন্দ ও সুখের উৎপত্তি হইবে?" সহসা অনিবার্য্য আত্মজ্ঞান উত্তর করিল, "না।" এই উত্তরে তাঁহার হৃদয় অন্তরে বিলীন হইল। যে ভিত্তির উপর তাঁহার জীবনগৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা সহসা ভূতলশায়িনী হইল। তিনি দেখিলেন যে, যাহা তাঁহার জীবনের লক্ষ্য,—তাহার প্রাপ্তিতে সুখের অভাব। যাহার প্রাপ্তিতে সুখের অভাব, তাহার অনুসরণে কাহারও প্রবৃত্তি জন্মে না। সুতরাং মিলেরও জীবনের লক্ষ্যসংসাধনে প্রবৃত্তি ছিল না। কিছুদিনের জন্য তাঁহার জীবনতরী কর্ণধারশূন্য হইল। মিল ভাবিলেন, এই চিন্তামেঘ তাঁহার হৃদয়াকাশ হইতে শীঘ্রই অপসৃত হইবে। কিন্তু তাহা হইল না। শান্তিদায়িনী নিদ্রা তাঁহার হৃদয়ে ক্ষণিকমাত্র শান্তি প্রদান করিল। তিনি জাগরিত হইলেন। হতাশা তাঁহার হৃদয়কে পূর্ব্ববৎ জর্জ্জরিত করিতে লাগিল। তিনি যে কার্য্যে, যে সভায় গমন করিতেন, গভীর হতাশভাব তাঁহার মুখমণ্ডলে প্রতিভাত হইত। জগতের অসংখ্য প্রলোভন-পরম্পরাও তাঁহার অন্তর্নিগূহিত গভীর বেদনাকে বিস্মৃতিজলে ভাসাইতে পারিল না। এই মেঘ ক্রমেই গাঢ়তর হইতে লাগিল। তিনি পুস্তক-রাশিতে চিত্তের বিনোদনোপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু পুস্তকপাঠে তাঁহার মনে আর পূর্ব্বের ন্যায় ভাবোদয় হইল না। বোধ হইল যেন, তাঁহার মানবপ্রেম ও উৎকর্ষপ্রিয়তা একেবারে পর্য্যবসিত হইল। তিনি নিজের গভীর বেদনা কাহারও নিকট ব্যক্ত করিতে ভালবাসিতেন না। তিনি ভাবিতেন যে, অপরের নিকট তাঁহার এই যন্ত্রণার বিশেষ কারণ নাই। সুতরাং নিষ্কারণ যন্ত্রণা কাহারও সহানুভূতি উদ্ভূত করিতে পারে না। এ অবস্থায় সদুপদেশ অতিশয় প্রার্থনীয়; কিন্তু কাহার নিকট যাইলে সেই সদুপদেশ প্রাপ্ত হইবেন, তিনি জানিতেন না। কোন নিবার্য্য বিপদ্ পড়িলে তিনি পিতার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করিতেন, কিন্তু রূপ অনিবার্য্য কাল্পনিক বিপৎপাতে তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা নিতান্ত হাস্যকর। তিনি জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার হৃদয়ে যে গভীর চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, পিতা তদ্বিষয়ে কিছুই অবগত নহেন। কিন্তু তিনি জানিতেন, পিতা অবগত হইলেও তাঁহা দ্বারা এ রোগের প্রতীকারের সম্ভাবনা নাই। তাঁহার শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে পিতৃপরিশ্রমের ফল; পিতা স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, সে শিক্ষার পরিণাম এরূপ বিষময় হইবে। মিল এই সংবাদ দিয়া পিতার হৃদয়ে যাতনা দিতে ইচ্ছা করেন নাই। তিনি জানিতেন যে, তাঁহার রোগ এক প্রকার অচিকিৎস্য অথবা পিতৃচিকিৎসাতীত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহার বন্ধুবর্গের মধ্যে এমন কেহ ছিলেন না, যাঁহার নিকট তিনি হৃদয়ের যাতনা ব্যক্ত করিলে সহানুভূতি পাইতে পারিতেন। সুতরাং এ বিষয়ে তিনি যতই ভাবিতে লাগিলেন, ততই হতাশা বলবতী হইতে লাগিল।

মিল যে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার দৃঢ়-বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, সৎ ও অসৎ উভয় প্রকার নৈতিক মানসিক ভাবই আমাদের সংস্কারের (Association) ফল; আমাদের যে কোন বিষয়ে প্রীতি এবং যে কোন বিষয়ে ঘৃণা জন্মে, আমরা যে কোন বিষয়ের অনুষ্ঠানে ও চিন্তনে দুঃখ অনুভব করি, তাহার কারণ এই যে, আমাদের শিক্ষা

আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছে যে, এই এই কার্য্য করিলে আমরা সুখী এবং এই এই কার্য্য করিলে আমরা অসুখী লইব। সুতরাং আমরা শিক্ষাবলে বাল্য হইতেই কতকগুলি কার্য্যের সহিত দুঃখ ও কতকগুলি কার্য্যের সাহত সুখ সংশ্লিষ্ট করিয়া ফেলি। বস্তুতঃ কার্য্যের সহিত সুখ দুঃখের এরূপ শিক্ষাজনিত অনিচ্ছাকৃত সংশ্লেষণের নামই সংস্কার। জেমস মিল সর্ব্বদা বলিতেন যে, যে কার্য্য দ্বারা জগতের অসংখ্য লোকের মঙ্গল সংসাধিত হইতে পারে, তাহার সাহত সুখ এবং যে বস্তু ও কার্য্য দ্বারা জগতের অসংখ্য লোকের অনিষ্ট সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা, তাহার সহিত দুঃখের সংস্কার দৃঢ়-সংবদ্ধ করাই শিক্ষার প্রধান কার্য্য। মিল পিতার এই মতের সম্পূর্ণ পরিপোষণ করিতেন। কিন্তু জেমস—প্রশংসা ও নিন্দা এবং পুরস্কার ও শাস্তিস্বরূপ যে পূর্ব্ব-পরম্পরাগত উপায় দ্বারা এই সংস্কার বদ্ধমূল করিবার মত প্রকাশ করিয়াছেন, মিল সে মতের সম্পূর্ণরূপে পরিপোষকতা করেন নাই। তিনি বলিতেন যে, এইরূপ বলপূর্ব্বক কোন সংস্কার জন্মাইলে তাহা চিরস্থায়ী হইলেও হইতে পারে, কিন্তু তাহার স্থায়িত্বের উপর কখন নির্ভর করিতে পারা যায় না। সুতরাং এই সংস্কার চিরস্থায়ী করিতে হইলে সুখ-দুঃখের সহিত বস্তু ও কার্য্যের যে নিত্য ও স্বভাবসিদ্ধ সম্বন্ধ, সেইটিই যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়া দেওয়া উচিত। বিশ্লেষণ শক্তি (Power of Analysis) এই নিত্য স্বভাবসিদ্ধ সম্বন্ধের প্রধান আবিষ্কারক ; সুতরাং মনুষ্যের হৃদয় ভাব বস্তু ও কার্য্যের সহিত সুখ-দুঃখের যে অস্বাভাবিক ও অনিত্য সম্বন্ধ সংঘটিত করে, বিশ্লেষণশক্তি তাহার মূলে কুঠারাঘাত করে। মিলের এই বিশ্লেষণশক্তি অতিশয় বলবতী হইয়াছিল। ইহাতে তাঁহার যেমন ইষ্ট, তেমনি অনিষ্টও সংঘটিত হইয়াছিল। মনুষ্যের অধিকাংশ সুখ ও দুঃখ কল্পনা-বিজৃম্ভিত। মনুষ্যের কার্য্য ও দ্রব্যজাতের সহিত নিত্যসংবদ্ধ সুখ ও দুঃখের পরিমাণ অল্প। জগতে অনিত্য, অস্বাভাবিক ও কল্পনাবিজৃম্ভিত সুখ-দুঃখের পরিমাণই অধিক। মনুষ্যের জীবনকে এই শেষোক্ত প্রকার সুখ ও দুঃখের সহিত বিয়োজিত কর, ইহা জীর্ণ অরণ্য ও জল-বৃক্ষাদিশূন্য মরুভূমিবৎ প্রতীয়মান হইবে। মিলের হৃদয় এই বিশ্লেষণ শক্তিবলে নীরস ও শুষ্ক হইয়া পড়িল। দয়া, স্নেহ, মমতা প্রভৃতি যে সকল কোমল গ্রন্থি পরস্পরের হৃদয়কে পরস্পরের সহিত গ্রথিত করে, তাঁহার বিশ্লেষণশক্তি যে সকল গ্রন্থির ছেদসাধন করিয়াছিল। তিনি জানিতে পারিলেন যে, হৃদয়ে এই কোমলতর বৃত্তিসকল বলবতী থাকিলে তিনি অধিকতর সুখী হইতে পারিতেন। কিন্তু এই জ্ঞান তাঁহার হৃদয়ে সেই কোমলতর বৃত্তি সকলের অবতারণা করিতে পারিল না। দয়া, স্নেহ, প্রেম, ভক্তি প্রভৃতি কোমলতর বৃত্তি সকল তদীয় বিশ্লেষণ-শক্তির উজ্জ্বল কিরণে অন্তর্হিত হইয়া গেল। দয়া, স্নেহ প্রভৃতির সহিত মিলের আত্মাভিমান ও গৌরব-প্রিয়তাও বিলীন হইল। তাঁহার কার্য্যের উত্তেজক আর কিছুই রহিল না। এইরূপে তিনি আত্মবিষয়ক ও পরবিষয়ক উভয় প্রকার সুখেই বঞ্চিত হইলেন। ইচ্ছা করিলেন, জীবন নূতনভাবে পুনরারম্ভ করেন, কিন্তু তাঁহার সেই ইচ্ছা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

১৮২৬।২৭ খৃষ্টাব্দে যখন এই সকল গভীর চিন্তায় তাঁহার হৃদয় আন্দোলিত হইতেছিল, তখনও তিনি আপনার নিত্য দৈনিক পাঠনায় বিরত হন নাই। তাঁহার এরূপ অভ্যাসগত হইয়াছিল যে, ইহার নিত্য অনুষ্ঠান হইতে বিরত হওয়া তাঁহার পক্ষে ক্লেশকর হইত। তিনি এরূপ মানসিক অবস্থাতেও তাঁহাদিগের তর্কসভার জন্য কয়েকটি উৎকৃষ্ট বক্তৃতা রচনা করেন। কিন্তু যেমন কোন সচ্ছিদ্র পাত্রে অমৃত-বর্ষণ করিলে তাহা অবিলম্বে অন্তর্হিত হইয়া যায়, সেইরূপ আশা ব্যতীত—মনের স্ফূর্ত্তি ব্যতীত, মিলের কার্য্য-প্রবণতা ক্রমেই নিষ্প্রভ হইতে লাগিল। একদিন তাঁহার মনে এই প্রশ্ন সমুদিত হইল, "যখন জীবন এরূপ দুর্ভর বোধ হইতে লাগিল, তখন আর আমি ইহা কত কাল বহন করিতে পারিব ?" তাঁহার মন হইতেই আবার এই উত্তর বহির্গত হইল, "তুমি এই দুর্ভর জীবন এক বৎসরের অধিককাল বহন করিতে পারিবে কি না সন্দেহ।" কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে একবৎসরকাল অতীত না হইতেই আশাসূর্য্যের একটি সূক্ষ্ম রশ্মি তাঁহার তমসাচ্ছন্ন হৃদয়কে কিঞ্চিৎ আলোকিত করিল। এক দিন তিনি মার্ম্মন্‌টেলের জীবনচরিত পড়িতে পড়িতে গ্রন্থের যে স্থানে—বাল্যাবস্থায় মার্ম্মন্‌টেলের পিতৃ-

বিয়োগে জননী ও ভ্রাতৃভগিনীগণের বিলাপশ্রবণে ও দুরবস্থা দর্শনে মার্ম্মন্‌টলের হৃদয়ের বিচলিত ভাব ও তৎসর্ত্তৃক পরিবারবর্গের সান্ত্বনা—এই সকল ঘটনা লিখিত ছিল, সেই স্থানে সহসা উপনীত হইলেন। নিযুক্ত পরিবারের হৃদয়ভাব ও শোচনীয় চিত্র মিলের অন্তরে পরিস্ফুটরূপে অঙ্কিত হইল। অনুভূতি-সমুদ্ভূত অশ্রুধারা প্রবলবেগে তাঁহার গণ্ডস্থল বহিয়া পড়িল। এই মুহূর্ত্ত হইতে তাঁহার হৃদয়ের দুঃখভার কিঞ্চিৎ উপশমিত হইল। তাঁহার হৃদয় শুষ্ক ও ভাবশূন্য বলিয়া তাঁহার মনে যে যাতনা হইতেছিল, এক্ষণে তাহা অন্তর্হিত হইল। হতাশা তাঁহার হৃদয়কে আর নিপীড়িত করিতে পারিল না। এখন হইতে তিনি আর আপনাকে পাষাণবৎ মনে করিলেন না। তাঁহার প্রতীতি জন্মিল যে, তাঁহার অন্তরে এমন পদার্থ এখনও বিদ্যমান আছে, যাহাতে তিনি সুখী হইতে পারেন। তাঁহার যাতনা অপরিহার্য্য ও অনিবার্য্য নহে,—যে মুহূর্ত্তে তাঁহার অন্তরে এই বিশ্বাস জন্মিল, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই জীবনের সামান্য ঘটনাতেও তিনি কিঞ্চিৎপরিমাণে সুখ পাইতে লাগিলেন। সূর্য্যকিরণ, গগনমণ্ডল, গ্রন্থরাশি, কথোপকথন প্রভৃতি সাধারণ বস্তু ও কার্য্যও তাঁহার প্রফুল্লতার কারণ হইতে লাগিল। আত্মমতের সমর্থন ও সাধারণ হিতের অনুষ্ঠানের জন্য তিনি পুনরায় উত্তেজিত হইতে লাগিলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে তাঁহার অন্তর হইতে চিন্তা-মেঘ তিরোহিত হইল এবং জীবন তাঁহার নিকট পুনরায় সজীব বোধ হইতে লাগিল। যদিও ইহার পর আরও কয়েকবার তাঁহার অন্তর এই চিন্তা-মেঘে আচ্ছন্ন হয়, তথাপি তিনি এই সময়ে ন্যায় জীবনের আর কোন ভাগে এরূপ গুরুতর দুঃখভারে প্রপীড়িত হন নাই।

এই সকল ঘটনায় মিলের মতের দুইটি পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। প্রথমতঃ জীবন সম্বন্ধে তাঁহার পূর্ব্ব এই মত ছিল যে, আত্মসুখই মানব-জীবনের সমস্ত কার্য্যের নোদক ও একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু এক্ষণে এই মতের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল। তাঁহার বর্ত্তমান মতে আত্মসুখ—কার্য্যের অব্যবহিত লক্ষ্য নহে; যাহারা আত্মসুখকে কার্য্যের অব্যবহিত লক্ষ্য মনে করে, তাহারা কখনই সুখী হইতে পারে না। যাহারা পরের সুখ ও পরের উন্নতি আত্মকার্য্যের অব্যবহিত লক্ষ্য মনে করে, তাহারাই প্রকৃত সুখী। আত্মসুখের অন্বেষণে আজীবন পরিভ্রমণ কর, কখনই সুখ পাইবে না; পরের দুঃখ বিমোচনে, পরের সুখবর্দ্ধনে ও বিজ্ঞানাদির আলোচনায় সতত নিরত থাক, সুখ আপনা হইতেই আসিবে। পরের দুঃখ-বিমোচন ও পরের সুখবর্দ্ধন তোমার গন্তব্য স্থান হউক; পথিমধ্যে এত আনন্দ ও এত সুখ পাইবে যে, জীবন প্রার্থনীয় বলিয়া বোধ হইবে। কখনও আত্মসুখের জন্য ব্যগ্র হইও না, কখনও অন্তরে আত্মসুখের অস্তিত্বের অনুসন্ধান করিও না। কারণ, সুখ ব্যগ্রতা অনুসন্ধিৎসা সহিতে পারে না। যখনই তোমার মনে উদিত হইবে, 'আমি কি সুখী?' তখনই সুখ অপসৃত হইবে। ফলতঃ আত্মবহির্ভূত কোন বিষয় জীবনের উদ্দেশ্য না হইলে সুখ নাই। এই নূতন মত, এখন হইতে মিলের জীবন-জ্ঞানের মূলভিত্তি-স্বরূপ হইল। মিলের মত বিষয়ে যে দ্বিতীয় পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, তাহা এই;—এত দিন তিনি বুদ্ধিবৃত্তি ও স্মরণশক্তি প্রভৃতি মানসিক বৃত্তিনিচয়ের পরিমার্জ্জনকেই শিক্ষার প্রধান ও একমাত্র অঙ্গ বলিয়া মনে করিতেন; এত দিন তিনি দয়া, স্নেহ, প্রেম, ভক্তি প্রভৃতি হৃদয়ের কোমল বৃত্তিনিচয়ের পরিমার্জ্জনার বিশেষ আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। এখন হইতে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, শিক্ষার সম্পূর্ণতাবিধানে উভয় প্রকার বৃত্তিনিচয়ের সামঞ্জস্যবিধান করাই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য; মানসিক বৃত্তিনিচয়ের পরিপোষণের জন্য যেমন গণিত-বিজ্ঞানাদির প্রয়োজন, সেইরূপ হৃদয়ের কোমল বৃত্তিনিচয়ের পরিপোষণের জন্য কবিতা, নাটক, নবন্যাস, সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যা প্রভৃতিরও প্রয়োজন। মিল বাল্যাবধিই সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন; সঙ্গীতের মোহিনী শক্তি আশৈশব তাঁহার হৃদয়কে আকৃষ্ট করে। তিনি বলিতেন, সঙ্গীত অন্তরে কোন নূতন ভাবের অবতারণা করে না বটে, কিন্তু অন্তরে যে সকল উন্নত ভাব ম্লানভাবে অবস্থিত থাকে, ইহা তাহাদিগকে উত্তেজিত ও পরিপুষ্ট করে। মিল এখন হইতে কবিতার আলোচনা আরম্ভ করিলেন। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে তিনি সর্ব্বপ্রথমে ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও বাইরণ পাঠ করেন। মিল স্বয়ং যে দুঃখ-প্রবণতা (Melancholia) রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন, বাইরণের চাইলড হেরল্ড ও ম্যানফ্রেডও সেই রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং বাইরণ পাঠে

তাঁহার দুঃখ বই সুখ পাইবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু ওয়ার্ডসওয়ার্থের স্বভাববর্ণনা বিশেষরূপে তাঁহার চিত্তাকর্ষণ করে। ওয়ার্ডসওয়ার্থ শুদ্ধ স্বভাব-বর্ণনা দ্বারাই মিলের এতদূর চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিলেন, এরূপ নহে; স্বভাব-সৌন্দর্য্য দর্শনে হৃদয়ে যে সকল অনির্ব্বচনীয় ভাবের আবির্ভাব হয়, সেই সকলের চিত্রীকরণ দ্বারাই তিনি মিলের এত প্রিয় হইয়াছিলেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থ পাঠে তিনি সর্ব্বপ্রথমে জানিতে পারিলেন যে, প্রকৃতি পর্য্যালোচনাই অনন্ত সুখের আকর। ওয়ার্ডসওয়ার্থই তাঁহার কবিত্ব-শূন্য হৃদয়ে কবিত্ব উদ্দীপিত করিতে সমর্থ হন এবং এই জন্যই তিনি ওয়ার্ডওয়ার্থ অপেক্ষা মহা মহা কবি সত্ত্বেও ওয়ার্ডসওয়ার্থেরই বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। বাইরণ অপেক্ষা ওয়ার্ডসওয়ার্থের উৎকর্ষ খ্যাপন করিতে গিয়া তাঁহার অনেক পুরাতন বন্ধুর সহিত বন্ধুত্ববিচ্ছেদ ও অনেক নূতন বন্ধুর সহিত বন্ধুত্ব সংঘটিত হয়। বাইরণ ও ওয়ার্ডসওয়ার্থের পরস্পরের কবিত্বশক্তি লইয়া তর্কসভায় তাঁহাদিগের বিশেষ বিতর্ক উপস্থিত হয়। মিলের পূর্ব্ববন্ধু রীবক্ বাইরণের ও মিল্ ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের উৎকর্ষ প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন করেন। এই সময় হইতে রীবকের সহিত মিলের বিচ্ছেদ দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। যে সময় রীবকের সহিত মিলের বিচ্ছেদ সংঘটিত হয়, সেই সময় ফ্রেডারিক মরিস্ এবং জন্ ষ্টার্লিং নামক দুই জন পণ্ডিতের সহিত তাঁহার নব-সখ্য সংস্থাপিত হয়। মরিস্ চিন্তাশীল ও ষ্টার্লিং বাগ্মী ছিলেন। মিল মানসিক উন্নতির জন্য কোলেরীজ এবং গেটি প্রভৃতি জার্ম্মান্ পণ্ডিতগণের নিকট যেরূপ ঋণী ছিলেন, ইহাঁদিগের নিকটও সেইরূপ ঋণী ছিলেন। যদিও কোলেরীজ নীতিবিষয়ে মরিসের গুরু ছিলেন, তথাপি ধীশক্তিবিষয়ে তদপেক্ষা মরিসের উৎকর্ষ অবিসংবাদিত। মরিসের তীক্ষ্ণ প্রতিভা এবং স্বভাব ও অভিপ্রায়ের সাধুতা নিবন্ধন তাঁহার প্রতি মিলের ভক্তি অতি গভীর ও অবিচলিত ছিল। ষ্টার্লিং বুদ্ধি ও বিদ্যায় কোলেরীজ ও মরিস উভয়েরই শিষ্য ছিলেন। কিন্তু তাঁহার হৃদয় অতিশয় সরল, প্রেমময় ও প্রশস্ত ছিল, কি সামান্য, কি গুরুতর সকল বিষয়েই তাঁহার সত্য প্রিয়তা অতিশয় বলবতী ছিল। তাঁহার স্বভাব অতি উদার ও উদ্যোগশীল ছিল। তিনি যে সকল মত অভ্রান্ত বলিয়া মনে করিতেন, সে সকলের সমর্থন জন্য প্রাণবিসর্জ্জন করিতেও পরাঙ্মুখ হইতেন না। যদিও তিনি স্বমতের পরিপোষণের জন্য সতত বদ্ধপরিকর ছিলেন, তথাপি তিনি বিরুদ্ধ মত বা তদবলম্বী ব্যক্তিগণের প্রতি কখন অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেন না। স্বাধীনতা ও কর্ত্তব্যকারিতা তাঁহার কার্য্যস্রোতের নিয়ামক ছিল। এই সকল কারণে ষ্টার্লিং অচিরকালমধ্যেই মিলের হৃদয়াপহারক হইয়া উঠিলেন। মিল স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন যে, আর কাহারও সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব এত ঘনীভূত হয় নাই যদিও মিলের সহিত ষ্টার্লিঙের সর্ব্বদা মতভেদ সংঘটিত হইত, তথাপি তাঁহাদিগের এই গভীর সখ্যভাব কখন বিচলিত হয় নাই।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দের পর মিল তর্ক-সভা হইতে অপসৃত হইলেন। অনেক তর্ক-বিতর্ক ও অনেক বক্তৃতার পর বিশ্রাম তাঁহার অতিশয় প্রীতিকর হইল, তিনি কিছুদিন নির্জ্জনে পাঠনার অনুশীলনে ও চিন্তাশক্তির পরিমার্জ্জনে বিশেষ সুখানুভব করিতে লাগিলেন। তিনি বাল্যাদৃত পুরাতন ও শিক্ষিত মত সকল দ্বারা যে সৌধরাজি নির্ম্মিত করেন, এই পরিবর্ত্তনকালে তাহার স্থান প্রতিদিনই জীর্ণ ও ভগ্ন হইতে লাগিল; তিনি প্রতিদিনই তাহাদিগের জীর্ণ-সংস্কার করিতে লাগিলেন; কখনই ইহাকে ভূতলশায়িনী হইতে দেন নাই। নূতন মতের সমাগমে তিনি কখনই হতবুদ্ধি ও ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইতেন না। তিনি এত পরিস্ফুটরূপে প্রাচীন ও নূতন মতের পরস্পর সম্বন্ধ-নির্ণয় করিতেন যে, তাহাদিগের পরস্পরের সহিত কখন সংঘর্ষ উত্থিত হইত না।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে মিল ন্যায়দর্শন (Logic) বিষয়ক তাঁহার মত সকল কাগজে সন্নিবেশিত করেন। এই সময়ে কোলেরীজ, গেটি এবং কার্লাইল প্রভৃতির রাজনীতি-সংক্রান্ত গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া রাজনীতি সম্বন্ধে তাঁহার মত সকলের অনেক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। কিন্তু সেণ্টসাইমন্ ও তৎশিষ্যবর্গের রাজনীতি-বিষয়ক পুস্তক-সকল পাঠ করায় তাঁহার মনে রাজনীতি বিষয়ে সম্পূর্ণ নূতন মতের আবির্ভাব হয়। ১৮২৯ ও ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে এই সকল গ্রন্থাবলীর সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয় হয়। ইহাঁদিগের রাজনীতি-বিষয়ক মত সকলের তখন শৈশবাবস্থা। তাঁহার এখনও

তাঁহাদিগের রাজনৈতিক বিজ্ঞানকে ধর্ম্ম পরিচ্ছেদ পরিধান করান নাই। তাঁহাদিগের "সোসালিজম" প্রণালী এখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তাঁহারা কেবল পুত্র-পৌত্রাদি-ক্রমে পিতৃ পৈতামহিক সম্পত্তির ভোগাধিকার-প্রণালীর যৌক্তিকতা বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন মাত্র। মিল সেণ্ট সাইমোনীয়দিগের সহিত সকল বিষয়ে ঐকমত্য অবলম্বন করিতেন না, কিন্তু ইহাঁরা মানবজাতির স্বাভাবিকী উন্নতি-বিষয় যে পরম্পরসম্বন্ধক্রম নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং ইতিহাসকে জৈবনিক (Organic) ও সাংশয়িক (Critical) যে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, মিল সেই সকলের বিশেষ পরিপোষণ করিতেন। ইতিহাসের এই জৈবনিক বিভাগে মনুষ্যজাতি দৃঢ়প্রতীতির সহিত কতকগুলি ভ্রান্ত বা অভ্রান্ত বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া পড়ে। এই সকল বিশ্বাস তাহাদিগের সকল কার্য্যের উপর প্রভুত্ব সংস্থাপন করে। এই বিশ্বাস-প্রভাবে তাহারা অনেক উন্নতিও সাধন করে। কিছুকাল পরে এই বিশ্বাসের ভ্রান্ততা বা অভ্রান্ততা লইয়া অনেক তর্ক-বিতর্ক উপস্থিত হয়, এবং সেই সকল তর্কবিতর্কের সঙ্গে সেই পুরাতন বিশ্বাস তিরোহিত হয়, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে কোন নূতন বিশ্বাস সংস্থাপিত হয় না, সুতরাং বিশ্বাসের অভাব হইয়া পড়ে। সমাজ, ধর্ম্ম ও রাজনীতি প্রভৃতি কিছুদিনের জন্য জড়ভাব অবলম্বন করে। ইতিহাসের এই ভাগকে তাঁহারা সাংশয়িক নামে আখ্যাত করিয়াছেন। গ্রীক্ ও রোমীয় অনেকেশ্বরবাদিত্ব (যতদিন সুশিক্ষিত গ্রীক ও রোমীয়গণ ইহা প্রকৃত প্রস্তাবে বিশ্বাস করিতেন) ইতিহাসের একটি জৈবনিক বিভাগ। ইহার পর যে সময়ে গ্রীক্ দার্শনিকদিগের অবিশ্বাসমূলক মত সকল প্রচারিত হয়, সেই সময়কে ইতিহাসের একটি সাংশয়িক বিভাগ বলা যাইতে পারে। আবার খৃষ্টধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবের সহিত আর একটি জৈবনিক বিভাগ প্রচলিত হয়। অবশেষে লুথার কর্ত্তৃক চির-প্রচলিত ধর্ম্মসংস্কারের উচ্ছেদ এবং ফরাসী-বিপ্লব দ্বারা সামাজিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভৃতি সমস্ত প্রাচীন সংস্কারের উচ্ছেদ—এই ঘটনাদ্বয় হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত সমস্ত সময়কে ইতিহাসের সাংশয়িক বিভাগ বলা যাইতে পারে। এই সাংশয়িক বিভাগ অচিরকাল-মধ্যেই এক উন্নত জৈবনিক বিভাগ দ্বারা অপসারিত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই মতগুলি যে সেণ্ট সাইমোনীয়েরাই আবিষ্কার করেন, এরূপ নহে। এ সকল মত বহুকাল হইতে সমস্ত ইউরোপে, অন্ততঃ ফ্রান্স ও জার্ম্মানীতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল। সেণ্ট সাইমোনীয়েরা কেবল ইহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করেন মাত্র। এই সকল মতবিষয়ে সেণ্ট সাইমোনীয়দিগের যতগুলি গ্রন্থ বাহির হইয়াছিল, তন্মধ্যে অগষ্ট কমট লিখিত গ্রন্থখানি সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই গ্রন্থের টাইটেল পেজে অগষ্ট কমট আপনাকে সেণ্ট সাইমনের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। এই গ্রন্থে তিনি মনুষ্যজাতির জ্ঞানবিভাগের তিনটি স্বাভাবিক ক্রম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সে তিনটি এই;—প্রথমতঃ ধর্ম্মযুগ (Thol.gical), দ্বিতীয়তঃ দর্শন-যুগ (Merahheysical), শেষতঃ প্রত্যক্ষযুগ (Positive)। তিনি বলিলেন, সমাজবিজ্ঞানও এই নিয়মের অধীন। তাঁহার মতে সামন্ততন্ত্র ও ক্যাথলিক প্রণালী সমাজবিজ্ঞানের ধর্ম্মযুগ-বিভাগের শেষ পরিণামমাত্র। প্রোটেষ্টাণ্টিজম দর্শনযুগবিভাগের আরম্ভ এবং ফরাসী-বিপ্লবকালীন মতাবলী ইহার পরিণাম মাত্র। এই বিভাগ এখনও চলিতেছে। প্রত্যক্ষযুগবিভাগ অচির-সম্ভাবী। এই বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিভাগ মিলের বর্ত্তমান মতের সহিত সম্পূর্ণরূপে সমঞ্জসীভূত হইল। মিল বর্ত্তমান যুগের উচ্চ তর্ক-বিতর্ক ও দুর্ব্বল বিশ্বাসের মধ্য দিয়া অচিরসম্ভাবী প্রত্যক্ষযুগের রমণীয় মূর্ত্তি অবলোকন করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন যে, এই প্রত্যক্ষযুগ বিভাগে জৈবনিক ও সাংশয়িক উভয় যুগের সমস্ত গুণ একত্রীভূত হইবে। এই যুগে জৈবনিক যুগের কর্ত্তব্যানুরক্তি ও সাংশয়িক যুগের অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীন চিন্তা একত্র হইবে। এই সময় প্রত্যেক ব্যক্তি অসংযতভাবে নিজের স্বাধীন মত ব্যক্ত করিতে পারিবে, অপরের সুখ বা স্বাধীনতার ব্যাঘাত সম্পাদন না করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে পারিবে; এবং কোনটি ভাল কোনটি মন্দ, এ বিষয়ে একটি গভীর বিশ্বাস সকলেরই হৃদয়ে চির অঙ্কিত হইবে।

কমট অচিরকালমধ্যে সেণ্ট সাইমোনীয়দিগকে পরিত্যাগ করিলেন; এবং মিলেরও কমট বা তদ্রচিত রচনাবলীর সহিত কিছুকালের জন্য কোন পরিচয় রহিল না। কিন্তু মিল সেণ্ট সাইমোনীয়দিগের গ্রন্থাবলীপাঠে বিরত হইলেন না। এই

সময় মসো গষ্টেভ ডি ইচথাল নামক এক জন প্রধান সেণ্ট সাইমোনীয় ইংলণ্ডে আসিয়া বসতি করিতেছিলেন। ইহার সহিত মিলের পরিচয় হইল এবং ইহার নিকট তিনি সেণ্ট সাইমোনীয়দিগের ক্রমিক উন্নতি-বিষেয় বিশেষরূপে অবগত হইতে লাগিলেন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে মিল বাজার্ড এবং এনফাণ্টিন্ নামক দুই জন সেণ্ট সাইমোনীয় অধিনায়কের সহিত পরিচিত হন। ইঁহারা "সোসালিজম" মত সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিয়াছেন, মিল তৎসমস্ত অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করেন। ইঁহাদিগের মত সকলের সার নিম্নে সংগৃহীত হইল :—(১) প্রথমতঃ তাঁহারা বলেন, ভূমির উপর ব্যক্তিবিশেষের স্বত্ব এবং দানবিক্রয় প্রণালী সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক; (২) তাঁহাদিগের মতে সমাজের সমস্ত পরিশ্রম ও ধন জনসাধরণের উপকারে নিয়োজিত হওয়া উচিত; সমাজের সমস্ত লোকেই আপন আপন ক্ষমতানুসারে গ্রন্থকার, শিক্ষক ও কৃষক প্রভৃতির কার্য্য সম্পাদন করা উচিত; এবং সকলের সমবেত পরিশ্রম দ্বারা উপার্জ্জিত ধন এক স্থানে সংগৃহীত হইয়া ব্যক্তিবিশেষের ক্ষমতানুসারে সকলের মধ্যে বিভক্ত হওয়া উচিত। মিল ইঁহাদিগের উদ্দেশ্যের যৌক্তিকতা ও অভিলষণীয়তা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারিতেন; কিন্তু যে সকল উপায় দ্বারা তাঁহারা এই উদ্দেশ্য সংসাধিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন, তাহা অভীষ্ট ফলোৎপাদনের সম্পূর্ণ অনুপযোগী বলিয়া মনে করিতেন এবং কেহ যে কখন এই অভীষ্ট সংসাধিত করিতে পারিবেন, তদ্বিষয়েও তাঁহার সম্পূর্ণ সন্দেহ ছিল। কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, সমাজের এই উৎকৃষ্ট আদর্শ লোকের নয়নসমক্ষে ধারণ করিয়া রাখিলে এক সময়ে না এক সময়ে সমাজ এই আদর্শের সমীপবর্ত্তী হইবে। আর একটি বিষয়—যাহার জন্য লোকে সেণ্ট সাইমোনীয়দিগের বিশেষ নিন্দা করিত এবং মিল বিশেষ ভক্তি করিতেন—এই যে, ইঁহারা অসীম সাহস ও স্বাধীনতার সহিত পারিবারিক সম্বন্ধবিষয়ক চিরপ্রচলিত কুসংস্কার সকলের মূলে সর্ব্বপ্রথমে কুঠারাঘাত করেন। কোন সমাজসংস্কারক অদ্যাবধি এই গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করেন নাই। ইঁহারাই জগতে সর্ব্বপ্রথম খ্যাপন করেন যে, স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই সকল বিষয়ে সমান অধিকার। ইঁহারাই স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের পরস্পরসম্বন্ধ বিষয়ে সম্পূর্ণ নূতন শৃঙ্খলের উদ্ভাবন করেন। এই সকল কারণে জগৎ ইঁহাদিগের নিকট চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ।

আমরা মিলের এই সময়ের জীবনবৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে গিয়া কেবল সেই সকল ঘটনারই উল্লেখ করিয়াছি যাহাতে তাঁহার মতসকলের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, যাহাতে তাঁহার চিন্তাশক্তির স্পষ্ট বিস্ফুরণ ও উন্নতি উপলক্ষিত হয়। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক বিষয়ে তাঁহার চিন্তাশক্তি পরিণত ও পরিমার্জ্জিত হয়। কিন্তু এই সকল বিষয় পৃথিবীর নিকট নূতন আবিষ্কার নহে। যে সকল বিষয় বহুকাল হইতে পৃথিবীতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল, মিল্ সে সকল বিষয় হয় বিশ্বাস করিতেন না, নয় গ্রহ করিতেন। যে সকল উপায় দ্বারা জগতে সেই সকল বিষয় সর্ব্বপ্রথমে আবিষ্কৃত হইয়াছিল, মিল সেই সকল দ্বারা যখন স্বয়ং সেই সকল বিষয় নবাবিষ্কৃত করিতেন, তখনই তাহাদিগের সত্যতা বিষয়ে তাঁহার দৃঢ় প্রতীতি জন্মিত।

এইরূপে মিল অনেক পুরাতন বিষয়—যাহা তিনি পূর্ব্বে বুঝিতে পারিতেন না বা বিশ্বাস করিতেন না—নূতন ভাবে দেখিতে লাগিলেন। উদাহরণস্বরূপ নিম্নে দুই একটির উল্লেখ করা যাইতেছে। পূর্ব্বে তিনি অদৃষ্টবাদ (Fatalim) হইতে অবস্থানুবাদ (Doctrine of circumstances) এবং স্বাধীন ইচ্ছাবাদের (Doctirne of Free Will) প্রভেদ কিছুই বুঝিতে পারিতেন না। এ বিষয়ে তাঁহার মনের ভাবসকল সম্পূর্ণ তমসাচ্ছন্ন ছিল। তাঁহার মনে এই তর্ক সমুদিত হইত যে, যদি 'যাহা অদৃষ্টে লিখিত আছে, তাহা ঘটিবেই ঘটিবে' এই মত সত্য হয়, তাহা হইলে 'মানব-ইচ্ছা স্বাধীন' অর্থাৎ মনুষ্য যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতে পারে, এই মত কিরূপে সত্য হইতে পারে? যদি 'মনুষ্য অবস্থার দাস' এই মত সত্য হয়, তাহা হইলে 'মানব-ইচ্ছা স্বাধীন' এই মত কিরূপে সত্য হইতে পারে? আর যদি 'যাহা অদৃষ্টে লিখিত আছে, তাহা ঘটিবেই ঘটিবে,' তাহা হইলে মনুষ্যের স্বভাব ও ব্যবহার অবস্থা সাপেক্ষ কেন হইবে? কারণ, কোন অবস্থা সংঘটিত হইবার পূর্ব্বেই যাহা ঘটিবে, তাহা স্থিরীকৃত হইয়াছে। তিনি এই পরস্পর-বিসংবাদী মত সকলের সামঞ্জস্যবিধান করিতে পারিতেন না —অথবা ইহাদিগের কোন্‌টি মিথ্যা, কোন্‌টি সত্য,

তাহা নির্ণয় করিতে পারিতেন না। তাঁহার মন সতত সন্দেহদোলায় দোলায়মান হইত। 'মনুষ্য যে সকল ঘটনার দাস, তাহাদিগের উপর তাহার কোন প্রভুতা নাই'—'মনুষ্যের স্বভাব অদৃষ্ট দ্বারা পূর্ব্বেই সংঘটিত হইয়াছে'—'মনুষ্যের কার্য্যাবলী অদৃষ্ট দ্বারা পূর্ব্বেই স্থিরাকৃত হইয়াছে'—এই সকল চিন্তা তাঁহার মনে যেই উত্থিত হইত, অমনি তাঁহার হৃদয় আকুলিত হইয়া উঠিত। অমনি—তিনি সমাজ-সংস্কারক হইবেন, তিনি জগতের হিতসাধন করিবেন—এই চিররূঢ় আশালতা সমূলে উন্মূলিত হইত। ইচ্ছা হইত, তিনি এই সকল মত অগ্রাহ্য বলিয়া মনকে সান্ত্বনা দেন; কিন্তু তাহাও পারিতেন না। এইরূপে হতাশা-প্রপীড়িত হইয়া ভাবিতে ভাবিতে ক্রমে তিনি এই বিষয়ে আলোক দেখিতে পাইলেন। তিনি দেখিলেন যে, যেমন মনুষ্যের স্বভাব ও চরিত্র অবস্থা দ্বারা সংগঠিত হয়, সেইরূপ অবস্থা সকলও মনুষ্যের ইচ্ছা দ্বারা সংগঠিত বা রূপান্তরিত হইয়া থাকে। সুতরাং এ দুই-ই সত্য যে—মনুষ্য অবস্থারও দাস এবং মনুষ্যের ইচ্ছাও স্বাধীন। এই সূক্ষ্ম অনুভূতি মিলের অন্তর হইতে গুরুতর ভার অপনীত করিল। তাঁহার মনে আবার আশার সঞ্চার হইল যে, তিনি সমাজসংস্কারক হইবেন, জগতের হিতসাধন করিবেন। এই সকল মত লইয়া তিনি তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ ন্যায়দর্শনের শেষ অধ্যায়ের স্বাধীনতা এবং অবশ্যম্ভাবিতা নামক প্রস্তাবদ্বয় রচনা করেন।

রাজনীতি বিষয়েও মিলের মতের অনেক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। তিনি পূর্ব্বে বিশ্বাস করিতেন যে, সকল দেশে সকল সময়ে সকল লোকেরই রাজ্য-শাসন-কার্য্যে সমান অধিকার। কিন্তু এক্ষণে তাঁহার বিশ্বাস অন্যপ্রকার হইয়া উঠিল। তাঁহার মতে দেশকালপাত্রভেদে শাসনপ্রণালীর ভেদ আবশ্যক। যে শাসনপ্রণালী ইংলণ্ড বা ইউরোপের বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগিনী, তাহা অন্য দেশের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগিনী না হইতে পারে। তাঁহার মতে সাধারণতন্ত্র ইউরোপের—বিশেষতঃ ইংলণ্ডের সম্পূর্ণ উপযোগিনী। সম্ভ্রান্তশ্রেণীর আধিপত্য-নিবন্ধন ইংলণ্ডের শাসনকার্য্য এরূপ দূষিত ও কলুষিত হইয়াছে যে, এই আধিপত্য নিবারণের জন্য কোন প্রস্তাবই অনুত্তোলিত রাখা উচিত নয়। অথবা কর-নির্দ্ধারণ বা অন্য কোন সামান্য অসুবিধার জন্য তিনি এরূপ মত ধারণ করিয়াছিলেন, এমন নহে, তিনি বলিতেন যে, সম্ভ্রান্তশ্রেণী গবর্ণমেণ্টকে পক্ষপাতদোষে দূষিত করিয়া সমস্ত রাজ্যে দুর্নীতি বিস্তার করিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট এই শ্রেণীর প্ররোচনায় ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায়বিশেষের স্বার্থ-সাধনের জন্য অন্যায্য বিধি-প্রণালী দ্বারা প্রজা-সাধারণের অহিতসাধন করিতেছেন। ইংলণ্ডের নিম্নশ্রেণী প্রায়ই অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন। সুতরাং তাহারা লক্ষ্মী বা লক্ষ্মীর আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম সকলের বিশেষ আদর করিয়া থাকে। নিম্নশ্রেণীর জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইলে তাহাদিগের এই আদর অবশ্যই কমিবে; সুতরাং নিম্নশ্রেণীকে জ্ঞানালোক প্রদান করা সম্ভ্রান্তশ্রেণীর স্বার্থের বিরোধী। অতএব যত দিন তাঁহাদিগের হস্তে রাজ্যের সমস্ত শাসনভার অর্পিত থাকিবে, ততদিন তাঁহারা নিম্নশ্রেণীর অন্তর জ্ঞানালোকে আলোকিত করিতে চাহিবেন না। কিন্তু নিম্নশ্রেণীর হস্তে রাজ্যশাসনভার পর্য্যাপ্ত পরিমাণে অর্পিত হইলে, তাহাদিগের সুশিক্ষাবিধান উচ্চ শ্রেণীর স্বার্থ হইয়া উঠিবে। কারণ, মূর্খ প্রতিদ্বন্দ্বী অজ্ঞানতাবশতঃ যে সকল ভয়ঙ্কর অনিষ্ট সংঘটিত করে, তাহাদিগের সহিত তুলনায় জ্ঞানকৃত অনিষ্ট অতি সামান্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই জন্য ইংলণ্ডে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, ইহা মিলের ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল এবং তিনি ওয়েন ও সেণ্ট সাইমনের সম্পত্তিবিরোধী মতসকল সর্ব্বত্র প্রচারিত হওয়া এই ইচ্ছা-পরিপূরণের একটি প্রধান উপায় বলিয়া মনে করিতেন।

তাঁহার মনের অবস্থা এইরূপ, এমন সময় ফরাসী-বিপ্লব সমুপস্থিত হয়, মিল্ একবারে উৎসাহে মাতিয়া উঠিলেন এবং যেন নবজীবন প্রাপ্ত হইলেন। তিনি অবিলম্বে পারিস নগরী যাত্রা করিলেন এবং তথায় উত্তীর্ণ হইয়া লাফেটী ও অন্যান্য সাধারণতন্ত্র দল-পতিদিগের সহিত বিশেষ পরিচিত হইলেন। কিয়দ্দিবস প্যারিসে অবস্থিতির পর তিনি স্বদেশে প্রত্যাগত হইলেন এবং এখন হইতে অতি গভীররূপে তদানীন্তন রাজনীতি বিষয়ক তর্কসাগরে অবতরণ করিলেন। এই সময়ে লর্ড গ্রে ইংলণ্ডের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ এবং রাজনীতি-সংস্কার-মানসে পার্লিয়ামেণ্টে রিফরম্ বিল নামক একটি বিলের প্রস্তাব করেন। রিফরম্ বিলের প্রস্তাবনায় ইংলণ্ডের সংবাদপত্র সকলে

রাজনীতিবিষয়ে ঘোরতর তর্ক-বিতর্ক উপস্থিত হয় এবং মিল্ সেই সকল তর্ক-বিতর্কে প্রধান অংশ গ্রহণ করেন।

সংবাদপত্রে বর্ত্তমান ঘটনাবলীয় আন্দোলনে চিন্তাশক্তির তাদৃশ পরিণতি হয় না, এই জন্য মিল্ ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে "দ স্পিরিট অব দি এজ" নামক একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ বর্ত্তমান সময়ের প্রকৃতি এবং পরিবর্ত্তনের আনুষঙ্গিক অবশ্যম্ভাবী ও অনিবার্য্য বিশৃঙ্খলাজনিত অনিষ্টপাত বিষয়ে নিজের মতসকল সন্নিবেশিত করেন। এই পুস্তক পাঠে কার্লাইল্ অতিশয় প্রীত হন এবং স্বয়ং চেষ্টা করিয়া মিলের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

মিল্ যে সকল উপায়ে জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, কার্লাইলের গ্রন্থাবলী তাহার অন্যতম। কার্লাইলের রচনাবলী—কবিত্ব ও জার্ম্মান মনোবিজ্ঞানে পরিপূর্ণ। সেই সমস্ত রচনার সাধারণ ভাব,—ধর্ম্মে বিশ্বাসভাব, হিতবাদ, অবস্থাবাদ এবং সাধারণতন্ত্র,ন্যায়দর্শন ও অর্থনীতিশাস্ত্রের অত্যাবশ্যকতা প্রভৃতি—মিলের প্রধান প্রধান মত সকলের বিরোধী। যদিও কার্লাইলের মত সকল মিলের মত সকলের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল তথাপি মিল্ বহুকাল পর্য্যন্ত কার্লাইলের রচনাবলীর একজন প্রধান স্তুতিবাদক ছিলেন। কার্লাইলের দর্শন মিলের বুদ্ধিবৃত্তিকে মার্জ্জিত না করুক, কার্লাইলের কবিত্ব মিলের হৃদয়কে উৎসাহিত ও উত্তেজিত করিয়াছিল সন্দেহ নাই।

ধীশক্তিসম্পন্ন যতগুলি লোকের সহিত মিলের পূর্ব্ব-পরিচয় ছিল, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ অষ্টিনের সহিতই তাঁহার মতের অনেক ঐক্য হইত। কার্লাইলের তেজস্বিনী কল্পনা ও মিলের গভীর চিন্তাশীলতা—এ দুই-ই জ্যেষ্ঠ অষ্টিনে অধিকতর উৎকর্ষ লাভ করে। অষ্টিন লণ্ডন-বিদ্যালয়ের জুরিস্প্রুডেন্সের অধ্যাপকপদে অভিষিক্ত হইয়া আইন অধ্যয়নের নিমিত্ত বন্‌ন নগরে গমন করেন। জার্ম্মান সাহিত্য এবং জার্ম্মান সমাজের প্রকৃতি ও অবস্থা—মানব-জীবন সম্বন্ধে তাঁহার মত সকলে অনেক পরিবর্ত্তন সংঘটিত করে। জার্ম্মান প্রভাবে তাঁহার স্বভাব কোমলতর, তাঁহার তর্কস্পৃহা ক্ষীণতর এবং তাঁহার কবিত্ব ও চিন্তাশক্তি প্রবলতর হইয়া উঠে। তিনি বর্ত্তমান সময়ের অন্তঃসংস্কার-বিরহিত বাহ্য-পরিবর্ত্তনের বিরোধী হইয়া উঠিলেন। সাধারণতঃ ইংরাজ জীবনের নীচতা, ইংরাজ-চিন্তার সঙ্কীর্ণতা, ইংরাজ-হৃদয়ের অনুদারতা এবং ইংরাজলক্ষ্যের অনুচ্চতা প্রভৃতির তিনি বিশেষ ঘৃণা করিতেন। অধিক কি, ইংরাজেরা যাহাকে দেশহিতৈষিতা বলেন, তাহার প্রতিও তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না। তিনি বলিতেন এবং মিলও তাঁহার অনুমোদন করিতেন যে, ইংরাজ-প্রজাতন্ত্র অপেক্ষা প্রুসীয় যথেচ্ছাচার-প্রণালীর অধীনে কার্য্যতঃ উৎকৃষ্ট সুশাসন এবং সকল শ্রেণীর লোকের সুশিক্ষা ও মানসিক উন্নতি-বিধানের জন্য অধিকতর যত্ন হইয়া থাকে। অষ্টিন রিফরম বিলের অনুমোদন করিতেন বটে, কিন্তু লোকে ইহা হইতে রাজ্যশাসন-বিষয়ে তৎক্ষণাৎ যত শুভ ফলের প্রত্যাশা করিত, তিনি ততদূর করিতেন না। মিলের সহিত তাঁহার প্রায় পুরাতন ও নূতন সকল মতবিষয়েই সহানুভূতি ছিল। মিলের ন্যায় তিনি হিতবাদী ছিলেন। জার্ম্মানজাতির প্রতি তাঁহার অবিচলিত প্রেম এবং জার্ম্মান সাহিত্যের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা সত্ত্বেও তিনি কখনই তাহাদিগের দুর্ব্বোধ দর্শনে দীক্ষিত হন নাই। কিন্তু তাঁহার মর্ম্ম জার্ম্মানদিগের প্রায় কবিত্ব ও অনুভূতিময় হইয়া উঠিল। রাজনীতি বিষয়ে তাঁহার মতসকল মিল অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বিভিন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। সাধারণ অনুষ্ঠানসকলের উন্নতি-বিষয়ে তিনি ক্রমে উদাসীন হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তিনি "সোসালিজম" মতের বিরোধী ছিলেন না; এবং যাহাতে ঐ মত সর্ব্বত্র প্রচলিত হয় ও সামন্তশ্রেণীর হস্ত হইতে অধিকার সকল প্রচুর-পরিমাণে বিগলিত হইয়া নিম্নশ্রেণীর হস্তে পতিত হয়, ইহা তাঁহার একান্ত বাসনা ছিল। তিনি মানবজাতির নৈতিক উন্নতির কোন সীমা নির্দ্দেশ করিতে চাহিতেন না, এবং এরূপ সীমা নির্দ্দেশ করা সম্ভবপর বলিয়া মনে করিতেন না। তিনি এই সকল মত জীবনের শেষ-কাল পর্য্যন্ত ধারণ করিয়াছিলেন কি না, মিল তাহা জানিতেন না। তবে তাঁহার শেষকালের রচিত গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া মিলের মনে সন্দেহ হয় যে, অন্তিমকালে অষ্টিনের অন্তরে রাজনীতি-বিষয়ে গুরুতর পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়।

এক্ষণে পিতা ও পুত্রের পরস্পরের সহিত এই সময়ের মানসিক সম্বন্ধ নির্ব্বাচন করা যাইতেছে। পিতার চিন্তা ও অনুভূতি হইতে মিল

ক্রমেই দূরসমাকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। যদি তাঁহারা পরস্পর প্রশান্তভাবে পরস্পরের নিকট আত্ম-মতের সারবত্তা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিতেন এবং অনাবশ্যক প্রভেদ পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের অন্তর্ব্বর্ত্তী দূরত্বের হ্রাস হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু জেমস্ মিল নমনীয়-স্বভাবের লোক ছিলেন না। বিশেষতঃ যে ব্যক্তি তাঁহার পতাকা পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, তাহার সহিত আত্মমতের যৌক্তিকতা বা অযৌক্তিকতা বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক করা তিনি নীচতা মনে করিতেন। সৌভাগ্যক্রমে রাজনীতি-সংক্রান্ত মত সকলে পিতা ও পুত্রের সম্পূর্ণ ঐকমত্য ছিল। এই বিষয়ের কথোপকথনে ও এই বিষয়ের তর্ক-বিতর্কে তাঁহাদিগের অনেক সময় অতিবাহিত হইত। যে সকল বিষয়ে তাঁহাদিগের মতভেদ ছিল, সে সকল বিষয়ে তাঁহারা প্রায় কোন কথা উপস্থিত করিতেন না। জেমস মিল জানিতেন যে, তিনি যে স্বাধীন চিন্তার ভাব পুত্রের অন্তরে সন্নিবেশিত করিয়া দিয়াছেন, সেই স্বাধীনচিন্তাবলে পুত্র অনেক সময়ে বিভিন্ন মত অবলম্বন করিবেন। তথাপি কি প্রণালীতে সেই বিভিন্নতা সংঘটিত হইত, তাহা জানিবার জন্য জেমস বিশেষ উৎসুক হইতেন। কিন্তু তিনি দুঃখের সহিত দেখিতেন যে, পুত্র তাঁহার নিকট সেই প্রণালী ব্যক্ত করিতে অনিচ্ছুক। মিল বলিতেন যে, এরূপ তর্ক-বিতর্কে কোন ফল নাই, অধিকন্তু পরস্পরের মনোবেদনা হইবারই বিশেষ সম্ভাবনা; এই জন্যই তিনি ইহা হইতে একান্ত বিরত থাকিতেন। কিন্তু যখন পিতা পুত্রের মতের বিরোধী মতসকল এইরূপভাবে ব্যক্ত করিতেন যে, তাহার প্রতিবাদ না করা পুত্রের পক্ষে কপটতার পরিচয়-দানমাত্র হইত, তখন তিনি প্রতিবাদ করিতে বিরত হইতেন না।

পঞ্চম অধ্যায়

—*—

দুর্লভ বন্ধুত্ব ও প্রণয়।

যে রমণী বিংশতি বৎসরের বন্ধুত্বের পর মিলের গৃহলক্ষ্মী হইতে সম্মতা হন এবং যে রমণীর সাহায্য ব্যতিরেকে মিল জগতের চিন্তাসাগরে নূতন তরঙ্গ উত্থাপিত করিতে পারিতেন না, ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে সেই রমণীর সহিত মিলের প্রথম পরিচয় হয়। এই সময়ে মিলের বয়স পঞ্চবিংশতি এবং সেই রমণীর বয়স ত্রয়োবিংশতি বৎসর ছিল। এই রমণীর স্বামীর নাম মিষ্টার টেলর। টেলরের সহিত মিলের পূর্ব্ব-পরিচয় ছিল। মিল বাল্যকালে কখন কখন তাঁহাদিগের বাটীতে ক্রীড়া করিতে যাইতেন। সেই সময়ে টেলরের সহিত তাঁহার বাল্য-সুলভ সৌহার্দ্দ্য জন্মে। এই বাল্য-সৌহার্দ্দ্যের অনুরোধেই টেলর তাঁহাকে স্বীয় পত্নীর নিকট পরিচিত করিয়া দেন। টেলর স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, মিল ও তাঁহার পত্নী —ইঁহাদিগের পরস্পরের মধ্যে এই সময় যে পরিচয় জন্মিল, এই পরিচয় তাঁহার জীবদ্দশাতেই গাঢ়তর প্রণয়ে এবং তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই বিবাহে পরিণত হইবে। যদিও মিল ও টেলর-পত্নীর আত্মীয়তা সর্ব্বপ্রথমে তত ঘনীভূত হয় নাই, তথাপি প্রথম দর্শনাবধি টেলর পত্নী মিলের হৃদয়ের একমাত্র অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইয়া উঠিলেন। টেলর-পত্নী পরিণত বয়সে বিদ্যা-বুদ্ধি-গুণে যেরূপ বিভূষিতা হইয়াছিলেন, এই নবীন বয়সে তাহাতে সে সকলের অঙ্কুরমাত্র দেখা গিয়াছিল। বয়সের পরিণতির সহিত তাঁহার মানসিক বৃত্তি-সকলও দিন দিন বিকসিত হইতে লাগিল। দিনমণির কিরণে নলিনী যেন প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। যে সকল কমনীয় গুণে স্ত্রীজাতি জগতে বিখ্যাত, এতাবৎকাল পর্য্যন্ত তাঁহার সেই সকল গুণেরই বিশেষ পরিণতি হইয়াছিল। কিন্তু এখন হইতে মিলের সুতীক্ষ্ণ প্রতিফলনে, যে সকল উর্জ্জস্বল-গুণে পুরুষজাতি জগতে বিখ্যাত, টেলর-পত্নীতে সে সকল গুণেরও পরিণতি হইতে লাগিল। আত্মীয়-গণ যেমন তাঁহার গভীর ও প্রবল হৃদয়ভাব,

অন্তর্ব্বোধকারিণী স্বাভাবিক বুদ্ধি এবং চিন্তাশীল ও কবিত্বপরিপূর্ণ প্রকৃতি দ্বারা আকৃষ্ট হইতেন, বাহিরের লোক তেমনই তাঁহার অলৌকিক সৌন্দর্য্য ও সহৃদয়তায় মুগ্ধ হইত। অতি অল্পবয়সেই তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার স্বামী—সত্যনিষ্ঠ, সাহসী, নিষ্কলঙ্ক, স্বাধীনমতাবলম্বী এবং সুশিক্ষিত ছিলেন। যদিও তাঁহার উপর তাঁহার স্বামীর প্রেম চিরকাল অবিচলিত ছিল, যদিও তিনি চিরকাল সমভাবে স্বামীকে ভক্তি করিতেন ও ভালবাসিতেন, তথাপি তীক্ষ্ণপ্রতিভা ও সজীব সহৃদয়তায় তাঁহার ন্যূন হওয়ায় স্বামী তাঁহার প্রকৃত সহচর হইতে পারেন নাই। সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ে স্ত্রীজাতির অধিকার না থাকায় তাঁহার উচ্চবৃত্তি সকল কার্য্যে পরিণত হইয়া বিকাশ পাইতে পারিত না, সুতরাং তাঁহার জীবন সতত ধ্যানমগ্ন থাকিত, কেবল কতিপয় বন্ধুর সমাগমে সেই ধ্যান মধ্যে মধ্যে ভগ্ন হইত মাত্র। মিল টেলরপত্নীর সেই কতিপয় বন্ধুর অন্যতম ছিলেন, টেলরপত্নী সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার হইতে বিচ্ছিন্ন ছিলেন। তিনি সমাজের অনেক চিররূঢ় কুপ্রথার বিরুদ্ধে সতত অসন্দিগ্ধভাবে স্বাভিমত ব্যক্ত করিতেন। তাঁহার তৎকালীন ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ও স্বভাবাদি অনেক পরিমাণে কবিবর সেলির ন্যায় ছিল। কিন্তু পরিণত-বয়সে তাঁহার চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি যেরূপ উদ্দীপিত ও পরিমার্জ্জিত হইয়াছিল, তাহার সহিত তুলনায় সেলিকে একটি বালক বলিলেও অসঙ্গত হয় না। উচ্চ-চিন্তা বিষয়ে ও দৈনন্দিন কার্য্যকলাপে তাঁহার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি পদার্থনিচয়ের অন্তর্ব্বোধ করিতে পারিত। কার্য্যকরণে তাঁহার যেমন ক্ষিপ্রকারিতা, তেমনই সুদক্ষতা ছিল। তাঁহার কল্পনা ও অনুভূতি এত তেজস্বিনী ছিল যে, তিনি শিল্প-বিদ্যায় অভিনিবিষ্ট হইলে অসাধারণ শিল্পী হইতে পারিতেন। তাঁহার মনের এরূপ তেজস্বিতা ও কোমলতা ছিল এবং তাঁহার বক্তৃতাশক্তি এতদূর বলবতী ছিল যে, তিনি বক্তৃতা-বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হইলে অদ্বিতীয় বাগ্মী হইতে পারিতেন। তিনি মনুষ্য-প্রকৃতি এত গভীররূপে বুঝিতে পারিতেন এবং মনুষ্যের দৈনন্দিন জীবনে তাঁহার এরূপ সূক্ষ্মদর্শিতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ছিল যে, স্ত্রীজাতির রাজ্যের শাসনকার্য্যে কোন অধিকার থাকিলে, তিনি একজন সুপ্রসিদ্ধ শাসনকর্ত্রী হইতে পারিতেন। তাঁহার নিঃস্বার্থভাব, তাঁহার হৃদয়ের স্বাভাবিক মনুষ্যপ্রেম হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল, কর্ত্তব্যাবলীর উপদেশের ফল ছিল না। তাঁহার পরদুঃখানুভাবকতাশক্তি এতদূর বলবতী ছিল, তাঁহার কল্পনা এরূপ তেজস্বিনী ছিল যে, তাঁহার অন্তর দুঃখীর অন্তরের সহিত মিশাইয়া যাইত এবং তিনি অনেক সময় পরের দুঃখে অধিকতর বর্ণবিন্যাস করিয়া বদান্যতা ও সহানুভূতির সীমা অতিক্রম করিতেন। তাঁহার ন্যায়পরতা এতদূর বলবতী ছিল যে, যে কেহ তাঁহার ভালবাসা অণুমাত্র প্রত্যর্পণ করিতে পারিত, তাহার উপরই তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইত। তিনি স্বভাবতঃ নম্র ছিলেন বটে, কিন্তু অহঙ্কার-প্রদর্শনের স্থল উপস্থিত হইলে অহঙ্কার-প্রদর্শন করিতেও ত্রুটি করিতেন না। তিনি স্বভাবতঃ সরলা ও বিলাসবিবর্জ্জিতা ছিলেন, নীচতা ও ভীরুতার উপর তাঁহার স্বাভাবিকী ঘৃণা এবং নৃশংস বা অত্যাচারী বিশ্বাসঘাতক বা অভদ্র-চরিত্রের লোকের উপর তাঁহার দীপ্তিমান্ ক্রোধ ছিল। কিন্তু তিনি প্রাকৃতিক নিয়ম-লঙ্ঘনে কার্য্যের যে অসাধুতা জন্মে, তাহার সহিত মনুষ্যকৃত নিয়ম-লঙ্ঘনে কার্য্যের যে অসাধুতা জন্মে, তাহার অন্তর বুঝিতে পারিতেন। তাঁহার এরূপ বিশ্বাস ছিল যে, যাহারা প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করে, তাহারাই প্রকৃতিতঃ অসাধু। কিন্তু যাঁহারা কেবল মনুষ্যকৃত নিয়ম লঙ্ঘন করেন, তাঁহারা প্রকৃতিতঃ অসাধু না হইলেও হইতে পারেন, অধিক কি, অনেক সময় তাঁহাদিগের মধ্যে অনেক উচ্চদরের লোকও দেখিতে পাওয়া যায়।

এরূপ অপূর্ব্ব রমণীর সহিত মানসিক সহবাসে মিলের মনোবৃত্তি সকল যে ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত ও পরিমার্জ্জিত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এই অদ্ভুত রমণীর নিকট হইতে মিল্ যে সকল উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তিনি সে সমস্তের কখন প্রতিশোধ দিতে পারেন নাই; তথাপি উন্নতি-বিষয়ে সেই রমণীও যে মিলের নিকট বিশেষ ঋণী ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। প্রবল অনুভূতিবলে তিনি যে সকল উন্নতমত আপনা হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, মিল্‌কে প্রগাঢ় অধ্যয়ন ও যুক্তি দ্বারা প্রায় সেই সকল মতে উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছিল। মিলের প্রগাঢ় অধ্যয়ন ও যুক্তি সাহায্যে টেলরপত্নী আপনার স্বভাবজ জ্ঞানের দুর্ব্বলতা অপনীত করিতে পারিয়াছিলেন। অসাধারণ বুদ্ধির প্রখরতা ও

অসামান্য মানসিক ক্ষিপ্রকারিতাবলে তিনি যেমন সর্ব্বপদার্থ হইতেই জ্ঞানের উপকরণনিচয় সংগ্রহ করিতেন, তেমনই তিনি নিজের নিকট হইতেও অসংখ্য জ্ঞানোপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

মিল্ তাঁহার "স্বাধীনতা" নামক গ্রন্থ এই রমণীকে উৎসর্গ করিতে গিয়া তাঁহার বিষয় এইরূপ লিখিয়াছেন ;—"আমি যত কিছু গ্রন্থ রচনা করিয়াছি, ইনি সে সমুদায়ের উত্তেজক বা আংশিক রচয়িত্রী ছিলেন। ইনি আমার গৃহিণী ও সখা ছিলেন। ইনি যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন, তাহাতেই আমার প্রবৃত্তি জন্মিত। ইনি কোন কার্য্যে অনুমোদন করিলে আমি সেই অনুমোদন আমার প্রধান পুরস্কার বলিয়া মনে করিতাম। আমার অন্য পুস্তকগুলির ন্যায়, এখানিও আমাদের উভয়ের রচিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এখানি তাঁহার অমূল্য-পুনর্দ্দর্শন দ্বারা বিশোধিত হয় নাই। যে সকল মহতী চিন্তা ও গভীর হৃদয়ভাব তাঁহার সহিত সমাধিনিহিত হইয়াছে, আমি যদি সে সকলের অর্দ্ধেকও জগতে ব্যক্ত করিতে পারিতাম, তাহা হইলেও আমা দ্বারা জগতের অসীম উপকার সংসাধিত হইতে পারিত, কিন্তু এ উপকারের সহিত তুলনায়, আমি এক্ষণে একাকী তদীয় অমূল্য জ্ঞানের সাহায্য-বিরহিত হইয়া যাহা কিছু লিখিব, তাহা হইতে জগতের যে উপকার সাধিত হইবে, তাহা অতি সামান্য।"

টেলরপত্নী যে অপূর্ব্ব রমণী ছিলেন, ইহাতেই তাহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। অধিক বলা বাহুল্য মাত্র।

১৮৩৩ খৃঃ মিল্ একজামিনার নামক পত্রের সম্পাদক ফন ব্লাঙ্কের সহিত তদীয় পত্রিকায় র‍্যাডিক্যালিজম মত লইয়া হুইগ মন্ত্রিদলের সহিত ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন। ১৮৩৪ খৃঃ তিনি "মনথলি রিপজটরি" মাসিক পত্রিকায় চলিত ঘটনাবলীর উপর "নোটস অন দি নিউসপেপারস্" নামক কতকগুলি প্রস্তাব রচনা করেন। উক্ত পত্রিকার সম্পাদক ফক্স একজন বিখ্যাত রাজনৈতিক বাগ্মী ছিলেন। ইনি পরে পার্লিয়ামেণ্টের একজন সভ্য নির্ব্বাচিত হন। ইহাঁর সহিত এই সময় মিলের বিশেষ পরিচয় হয় এবং ইহাঁরই অনুরোধে মিল তদীয় পত্রিকায় আরও অনেকগুলি বিষয় লিখেন ; তন্মধ্যে "থিওরি অব পইট্রি" নামক কবিতা-বিষয়ক প্রস্তাবটি তাঁহার "ডেজারটেনস" নামক পুস্তকে অন্তর্নিবেশিত হইয়াছে। সংবাদপত্রে ব্যতীতও ১৮৩২—১৮৩৪ খৃঃ পর্য্যন্ত তিনি স্বতন্ত্রভাবে অন্যান্য যে সকল প্রস্তাব রচনা করেন, সে সমস্ত একত্র করিলে একখানি সুদীর্ঘ গ্রন্থ হয়। সেই সকলের মধ্যে উপক্রমণিকার সহিত প্লেটোলিখিত ডায়ালগ সকলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং বেন্থামের দর্শনের উপর টিপ্পনী বিশেষ গৌরব লাভ করে।

এই সময়ে মিল, তাঁহার পিতা এবং তদীয় পিতৃবন্ধুদিগের মধ্যে দার্শনিক র‍্যাডিক্যালদিগের মুখযন্ত্রস্বরূপ একখানি সাময়িক পত্র ও সমালোচন প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রস্তাব হয়। ওয়েষ্টমিনিষ্টার রিভিউ প্রথমে এই উদ্দেশ্যেই সংস্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু নানা কারণে ইহা সেই উদ্দেশ্যসাধন করিতে পারে নাই। এই প্রস্তাব অনেক দিন হইতে চলিতেছিল, কিন্তু অর্থাভাব প্রভৃতি নানা কারণে বহুদিন পর্য্যন্ত ইহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। অবশেষে ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে সার উইলিয়ম মলেসওয়ার্থ নামক একজন দার্শনিক এই গুরুভার-গ্রহণে সম্মত হইলেন। অর্থ ও বিদ্যা উভয়েতেই তিনি গুরুভার গ্রহণের যোগ্য, তথাপি অন্ততঃ অপ্রকাশ্যভাবেও মিল এই পত্রিকার সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ না করিলে তিনি ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতে স্বীকৃত হইলেন না ; সুতরাং মিল অগত্যা এই ভার গ্রহণে সম্মত হইলেন। এই পত্রিকা প্রথমে লণ্ডন রিভিউ নামে প্রকাশিত হয়। পরে মলেসওয়ার্থ ওয়েষ্টমিনিষ্টার রিভিউয়ের স্বত্বাধিকারী জেনেরাল টমসনের নিকট হইতে ওয়েষ্টমিনিষ্টার রিভিউয়ের স্বত্বাধিকার ক্রয় করিলে এই দুই পত্রিকা একত্রীভূত হইয়া লণ্ডন এবং ওয়েষ্টমিনিষ্টার রিভিউ নামে প্রকাশিত হইতে লাগিল। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই পত্রিকার সম্পাদনে মিলের অধিকাংশ সময় পর্য্যবসিত হয়। এই পত্রিকার প্রথমাবস্থায় ইহাতে সম্পূর্ণরূপে মিলের মত সকল ব্যক্ত হয় নাই, মিলকে অনেক সময়ে অপরিহার্য্য সহচরবৃন্দের মতের অনুবর্ত্তন করিতে হইত। এই পত্রিকা দার্শনিক র‍্যাডিক্যালদিগের মুখযন্ত্রস্বরূপ ছিল বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, অন্যান্য দার্শনিক র‍্যাডিক্যালদিগের সহিত মিলের সর্ব্বদাই গুরুতর বিষয়ে মতান্তর উপস্থিত হইত। এই পত্রিকার সম্পাদনে জেমস্ মিলের সাহায্য সকলেই বহুমূল্য বলিয়া মনে করিতেন এবং

তিনিও জীবনের শেষ পীড়া পর্য্যন্ত ইহার উৎকর্ষ-বিধানে প্রচুর পরিমাণে পরিশ্রম করিতে ত্রুটি করেন নাই। তল্লিখিত প্রস্তাবাবলীর বিষয় সকল এবং তদীয় মত-ব্যক্তির অসন্দিগ্ধতা, ওজস্বিতা ও বিশদতা প্রভৃতির জন্য এই পত্রিকা তাঁহার নিকট হইতেই বিশেষরূপে জীবন ও বর্ণ প্রাপ্ত হয়। মিল্ পিতৃ-লিখিত প্রস্তাব সকলের উপর তাঁহার সম্পাদকীয় ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারিতেন না; অধিকন্তু সময়ে সময়ে তাঁহাকে আংশিকরূপে নিজের মত সকল পরিত্যাগ করিতে হইত। এইরূপে প্রাচীন ওয়েষ্টমিনিষ্টার রিভিউএর মত সকলই কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া এই নব পত্রিকায় প্রচারিত হইতে লাগিল। কিন্তু মিল্ ইহাতে পরিতৃপ্ত হইতে পারিলেন না। তিনি ঐ সকল পুরাতন মতের পার্শ্বে নিজের নূতন মত সকলও সন্নিবেশিত করিতে লাগিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি এরূপ নিয়ম সংস্থাপন করিলেন যে, প্রত্যেক লেখককে আপন আপন নাম স্বাক্ষর করিয়া বা কোন সাঙ্কেতিক নাম দিয়া আপন আপন প্রস্তাব প্রকাশিত করিতে হইবে। সম্পাদক কাহারও মতের জন্য দায়ী নহেন। তিনি কেবল এই মাত্র দেখিবেন, যেন প্রস্তাবগুলি পত্রিকার উপযোগী হয়। এই সময় সুবিখ্যাত পদার্থ বিদ্যাবিদ্ অধ্যাপক সেজউইক, লক্ এবং পেলির মতের প্রতিবাদ উপলক্ষ করিয়া বৈশ্লেষিক মনোবিজ্ঞান ও হিতবাদ মতের উপর ঘোরতর আক্রমণ করেন। মিল্ সেজউইকের এই প্রতিবাদের বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাব রচনা করেন। এই প্রস্তাব উপলক্ষে হিতবাদ প্রভৃতির মত সম্বন্ধে তাঁহার যে সকল নূতন ভাব ছিল, তাহা ব্যক্ত করেন।

মিল পিতার সহিত তাঁহার যতদূর মতভেদ ছিল বলিয়া মনে করিতেন, তাঁহাদিগের মধ্যে বাস্তবিক তাদৃশ মতভেদ ছিল না। বিতণ্ডার সময় না হউক, অন্ততঃ সহজ অবস্থায়, পিতা মিলের অনেক মতের সত্যতা স্বীকার করিতেন এবং কার্য্যতঃ অনেক উদারতা প্রদর্শন করিতেন। এই সময়ে জেম্স্ মিলের "ফ্রগ্‌মেণ্ট অন্ ম্যাকিণ্টস্" নামক পুস্তক লিখিত ও প্রকাশিত হয়। মিল এই পুস্তকের ভূয়সী প্রশংসা করিতেন বটে; কিন্তু যেরূপ পারুষ্যের সহিত ইহাতে ম্যাকিণ্টসকে আক্রমণ করা হইয়াছে, তাহা ন্যায় ও ভদ্রতার বহির্ভূত বলিয়া মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেন। আহ্লাদের বিষয় এই যে, এই সময় "ডিমোক্রেসি ইন্ আমেরিকা" নামে টক্‌ভিলের একখানি গ্রন্থ প্রচারিত হয়। ইহাতে রাজনীতি-ঘটিত প্রশ্ন সকল যে প্রণালীতে মীমাংসিত হইয়াছিল, তাহা জেম্স্ মিলের প্রণালীর সম্পূর্ণ বিপরীত। জেমসের প্রণালী যুক্তিমূলক, টক্‌ভিলের প্রণালী ব্যাপ্তিজ্ঞান ও বিশ্লেষ মূলক। ভিন্ন প্রণালীতে লিখিত হইলেও জেমস্ মিল্ এই গ্রন্থের বিশেষ সমাদর করিতেন। তিনি বলিতেন যে, টক্‌ভিল সাধারণ-তন্ত্রের স্বপক্ষ বিপক্ষে যাহা বলিয়াছেন, সে দুয়ের তুলনা করিতে গেলে স্বপক্ষে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত ও হৃদয়গ্রাহী বলিয়া বোধ হয়। আর একটি আহ্লাদের বিষয় এই যে, মিল এই সময় সম্মিলিত রিভিউয়ে সভ্যতা সম্বন্ধে যে প্রস্তাবটি রচনা করেন এবং যে প্রস্তাবটি পরে তাঁহার "ডেজারটেসনস্" নামক গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত হয়, জেমস সেই প্রস্তাবটির বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন। এই প্রস্তাবে মিল অনেক নূতন মতের অবতারণা করেন। এইরূপে মিল ও তাঁহার পিতা—ইহাদিগের উভয়ের মতভেদ ক্রমেই অপনীত হইতেছিল, এমন সময় সহসা অকাল-মৃত্যু আসিয়া জেমস্ মিলের বহুমূল্য জীবনের সীমা নির্দ্দেশ করিল। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের সমস্ত বৎসর তাঁহার স্বাস্থ্য ক্রমেই অবনত হইতে থাকে এবং তাঁহার পীড়া ক্রমে ক্ষয়কাসে পরিণত হয়। অবশেষে কঙ্কালাবশিষ্ট হইয়া ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুন তারিখে তিনি মানবলীলা সংবরণ করেন। জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত তাঁহার মানসিক বৃত্তিনিচয়ের নিস্তেজ ভাব উপলক্ষিত হয় নাই। প্রাণী ও বস্তুমাত্রের উপর তাঁহার যে বিশেষ যত্ন ছিল, এক দিনের জন্যও তাহার হ্রাস হয় নাই। নিকটবর্ত্তী মৃত্যুর বিভীষিকা এক দিনের জন্যও তাঁহার ধর্ম্মবিষয়ক মত সকল পরিবর্ত্তিত করিতে পারে নাই। তাঁহার প্রধান সুখ এই যে, তিনি যত দিন জীবিত ছিলেন, অক্লান্তভাবে জগতের হিতসাধন করিয়াছেন। তাঁহার প্রধান দুঃখ এই যে, তিনি জগতের হিতসাধন করিতে আরও অধিক সময় পাইলেন না।

সাহিত্য ও রাজনীতি বিষয়ে দেশের মধ্যে তাঁহার স্থান অতীব উচ্চে উনবিংশ শতাব্দীর বংশধরগণ—যাঁহারা জেমস মিলের লেখনী হইতে অসীম উপকার লাভ করিয়াছেন—যে তাঁহার নামের তত উল্লেখ করেন না, ইহা তাঁহাদিগের পক্ষে গৌরবের

বিষয় নহে। জেমস মিলের যশঃসূর্য্য বেন্থামের যশঃসূর্য্যের উজ্জলতর কিরণে ম্লান ও নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু জেমস মিল কখনই বেন্থামের শিষ্য বা অনুবর্ত্তক ছিলেন না। তিনি তাঁহার সময়ের এক জন অদ্বিতীয় স্বাধীন-চিন্তাশীল ব্যক্তি ছিলেন। অতীত বংশধরগণ তাঁহাদিগের উত্তরাধিকারিগণের জন্য যে সকল অমূল্য স্বাধীন চিন্তারত্ন রাখিয়া গিয়াছিলেন, তিনিই সর্ব্বপ্রথমে সেই সকলের মূল্য অনুধাবন করেন, এবং তিনিই সর্ব্বপ্রথমে তাহাদিগের ব্যবহার করেন। বেন্থাম ও তাঁহার মনের গঠনের বস্তুতঃ অনেক বৈলক্ষণ্য ছিল। সত্য বটে, তিনি বেন্থামের সকল উচ্চগুণের অধিকারী হন নাই, কিন্তু বেন্থামও তাঁহার সমস্ত উচ্চগুণের আধার হইতে পারেন নাই। বস্তুতঃ জগতের অসীম উপকারসাধন করিয়া বেন্থাম যে অতুল যশোরাশি লাভ করিয়াছেন, জেমস মিলের জন্য সে যশ প্রার্থনা করিলে আমরা লোকের নিকট উপহাসাস্পদ হইব। বেন্থামের ন্যায় তিনি মানবচিন্তাবিভাগে কোন বিপ্লব উত্থাপিত করিতে পারেন নাই, কোন নূতন সৃষ্টিও সংশোধিত করিতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি বেন্থামের প্রতিভার উজ্জলতর কিরণের সাহায্যে জগতের যে সকল হিতসাধন করিয়াছেন, সে সকল গণনায় না আনিলেও বেন্থাম যে বিষয়ে হস্তক্ষেপও করেন নাই, সেই বৈশ্লেষিক মনোবিজ্ঞানে—যাহার উপর নীতি ও রাজনীতিশাস্ত্র মূলতঃ নির্ভর করিতেছে—যাহা যাহা করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার নাম ভাবী বংশধরদিগের নিকট অতি আদরের জিনিস হইবে সন্দেহ নাই। আর একটি কারণ—যাহাতে তাঁহার নাম ঊনবিংশ শতাব্দীর লোকের নিকট তত আদৃত হয় নাই—এই যে, যদিও তাঁহার মত সকল সাধারণতঃ প্রায় সর্ব্বত্র গৃহীত হইয়াছিল, তথাপি তাঁহার মত সকলের সহিত বর্ত্তমান শতাব্দীর মত সকলের স্পষ্ট প্রতিযোগিতা দৃষ্ট হইত। যেমন ব্রুটস রোমানদিগের শেষ আদর্শ বলিয়া গৃহীত হইয়া ছিলেন, সেইরূপ জেমস মিল্ অষ্টাদশ শতাব্দীর চিন্তা ও মতসকল পরিবর্ত্তিত ও পরিশোধিত করিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীতে আনয়ন করিয়াছিলেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে অষ্টাদশ শতাব্দীর বিরুদ্ধে যে অভ্যুত্থান উপস্থিত হয়, জেমস্ মিল্ তাহার ভালমন্দ কিছুতেই সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। অষ্টাদশ শতাব্দীকে একটি সুমহৎ যুগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। এই যুগে অসংখ্য নির্ভীক ও দৃঢ়চিত্ত লোকের জন্ম হয়। জেমস্ মিল তাঁহাদিগের অন্যতম। তাঁহার রচনা ও ব্যক্তিগত মত সকল প্রভাবে তিনি তাঁহার সমসাময়িক বংশধরদিগের আলোক-কেন্দ্র-স্বরূপ ছিলেন। ভল্টেয়ার যেমন ফ্রান্সের দার্শনিকদিগের অগ্রণী ছিলেন, জেমস্ মিল সেইরূপ ইংলণ্ডের দার্শনিক র‍্যাডিক্যালদিগের দলপতি ছিলেন। ইনি ভারতবাসীদিগের অতি আদরের ধন —যেহেতু, ইনিই সর্ব্বপ্রথমে ডাইরেক্টরদিগের সুমন্ত্রণা প্রদান দ্বারা ভারতবাসীদিগকে বণিক্-সম্প্রদায়ের অত্যাচার হইতে উন্মুক্ত করিতে চেষ্টা করেন। তিনি এমন কোন বিষয় লিখেন নাই, যাহা তিনি নিজের অমূল্য চিন্তালোকে আলোকিত করেন নাই। নিজ চরিত্র ও মনের বলে অপরের মত ও উদ্দেশ্য পরিবর্ত্তিত করিয়া, স্বাধীনতা ও উন্নতির স্রোত পরিবর্দ্ধিত করিতে সমর্থ —তাঁহার ন্যায় ইংলণ্ডে তৎকালে এমন আর দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন না।

এইরূপে পিতৃবিহীন হইয়া মিল এখন হইতে উন্নতিক্ষেত্রে একাকী বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি জানিতেন যে, তদীয় পিতা যে সকল গুণে জনসমাজে স্বকীয় আধিপত্য সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, তাঁহাতে সে সকল সামাজিক গুণের অনেক অভাব আছে; সুতরাং পিতার জীবদ্দশায় তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র যেরূপ সহজ ও পরিস্কৃত ছিল, এখন আর সেরূপ থাকিবে না। এখন তাঁহাকে সকল কার্য্যই একাকী ও সাহায্যবিরহিত হইয়া করিতে হইবে। তিনি এখন হইতে সাধারণতন্ত্র-পক্ষপাতী উদারচেতা ব্যক্তিদিগের উপর আপন আধিপত্য-সংস্থাপনের একমাত্র আশা তাঁহার নব পত্রিকার উপরই ন্যস্ত করিলেন। পিতৃবিহীন হওয়াতে মিল পিতার অমূল্য সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইলেন বটে, কিন্তু পিতৃ-সম্বন্ধীয় যে অধীনতার বিনিময়ে তাঁহাকে সেই সাহায্য ক্রয় করিতে হইত, তাহা হইতে উন্মুক্ত হইলেন।

এই শৃঙ্খল হইতে উন্মুক্ত হওয়ায় তাঁহার মত সকল মেঘোন্মুক্ত সূর্য্যের ন্যায় অধিকতর বিকাশ পাইতে লাগিল। তৎকালে ইংলণ্ডে জেমস্ মিল ভিন্ন র‍্যাডিক্যালমতাবলম্বী আর কোন লেখক বা রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন না, যাঁহার নিকটে মিলের মস্তক অবনত হইত অথবা তাঁহার লেখনী প্রতিহত বা সঙ্কুচিত থাকিত। এক্ষণে মিল মলেস্ওয়ার্থের সম্পূর্ণ বিশ্বাসভাজন হইয়া নব পত্রিকায় নিজের স্বাধীন মতসকল

ও চিন্তাপ্রণালীর পূর্ণ প্রসর দিতে লাগিলেন। তিনি স্বাহমোদিত উন্নতির পক্ষসমর্থক ব্যক্তিমাত্রেরই জন্য পত্রিকার স্তম্ভ সকল উন্মুক্ত রাখিলেন। ইহাতে যদি তিনি প্রাচীন সহচরবৃন্দের সাহায্যে বঞ্চিত হন, তজ্জন্যও প্রস্তুত হইলেন। এই সময় হইতে কার্লাইল এই পত্রিকার নির্দ্দিষ্টলেখকশ্রেণীভুক্ত হইলেন এবং ষ্টার্লিং ইহাতে মধ্যে মধ্যে দুই একটি প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন। যদিও প্রত্যেক লেখক ইহাতে স্বাধীনভাবে আপন আপন প্রবন্ধে আপন আপন মত ব্যক্ত করিতে লাগিলেন, তথাপি এই পত্রিকায় সাধারণ ভাব মিলের মতানুযায়ীই হইয়া উঠিল। তিনি সুশৃঙ্খলরূপে এই পত্রিকার সম্পাদন-কার্য্যের নির্ব্বাহ জন্য রবার্টসন নামক একজন স্কচ্‌কে সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত করিলেন। রবার্টসন অতিশয় কার্য্যদক্ষ, বহুদর্শী এবং পরিশ্রমশীল ছিলেন। ইঁহারই বুদ্ধিকৌশলের উপর মিল তাঁহার পত্রিকার বিক্রয় ও প্রচারের আশা ন্যস্ত করিয়াছিলেন। ইঁহার বুদ্ধিকৌশলের উপর মিল এত আশা করিয়াছিলেন যে, ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে যখন মলেসওয়ার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পত্রিকার প্রকাশনে ক্লান্ত হইলেন এবং যে কোন প্রকারে ইহা হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছুক হইলেন, তখন মিল তাঁহার আশায় অবিবেচনাপূর্ব্বক আপন ব্যয়ে ইহা চালাইতে সম্মত হইলেন। একজন সম্পাদক, একজন সহকারী সম্পাদক, এবং কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট লেখককে বেতন দিতে হইলে তাঁহাকে একদিনের জন্যও পত্রিকা চালাইতে হইত না। কিন্তু স্বয়ং এবং তাঁহার কতিপয় বন্ধু ইহাতে বিনা বেতনে লিখিতে সম্মত হওয়ায় অতি কষ্টে ইহার মুদ্রাঙ্কন-ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে লাগিল। তথাপি এডিনবরা ও কোয়ার্টার্লি রিভিউয়ের নিয়মে কতকগুলি বৈতনিক লেখককে বেতন দিতে সম্মত হওয়ায় মিল্‌কে উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। কারণ, পত্রিকার বিক্রয়োৎপন্ন অর্থ হইতে তাহা নির্ব্বাহ হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁহার ন্যায়দর্শনে পুনর্ব্বার হস্তক্ষেপ করিলেন। ইন্‌ডকৃসন আরম্ভ করিয়াই প্রায় পাঁচ বৎসরের জন্য তাঁহার লেখনী এ বিষয়ে বিশ্রান্ত ছিল। তাহার কারণ এই, তিনি জানিতেন যে, পদার্থ-বিজ্ঞানের সর্ব্বাঙ্গীন ও সূক্ষ্মজ্ঞান ব্যতীত ন্যায়দর্শন আয়ত্ত করা অসম্ভব। কিন্তু তাহাও স্বল্পসময়-সাধ্য নহে, আর এমন কোন পুস্তক ছিল না, যাহাতে ন্যায়দর্শনসাহায্যার্থে বিজ্ঞানশাস্ত্র সকলের সাধারণ জ্ঞান ও প্রণালী সকল একত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এই বৎসরের প্রারম্ভে ডাক্তার হিউয়েল (Whewell) তাঁহার ইন্‌ডকৃটিভ বিজ্ঞানের ইতিবৃত্ত প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থখানি মিলের আকাঙ্ক্ষার অনতিদূরবর্ত্তী হইয়াছিল। এই জন্য মিল অতি আগ্রহের সহিত ইহা পাঠ করিয়াছিলেন, ইহার অন্তবর্ত্তী মত সকল যদিও অভ্রান্ত ছিল না, তথাপি ইহার অন্তর্নিহিত চিন্তার প্রভূত উপকরণসামগ্রী মিলের যে বিশেষ উপকারে লাগিয়াছিল, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

উক্ত উপকরণসামগ্রী হিউয়েলের হস্তে প্রথম সংস্কার প্রাপ্ত হয়। সুতরাং অল্প পরিশ্রমেই ইহা মিলের কার্য্যোপযোগী হইয়া উঠে। এত দিন যাহার অনুসন্ধান করিতেছিলেন, এক্ষণে তাহা তাঁহার করতলস্থ হইল। হিউয়েলের গ্রন্থ তদীয় চিন্তাসাগরে নূতন তরঙ্গ উত্থাপিত করিল। তিনি হিউয়েলের গ্রন্থপাঠের পর হার্সেলের প্রাকৃতিক বিজ্ঞান পাঠ করিলেন। এই গ্রন্থ তিনি পূর্ব্বেও পাঠ করিয়াছিলেন এবং ইহার সমালোচনা পর্য্যন্তও করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতেও কখন তাঁহার কোন উপকার দর্শে নাই। কিন্তু এক্ষণে হিউয়েলের গ্রন্থের আলোকে তিনি ইহাতে অনেক নূতন বিষয় দেখিতে লাগিলেন, আপনার মানসিক উন্নতির ইয়ত্তা করিতে পারিলেন। তিনি তাঁহার নব পত্রিকার সম্পাদনকালের মধ্যে যে অবসর পাইতেন, তাহাতেই তাঁহার সুবিখ্যাত ন্যায়দর্শনের এক-তৃতীয়াংশ সমাপ্ত করিলেন। পূর্ব্বে তিনি এ বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতেও আর এক-তৃতীয়াংশ হইল। অপর এক-তৃতীয়াংশ মাত্র অবশিষ্ট রহিল। ন্যায়দর্শন এই অবস্থায় রাখিয়া তিনি এক্ষণে কমটের দর্শন লইয়া ঘোরতর বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন।

মিল্ কমটের গবেষণাপ্রণালীর সূক্ষ্মতা ও গম্ভীরতার ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। কিন্তু তিনি তাঁহার দর্শনের এই প্রধান দোষ উল্লেখ করিয়াছেন যে, ইহাতে প্রমাণের কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই। এই বিষয়ে মিলের দর্শন কমটের দর্শন অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। যাহা হউক, কমটের দর্শনপাঠে মিলের বিশেষ উপকারলাভ হইয়াছিল। তাঁহার শেষ রচনা সকল অনেক স্থলে কমটের দর্শনালোকে আলোকিত। এতাবৎকাল পর্য্যন্ত কমট-দর্শনের দুই খণ্ডমাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল।

ইহার পর কমট দর্শনের অবশিষ্ট খণ্ড সকল যেমন প্রকাশিত হইতে লাগিল, অমনি মিল্ বিশেষ আগ্রহের সহিত সেই সকল পাঠ করিতে লাগিলেন। কমটের সামাজিক বিজ্ঞান মিলের রুচিকর হয় নাই। চতুর্থ খণ্ডে এই বিষয়ের আলোচনা ছিল। সুতরাং চতুর্থ খণ্ড মিল্‌কে সম্পূর্ণরূপে হতাশ করে। কিন্তু পঞ্চম খণ্ড তাঁহার এই ক্ষোভ কিয়ৎপরিমাণে অপনীত করে। এই খণ্ডে ইতিহাসের একটি অখণ্ড ছবি প্রদত্ত হয়। এই ছবি অবলোকন করিয়া মিল্ পরম পুলকিত হন। ন্যায়দর্শন সম্বন্ধে মিল্ বিপরীত অম্বয়-প্রণালী (Inverse Deductive method) বিষয়ে কমটের নিকট ঋণী ছিলেন। এই মতটি সম্পূর্ণ নূতন। মিল্ কমটের দর্শন ভিন্ন আর কুত্রাপি এই মত দেখেন নাই, বোধ হয়, কমটের দর্শন অবলোকন না করিলে এই মতে উপনীত হইতে বহুদিন লাগিত, অথবা হয় ত তিনি স্বয়ং কোন কালেই এ মতে উত্তীর্ণ হইতে পারিতেন না।

কমটের সহিত মিলের কখনই চাক্ষুষ আলাপ হয় নাই, তথাপি মিল্ তাঁহার রচনাবলীর একজন অকপট স্তুতিবাদক ছিলেন। কিছুদিন তাঁহাদিগের মধ্যে পত্রাদি লেখালেখি চলিয়াছিল। কিন্তু ক্রমে সেই পত্র সকল বিতণ্ডায় পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগের পরস্পরকে পত্র লেখার আগ্রহও কমিয়া গেল। পত্র লেখা বিষয়ে মিল্ সর্ব্বপ্রথমে শিথিল হন, কিন্তু পত্র লেখা রহিত করা বিষয়ে কমটই অগ্রগামী হন। মিল্ দেখিলেন—আর বোধ হয়, কমটও তাহাই বুঝিয়াছিলেন যে, তাহা দ্বারা কমটের মানসিক উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই এবং কমট দ্বারা তাঁহার যে উপকারের সম্ভাবনা, তাহা কমটের পুস্তক দ্বারাই হইতে পারে। তাঁহাদিগের পার্থক্য যদি সামান্য মতভেদ-ঘটিত হইত, তাহা হইলে তাঁহাদিগের মধ্যে এরূপ চিরবিচ্ছেদ সংঘটিত হইত না। কিন্তু যে সকল প্রিয়তম মত তাঁহাদিগের গভীর ও প্রবলতর হৃদয়ভাবের সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছিল, যে সকল প্রিয়তম মত তাঁহাদিগের জীবন পথের নিয়ামক ছিল, তাঁহাদিগের বিচ্ছেদ সেই প্রিয়তম ও গভীরতম মত সকলের পার্থক্যে সংঘটিত হয়। কমট বলিতেন যে, যেমন জনসাধারণ—অধিক কি, তাহাদিগের শাসনকর্ত্তৃগণও পদার্থ-বিদ্যা বিষয়ে বৈজ্ঞানিকদিগের মতের উপর নির্ভর করিয়া থাকেন, সেইরূপ তাঁহাদিগের সমাজতত্ত্ব ও রাজনীতি বিষয়েও দার্শনিকদিগের মতের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করা উচিত। মিল এ বিষয়ে কমটের সহিত সম্পূর্ণ ঐকমত্য অবলম্বন করিতেন। কমটের সর্ব্বপ্রথম গ্রন্থ পাঠ করা অবধি এই মত মিলের অন্তরে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হয়। মধ্যযুগে রাজকীয় ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে পৃথগ্‌ভূত হওয়ায় আধুনিক ইউরোপের সভ্যজতি সকল যে কি অসীম উপকার লাভ করিয়াছেন, কমট তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে তাহা অতি সুন্দররূপে বিবৃত করিয়াছেন। মিল ইহার ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। কমট বলিতেন যে, ধর্ম্মযাজকেরা এতদিন পর্য্যন্ত আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি ও নীতির উপর যে প্রভুতা প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছেন, কালে সেই প্রভুতা অতর্কিতভাবে দার্শনিকদিগের হস্তেই পতিত হইবে। দার্শনিকেরা যখন নানা মত পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণরূপে ঐকমত্য অবলম্বন করিবেন, তখনই তাঁহারা এরূপ আধিপত্য প্রাপ্ত হইবার যোগ্য হইবেন। মিল এ বিষয়েও কমটের সহিত ঐকমত্য অবলম্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু এখন কমট দার্শনিকদিগকে রোমান্ ক্যাথলিক ধর্ম্মযাজকদিগের ন্যায় একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিলেন। যখন তিনি রোমান্ ক্যাথলিক ধর্ম্মযাজকেরা এক সময় যে আধ্যাত্মিক আধিপত্য ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহার দার্শনিকদিগকে সেই আধিপত্যে অভিষিক্ত করিলেন; যখন তিনি এই আধ্যাত্মিক প্রভুতাকে উৎকৃষ্ট শাসন-প্রণালীর একমাত্র অবলম্বন এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক অত্যাচার-নিবারণের এক মহৌষধি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে লাগিলেন; যখন তিনি এরূপ প্রণালী হইতে রাজনৈতিক ও পারিবারিক যথেচ্ছাচার বিষয়েও অনেক উপকারের আশা করিতে লাগিলেন; সেই মুহূর্ত্ত হইতেই মিল্ স্থির করিলেন যে, ন্যায়দর্শন সম্বন্ধে তাঁহাদিগের মত যতই কেন এক হউক না, সমাজতত্ত্ব বিষয়ে তাঁহারা আর এক পথে অধিক দিন বিচরণ করিতে পারেন না। কমট "সিষ্টেম ডি পলেটিক পজিটিব" নামক তাঁহার শেষ গ্রন্থে তাঁহার এই মত সকলকে চরমসীমায় সমানীত করেন। সেই মত এই—কতকগুলি আধ্যাত্মিক শিক্ষক ও শাসনকর্ত্তাদিগের একটি সুসংবদ্ধ সমাজ থাকিবে, তাঁহারা যে যে মতবিষয়ে ঐকমত্য অবলম্বন করিবেন, সেই সেই মত দ্বারা সাধারণের কার্য্য—অধিক কি, চিন্তা

পর্য্যন্তও—নিয়ন্ত্রিত ও পরিমার্জ্জিত হইবে। এই মত সমাজের ব্যক্তিবিশেষের কার্য্য ও যতদূর সম্ভব চিন্তার—সেই কার্য্য ও চিন্তা তাঁহাদিগের নিজ সম্বন্ধেই হউক আর জনসাধারণ সম্বন্ধেই হউক—নিয়ামক হইবে। আধ্যাত্মিক বিষয়ে ও রাজ্যশাসন সম্বন্ধে এরূপ ভীষণ যথেচ্ছাচার প্রণালীর প্রতিপোষক মত বোধ হয়, ইগনেসিয়স লয়লা ভিন্ন আর কোন মনুষ্যের মস্তিষ্ক হইতে কখন নিষ্ক্রান্ত হয় নাই। যাহা হউক, কমটের এই গ্রন্থখানি হৃদয়ের গভীর ভাব সম্বন্ধে যে তাঁহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব গ্রন্থগুলি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু সমাজবিজ্ঞান সম্বন্ধে ইহার একমাত্র মূল্য এই যে, "ধর্ম্মে বিশ্বাস ব্যতিরেকে নৈতিক প্রভুত্ব সংরক্ষিত হইতে পারে না" জগতে যে এই ভ্রান্ত মত প্রচলিত ছিল, ইহা তাহার মূলোচ্ছেদ করে। কারণ, কমট মানব-ধর্ম্ম (Religion of Humanity) ভিন্ন আর কোন ধর্ম্মেরই অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না। কিন্তু যাহা তাঁহার দার্শনিক সমাজ ভাল বলিয়া জানে, তাহা ব্যক্তিমাত্রকেই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে ও তদনুসারে কার্য্য করিতে হইবে—কমটের এই ভীষণ মত চিন্তা করিতেও ভয় হয়। স্বাধীনতা ও ব্যক্তিত্বের মূল্য বিষয়ে নষ্টদর্শন হইলে যে মনুষ্য দ্বারা কি ভীষণ অনিষ্ট সংঘটিত হইতে পারে, যাঁহারা রাজনীতি ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ে চিন্তা করিয়া থাকেন, কমটের পুস্তক তাঁহাদিগকে তাহা দেখাইয়া দিতেছে।

গ্রন্থ প্রণয়ন করিবার ও গ্রন্থকার হইবার উদ্দেশে যে চিন্তা, তদ্বিষয়ে মিল্ যে কিছু সময় অর্পণ করিতে পারিতেন, তাহা তাঁহার পত্রিকার সম্পাদনেই পর্য্যবসিত হইত। যে প্রবন্ধগুলি লণ্ডন এবং ওয়েষ্টমিনিষ্টার রিভিউ হইতে উদ্ধৃত হইয়া ডেসারটেসন্স নামক তদীয় পুস্তকে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে, তিনি উক্ত পত্রিকায় সমুদয়ে যাহা লিখিয়াছিলেন, সেগুলি তাহার চতুর্থাংশও নহে। উক্ত রিভিউয়ের সম্পাদন-বিষয়ে তাঁহার দুইটি প্রধান লক্ষ্য ছিল। দার্শনিক র‍্যাডিক্যালিজমকে সাম্প্রদায়িক বেন্থামিজম অপবাদ হইতে মুক্ত করা তাহার অন্যতর। র‍্যাডিক্যাল মতকে প্রশস্ততর ভিত্তিতে সংন্যস্ত করা, ইহাকে স্বাধীনতার আকার প্রদান করা, মিলের জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। তাঁহার এই উদ্দেশ্য কিয়ৎপরিমাণে সংসিদ্ধও হইয়াছিল। সুশিক্ষিত র‍্যাডিক্যালদিগকে কার্য্যে উত্তেজিত করা এবং যাহাতে তাঁহারা হুইগদিগের সহিত সমানরূপে রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিতে পারেন, এই জন্য তাঁহাদিগকে দলবদ্ধ করা, তাঁহার জীবনের দ্বিতীয় লক্ষ্য ছিল। কিন্তু তাঁহার এই লক্ষ্য প্রথম হইতেই বিফল হয়। সময়ের অননুকূলতা, সংস্কারোৎসাহের হ্রাস-প্রবণতা এবং টোরিদিগের সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা—ইহার আংশিক কারণ বটে, কিন্তু উপযুক্ত লোকের অসদ্ভাবই ইহার প্রধান কারণ। এই সময় পার্লিয়ামেণ্টের সভ্যদিগের মধ্যে অনেকগুলি সুশিক্ষিত ও কার্য্যদক্ষ র‍্যাডিক্যালমতাবলম্বী লোক ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের অধিনায়ক হইতে পারেন, তাঁহাদিগের মধ্যে এমন লোক একজনও ছিলেন না। মিলের গভীর উত্তেজনাও তাঁহাদিগকে সঞ্চালিত করিতে পারিল না। কিন্তু এই সময় সৌভাগ্যক্রমে একটি ঘটনা সংঘটিত হইল, যাহাতে মিল্ অসমসাহসিকতা ও কৃতকার্য্যতার সহিত র‍্যাডিক্যাল মতের পক্ষসমর্থন করিতে পারিলেন। মন্ত্রিদল পর্য্যাপ্তপরিমাণে লিবারেল না হওয়ায় এই সময় লর্ড ডার্হাম মন্ত্রিত্বপদ পরিত্যাগ করেন; কিন্তু তিনি অচিরকালমধ্যেই ক্যানাডীয় বিদ্রোহের কারণ-নির্ণয় অপনয়ন করার ভার গ্রহণ করেন। তিনি প্রথম হইতেই র‍্যাডিক্যাল উপদেশকবৃন্দে পরিবেষ্টিত হওয়ার প্রবণতা প্রদর্শন করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার প্রথম কার্য্যই—উদ্দেশ্য ও ফলে অতি উৎকৃষ্ট কার্য্য সন্দেহ নাই—হোম গবর্ণমেণ্ট নামঞ্জুর করেন ও উল্টাইয়া দেন। সুতরাং তিনি উক্ত পদ পরিত্যাগ করিয়া মন্ত্রিদলের সহিত প্রকাশ্য বৈরভাবে অবস্থিত হন। এক দিকে টোরিগণ কর্ত্তৃক ঘৃণিত, অন্যদিকে হুইগগণ কর্ত্তৃক অবমানিত—অথচ অর্থ ও গৌরবে কাহা অপেক্ষাও ন্যূন নহেন—এরূপ অবস্থায় লর্ড ডার্হামেই র‍্যাডিক্যাল দলের অধিনায়ক হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হইয়া উঠিল। তিনি সকল দিক্ হইতেই আক্রান্ত হইতে লাগিলেন; শত্রুরা তাঁহার কার্য্যের দোষোদ্ঘোষণ করিতে লাগিল, বন্ধুবর্গ কিরূপে তাঁহার পক্ষসমর্থন করিতে হইবে, তাহা বুঝিতে পারিলেন না। এইরূপ অবস্থায় ভগ্নমনা ও পর্য্যুদস্ত হইয়া তিনি ক্যানাডা হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন। মিল্ প্রারম্ভ হইতেই ক্যানাডীয় ঘটনাবলী আলোচনা করিয়া আসিতেছিলেন। তিনি ডার্হামের উপদেশক ছিলেন;

ডার্হাম ক্যানাডীয় ঘটনাবলীর যেরূপ পরিচালন করিয়াছিলেন, তিনিও ওরূপ অবস্থায় ঠিক সেইরূপ করিতেন, সুতরাং তিনিই ডার্হামের পক্ষ-সমর্থন করণের সম্পূর্ণ উপযুক্ত ছিলেন। তিনি তাঁহার পত্রিকায় ডার্হামের পক্ষ-সমর্থক একটি প্রবন্ধ রচনা করেন; তাহাতে তিনি যে ডার্হামকে শুদ্ধ অভি-যোগ হইতে মুক্ত করেন, এরূপ নহে; স্বদেশবাসী-দিগের নিকট তাঁহার জন্য প্রশংসা ও গৌরবও প্রার্থনা করেন। তৎক্ষণাৎ অন্যান্য কতিপয় সম্পা-দক মিলের মতের অনুসরণ করিলেন। লর্ড ডার্হাম ইংলণ্ডে প্রত্যাগত হইবামাত্র যে অতি সমারোহে গৃহীত হন, তাহার প্রধান কারণ মিলের এই প্রবন্ধ। এরূপ মুমূর্ষু সময়ে মিলের প্রবন্ধ বাহির না হইলে, ডার্হামের অদৃষ্টে যে কি ঘটিত, কে বলিতে পারে? যাহা হউক, ডার্হামের কানেডীয় রাজনীতি যদিও জয় লাভ করিল, তথাপি গবর্ণমেণ্টের নিকট তাঁহার আদর জন্মের মত তিরোহিত হইল। কিন্তু ডার্হা-মের আদেশানুসারে চার্লস বুলার কর্ত্তৃক লিখিত লর্ড ডার্হামের কানেডীয় কার্য্য-বিবরণ রাজনৈতিক জগতে একটি নূতন যুগের অবতারণা করিল। লর্ড ডার্হাম উক্ত কার্য্য-বিবরণে সম্পূর্ণরূপ আভ্যন্তরীণ আত্মশাসন প্রণালীর (Internal Self-Government) সংস্থাপনের অনুরোধ করেন। তাঁহার এই অনুরোধে দুই তিন বৎসরের মধ্যেই ক্যানাডায় আত্মশাসন-প্রণালী সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ক্রমে ঐ প্রণালী ইউরোপীয় সভ্যজাতিমাত্রেরই উপনিবেশ সকলে বিস্তার্ণ হইয়া পড়ে। মিল যথা-সময়ে ডার্হাম ও তদীয় মন্ত্রিবর্গের কার্য্যপ্রণালীর পোষকতা না করিলে এরূপ শুভকর অনুষ্ঠান শীঘ্র সংঘটিত হইত কি না সন্দেহ।

উক্ত পত্রিকার সম্পাদনকালে আর একটি ঘটনা সংঘটিত হয়, যাহাতে মিলের দ্রুত হস্তক্ষেপ ঘটনা-সাগরের প্রবাহ পরিবর্ত্তন করে। কার্লাইলের ফরাসীবিপ্লব যে অতিশয় গৌরব ও কৃতকার্য্যতা লাভ করে, তাহার প্রধান কারণ মিলের সমালোচনা। এই গ্রন্থ মুদ্রাযন্ত্র হইতে বহির্গত হইবামাত্র স্থূলদর্শী সমা-লোচকেরা—যাঁহাদিগের নিয়মাবলী ও বিচারপ্রণালীকে কার্লাইল পদদলিত করিয়াছিলেন, স্ব স্ব কুটযুক্তি ইহার বিরুদ্ধে দুষিত করিতে না করিতেই মিল্ নিজের পত্রিকায় ইহার সমালোচনা বাহির করেন। তিনি এই সমালোচনায় এই গ্রন্থের এই বলিয়া প্রশংসা করেন যে, ইহা স্বাভাবিকী প্রতিভার ফল, সুতরাং ইহা সামান্য নিয়ম বা বিধির অধীন নহে, বরং ইহা নিয়ম বা বিধির প্রবর্ত্তক। মিলের এই সমালোচনায় কার্লাইলের এই গ্রন্থ ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র সমাদরে গৃহীত হয়। মিলের সমালোচনার কোন অদ্ভুত শক্তি ছিল বলিয়া মিলের সংস্কার ছিল না। তাঁহার মতে সাময়িক হস্তক্ষেপই কৃতকার্য্যতার মূল। তিনি বলিতেন, ঠিক সেই সময়ে যে কোন ব্যক্তি কথঞ্চিৎ হৃদয়গ্রাহিরূপে ঐরূপ মত প্রকাশ করিলে, সমান ফল উৎপাদন করিতে পারিতেন, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। যদিও তিনি তাঁহার পত্রিকা দ্বারা র‍্যাডিক্যাল রাজনীতিতে নূতন জীবন সঞ্চারিত করিতে অক্ষম হন নাই বলিয়া ক্ষুব্ধ ছিলেন, তথাপি তিনি যখনই এই ঘটনার বিষয় মনে করিতেন, তখনই তাঁহার মন আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইত।

র‍্যাডিক্যালদলের প্রতিষ্ঠা-বিষয়িণী আশালতা উন্মূলিত হইলে, মিল পত্রিকার সম্পাদনজনিত অর্থ ও সময়ের বৃথা ব্যয় হইতে অপসৃত হইলেন। এই পত্রিকাখানি এতদিন তাঁহার নিজের মত-প্রকাশের যন্ত্রস্বরূপ ছিল। এই পত্রিকায় তিনি সম্পূর্ণরূপে তদীয় পরিবর্ত্তিত মত সকল ব্যক্ত করিতে পারিয়া-ছিলেন, তাঁহার প্রাথমিক রচনাবলীর সঙ্কীর্ণ বেন্থামি-জম হইতে আপনাকে স্পষ্টরূপে পৃথক্‌কৃত করিতে পারিয়াছিলেন। এই পত্রিকায় প্রকাশিত তদ্রচিত বিবিধ সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধ, দুইটি প্রবন্ধে বেন্থাম ও কোলেরাজের দর্শনের তুলনা এবং তদীয় রচনা সকলের সাধারণ ভাব—পাঠকমাত্রকেই প্রতিপন্ন করিয়াছিল যে, তদীয় মত সকলে অনেক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হই-য়াছে। পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধদ্বয়ের প্রথমটিতে তিনি বেন্-থামের গুণ-বর্ণনপূর্ব্বক তাঁহার দর্শনের ভ্রম ও অভাব সকল প্রদর্শন করেন। এরূপ সমালোচন ন্যায়সঙ্গত হইলেও বেন্থামের দর্শন সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া তাহার কার্য্য সম্পাদন করিতে না করিতেই, তাহার গৌরব নষ্ট করা মিলের সুবিবেচনার কার্য্য হয় নাই। ইহাতে উন্নতিপথ রুদ্ধ বই পরিষ্কৃত করা হয় নাই। মিল্ এই ভ্রম আপনিই স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তিনি বলেন যে, বেন্থামের অদ্ধপ্রাতষ্ঠিত দর্শনের ভ্রম-প্রমাদ প্রদর্শন করিয়া তিনি যেমন জগতের কিয়ৎপরিমাণ অপকার করিয়াছেন—কারণ, মিলের সমালোচনা পাঠ

করিয়া অনেকে হয় ত শুদ্ধ দোষভাগ দেখিয়াই বেন্থামিক দর্শনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইবেন—সেইরূপ যে সকল ভক্ত্যন্ধ ব্যক্তিগণ বেন্থামকে অভ্রান্ত বলিয়া মনে করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সমক্ষে বেন্থামের ভ্রম-প্রমাদ প্রদর্শন করিয়া জগতের কিয়ৎ-পরিমাণে উপকারও করিয়াছিলেন।

কোলেরীজবিষয়ক প্রবন্ধে তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর অভাবাত্মক দর্শনের বিরুদ্ধে উনবিংশ শতাব্দীর অভ্যুত্থানের প্রকৃতিগত দোষ সকল স্পষ্টাক্ষরে বুঝাইয়া দেন। বেন্থামের দর্শন-সমালোচনার সময় মিল্ যেমন বেন্থামের দোষভাগের অযথা আন্দোলন দ্বারা একরূপ ভ্রমে পাতত হইয়াছিলেন, সেইরূপ কোলেরীজ দর্শনের সমালোচনার সময় গুণভাগের অযথা আন্দোলন দ্বারা আর এক প্রকার ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। কিন্তু কার্য্য ভ্রমাত্মক হইলেও মিলের উদ্দেশ্যের মহত্ত্ব ও সাধুতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। উনবিংশ শতাব্দীর র‍্যাডিক্যাল ও লিবারেলদিগের এরূপ অন্ধবিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, বেন্থাম-দর্শনের সকলই অভ্রান্ত এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর অভাবাত্মক দর্শনের সকলই ভ্রান্ত, এই রোগের প্রতীকার করাই মিলের উদ্দেশ্য ছিল।

উক্ত পত্রিকার যে সংখ্যায় কোলেরীজ বিষয়ক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়, মিলের অধ্যক্ষতাকালে উক্ত পত্রিকার ঐ শেষ সংখ্যা। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে মিল উক্ত পত্রিকার অধ্যক্ষতা হিক্সন্ সাহেবের হস্তে সমর্পণ করেন। হিক্সন্ তাঁহার অধ্যক্ষতাকালে উক্ত পত্রিকার একজন অবৈতনিক নিয়মিত ও যোগ্য লেখক ছিলেন। হিক্সনের সহিত মিলের এই মাত্র বন্দোবস্ত হইল যে, উক্ত পত্রিকা এখন হইতে "ওয়েষ্টমিনিষ্টার রিভিউ" এই পুরাতন নামে আখ্যাত হইবে। সেই নামে উক্ত পত্রিকা হিক্সনের অধ্যক্ষতায় দশ বৎসরকাল প্রচলিত থাকে। হিক্সন উক্ত পত্রিকার অধ্যক্ষ ও সম্পাদক দুইই হইলেন। তিনি তাঁহার পরিশ্রমের জন্য কিছুই লইতেন না এবং খরচপত্র বাদে যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিত, নিয়মিত লেখকদিগের মধ্যে ভাগ করিয়া দিতেন। কিন্তু এরূপ র‍্যাডিক্যালমতাবলম্বী পত্রিকার ব্যয় বাদে আয় অতি অল্পই হইত। সুতরাং এত অল্প টাকায় তিনি যে সম্মানের সহিত এতদিন এই পত্রিকা চালাইতে পারিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার পক্ষে সামান্য গৌরবের বিষয় নহে। ইহা তাঁহার হস্তে যত দিন ছিল, তত দিনই উন্নতি ও র‍্যাডিক্যালিজম্ মত-প্রচার বিষয়ে সতত ব্রতী থাকিত। মিল ইহাতে লিখিতে একেবারে ক্ষান্ত হন নাই। মিল কিন্তু এডিন্‌বরা রিভিউয়ের অধিকতর প্রচারহেতু এখন হইতে তাহাতেই অধিক পরিমাণে লিখিতে লাগিলেন, এই সময়ে "ডিমক্রেসি ইন আমেরিকা" নামক একখানি পুস্তক প্রকাশিত হয়। মিল এই গ্রন্থের সমালোচন এডিন্‌বরা রিভিউয়েতে প্রদান করিয়া ইহার লেখকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

জীবনের শেষভাগ,—ন্যায়দর্শন, টেলর-পত্নী, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, সমাজ-বিপ্লব, পরিণয়, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অন্তর্ধান

এখন হইতে মিলের জীবনবিষয়ে আমাদিগের যাহা বক্তব্য আছে, তাহা অতি সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ। এখন হইতে তাঁহার মানসিক পরিবর্তন বিষয়ে আমাদিগের আর অধিক বক্তব্য নাই। কারণ, তাঁহার মনের এখন পরিবর্তনের অবস্থা নহে, ক্রমিক উন্নতির অবস্থা। এই ক্রমিক উন্নতি তাঁহার পরিণাম-রচনায় সম্পূর্ণরূপে পরিব্যক্ত হইয়াছে। যাঁহারা তাঁহার সেই সকল গ্রন্থ পাঠ করিবেন, তাঁহারাই তাহা সবিশেষ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। এই গুরুভার পাঠকগণের উপর ন্যস্ত করিয়া আমরা তাঁহার জীবন-নাটকের শেষ অঙ্ক অতি সংক্ষেপে অভিনয় করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

মিল্ তাঁহার পত্রিকার সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া প্রথম অবসরেই তদীয় ন্যায়দর্শন সমাপ্ত করেন। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের জুলাই এবং আগষ্ট মাসে তিনি যে অবসর প্রাপ্ত হন, তাহাতেই তাঁহার ন্যায়দর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের যাহা কিছু লিখিতে অবশিষ্ট ছিল, তাহা সমাপ্ত করেন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্ম ও শরৎকালে পুস্তকের অবশিষ্টাংশ পরিসমাপ্ত হয়। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল

হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত সময় পুস্তকখানির পুনর্লেখনে পর্য্যবসিত হয়। তাঁহার সমস্ত পুস্তকই এইরূপে অন্ততঃ দুইবার করিয়া লিখিত হইত। প্রথমে তিনি পুস্তকখানির আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত রচনা সমাপ্ত করিতেন। পুস্তকখানির রচনা সমাপ্ত হইলে, তিনি সেই খসড়া দেখিয়া আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত ইহা আবার নূতন করিয়া লিখিতেন। এই দ্বিতীয় লেখনের সময় পুস্তকের যেখানে যে অসম্পূর্ণতা থাকিত, তাহা তিনি পূরণ করিয়া দিতেন। এরূপ পুনর্লেখনে তিনি অনেক উপকার প্রাপ্ত হইতেন। ইহা তাঁহার প্রথম কল্পনার নবীনতা ও তেজস্বিতার সহিত দীর্ঘকাল-ব্যাপিনী-চিন্তা-জনিত সূক্ষ্মতা ও পরিপূর্ণতা মিশ্রিত করিয়া দিত। তিনি প্রথম কল্পনা অপেক্ষা ইহা অল্পায়াস-সাধ্য বলিয়া মনে করিতেন। প্রথম কল্পনার সময় তিনি কেবল শ্রেণীবিভাগের দিকেই লক্ষ্য রাখিতেন। যদি সেই শ্রেণীবিভাগ অসম্পূর্ণ বা ভ্রান্তিসঙ্কুল হয়, তাহা হইলে যে সমগ্র সূত্র দ্বারা ভাব সকল পরস্পর-গ্রথিত, তাহা অবশ্যই খিন্ন বা সঙ্কুচিত হইবে। প্রথম লেখনকালে শ্রেণীবিভাগ সুন্দর ও ভাব সকল সুসংবদ্ধ হইলে দ্বিতীয় লেখন-সময়ে রচনার দোষ সকল দূরীকৃত করা কঠিন ব্যাপার নহে; কিন্তু প্রথমেই শ্রেণীবিভাগের দোষ ঘটিলে—অর্থাৎ ভাব সকল অযথা সংবদ্ধ হইলে—তাহা হইতে অভীষ্ট সত্যের বিবৃতি করা অতীব কঠিন ব্যাপার।

মিলের ন্যায়দর্শনের দ্বিতীয় লেখনকালে, হিউয়েলের দর্শনের ইন্‌ডকৃটিব বিজ্ঞানখণ্ড প্রকাশিত হয়। মিল্ এই ঘটনাকে সৌভাগ্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। বিপরীতমতাবলম্বী ব্যক্তি দ্বারা সেই বিষয়ের পূর্ণ আলোচনার অভাব, মিল অনেক দিন হইতে অনুভব করিতেছিলেন। প্রতিপক্ষোত্থিত আপত্তি সকলের খণ্ডন এবং স্পষ্টাক্ষরে প্রতিপক্ষপ্রচারিত মতের বিপরীত মত সংস্থাপন করিতে গিয়া, তাঁহার ভাবসকল অধিকতর বিশদতা, অধিকতর ওজস্বিতা ও অধিকতর পরিপূর্ণতার সহিত পরিব্যক্ত হইয়াছিল। তাঁহার ন্যায়-দর্শনের পুনর্লেখনকালেই মিল হিউয়েলের সহিত বিতণ্ডার স্থূল বৃত্তান্ত এবং কমটের পুস্তক হইতে গৃহীত নূতন মত সকল ইহার অন্তর্নিবেশিত করেন।

১৮৪১ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে তাঁহার ন্যায়দর্শন মুদ্রাযন্ত্রে প্রেরণের উপযোগী হইল। তিনি প্রকাশের জন্য সর্ব্বপ্রথমে ইহা মরের (Murray) হস্তে সমর্পণ করেন। মরে অনেক দিনের পর কোন অজ্ঞাত কারণে পুস্তকখানি প্রকাশিত অবস্থায় মিলের হস্তে প্রত্যর্পণ করেন। তদনন্তর মিল ইহা পার্কারের (Mr. Parkar) হস্তে প্রদান করেন। পার্কার ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে পুস্তকখানি প্রকাশিত করেন। মিল ইহার কৃতকার্য্যতার বিষয়ে বিশেষ আশা করেন নাই। আর্চ্চ বিশপ হোয়েটুলী ও ডাক্তার হিউয়েল প্রভৃতি মহাত্মগণ এই দুরূহ শাস্ত্রের আলোচনা-বিষয়ে পূর্ব্বেই লোকের ঔৎসুক্য কিঞ্চিৎপরিমাণে উদ্দীপিত করিয়া দিয়াছিলেন বটে, তথাপি এরূপ দুরূহ বিষয় লোকসাধারণের প্রীতিকর বা পাঠোপযোগী হইবে, মিল্ কখনই এরূপ আশা করেন নাই। যে সকল ছাত্র ন্যায়দর্শন, তাঁহাদিগের বিশেষ পাঠনার বিষয়ীভূত করিয়াছিলেন, ইহা কেবল তাঁহাদিগেরই উপযোগী হইয়াছিল। কিন্তু এরূপ ছাত্রের সংখ্যা তৎকালে ইংলণ্ডে বড় অধিক ছিল না। যে কয়েকজন ছিলেন, তাঁহাদিগেরও অধিকাংশ বিপরীত ন্যায়দর্শনের পক্ষপাতী ছিলেন। সুতরাং মিলের ন্যায়দর্শন পড়ে বা তাঁহার মত সকলের অনুমোদন করে, এরূপ লোকের সংখ্যা তৎকালে ইংলণ্ডে অতিশয় অল্প ছিল।

মিল ভাবিয়াছিলেন যে, ডাক্তার হিউয়েলের তর্কপ্রিয়তা অতি ত্বরায় তাঁহাকে তদীয় ন্যায়দর্শনের উপর আক্রমণের প্রতিবাদে প্রবৃত্ত করিবে এবং প্রতিবাদে মিলের পুস্তক শীঘ্রই সাধারণ জনগণের ঔৎসুক্য উদ্দীপিত করিবে। কিন্তু মিলের সে আশা সম্পূর্ণ ফলবতী হয় নাই। হিউয়েল্ তাঁহার পুস্তকের প্রতিবাদ করিলেন বটে, কিন্তু তাহা ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে নহে। এই সময়ের মধ্যে মিলের ন্যায়দর্শন তৃতীয় সংস্করণ অতিক্রম করে। যাহার বিষয় এত কঠিন ও দুর্ব্বোধ, এরূপ পুস্তক এত শীঘ্র এত কৃতকার্য্যতা লাভ কেন করিল এবং কিরূপ লোকেই বা ইহার ক্রেতৃশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইল, মিল্ তাহা কখনই সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারেন নাই। ইহা দ্বারা তিনি স্পষ্ট প্রমাণ পাইলেন যে, আধুনিক ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র—বিশেষতঃ বিশ্ববিদ্যালয়-সকলে—স্বাধীন চিন্তা আবার নূতন উৎসাহ ও নূতন আদর প্রাপ্ত হইয়াছে। এরূপ অভাবনীয় কৃতকার্য্যতা

সত্ত্বেও মিল কখন ভাবেন নাই যে, তাঁহার ন্যায়দর্শন তদাপ্রচলিত দার্শনিকমতের বিশেষ পরিবর্ত্তন সংঘটিত করিয়াছে।

পর্য্যবেক্ষণ (Observation) ও ভুয়োদর্শন (Experience) মিলের ন্যায়দর্শনের মূলসূত্র। তাঁহার মতে জ্ঞানমাত্রই পর্য্যবেক্ষণ ও ভুয়োদর্শনের ফল, বুদ্ধিবৃত্তি ও বিবেক সংস্কারের (Association) ফল এবং সংস্কার শিক্ষার ফল। জার্ম্মান্ দার্শনিকেরা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীতমতাবলম্বী। তাঁহারা বলেন, মনুষ্যের কতকগুলি জ্ঞান পর্য্যবেক্ষণ ও ভুয়োদর্শনজাত বটে, কিন্তু অনেকগুলি আজন্মসিদ্ধ (Innaete) তাঁহাদিগের মনে মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি ও বিবেক সংস্কার ও শিক্ষা দ্বারা পরিমার্জ্জিত হইতে পারে বটে, কিন্তু ইহা সংস্কার ও শিক্ষার ফল নহে। বহির্জ্জগৎসম্বন্ধীয় সত্য সকল পর্য্যবেক্ষণ ও ভুয়োদর্শন ব্যতিরেকে শুদ্ধ স্বভাবজ্ঞান (Intuition) ও বিবেক দ্বারা কিরূপে উপলব্ধ হইতে পারে, মিল্ তাহা বুঝিতে পারিতেন না। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এরূপ ভ্রান্ত ও দুর্ব্বোধ মতই যত দার্শনিক কুসংস্কারের মূল। মিল্ দুঃখের সহিত দেখিলেন, তাঁহার ন্যায়দর্শন এই ভ্রান্তদর্শনকে সম্পূর্ণরূপে সিংহাসনচ্যুত করিতে পারিল না। এই ভ্রান্তদর্শন এরূপ বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে যে, ইহাকে পর্য্যুদস্ত করিতে আরও কিছুদিন লাগিবে।

সাময়িক রাজনীতির সহিত কার্য্যলিপ্ততা এবং সাময়িক পত্রিকার সম্পাদন জন্য লেখকগণের সহিত সাক্ষাৎ ও কথোপকথনের আবশ্যকতা হইতে মুক্ত হইয়া মিল্ সহচরবৃন্দের সংখ্যা অতিশয় নিয়মিত করিয়া ফেলিলেন। ইংলণ্ডের সাধারণ সমাজের অবস্থা এত শোচনীয় এবং তাহাদিগের সংসর্গ এত নীরস যে, কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি সুখের আশায় ইহার অনুসরণে কখনই প্রবৃত্ত হইবেন না। যে সকল বিষয়ে মতভেদ হইতে পারে, সে সকল বিষয়ে কোন গভীর তর্ক উত্থাপন করা তৎকালে ইংলণ্ডের সাধারণ সমাজে কুশিক্ষার ফল বলিয়া পরিগণিত হইত। এ দিকে ফরাসীদিগের ন্যায় ইংরাজজাতির সজীবতা ও সামাজিকতার সহিত প্রীতিজনকরূপে সামান্য বিষয়ে গল্প করিবারও ক্ষমতা নাই। যাঁহারা সমাজতরুর উচ্চতম শাখায় এখনও উঠিতে পারেন নাই, তাঁহারাই অন্যের সাহায্যে উঠিবেন বলিয়া তাঁহাদিগেরই সংসর্গের অনুসরণ করিয়া থাকেন। যাঁহারা উচ্চ শাখায় আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহারা স্বপদের মর্য্যাদারক্ষা করিবার নিমিত্তই এরূপ করিয়া থাকেন। যাঁহাদিগের চিন্তাশক্তি কিয়ৎপরিমাণে উদ্দীপিত, যাঁহাদিগের হৃদয় কিঞ্চিৎপরিমাণে বিশোধিত, কোন গূঢ় অভিসন্ধি ব্যতিরেকে এরূপ সমাজের সহিত সংসর্গ তাঁহাদিগের প্রীতিকর বোধ হইবে না। যাঁহারা প্রকৃত উচ্চশ্রেণীস্থ বুদ্ধির লোক, তাঁহারা এরূপ সমাজের সহিত এত অল্প সংস্রব রাখেন যে, তাঁহারা ইহা হইতে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাঁহাদিগের প্রকৃত মানসিক উৎকর্ষ আছে, তাঁহারা এরূপ সমাজের সহিত সর্ব্বদা মিশ্রিত হইলে অনতিবিলম্বেই অধঃপতিত হয়েন, সন্দেহ নাই। শুদ্ধ যে ইহা দ্বারা তাঁহাদিগের সময় অপব্যয়িত হয়, এরূপ নহে, তাঁহাদিগের হৃদয়ভাবও ক্রমে অবনত হইয়া পড়ে। তাঁহাদিগের যে সকল চিররূঢ় মত সাধারণ মতের প্রতিকূলে, সমাজের প্রীতিবিধান করিতে গিয়া সেই সকল মত-বিষয়ে অগত্যা তাঁহাদিগকে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিতে হয়। তাঁহাদিগের হৃদয় ও মনের উচ্চ আদর্শ সকলকে তাঁহারা ক্রমে কার্য্যে পরিণত করার অনুপযোগী বলিয়া মনে করিতে থাকেন। সে সকলকে তাঁহারা ক্রমে স্বপ্নবিজৃম্ভিত বা কল্পনামাত্র বলিয়া বিবেচনা করিতে আরম্ভ করেন। যদি কোন মহাপুরুষ সৌভাগ্যক্রমে এরূপ সংসর্গেও তাঁহার উচ্চতম মত সকল অক্ষত ও অবিচলিত রাখিতে সমর্থ হন, তথাপি তিনি অতর্কিতভাবে সংসৃষ্ট ব্যক্তিবর্গের হৃদয়ভাব ও মতের অনুবর্ত্তন করিবেন। এই জন্য উচ্চধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির অশিক্ষিত সমাজে উপদেষ্টৃভাব ভিন্ন অন্য ভাবে প্রবেশ করা হিতকর নহে। যে ব্যক্তির এরূপ উচ্চ ও বিশুদ্ধ অভিপ্রায়, তিনি ব্যতিরেকে আর কেহই নিরাপদে এরূপ অশিক্ষিত সমাজে প্রবেশ করিতে পারেন না। যাঁহাদিগের বড় হইবার ইচ্ছা আছে—বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান ও মহদাশয়তায় যাঁহারা তাঁহাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অথবা শ্রেষ্ঠ না হউন, অন্ততঃ তাঁহাদিগের সমান,—তাঁহাদিগের বি ষ ইষ্টজনক। আরও যখন স্বভাব ও মন গঠিত হইয়াছে,—তখন মত, প্রতীতি ও হৃদয়ভাব প্রভৃতি বিষয়ে যাঁহাদিগের সহিত সম্পূর্ণ একতা সংঘটিত হয়—তাঁহাদিগের সহিত প্রকৃত বন্ধুত্ব হইয়া থাকে। এই সকল কারণে মিল যাঁহাদিগের সংসর্গ অনুসরণ করিতেন,

এরূপ লোকের সংখ্যা ক্রমেই, অতিশয় সংক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল।

এই স্বল্প বন্ধুবর্গের মধ্যে টেলরপত্নীই সর্ব্বপ্রথম ছিলেন। এই সময়ে প্রায় অধিক সময় তিনি তাঁহার বালিকা দুহিতামাত্র অবলম্বন করিয়া ইংলণ্ডের কোন পল্লীগ্রামে বাস করিতেন। তাঁহার স্বামী কর্ম্মোপলক্ষে লণ্ডনে বাস করিতেন; এই জন্য তিনি সময়ে সময়ে লণ্ডনে আসিয়াও অবস্থিতি করিতেন। মিল এই দুই স্থানেই তাঁহার সহিত মিলিত হইতেন। টেলর-পত্নী স্বামি-বিরহিত হইয়া বৎসরের অধিক সময়ই যখন পল্লীগ্রামে বাস করিতেন, তখনও মিল্ তাঁহার নিকট সর্ব্বদা যাতায়াত করিতেন এবং দুই জনে সময়ে সময়ে একত্র ভ্রমণে নির্গত হইতেন। এই ঘটনায় স্বভাবতঃ অপযশ ঘোষণা হইতে পারে জানিয়াও টেলর-পত্নী নিজ চরিত্র-বলে সে সকল বিষয়ে উপেক্ষা করিতেন। এই জন্য মিল তাঁহার নিকট সবিশেষ কৃতজ্ঞ ছিলেন। টেলরের অনুপস্থিতিকালে একত্র অবস্থিতি ও একত্র পরিভ্রমণ ভিন্ন এই সময় তাঁহাদিগের পরস্পরের ব্যবহারে লোকে এমন কিছুই পাইত না, যাহাতে তাঁহাদিগের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের গভীর স্নেহ,পরস্পরের সহিত পরস্পরের ঘনিষ্টতর বন্ধুত্বভাব ভিন্ন অন্য কোন ভাবের অস্তিত্বের সংশয় লোকের মনে উপস্থিত হইতে পারে। তাঁহারা দুই জনে যে সমাজের ভয়ে ভীত হইতেন, এরূপ নহে। কারণ, তাঁহাদিগের বিশ্বাস ছিল যে, কাহারও ব্যক্তিগত কার্য্যের উপর সমাজের কোন অধিকার নাই। সুতরাং ব্যক্তিগত কার্য্যে তাঁহারা সমাজের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য ছিলেন না। কিন্তু যে কার্য্যে টেলরের অন্তরে বেদনা লাগিবার সম্ভাবনা, যে কার্য্যে সমাজের নিকট টেলরকে—সুতরাং টেলরপত্নীকেও লজ্জিত হইতে হইবে, সে কার্য্যের অনুষ্ঠান তাঁহাদিগের উভয়েরই অকর্ত্তব্য।

তাঁহার মানসিক উন্নতির এই তৃতীয় অবস্থায় —অর্থাৎ যে সময়ে তাঁহার ও টেলর-পত্নীর মানসিক উন্নতি সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছিল, তাঁহার মত সকল অধিকতর গভীর প্রশস্ত হইতে লাগিল। যে সকল বিষয় পূর্ব্বে তিনি বুঝিতে পারিতেন না, এখন হইতে সে সকল বিষয় তাঁহার বুদ্ধির অধিগম্য হইতে লাগিল; এবং যে সকল বিষয় তিনি অস্পষ্ট-ভাবে বুঝিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে সুস্পষ্টরূপে তাঁহার বুদ্ধির বিষয়ীভূত হইতে লাগিল। দিন-কতক মিল্ অনেক বিষয়ে বেনথামের বিরুদ্ধমতা-বলম্বী হইয়া উঠিয়াছিলেন। এক্ষণে আবার তিনি পূর্ব্বের ন্যায় সম্পূর্ণরূপে বেন্থামিক হইয়া দাঁড়াই-লেন। যে সময়ে তিনি বেন্থামের বিরুদ্ধে দণ্ডায়-মান হন, সে সময়ে তিনি সমাজ ও পৃথিবীর সাধা-রণ মত বিষয়ে উদারতা প্রদর্শন করিতেও শিখিয়া-ছিলেন এবং সেই সকল সাধারণ মতের বাহ্য উৎ-কর্ষেও কথঞ্চিৎ পরিতৃপ্ত হইতে প্রস্তুত ছিলেন; তথাপি অনেক বিষয়ে সাধারণ মতের সহিত মূলতঃ অনৈক্য প্রদর্শন করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তখন তদীয় মত সকলের সাধারণমত-বিসংবাদিতার আতি-শয্য পরিত্যাগ করিতেও উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এক্ষণে দেখিলেন, যে যে বিষয়ে সাধারণ লোকের সহিত তাঁহার মতভেদ উপস্থিত হইয়াছিল, সেই সেই স্থলেই তাঁহার মতের উৎকর্ষ—সেই সেই স্থলেই সমাজ ও রাজনীতি প্রভৃতির সংস্কারের জন্য সেই সেই মত প্রকাশ করা আবশ্যক। এক্ষণে টেলর-পত্নীর সাহায্যে তাঁহার মত সকল পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সমাজদ্রোহী হইয়া উঠিল। বেন্থামিক মতে যখন তিনি নবদীক্ষিত হন, যখন তিনি বেন্থামিক সাম্প্রদায়িকতার নবীন উৎসাহে মাতিয়া উঠেন, তখনও তাঁহার মত সকল এতদূর সমাজদ্রোহী হয় নাই। তদানীন্তন বার্ত্তাশাস্ত্রবিদ্দিগের ন্যায় তখন তিনি এইমাত্র বিশ্বাস করিতেন যে, সামাজিক শৃঙ্খলার অনেকগুলি মৌলিক পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা ও সম্ভাবনা আছে, তাঁহাদিগেরও মতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি (Private Property) ও উত্তরাধিকার ব্যবস্থাপক সমাজের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। তাঁহাদিগের ও মিলের বিশ্বাস ছিল যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও উত্তরা-ধিকার সম্বন্ধে যত প্রকার অবিচার প্রচলিত আছে, সে সমস্তই জ্যেষ্ঠাধিকার ও এন্‌টেইল (Entail) প্রথা উঠাইয়া দিলেই নিবারিত হইতে পারে। ধনের অসম বিতরণে জগতে যে দরিদ্র-সংখ্যার দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে, তাঁহাদিগের ও মিলের মতে সন্তানোৎ-পাদন বিষয়ে আত্মসংযম করিলেই তাহা কথঞ্চিৎ নিবারিত হইতে পারিবে। সংক্ষেপে বলিতে হইলে মিল তৎকালে কেবলমাত্র একজন লোকতান্ত্রিক (Democrat) ছিলেন; বিন্দুমাত্রও সমাজতান্ত্রিক (Socialist) ছিলেন না। এক্ষণে টেলর পত্নীর

সাহায্যে মত বিষয়ে মিল সম্পূর্ণরূপে সমাজতান্ত্রিক হইয়া উঠেন। কিন্তু মিল ও টেলর-পত্নী উভয়েই বলিতেছেন যে, এই মত কার্য্যে পরিণত করার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। যতদিন সাধারণ লোকের শিক্ষার অবস্থা এরূপ শোচনীয় থাকিবে, যতদিন সাধারণ লোক উদার শিক্ষাবিরহে এরূপ স্বার্থপর ও হিংস্র-প্রকৃতি থাকিবে, ততদিন এরূপ মত কার্য্যে পরিণত করার চেষ্টায় জগতের ভীষণ অমঙ্গল বই মঙ্গল সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যদিও সমাজের অপরিণত অবস্থার জন্য তাঁহারা কার্য্যতঃ এরূপ হতাশ হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাদিগের দৃঢ়-বিশ্বাস ছিল যে, উদার ও উচ্চশিক্ষার বিস্তারে একদিন জগতের উন্নতি শুদ্ধ যে লোকতান্ত্রিকতামাত্রে (Democracy) উঠিয়াই ক্ষান্ত থাকিবে, এরূপ নহে, চরমে সমাজতান্ত্রিকতাতেও (Socialism) পরিণত হইবে।

যদিও তাঁহারা উভয়েই ব্যক্তিবিশেষের উপর সমাজের যথেচ্ছাচাররূপ সমাজতান্ত্রিক মতের ভীষণ অঙ্গের সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করিতেন, তথাপি তাঁহারা মনে মনে আশা করিয়াছিলেন যে, সমাজের এমন অবস্থা অসম্ভাবিত নহে, যখন ইহা অলস ও পরিশ্রমী এই দুই দলে বিভক্ত হইবে না, —অর্থাৎ সমাজে অলসশ্রেণীর সংখ্যা একেবারেই লোপ পাইবে ;—যখন—যাহারা পরিশ্রম করিবে না, তাহারা আহারও পাইবে না—এই সাধারণ নিয়ম শুদ্ধ দীন-দুঃখীর উপরেই প্রচারিত হইবে, এরূপ নহে, ধনীদিগকেও এই নিয়মের অধীনে আসিতে হইবে ; যখন শ্রমোপার্জ্জিত ফলের বিভাগ জন্মের দৈবঘটনার উপর নির্ভর না করিয়া অপক্ষপাতী ন্যায়ের তুলাদণ্ডের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে এবং যখন যে সকল উপকার-পরম্পরা সাধারণ্যে ভোগ করিতে হইবে, তাহার জন্য যত্ন করা মনুষ্যের পক্ষে অসাধ্য-সাধন বলিয়া বিবেচিত হইবে না। কিরূপে জগতের স্বাধীনতার পরাকাষ্ঠা প্রবর্ত্তিত হইবে এবং তৎসঙ্গে কিরূপে জগতের অযত্নলব্ধ দ্রব্যজাতের উপর সাধারণ অধিকার ও সাধারণ পরিশ্রমে উপার্জ্জিত ফলে সকলের সমান অধিকার সংস্থাপিত হইতে পারিবে —তাঁহাদিগের উভয়েরই মতে এই গুরুতর বিষয়-ত্রয়ের মীমাংসা করাই সমাজসংস্কারকদিগের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। ঠিক কি উপায় অবলম্বন করিলে এই সকল গুরুতর বিষয় সংসাধিত হইতে পারে আর কতদিন পরেই বা সকল মতের কার্য্যে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা, তাহা তাঁহারা নিশ্চিতরূপে বলিতে পারিতেন না। তবে এইমাত্র স্পষ্ট বুঝিতেন যে, অশিক্ষিত কৃষকশ্রেণী ও তাহাদিগের প্রভুদিগের চরিত্রে যত দিন না সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে, ততদিন এরূপ গুরুতর সমাজ-সংস্কারের কোন সম্ভাবনা নাই, এরূপ শুভঘটনা সংঘটিত হওয়ার পূর্ব্বে এই উভয় শ্রেণীর লোকদিগকেই অভ্যাস দ্বারা সাধারণের হিতার্থ পরিশ্রম ও সমুদ্যম-সমুত্থান করিতে শিখিতে হইবে। সাধারণের হিতার্থে কার্য্য করার প্রবৃত্তি মনুষ্যের প্রকৃতি-বিরোধিনী নহে। যখন একজন অশিক্ষিত সামান্য সৈনিকপুরুষ স্বদেশের স্বাধীনতা-রক্ষার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে অকাতরে প্রাণ-বিসর্জ্জন করিতেছে, তখন শিক্ষা, অভ্যাস ও হৃদয় ভাবের পরিমার্জ্জন-বলে এক জন প্রাকৃত লোক যে জনসাধারণের উপকারার্থ ভূমিকর্ষণ ও বস্ত্রবয়ন প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? এরূপ অবস্থা যে কতদিনে ঘটিবে, তাহা তাঁহারা বলিতে পারিতেন না ; কিন্তু পুরুষপরম্পরাব্যাপী অবিশ্রান্ত শিক্ষাবলে মনুষ্য যে অল্পে অল্পে এরূপ অবস্থায় আনীত হইতে পারে, তাহা তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতেন। সাধারণ মঙ্গল যে অধুনা জনসাধারণের কার্য্যের প্রবৃত্তিনিয়ামক নহে, তাহার কারণ কেবল প্রতিকূল শিক্ষা অভ্যাস। সমাজ-শৃঙ্খলার বর্ত্তমান অবস্থায় মানুষ প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কেবল নিজের ও নিজ পরিবারসম্বন্ধীয় বিষয় লইয়াই ব্যতিব্যস্ত ; সাধারণের হিতার্থে অতি অল্পসময়ই ব্যয়িত করিতে শিখে। স্বার্থপরতার ন্যায় সাধারণ মঙ্গলেচ্ছা দ্বারাও কার্য্যে প্রবর্ত্তিত হইয়া এবং লজ্জার ভয় ও গৌরবস্পৃহায় প্রণোদিত হইয়া প্রকৃত মনুষ্যও কত অদ্ভুত আত্মত্যাগ প্রদর্শন করিতে পারে, তাহার সংখ্যা করা যায় না ! আধুনিক সমাজ-শৃঙ্খলার প্রায় সমস্ত নিয়মাবলীই স্বার্থপরতার উৎসাহ দিয়া থাকে। এই জন্য বর্ত্তমান সময়ে স্বার্থপরতা মনুষ্যের প্রকৃতির সহিত এতদূর বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে, আপাততঃ যেন বোধ হয়, ইহার উত্তেজনা ব্যতীত মনুষ্যসাধারণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। কিন্তু তাহা সত্য নহে। কারণ, পুরাকালীন সাধারণতন্ত্র সকলে,—যৎকালে প্রত্যেক স্বাধীন

নাগরিক অসংখ্য সাধারণ কার্য্যে সর্ব্বদা আহূত হইতেন,—অস্বার্থপরতার ভূরি ভূরি নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাহা হউক, তথাপি মিল ও টেলর-পত্নী ইচ্ছা করিতেন না যে, স্বার্থপরতার পরিবর্ত্তে কোন উৎকৃষ্টতর প্রবৃত্তি-নিয়ামক উদ্দেশ্য সংস্থাপিত হওয়ার পূর্ব্বে, সামাজিক কার্য্যপ্রণালী হইতে স্বার্থপরতার প্রলোভন একেবারে উঠিয়া যায়। তাঁহারা বর্ত্তমান সমাজশৃঙ্খলাকে শুদ্ধ সাময়িক বন্দোবস্তমাত্র বলিয়া বিবেচনা করিতেন। সুতরাং যে যে উপায়ে নূতন ও উৎকৃষ্টতর সমাজশৃঙ্খলা সংস্থাপিত হইতে পারে, উপযুক্ত লোক দ্বারা সেই সেই উপায়ের পরীক্ষাকরণ—তাঁহাদিগের নিকট অতিশয় আদর ও উৎসাহের বিষয় হইত। এরূপ উদ্যম সফল হউক বা নিষ্ফলই হউক, উদ্যোগকর্ত্তাদিগের যে ইহাতে সবিশেষ শিক্ষা হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সাধারণ মঙ্গলরূপ উদ্দেশ্য অবলম্বন করিয়া কিরূপে কার্য্য করিতে হয় এবং বর্ত্তমান সমাজশৃঙ্খলার কি কি দোষ বর্ত্তমান থাকায় লোকে সেই উদ্দেশ্য অবলম্বন করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারিতেছে না, এই পরীক্ষায়—আর কিছু না হউক—অন্ততঃ এগুলি তাঁহারা বিশেষরূপে বুঝিতে পারেন।

মিল "প্রিন্সিপলস অব পলিটিকাল ইকনমি" নামক অর্থনীতি বিষয়ক তদীয় গ্রন্থে এই সকল মতের সবিস্তার প্রচার করিয়াছেন। ইহার প্রথম সংস্করণে এই মত সকল তত পরিস্ফুট ও পরিপূর্ণরূপে পরিব্যক্ত হয় নাই; দ্বিতীয় সংস্করণে অধিকতর অপরিস্ফুট ও পরিপূর্ণরূপে এবং তৃতীয় সংস্করণে অসন্দিগ্ধরূপে এই সকল মত পরিব্যক্ত হয়। এই ক্রমিক পরিব্যক্তির অর্থ এই যে, এই সকল মত সাধারণের মতের বিরোধী, সুতরাং হঠাৎ অসন্দিগ্ধরূপে সেগুলি পরিব্যক্ত হইলে, লোকে ভীত ও চকিত হইয়া তদনুসরণে একেবারে বিরত হইতে পারে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে পরিব্যক্ত হইলে সেইগুলি ততদূর ভয় ও বিস্ময়ের কারণ না হইতে পারে। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ফরাসীবিপ্লবের পূর্ব্বে এই গ্রন্থখানি মুদ্রাযন্ত্রে প্রেরিত হয়; সুতরাং প্রথম সংস্করণকালে লোকের মন ততদূর উন্নতিপ্রবণ না হওয়াতে মিল এরূপ সমাজদ্রোহী মতসকল অতি পরিস্ফুটরূপে পরিব্যক্ত করিতে সাহসী হন নাই, এই জন্যই তিনি ইহার প্রথম সংস্করণকালে সমাজতান্ত্রিক মত সম্বন্ধে যতগুলি আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে, ইহাতে তাহার অধিকাংশ এত প্রবলরূপে অঙ্কিত করিয়াছিলেন যে, আপাততঃ যেন তাঁহার গ্রন্থখানি উক্তমতবিরোধী বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল। ইহার পর ফরাসীবিপ্লবের উন্মাদকরী উত্তেজনায় লোকের মন অধিকতর উন্নতিপ্রবণ হওয়ায় ইউরোপীয় লোকতান্ত্রিক গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থরাশি আলোড়িত হওয়ায়, এবং এ বিষয়ে লোকের চিন্তা উদ্দীপিত ও ঘোরতর বিতর্ক উত্থাপিত হওয়ায়, মিল ইহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ কালে ইহাতে সম্পূর্ণ পরিস্ফুটরূপে এই মত সকল প্রকাশ করেন।

মিলের সকল গ্রন্থ অপেক্ষা তাঁহার "পলিটিকাল ইকনমি" দ্রুততর সম্পাদিত হয়। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের শরৎকালে ইহার রচনা আরম্ভ হয় এবং ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের শেষ না হইতেই ইহা মুদ্রাযন্ত্রে প্রেরণের উপযোগী হয়। এই ন্যূনাধিক দ্বিবৎসরকালের মধ্যে আবার ছয়মাস কালের জন্য গ্রন্থখানি সমগ্রভাবে পড়িয়া থাকে। এই সময়ে মিল "মর্ণিং ক্রনিক্ল" নামক সংবাদপত্রে আয়র্লণ্ডের পতিত ভূমি সকলে কৃষক ভূম্যধিকারী সংস্থাপনের আবশ্যকতা বিষয়ে সবিশেষ আন্দোলন করিতেছিলেন। ১৮৪৬-১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের শীতকালে আয়র্লণ্ডে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। এই ঘটনায় আয়র্লণ্ডের দীনদরিদ্র কৃষকদিগকে ইহার পতিত ভূমি সকলের অধিকারী করিয়া দিলে আয়র্লণ্ডবাসীরা যে শুদ্ধ উপস্থিত বিপদের করালগ্রাস হইতে রক্ষা পাইবে, এরূপ নহে, তাহাদিগের ভাবী সামাজিক ও অর্থনীতি-সম্বন্ধীয় অবস্থাও চিরকালের জন্য উন্নত হইবে—মিলের মনে এই ভাব উদিত হয়। কিন্তু এ ভাবটি সম্পূর্ণ নূতন, সুতরাং সাধারণের প্রীতিকর নহে; ইংলণ্ডের ইতিহাসে এরূপ রোগে এরূপ ঔষধি প্রয়োগের কোন পূর্ব্বনিদর্শন নাই। যে সকল সামাজিক প্রণালী ইংলণ্ডে প্রচলিত নাই, অন্যান্য অসংখ্য দেশে প্রচলিত থাকিলেও ইংলণ্ডের প্রজাসাধারণ তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ; এই সকল কারণে মিলের চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে নিষ্ফল হইল। পতিতভূমি সকলের উপর পর্য্যাপ্ত-পরিমাণে কৃষিকার্য্যের আরম্ভ না করিয়া এবং কুটীরবাসী কৃষকদিগকে ভূম্যধিকারিরূপে পরিস্থাপিত না করিয়া, ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্ট দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত আয়র্লণ্ডবাসীদিগের আপাততঃ উপকারার্থে এক "দীন-আইন" (Poor law) জারী করিলেন।

দুর্ভিক্ষ ও অন্যত্র উপনিবেশন সংস্থাপনাদি দ্বারা আয়র্লণ্ডের লোকসংখ্যা যদি কমিয়া না যাইত, তাহা হইলে এরূপ গোচিকিৎসায় আয়র্লণ্ডের যে কি শোচনীয় অবস্থা সংঘটিত হইত, কে বলিতে পারে?

মিলের "পলিটিকল ইকনমির" দ্রুত কৃতকার্য্যতা দুইটি বিষয় প্রতিপন্ন করিতেছে,—প্রথমতঃ ইংলণ্ডের জনসাধারণ এরূপ একখানি গ্রন্থের অভাব অনেক দিন হইতে অনুভব করিতেছিল, দ্বিতীয়তঃ এরূপ একখানি গ্রন্থ বাহির হইলে তাহারা তাহা আগ্রহের সহিত পাঠ করিতে প্রস্তুত ছিল। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ইহার এক সহস্র খণ্ড মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। সেগুলি সেই বৎসরেই নিঃশেষিত হয়। আর এক সহস্র খণ্ড ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। সেগুলি দুই তিন বৎসরের মধ্যে নিঃশেষিত হয়। আবার ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে তৃতীয় সংস্করণকালে ১২৫০ খণ্ড পুস্তক প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রচারাবধিই ইহা প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত হয়। তাহার কারণ এই যে, অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় ইহাতে যে সমাজবিজ্ঞানের শুদ্ধ মত মাত্র প্রচারিত হইয়াছিল, এরূপ নহে, সেই মত সকল কিরূপে কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে, সে উপায়গুলিও ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ ইহা অন্যান্য অর্থনীতি গ্রন্থের ন্যায় স্বতন্ত্র বিজ্ঞানরূপে প্রচারিত হয় নাই; সমাজ-বিজ্ঞান-রূপ প্রকাণ্ড তরুর একটি শাখামাত্ররূপে প্রচারিত হইয়াছিল। বাস্তবিক অর্থনীতি কখনই একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান নহে; সুতরাং ইহা অন্যান্য-সহচর-বিজ্ঞান নিরপেক্ষ হইয়া মনুষ্যকে কখন কোন বিষয়ে উপদেশ দিতে পারে না।

অর্থনীতির প্রকাশের পর অনেক দিন পর্য্যন্ত মিল কোনও বৃহৎ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই বটে, কিন্তু এই সময়ে তিনি নানা সংবাদপত্রে সময়ে সময়ে যাহা যাহা লিখিতেন এবং পরিচিত বা অপরিচিত লোকের সহিত সাধারণ হিতকর বিষয়ে তাঁহার যে সকল পত্রাদি লেখালেখি চলিয়াছিল, সেই সমস্ত একত্র করিয়া মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিলে একখানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ হইতে পারে। এই কয় বৎসরে তিনি জীবনের শেষভাগে প্রকাশের জন্য, ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন সম্বন্ধীয় অনেক প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া যান। তিনি সাধারণ ঘটনাস্রোত অতি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টির সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। কিন্তু ইহার গতি ও উন্নতি তাঁহার আশা পরিতৃপ্ত করিতে পারে নাই। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ফরাসী বিপ্লবের বিরুদ্ধে যে প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয়, তাহা এবং ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে একজন দুষ্টমনা যথেচ্ছাচারী ব্যক্তিকর্তৃক ফরাসীসিংহাসনের অধিকার,—এই ঘটনাদ্বয় কিছুদিনের মত ফ্রান্সের ও ইউরোপের স্বাধীনতা ও সামাজিক উন্নতির আশা একেবারে সমূলে উচ্ছেদ করে।

মিল আশৈশব যে সকল মত, উপাস্য দেবতার ন্যায় হৃদয়ে ধারণ করিয়া আসিতেছিলেন এবং যে সকল সংস্কার সংসাধনের জন্য অসংখ্য বাধা-বিপত্তির সহিত সতত সমরে অবগাহন করিতেন, এই সময়ে সেই চিররূঢ় মত সকল ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র ক্রমে আদৃত হইতে লাগিল এবং সেই চিরাভিলষিত সংস্কার সকল ক্রমেই প্রবর্ত্তিত হইতে লাগিল। কিন্তু এই সকল পরিবর্ত্তনে মানবজাতির যতদূর শুভ সংঘটিত হইবে বলিয়া মিল আশা করিয়াছিলেন, ততদূর ঘটিল না। বুদ্ধিবৃত্তির ও নীতিপ্রবৃত্তির পরিমার্জ্জন ও উৎকর্ষসাধনেই মনুষ্যের প্রকৃত মঙ্গল। এই বাহ্য পরিবর্ত্তনের দ্বারা সেই প্রকৃত মঙ্গল সম্পূর্ণরূপে সংসাধিত হয় নাই। বহুদর্শনে মিলের মনে এই সংস্কার জন্মিয়াছিল যে, ভ্রান্ত ও অবিশুদ্ধ মত সংশোধিত হইতে পারে, তথাপিও যে মানসিক দুর্ব্বলতা হইতে সেই ভ্রান্তমত সকল উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই মানসিক দুর্ব্বলতা নিরাকৃত না হইতে পারে। ইংলণ্ডে স্বাধীন বাণিজ্য প্রচারিত হইল বটে, কিন্তু স্বাধীন বাণিজ্য প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে ইংরাজজাতি অর্থনীতিশাস্ত্রে যেরূপ অপরিপক্ক ও অদূরদর্শী ছিলেন, এখনও সেইরূপ আছেন। এখনও তাঁহারা গুরুতর বিষয় সকলে ভ্রমের হস্ত হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইতে পারেন নাই। গভীরতর চিন্তা ও বিশুদ্ধতর হৃদয়ভাব তাঁহাদিগের অন্তর হইতে এখনও দূরবর্ত্তী রহিয়াছে। তাঁহারা কোন কোন বিষয়ে ভ্রমের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি ও নীতিপ্রবৃত্তি এখনও অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে। মিলের দৃঢ়-প্রতীতি জন্মিয়াছিল যে, যত দিন না মানবচিন্তা-প্রণালীতে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে, তত দিন মানবসমাজের বিশেষ উন্নতির আশা নাই। এখন আর পূর্ব্বের মত ধর্ম্ম, নীতি ও

রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে পুরাতন মত সকল সুশিক্ষিত দলের নিকট আদৃত হইত না; সুতরাং সুশিক্ষিত সমাজ সেই সকল মতের শুভকরী শক্তি আর স্বীকার করিতেন না; কিন্তু সেই সকল মতের এখনও এতদূর তেজস্বিতা ছিল যে, তাহাদিগের পরিবর্ত্তে নূতন ও উৎকৃষ্টতর মত পরিস্থাপিত করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। যখন পৃথিবীর দার্শনিকদিগের ইহার প্রচলিত ধর্ম্মে বিশ্বাস বিলুপ্ত হয়, তখন এক প্রকার সামাজিক বিপ্লবকাল উপস্থিত হয়। এই কালে লোকের প্রতীতি ক্ষীণ বুদ্ধিবৃত্তি কার্য্যাক্ষম ও বিবেকশক্তি শিথিল হইয়া পড়ে। যত দিন না আবার মানবমনে একটি নূতন (মানবিকই হউক বা ঐশ্বরিকই হউক) ধর্ম্মে বিশ্বাস সংস্থাপিত হয়, ততদিন এই নব-পরিবর্ত্তন ভিন্ন অন্য বিষয়ে মত কেন লেখ না, যত কেন ভাব না, তাহাতে মানবজাতির সাময়িক বই চিরস্থায়ী উপকারের সম্ভাবনা নাই। মানবমনের এরূপ অবস্থায় এরূপ গুরুতর বিষয়ে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য দেখিয়া মিল মানবজাতির ভাবী উন্নতি বিষয়ে কথঞ্চিৎ হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু আজকাল স্বাধীন চিন্তার স্রোত কিঞ্চিৎ প্রবল হওয়াতে, ইংলণ্ডের ভাবী উন্নতি বিষয়ে মিলের মনে কিঞ্চিৎপরিমাণে আশার সঞ্চার হইল।

এই সময়ে মিলের পারিবারিক জীবনে কয়েকটি মহতী ঘটনা সংঘটিত হয়। তন্মধ্যে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বিধবা টেলর-পত্নীর সহিত তাঁহার পরিণয় সর্ব্বপ্রধান। যাঁহার অতুল গুণরাশি তদীয় বন্ধুত্বকে মিলের অনন্ত সুখ ও অনন্ত উন্নতির অবিশোষ্য উৎস করিয়াছিল, সেই রমণীকুলভূষণ টেলরপত্নীর সহিত তাহার যে জীবনে কখন বৈবাহিক মিলন সংঘটিত হইবে, তিনি কখনই সেরূপ আশা করেন নাই। এই স্বর্গসুখভোগে তাঁহাদিগের ইচ্ছা ছিল না এরূপ নহে, কিন্তু কি গুরুতর মূল্যে তাঁহারা সেই সুখ ক্রয় করিতে পারেন, তাহা তাঁহারা জানিতেন। তাঁহারা জানিতেন যে, টেলরের অকালমৃত্যু ব্যতীত তাঁহাদিগের এ মনোরথসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। কিন্তু টেলরের প্রতি মিলের অকৃত্রিম ভক্তি ও তদীয় পত্নীর প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। সুতরাং তাঁহারা বরং জন্মের মত সেই স্বর্গীয় সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত ছিলেন, তথাপি টেলরের অকালমৃত্যুরূপ গুরুতর মূল্যে তাহা ক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে যখন সেই অনভিলষিত শোচনীয় ঘটনা ঘটিল, তখন সেই গুরুতর অশুভ হইতে তাঁহাদিগের জীবনের সর্ব্বোচ্চ শুভ সংসাধিত হইল। এতদিন শুদ্ধ চিন্তা, হৃদয়ভাব ও রচনা বিষয়ে যাঁহার সহিত সহভাগিতা ছিল, এখন হইতে তাঁহার সহিত সমগ্র জীবনের সহভাগিতা সংস্থাপিত হইল। কিন্তু সার্দ্ধসপ্ত বৎসরকালমাত্র তিনি এই স্বর্গসুখ ভোগ করিয়াছিলেন। কেবল সার্দ্ধসপ্ত বৎসরকাল! এই রমণীরত্নের অকালমৃত্যুতে মিল যে ক্ষতি অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা অনুভব করা যাইতে পারে, কিন্তু ব্যক্ত করা যায় না। বিবাহের পূর্ব্বে ও পরে এই রমণীকুলশিরোমণি দ্বারা মিল্ যে তাঁহার রচনা বিষয়ে কতদূর উপকৃত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সাহচর্য্যে তিনি যে কত অতুল সুখের অধিকারী হইয়াছিলেন, তাহা তিনি স্বয়ং ব্যক্ত করিতে অক্ষম ছিলেন।

যখন দুই ব্যক্তির চিন্তা ও হৃদয়ভাব একীভূত হয়, যখন তাঁহারা বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মনীতি বিষয়ক নানা প্রশ্নের মীমাংসার জন্য উভয়ে একত্র তর্কসাগরের গভীরতম প্রদেশে প্রতিদিন অবগাহন করেন; যখন তাঁহারা উভয়ে একত্র এক এক সূত্র ধরিয়া একই প্রণালী অবলম্বনপূর্ব্বক একই মীমাংসায় উপনীত হন; তখন উভয়ের যিনিই লেখনী ধারণ করুন না, বিষয়টি যে উভয়ের মস্তিষ্কের ফল, তাদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। রচনা বিষয়ে যাঁহার অংশ অল্প, চিন্তা বিষয়ে তাঁহার অংশ অধিকতর হইলেও হইতে পারে। কিন্তু যে রচনা ও চিন্তা উভয় বুদ্ধির ফল, তাহার কোন্ অংশ একের এবং কোন অংশ বা অন্যতরের, তাদ্বিষয়ে নির্ণয় হওয়া দুর্ঘট। মিল্ বলেন, কি বৈবাহিক জীবনে, কি তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বন্ধুত্বকালে তাঁহার নামে যে সকল পুস্তক প্রচারিত হয়, তাহা তাঁহার ও তদীয় পত্নীর বুদ্ধির ফল। তাঁহাদিগের প্রণয়ের পরিণতির সহিত তৎপ্রকাশিত পুস্তক সকলে তাঁহার পত্নীর অংশ ক্রমশঃই পরিবর্দ্ধিত হয়। কোন কোন স্থলে তদীয় পত্নীর অংশ নির্ব্বাচিত করা যাইতে পারে; মিলের মত তাঁহাদিগের উভয়রচিত পুস্তক সকলে যত কিছু বহুমূল্য ভাব, যত কিছু সুন্দর অবয়ব, যাহা দ্বারাই সেই পুস্তক সকলের এত গৌরব ও এত কৃতকার্য্যতা,—যাহা দ্বারাই সেই পুস্তক সকল হইতে জগতে এত অসংখ্য শুভ ঘটনা—সমস্তই তদীয় পত্নীর বুদ্ধিমূলক।

অর্থনীতি ও অর্থব্যবহারবিষয়ক পুস্তকেই সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার পত্নীর মস্তিষ্ক বিশেষরূপে পরিচালিত

হয়। ন্যায়দর্শন গ্রন্থে রচনার সূক্ষ্মতা-বিষয় ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে তাঁহার পত্নীর সাহায্য গৃহীত হয় নাই। সুবিখ্যাত দার্শনিক বেইন্‌ই একমাত্র ব্যক্তি, যাঁহার নিকট হইতে মিল্ ন্যায়দর্শন সম্বন্ধে বিশেষ সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। পুস্তকখানির হস্তলিপি মুদ্রাযন্ত্রে প্রেরিত হওয়ার পূর্ব্বে উপরি-উক্ত দার্শনিকের হস্তে প্রদত্ত হয়। তিনি বিজ্ঞান হইতে অসংখ্য দৃষ্টান্ত ও উদাহরণ আহরণ করিয়া ইহাতে সন্নিবেশিত করেন এবং ন্যায়দর্শন সম্বন্ধে মিলের মতে সম্পূর্ণ অনুমোদন করেন। ন্যায়দর্শন-বিষয়ে মিল কমটের নিকট হইতে সাক্ষাৎসম্বন্ধে কোন উপকার প্রাপ্ত হন নাই। তাঁহার ন্যায়দর্শনের প্রথম ভাগ সমাপ্ত হওয়ার পূর্ব্বে তিনি কমটের পুস্তক দেখেন নাই, এই সময়ে কমটের "সিষ্টেম ডি ফিলসফি পজিটিবের" প্রথমভাগ মাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। মিল্ তাঁহার ন্যায়দর্শনের প্রথম ভাগ সমাপ্ত হওয়ার পর, এই পুস্তকখানি প্রাপ্ত হন। তাঁহার ন্যায়দর্শনের পরিশিষ্ট লিখনকালে এই পুস্তক হইতে তিনি অনেক উপকার প্রাপ্ত হন।

অর্থনীতি ও অর্থব্যবহারবিষয়ক গ্রন্থের "শ্রমজীবি-শ্রেণীর সম্ভাবিত ভাবী অবস্থা" নামক অধ্যায়টি সম্পূর্ণরূপে তদীয় পত্নীর রচিত। প্রথম হস্তলিখনকালে এই অধ্যায়টি একেবারেই ছিল না। কিন্তু তাঁহার পত্নী এরূপ অধ্যায়ের আবশ্যকতা নির্দ্দেশ করায় এবং এরূপ একটি অধ্যায় ব্যতীত এ গ্রন্থখানি অসম্পূর্ণ থাকিবে, এরূপ বলায় মিল তাঁহার পুস্তকে এই অধ্যায়টি সংযোজিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই অধ্যায়ে যাহা কিছু লিখিত হইয়াছে, সে সমস্তই তদীয় পত্নীর উদ্ভাবনা। অধিক কি, ভাষা পর্য্যন্তও অনেক সময় তাঁহারই। অর্থের উৎপাদন ও বিতরণে যে কি প্রভেদ, তাহা পূর্ব্বে কোন অর্থনীতিজ্ঞই নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই; যে সকল নিয়ম দ্বারা অর্থের উৎপাদন ও বিতরণ নিয়মিত হয়, তাঁহাদিগের মতে সে সমস্তই প্রাকৃতিক মানবী ইচ্ছা তাহাদিগকে নিয়মিত বা পারিবর্ত্তিত করিতে পারে না। তদীয় পত্নী সর্ব্বপ্রথমে এই নূতন মত আবিষ্কৃত করেন, যে সকল নিয়ম দ্বারা অর্থের উৎপাদন নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহা প্রাকৃতিক বটে, কিন্তু যে সকল নিয়ম দ্বারা অর্থের বিতরণ নিয়ন্ত্রিত হয়, সে সকল প্রায়ই মানবী ইচ্ছার অধীন। এই শেষোক্ত নিয়মগুলি মানবী ইচ্ছা ও সমাজের আবশ্যকতানুসারে নিয়মিত ও পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, এই ভাবগুলি মিল সর্ব্বপ্রথমে সেণ্ট সাইমোনীয়দিগের নিকট হইতেই প্রাপ্ত হন; কিন্তু তাঁহার পত্নীর উত্তেজনাতেই ইহা তাঁহার সজীবতা ধারণ করে। সংক্ষেপতঃ তাঁহার পুস্তকের যে অংশের সহিত বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ও আন্বীক্ষিকীর সম্বন্ধ, সেইটুকুই তাঁহার নিজের ও অবশিষ্ট সমস্তই তদীয় পত্নীর। এই সকল কারণে মিলের ইচ্ছা ছিল যে, পুস্তকখানি তদীয় পত্নীর নামে উৎসর্গীকৃত করেন, কিন্তু তাঁহার পত্নী এরূপ ইচ্ছা করিতেন না যে, তাঁহার বিষয় লইয়া বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হয়; এই জন্যই তিনি বান্ধবদিগকে দিবার নিমিত্ত কয়েক খণ্ড বাদে অন্য পুস্তকগুলি আপনার নামে উৎসর্গীকৃত করিতে দেন নাই।

মিলের বৈবাহিক জীবনের শেষ ভাগে দুইটি প্রধান ঘটনা সংঘটিত হয়—একটি তাঁহার পীড়াবিষয়ক, অপরটি ইণ্ডিয়া হাউসে তাঁহার কর্ম্মবিষয়ক। প্রথমতঃ তিনি এই সময়ে একবার পিত্রাগত পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া স্বাস্থ্যলাভ করিবার জন্য প্রায় ছয় মাস কাল ইতালী, সিসিলী এবং গ্রীস প্রভৃতি নানাদেশ পরিভ্রমণ করিয়া আসেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ইণ্ডিয়া হাউসের করেসপণ্ডেন্স্ বিভাগের সর্ব্বোচ্চ পদে অভিষিক্ত হন। এই বিভাগে তিনি অন্যূন ত্রয়স্ত্রিংশ বৎসর কর্ম্ম করেন। তিনি এক্ষণে যে পদে অভিষিক্ত হইলেন, তাহার নাম ইণ্ডিয়া হাউসের করস্পন্ডন্সের পরীক্ষক। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে সেক্রেটরীর পদ ভিন্ন ইহা অপেক্ষা আর উচ্চতম পদ ছিল না। যতদিন এই পদ প্রতিষ্ঠিত ছিল, ততদিনই মিল্ ইহাতে অভিষিক্ত ছিলেন, কিন্তু তিনি অধিক দিন এই পদে অভিষিক্ত করিতে পারেন নাই। তাঁহার এই পদে উন্নীত হওয়ার দুই বৎসরের অনধিককালমধ্যেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত এই পদের তিরোধান হয়!

সুবিখ্যাত ভারতবর্ষীয় সিপাহী মিউটিসিনীর পর ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে প্রধান মন্ত্রী লর্ড পামার্ষ্টনের পরামর্শে রাজ্ঞী ভিক্‌টোরিয়া স্বহস্তে ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করেন। মিল ভিন্ন আর সকল রাজনীতিজ্ঞেরাই তৎকালে বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে, রাজ্ঞীর হস্তে ভারতবর্ষের শাসনকার্য্য অধিকতর সুন্দররূপে নির্ব্বাহিত হইবে। মিলের বিশ্বাস স্বতন্ত্র ছিল। তিনি জানিতেন যে, রাজ্ঞী তদীয় মন্ত্রিসভা এবং

পার্লিয়ামেণ্টের নিকট জবাবদিহি করিতে হইবে বলিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যতদূর সতর্কতার সহিত ভারতবর্ষের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিলেন, রাজ্ঞীর কর্ম্মচারীরা সে সতর্কতার সহিত কখনই ভারতবর্ষের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন না। তাঁহাদিগকেও রাজ্ঞী, তদীয় মন্ত্রিসভা এবং পার্লিয়ামেণ্টের নিকট জবাবদিহি করিতে হইবে বটে, কিন্তু ভারতবর্ষের শাসনকার্য্য সম্বন্ধে কোন অত্যাচারনিবন্ধন পার্লিয়ামেণ্ট কর্ত্তৃক তাঁহারা পরীক্ষাস্থলে আনীত হইলে, রাজ্ঞী তাঁহাদিগকে সমুচিত দণ্ড হইতে রক্ষা করিবার জন্য যে নানা চেষ্টা করিবেন, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। হেষ্টিংসের পরীক্ষাকালে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রতি কোন প্রকার পক্ষপাত প্রদর্শন করেন নাই। তাঁহাকে উচিত দণ্ড হইতে রক্ষাকরণেও গবর্ণমেণ্টের কোন স্বার্থ ছিল না। সুতরাং পার্লিয়ামেণ্ট তাঁহাকে পরীক্ষার বিষয়ীভূত করিতে বিন্দুমাত্রও সঙ্কুচিত হন নাই। কিন্তু এক্ষণকার ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনারেল রাজ্ঞীর প্রতিনিধি। সুতরাং পার্লিয়ামেণ্ট কোন অপরাধে তাঁহাকে পরীক্ষাস্থলে সহজে আনয়ন করিতে সাহসী হইবেন না। এই সকল কারণে মিল স্থির করিলেন যে, এখন হইতে ভারতবর্ষে অরাজকতা অতিশয় প্রবল হইবে। এই সকল কারণেই তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অস্তিত্ব রক্ষা করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিনিধি শাসনপ্রণালী নামক পুস্তকের পরিশিষ্টে ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর স্বাপক্ষে তল্লিখিত আবেদনপত্রাদিতে তাঁহার চেষ্টা বিশেষরূপে পরিব্যক্ত রহিয়াছে।

যাহা হউক, এই ঘটনায় তাঁহার নিজের বরং উপকারই হইল। বিদায়দানের সময় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে প্রচুর অর্থ প্রদান করিলেন। লর্ড ষ্টান্লে রাজ্ঞীর অধীনে সর্ব্বপ্রথমে ভারতবর্ষের সেক্রেটারী অব্ ষ্টেটের পদে অভিষিক্ত হইলেন। লর্ড ষ্টান্লে ভারতবর্ষীয় সভায় আসনগ্রহণ করিবার জন্য মিলকে অনুরোধ করেন। কিছুদিন পরে সভার সভ্যগণও পুনর্ব্বার ঐ প্রস্তাব করেন। কিন্তু দুইবারই মিল অস্বীকৃত হন। রাজ্ঞীর অধীনে ভারতবর্ষের শাসনসম্বন্ধে যে সকল নিয়মাবলী প্রতিষ্ঠিত হয়, মিল দেখিলেন, তাহা হইতে কোন শুভফলের আশা করা যাইতে পারে না। সুতরাং রাজ্ঞীর অধীনে কার্য্য স্বীকার করিয়া তিনি ভারতের কোন মঙ্গলসাধন করিতে পারিবেন, এরূপ আশা নাই; অথচ তাঁহার অমূল্য সময় বৃথা অতিবাহিত হইবে। তাঁহার অনুমান ব্যর্থ হয় নাই। রাজ্ঞীর অধীনে ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালী পর্য্যালোচনা করিয়া এই অস্বীকার জন্য তাঁহাকে কখনই অনুতাপ করিতে হয় নাই।

তাঁহার এই কার্য্যলিপ্ত জীবনের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী দুই বৎসরকাল ধরিয়া তিনি ও তদীয় পত্নী তাঁহার "লিবার্টি" নামক স্বাধীনতা-বিষয়ক গ্রন্থের রচনায় নিমগ্ন ছিলেন। মিল ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে উক্ত বিষয়ে একটি ক্ষুদ্র রচনা করেন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে রোমনগর ক্যাপিটেলের সোপানমার্গে আরোহণকালে এই প্রবন্ধকেই স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপে পরিণত করিবার ভাব তাঁহার মনে সর্ব্বপ্রথমে সমুদিত হয়। তাঁহার আর কোন গ্রন্থই এইখানির ন্যায় এত উৎসাহের সহিত রচিত ও পরিশোধিত হয় নাই। তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় এখানিরও হস্তলিপি দুইবার লিখিত হয়; কিন্তু অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় দুইবার লিখনের পরই ইহা মুদ্রাযন্ত্রে প্রেরিত করিতে হয় নাই। ইহার পরও এই গ্রন্থের হস্তলিপিখানি অনেক দিন পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের নিকট ছিল। তাঁহারা দুই জনে বার বার তাহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিতেন এবং প্রতিবার তাহার প্রত্যেক পদের ও প্রত্যেক বাক্যের দোষ-গুণ বিচার করিতেন। তাঁহাদিগের এরূপ সঙ্কল্প ছিল যে, ১৮৫৮—৫৯ খৃষ্টাব্দের শীতকালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কার্য্য হইতে মিলের অবসৃত হইবার অব্যবহিত পর-বৎসরে—তাঁহারা দুই জনে ইউরোপের দক্ষিণে অবস্থিত হইয়া বিশ্রামসুখ অনুভব করিবেন এবং সেই সময় এই গ্রন্থের চরম পুনঃপর্য্যবেক্ষণ সমাপ্ত করিবেন। কিন্তু মানব-জীবনের ন্যায় মানবী আশাও অনিত্য। তাঁহারা দুই জনে পূর্ব্বোক্ত উদ্দেশে মণ্টপিলিয়ার নগরে গমন করিতেছিলেন, এমন সময়ে পথিমধ্যে অ্যাভিগনন নগরে ফুস্‌ফুসে রক্তাবরোধ (পেল্‌মোনরী কন্‌জেসচন্) রোগের আকস্মিক আক্রমণে তদীয় পত্নীর মৃত্যু হইল এবং সেই সঙ্গে তাঁহার এ জীবনের সমস্ত আশা তিরোহিত হইল।

সপ্তম অধ্যায়

— * —

মিল্ একাকী,—"স্বাধীনতা" "স্ত্রীজাতির অধীনতা" রাজনৈতিক রচনা ; আমেরিকার দাস-সমর ; সার উইলিয়ম হ্যামিলটন-প্রণীত দর্শন ; আগস্ট কম্‌ট ও তদুদ্ভাবিত প্রত্যক্ষবাদ।

"গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ
প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।
করুণাবিমুখেন মৃত্যুনা
হরতা ত্বাং বদ কিং ন মে হৃতম্॥"

যদি কখন কোন রমণী কবিকুলচূড়ামণি কালিদাসের এই প্রশংসা অপেক্ষা অধিকতর প্রশংসা-যোগ্যা হইয়া থাকেন, তাহা মিলের সহধর্ম্মিণীই। কালিদাস গৃহিণীত্ব, সচিবত্ব, সখীত্ব, শিষ্যাত্ব এই কয়েকটি বই রমণীর অন্য কোন গুণের অস্তিত্বের উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। কিন্তু মিলের পত্নীতে এ সমস্ত অপেক্ষা প্রচুর পরিমাণে অধিকতর ও উচ্চতর গুণের সমাবেশ ছিল। এরূপ সর্ব্বগুণসম্পন্না ও পতিপরায়ণা সহধর্ম্মিণীর বিয়োগে মিলের ন্যায় মনীষীরও মন যে বিচলিত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? পত্নীবিয়োগের পর মিল সংসারসুখে জলাঞ্জলি দিয়া তদীয় সমাধি-সন্নিধানে একটি ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মাণপূর্ব্বক তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পত্নীর অন্যপূর্ব্বাবস্থাজাত একমাত্র দুহিতা সেই নির্জ্জন প্রদেশে তাঁহার একমাত্র সহচরী ছিলেন। ইনিই সেই বিয়োগিনী অবস্থায় তাঁহার একমাত্র সান্ত্বনাস্থল হইয়াছিলেন। এই ক্ষুদ্রকুটীর পত্নী-বিয়োগেও তিনি কল্পনাবলে তৎসাক্ষাৎকার লাভ করিতে লাগিলেন। যে সকল মহৎকার্য্য তাঁহার পত্নীর জীবনের লক্ষ্য ছিল, সেই সকল কার্য্য তাঁহার জীবনেরও একমাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠিল। যে সকল কার্য্যে তাঁহার পত্নীর সহানুভূতি ছিল এবং যে সকল কার্য্যের সহিত তদীয় পত্নী অনিবার্য্যরূপে সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেই সকল কার্য্যেই জীবনের অবশিষ্টকাল অতিবাহিত করিবেন,—মিল্ ইহা স্থিরসঙ্কল্প করিলেন। নীতির যে আদর্শ তদীয় পত্নীর অনুমোদিত ছিল, সেই নৈতিক আদর্শ দ্বারাই জীবন নিয়মিত করিবেন, ইহা তাঁহার স্থিরসঙ্কল্প হইল। ইত্যাদি নানা উপায়ে পত্নীর স্মৃতি সঞ্জীবিত রাখা মিলের জীবনের একমাত্র ধর্ম্ম হইয়া উঠিল।

যে স্বাধীনতাবিষয়ক গ্রন্থ বিশেষরূপে তাঁহাদিগের উভয় মস্তিষ্কের ফল, সেই "লিবার্টি" নামক গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কন ও প্রকাশন এবং পত্নীর নামে তাহার উৎসর্গীকরণ, পত্নীবিয়োগের পর মিলের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য হইল। তিনি ইহার কোন স্থানে পরিবর্ত্তন বা ইহার কোন স্থানে কোন নূতন বিষয়ের সংযোজনা করিলেন না। যদিও ইহা তদীয় পত্নীর হস্তে শেষ সংস্করণ পাইলে উৎকৃষ্টতর হইত সন্দেহ নাই, তথাপি মিল্ নিজ হস্তে সেই অভাবের পূরণ করিতে কখন ইচ্ছা করেন নাই।

এই গ্রন্থের এমন একটি বাক্য নাই, যাহা তাঁহারা দুইজনে একত্র তন্ন তন্ন করিয়া দেখেন নাই, ইহাতে এমন একটি চিন্তা বা ভাব নাই, যাহা তাঁহারা দোষ-স্পর্শ শূন্য করিতে চেষ্টা করেন নাই; এই সকল কারণে এই গ্রন্থখানি যদিও তদীয় পত্নীর শেষ পুনঃ-পর্য্যবেক্ষণ প্রাপ্ত হয় নাই, তথাপি ইহা রচনা বিষয়ে মিলের যাবতীয় গ্রন্থ অপেক্ষা যে উৎকৃষ্টতর হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহাতে যে সকল চিন্তা সন্নিবেশিত আছে, তাহার কোন্‌গুলি তাঁহার এবং কোন্‌গুলি তদীয় পত্নীর, তদ্বিষয়ে নির্ণয় হওয়া সুকঠিন। তবে ইহার চিন্তা-স্রোতের গতি যে তদীয় পত্নী কর্ত্তৃক নিয়মিত হইয়াছিল, তাহাতে আর সংশয় নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাঁহাদিগের দুই জনেরই মনে এই বিষয়ে একইরূপ চিন্তাস্রোতে প্রবাহিত হইত। এই বিষয়ে তাঁহার মনে যে চিন্তাস্রোত-প্রবাহিত হইত, মিল্ তাহা পত্রে অঙ্কিত করিতেন। তদীয় পত্নী সেই পত্রাঙ্কিত চিন্তাস্রোতের গতির অনুসরণ করিতেন এবং গতিভ্রংশ দেখিলে তাহার সংশোধন করিয়া দিতেন। কখন কখন মিলের মনের গতি এরূপ হইত যে, তিনি রাজনৈতিক ও সামাজিক মতশাসনের অনুমোদন করিতেন; কখন বা তাঁহার র‍্যাডিক্যালত্ব ও লোকতন্ত্রিত্বপ্রবণতা কমিয়া যাইত। এই সকল মতিভ্রংশের সময় তদীয় পত্নীই তাঁহাকে প্রকৃত পথে রাখিতে চেষ্টা করিতেন। আত্মাভিমান মিলের এত অল্প ছিল যে, তিনি সকলের নিকট হইতেই শিক্ষা

গ্রহণ করিতেন এবং সকলেরই মতের যথোচিত সম্মান করিতেন। এই জন্ত সময়ে সময়ে এরূপ ঘটিত যে, তিনি অপরের মতের সম্মান রক্ষা করিতে গিয়া নিজের মতকে কথঞ্চিৎ সঙ্কুচিত করিতেন। এই সঙ্কট হইতে তদীয় পত্নীই তাঁহাকে সতত রক্ষা করিতেন। কোন মতের কতদূর সম্মাননা করা উচিত এবং পরের মতের সম্মাননা রক্ষা করিবার জন্ত নিজের মত কত পরিমাণে সঙ্কুচিত করা উচিত, তদীয় পত্নীই তাহার মীমাংসা করিতেন।

মিল "ন্যায়দর্শন" ব্যতীত অন্যান্য যত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তৎসমুদয়ের মধ্যে তদীয় স্বাধীনতাবিষয়ক গ্রন্থখানিই দীর্ঘজীবী হইবার অধিকতর সম্ভাবনা। তাহার প্রথম কারণ এই যে, ইহার প্রণয়নে তাঁহার নিজের এবং তদীয় পত্নীর মস্তিষ্ক বিশেষরূপে পরিচালিত হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ শুদ্ধ এইরূপ একটি মাত্র সত্য লইয়া এরূপ দার্শনিক গ্রন্থ পূর্ব্বে প্রায় কখনই প্রচারিত হয় নাই। তৃতীয়তঃ অধুনাতন সমাজে উন্নতির অনুকূলে যে সকল পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে এই সত্যের বেগ ক্রমশই প্রবলতররূপে অনুভূত হইতেছে, সামাজিক ও ব্যক্তিগত পরাধীনতার পরস্পর প্রভেদ ও স্বতন্ত্র মূল্য অনেকেই ক্রমে বুঝিতে পারিতেছেন; সংখ্যাতীত মানবের সংখ্যাতীত বিভিন্ন প্রকার প্রকৃতি প্রবৃত্তি থাকিবে, অথচ সেই অসংখ্য প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির পরস্পরের সহিত সংঘর্ষণ হইবে না, এরূপ অবস্থা যে মানবজগতের বৈচিত্র্যসাধন ও স্থিতিস্থাপনের একমাত্র উপায়, তাহা এক্ষণে অনেকেই জানিতে পারিয়াছেন। যখন পুরাতন মত সকল বিলোড়িত হইয়া তাহার স্থানে কোন নূতন মত সংস্থাপিত না হয়, যখন লোকের মনে পুরাতন মতের উপর অভক্তি ও অবিশ্বাস জন্মে এবং তাহারা স্পষ্টাক্ষরে দেখিতে পায় যে, তাহাদিগের পুরাতন মত সকল আর এরূপ অবস্থায় ধারণ করা যাইতে পারে না, তখন তাহারা সবিশেষ আগ্রহের সহিত নূতন মত সকল শ্রবণ করে। এই সময়ে ইংলণ্ডীয় সমাজের ঠিক এইরূপ অবস্থা উপস্থিত হয়। সেই সময়েই মিলের স্বাধীনতাবিষয়ক প্রবন্ধের এত আদর। এই জন্যই ইহার চিরস্থায়ী হইবার এত সম্ভাবনা।

ইহার মৌলিকতা (Originality) সম্বন্ধে অধিক বক্তব্য নাই। ব্যক্তিগত স্বাধীনতাস্বরূপ সত্য-জগতে এই নূতন আবিষ্কৃত হইল, এরূপ নহে। ব্যক্তিগত ও জাতি বা সমাজগত স্বাধীনতার প্রভেদ কি, তাহা পূর্ব্বে অনেকেই জানিতেন। প্রাচীনকালে—সভ্যতালোক জগৎ আলোকিত করার পূর্ব্বে এই সত্য কতিপয় মনীষিমাত্রেরই নিভৃত চিন্তার বিষয়ীভূত ছিল বটে; কিন্তু এক্ষণে জগতে সভ্যতাসূর্য্য সমুদিত হওয়ার পর অবধি মানবজাতি কখনই এই সত্যের আলোকশূন্য হয় নাই। বিশেষতঃ অধুনাতন ইউরোপে পেস্‌টালোজি, উইলহেম্ ভন্ হম্বোল্ট ও গেটি প্রভৃতি প্রতিভাশালী ব্যক্তিদিগের যত্নে ব্যক্তিত্ববাদ (Individuality) মতের বিপুল প্রচার হইয়া গিয়াছে। মিলের পুস্তক প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব্বে ইংলণ্ডে উইলিয়ম ম্যাক্কাল এবং আমেরিকার ওয়ারেন—এই মত সম্বন্ধে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত করেন। সুতরাং মিলের পুস্তকে কোন নবাবিষ্কৃত মত প্রচারিত হইয়াছে, এ কথা আমরা বলি না। তবে আমরা এইমাত্র বলিব যে, এই বিষয় এত অসন্দিগ্ধরূপে ও এরূপ নূতনভাবে জনসাধারণের হৃদয়ঙ্গম করা পূর্ব্বে আর কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই।

মিলের আর একখানি গ্রন্থের সহিত তাঁহার পত্নীর স্মৃতিচিহ্ন গ্রথিত হইয়া আছে। এই গ্রন্থখানির নাম "সবজেকশন অব উইমেন" বা স্ত্রীজাতির অধীনতাবিষয়ক প্রবন্ধ। ইহার অন্তর্নিবেশিত মত কেবল তিনি তদীয় পত্নীর নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন, এ কথা আমরা বলিতেছি না। যাঁহাদিগের এরূপ সংস্কার আছে, তাঁহারা যেন তাহা ভুলিয়া যান। আমাদিগের বক্তব্য এই যে, ইহাতে স্ত্রীজাতির অনুকূলে যে নূতন মতগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে, সেগুলি বহুদিন হইতেই মিলের হৃদয়ের অতি প্রিয়বস্তু ছিল; তাঁহার মুখ হইতেই টেলরপত্নী সেই মতগুলি শ্রবণ করেন। সেইগুলিই সর্ব্বপ্রথমে টেলরপত্নীর চিত্ত মিলের দিকে আকৃষ্ট করে, সেই মতগুলিই তাঁহাদিগের উদ্ভাবয়িতার প্রতি টেলরপত্নীর মনকে প্রণয়প্রবণ করিয়া দেয়। সেই মতগুলিই তাহাদিগের উদ্ভাবয়িতার সহিত টেলর পত্নীর প্রথমে প্রণয় ও পরিশেষে পরিণয় সংঘটনের মূল। "বৈধিক রাজনৈনিক, সামাজিক সকল বিষয়েই পুরুষজাতির সহিত স্ত্রীজাতির সমান অধিকার" এই নবীন মত তিনি টেলরপত্নীর নিকট শিক্ষা করেন না। বরং টেলরপত্নীই এই মতগুলি সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার মুখে শ্রবণ করেন এবং শ্রবণ করা অবধি মিলের প্রতি

তাঁহার শ্রদ্ধা দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হয়। যদিও মিল এই মতগুলি টেলরপত্নীর নিকট হইতে শিক্ষা করেন নাই, তথাপি সেই মত কিরূপে কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে, তাহা তিনি তাঁহারই নিকট শিখিয়াছিলেন। "স্ত্রীজাতি পুরুষজাতির ন্যায় সম্পূর্ণ বৈদিক স্বাধীনতার অধিকারিণী; পুরুষজাতির ন্যায় স্ত্রীজাতির স্বত্ব ও স্বার্থ সম্পূর্ণ রক্ষণীয়; যে সকল বিধিপরম্পরা দ্বারা সমাজ ও রাজ্য শাসিত হইয়া থাকে, তাহার গঠনকার্য্য পুরুষজাতির ন্যায় স্ত্রীজাতিরও সমান অধিকার। সকল মত তিনি তদীয় পত্নীর নিকট হইতে শিক্ষা করেন নাই বটে, কিন্তু স্ত্রীজাতির স্বত্ব ও স্বার্থ সংরক্ষিত না হওয়ায় এবং পূর্ব্বোক্ত বিধিপরম্পরার গঠনবিষয়ে স্ত্রীজাতির অধিকার না থাকায়, সমাজের যে সকল অনিষ্ট সংঘটিত হইতেছে, মানবজাতির উন্নতিমার্গে যে সকল কণ্টক রোপিত হইতেছে এবং কি কি উপায়েই বা সেই সকল অনিষ্টপাতের নিবারণ হইতে পারে, সে সমস্ত তিনি তদীয় পত্নীর নিকটই শিক্ষা করিয়াছিলেন। মিলের এরূপ বিশ্বাস ছিল যে—তদীয় পত্নীর এতদ্বিষয়ক সমস্ত চিন্তা তিনি এই গ্রন্থে উদ্ভাসিত করিতে পারেন নাই; এবং এই গ্রন্থ তদীয় পত্নী দ্বারা সংরচিত হইলে ইহা অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর হইত।

"লিবার্টির" মুদ্রাঙ্কণের কিছুদিন পরেই মিল্ "থটস অন্ পার্লিয়ামেণ্টের রিফরম্" নামক একখানি রাজনীতিবিষয়ক পুস্তিকা প্রকাশ করেন। পুস্তিকার কিয়দংশ তদীয় পত্নীর দ্বারা অনুমোদিত ও সংশোধিত হইয়াছিল। মিল ও তদীয় পত্নী—ইহারা দুই জনেই পূর্ব্বে "ব্যালট"* প্রণালীর স্বপক্ষ ছিলেন; কিন্তু পত্নীবিয়োগের কিছুদিন পূর্ব্বে মিলের ও তদীয় পত্নীর এই বিষয়ে মতপরিবর্ত্তন হয়। মতপরিবর্ত্তন বিষয়ে মিলের পত্নী বরং তাঁহার অগ্রগামিনী হন। এই পুস্তিকার "ব্যালট" প্রণালীর বিরুদ্ধে তাঁহাদিগের যে সকল যুক্তি ছিল, সেই সকল যুক্তিমাত্রই সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহাতে মিলের আরও একটি নূতন মত সন্নিবেশিত হইয়াছিল। তাঁহার মতে ভোটের অসমতা অবশ্য রক্ষণীয়; কিন্তু তাঁহার মতে ইহা পূর্ব্বের ন্যায় সম্পত্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হইয়া বুদ্ধি ও জ্ঞানের উৎকর্ষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া কর্ত্তব্য। এই মত বিষয়ে মিল কখনই পত্নীর সহিত তর্ক বিতর্ক করেন নাই, সুতরাং এ মত তদীয় পত্নীর অনুমোদিত ছিল, একথা বলা যাইতে পারে না। ফলতঃ কেহই তাঁহার এ মতের অনুমোদন করেন নাই। যাঁহারা ভোটের অসমতার পক্ষপাতী, তাঁহারা সম্পত্তিরূপে ভিত্তির উপরই এই অসমতা সংস্থাপিত করিতে চাহেন; বুদ্ধি বা বিদ্যার উৎকর্ষের উপর নহে।

মিলের পার্লিয়ামেণ্টের সংস্কার বিষয়ক প্রবন্ধের প্রকাশনের অব্যবহিত পরেই মিষ্টার হেয়ারের প্রতিনিধি শাসনপ্রণালী বিষয়ক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। হেয়ারের প্রণালীর উৎকর্ষ বিষয়ে মিল অনেক প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি ফ্রেজার্স ম্যাগাজিনে হেয়ারের পুস্তকের এবং এই বিষয়ে অষ্টিন্ ও লরিমার লিখিত পুস্তকদ্বয়ের একটি বিস্তৃত সমালোচনা বাহির করেন। এই সমালোচনা এক্ষণে মিলের "বিবিধ রচনাবলী" নামক গ্রন্থে অন্তর্নিবেশিত হইয়াছে।

এই বৎসরে তিনি আর দুই একটি গুরুতর কার্য্যের সম্পাদন করেন। প্রথমতঃ এডিন্‌বরা রিভিউতে সুবিখ্যাত দার্শনিক বেস্থনের মনোবিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধের সমালোচনা করিয়া ইহার যশঃ ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র উদ্‌ঘোষিত করেন। দ্বিতীয়তঃ তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রচনাগুলিকে "ডেসার্টেসন্‌স অ্যাণ্ড ডিস্‌কসন্‌স" নামে পুস্তকাকারে দুইখণ্ডে প্রকাশিত করেন। তদীয় পত্নীর জীবদ্দশাতেই ইহার অন্তর্নিবেশনীয় বিষয়গুলি নির্ব্বাচিত হয়; কিন্তু পুনঃ প্রকাশন লক্ষ্য করিয়া সেগুলি তদীয় পত্নী দ্বারা কখনই সংশোধিত হয় নাই। পত্নীসাহায্য-বিরহে হতাশ হইয়া মিল প্রস্তাবগুলিকে তদবস্থাতেই মুদ্রিত করিলেন। কেবল যে যে স্থান তাঁহার বর্ত্তমান মতের বিরোধী ছিল, সেই সকল স্থান উঠাইয়া দিলেন। "এ ফিউ ওয়ার্ডস অন নন্-ইণ্টারভেন্ সন"—ফ্রেজার্স ম্যাগাজিনের এতৎ-শিরস্ক প্রবন্ধ ভিন্ন মিল এবৎসর আর কিছুই লিখেন নাই। প্রবন্ধটি তদীয় "ডেজার্টেসন্‌স অ্যাণ্ড ডিস্‌কসনস" এই নামক পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডে পুনঃ প্রকাশিত হয়।

ইউরোপীয় রাজনীতিজ্ঞেরা বলিয়া থাকেন, ইংলণ্ড বিদেশীয় রাজনীতি বিষয়ে কথঞ্চিৎ উদাসীন; যে বিষয়ে ইংলণ্ডের কোন স্বার্থ নাই, তাহাতে ইংলণ্ড

---

* বিভিন্ন বর্ণের দুইটি। গুটিকায় অন্যতর দ্বারা মত বা অমত প্রকাশ করাকে ব্যালট প্রণালী কহে।

হস্তক্ষেপ করেন না—ইত্যাদি অপবাদ হইতে ইংলণ্ডের গৌরব-রক্ষা করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ছিল। এই সময় লর্ড পামার্শন কর্তৃক সুয়েজ খাল কাটার প্রতিবাদই—ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে পূর্ব্বোক্ত অপযশ উদ্ঘোষিত হওয়ার উত্তেজক কারণ। এই প্রস্তাব উপলক্ষে মিল্—যে নীতি ও রাজনীতি দ্বারা বিভিন্ন বিভিন্ন জাতির পরস্পর সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত—সেই নীতি ও রাজনীতিবিষয়ে একটি উৎকৃষ্ট বিতর্ক উত্থাপিত করেন। এই বিভিন্ন-জাতিগত নীতি ও রাজনীতি-সংক্রান্ত তদীয় মত সকল, তিনি লর্ড ব্রুহাম প্রভৃতির আক্রমণ হইতে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ফরাসী সাময়িক গবর্ণমেণ্টের সমর্থন-বিষয়ক প্রস্তাবে কিয়ৎপরিমাণে ব্যক্ত করেন। এই প্রবন্ধটি প্রথমে ওয়েষ্টমিনিষ্টার রিভিউয়ে প্রকাশিত হয়; এবং পরে তদীয় "ডেজার্টেসন্স্" নামক পুস্তকে পুনর্মুদ্রিত হয়।

মিল্ জীবনের অবশিষ্টভাগ এইরূপে শুদ্ধ রাজনৈতিক সাহিত্যের অনুশীলনে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। তিনি রাজনীতির প্রধান আন্দোলন-স্থান লণ্ডন নগরী হইতে অনেক দূরে অবস্থিত ছিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার রাজনীতি-বিষয়ক আলোচনা সম্বন্ধে অসুবিধা না হইয়া বরং সুবিধাই ঘটিয়াছিল। আজকাল যাঁহাদের কিছু সঙ্গতি আছে, বাষ্পীয় পোত, বাষ্পীয় শকট, তাড়িত বার্ত্তাবহ প্রভৃতি গত্যনুকূল উপকরণ সকলের জন্য দূরত্বজনিত কোন অসুবিধাই তাঁহাদিগকে ভোগ করিতে হয় না। গত দিবস যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে, পরদিন প্রত্যূষে সেই সকল ঘটনা সংবাদপত্রযোগে এক সময়েই লণ্ডনে ও অন্যান্য স্থানে প্রচারিত হইয়া থাকে। লণ্ডনের অধিবাসীরা যে সময়ে দৈনিন্দন সংবাদপত্র সকল তাঁহাদিগের টেবিলের উপর দেখিতে পান, বাষ্পীয় শকটের অদ্ভুত মহিমায় অন্যান্য নগরের ও পল্লীগ্রামের অধিবাসীরাও সেই সময়েই সেই সকল সংবাদপত্র দ্বারা তাঁহাদিগের টেবিল সুশোভিত দেখিতে পান। সাহিত্য ও রাজনীতি-বিষয়ক পত্র সকল যথাসময়ে প্রকাশিত ও প্রচারিত হইয়া পল্লীগ্রামের অধিবাসীদিগকেও সাময়িক তর্কের বিষয় অবগত করিয়া দেয়। অনেক সময় এরূপ ঘটে যে, নগরের সাধারণ অধিবাসীরা বর্ত্তমান আলোচনার বিষয় সকল লোকের মুখে শুনিয়াই পরিতৃপ্ত হন; সুতরাং তাঁহারা সংবাদপত্র বা সাময়িক পত্রাদিতে এই সকল বিষয়ে যে সকল তর্ক-বিতর্ক উত্থাপিত বা প্রবন্ধ লিখিত হয়, তাহা পাঠ করা তত আবশ্যক মনে করেন না; কিন্তু পল্লীগ্রামের অধিবাসীরা—যাঁহাদিগের লোকমুখে সে সকল বৃত্তান্ত শুনিবার সম্ভাবনা নাই—হয় ত যত্নপূর্ব্বক সেই সকল বিষয় সংবাদপত্র বা সাময়িক পত্রাদিতে পাঠ করিয়া থাকেন। সাধারণতঃ এরূপ দেখা যায় যে, নগরের সাধারণ লোক প্রায়ই অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত—চিন্তা-বিহীন ও হুজুগপ্রিয়ঃ কিন্তু সম্পাদকেরা অপেক্ষাকৃত অধিকতর চিন্তাশীল ও সুশিক্ষিত। এই জন্যই সম্পাদকেরা সাধারণের প্রতিবিধি বলিয়া পরিগণিত হন। এই জন্যই সংবাদ বা সাময়িক পত্রাদিতে লিখিত বর্ত্তমান ঘটনা-বিষয়ক প্রস্তাব বা প্রবন্ধ প্রায়ই সারবান্ ও চিন্তাবহুল হয়। এই জন্যই অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় যে, সংবাদপত্র বা সাময়িক পত্রাদির পল্লীগ্রামস্থ পাঠক অপেক্ষা নগরের সাধারণ লোক বর্ত্তমান ঘটনা-বিষয়ে অধিকতর অজ্ঞ। যাঁহারা লৌকিকতা ও সামাজিকতা লইয়া সতত ব্যতিব্যস্ত, তাঁহারা মানবী ঘটনাবলীর গভীর তত্ত্বের উন্মেষণে অক্ষম। একজন বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান লোকও যদি অধিক দিন লৌকিকতা ও সামাজিকতা লইয়া ব্যস্ত থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারও জ্ঞাননেত্র অচিরকালমধ্যে নিমীলিত ও বুদ্ধিবৃত্তি নিষ্প্রভ হইয়া যাইবে। যাহাদিগের সহিত তিনি সতত মিশ্রিত হইবেন, তাহাদিগের সমতলে তাঁহাকে অচিরকালমধ্যেই নামিতে হইবে। এরূপ লোকের সংবাদপত্র বা সাময়িক পত্রাদি পাঠ করিবার অবকাশ নাই; সুতরাং চতুর্দ্দিকে কি ঘটিতেছে, কোন্ কোন্ বিষয়ের আন্দোলনে তদীয় দেশ আন্দোলিত হইতেছে, সে সকল বিষয় জানিবার তাঁহার অবসর নাই। বর্ত্তমান ঘটনাস্রোতের কি পরিণাম হইবে, বর্ত্তমান তর্কের বিষয়ীভূত প্রশ্ন সকলের কি মীমাংসা হইতে পারে, তাহাও ভাবিবার সময় নাই। মিল এরূপ অবস্থার শোচনীয় পরিণাম জানিতেন, এই জন্যই তিনি সামাজিকতা ও লৌকিকতা লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন না। নগরের অনতিদূরস্থিত ক্ষুদ্র কুটীরে অবস্থিত হইয়াও সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রাদির দ্বারা তিনি জগতের সমস্ত ঘটনা জানিতে পারিতেন; বর্ত্তমান ঘটনাবলীর স্রোত কোন্ দিকে প্রধাবিত হইবে, বর্ত্তমান অমীমাংসিত প্রশ্ন সকলেরই বা কি মীমাংসা হইতে পারে, তাহা তিনি সেই ক্ষুদ্র কুটীরে বসিয়া ভাবিতেন; এবং মধ্যে মধ্যে সেই

সকল বিষয়ে নব নব প্রবন্ধ লিখিয়া জগতে নূতন আলোক বিস্তার করিতেন। শিল্পবাণিজ্যাগত দ্রব্য-জাত ও মানবস্রোত প্রভৃতি স্বচক্ষে দেখিয়া জ্ঞান-ভাণ্ডার অধিকতর পরিবর্দ্ধিত করিবার জন্য তিনি মধ্যে মধ্যে নগরে আসিতেন।

এই নির্জ্জন প্রদেশের এই ক্ষুদ্র কুটীরের একমাত্র আলোক—তদীয় পত্নীর গর্ভজাত দুহিতা—মিলের আত্মোৎকর্ষ-সাধনের সাহায্যব্রত ব্রতী ছিলেন। মিলের শারীরিক ও আধ্যাত্মিক শুশ্রূষা ব্যতীত তাঁহার জীবনের অন্য কোন কার্য্য ছিল না। জীবন-নাট্যশালায় এরূপ বিচ্ছেদের পর এরূপ সঙ্গিনী প্রাপ্ত হওয়া অতি অল্প পুরুষের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে। এখন হইতে যাঁহারা মিলের নামে প্রকাশিত পুস্তক সকল পাঠ করিবেন, তাঁহাদিগের মনে যেন ইহা উদিত হয় যে, সেই পুস্তকগুলি দুই জন অদ্ভুত রমণী ও একজন অদ্ভুত পুরুষের সংযোগের ফল।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে মিল "কন্‌সিডারেসন্স অন্ রেপ্রে-জন্‌টেটিভ গবর্ণমেণ্ট" নামক পুস্তক প্রকাশিত করেন। দীর্ঘকালব্যাপিনী চিন্তার পর প্রতিনিধি-শাসনপ্রণালী বিষয়ে তিনি যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, এই পুস্তকে সেই সকলই বিশেষ-রূপে বিবৃত হইয়াছে। তাঁহার মতে বহুজনাকীর্ণ-প্রতিনিধি-সভা বিধিব্যবস্থাপন-কার্য্যের সম্পূর্ণ অযোগ্য। এরূপ সভার প্রকৃত কার্য্য—নির্দ্দিষ্ট কতি-পয় সুযোগ্য রাজনীতিজ্ঞ দ্বারা যে সকল বিধি ব্যবস্থা-পিত হইবে—সেই সকল বিধির অনুমোদন বা প্রত্যা-খ্যান মাত্র- বিধির ব্যবস্থাপন নহে। এই জন্য তাঁহার মতে প্রতিনিধি-সভা দ্বারা বিধির ব্যবস্থাপন নিমিত্ত একটি ব্যবস্থাপক সমাজ মনোনীত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রতিনিধি-সভা যখন দেখিবেন যে, কোন নূতন বিধির ব্যবস্থাপন আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে, তখন তাঁহারা এই গুরুতর কার্য্যের ভার ব্যবস্থাপক সমাজের উপর অর্পণ করিবেন। ব্যবস্থাপক সমাজ বিধির ব্যবস্থাপন করিলে প্রতিনিধি-সভা ইচ্ছামত তাহা মঞ্জুর বা নামঞ্জুর করিতে পারিবেন। কিন্তু তাহার কোন পরিবর্ত্তন করিতে হইলে প্রতিনিধি-সভা স্বয়ং করিতে পারিবেন না। ব্যবস্থাপক সমাজের উপরই সেই সকল পরিবর্ত্তনের ভার অর্পণ করিতে হইবে। বিধির ব্যবস্থাপনরূপ এই গুরুতর প্রশ্নের এরূপ পূর্ণ-মীমাংসা বেন্‌থামের পূর্ব্বে আর কেহই করিতে পারেন নাই। বেন্‌থামশিষ্য মিল্ গুরুক্ষুণ্ণ এই নূতন পথের পরিষ্করণ ও বিস্তৃতিসাধন দ্বারা যে জগতের অসীম উপকার সংসাধিত করিয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সাধারণ কার্য্যে সাধারণী সভার সম্পূর্ণ অধিকারের সহিত কতিপয় সুদক্ষ রাজনীতিজ্ঞ দ্বারা বিধিব্যবস্থাপনকার্য্যের সামঞ্জস্য বিধানের প্রস্তাব পূর্ব্বে আর কেহই করেন নাই। মিলের দৃঢ়-বিশ্বাস ছিল যে, এই প্রস্তাব অব-শ্যই একদিন কার্য্যে পরিণত হইবে।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে মিল্ যে পুস্তক প্রণয়ন করেন, তাহার নাম "দি সবজেকসন অব উইমেন" বা স্ত্রী-জাতির অধীনতা-বিষয়ক প্রবন্ধ। ইহার বিষয় আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এই গ্রন্থখানি ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এতদিন অপ্রকাশিত রাখার কারণ এই যে, মিলের ইচ্ছা ছিল যে, তিনি অবসরমত মধ্যে মধ্যে ইহার পরি-পুষ্টিসাধন ও উৎকর্ষবিধান করিবেন এবং এই মতের কৃতকার্য্যতালাভের সময়েই ইহার প্রচার করিবেন। মিলের এই ইচ্ছা কথঞ্চিৎ ফলবতী হইয়াছিল।

ইহার অব্যবহিত পরেই তিনি আর একখানি গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন। এই গ্রন্থখানির নাম "ইউটিলিটেরিয়ানিজম্" বা হিতবাদ। এই প্রবন্ধটি তাঁহার পত্নীর জীবদ্দশাতেই তিনি ফ্রেজার্স ম্যাগাজিনে উপর্য্যুপরি তিনবারে প্রকাশিত করেন। তিনি সেই প্রবন্ধটি সংশোধিত করিয়া এবং তাহাতে কিঞ্চিৎ সংযোজিত করিয়া এক্ষণে এই পুস্তিকায় প্রকাশ করেন।

এই ঘটনার অনতিপূর্ব্বে জগতের ঘটনা-স্রোতে এক নববিবর্ত্ত উত্থাপিত হয়। দাস-ব্যবসায় লইয়া আমেরিকায় ঘোরতর গৃহ-বিচ্ছেদ-জনিত সংগ্রাম উপ-স্থিত হয়। এই সময়ের সহিত মিলের হৃদয় সম্পূর্ণ-রূপে একীভূত হইয়া গিয়াছিল। তিনি জানিতেন, এই ভীষণ সংগ্রামের পরিণাম অনন্তকালের জন্য মানব-ঘটনাস্রোতের দিক্ নির্ণয় করিবে। এই জ্বলনোন্মুখ বহ্নি অনেক দিন হইতেই ধূমায়মান হইতেছিল। মিলের সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিল যে, এই প্রধূমিত বহ্নি অচিরকালমধ্যেই প্রজ্বলিত হুতাশনে পরিণত হইবে। তাঁহার সহানুভূতি দাসব্যবসায়-বিরোধীদিগেরই সহিত ছিল। দাসব্যবসায়ীদিগের দ্বারা দাসত্বের অধিকারবিস্তারচেষ্টা যে অন্যায় ও

অসঙ্গত, তাহা তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিতেন। ধনলিপ্সা, প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষা এবং বহুকালোপভুক্ত অধিকার-পরিত্যাগের অনিচ্ছা—প্রভৃতি দুর্দ্দমনীয় বৃত্তিসকল যে দাসত্ব-প্রথার দূরীকরণের প্রতিদ্বন্দ্বিনী,তাহা তিনি জানিতেন। তাঁহার প্রিয়বন্ধু অধ্যাপক কেয়ার্ণেস তদীয় "স্লেভপাউয়ার" নামক দাসত্ব-বিষয়ক গ্রন্থে এই সমস্ত বিষয় অতি স্পষ্টরূপে বিবৃত করিয়াছেন। মিল্ জানিতেন যে, এই ভীষণ সংগ্রামে যদি দাসব্যবসায়পক্ষপাতীরা জয়লাভ করে, তাহা হইলে জগতে বহুদিনের মত উন্নতির স্রোত রুদ্ধ হইবে, অধর্ম্মের জয়-পতাকা উড্ডীয়মান হইবে, উন্নতিদ্রোহীদিগের হৃদয় উৎসাহে মাতিয়া উঠিবে এবং উন্নতিপক্ষপাতীদিগের হৃদয় ভগ্ন হইবে। কতকগুলি মনুষ্যের স্বাধীনতার উপর কতকগুলি মনুষ্যের সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা সমাজতরুর মূলেবৎ পাটক। যাহারা এই প্রভুতার আকাঙ্ক্ষী, তাহারা নরাকার রাক্ষস। মিল্ জানিতেন যে, এই রাক্ষসদিগের জয়লাভ হইলে, ইহাদিগের দুর্দ্দমনীয় সেনা বহুদিন জগতের শুভকার্য্যের ব্যাঘাত সম্পাদন করিবে, আমেরিকার সাধারণতন্ত্রের বিপুল যশ বহুকালের জন্য নিমীলিত হইবে এবং ইউরোপের সম্ভ্রান্ত-শ্রেণীর অন্তরে এই ভ্রান্তবিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইবে যে, তাঁহারা এখন হইতে নির্ব্বিবাদে নীচপ্রবৃত্তির অনুসরণ করিতে পারেন, তাঁহাদিগের এই অন্ধবিশ্বাস নররুধিরে ধৌত না হইলে আর অপনীত হইবে না।

এ দিকে তিনি দেখিতে লাগিলেন যে, উদীচ্য আমেরিকানেরা যদি সমরে জয়লাভে কৃতসঙ্কল্প হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের জয়লাভ অবশ্যম্ভাবী। ইহাঁদিগের বিবেক দাসত্বপ্রথা একেবারে উঠাইয়া দিতে এখনও প্রস্তুত হয় নাই; যে সকল ষ্টেটসে দাসত্বব্যবসায় অদ্যাপি প্রচলিত আছে, সে সকল ষ্টেটস হইতেও দাসত্ব উঠাইয়া দেওয়া এখনও ইহাঁদিগের উদ্দেশ্য হয় নাই; অন্যান্য ষ্টেটসে দাসত্বপ্রথা যাহাতে বিস্তৃত না হয়, তাহার প্রতিবিধান করাই তাঁহাদিগের বর্ত্তমান উদ্দেশ্য। মিল্ দেখিলেন যে, এই মনোমালিন্য যদি সহজে নিবারিত না হয়, তাহা হইলে উদীচ্যেরা দাসত্ব-প্রথা একেবারেই উঠাইয়া দিতে কৃতসঙ্কল্প হইবেন। ইহা মানবপ্রকৃতির একটি সাধারণ নিয়ম, সামাজিক বিপ্লবের একটি অব্যভিচারী অঙ্গ যে, সামান্য প্রার্থনার প্রতিবাদ করিলে গভীরতর প্রার্থনা আসিয়া উপস্থিত হয়। যে উদীচ্যেরা এক্ষণে অন্যান্য ষ্টেটসে যাহাতে দাসত্ব প্রচলিত না হয়, শুদ্ধ তাহারই প্রতিবিধানে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, দাক্ষিণাত্য ষ্টেটস সকলে যে সকল দাস পূর্ব্বে ক্রীত হইয়াছে, তাহাদিগকে দাসত্বশৃঙ্খল হইতে উন্মোচিত করিতে এবং ভবিষ্যতে সে সকল ষ্টেটসে যাহাতে আর দাস ক্রীত না হয়, তাহার প্রতিবিধান করিতে যে উদীচ্যদিগের বিবেক এখনও উদ্বোধিত হয় নাই, বাধা পাইলে সেই উদীচ্যদিগেরই বিবেক দাসত্বপ্রথার সমূলোৎপাটনে নিশ্চয়ই বদ্ধপরিকর হইবে।

মিলের এই শেষোক্ত আশঙ্কাই ফলবতী হইল। দাক্ষিণাত্য ষ্টেটস সকলের অধিবাসীরা—উদীচ্য আমেরিকানদিগের পরিমিত প্রার্থনাতেও স্বীকৃত হইলেন না। সুতরাং সমরানল ভীষণবেগে প্রজ্বলিত হইল। গ্যারিসন্, ওয়েণ্ডেল, ফিলিপ্স এবং জন্ ব্রাউন প্রভৃতি মনীষিগণ দাসত্বপ্রথার বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন উত্থাপিত করিলেন। সমগ্র উদীচ্য অধিবাসীই তাঁহাদিগের পশ্চাদ্গামী হইলেন। সশস্ত্র সৈনিকপুরুষ দ্বারা ইউনাইটেড্ষ্টেটসের কনষ্টিটিউসনের মূলভিত্তি উৎপাটিত হইল। যুদ্ধে উদীচ্যদিগেরই জয়লাভ হইল। ইউনাইটেড্ষ্টেট্সের কন্ষ্টিটিউসন্ আবার নূতন করিয়া গঠিত হইল। ইহাতে যাহা কিছু ন্যায়বিগর্হিত ছিল, সমস্ত পরিত্যক্ত হইল। এই ভীষণ সময়ে ইংলণ্ডের সমগ্র উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীর লোক—অধিক কি, যাঁহারা লিবারেল বলিয়া খ্যাত ছিলেন, তাঁহারাও দাক্ষিণাত্যের ষ্টেট্সের অধিবাসীদিগের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শ্রমজীবিশ্রেণী এবং কতিপয় সাহিত্য ও বিজ্ঞানব্যবসায়ী ব্যক্তি ভিন্ন ইংলণ্ডের যাবতীয় অধিবাসীই উদীচ্য অধিবাসীদিগের প্রতিকূলে বদ্ধপরিকর হইলেন। এই ঘটনার পূর্ব্বে মিল্ জানিতে পারেন নাই যে, ইংলণ্ডের সম্ভ্রান্তশ্রেণী এবং লিবারেল মতাভিমানীরা চিরস্থায়ী উন্নতির দিকে এত অল্প অগ্রসর হইয়াছেন। কিন্তু ইউরোপের লিবারেলেরা ইংলণ্ডের ভ্রাতৃগণের ন্যায় এরূপ ঘোরতর ভ্রমে পতিত হন নাই। ইংলণ্ডের যে বংশধরগণ প্রতীচ্য ইণ্ডিয়ায় ইউরোপীয় প্লাণ্টারদিগের হস্ত হইতে নিগ্রোদাসদিগকে উন্মুক্ত করিবার জন্য অমানুষী চেষ্টা ও অসংখ্য মুদ্রা ব্যয় করিয়াছিলেন, সেই বংশধরগণ এক্ষণে কালকবলে পতিত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের পবিত্র আসন এক্ষণে আর একদল বংশধর কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। পূর্ব্বপুরুষেরা বহুদিনব্যাপী

বিতর্ক ও তত্ত্বানুসন্ধানের পর দাসত্বের যে সকল ভয়ঙ্কর অনিষ্টপাতের বিষয় অবগত হইয়াছিলেন, এই নবাগত পুরুষ তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। শ্বেতদ্বীপের বাহিরে যে সকল ঘটনা ঘটিতেছে, তাহার তত্ত্বানুসন্ধানে ইংরাজজাতি এরূপ স্বভাবসিদ্ধ অপ্রবণতা যে, আমেরিকার এই ভীষণ সমরের অব্যবহিত বা ব্যবহিত কারণ বিষয়ে ইংরাজসাধারণ অনেকদিন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। অধিক কি, এই সমরের প্রথম দুই এক বৎসর অনেকেই অবগত ছিলেন না যে, এই সমর দাসত্বঘটিত। অনেক লিবারেল্ মতাবলম্বী মনীষীরাও অনেকদিন পর্য্যন্ত বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে, এই সমর বাণিজ্য শুল্কসংক্রান্ত। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে, উৎপীড়িত ষ্টেট্স সকলের অধিবাসীরাই স্বাধীনতার জন্য এই সমর উত্থাপিত করিয়াছে; এরূপ সমরের সহিত তাঁহাদিগর চিরদিনই সহানুভূতি ছিল।

ইংলণ্ডের যে কতিপয় মনীষী দাসত্ব বিরোধী উদীচ্যদিগের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন, মিল্ তাঁহাদিগের অন্যতম। মিল্ দাসত্বের প্রতিবাদে সেই মনীষীদিগের অগ্রণী ছিলেন, এ কথা আমরা বলিতে পারি না। মিষ্টার হিউজ এবং মিষ্টার লড্‌লো—এই প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মাদ্বয়ই সর্ব্ব প্রথমে তাঁহাদিগের তেজস্বিনী লেখনী দ্বারা এই জঘন্য প্রথার প্রতিবাদ করেন। বাগ্মিকশ্রেষ্ঠ মিষ্টার ব্রাইট অমানুষী বক্তৃতা দ্বারা পূর্ব্বোক্ত মহাত্মদ্বয়ের অনুসরণ করেন। মিল্ও তাঁহাদিগের অনুগমন করিবেন মনে করিতেছিলেন, এমন সময়ে একটি আকস্মিক ঘটনা উপস্থিত হওয়া তাঁহার সমস্ত সঙ্কল্পের বিপর্য্যয় করিয়া দিল। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে কতিপয় দাক্ষিণাত্য দূত একখানি ব্রিটিশ জাহাজে আসিতেছিলেন। এমন সময় এক জন উদীচ্য কর্ম্মচারী তাঁহাদিগকে ধৃত করেন। এই সংবাদে সমস্ত ইংলণ্ড ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠেন। ইউনাইটেডষ্টেট্‌সের সহিত ইংলণ্ডের যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। চতুর্দ্দিকে যুদ্ধের আয়োজন হইতে লাগিল। এইরূপ অবস্থায় আমেরিকার স্বাপক্ষে কোন কথা লিখিত বা কথিত হইলে শ্রোতৃবর্গ পাইবার মত সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, মিল্ কিছুদিন নীরব রহিলেন। উদীচ্য আমেরিকানদিগের এই কার্য্য গর্হিত হইয়াছে,—মিল এই সর্ব্ববাদিসম্মত মতের অনুমোদন করিয়াছিলেন। সুতরাং উদীচ্য আমেরিকার যে ইংলণ্ডের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত, এ বিষয়েও তিনি সাধারণের সহিত ঐকমত্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। আমেরিকা অবশেষে ক্ষমাপ্রার্থনা করিতে বাধ্য হইলেন। এ দিকে ইংলণ্ডে যুদ্ধের উদ্‌যোগও নিবৃত্ত হইল। এই সুযোগ মিলও ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ফ্রেজার্স ম্যাগাজিনে আমেরিকার যুদ্ধ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করিলেন।

যে সকল লিবারেল মতাবলম্বীরা প্রতিপক্ষদিগের মতস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিলেন, তাঁহারা মিলের এই প্রবন্ধরূপ অবলম্বন পাইয়া স্বস্থানে সংস্থিত হইলেন। ইঁহারা সকলে একত্রীভূত হইয়া এক্ষণে দাসত্বের প্রতিকূলে একটি দল সংস্থাপিত করিলেন। ইত্যবসরে উদীচ্যেরা জয়লাভ করিল। সুতরাং ইংলণ্ডে দাসত্বের প্রতিকূল দল ক্রমেই পুষ্টাবয়ব হইতে লাগিল। মিল ইতঃপূর্ব্বে কিছুদিনের জন্য ভ্রমণে গিয়াছিলেন; তিনি ভ্রমণ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ওয়েষ্টমিনিষ্টার রিভিউতে অধ্যাপক কেয়ার্ণেসের পুস্তকের আলোচনা উপলক্ষ করিয়া এই বিষয়ে আর একটি প্রস্তাব লিখিলেন।

যদি মিল্ প্রভৃতি কতিপয় মনীষী ইউনাইটেডষ্টেট্‌সের স্বাপক্ষে লেখনী ধারণ ও জিহ্বা-সঞ্চালন না করিতেন, তাহা হইলে ইংলণ্ড আমেরিকার অধিকতর বিদ্বেষের ভাজন হইতেন সংশয় নাই। ইংলণ্ড আমেরিকার প্রতি এই অসদ্ব্যবহারের ফল অদ্যাপি ভোগ করিতেছেন। পূর্ব্বোক্ত কতিপয় মনীষীর প্রতি প্রগাঢ়শ্রদ্ধা না থাকিলে আমেরিকার ক্রোধানল এতদিন শ্বেতদ্বীপকে ইংরাজরক্তে রঞ্জিত করিত সন্দেহ নাই। ইউনাইটেডষ্টেট্‌সের জাতীয় অস্তিত্ব লোপ করাই ইংলণ্ডের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল; কিন্তু জগতের মঙ্গলের জন্য এবং ইউনাইটেডষ্টেট্‌সের সৌভাগ্যবলে ইংলণ্ডের সেই অসাধু ইচ্ছা সফল হইল না, তথাপি এরূপ অসাধু ইচ্ছা হৃদয়ে ধারণ করার বিষময় ফল ইংলণ্ডকে আজও পদে পদে ভোগ করিতে হইতেছে।

আমেরিকার স্বাপক্ষে লেখনী-চালনা করার অব্যবহিত দুই বৎসরকাল মিল্ যে যে বিষয়ে নিমগ্ন ছিলেন, তাহা রাজনৈতিক নহে। এই সময়ে অষ্টিনের মৃত্যু হয়; এবং তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপ্রদত্ত ব্যবহারবিজ্ঞানবিষয়ক (Jurisprudence) উপদেশাবলী প্রকাশিত হয়। অষ্টিনের স্মৃতি মিলের হৃদয়ের অতি প্রিয় বস্তু ছিল। সেই স্মৃতির সম্মাননার জন্য মিল অষ্টিনের উপদেশাবলীর সমালোচনা করিলেন। যৎকালে মিল

বেন্থাম-প্রণালীতে নব-দীক্ষিত হন, তৎকালে তিনি ব্যবহার-বিজ্ঞান-শাস্ত্রের আলোচনায় অনেক সময় অতিবাহিত করেন। সেই আলোচনার সময় এই বিষয়ে তাঁহার মনে অনেক নূতন ভাবের আবির্ভাব হয়। এই সমালোচনা উপলক্ষে তিনি সেই সকল নূতন ভাব সাধারণসমক্ষে প্রদান করেন।

কিন্তু এই দুই বৎসরের তাঁহার প্রধান রচনা—সার উইলিয়ম্ হ্যামিল্টন-প্রণীত দর্শনের পূর্ণ সমালোচনা। ১৮৬০ এবং ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে হ্যামিল্টনের দর্শন প্রচারিত হয়। মিল শেষোক্ত বৎসরের শেষভাগে উক্ত গ্রন্থ পাঠ করেন। তাঁহার প্রথমে ইচ্ছা ছিল, উক্ত গ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্ত সমালোচনা মাত্র করিবেন। কিন্তু পরে দেখিলেন, স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে ইহার একটি সুদীর্ঘ সমালোচনা না করিলে আর এই পুস্তকের প্রতি যথোচিত ব্যবহার করা হইবে না। তাঁহার প্রথমে সংশয় উপস্থিত হইল যে, এ কার্য্যে তাঁহার নিজের হস্তক্ষেপ করা উচিত কি না। কিন্তু অনেক বিবেচনার পর তাঁহার এই সংশয় অপনীত হইল। তিনি স্বয়ংই এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

হ্যামিল্টনের দর্শন-পাঠে মিল নিতান্ত হতাশ হন। হ্যামিল্টনের সহিত তাঁহার কোন মনোমালিন্য ছিল না; সুতরাং তিনি যে নিজে বিদ্বেষবিশিষ্ট হইয়া তদীয় সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় না। বরং তদুদ্ভাবিত মানবজ্ঞানের "রিলেটিভিটি" অর্থাৎ সাপক্ষতা মতের জন্য হ্যামিল্টনের সহিত তাঁহার মতের সহানুভূতিই ছিল। কিন্তু হ্যামিল্টনের দর্শনশাস্ত্রবিষয়ক উপদেশাবলী ও তৎপ্রণীত রীডের সমালোচনা পাঠ করায় মিলের সেই সহানুভূতি অনেক পরিমাণে শিথিলতা হইল। মিলের পূর্ব্বে বিশ্বাস ছিল যে, দর্শন শাস্ত্রবিষয়ে হ্যামিল্টনের মতের সহিত তাঁহার মতের সৌসাদৃশ্য আছে। কিন্তু এক্ষণে দেখিলেন যে, সে বিশ্বাস নিতান্ত ভ্রান্ত।

এই সময় ইউরোপ দুই দার্শনিক সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। এক সম্প্রদায় সহজজ্ঞানের পক্ষপাতী; অপর সম্প্রদায় ভূয়োদর্শন ও সংযোজনজ্ঞানের পক্ষপাতী। প্রথম সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁহাদিগের হৃদয়ের প্রিয় মতগুলিকে যুক্তি-নিরপেক্ষ স্বভাবজ সত্য (Intuitive truth) বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন, তাঁহাদিগের কর্ত্তব্যজ্ঞান যাহা ভাল বলিত, তাহাই তাঁহারা প্রকৃতি ও ঈশ্বরের অনুমোদিত বলিয়া মনে করিতেন, তাঁহারা যুক্তির আদেশ অপেক্ষা কর্ত্তব্যজ্ঞানের আদেশ অলঙ্ঘনীয় বলিয়া মনে করিতেন; সুতরাং যুক্তিপ্রদর্শন দ্বারা তাঁহাদিগের কর্ত্তব্যজ্ঞানের উপদেশের ভ্রান্ততা প্রদর্শন করিতে গেলে তাঁহারা খড়্গহস্ত হইয়া উঠিতেন। মানবজাতির ব্যক্তিগত, জাতিগত ও লিঙ্গগত প্রভেদে যে অবস্থার প্রভেদ জন্মিয়া থাকে, এ কথা তাঁহারা স্বীকার করেন না। তাঁহাদিগের মতে মানবচরিত্রের বৈচিত্র্য প্রকৃতিসিদ্ধ—অবস্থার ফল নহে। প্রকৃতিসিদ্ধ; সুতরাং পরিবর্ত্তাসহ। সামাজিক বা রাজনৈতিক সংস্কারক যে কোন সংস্কারের অনুষ্ঠান করিবেন, যে কোন নূতন বিষয়ের প্রস্তাব করিবেন, তাহাতেই এই সম্প্রদায়ের লোকের নিকট হইতে বাধা ও আপত্তি প্রাপ্ত হইবেন। তাঁহাদিগের মতে সমাজ, নীতি ও রাজনীতি বিষয়ে যে সকল সংস্কার বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহা স্বতঃপ্রবৃত্ত ও স্বতঃসিদ্ধ। যাহা স্বতঃসিদ্ধ, তাহা প্রমাণ-সাপেক্ষ নহে। সুতরাং সেগুলির আবশ্যকতা বিষয়ে কোন প্রমাণ চাহিলে তাঁহারা ক্রোধে জ্বলিয়া উঠেন। দুই একটা উদাহরণ দিলেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন। প্রথমতঃ 'ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান ও অনন্ত দয়ার আধার'—এই সংস্কার অনেক দিন হইতেই চলিয়া আসিতেছে। কেহ এই চিরন্ধঢ় সংস্কারের প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন—ঈশ্বর যদি সর্ব্বশক্তিমান্ ও দয়ার আধার হইবেন, তবে জগতে এত কষ্ট, এত দুঃখ শোক-তাপ দেখিতে পাওয়া যায় কেন? যাঁহার হৃদয় অনন্ত দয়ার ভাণ্ডার, তিনি কখন পরের কষ্ট ও পরের দুঃখ দেখিতে পারেন না। সুতরাং তিনি যখন পরের দুঃখ অবলীলাক্রমে দেখিতেছেন, তখন হয় তাঁহার শক্তি নাই, নয় দয়া নাই। এরূপ প্রতিবাদের বিপক্ষে যুক্তিপ্রদর্শন করিতে অসমর্থ হইয়া এই সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অকারণে বদ্ধপরিকর হইবেন। দ্বিতীয়তঃ—'আমরা যখন কোন বস্তুই অকর্ত্তৃক দেখিতে পাই না, তখন এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎ যে অকর্ত্তৃক, তাহা বোধ হয় না'—বহুদিন হইতে এইরূপে এই জগতের স্রষ্টার কল্পনা হইয়া আসিতেছে। কিন্তু যখন এইরূপে কল্পিত জগৎ-স্রষ্টার বিরুদ্ধে এই আপত্তি উত্থিত হয় যে, আমরা যখন সকল কারণেরই কারণ দেখিতে পাই, তখন জগৎকারণেরও যে কারণ নাই, এ কথা আমরা বলিতে পারি না বটে; কিন্তু জগৎ কারণেরও কারণ কল্পনা করিতে

গেলে অনবস্থাপাত উপস্থিত হয় অর্থাৎ জগৎ-স্রষ্টার স্রষ্টা, তৎস্রষ্টা ইত্যাদি কারণ-পরম্পরায় আনন্ত্য আসিয়া উপস্থিত হয়; সুতরাং অনন্ত কারণ-পরম্পরার কল্পনারূপ গুরুত্বের আশ্রয় লওয়া অপেক্ষা এই জগৎকেই স্বয়ং সৃষ্ট বলিলে কল্পনার অনেক লাঘব হয়। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা এরূপ প্রতিবাদের কিছুই বলিতে সমর্থ হইবেন না; অথচ প্রতিপক্ষের প্রতি পাষণ্ড, নাস্তিক প্রভৃতি গালিবর্ষণ করিবেন। ধর্ম্মনীতি-বিষয়ে যেরূপ, সেইরূপ রাজনীতি ও সমাজ-নীতি বিষয়েও যুক্তির উপাসকদিগের এই সম্প্রদায়ের লোকের নিকট হইতে অনেক অকারণ আপত্তি সহ্য করিতে হয়। এই সকল অযৌক্তিক আপত্তি খণ্ডন করিতে সংস্কারকদিগের অনেক সময় বৃথা অতিবাহিত হইয়া যায়।

দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের লোকেরা স্বভাবজ জ্ঞান মানেন না। তাঁহাদিগের মতে সমস্ত মানবজ্ঞানেরই মুল ভূয়োদর্শন ও সংযোজন। শিশু যখন মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয়, তখন সে কোনও স্বভাবজ জ্ঞান লইয়া ভূমিষ্ঠ হয় না। সদ্যঃপ্রসূত শিশুর জিজ্ঞাসাবৃত্তি ও জ্ঞানধারণাশক্তি থাকে মাত্র। জগতের সমস্ত বস্তুই সে জানিতে ইচ্ছা করে এবং সেই চেষ্টায় ভূয়োদর্শনে ক্রমে সমস্ত বস্তুরই জ্ঞান তাহার উপলব্ধি হইতে থাকে। এই সকল ভূয়োদর্শনজাত জ্ঞানরাশি সংযোজনী শক্তি দ্বারা এরূপ পরস্পর সংবদ্ধ হইয়া যায় যে, একটির স্মরণে অপরগুলির স্মরণ অনিবার্য্য-বেগে আসিয়া পড়ে। যাঁহারা স্বভাবজ জ্ঞান মানেন না, তাঁহারা জ্ঞানের অপরিবর্ত্তনীয়তা ও অভ্রান্ততাও স্বীকার করেন না। ভূয়োদর্শন যাঁহাদিগের জ্ঞানের আকর, তাঁহা-দিগের জ্ঞান সতত পরিবর্ত্তনশীল এবং নিত্যসংস্কার-সহ। যত দিন যায়, ততই ভূয়োদর্শনের পরিপুষ্টি ও উৎকর্ষ সাধিত হয়। পঞ্চমবর্ষীয় বালকের ভূয়োদর্শন অপেক্ষা তাহার পরিণত-বয়সের ভূয়োদর্শন প্রায়ই অধিকতর পরিপুষ্টি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ব্যক্তি সম্বন্ধে যেরূপ, জাতি ও মানব-সাধারণ সম্বন্ধেও প্রায় তদ্রূপ। মানবজাতির শৈশবাবস্থায় যে ভূয়োদর্শন ছিল, সাধা-রণতঃ এখনকার ভূয়োদর্শন তাহা অপেক্ষা অধিকতর পরিপুষ্ট ও উৎকর্ষপ্রাপ্ত। সেই ভূয়োদর্শনের উৎকর্ষ ও পরিপুষ্টির সহিত মানবজ্ঞান ও মানবমতেরও উৎকর্ষ ও পরিপুষ্টিসাধন করা উচিত। এত দিন যাহা ভাল বলিয়া চলিয়া আসিতেছে, তাহাই ভাল; সুতরাং তাহাই অনুসরণীয়—এ সম্প্রদায়ের লোকেরা এ মতের নিতান্ত বিরোধী। ইঁহাদিগের মতে কল্য যাহা ভাল বলিয়া চলিয়া আসিতেছে, অদ্যকার ভূয়োদর্শনে হয় ত তাহা মন্দ বলিয়া প্রতীত হইতে পারে। সেইরূপ কল্য যাহা মন্দ বলিয়া প্রতীত হইয়া-ছিল, অদ্যকার ভূয়োদর্শনে হয় ত তাহা ভাল বলিয়া প্রতীত হইতে পারে। সুতরাং এরূপ স্থলে কল্যকার ভূয়োদর্শনের বশীভূত হইয়া আমরা অদ্যকার অধিকতর উৎকর্ষপ্রাপ্ত ও পরিপুষ্ট ভূয়োদর্শনের অবমাননা করিতে পারি না। অদ্যকার ভূয়োদর্শনের সম্মাননা করিতে গেলেই—কি ধর্ম্মনীতি, কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি, সকল বিষয়েই নিত্য সংস্কার ও নিত্য পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন। সেই জন্যই এই সম্প্রদায়ের লোকেরা এত সংস্কারপ্রিয়। মিল্ তদীয় পিতা এবং অধ্যাপক বেইন প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর্গ এই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

সার উইলিয়ম্ হ্যামিল্টন ও জার্ম্মান দার্শনিকেরা প্রথম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। সার উইলিয়ম হ্যামিল্-টনের সাপেক্ষ জ্ঞান প্রচারিত হইলে মিল্ ভাবিয়া-ছিলেন যে, হ্যামিল্টন এই দুই সম্প্রদায়ের সংযোজক শৃঙ্খলস্বরূপ হইবেন। কিন্তু তৎপ্রদত্ত দার্শনিক উপদেশাবলী ও তৎকৃত রীডের সমালোচনা পাঠ করিয়া মিলের সে আশা দূরীকৃত হইল।

দার্শনিক জগতে সার উইলিয়ম্ হ্যামিল্টনের যেরূপ প্রতিপত্তি, তাঁহার রচনার যেরূপ মোহিনী-শক্তি, তাহাতে মিল্ দেখিলেন যে, তৎপ্রণীত দর্শন-শাস্ত্র অনাক্রান্ত থাকিলে, জগতের উন্নতি-স্রোত অনেক দিনের জন্য রুদ্ধ-প্রসর হইবে। তদীয় দর্শন "স্বভাবজ্ঞান মতের দুর্গস্বরূপ।" মিল্ দেখিলেন যে, সেই দুর্গ সমূলোৎপাটিত করিতে না পারিলে আর স্বভাবজ্ঞান মত তিরোহিত হইবে না। তিনি দেখিলেন যে, এই দুই শ্রেণীর দর্শন-শাস্ত্রের শুদ্ধ মর্ম্ম সাধারণ সমক্ষে ধারণ করিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে না; এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘোর-তর তর্ক-বিতর্ক উত্থাপিত করিতে হইবে। এই জন্য তিনি স্থির করিলেন যে, প্রথম সম্প্রদায়ের অধি-নায়ক হ্যামিল্টনের দর্শনের ভ্রম সকল তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইয়া দিতে হইবে। হ্যামিল্টন এক্ষণে দার্শনিক জগতে যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী যশোলাভ করিতেছেন, তিনি যে সে অতুল যশের উপযুক্ত নন, তাহা স্পষ্টাক্ষরে

বুঝাইয়া দিতে হইবে। এই জন্যই তিনি হ্যামিল্টনের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিলেন।

মিলের সমালোচনা প্রকাশিত হইল। অমনি চতুর্দ্দিকে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। তিনি হ্যামিল্টন দর্শন হইতেই নানা স্থল উদ্ধৃত করিয়া তাহাদিগের পরস্পরবিরোধিতা দেখাইয়া দিলেন। তিনি যথাযথ বর্ণন করিতেও বিন্দুমাত্র ভীত ও সঙ্কুচিত হন নাই, অথচ হ্যামিল্টনের প্রতি যথোচিত সম্মানপ্রদর্শন করিতেও ত্রুটি করেন নাই। মিল্ জানিতেন যে, অজ্ঞানবশতঃ তিনি যদি কোন কোন স্থলে হ্যামিল্টনের প্রতি অন্যায় আক্রমণ করিয়া থাকেন, তাঁহার অসংখ্য শিষ্য ও স্তুতিবাদকেরা অবশ্যই সেই সেই স্থলে তাঁহার ভ্রম সংশোধন করিয়া দিবেন। বাস্তবিকও তাহাই ঘটিল। মিলের সমালোচনা প্রকাশিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই হ্যামিল্টনের অসংখ্য শিষ্য ও স্তুতিবাদকেরা মিলের সমালোচনার প্রতিবাদ করিয়া অসংখ্য প্রস্তাব লিখিলেন। তাঁহারা মিলের যে সকল ভ্রম-প্রমাদ দেখাইয়া দিলেন, তাহা সংখ্যায় অতি অল্প ও মূল্যে অতি সামান্য হইলেও, মিল দ্বিতীয় সংশোধন করিয়া দিলেন। যাহা হউক, সব দিক দেখিলে এই সমালোচনায় অনেক কাজ হইয়াছিল বলিতে হইবে। এই সমালোচনায় হ্যামিল্টনের দর্শনের দুর্ব্বলাংশ সকল সাধারণ-সমক্ষে প্রদর্শিত হয়; দার্শনিক জগতে তাঁহার অপ্রতিদ্বন্দ্বী যশ উপযুক্ত সীমায় নিবদ্ধ হয়; এবং সাধারণ বিতর্কে পদার্থ ও মন সম্বন্ধে দার্শনিক মত সকলের অনিশ্চিততার মীমাংসা হইয়া যায়।

হ্যামিল্টন-দর্শনের সমালোচনা পরিসমাপ্ত করিয়া মিল অগষ্ট কম্টের মতাবলীর সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন। নানা কারণে এই গুরুতর ভার তাঁহারই উপর সংন্যস্ত ছিল। যৎকালে মিল তাঁহার ন্যায়-দর্শনে অগষ্ট কম্টের বিষয় প্রথম উল্লেখ করেন, তখন কম্টের নাম ফ্রান্সেরও সর্ব্বত্র শ্রুত হয় নাই। মিল তদীয় ন্যায়দর্শনে কম্টের পাঠক ও স্তুতিবাদক হইয়া উঠিলেন। যৎকালে মিল তাঁহার বিষয় প্রথম উল্লেখ করেন, তখন তিনি ইংলণ্ডের চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগেরও নিকট এতদূর অপরিচিত ছিলেন যে, তদীয় নামের উল্লেখেই তাঁহারা বিস্মিত হইয়াছিলেন। কিন্তু মিল যখন তাঁহার পুস্তকের ও তদুদ্ভাবিত মতাবলীর সমালোচনা করেন, তখন এরূপ অবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। এ সময়ে তাঁহার নাম ইউরোপের প্রায় সর্ব্বত্র এবং তদুদ্ভাবিত মতাবলী ইউরোপের প্রায় অনেক স্থলেই পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কি শত্রু, কি মিত্র সকলেই একবাক্যে তদীয় গভীর চিন্তাশীলতার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। তিনি যে চিন্তাবিষয়ে উনবিংশ শতাব্দীর অধিনায়ক, তাহা সকলেই মুক্তকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন। যে সকল মন গভীর শিক্ষা ও বলবতী প্রবণতা দ্বারা পূর্ব্বেই প্রস্তুত হইয়াছিল, সেই সকল মনই তদীয় গভীর চিন্তা সকলের ধারণায় সমর্থ হইল। কিন্তু সেই উৎকৃষ্ট মতগুলির সহিত তদীয় কতকগুলি দূষিত মতও সর্ব্বত্র সমাদরে গৃহীত হইতে লাগিল। অধিক কি, ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও ইউরোপের অন্যান্য দেশের অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিরাও কম্টের সেই উৎকৃষ্ট মতগুলির সহিত দূষিত মতগুলিরও পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন। এই জন্য ইহা প্রার্থনীয় হইয়া উঠিল যে, কোন উপযুক্ত লোক কম্টের দূষিত মতগুলির তদীয় উৎকৃষ্ট মতগুলি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সাধারণ-সমক্ষে ধারণ করেন। এই গুরুতর কার্য্যের ভার গ্রহণে ইচ্ছুক ও সমর্থ মিল ব্যতীত তৎকালে ইংলণ্ডে আর দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন না। এই জন্যই মিল গুরুভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি "অগষ্ট কম্ট ও তদীয় প্রত্যক্ষবাদ" এই নাম দিয়া ওয়েষ্টমিনিষ্টার রিভিউয়ের উপর্য্যুপরি দুই খণ্ডে দুইটি সুদীর্ঘ প্রস্তাব লিখেন। এই প্রস্তাবদ্বয় পরে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

মিলের যে সকল রচনার বিষয় আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিলাম, ১৮৫৯ হইতে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কালের মধ্যে সেইগুলিই তদীয় লেখনীর প্রধান ফল; এতদ্ব্যতীতও তিনি অনেক সাময়িক পত্রে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তাব লিখিয়াছিলেন; কিন্তু পরিরক্ষণের অনুপযুক্ত বলিয়া তিনি সেগুলির আর পুনর্মুদ্রাঙ্কন করেন নাই।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে মিল নিম্নশ্রেণীস্থ ব্যক্তিবর্গের অনুরোধে তদীয় অর্থনীতি, স্বাধীনতা ও প্রতিনিধিশাসনপ্রণালী গ্রন্থত্রয়ের সুলভ মুদ্রাঙ্কন করেন। ইহাতে অর্থসম্বন্ধে তাঁহাকে বিশেষ ত্যাগস্বীকার করিতে হইল। তিনি যৎসামান্য লাভ রাখিয়া শুদ্ধ ব্যয়মূল্যে তাঁহার পুস্তকগুলির মূল্য নির্দ্ধারণ করিলেন। মূল্যের লঘুকরণে তাঁহার পুস্তকবিক্রয়ের

সংখ্যা অতিশয় বাড়িয়া গেল। কিন্তু মূল্যের লঘুকরণে আয় সম্বন্ধে তাঁহার যে ক্ষতি হইল, এরূপ অধিক বিক্রয়েও তাহার পূরণ হইল না। তথাচ যে যৎসামান্য ক্ষতিপূরণ হইল, তাহাতেই তিনি আশাতীত সন্তোষলাভ করিলেন।

অষ্টম অধ্যায়

—*—

পার্লিয়ামেণ্টীয় জীবন ;—শ্রমজীবিশ্রেণী কর্ত্তৃক মিলের নির্ব্বাচন, লণ্ডনে মিউনিসিপাল শাসনপ্রণালী স্থাপন, আয়র্লণ্ড, শ্রমজীবিশ্রেণী ও রিফর্ম্ বিল্, জামেকা-বিদ্রোহ, একষ্ট্রাডিসন্ ও ব্রাইবারী বিল্, ব্যক্তিগত প্রতিনিধিত্ব ও স্ত্রীজাতির প্রতিনিধিত্ব, নানাবিষয়ক পত্রপ্রাপ্তি, পিতৃলিখিত মানবমনের বিশ্লেষণ গ্রন্থের সম্পাদান, দ্বিতীয়বারে মিলের পরিক্ষেপ, মৃত্যু, উপসংহার।

আমরা এক্ষণে মিলের জীবন-নাটকের শেষ অঙ্কে উপনীত হইলাম। বীণাপাণি এত দিন তদীয় লেখনীতেই কেবল বিরাজ করিতেছিলেন, রসনায় বিকাশ পাইবার কোন সুবিধা পান নাই। এক্ষণে শেষ-দশায় সেই সুবিধা ঘটিল। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে মিলকে হাউস অব কমন্সের সভ্য মনোনীত করিবার নিমিত্ত যে এই সর্ব্বপ্রথম প্রস্তাব হয়, এরূপ নহে। দশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি যখন আয়র্লণ্ডের ভূমি-বিষয়ক জটিলপ্রশ্নের মীমাংসা করেন,তখন মিষ্টার লুকাস এবং মিষ্টার ডফি প্রভৃতি আয়র্লণ্ডের সাধারণদলের অধিনায়করা তাঁহাকে আয়র্লণ্ডের সাধারণদলের প্রতিনিধি করিয়া হাউস্ অব কমন্সে পাঠাইবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু তৎকালে মিল ইণ্ডিয়া হাউসে নিযুক্ত ছিলেন, সুতরাং সেই প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারেন নাই। ইণ্ডিয়া হাউসের কর্ম্মত্যাগের পর মিলের বন্ধু বান্ধবেরা তাঁহাকে পার্লিয়ামেণ্টে আসীন দেখিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু সে ইচ্ছা যে ফলবতী হইবে, আপাততঃ তাহার কোন সম্ভাবনা ছিল না। অনেকে মিলের মনে এরূপ প্রতীতি জন্মাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, কোন ইলেক্টরাল্ সমাজই * তাঁহার ন্যায় কেন্দ্রবহির্ভূত মতাবলম্বী ব্যক্তিকে পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য মনোনীত করিতে চাহিবেন না। বিশেষতঃ যাঁহার কোন স্থানীয় সংস্রব বা লোক-প্রিয়তা নাই এবং যিনি মতবিষয়ে কোন দলের প্রতিনিধি হইতে চাহেন না, বিপুল অর্থব্যয় ব্যতীত তাদৃশ লোকের পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য মনোনীত হওয়ার সম্ভাবনা অল্প। কিন্তু মিলের দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছিল যে, যাঁহারা সাধারণ কার্য্যে ব্রতী হইবেন, তাঁহাদিগের সেই উদ্দেশ্যে এক পয়সাও ব্যয় করা উচিত নহে। তাঁহার মতে পার্লিয়ামেণ্টে সভ্য মনোনীত করিবার জন্য সে সকল ব্যয় যুক্তিসঙ্গত ও অপরিহার্য্য, রাজকোষ বা স্থানীয় চাঁদা দ্বারাই সে সকল সাধারণ ব্যয়ের নির্ব্বাহ হওয়া উচিত। যদি কোন ইলেক্টরাল সমাজ কোন ব্যক্তিবিশেষকে পার্লিয়ামেণ্টে আপনাদিগের প্রতিনিধিস্বরূপ প্রেরণ করিতে ইচ্ছা করেন এবং সেই ইচ্ছার সফলতাসাধনের নিমিত্ত তাঁহারা যদি ন্যায়সঙ্গত ও অপরিহার্য্য ব্যয়ভূষণ করেন, তাহাতে কোন আপত্তি উঠিতে পারে না; কিন্তু সেই ব্যয়ের সমস্ত আংশিক ভার প্রার্থীর বহন করাই মূলতঃ দূষণীয়; কারণ, ইহা একপ্রকার পার্লিয়ামেণ্টের আসন ক্রয় করার সমান। এরূপ ব্যাপার ঘটিতে দিলে দুইটি অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। প্রথমতঃ অনেক স্বার্থপর ধনবান্ লোক স্বার্থসাধনের জন্য পার্লিয়ামেণ্টে প্রবিষ্ট হইতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ যে সকল সাধু, সচ্চরিত্র ও স্বদেশানুরাগী ব্যক্তি পার্লিয়ামেণ্টে নিজ প্রবেশনিমিত্তক ব্যয়-ভারবহনে অনিচ্ছুক বা অসমর্থ, তাঁহাদিগকে কার্য্যতঃ পার্লিয়ামেণ্ট হইতে অপসারিত করায় রাজ্যের গুরুতর ক্ষতি হইবে।

অর্থব্যয় ব্যতীত যদি পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশ নিতান্তই অসাধ্য হইয়া উঠে, তাহা হইলে স্বদেশের মঙ্গলসাধন করা যাঁহাদিগের পার্লিয়ামেণ্ট-প্রবেশের একমাত্র উদ্দেশ্য, এরূপ স্বদেশানুরাগী ব্যক্তিগণের পক্ষে পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশোদ্দেশে ন্যায়সঙ্গত অর্থব্যয় করা

---

* (Electoral Body) ইংলণ্ডে যাঁহারা পার্লিয়ামেণ্টে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক সভ্য প্রেরণ করার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে ইলেক্টরাল সমাজ কহে।

-নীতিমার্গবিরোধী, মিল এরূপ বলিতেন না। কিন্তু যতক্ষণ না তাঁহার মনে দৃঢ়-প্রতীতি জন্মিবে যে, সেই নিরপেক্ষ স্বদেশানুরাগী ব্যক্তিগণ অন্য কোন ব্যাপারে নিবিষ্ট না হইয়া পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশ করিলে দেশের অধিকতর উপকার করিতে পারিবেন, ততক্ষণ তিনি এ উদ্দেশে অর্থব্যয় করার পক্ষসমর্থন করিতে পারেন না। নিজ সম্বন্ধে তদীয় প্রতীতি সম্পূর্ণ প্রতিকূলই ছিল। তিনি জানিতেন যে, শুদ্ধ লেখনী পরিচালন করিয়া তিনি দেশের যে পরিমাণ উপকার করিতে পারিবেন, পার্লিয়ামেণ্টে বেঞ্চে আসীন হইয়া দেশের সে পরিমাণ উপকারসাধন করিতে পারিবেন না। এই জন্য তিনি স্থির করিলেন যে, পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত অর্থব্যয় করা দূরে থাকুক, তিনি বিনা অর্থব্যয়েও ইহাতে প্রবেশ করিবেন না।

কিন্তু শ্রমজীবিশ্রেণী মিলকে পার্লিয়ামেণ্টে আপনাদিগের প্রতিভূস্বরূপ প্রেরণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে এ প্রস্তাব অচিরাৎ রূপান্তর ধারণ করিল। মিল পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশ করিবার জন্য কোনও চেষ্টা করিতে প্রস্তুত ছিলেন না; কারণ, তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশ করা অপেক্ষা লেখনী-পরিচালন দ্বারা তিনি দেশের অধিকতর উপকারসাধন করিতে পারিবেন, সুতরাং পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশের জন্য তিনি স্বয়ং কোনও চেষ্টা করিবেন না; কিন্তু যদি কোন ইলেকটরাল সমাজ তদীয় কেন্দ্র বহির্ভূত মত সকল জানিয়াও তাঁহাকে পার্লিয়ামেণ্টে আপনাদিগের প্রতিনিধিস্বরূপ প্রেরণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহাদিগের অনুরোধ অবহেলা করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। মিল শ্রমজীবিশ্রেণীর ইচ্ছার দৃঢ়তা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে সরলভাবে এই মর্ম্মে একখানি পত্র লিখেন যে,—পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য মনোনীত হইবার জন্য তাঁহার নিজের কোনও ইচ্ছা নাই, সুতরাং তজ্জন্য তিনি দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতে বা কিঞ্চিন্মাত্রও ব্যয় করিতে প্রস্তুত নহেন; আর বিশেষতঃ তিনি সভ্য মনোনীত হইলেও তাঁহাদিগের স্থানীয় বিষয়ে সময় ও শ্রম ব্যয় করিতে পারিবেন না। সাধারণ রাজনীতি-বিষয়ে তাঁহারা যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তিনি স্পষ্টাক্ষরে সে সকলের উত্তর দিলেন এবং ভোট সম্বন্ধে স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিলেন যে, তাঁহার মতে এবই নিয়মে পুরুষদিগের ন্যায় স্ত্রীলোকদিগকেও পার্লিয়ামেণ্টের প্রতিনিধি প্রেরণ করার অধিকার প্রদান করা উচিত এবং তিনি যদি পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য মনোনীত হয়েন, তাহা হইলে, তথায় এ বিষয়ে সবিশেষ আন্দোলন করিবেন। ইংলণ্ডীয় ইলেক্টরাল সমাজের নিকট এরূপ প্রস্তাব সর্ব্বপ্রথমে উপস্থিত হয়। এরূপ প্রস্তাব করার পরও যে তিনি শ্রমজীবিশ্রেণী কর্ত্তৃক প্রতিনিধি মনোনীত হইলেন, ইহা অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। একজন সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর স্বয়ং আসিলেও এমন স্থলে সভ্য মনোনীত হইতে পারিতেন কি না সন্দেহ। যাহা হউক, পার্লিয়ামেণ্টে সভ্য মনোনীতকরণে পুরুষজাতির সহিত স্ত্রীজাতির সমান অধিকার—এই সাধারণ-মত-বিরোধী মত প্রকাশ করার পরও মিল সভ্য মনোনীত হওয়াতে স্ত্রীজাতির অধিকার কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া পড়িল।

মিল নিজ মত হইতে রেখামাত্রও বিচলিত হইলেন না, এক কপর্দ্দকও ব্যয় করিলেন না এবং কাহারও নিকট গমন করিলেন না, তথাপি তিনি শ্রমজীবিশ্রেণী কর্ত্তৃক পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য মনোনীত হইলেন। যে দিন তিনি সভ্য মনোনীত হইলেন, তাহার এক সপ্তাহ পূর্ব্বে তাঁহারা তাঁহাকে ডাকাইয়া পাঠান, ইলেক্টরেরা নানা বিষয়ে প্রশ্ন করিলেন, নানা বিষয়ে তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু সকল বিষয়েই তাঁহারা মিলের নিকট হইতে স্পষ্ট ও অপ্রতিরুদ্ধ উত্তর পাইলেন। কেবল এক বিষয়ে—অর্থাৎ তাঁহার ধর্ম্মবিষয়ক মত সম্বন্ধে—তিনি প্রথম হইতেই বলিয়াছিলেন কোন উত্তর দিবেন না; বরং প্রসন্নই হইয়াছিলেন। উত্তরের গুণাগুণ যাহাই থাকুক, ধর্ম্ম ভিন্ন সকল বিষয়েই সরল ও নির্ভীক ভাবে উত্তর দেওয়ায় মিল ইলেকটরাল সমাজের বিশেষ প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। ইহার প্রমাণস্বরূপ একটিমাত্র উদাহরণ দিলেই পাঠকগণের প্রতীতি জন্মিবে। "পার্লিয়ামেণ্টিয় সংস্কার বিষয়ে কয়েকটি চিন্তা" নামক মিল-রচিত একখানি পুস্তিকায় লিখিত ছিল যে,—যদিও অন্যান্য দেশের শ্রমজীবী অপেক্ষা ইংলণ্ডের শ্রমজীবীরা মিথ্যা কথা কহিতে কিঞ্চিৎ লজ্জাবোধ করেন, তথাপি তাঁহারা সাধারণতঃ মিথ্যাবাদী। মিলের প্রতিদ্বন্দ্বীরা এই কথাগুলি প্লাকার্ডে লিখিয়া ইলেকটরাল সমাজের সম্মুখে ধারণ করেন। এই ইলেক্টরাল সমাজ শ্রমজীবিশ্রেণীগঠিত

ছিল, সুতরাং এ কথাগুলি তাঁহাদিগের প্রীতিকর বোধ না হওয়ায়, তাঁহারা মিলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি ইহা লিখিয়াছেন কি না। মিল তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন—"লিখিয়াছি।" "লিখিয়াছি" এই শব্দটি মিলের মুখ হইতে উচ্চারিত হইতেই গভীর প্রশংসা-ধ্বনি সেই সভাকে প্রতিধ্বনিত করিল। শ্রমজীবি-শ্রেণী এতদিন পর্য্যন্ত পার্লিয়ামেণ্টে যত প্রতিনিধি পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের কেহই কখন তাঁহাদিগের প্রশ্নের অপ্রীতিকর উত্তর দিতে সাহস করেন নাই; সকলেই তাঁহাদিগের মনের কথা গোপন করিয়া, ইলেক্‌টরাল সমাজের তুষ্টিবিধানের নিমিত্ত অপ্রকৃত কথা বলিয়াছে; যাহাতে ইলেক্‌টরাল সমাজ বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট হইতে পারেন, এরূপ কথা সাহস পূর্ব্বক কেহই বলেন নাই; ইলেক্‌টরাল সমাজ এতদিন যেরূপ উত্তর শুনিয়া আসিতেছিলেন, আজ তাহার বিপরীত উত্তর শুনিলেন। ইহাতে তাঁহারা আপনাদিগকে অবমানিত মনে করিলেন না। তাঁহারা একেবারেই বুঝিতে পারিলেন এরূপ নির্ভীক ও সত্যপ্রিয় লোকই তাঁহাদিগের বিশ্বাসপাত্র হইবার প্রকৃত যোগ্য। শ্রমজীবীরা সকল বিষয়েই পূর্ণ সরলতা ভালবাসিতেন। এই গুণ থাকিলে সহস্র অপরাধও তাঁহাদিগের নিকট মার্জ্জনীয় হইত।

মিলের এই দুঃসাহসিক উত্তর শ্রবণ করিয়া মিষ্টার ওডগার নামক একজন শ্রমজীবী উঠিয়া বলিলেন যে, শ্রমজীবিশ্রেণী ইচ্ছা করেন না যে, তাঁহাদিগের প্রকৃত দোষ তাঁহাদিগের নিকট হইতে গোপন করা হয়। তাঁহারা বন্ধু চান, স্তুতিবাদক চান না। যদি কেহ প্রকৃত প্রস্তাবে বিশ্বাস করেন—শ্রমজীবিশ্রেণীতে কোন দোষ বিদ্যমান আছে ও সেই দোষের অচিরাৎ সংশোধন আবশ্যক এবং তদনুসারে তিনি তাঁহাদিগকে তদ্বিষয়ে বিদিত করেন, তাহা হইলে শ্রমজীবিশ্রেণী তাঁহার উপর বিরক্ত না হইয়া তাঁহার নিকট গুরুতর ঋণে আবদ্ধ থাকিবেন। সভাস্থ সকলেই অন্তরের সহিত ওডগারের এই কথার অনুমোদন করিলেন।

মিল যদি সভ্য মনোনীত না হইতেন, তথাপি তাঁহার আক্ষেপের কোন বিষয় ছিল না। কারণ, এই ঘটনায় দেশের অসংখ্য লোকের সহিত তাঁহার পরিচয় হইল। ইহাতে শুদ্ধ যে তাঁহার ভূয়োদর্শন পরিবর্দ্ধিত হইল, এরূপ নহে; ইহাতে তাঁহার রাজনৈতিক মত সকল বিস্তৃতরূপে প্রচারিত হইল এবং যে যে স্থানে পূর্ব্বে তাঁহার নামও শ্রুত হয় নাই, সেই সেই স্থানে তিনি বিশেষরূপে পরিচিত হওয়ায়, তাঁহার পাঠক-সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল এবং তাঁহার রচনার প্রভাবও অধিকতর অনুভূত হইতে লাগিল। পার্লিয়ামেণ্টের যে তিন অধিবেশনে 'রিফরম বিল' রাজবিধিতে পরিণত হয়, সেই তিন অধিবেশনেই মিল পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য ছিলেন। এই সময়ে পার্লিয়ামেণ্টই মিলের চিন্তার একমাত্র বিষয় ছিল। মিল প্রায়ই পার্লিয়ামেণ্টে বক্তৃতা করিতেন। এই বক্তৃতা সকল তিনি কখন কখন লিখিয়া লইয়া যাইতেন, অনেক সময় মুখে মুখেই করিতেন। পার্লিয়ামেণ্টের কার্য্য-প্রণালীর সংস্রবে আসিবার মিলের একটি প্রধান নিয়ম ছিল। অপরের দ্বারা যে সকল বিষয় সুসম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা ছিল, সে সকল বিষয় তাঁহার প্রিয়মত হইলেও, তিনি তাহাতে হস্তক্ষেপ করা অনাবশ্যক বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু যে সকল বিষয়ে লিবারেলমতাবলম্বী ব্যক্তিরাও তাঁহার সহিত ভিন্নমত বা উদাসীন, সেই সকল বিষয় সমর্থনের নিমিত্তই তিনি বদ্ধপরিকর হইতেন। এই সময় প্রাণদণ্ডের বিরুদ্ধে পার্লিয়ামেণ্টে যে আন্দোলন উপস্থিত হয়, মিল প্রাণপণে তাহার পক্ষসমর্থন করেন। পার্লিয়ামেণ্টে স্ত্রীজাতির প্রতিনিধি-প্রেরণ ও ব্যক্তিগত প্রতিনিধিত্ব-বিষয়ে তিনি যে মত প্রকাশ করেন, তাহা তৎকালে পার্লিয়ামেণ্টের সভ্যগণ কর্ত্তৃক তাঁহার নিজের খেয়াল বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু পার্লিয়ামেণ্টের সভ্যগণ অচিরাৎ জানিতে পারেন যে, স্ত্রীজাতির প্রতিনিধি-প্রেরণ-প্রস্তাব তাঁহার খেয়ালমাত্র নহে। কারণ, মিল পার্লিয়ামেণ্টে এই প্রস্তাব উত্থাপিত করিলেই রাজ্যের চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহার প্রস্তাবের অনুমোদন-সূচক প্রতিধ্বনি আসিতে লাগিল। সুতরাং এ প্রস্তাব যে সময়োপযোগী, তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণীকৃত হইল। মিল যে বিষয়ে শুদ্ধ নৈতিক ও সামাজিক কর্ত্তব্য বলিয়া নিঃস্বার্থভাবে অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার স্বার্থ-সিদ্ধিতে পরিণত হইল। তিনি যে শুদ্ধ পার্লিয়ামেণ্টেরই বিরাগ-ভাজন হইবেন, দেশের সমস্ত লোকের উপহাসের পাত্র হইবেন। এরূপ জানিয়াও তিনি কর্ত্তব্যানুরোধে এ প্রস্তাব উত্থাপিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে এই প্রস্তাবে তিনি দেশের

লোকের অপ্রিয় না হইয়া, অধিকতর প্রিয় হইয়া উঠিলেন ; ইংলণ্ডের স্ত্রীসমাজের চিরকৃতজ্ঞতার পাত্র হইলেন।

রাজধানীর সভ্য বলিয়া, তাঁহার উপর আর একটি গুরুতর কর্ত্তব্যভার ন্যস্ত হইয়াছিল ; রাজধানীতে মিউনিসিপাল শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠাপিত করিবার জন্য তাঁহাকে বিশেষ চেষ্টা করিতে হইয়াছিল ; কিন্তু এই বিষয়ে হাউস অব কমন্সের এত দূর ঔদাসীন্য ছিল যে, তিনি একজন সভ্যকেও আত্ম-পক্ষসমর্থক পাইলেন না। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এ বিষয়ে তিনি পার্লিয়ামেণ্টের বাহিরে অনেক সাহায্য পাইয়াছিলেন। এক দল কর্ম্মঠ বুদ্ধিমান লোক বাহির হইতে নানা প্রকারে তাঁহার সাহায্য করিতেছিলেন। তাঁহারা পার্লিয়ামেণ্টের বাহিরে এ বিষয়ে ঘোরতর আন্দোলন উত্থাপিত করিতেছিলেন। অধিক কি, বলিতে গেলে, এ প্রস্তাবের মূল তাঁহারাই। তাঁহারাই ইহার পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত করিয়া মিলের হস্তে সমর্পণ করেন। মিলকে কেবল সেই পাণ্ডুলেখ্য পার্লিয়ামেণ্ট-সকাশে উপনীত করিতে এবং যতক্ষণ সেই পাণ্ডুলেখ্য হাউস-নির্দ্দিষ্ট কমিটীর নিকট ছিল, ততক্ষণ তাহার পক্ষসমর্থন করিতে হইয়াছিল মাত্র। অবশেষে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে এই পাণ্ডুলেখ্য যে বিভিন্ন আকারে রাজবিধিতে পরিণত হয়, তাহার কারণ—এই আন্দোলন। যে সকল বিষয় এক দিকে সাধারণ হিত এবং এক দিকে ব্যক্তিগত বা সাম্প্রদায়িক হিতের পরস্পর সংঘর্ষ উত্থিত হয়, সে সকল বিষয় কিছুদিন এইরূপই যবস্থব অবস্থায় থাকে ; পরিশেষে সাধারণ হিতেরই জয়লাভ হয়।

তৎকালে অগ্রগত লিবারালিজম পার্লিয়ামেণ্ট অতিশয় উৎসাহের বিষয় ছিল ; এই জন্য প্রধান লিবারেল মতাবলম্বী হাউসের সভ্যেরাও এই মতের সমর্থনে অগ্রসর হইতে সাহস করিতেন না। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, পার্লিয়ামেণ্টে যে কার্য্য অপরের দ্বারা সংসাধিত হইবার নহে, তাহাতেই হস্তক্ষেপ করা মিলের নিয়ম ছিল। সেই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া, তিনি অগ্রগত লিবারালিজম মতের সমর্থনে প্রবৃত্ত হইলেন। এই জন্যই এক জন আইরিস সভ্য কর্ত্তৃক আয়র্লণ্ডের স্বাপক্ষে যে সকল পরিবর্ত্তন প্রস্তাবিত হয়, মিল সে সকলের পক্ষসমর্থন করিলেন। বিখ্যাত বাগ্মিক মিষ্টার ব্রাইট্, মিষ্টার ম্যাক্লারেন, মিষ্টার পটার এবং মিষ্টার হাডফীল্ড এই চারি জন ভিন্ন পার্লিয়ামেণ্টে আর কোন সভ্যই তাহার অনুসরণ করিতে সাহস করেন নাই। আয়র্লণ্ডে 'হেবিয়স কর্পস' বিধি কিছু দিনের জন্য রহিত হয়, সেই নির্দ্দিষ্ট সময়ের অবসান হইলে আয়র্লণ্ডের শত্রুরা আরও কিছু দিন তাহা স্থগিত রাখিবার জন্য প্রস্তাব করেন। মিল এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। এই উপলক্ষে তিনি আয়র্লণ্ডের প্রতি ইংলণ্ডের অবিচার ও আয়র্লণ্ডে ইংরাজপ্রবর্ত্তিত শাসনপ্রণালীর দোষ সকল স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু তৎকালে ফেনীয়ান্‌দিগের প্রতি ইংলণ্ডের জনসাধারণের রাগ এতদূর প্রবল ছিল যে, ফেনীয়ানেরা ইংলণ্ডের যে সকল অবিচার-অত্যাচারের উপর ভীষণ আক্রমণ করিয়াছিলেন, সে সকলের উপর আক্রমণ করা আর ফেনীয়ানদিগের উৎসাহবর্দ্ধন করা সমান বলিয়া বিবেচিত হইত। এইজন্য মিলের প্রস্তাবে কেহই কর্ণপাত করিলেন না। মিলের বন্ধু-বান্ধবেরা তাঁহাকে কিছুদিন অপেক্ষা করিতে বলেন। মিলও তাঁহাদিগের উপদেশের সারগর্ভতা বুঝিলেন এবং 'রিফরম বিলের' সাধারণ তর্ক-বিতর্কের সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীরা তাঁহার তূষ্ণীভাব দেখিয়া মনে করিলেন, মিল পরাভূত হইয়াছেন ; সুতরাং তাঁহার জন্য তাঁহাদিগকে আর উদ্বিগ্ন হইতে হইবে না। তাঁহার মিলের এই কল্পিত পরাভব লইয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া অনেক রহস্য-বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই রহস্য-বিদ্রূপেই মিলের পরিণাম শুভকর হইয়া উঠিল। যাঁহারা আয়র্লণ্ডের বিষয়ে পূর্ব্বে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন, মিল্ অন্যায়রূপে অবমানিত হইতেছেন দেখিয়া, তাঁহারাও মিল-কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত বিষয়ের প্রতি সহানুভূতি দেখাইতে লাগিলেন। এই জন্য 'রিফরম বিলের' আলোচনার সময় মিল যখন দ্বিতীয়বার আয়র্লণ্ডের স্বাপক্ষে বক্তৃতা করিলেন, তখন তাঁহারা বক্তৃতা অধিকতর সমাদৃত হইল। পার্লিয়ামেণ্টে তাঁহার সম্মান ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। ক্রমেই তাঁহার শ্রোতৃ-বর্গের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি জাতীয় ঋণের পরিশোধের স্বাপক্ষে যে বক্তৃতা করেন এবং টোরি অধিনায়কদিগের প্রতি যে সোৎপ্রাসোক্তি প্রয়োগ করেন, তাহাতে পার্লিয়ামেণ্টে তাঁহার প্রতিষ্ঠা অধিকতর পরিবর্দ্ধিত হয়। তিনি তদীয় প্রতিনিধি-শাসন

প্রণালী গ্রন্থের কোন স্থানে স্থিতিশীলদিগকে বুদ্ধিশূন্য দল" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। তাঁহারা এই বিষয় লইয়া, তাঁহার প্রতি ভীষণ আক্রমণ করেন। কিন্তু তাহাতে মিলের কোন অপকার না হইয়া, তাহাদিগেরই সবিশেষ অপকার হইল। এই আন্দোলনে এখন হইতে সকলেই তাহাদিগের নামের সহিত "বুদ্ধিশূন্য দল" এই পরিচায়ক বিশেষণ সংযোজিত করিতে লাগিল। যাহা হউক, "তাঁহার কথাতে কেহই কর্ণপাত করিবেন না" পার্লিয়ামেণ্ট প্রবেশের সময় মিলের মনে যে এইরূপ ভয় সঞ্চারিত হয়, সে ভয় এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে অপনীত হইল। তিনি কোন বিষয় বলিতে আরম্ভ করিলে এখন আর শ্রোতৃসংখ্যার অভাব থাকিত না। তথাপি তিনি তদীয় নির্দ্দিষ্ট নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া পরিমিতভাষী হইলেন। যে সময়ে বিশেষরূপে বক্তৃতা প্রয়োজনীয়, সেই বিষয়েই তিনি বাক্য-ব্যয় করিতে লাগিলেন এবং যাহা অন্য দ্বারাও সুসম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা, তাহা হইতে সর্ব্বথা বিরত থাকিতে লাগিলেন। পার্লিয়ামেণ্টের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধিবেশনের সময় তিনি যতগুলি বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে আয়র্লণ্ড, শ্রমজীবিশ্রেণী এবং মিষ্টার ডিজ্‌রেলীর রিফরম বিলবিষয়ক বক্তৃতা-ত্রয়ই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

আয়র্লণ্ড ও শ্রমজীবিশ্রেণী-বিষয়ক প্রস্তাবদ্বয় তাঁহার হৃদয়ের অতি প্রিয়বস্তু ছিল। তিনি গ্লাডষ্টোনের রিফরম বিল উপলক্ষ করিয়া শ্রমজীবিশ্রেণীর পার্লিয়ামেণ্টে প্রতিনিধি-প্রেরণ বিষয়ে এক উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করেন। ইহার অব্যবহিত পরে লর্ড রসেলের মন্ত্রিত্বপদ-পরিত্যাগ এবং টোরি গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রিত্বপদে অধিরোহণের পর শ্রমজীবিবিশ্রেণী কর্ত্তৃক হাইড পার্কে একটি সাধারণ সভা আহূত হয়। পুলিসকর্ম্মচারীরা সমবেত ব্যক্তিদিগের গতিরোধ করায়, তাহারা রেল ভাঙ্গিয়া পার্কের ভিতর প্রবেশ করে। মিষ্টার বীলস এবং শ্রমজীবীদিগের অধিনায়কেরা পুলিসের প্রতিরোধে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন বটে, কিন্তু অধিকাংশই তথা হইতে যাইতে অস্বীকৃত হইলেন। ইহাতে পুলিসের সহিত তাঁহাদিগের ঘোরতর বিবাদ বাধিয়া উঠিল। অনেকগুলি নিরীহ ব্যক্তি পুলিস কর্ত্তৃক অপমানিত হইলেন। এই ঘটনায় শ্রমজীবিশ্রেণীর ক্রোধের আর পরিসীমা রহিল না। তাঁহারা দ্বিতীয়বার পার্কে সভার আহ্বানের সঙ্কল্প করিলেন এবং অনেকেই সশস্ত্র আসিতে স্বীকৃত হইলেন। গবর্ণমেণ্টও এই সংবাদ পাইয়া এই উদ্যম-নিবারণের জন্য সৈনিক-সজ্জা আরম্ভ করিলেন। এই সংঘর্ষের পরিণাম অতি ভয়ঙ্কর বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল। এই ভয়ঙ্কর পরিণাম-নিবারণের জন্য মিলের বলবতী চেষ্টা ফলবতী হইল। মিল পার্লিয়ামেণ্টে শ্রমজীবিশ্রেণীর পক্ষসমর্থন করিলেন এবং গবর্ণমেণ্টের ব্যবহার নিন্দনীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। এ দিকে শ্রমজীবিশ্রেণীকে বলিলেন, তাঁহারা হাইড পার্কে সভা আহ্বানের প্রস্তাব পরিত্যাগ করুন। তাঁহাকে,—বীলস, কর্ণেল ডিকেন্‌স প্রভৃতি অধিনায়কদিগকে এ প্রস্তাবে সম্মত করিতে চেষ্টা করিতে হয় নাই। কারণ, তাঁহারা প্রথম হইতেই ইহাতে ক্ষান্ত হইয়াছিলেন এবং আর সকলকেও ক্ষান্ত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন। তথাপি শ্রমজীবিশ্রেণী তাঁহাদিগের প্রথম সঙ্কল্প হইতে কিছুতেই বিচলিত হইলেন না। মিল অবশেষে এক উপায় অবলম্বন করিলেন। তিনি বলিলেন, হাইড পার্কে দ্বিতীয়বার সভা সন্নিবেশিত করিতে গেলে নিশ্চয়ই সৈনিকদলের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হইবে; এই সংঘর্ষ দুই অবস্থায় মাত্র ক্ষমণীয় হইতে পারে; প্রথমতঃ যদি কার্য্যস্রোত এরূপ অবস্থায় আনীত হইয়া থাকে যে, আকস্মিক বিপ্লব প্রার্থনীয়, —দ্বিতীয়তঃ যদি তাঁহারা আপনাদিগকে সেই বিপ্লব সংশোধন করিতে সমর্থ বলিয়া মনে করেন। শ্রমজীবিশ্রেণী এই প্রশ্নে নীরব হইলেন। আকস্মিক বিপ্লব প্রার্থনীয় বা তাঁহারা তৎসম্পাদনে সমর্থ—এ কথা তাঁহারা বলিতে পারিলেন না; সুতরাং অনেক তর্ক-বিতর্কের পর, তাঁহারা মিলের প্রস্তাবে সম্মত হইতে বাধ্য হইলেন। মিল এই সমাচার মন্ত্রিবর ওয়াল্‌পোলের কর্ণগোচর করিলেন। এই সংবাদ-শ্রবণে ওয়াল্‌পোলের মস্তক হইতে যেন গুরুতর ভার অপনীত হইল এবং মিলের প্রতি তাঁহার কৃতজ্ঞতার আর ইয়ত্তা রহিল না।

শ্রমজীবিরা হাইড পার্ক বিষয়ে হতাশ হইয়া অবশেষে 'এগ্রিকল্‌চরল' হলে সভা আহ্বান করা স্থির করিলেন। তাঁহারা মিলকে তাঁহাদিগের সভায় উপস্থিত থাকিতে এবং বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করেন। তাঁহারা মিলের অনুরোধ রাখিয়াছেন; সুতরাং মিল তাঁহাদিগের অনুরোধ অবহেলা করিতে পারিলেন না। পার্লিয়ামেণ্টে এবং এই সকল সভায় বক্তৃতা করিবার

সময় মিল সবিশেষ উত্তেজিত হইয়া পড়েন এবং আত্ম-সংযম ভুলিয়া যান—টোরি লেখকেরা মিলের উপর এই বলিয়া গালি-বর্ষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু টোরি-দলের জানা উচিত যে, মিলের বক্তৃতার উত্তেজনী শক্তি ব্যতীত তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত ভয়ঙ্কর বিপৎপাতের হস্ত হইতে রক্ষা পাইতেন না। সে সময়ে মিল, গ্লাডষ্টোন এবং ব্রাইট্—এই তিন জন ভিন্ন আর কেহই শ্রম-জীবীদিগকে এই ভীষণ সংঘর্ষ হইতে বিরত করিতে পারিতেন না। কিন্তু ব্রাইট্ তৎকালে নগরে উপস্থিত ছিলেন না এবং গ্লাডষ্টোন্ কোন বিশেষ কারণে ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন; একমাত্র মিল ব্যতীত টোরিদিগকে সেই বিপদ্ হইতে রক্ষা করিবার আর কেহই ছিলেন না।

কিছুদিন পরে শ্রমজীবিশ্রেণীর অভ্যুত্থানের প্রতিশোধ লইবার জন্য টোরি গবর্ণমেণ্ট পার্ক সাধারণ সভা আহ্বান-বিষয়ক এক বিল অবতারিত করিলেন। মিল শুদ্ধ স্বয়ং এই বিলের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াই ক্ষান্ত রহিলেন, এরূপ নহে; তিনি অনেকগুলি অগ্রগত লিবারেল্‌কে ইহার বিরোধী করিয়া তুলিলেন এবং আপনি তাঁহাদিগের অধিনায়ক হইয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের সমবেত যত্নে বিল পরাভূত হইল। টোরিরা এ বিষয়ে আর দ্বিতীয়বার হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করিলেন না।

মিল আয়র্লণ্ড বিষয়ে সবিশেষ মনোযোগ-প্রদর্শন করা ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন। পার্লিয়ামেণ্টীয় সভ্য-দিগের যে দল মন্ত্রিবর লর্ড ডর্বীর নিকট ফেনীয় বিদ্রোহী সেনাপতি বর্কের জীবন ভিক্ষা করিতে যান, তিনি তাঁহাদিগের সর্ব্বপ্রধান ছিলেন। এই দলের অধিনায়কেরা ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের পার্লিয়ামেণ্টের অধি-বেশনের সময় আয়র্লণ্ডের চর্চ্চ-বিষয়ক প্রশ্ন এরূপ পারদর্শিতার সহিত করায়ত্ত করেন যে, মিলকে এ বিষয়ে শুদ্ধ তাঁহাদিগের স্বপক্ষতা অবলম্বন ভিন্ন আর কিছুই করিতে হয় নাই। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে লর্ড রসে-লের মন্ত্রিত্ব-কালে আয়র্লণ্ডের ভূমিসংস্কার বিষয়ে যে বিল প্রস্তাবিত হয়, তদুপলক্ষে মিল একটি উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করেন। তৎকালে ভূমি বিষয়ে অনেক কুসংস্কার বশতঃ সেই বিল প্রত্যাখ্যাত হয়। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড ডর্বীর মন্ত্রিত্বকালে পুনরায় সেইরূপ আর একটি বিল অবতারিত হয়। এ বিলটিও প্রথম বিলটির ন্যায় দ্বিতীয়বার পাঠনার পর, প্রত্যাহৃত হয়। ইত্যবসরে আইরিস প্রজাদিগের মনের অবস্থা দিন দিন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিষাক্ত হইয়া উঠিল। তাঁহারা আর এক্ষণে অল্পে সন্তুষ্ট হইতে চাহিলেন না। ইংলণ্ড হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হওয়াই তাঁহাদের একমাত্র প্রার্থনা এবং একমাত্র ইচ্ছা হইয়া উঠিল। যাঁহা-দিগের চক্ষু ছিল, তাঁহারা দেখিলেন, কি রাজনৈতিক, কি সামাজিক, সকল বিষয়েই সম্পূর্ণ সংস্কার ব্যতীত আয়র্লণ্ডকে আর শান্ত করিবার উপায়ান্তর নাই। মিল দেখিলেন, এই ভয়ঙ্কর বিপদের সময় তিনি নীরব থাকিলে, অধিকতর অনিষ্টের সম্ভাবনা। এই ভাবিয়া তিনি লেখনী ধারণ করিলেন; এবং "ইংলণ্ড ও আয়র্লণ্ড" নামক একটি প্রস্তাব লিখিয়া ১৮৬৮ খৃষ্টা-ব্দের পার্লিয়ামেণ্টীয় অধিবেশনের অব্যবহিত পূর্ব্বে একখানি ক্ষুদ্র পত্রিকাকারে প্রকাশিত করেন। এই প্রস্তাবে এক দিকে আয়র্লণ্ডকে বিশেষ যুক্তি-প্রদ-র্শন পূর্ব্বক প্রতিপন্ন করা হইল, ইংলণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া তাঁহার পক্ষে শুভকর নয়; এবং অন্য দিকে পার্লিয়ামেণ্টকে বিশেষ অনুরোধ করা হইল, যেন আয়র্লণ্ডের ভূমিবিষয়ক ও অন্যান্য প্রশ্নের অচিরাৎ সুমীমাংসা করা হয়। এই পত্রিকায় তিনি আয়র্লণ্ডের প্রজাদিগকে নির্দিষ্ট করে ভূমিতে স্থায়ী স্বত্ব প্রদানের এবং কোন্ কোন্ ভূমির উপরে কিরূপ কর নির্দিষ্ট হওয়া উচিত, তন্নির্ণয়ার্থ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক আসেসর নিয়োগের প্রস্তাব করেন।

মিলের প্রস্তাব আয়র্লণ্ড ভিন্ন আর কুত্রাপি আদৃত হইল না। ইহা যে ইংলণ্ডে আদৃত হইবে, মিল সে আশাও করেন নাই। তিনি যে সকল সংস্কারের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, সেই সকল সংস্কার অনুষ্ঠিত না হইলে, আয়র্লণ্ডে যে শান্তি সংস্থাপিত হইবে না—তিনি তাহা অসন্দিগ্ধরূপে জানিতেন। এই জন্যই তিনি এ স্থলে কিছু না বলিয়া নীরব থাকা পাপ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। আর বিশেষতঃ তিনি জানিতেন যে, পূর্ণ আদর্শ সম্মুখে ধারণ করিলে লোক তত দূর অগ্রসর হইতে না পারুক্, অন্ততঃ মধ্যস্থল পর্য্যন্তও গমন করিবে। মিলের এই পত্রিকা প্রচারিত না হইলে গ্লাড্‌ষ্টোনের আইরিস বিল কখনই পার্লিয়ামেণ্টে অনু-মোদিত হইতে পারিত না। আয়র্লণ্ডের ঘটনা এত গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে যে, অচিরাৎ গুরুতর সংস্কার সম্পাদিত না হইলে, ভয়ঙ্কর অনিষ্টপাতের

সম্ভাবনা এবং সেই সংস্কার সংসাধনের জন্য কতকগুলি সম্ভ্রান্ত লোক দলবদ্ধ হইয়াছেন,—ইংলণ্ডের প্রজাদিগের মনে এরূপ প্রতীতি জন্মিয়াছে, না জানিলে, গ্লাড্‌ষ্টোনের আইরিস বিল পার্লিয়ামেণ্টে অবতারিত হইয়াই প্রত্যাখ্যাত হইত। ব্রিটিশ প্রজাসাধারণের অন্ততঃ উচ্চ এবং মধ্য শ্রেণীর এই একটি প্রকৃতিগত ধর্ম্ম যে,—কোন একটিপরিবর্ত্তনের অনুমোদন করিতে হইলে, তাঁহার অগ্রে জানিতে চান, সেই পরিবর্ত্তনটি মাধ্যমিক কি না। তাঁহারা পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব-মাত্রকেই প্রথমে চরম ও সমাজদ্রোহী বলিয়া মনে করেন। কিন্তু যখন এমন দুইটি পরিবর্ত্তন প্রস্তাবিত হয়, যাহার একটি অন্যটি অপেক্ষা অধিকতর অগ্রগত, তখন তাঁহারা প্রথমোক্তটিকে চরম ও সমাজদ্রোহী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়া, শেষোক্তটিকে মাধ্যমিক বলিয়া অবলম্বন করেন। এখানেও ঠিক সেইরূপ ঘটিল। মিলের প্রস্তাবটি চরম বলিয়া পরিত্যক্ত হইল বটে, কিন্তু গ্লাড্‌ষ্টোনের প্রস্তাব অপেক্ষাকৃত মাধ্যমিক বলিয়া অবলম্বিত হইল। মিলের প্রস্তাব অগ্রে প্রস্তাবিত না হইলে, গ্লাড্‌ষ্টোনের বিলও চরম বলিয়া পরিত্যক্ত হইত।

আয়র্লণ্ড-বিষয়ে মিলের যে পত্রিকা প্রচারিত হয়, তাহাতে লিখিত ছিল,—গবর্ণমেণ্ট নির্দ্দিষ্ট করে ভূমির উপর প্রজাদিগের চিরস্থায়ী স্বত্ব সংস্থাপিত করিবেন। ইহাতে যদি ভূম্যধিকারীরা অসন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে তাঁহারা ইচ্ছা করিলে গবর্ণমেণ্টের নিকট উচিত মূল্যে তাঁহাদিগের ভূমি-সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারেন; অথবা ইচ্ছা করিলে তাঁহারা প্রজাদিগের সহিত পূর্ব্বোক্ত সম্বন্ধ রক্ষা করিতে পারেন। মিল জানিতেন,—ভূম্যধিকারীরা এরূপ নির্দ্দিষ্ট নিয়মেও তাহাদিগের ভূসম্পত্তি রক্ষা করিবেন, তথাপি গবর্ণমেণ্টের মাসোহারা ভোগী হইবেন না কিন্তু লোকে মিলের প্রস্তাবের মর্ম্ম বুঝিয়াও বুঝিলেন না। তাঁহারা মিলের প্রস্তাবের মর্ম্ম বিভিন্ন অর্থে গ্রহণ ও প্রচার করিলেন। তাঁহারা এরূপ রটনা করিলেন,—মিল গবর্ণমেণ্টকে আয়র্লণ্ডের সমস্ত সম্পত্তি ক্রয় করিয়া লইয়া একমাত্র ভূম্যধিকারী হইতে উপদেশ দিতেছেন। মিল মিষ্টার মাগায়ারের প্রস্তাব ও মিষ্টার ফর্টেস্কুর বিল উপলক্ষে পূর্ব্বোক্ত ভ্রম-সংশোধনার্থ দুইটি বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতাদ্বয় মিলের অনুমতিক্রমে আয়র্লণ্ডে প্রকাশিত হয়।

এই সময় আর একটি গুরুতর কর্ত্তব্যভার মিলের মস্তকে ন্যস্ত হয়। এই সময় জামেকায় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান হয়। অভ্যুত্থান ইংলণ্ডের অবিচার দ্বারা প্রথম উত্তেজিত হইয়া, অবশেষে ভয়ে ও ক্রোধে বিদ্রোহে পরিণত হয়। এই সূত্রে জামেকার অসংখ্য নির্দ্দোষ লোকের জীবন 'কোর্টস্ মার্সেলের' আদেশে নৃশংস সৈনিকপুরুষ দ্বারা নির্দ্দয়রূপে হত হয়। বিদ্রোহ নিবারিত হইলেও অনেক দিন পর্য্যন্ত এই 'কোর্টস্ মার্সেল' উপবিষ্ট থাকে। অসি নিষ্কোশিত ও বন্দুকাদি নির্ম্মুক্তমুখ হইলে, যে সকল ভয়ঙ্কর বিশৃঙ্খল কাণ্ড সংঘটিত হওয়ায় সম্ভাবনা, এ ক্ষেত্রে সে সমস্তই ঘটিয়াছিল। লোকের প্রাণ, মান কিছুই নিরাপদ ছিল না। যে ব্যক্তি সম্পত্তি-বিহীন অথচ সন্দেহপাত্র, সে শাণিত অসির খরধারে বা বন্দুক-মুখে পতিত হইল। বালবনিতা বেত্রাহত হইল। অত্যাচারের আর সীমা-পরিসীমা রহিল না। ইংলণ্ডের যে সকল লোক এত দিন নিগ্রো-দাসত্বের সমর্থন করিয়া আসিতেছিল, তাহারাই এই ঘাতুকদিগের নৃশংস কর্ম্মকাণ্ডের পক্ষ-সমর্থন করিতে লাগিল। মিল দেখিলেন, এরূপ ঘটনা বিনা দণ্ডে যাইতে দিলে ইংলণ্ডের বিপুল যশে একটি গভীর কলঙ্ক রেখা পতিত হইবে। এই জন্য তিনি পার্লিয়ামেণ্টের অভ্যন্তরে ও বাহিরে এই বিষয়ে ঘোরতর আন্দোলন উত্থাপিত করিলেন। এই আন্দোলন উত্থাপিত করার পর কোন কার্য্যবশতঃ তাঁহাকে স্থানান্তরে যাইতে হয়। তিনি তথা হইতে শুনিলেন যে, জামেকার স্বাপক্ষে কতকগুলি ভদ্রলোক দলবদ্ধ হইয়াছেন। জামেকার বিষয় সবিশেষ অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত ও তৎপক্ষে যাহা কর্ত্তব্য, তদনুষ্ঠানের নিমিত্ত তাঁহারা একটি সভা সংস্থাপন করিয়াছেন। এই সভার নাম তাঁহারা জামেকা কমিটী রাখিয়াছেন এবং চতুর্দ্দিক্ হইতে এই সভার সভ্যসংখ্যা পাইতেছেন। এই সংবাদে মিলের আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি সেই স্থানান্তর হইতেই সেই সভার সভ্য-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইবার নিমিত্ত নিজ নাম প্রেরণ করিলেন এবং অচিরকাল-মধ্যেই নগরীতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া এই সভার কার্য্যসম্পাদন জন্য স্বয়ং বিশেষ শ্রম ও যত্ন করিতে লাগিলেন। জামেকার এই ঘটনা যদি অন্য কোন গবর্ণমেণ্ট দ্বারা অনুষ্ঠিত হইত, তাহা হইলে ইংলণ্ডের অধিবাসীরা তাহার প্রতি ঘৃণা-প্রদর্শন

করিতে ত্রুটি করিতেন না। কিন্তু এই শোচনীয় ব্যাপার ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট দ্বারা অনুষ্ঠিত হওয়ায় তাঁহাদিগের মুখে আর কথা নাই। তাঁহারা শুদ্ধ তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক ইহার অনুমোদন করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন এরূপ নহে, স্পষ্টাক্ষরে ইহার সমর্থন করিতেও লজ্জা বোধ করেন নাই।

মিল্ দেখিলেন, এই ঘটনা দ্বারা শুদ্ধ নিগ্রোদিগেরই প্রতি ন্যায়পরতার ব্যাঘাত সম্পাদিত হইয়াছিল, এরূপ নহে; ইহা দ্বারা গ্রেটব্রিটেন ও ইহার অধীন দেশ সকলেরও স্বাধীনতার লোপ হইবার সম্ভাবনা হইয়া উঠিল। এক্ষণে এই প্রশ্ন অভ্যুত্থিত হইল যে, ব্রিটিশ প্রজারা কোন নির্দ্দিষ্ট দণ্ডবিধির অধীন, কি সৈনিক যথেচ্ছাচারের অধীন? ব্রিটিশ প্রজাদিগের দেহ ও জীবন এখন হইতে দুই বা তিন জন ভূয়োদর্শন-বিরহিত অপরিণতবুদ্ধি বিশৃঙ্খলস্বভাব নৃশংস সৈনিক পুরুষের দয়ার উপর নির্ভর করিবে, কি নির্দ্দিষ্ট নিয়মাবলীর উপর নির্ভর করিবে? কোন গবর্ণর বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত রাজকর্ম্মচারী ইচ্ছা করিলেই দুই তিন জন অজাতশ্মশ্রু সৈনিকপুরুষের উপর প্রজাদিগের দেহ-প্রাণ সমর্পণ করিতে পারিবেন কি না? এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা কেবল বিচারালয় দ্বারাই হইতে পারে। এই জন্য জামেকা কমিটী এই সকল প্রশ্নের মীমাংসার জন্য বিচারালয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

কমিটী স্থির করিলেন যে জামেকার গবর্ণর আয়ার (Eyre) এবং তাঁহার প্রধান প্রধান সহযোগীদিগের নামে ইংলণ্ডের ফৌজদারী আদালতে অভিযোগ করিতে হইবে। সভাপতি চার্লস বক্স্টন ইহাতে স্বীকৃত না হওয়ায় সভাপতির পদ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন। এই শূন্য আসনে মিল অভিষিক্ত হন। মিল পার্লিয়ামেণ্টে এই সভার প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন। কখন বা তাঁহাকে গবর্ণমেণ্টের নিকট নানা বিষয়ে প্রশ্ন করিতে হইত, কখন বা তাঁহাকে কমিটীর প্রতিনিধি বলিয়া পার্লিয়ামেণ্টের সভ্যদিগের নিকট হইতে ক্রোধোদ্দীপক কর্কশবাক্য সকল শুনিতে হইত। বক্স্টন্ জামেকা-বিষয়ক প্রস্তাব উত্থাপিত করিলে, মিল তদুপলক্ষে যে বক্তৃতা করেন, তাহা এতাবৎকাল পর্য্যন্ত মিল পার্লিয়ামেণ্টে যতগুলি বক্তৃতা করিয়াছিলেন—তাহার মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কমিটী প্রায় দুই বৎসরকাল এই বিষয়ের জন্য ঘোরতর লড়িলেন; ফৌজদারী আদালতে আইন অনুসারে যত কিছু চেষ্টা সম্ভব, সমস্তই করিলেন; কিন্তু কিছুতেই বিশেষ ফলোদয় হইল না। ইংলণ্ডের একটি টোরি কাউন্টির ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের নিকট এই মোকদ্দমা উপস্থিত করাইলে তাঁহারা ইহা ডিস্মিস্ করিলেন। কিন্তু রাজধানীর ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের নিকট এই নালিশ উত্থাপিত হওয়ায় তাঁহারা এই নালিশ গ্রাহ্য করিয়া কুইন্স বেঞ্চের লর্ড চীফ জষ্টিস সার আলেকজাণ্ডার ককবরনের নিকট বিচারার্থ সমর্পণ করিলেন। ককবরন্ চার্জ্জ প্রদানের সময় এই বিষয়ে বিধি সংস্থাপিত করিয়া দেন। এই বিধি স্বাধীনতার অনুকূলেই হইল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ওলড বেলীর গ্রাণ্ড জুরী দ্বারা জামেকা কমিটী কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত বিল প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় এই মোকদ্দমার বিচার হইতে পারিল না। ইংলণ্ডের রাজকর্ম্মচারীরা নিগ্রো প্রভৃতির প্রতি প্রভুশক্তির অসদ্ব্যবহার করিয়া ইংলণ্ডের কোন ফৌজদারী আদালতে দণ্ড প্রাপ্ত হন, ইহা ইংলণ্ডের অধিবাসীদিগের অতিশয় অপ্রীতিকর। যাহা হউক, কমিটীর চেষ্টায় একটি বিশেষ উপকার হইল। নিম্নলিখিত কয়েকটি কারণে ইংলণ্ডের চরিত্র কিয়ৎপরিমাণে সংরক্ষিত হইল। (১) সকলে জানিতে পারিল যে, ইংলণ্ডের অন্ততঃ এমন কতক মনীষী আছেন, যাঁহারা—যাহাতে উৎপীড়িতদিগের প্রতি সদ্বিচার হয়—তজ্জন্য কোন উপায়ই অনবলম্বিত রাখিবেন না। (২) ইংলণ্ডের সর্ব্বোচ্চ ফৌজদারী আদালত স্বাধীনতার স্বপক্ষে এক অবিসংবাদিত বিধি প্রচার করিলেন। (৩) রাজকর্ম্মচারীদিগকে সাবধান করা হইল যে, তাঁহারা যেন ইহার পর এরূপ নৃশংসকার্য্যে প্রবৃত্ত না হন; তাঁহারা ফৌজদারী আদালতে দণ্ডের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারেন; কিন্তু তজ্জন্য ইহাঁদিগকে অন্ততঃ যে ব্যয় ও যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে, তাহা নিতান্ত সামান্য হইবে না।

যৎকালে জামেকা বিষয়ে এরূপ আন্দোলন চলিতেছিল, তৎকালে মিল নানা স্থান হইতে নানা প্রকার বেনামী চিঠি প্রাপ্ত হন। ইংলণ্ডের নৃশংস অধিবাসীদিগের মধ্যে অনেকেই যে নৃশংসহৃদয় এবং তাহাদিগের অনেকের যে জামেকার হত্যাকাণ্ডের সহিত সম্পূর্ণ সহানুভূতি ছিল, পত্রগুলি তাহার নিদর্শন। এইগুলিতে মিলের প্রতি নানা প্রকার

রহস্য বিদ্রূপ ও কটূক্তি প্রযুক্ত হয় এবং অধিক কি, তাঁহার প্রতি গুপ্তহত্যার ভয় পর্য্যন্তও প্রদর্শিত হয়।

মিল পার্লিয়ামেণ্টে অনেকগুলি মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। তন্মধ্যে পূর্ব্বোল্লিখিত আয়র্লণ্ড ও জামেকা বিষয়ক প্রস্তাব ও নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের পার্লিয়ামেণ্টীয় অধিবেশনের শেষভাগে একটি একষ্ট্রাডিসন্ বিল প্রস্তাবিত হয়। রাজনৈতিক পলাতকদিগকে বিদ্রোহ অপরাধের জন্য তাঁহাদিগের গবর্ণমেণ্টের হস্তে অর্পণ করা ইহার উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু যে সকল কার্য্যে বিদ্রোহের অপরিহার্য্য আনুষঙ্গিক, তদনুষ্ঠানের অপরাধে বিদেশীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অভিযুক্ত হইলে, বিচারার্থ বিদেশীয় গবর্ণমেণ্টের হস্তে তাঁহাদিগকে সমর্পণ করাই এই বিলের প্রধান উদ্দেশ্য। এই বিল এই আকারে পার্লিয়ামেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইলে, ইংলণ্ডে বিদেশীয় যথেচ্ছাচারী গবর্ণমেণ্টের প্রতিহিংসা-সাধন পাতকের সহযোগী ও অংশভাগী হইতে হইত। কিন্তু মিল এবং আর কতিপয় অগ্রগত লিবারেল তাহা হইতে দিলেন না। তাঁহাদিগেরই সমবেত যত্নে এই বিল প্রত্যাখ্যাত হইল। এই বিলের প্রত্যাখ্যানের পর মিল ও আর কতিপয় পার্লিয়ামেণ্টীয় সভ্য পার্লিয়ামেণ্ট কর্ত্তৃক একষ্ট্রাডিসন সন্ধিবিষয়ে সবিশেষ অনুসন্ধান ও বিবরণ প্রকাশ করিতে আদিষ্ট হন। তাঁহাদিগের বিবরণ প্রকাশের পর একষ্ট্রাডিসন্ বিল পরিবর্ত্তিত ও পরিশোধিত হইয়া নূতন আকারে পার্লিয়ামেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়া বিধিরূপে পরিণত হয়। এই বিধিতে নির্দ্দিষ্ট হয় যে, কোনও রাজনৈতিক পলাতক কোনও রাজনৈতিক অপরাধে বিদেশীয় গবর্মেণ্টের হস্তে সমর্পিত হইবেন না। তাঁহারা যদি অভিযুক্ত হন এবং কোন ইংলণ্ডীয় বিচারালয়ে সপ্রমাণ করিতে পারেন যে, তাঁহারা যে অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছেন, তাহা রাজনৈতিক, তাহা হইলে কোন মতেই তাঁহাদিগকে তাঁহাদিগের গবর্ণমেণ্টের হস্তে সমর্পণ করা হইবে না। এইরূপে মিল কর্ত্তৃক ইউরোপের স্বাধীনতা ও ইংলণ্ডের যশ ঘোরতর কলঙ্ক হইতে সংরক্ষিত হইল।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের পার্লিয়ামেণ্টীয় অধিবেশনের সময় উৎকোচ-নিবারণের জন্য ডিস্‌রেলী যে ব্রাইবারী বিল অবতারিত করেন, মিল বিশেষরূপে তাহার স্বপক্ষতা-সাধন করেন। রিফরম অ্যাক্ট্ পাস হওয়ায় উৎকোচ-প্রথা নিবারিত না হইয়া বরং পরিবর্দ্ধিত হইতেই লাগিল। এই প্রথা যাহাতে সর্ব্বথা নিরাকৃত হয়, মিল তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি কতিপয় সহযোগীর সহিত পরামর্শ করিয়া উক্ত বিলের নানা প্রকার পরিবর্ত্তন ও সংশোধন করিলেন। এই পরিবর্ত্তিত ও পরিশোধিত বিল বিধিবদ্ধ হইয়া উৎকোচ-প্রথার অনেক পরিমাণে নিরাকরণ করিল।

ডিস্‌রেলীর রিফরম বিল উপলক্ষে মিল আর দুইটি গুরুতর বিষয়ের অনুষ্ঠান করেন। দুইটিই প্রতিনিধিশাসনপ্রণালী বিষয়ক। একটি ব্যক্তিগত প্রতিনিধিত্ব-বিষয়ক, অপরটি স্ত্রীজাতির প্রতিনিধিত্ব বিষয়ে। পার্লিয়ামেণ্টে প্রতিনিধি-প্রেরণ বিষয়ে সকলেরই সমান অধিকার থাকা উচিত বটে, কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তিরই হস্তে প্রতিনিধি মনোনীতকরণের ভার অর্পিত হইলে, কার্য্যের অনেক অসুবিধা ঘটে। এই জন্য কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক লোকের উপর এই ভার অর্পিত হইয়া থাকে। ইঁহারাই ইলেক্‌টর নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। পূর্ব্বে এই ইলেক্‌টরের সংখ্যা লোক-সংখ্যা অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হইত না। এখন হইতে লোক-সংখ্যা অনুসারে ইলেক্‌টরের সংখ্যা নির্দ্দেশ করাই মিলের প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। তিনি এই উদ্দেশ্যে মিষ্টার হেয়ারের প্রতিনিধি শাসন-প্রণালীর উপর একটি উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করেন; এবং স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করেন যে, এই প্রণালী ইংলণ্ডে অচিরাৎ প্রবর্ত্তিত না হইলে ইংলণ্ডের মঙ্গল নাই। মিলের এই উত্তেজনা কিঞ্চিৎ পরিমাণে ফলবতী হইল। পার্লিয়ামেণ্ট আপাততঃ অতি অল্পসংখ্যক কন্‌ষ্টিচুয়েন্সীতে এই প্রথা প্রবর্ত্তিত করিলেন। কিন্তু এই আংশিক সংস্কারে সবিশেষ ফলোদয় হইল না।

প্রতিনিধি-শাসন-প্রণালী বিষয়ে মিলের চেষ্টা ততদূর সফল হইল না বটে, কিন্তু দ্বিতীয় বিষয়ে তিনি অধিকতর কৃতকার্য্যতা লাভ করিলেন। পার্লিয়ামেণ্টে প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার এত দিন শুদ্ধ পুরুষেরাই হস্তগত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহারা স্ত্রীজাতিকে এতদিন এই প্রকৃতিসিদ্ধ অধিকারে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। মিল এই অন্যায়-নিবারণার্থ স্ত্রীজাতিকেও এই অধিকার প্রদানের প্রস্তাব করিলেন। যে যে নিয়মে পুরুষজাতিকে ইলেক্টর করা হয়, সেই সেই নিয়মে যেন

স্ত্রীজাতিকে ইলেক্টর করা হয়, ইহাই মিলের প্রার্থনা। পালিয়ামেণ্টে প্রতিনিধি প্রেরণ করার অধিকার এই সময়ে নূতন রিফরম অ্যাক্ট অনুসারে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বিস্তারিত হয়। এমন সময়েও যদি স্ত্রীজাতিরা তাঁহাদিগের প্রকৃতিসিদ্ধ অধিকার বিষয়ে উদাসীন থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা যে কখনই ইহা প্রাপ্ত হইবেন, এরূপ আশা সুদূর পরাহত হয়; এই ভাবিয়া ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে মিল এ বিষয়ে একটি আন্দোলন উত্থাপিত করেন। স্ত্রীলোকদিগের নাম স্বাক্ষরিত করিয়া পালিয়ামেণ্ট এই বিষয়ে একখানি আবেদন করেন। যৎকালে মিল পালিয়ামেণ্টে এই আবেদন প্রদান করেন, তখন তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, দুই চারি জন চিন্তাশীল সভ্য ব্যতীত আর কেহই ইহার স্বপক্ষতা অবলম্বন করিবেন না। কিন্তু এই বিষয় পালিয়ামেণ্টে উপস্থিত হইলে, যখন সর্ব্বশুদ্ধ অশীতি জন সভ্য ইহার প্রতিপোষক হইলেন, তখন বিস্ময় শুদ্ধ মিলকে কেন—সকলকেই অভিভূত করিল এবং মিল ও তদীয় দলের উৎসাহের আর পরিসীমা রহিল না। উৎসাহের আরও বিশেষ কারণ এই যে, মিষ্টার ব্রাইট—যিনি প্রথমে ইহার বিরোধী ছিলেন—মিল ও তদীয় দলপতিদিগের বক্তৃতায় প্রতীত হইয়া তাঁহাদিগের মতের অনুবর্ত্তন করেন। * মিল পার্লিয়ামেণ্টে যতদিন কার্য্য করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে তিনি এইটিকেই তাঁহার বিশেষ গৌরবের কারণ বলিয়া মনে করিতেন।

মিলের পালিয়ামেণ্টিয় জীবনের যাহা কিছু কর্ত্তব্য ছিল, প্রায় সমস্তই বলা হইল। কিন্তু তিনি যখন পার্লিয়ামেণ্টীয় কর্ত্তব্যসাধনে প্রধানতঃ নিযুক্ত ছিলেন, তখনও অন্যান্য বিষয়ে তাঁহার অমূল্য সময়ের কিয়দংশ অতিবাহিত হইত। পালিয়ামেণ্টীয় গুরুতর কর্ত্তব্যসাধনের পর যে কিছু সময় অবশিষ্ট থাকিত, তাহার অধিকাংশই, তাঁহার চিঠিপত্রের উত্তর লিখিতেই পর্য্যবসিত হইত। পালিয়ামেণ্টের সভ্য মনোনীত হওয়ার পূর্ব্ব হইতে তিনি অসংখ্য অপরিচিত ব্যক্তির নিকট হইতে মনোবিজ্ঞান, ন্যায়দর্শন ও অর্থনীতি শাস্ত্রের জটিল প্রশ্ন সকলের মীমাংসার্থ অসংখ্য পত্র প্রাপ্ত হইতেছিলেন। যে সকল পত্রপাঠে মিলের প্রতীতি জন্মিত, যে লেখকদিগের বুদ্ধি সেই সকল জটিল প্রশ্নের মীমাংসা বুঝিতে সমর্থ, তিনি সেই সকল পত্রের উত্তর দিতেন; কিন্তু এবংবিধ পত্রের সংখ্যা ক্রমে এত বাড়িয়া উঠিল যে, তিনি তাহাদিগের সংক্ষিপ্ত উত্তরমাত্র দিতেও অসমর্থ হইতেন। কতকগুলি পত্র বড় বড় লোকের নিকট হইতেও আসিতে লাগিল। সেই সকল পত্রে মিলের রচনাবলীর ভ্রম-প্রমাদাদি প্রদর্শিত হয়। মিল্ অতি উদারপ্রকৃতি ছিলেন; সুতরাং তিনি সে সকল পত্রে বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট না হইয়া পরম আহ্লাদের সহিত সেই সকল পত্রের উপদেশানুসারে নিজ ভ্রম-প্রমাদ সকল সংশোধন করিয়া লইতেন। কিন্তু যে দিন হইতে তিনি পার্লিয়ামেণ্টের মঞ্চতে আসীন হইলেন, সেই দিন হইতে তিনি অন্যবিধ পত্র পাইতে লাগিলেন। যাঁহার যে কোন বিষয়ে প্রতিবাদ করিবার ছিল, যাঁহার যে কোন অভাব-পূরণের আবশ্যকতা ছিল, সেই সেই ব্যক্তি সেই সেই বিষয়ে প্রতিবাদ করিয়া এবং সেই সেই অভাব নির্দ্দেশ করিয়া মিলের নিকট আবেদন করিতে লাগিলেন। মিল্ যাঁহাদিগের প্রতিনিধি হইয়া পার্লিয়ামেণ্টে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের কেহই মিলের উপর এরূপ গুরুভার অর্পণ করেন নাই। যে নিয়মে মিল্ তাঁহাদিগের প্রতিনিধিগ্রহণে স্বীকৃত হইয়াছিলেন, তাঁহারা তাহা হইতে রেখামাত্রও বিচলিত হন নাই। যাহা হউক, মিল যে সকল পত্র পাইতে লাগিলেন, তাহাদের সংখ্যা ক্রমে এত বাড়িয়া উঠিল যে, সে সকলের উত্তর প্রদান করা তাঁহার পক্ষে অতি দুরূহ ভার বলিয়া প্রতীত হইল।

যৎকালে মিল পার্লিয়ামেণ্টিয় কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন তিনি অধিবেশনদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী কালেই কেবল লেখনকার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারিতেন। সেই সকল অবসরকালে তিনি আয়লণ্ড-বিষয়ক প্রস্তাব ভিন্নও আরও কয়েকটি বিষয় রচনা করেন। তন্মধ্যে তদীয় প্লেটো-বিষয়ক রচনা এবং সেণ্ট অ্যাণ্ড্রু বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বক্তৃতাই

---

* কিন্তু যে ব্রাইটের অনুমোদনে মিলের এত আনন্দ ও এত উৎসাহ হইয়াছিল, সেই ব্রাইট এক্ষণে স্ত্রীজাতির প্রতিনিধিত্বের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। তিনি এক্ষণে পূর্ব্বানুমোদন মিলের সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির উত্তেজনাজনিত ভ্রমমাত্র বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। মিলের আত্মা ইহাতে একান্ত ক্ষুব্ধ হইবেন সন্দেহ নাই।

সর্ব্বপ্রধান। প্লেটো-বিষয়ক রচনা সর্ব্বপ্রথমে এডিনবরা রিভিউয়ে প্রকাশিত হইয়া পরে তদীয় "ডেজার্টেসন্‌স এণ্ড ডিস্‌কসন্‌স" নামক পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডে পুনর্মুদ্রিত হয়। সেণ্ট অ্যাণ্ড্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা তাঁহাকে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টরের পদে অভিষিক্ত করেন। এই অভিষেক উপলক্ষেই মিলের পূর্ব্বোল্লিখিত বক্তৃতা। শাস্ত্রের কোন্ কোন্ শাখা উচ্চ-শিক্ষার অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হওয়া উচিত, কিরূপ প্রণালীতেই বা তাহাদের আলোচনা হওয়া উচিত, কিরূপে আলোচিত হইলেই বা তাহাদিগের হইতে কিরূপ ফলের উৎপত্তির সম্ভাবনা, কিরূপেই বা অনুসৃত হইলে তাহাদিগের হইতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফলের সম্ভাবনা, ইত্যাদি বিষয়ে মিল্ যে সকল চিন্তা ও মত আজন্ম সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন, এই উপলক্ষে তিনি সমস্তই ব্যক্ত করেন। পুরা-প্রচলিত ল্যাটিন, গ্রীক্ প্রভৃতি প্রাচীন ভাষা সকলের অধ্যয়নের সহিত নব-প্রবর্ত্তিত বিজ্ঞানের অনুশীলন যে উচ্চশিক্ষার পক্ষে একান্ত আবশ্যক, তাহা তিনি প্রবলতর যুক্তি প্রদর্শন দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়া দিলেন। প্রাচীন ভাষা সকলের অধ্যয়ন ও বিজ্ঞানের যে অনুশীলন উচ্চশিক্ষা-বিধান পক্ষে পরস্পর সহযোগী, সেই অধ্যয়ন অনুশীলন যে অনেক সময়ে উচ্চশিক্ষা-বিধানপক্ষে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে, তাহার কারণ যে সাধারণ শিক্ষা-প্রণালীর লজ্জাকর দূষিতাবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে, তাহা তিনি স্পষ্টাক্ষরে বুঝাইয়া দিলেন। মিলের এই বক্তৃতা যে শুদ্ধ উচ্চশিক্ষারই উত্তেজনা করিয়া দিল, এরূপ নহে; সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগেরও মনে উচ্চশিক্ষার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি বিষয়ে এত দিন যে সকল কুসংস্কার বদ্ধমূল ছিল, তাহারও নিরাস করিল।

এই সময়ে তিনি আরও একটি গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন, কিন্তু পার্লিয়ামেণ্ট থাকিতে থাকিতে তাহা সমাপ্ত করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সেই গুরুতর বিষয়—পিতৃদেব-রচিত "মানব মনের বিশ্লেষণ"-বিষয়ক প্রস্তাবের দ্বিতীয় সংস্করণের মুদ্রাঙ্কন ও প্রকাশন। ইহা দ্বারা তিনি যে শুদ্ধ পিতৃদেবের পবিত্র স্মৃতির প্রতি যথোচিত ভক্তি-প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এরূপ নহে, মনোবিজ্ঞানের প্রতিও তাঁহার প্রকৃত কর্ত্তব্যসাধন করা হইয়াছিল। তিনি টিপ্পনী লিখিয়া সেই সুন্দর পুস্তকখানির মতগুলিকে উন্নত বিজ্ঞান ও দর্শনের উপযোগী করিয়া দিলেন। এই গুরুতর কার্য্যে তিনি একাকী প্রবৃত্ত হন নাই। সুবিখ্যাত দার্শনিক মিষ্টার বেইন, বিখ্যাত ঐতিহাসিক মিষ্টার গ্রোট এবং সুবিখ্যাত শব্দশাস্ত্রজ্ঞ মিষ্টার ফিণ্ডলেটার—এই তিন জনে এই বিষয়ে প্রাণপণে তাঁহার সাহায্য করিয়াছিলেন। মনোবিজ্ঞান বিষয়ে যে সকল টিপ্পনী প্রদত্ত হয়, তাহার প্রায় অর্দ্ধভাগ তৎকর্ত্তৃক লিখিত এবং অপরার্দ্ধ মিষ্টার বেইন কর্ত্তৃক প্রদত্ত। দর্শনেতিবৃত্ত সম্বন্ধে যে সকল টিপ্পনী প্রদত্ত হয়, তাহার সমস্তই গ্রোটের শ্রমসম্ভূত; এবং শব্দশাস্ত্র সম্বন্ধে যে সকল অভাব প্রপূরিত হয়, তাহা ফিণ্ডলেটারেরই যত্নে। যৎকালে জেমস মিলের পুস্তকখানি প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন মনোবিজ্ঞানের স্রোত প্রতিকূলদিকেই প্রধাবিত ছিল; ভূয়োদর্শন ও সংযোজন মত তখনও সম্যক্‌রূপে প্রচারিত হয় নাই; এই জন্যই ইহা তৎকালে সাধারণ জনগণের নিকট ততদূর আদৃত হয় নাই। কিন্তু ইহা কতিপয় মনীষীর মনে এরূপ গভীর ভাব অঙ্কিত করে যে, তাঁহারা ভূয়োদর্শন ও সংযোজন মতের পক্ষপাতী না হইয়া থাকিতে পারিলেন না; এবং ইহাঁদিগের যত্নে এই মতের স্বপক্ষে যে অনুকূল পবন উত্থাপিত হয়, তাহারই প্রবাহ হেতু বর্ত্তমান সময়ে ভূয়োদর্শন মনোবিজ্ঞানের এতদূর প্রভাব। বৈশ্লেষিক মনোবিজ্ঞান বিষয়ে যতগুলি পুস্তক লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে মিষ্টার বেইন ও জেমস মিলের পুস্তকদ্বয়ই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই দুইখানিই উৎকৃষ্ট পাঠ্য পুস্তক হওয়ার সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

ইত্যবসরে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের শরৎকালে যে পার্লিয়ামেণ্ট রিফরম্ অ্যাক্ট পাশ করেন, তাহার অধিবেশন ভঙ্গ হইল। মিল্ গতবার ওয়েষ্টমিনিষ্টার কর্ত্তৃকই পার্লিয়ামেণ্টে প্রতিনিধি প্রেরিত হন। কিন্তু নব-প্রতিনিধি মনোনীত-করণকালে মিলের নাম পরিক্ষিপ্ত হইল। তিনি ইহাতে কিছুমাত্রও বিস্মিত হইলেন না। এই ঘটনার দুই তিন দিন পূর্ব্বেও তাঁহার পৃষ্ঠপোষকেরা ভাবিয়াছিলেন যে, তিনি এবারও ওয়েষ্টমিনিষ্টার কর্ত্তৃক প্রতিনিধি মনোনীত হইবেন। সুতরাং মিল্ পরিক্ষিপ্ত হওয়ায় তাঁহারা মর্ম্মান্তিক বেদনা পাইলেন বটে, কিন্তু

বিস্মিত হইলেন না। মিল্ যে পরিক্ষিপ্ত হইবেন, তাহা তাঁহার ও তদীয় বন্ধুদিগের বিন্দুমাত্রও বিস্ময়ের কারণ ছিল না। তবে যে কিরূপে তিনি একবার প্রতিনিধি মনোনীত হইয়াছিলেন এবং একবার প্রতিনিধি মনোনীত হইয়াই বা দ্বিতীয়বার কেন পরিক্ষিপ্ত হইলেন, ইহাই তাঁহাদিগের বিশেষ বিস্ময়ের কারণ হইয়াছিল।

মিল্ যে দ্বিতীয়বার পরিক্ষিপ্ত হইলেন, তাহার গুরুতর কারণ ছিল। টোরি গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে নিজ অস্তিত্বের জন্য শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। এক্ষণে কোন বিবাদে কৃতকার্য্যতালাভ করা তাঁহাদিগের নিকট প্রাণধারণের একমাত্র উপায় বলিয়া বিবেচিত হইল। তাঁহারা জানিতেন যে, পার্লিয়ামেণ্টে মিলের অবস্থিতি তাঁহাদিগের কৃতকার্য্যতালাভের প্রধান অন্তরায়। এই জন্য তাঁহারা এই দ্বিতীয়বারে মিলের পরিক্ষেপের জন্য প্রাণপণে যত্ন করিতে লাগিলেন। মিল্ যখন প্রথমবারে প্রতিনিধি মনোনীত হয়েন, তখন টোরিদিগের তাঁহার প্রতি কোন ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ছিল না। তাঁহারা তাঁহার মতের বিরোধী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার প্রতি তাঁহাদিগের কোন ব্যক্তিগত বিদ্বেষভাব ছিল না; বরং অনেকেই তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট অথবা উদাসীন ছিলেন। কিন্তু মিলের পার্লিয়ামেণ্টীয় নির্ভীক ও স্বাধীন কার্য্যকলাপ দেখিয়া এক্ষণে সকলেই তাঁহার বিদ্বেষী হইয়া উঠিয়াছিলেন; এবং যাহাতে তিনি দ্বিতীয়বার পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশ করিতে না পারেন, তজ্জন্য সকলেই বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। মিল্ তদীয় রাজনৈতিক রচনাবলীতে লোকতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে সকল বক্তব্য আছে, তাহার সবিশেষ নির্দ্দেশ করেন। এই সূত্র অবলম্বন করিয়া স্থিতিশীলেরা এইরূপ রটনা করিয়া দেন যে, তিনি লোকতন্ত্রের বিরোধী। তাঁহারা ভাবিলেন, বুঝি মিল্ তাঁহাদিগেরই দলভুক্ত হইলেন। কিন্তু মিলের সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি তাঁহাদিগের সঙ্কীর্ণ বুদ্ধির ন্যায় লোকতন্ত্রের প্রতিকূল পক্ষমাত্র দেখিয়াই প্রতিহত হইত না; অনুকূল পক্ষও ধারণা করিতে সমর্থ হইত। তাঁহারা যদি মিলের রচনাবলী আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত পাঠ করিতেন, তাহা হইলে অবশ্য জানিতে পারিতেন যে, মিল্ লোকতন্ত্রের বিরুদ্ধে সম্ভবতঃ যে সকল যুক্তি উত্থাপিত হইতে পারে,—সে সকলের প্রতি যথোচিত সম্মান-প্রদর্শন করিয়াও অবশেষে লোকতন্ত্রের অনুকূলেই অসন্দিগ্ধ মত প্রকাশ করিয়াছেন। তবে লোকতন্ত্র হইতে যে সকল অসুবিধা ঘটিবার সম্ভাবনা, সেইগুলির উল্লেখপূর্ব্বক তাহাদিগের নিবারণের জন্যই তিনি কতকগুলি সুনিয়ম সংস্থাপন করিতে বলেন মাত্র। মিল্ যেমন এক দিকে টোরিদলের ও স্থিতিশীলদিগের বিশেষ বিদ্বেষভাজন হইয়া উঠিলেন, তেমনই অন্যদিকে লিবারেল্দিগেরও অপ্রীতিভাজন হইয়া উঠিলেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, যে বিষয়ে অন্যান্য লিবারেলদিগের সহিত তাঁহার মতের অনৈক্য হইত, এবং যে যে বিষয়ে লিবারেলেরা সাধারণতঃ উদাসীন থাকিতেন, সেই সেই বিষয়েই প্রধানতঃ মিল পার্লিয়ামেণ্টীয় কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন। যে যে বিষয়ে লিবারেলদিগের সহিত তাঁহার মতের ঐক্য ছিল, সে সে বিষয়ে তিনি কিছুই বলিতেন না; সুতরাং লিবারেলেরাও তাঁহাকে আপনাদিগের পক্ষ বলিয়া মনে করিতে পারিতেন না। বিশেষতঃ মিলের কতকগুলি কার্য্যে অনেকেরই মনে তাঁহার প্রতি ব্যক্তিগত বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল। জামেকার গবর্ণর মিষ্টার আয়ারের প্রতি তাঁহার ব্যবহার অনেকে ব্যক্তিগত নির্য্যাতন বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। মিষ্টার ব্রাডলর পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য তিনি যে চাঁদা প্রদান করেন, তাহাতেও তিনি লোকের বিশেষ বিরাগভাজন হন। মিল নিজের পার্লিয়ামেণ্ট প্রবেশের জন্য এক কপর্দ্দকও ব্যয় করিতে প্রস্তুত ছিলেন না বটে; কিন্তু তাহাদিগের পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশনিমিত্তক ন্যায়-ব্যয় নির্ব্বাহার্থ চাঁদা দেওয়া তিনি অলঙ্ঘ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। বিশেষতঃ তাঁহার পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশ-সাধনার্থ যে ব্যয় হইয়াছিল, তাহার নির্ব্বাহার্থ যখন সাধারণে চাঁদা প্রদান করিয়াছিলেন, তখন তিনিও অন্যান্য পাত্রদের তন্নিমিত্তক ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য চাঁদা প্রদান করিতে আপনাকে ধর্ম্মতঃ বাধ্য বলিয়া মনে করিতেন। এই জন্য তিনি যে শুদ্ধ ব্রাডলর পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশসাধনের জন্যই চাঁদা দিয়া ক্ষান্ত রহিলেন, এরূপ নহে, অন্যান্য শ্রমজীবিশ্রেণী প্রার্থীদিগেরও প্রবেশসাধন-নিমিত্তক ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ প্রচুর চাঁদা প্রদান করেন। শ্রমজীবিশ্রেণী ব্রাডলর প্রধান পৃষ্ঠবল ছিলেন। তাঁহার নিজেরও বিশেষ ক্ষমতা ছিল। শ্রমজীবিশ্রেণীর নিকট ব্রাডল যে বক্তৃতা করেন, তাহা শুনিয়া মিল তাঁহার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। মিলের

প্রতীতি জন্মিল যে, ব্রাড্‌ল ডিমাগগ্ (Demagogue) নহেন। যাঁহারা আপন ইচ্ছানুসারে সাধারণ জনগণকে যে কোন বিষয়ে উত্তেজিত ও উন্মাদিত করিতে পারেন এবং আপনাদিগের লোকপ্রিয়তা রক্ষা করিবার জন্য সকল সাধারণ মতের অনুবর্ত্তন করেন, এরূপ লোকপ্রিয় ও লোকদাস ব্যক্তিগণই উক্ত বিশেষণে অভিহিত হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি ম্যালথসের মত ও ব্যক্তিগত প্রতিনিধিত্ব প্রভৃতি গুরুতর বিষয় সকলেও লোকতান্ত্রিক দলের সহিত সম্পূর্ণ মতভেদ প্রদর্শন করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না, তিনি ডিমাগগ—মিল ইহা কোন মতেই বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। যাঁহারা শ্রমজীবিশ্রেণীর লোকতান্ত্রিক মত সকলের পক্ষপাতী হইয়াও স্বাধীনভাবে রাজনৈতিক প্রশ্ন সকলের মীমাংসা করিতে সমর্থ, যাঁহাদিগের হৃদয় সাধারণ মতের বিরোধেও ব্যক্তিগত স্বাধীন মত ব্যক্ত করিতে বিকম্পিত হয় না ;—এরূপ লোকের পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশ যে একান্ত প্রার্থনীয়, তাহা মিল বিশেষরূপে জানিতেন। এই জন্যই ব্রাডলর পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশ-সাধনের জন্য মিলের এত যত্ন ও এত চেষ্টা হইয়াছিল। ব্রাডলর ধর্ম্মবিরোধী মতসকল সত্ত্বেও তিনি যে পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য মনোনীত হওয়ার সম্পূর্ণ উপযুক্ত, ইহা মিল মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেন। যদি মিলের মনে সাধারণ হিতের উপর আত্মস্বার্থজ্ঞানের প্রাবল্য থাকিত, তাহা হইলে তিনি কখনই ব্রাডলর ইলেক্‌সন্ ব্যয়নির্ব্বাহার্থ চাঁদা দিতে পারিতেন না। কারণ, তিনি জানিতেন যে, ব্রাড্‌লর বিরুদ্ধে সাধারণ মত এতদূর প্রবল যে, ব্রাডলর স্বপক্ষতাসাধন করিতে গেলে তাঁহার নিজের গুরুতর অনিষ্ট সাধিত হইবে। বাস্তবিকও তাহাই ঘটিল। ব্রাড্‌লর স্বপক্ষতাসাধনাই তাঁহার পার্লিয়ামেণ্টে পুনঃপ্রবেশের প্রধান অন্তরায় হইয়া উঠিল। তাঁহার শত্রুরা এই ঘটনা উল্লেখ করিয়া ওয়েষ্টমিনিষ্টারের ইলেক্টরদিগকে তাঁহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া দিল। একদিকে তাঁহার টোরি প্রতিদ্বন্দ্বী মুক্তহস্তে উৎকোচ প্রদান ও নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন, অন্যদিকে মিলের পক্ষে পার্লিয়ামেণ্টে পুনঃ প্রবেশের জন্য সৎ বা অসৎ কোন প্রকার উপায়ই অবলম্বিত হইল না। মিল প্রথমবার কৃতকার্য্য হইয়াও এই সকল কারণ-পরম্পরার সমবায়েই দ্বিতীয়বার কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

মিল ওয়েষ্টমিনিষ্টার কর্ত্তৃক প্রতিনিধি মনোনীত হইলেন না, এই সংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র চারিটি কাউণ্টি প্রার্থী হইবার জন্য মিলকে আহ্বান করিয়া পাঠাইল। প্রার্থী হইলে মিলের অকৃতকার্য্য হইবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না এবং যদিও বিনা ব্যয়েই তাঁহার কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারিত, তথাপি তিনি আর আপনাকে নির্জ্জনবাসজনিত শান্তিসুখে বঞ্চিত করিতে ইচ্ছা করিলেন না। পরিক্ষিপ্ত হওয়ায় তিনি আপনাকে কোন মতেই অবমানিত মনে করিলেন না। তাঁহার পরিক্ষেপ-সংবাদে নানা স্থানের নানা লোকের নিকট হইতে তাঁহার নিকট দুঃখসূচক পত্র আসিতে লাগিল। যে সকল লিবারেলদিগের সহিত মিল্ পার্লিয়ামেণ্টে একত্র কার্য্য করিতেন, তাঁহারা তাঁহার পরাজয়ে বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিয়া পাঠাইলেন। পরাজয়ে মিলের মনে যদি বিন্দুমাত্রও দুঃখ হইয়া থাকে, এই সাধারণ সহানুভূতিতে তাহা সম্পূর্ণরূপে অপনোদিত হইল।

আমরা এক্ষণে মিলের জীবন-নাটকের শেষ অঙ্কের চরম সীমায় উপনীত হইলাম। তাঁহার জীবনের এই অংশে কোনও গুরুতর ব্যাপার অভিনীত হয় নাই। তিনি পার্লিয়ামেণ্ট হইতে প্রত্যাখ্যাত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় অধ্যয়নে ও গ্রন্থ-রচনায় নিমগ্ন হইলেন এবং দক্ষিণ-ইউরোপের গ্রাম্য জীবনের উপভোগে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। বৎসরের প্রায় সমস্ত সময়ই তথায় অবস্থিতি করিতেন ; কেবল বৎসরে দুইবার কতিপয় সপ্তাহমাত্র লণ্ডনের অদূরে আসিয়া বাস করিতেন। এই সময়েও তদীয় লেখনী ও জিহ্বা পরহিতসাধনে সতত নিরত ছিল। তিনি অনেক সাময়িক পত্রে বিশেষতঃ বন্ধুবর মর্লের পাক্ষিক সমালোচনায় অনেকগুলি প্রস্তাব লিখিয়া পাঠান এবং "স্ত্রীজাতির অধীনতা" নামক যে পুস্তকখানি অনেকদিন পূর্ব্বে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া প্রকাশিত করেন। বৃদ্ধ চ্যাটামের ন্যায় এই পরিণতবয়সেও তিনি সাধারণ সভায় অনেকবার বক্তৃতা করেন ; এবং অসাধারণ অধ্যবসায়ের সহিত ভাবী পুস্তকাবলীর জন্য উপকরণসামগ্রী প্রস্তুত করিতেছিলেন, এমন সময় নিষ্ঠুর কালকীট তদীয় জীবনতন্তু ছিন্ন করিয়া ফেলিল।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ৯ই মে দক্ষিণ-ফ্রান্সের অন্তর্গত আভিনে নামক নগরে তদীয় পত্নীর সমাধিমন্দিরের অদূরবর্ত্তী কুটীরে, এরিসিপিলস্ রোগে জন্ ষ্টুয়ার্ট

মিলের মৃত্যু হয়। সেই দিনই অপরাহ্নে তাড়িত-বার্ত্তাবহযোগে ভারতে সংবাদ আসিল যে, স্ত্রীজাতির প্রধান সহায়—ভারতের পরম বন্ধু—স্বাধীনতার অদ্বিতীয় সমর্থক—পণ্ডিত-শিরোমণি—ব্রিটিশ-কহিনুর মিল নাই! ভারতের জীর্ণ দেহে এই বজ্রাঘাত অতি গুরুতর লাগিল। ভারত অতি দুঃখিনী, দীনা; তাঁহার পক্ষে এ ক্ষতি অপূরণীয়। ব্রিটেনের অসংখ্য অধিবাসীর মধ্যে প্রকৃত ভারতহিতৈষী অঙ্গুলিমাত্রে গণনীয়। পার্লিয়ামেণ্টে কত শত প্রতিনিধি প্রেরিত হইয়াছেন ও হইতেছেন; কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে প্রকৃত ভারত-হিতৈষী বর্ক, সেরিডান, মিল, ফসেট, এবং ব্রাইট্ প্রভৃতি কতিপয় মনীষী ভিন্ন আর কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না।

এই দুর্ঘটনা এত আকস্মিক হইয়াছিল যে, লোকে ভাবিবার কোনও সময় পায় নাই। গগনভেদী বজ্রধ্বনির ন্যায় এই আকস্মিক চমক ব্রিটেনের অধিবাসীদিগকে ক্ষণকালের জন্য সংজ্ঞাবিহীন করিয়া ফেলে। এই ক্ষণস্থায়ী চমকের পর সংবাদপত্রসকল একবাক্যে ও সমস্বরে মিলের যশোগান করিতে আরম্ভ করিল। অধিক কি, যে সকল ধর্ম্মযাজকেরা মিলের মতের বিদ্বেষী ছিলেন, তাঁহারাও ভজনালয়ের বেদীতে উপবিষ্ট হইয়া মিলের গুণগান আরম্ভ করিলেন। শ্রমজীবিশ্রেণী তদ্বিরহে পিতৃবিয়োগজনিত শোকচিহ্ন ধারণ করিল। যাঁহাদিগের মঙ্গলসাধনে তিনি জীবন উৎসর্গীকৃত করিয়াছিলেন, সেই কোমলহৃদয়া রমণীকুল শোকে দরবিগলিতাশ্রু হইলেন। সংক্ষেপতঃ উনবিংশ শতাব্দীর দার্শনিকদিগের চূড়ামণি, নৈতিক উৎকর্ষের সর্ব্বোৎকৃষ্ট আদর্শস্থল, চিন্তাসাগরের তলস্পর্শী ও পারদর্শী মিল নাই—ব্রিটেনের চতুর্দ্দিকে এই সংবাদ প্রচারিত হইলে সমস্ত ব্রিটিশ জাতিই গভীর শোকচিহ্ন ধারণ করিল।

মিল যৎকালে পার্লিয়ামেণ্টে আসনে উপবিষ্ট ছিলেন, তখন পার্লিয়ামেণ্টে ভারতীয় কোন গুরুতর প্রশ্ন উত্থিত নাই। উত্থিত হইলে তিনি যে ভারতের পক্ষই সমর্থন করিতেন, তাহা তাঁহার জামেকা ও আয়র্লণ্ডের প্রতি ব্যবহার দেখিলেই স্পষ্ট অনুমান করা যাইতে পারে।

মিল যে ভারতের প্রকৃত হিতৈষী ছিলেন, তাহার এরূপ আনুমানিক প্রমাণ ভিন্নও দুই একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণও আছে। কথিত আছে, ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বকালে উক্ত কোম্পানীর নিকট হইতে ভারতবর্ষের বিদ্যাশিক্ষাবিষয়ক যে প্রসিদ্ধ লিপি প্রেরিত হয়, তাহার রচনাকার্য্যে মিলের ভূয়সী সহায়তা ছিল। মিল তৎকালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর করেসপনডেন্স বিভাগের পরীক্ষকের পদে অভিষিক্ত ছিলেন। কোর্ট অব ডাইরেক্টার হইতে ভারতবর্ষে যে সকল আজ্ঞালিপি আসিত, তাহা মিলের পরীক্ষা ভিন্ন প্রেরিত হইত না। সুতরাং উক্ত লিপিও মিলের দ্বারা পরীক্ষিত ও অনুমোদিত হইয়াই ভারতে প্রেরিত হয়। মিলের "লিবার্টি" নামক স্বাধীনতা-বিষয়ক পুস্তকে যে সকল মত পরিব্যক্ত হইয়াছে এবং সেণ্ট আণ্ড্রুজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতাকালে তিনি শিক্ষা বিষয়ে যে সকল মত প্রকাশ করিয়াছেন, সেই সকল মতের সহিত এই ভারতীয়-শিক্ষা-বিষয়ক লিপি-প্রচারিত মতের সম্পূর্ণ ঐক্য উপলক্ষিত হয়। তাঁহার মতে চৌর্য্য প্রভৃতি অপরাধের দণ্ডপ্রদান করাই যে রাজার প্রধান কার্য্য, তাহা নহে। রাজার প্রজাদিগের প্রতি বহুগুলি কর্ত্তব্য আছে, তন্মধ্যে প্রত্যেক প্রজার সুশিক্ষা-বিধানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কি ধনী, কি নির্ধন, কি ভদ্র, কি অভদ্র, কি উচ্চ, কি নীচ—সকলেই যাহাতে বিদ্যাভ্যাস করে, রাজার তদ্বিষয়ে সবিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। প্রাচীন ও নবীন ভাষা সকলের অনুশীলনের সহিত দর্শন ও বিজ্ঞানের চর্চ্চা যাহাতে দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হয়, তদ্বিষয়েও রাজার বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। ধর্ম্মোপদেশ বিষয়ে রাজার হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে। প্রজাদিগকে ধর্ম্মবিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া রাজার অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্য। মিলের শিক্ষাবিষয়ক মতানুসারে ভারতের শিক্ষাপ্রণালী যে কিয়ৎ পরিমাণে অনুসৃত হইতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

মিল যে ভারতের পরমহিতৈষী ছিলেন, তাহার দ্বিতীয় প্রত্যক্ষ প্রমাণ, রাজ্ঞী কর্ত্তৃক স্বহস্তে ভারতের শাসনভার গ্রহণকালে মিল কর্ত্তৃক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষ সমর্থন। আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে যৎকালে রাজ্ঞী ভারতের শাসনভার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট হইতে নিজের হস্তে গ্রহণ করেন, তখন মিল তাহার ভীষণ প্রতিবাদ করেন। রাজ্ঞীকে এই কার্য্য হইতে নিরস্ত করিবার জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যে আবেদন করেন, মিলই তাহা লিখিয়া দেন। রাজ্ঞীর স্বহস্তে ভারতশাসনভার গ্রহণের প্রতিকূলে মিল যে

সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। তৎকালে কি ভারতবাসী, কি ব্রিটনবাসী—কেহই মিলের যুক্তির গভীরতার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। মিলের পরামর্শের অনুসরণ না করার অশুভ ফল ভারতবাসীদিগকে এক্ষণে পদে পদে ভোগ করিতে হইতেছে। অযোধ্যার বেগমদিগের সর্ব্বস্বাপহরণের জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারত-প্রতিনিধি লর্ড হেষ্টিংসের দুর্দ্দশার আর পরিসীমা ছিল না। কিন্তু কুমারাই, লক্ষ্মীবাই প্রভৃতির প্রতি সাধুজন-বিগর্হিত ব্যবহারের জন্য রাজ্ঞী-প্রতিনিধি লর্ড নর্থব্রুকের কি হইল? চৈৎসিংহের প্রতি অসদ্ব্যবহার করায় হেষ্টিংসের কি না হইয়াছিল? কিন্তু হতভাগা গুহকুমারের প্রতি নির্ব্বাসন করায় নর্থব্রুক আনন্দ উপাধিতে উন্নীত হইলেন। প্রধান বণিক্-দলের প্রতিনিধির সামান্য অপরাধও পার্লিয়ামেণ্ট বা রাজ্ঞী ক্ষমা করিতেন না। কিন্তু রাজ্ঞীর প্রতিনিধির গুরুতর অপরাধও কি রাজ্ঞীর নিকট ক্ষমণীয় নহে? এবং কোন গুরুতর অপরাধে ও রাজ্ঞীর ভারত-প্রতিনিধি অভিযুক্ত হইলেন, পার্লিয়ামেণ্টের কমন্স সভার তদ্রূপ সাহস আছে? ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী রাজ-প্রতিনিধি ছিলেন না; সুতরাং তাঁহার ভারতকর্ম্মচারীরা রাজপ্রতিনিধি বলিয়া সম্মান করিতে পারিতেন না। কিন্তু এক্ষণে সামান্য শান্তিরক্ষক হইতে গবর্ণর জেনেরল পর্য্যন্ত সকলেই রাজপ্রতিনিধি স্বরূপ; কাহারও সম্মানের ক্ষতি হইলে, কাহারও সহিত স্বার্থ সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে ...

... তের নেতা।

... বিশ্লেষণী শক্তি অতি প্রবল এবং কম্‌টের বুদ্ধির সংশ্লেষণী শক্তি অতি প্রখরা। এক জনের বুদ্ধির সূক্ষ্মতা ও গভীরতা অধিক, অন্যের বুদ্ধির প্রশস্ততা ও বিশালতা অধিক। মিলের বুদ্ধি তমোগুণান্বিত, কম্‌টের বুদ্ধি রজোগুণান্বিত। দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি যে সকল বিষয়ে কুসংস্কার প্রচলিত আছে, তাহাদের উচ্ছেদসাধন করাই মিলের বুদ্ধির প্রধান উদ্দেশ্য, এবং নূতন দর্শন, নূতন বিজ্ঞান, নূতন রাজনীতি, নূতন সমাজের সৃষ্টি করাই কম্‌টের বুদ্ধির প্রধান লক্ষ্য। মিল পণ্ডিতশিরোমণি, সূচাগ্রবুদ্ধি, চার্ব্বাক দর্শন-প্রবর্ত্তয়িতা দেবগুরু বৃহস্পতির প্রতিকৃতি; কম্‌ট মীমাংসাপটু, চিন্তানিমগ্ন, ধীরমতি, সাংখ্যদর্শনপ্রণেতা মুনিবর কপিলের প্রতিকৃতি। বৃহস্পতি ও কপিলের ন্যায় ইহাঁরা উভয়েই আমাদের আদরের ধন। প্রথমাবস্থাতেই ইহাঁদিগের দুই জনেরই অনেক বিষয়ে মতের একতা ছিল। কিন্তু ক্রমে তাঁহাদিগের মধ্যে গুরুতর মতভেদ হইয়া উঠিল। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও সামাজিক শাসন লইয়া ইহাঁদিগের মধ্যে প্রধানতঃ এই মতভেদ উত্থিত হয়। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর সামাজিক শাসনের প্রাবল্য হইলে জগতের উন্নতিস্রোত রুদ্ধ হইবে, সুতরাং তাহা হইতে দেওয়া উচিত নহে—ইহাই মিলভাষ্যের মূল সূত্র এবং সামাজিক শাসনের উপর ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রাবল্য হইলে জগতে ঘোরতর উচ্ছৃঙ্খল ব্যাপার সংঘটিত হইবে; সুতরাং তাহা হইতে দেওয়া উচিত নহে—ইহাই কম্‌ট ভাষ্যের মূলমন্ত্র। এ বিষয়ের পূর্ণ-সমালোচনা করা আমাদের এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থে এ বিষয়ের আলোচনা করা আমাদের অভিপ্রেত রহিল।

উপসংহারকালে বক্তব্য এই, যাঁহারা মানসিক পরিণতির সহিত সমভাবে হৃদয়ের উন্নতি দেখিতে চান, যাঁহারা সন্তান সন্ততিদিগের সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর শিক্ষাবিধান করিতে ইচ্ছা ...

... গভীর মানসিক চিন্তার সহিত প্রগাঢ় প্রণয়ের অবিসংবাদ দেখিতে কুতূহলী, লোকপ্রচলিত কোনপ্রকার ধর্ম্মপ্রণালীর অবলম্বন ব্যতীতও সাধু ও সচ্চরিত্র হওয়া সম্ভব, যাঁহারা তাহার পরীক্ষা করিতে চাহেন, তাঁহাদিগের সকলেরই জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত ও তদীয় গ্রন্থাবলী পাঠ করা উচিত। আমাদিগের বিশ্বাস, যদি কখন মানবজাতির উপকর্ত্তাদিগের পূজা জগতে প্রতিষ্ঠাপিত হয়, তাহা হইলে সেই দেবতালিকা হইতে কম্‌ট ও মিলের নাম কখনই পরিত্যক্ত হইবে না।

সমাপ্ত